শনিমণ্ডলীর ছবি

দণ্ডায়মান : নীরদ চৌধুরী, গোপাল হালদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, হরিপদ রায়, গিরিধর চক্রবর্তী।

উপবিষ্ট : সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রঙীন হালদার, মোহিতলাল মজুমদার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়,

আত্মস্মৃতি

[প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় খণ্ড একত্রে]

আত্মস্মৃতি

সজনীকান্ত দাস

স্বর্ণরেখা * ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড * কলিকাতা ৯

ATMASMRITI *by* SAJANI KANTA DAS

রঞ্জনকুমার দাস

প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ

॥ ৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ॥

প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ সূচী ॥

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

আত্মস্মৃতি

প্রথম খণ্ড

উৎসর্গ

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়কে
যিনি আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়া
আমার যাত্রাপথ
সুগম করিয়াছিলেন,
তাঁহার উনত্রিশ বিবাহ-বার্ষিক দিবসে

আত্মস্মৃতি

প্রথম তরঙ্গ

পরিচয়

১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র তারিখে আমার পঞ্চাশত্তম জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায়* সংক্ষেপে আমার জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন ; তাহা আমার সেই জীবনের কাহিনী যাহা প্রত্যক্ষ, সকলের গোচর ; সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া হাকিমের সম্মুখে হলফ করিয়া তাহা স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে বলা যাইতে পারে। ইহার বাহিরে আমার আর একটা জীবন আছে, যাহা শুধু অন্যের অগোচর নয়, আমারও সম্পূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে নহে—কতকটা অবাঙ্‌মনসগোচর, সৃষ্টিরহস্যসমুদ্রের উপরিভাগে যাহা মাঝে মাঝে কমলের মত শোভমান হইয়া সুরভি বিস্তার করিয়া অতলে তলাইয়া যায়—যাহার বিকাশ শুধু অনুভব করা যায়, বাস্তবে ধরা-ছোঁয়া যায় না। জানা-অজানার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত এই জীবন শুধু আমারই একান্ত নহে, প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই ইহা বর্তমান। নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান ও সাধনা করিলে সকলেই স্ব-স্ব-অগোচর জীবনকে অন্তত অংশতও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কিন্তু তাহার অবসর সংসারবদ্ধ জীবের পক্ষে কদাচিৎ ঘটে। ঝড়ের তাড়নায় শুষ্ক পাতার মত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ নিরন্তর অজ্ঞাত ও অনিশ্চিতের পশ্চাতে ধাবমান, পরিণামে কোথায় কোন্ আবর্জনাস্তূপের মধ্যে তাহার বিলুপ্তি—কে তাহার সন্ধান রাখে? অতি গূঢ়, গোপন, রহস্য-ময় এই জীবনকে বাঙ্ময় প্রকাশ দিতে পারেন শুধু কবিরা। তাঁহারা ভাগ্যবান, বিশেষকে সাধারণ করিয়া তুলিবার অধিকারী তাঁহারা। তাঁহারাই প্রমাণ করিয়া দেন—সহৃদয়-হৃদয়-বেদ্য কাব্যই যথার্থ মানুষের আত্মকথা ; সন-তারিখের ইতিহাস—অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য, রসিকজনের কাছে অগ্রাহ্য। আমার জীবন যদি কোনদিন সম্যক্ ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে, তখন তাহার কাহিনী রচনা করিবার ভার সমসাময়িক বা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের—আমার নহে। যে অগোচর জীবনের কথা আগে বলিলাম তাহার আভাস কেবল আমি একাই দিতে পারি। কিন্তু একটানা সে কাহিনী ইনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে পারি তেমন বস্তুতান্ত্রিক হিসাবী ঐতিহাসিক আমি নই। সৌভাগ্য-ক্রমে কাব্যসরস্বতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন, ছন্দের বন্ধনে অগোচর ও অধরা ক্ষণে ক্ষণে বাঁধা পড়িয়াছেন—মহাজীবন-তরঙ্গে আমার নগণ্য জীবনও ঢেউয়ের শীর্ষে উঠিয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে।

* 'শ্রীসজনীকান্ত দাস'—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ১৯৫০।

সেই তরঙ্গমালার কথা সকলকে শুনাইবার উপকরণ আমার রচনায় আছে। আজ আত্মস্মৃতির নাম করিয়া জীবনের ঢেউ গনিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছি—মহাজীবনজলধি ব্যাপিয়া ঢেউয়ের উপর ঢেউ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, কোনটি উত্তাল হইয়া গগন স্পর্শ করিবার স্পর্ধা করিতেছে, কোনটি নীরবে নিভৃতে ভাল করিয়া মাথা তুলিবার পূর্বেই ভাঙিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে, বায়ুপ্রঘাতে উচ্ছ্রিত ফেনপুঞ্জে কোনটি আত্মহারা, কোনটি মুহুর্মুহু বীচিভঙ্গে বর্ণাঢ্য প্রতিবিম্বমালায় সমুজ্জ্বল। এই নির্বিশেষ তরঙ্গমালার মধ্যে একটি বিশেষকে চিহ্নিত করিবার জন্য কিছু লৌকিক প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। গোড়ায় সেই পরিচয়-কাহিনীই বলিব।

বর্ধমান জেলার বহরান গ্রামে দাসগোষ্ঠীর আদি নিবাস। বহরান উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থপ্রধান গ্রাম ছিল। আমরাও ওই সমাজভুক্ত। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দুই-একজন পদকর্তা ও কবিও ছিলেন। আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ বিবাহসূত্রে বহরান ত্যাগ করিয়া বীরভূম জেলার বোলপুর স্টেশনের সন্নিকটবর্তী রাইপুর গ্রামে বসবাস করেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ লর্ড সিন্‌হা অব রাইপুর হইয়া এই গ্রামকে প্রসিদ্ধি দান করিয়াছেন। দাসেরা বর্তমানে সেই রাইপুরের অধিবাসী। আমার পিতা হরেন্দ্রলাল দাস সিউড়ি সরকারী স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া বর্ধমান রাজ কলেজে এফ. এ. পড়িতে পড়িতে কানুনগো হিসাবে সরকারী চাকুরিতে প্রবিষ্ট হন এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর হইতে পার্টিশন-ডেপুটি কালেক্টররূপে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাবনায় সাবডেপুটি কালেক্টর হইয়াছিলেন। আমার মাতুলালয় বর্ধমান জেলার মানকর স্টেশনের অনতিদূরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত বুদ্‌বুদ থানার দক্ষিণে বেতালবন গ্রামে। সেখানকার সুবিখ্যাত দত্ত-পরিবারের কন্যা আমার মাতা তুঙ্গলতা। তাঁহার ন'দাদা সূর্যলাল দত্ত বাঁকুড়া শহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা নটবর দত্ত মানকরের নাম-করা ডাক্তার—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের একজন বন্ধু ও সহপাঠী। ছয় ভাই দুই বোনের মধ্যে এখন একমাত্র তিনিই জীবিত আছেন। দীক্ষায় যাহাই হউক, ব্যবহারে আমার পিতৃকুল ঘোরতর শাক্ত এবং মাতৃকুল ঘোরতর বৈষ্ণব। মাতাঠাকুরাণী সামান্য যেটুকু লেখাপড়া জানিতেন তাহার সাহায্যে তাঁহাকে আমাদের বাল্যকালে 'গোবিন্দলীলামৃত', নরহরি সরকারের 'প্রার্থনা' প্রভৃতি পড়িতে দেখিতাম। প্রত্যহ ভোরে তাঁহার সুর করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আবৃত্তিতে আমাদের ঘুম ভাঙিত।

বেতালবনে মাতুলালয়ে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র শনিবার সন্ধ্যায় আমার জন্ম হয়, ইংরেজী ১৯০০, ২৫এ আগস্ট। কুম্ভলগ্নে জন্ম, নরগণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ, সিংহ-রাশি। আমার জন্মের ঠিক এক বৎসর পূর্বে পিতামহ বৈদ্যনাথ দেহরক্ষা করেন, তিনিই আমার দেহে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন—পিতার বৃদ্ধা আত্মীয়ারা এইরূপ উল্লেখ করিতেন। আমার পূর্বে তিন সহোদর এবং এক ভগিনী, পরে তিন ভগিনী, এক সহোদর। নয় ভাই-বোনের মধ্যে এখন তিন ভাই এক বোন বর্তমান আছি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই বাঁকুড়া শহরে মাতার এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় পিতার মৃত্যু হয়। আমার সর্বজ্যেষ্ঠ অমরেন্দ্রনাথ (মৃত্যু: কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৯) যৌবনে স্বদেশী আমলে কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

চার-পাঁচ বৎসর বয়সে যখন জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তখন আমরা উত্তর-বঙ্গের মালদহ শহরে (ইংরেজবাজার) কালীতলা নামক পাড়ার বাসিন্দা। তৎপূর্বে স্বগ্রামস্থ লর্ড সিংহের পিতা সিতিকণ্ঠ সিংহের নামে স্থাপিত বিদ্যালয়ে আমার হাতেখড়ি হয়। এই সিতিকণ্ঠ সিংহের সহোদর শ্রীকণ্ঠ সিংহকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তার সহিত চিত্রিত করিয়া বাংলা-সাহিত্যে অমর করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানার্জনের পথে আমার প্রথম স্মরণীয় গুরু স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার—তাঁহার পিতা তখন চাকুরিব্যপদেশে মালদহে আমাদেরই প্রতিবেশী ছিলেন। বিনয়কুমার নিজের পড়াশুনার অবকাশে আমাকে "ঐক্যবাক্য" শিখাইতেন। স্বদেশী আন্দোলন তখন বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করিয়া সবে শুরু হইয়াছে। বিপিন ঘোষ ও রাধেশ শেঠের নেতৃত্বে "বাঙালী জাতির কর্মবীর" বিনয়কুমারের দল সমগ্র মালদহ শহরকে জাতীয়তা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। মাত্র পাঁচ বৎসরের শিশু হইলেও আমার মনে তখন হইতে স্বদেশভক্তির রঙ ধরিয়াছিল। "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্" গানের সঙ্গে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে দল বাঁধিয়া নগর পরিভ্রমণ করার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আর মনে আছে গম্ভীরা-গান—সামান্য খুঁটিনাটি দৈনন্দিন ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গবিভাগ ও বিদেশীবর্জন প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শিবো-মহাদেবকে উপলক্ষ করিয়া সেই গম্ভীরা-গানের মহিমা স্মরণ করিলে আজিও এক অনির্বচনীয় রসে মন ভরিয়া যায়। জাতীয় সাহিত্যের সহিত আমার প্রথম পরিচয় এই গম্ভীরা-গানের সাহায্যেই হয়। দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর পরে মালদহে সসম্মানে নিমন্ত্রিত হইয়া আমারই [illegible]ম বাঁধা গম্ভীরা-গান শুনিয়াও চিত্তে সে অনির্বচনীয়তার সঞ্চার হয় নাই।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইলেও "হায় রে সেকাল" বলিয়া আক্ষেপ যে রক্তে-মাংসে গড়া মানুষকে করিতেই হয়, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

আরম্ভ যেখানে যাহার কাছেই হউক, দীনবন্ধু চৌধুরী বা প্রসিদ্ধ দীনু পণ্ডিতের পাঠশালার শিক্ষা আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া আছে। সার্থক গুরুমহাশয় হিসাবে তাঁহার তুলনা এ যুগে তো মিলেই না, সে যুগেও মিলিত না। মালদহের বর্তমান প্রবীণ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই শিক্ষার পত্তন এই দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায়। দীনু পণ্ডিতের কাছে কি শিখিয়াছিলাম —সরাসরি এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আজ কঠিন। আজ আমার সমগ্র জীবনের আলোকে হিসাব খতাইয়া এইটুকু মাত্র বলিতে পারি, তিনি আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত অঙ্ক বা গণিতশাস্ত্র শিখাইয়াছিলেন—পরবর্তী জীবনে যাহা নিয়মানুবর্তিতা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। পাঠশালা এবং স্কুল-জীবনে লেখাপড়ায় আমার কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। এই পাঠশালা হইতে নিম্ন-প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়া আমি সমগ্র জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। অতঃপর স্থানীয় সরকারী জিলা-স্কুলে ক্লাস ফোর এবং ক্লাস ফাইভের হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা পর্যন্ত পড়িয়া, পিতা পাবনায় ১৯১২ সনে বদলি হওয়ায়, ন'মামার কর্মস্থল বাঁকুড়ায় নীত হই। সেখানে ছয় মাস কাল বাড়িতেই পড়াশুনা করিয়া ১৯১৩ সনের গোড়ায় পাবনা জিলা-স্কুলের ক্লাস সিক্‌সে ভর্তি হই। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ক্লাস সেভেনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পড়িয়া ১৯১৪ সনে দিনাজপুরে উপস্থিত হই এবং সেখানে জিলা-স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হইয়া কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করি। সেথান হইতেই ১৯১৮ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করি।

আমার এই স্কুল-জীবনে স্কুলের শিক্ষা নিতান্ত গৌণ ছিল। নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবাধ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক জীবনের জন্য আমার কিশোর মন ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল। কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর সঙ্গে আমার মনের ক্রম-পরিণতির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। জন্মভূমির শীতে-শীর্ণতোয়া এবং বরষায়-দুকূলপ্লাবী অজয়, মালদহের কুলুকুলু-কলস্রোতা মহানন্দা, বাঁকুড়ার কচিৎ-মুমূর্ষু কচিৎ-ভীষণ দ্বারকেশ্বর এবং তাহার নিত্যসঙ্গিনী বালুমাত্ররূপা গন্ধেশ্বরী, পাবনার পারা-পারচিহ্নহীন সুবিপুলা ভয়ঙ্করী পদ্মা এবং দিনাজপুরের পল্লীবধূর মত শান্ত নিরলঙ্কার নিরহঙ্কার কাঞ্চন—ইহাদেরই খর অথবা ক্ষীণ ধারার সিঞ্চনে আমার মনের কাব্যরসপিপাসা আবাল্য শুধু মিটে নাই, আমার কাব্যজীবনের সহিত

তাহারা ওতপ্রোত হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। কুষ্টিয়া হইতে স্টীমারে প্রথম পদ্মা পাড়ি দিয়াছিলাম শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রিতে; পরদিন রৌদ্রালোকিত প্রভাতে কুলঝাউবনের মাঝে দাঁড়াইয়া পদ্মার যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা আজও আমার স্মৃতিতে জলজল করিতেছে। পাবনা হইতে দিনাজপুর যখন যাই, তখন সবে প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে, সারা-ব্রীজনির্মাণ তখনও শেষ হয় নাই—কি বিপুল আতঙ্ক ও উন্মাদনার মাঝখানে খেয়া-স্টীমারের যাত্রী হিসাবে সেদিন যে আবার পদ্মাকে দেখিয়াছিলাম, তাহা মাত্র অনুভবগম্য। এই নদী, তটভূমি ও বালুবেলাগুলি আমার অন্তর্জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইয়াছিলাম, কিন্তু দিনাজপুরে থাকিতেই সর্বাঙ্গে রাজনৈতিক কলঙ্কের ছাপ পড়িয়াছিল; সুতরাং সকল বিপ্লব-বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল রাজধানী কলিকাতায় অধ্যয়ন আমার বারণ হইয়া গেল। পিতা সরকারী চাকুরি-জীবী, সুতরাং আদেশ অমান্য করা গেল না। বিপ্লব-বিদ্রোহের ক্ষেত্রে তখন অনগ্রসর বাঁকুড়ার শান্ত পরিবেশে ওয়েস্‌লিয়ান মিশনরী কলেজে আমাকে ভর্তি করা হইল এবং সংলগ্ন হস্টেলে খাস বিলাতী সাহেবদের তত্ত্বাবধানে আমাকে রাখা হইল। এই পরিবর্তনের ধাক্কায় মন উদাসীন হইয়া গেল, ফলে পাঠ সম্পূর্ণ শিকায় তুলিয়া রাখিয়া সহপাঠী ও সহবাসী বন্ধুদের মোড়লির কাজ লইলাম। ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত অধ্যয়নের ভিত্তি এমনই দৃঢ় ছিল যে, তাহার জোরেই আই. এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উচ্চ স্থান অধিকার করিলাম। দুই বৎসর বাঁকুড়ার ঠাণ্ডা গারদে থাকিয়া কলিকাতার গরমে আসিবার আর কোনও বাধা ছিল না। সুতরাং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে স্কটিশ চার্চেস কলেজে বি. এস-সি. কেমিস্ট্রি অনার্সের ছাত্ররূপে কলিকাতায় পদার্পণ করিলাম। তোড়জোড়ে একটু দেরি হইয়াছিল, সুতরাং সাধারণ হিন্দু হস্টেলগুলিতে স্থানাভাব ঘটিল। অগত্যা প্রধানত খ্রীষ্টীয়ান ছাত্র-অধ্যুষিত মুসলমান বাবুর্চি-বয় সেবিত ডাফ হস্টেলেই ডেরা বাঁধিলাম। অতি ভালমানুষ স্ক্রীমজার সাহেব ছিলেন হস্টেলের প্রধান রক্ষক, কিন্তু নামেমাত্র; আসলে আমাদের আহার-বিহারের তত্ত্বাবধান করিতেন একজন দিশী সাহেব; যে কারণেই হউক, প্রায়শই আহার্যবস্তুর ত্রুটি ঘটিতে লাগিল। আমার নেতৃত্বে কয়েকজন বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, মামলা ঊর্ধ্বতন কলেজ-কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারা অখ্রীষ্টীয়ান নেতাকে অগিল্‌ভি হস্টেলে বদলি করিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন।

১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্পেশাল

কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকজন যুবকের সহিত তখন আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, তাহাদের সহায়তায় একটি ভলান্টিয়ার দল গঠন করিলাম এবং যোগ্যতার সঙ্গে নেতা-সেবা করিয়া কলিকাতার রাজনৈতিক মহলে পরিচিত হইলাম। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে তখনই খুব নিকট সান্নিধ্যে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল এবং উক্ত কয়দিনের অভিজ্ঞতায় দেশ ও মানুষ সম্পর্কে নূতন জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলাম।

অগিল্‌ভি হস্টেলে দেড় বৎসর অতিশয় সুখে অত্যন্ত আমোদে ও আনন্দে ছিলাম। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বি.এস-সি. পরীক্ষা দিয়া সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করি। দেড় বৎসরকাল যাহাদের সহিত এই কালে দিনরাত্রি একত্রে কাটাইয়াছিলাম, তাহাদের অনেকেই আজ সরকারী ও বেসরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে কৃতী পুরুষ। সেই সময় খেলাধূলার মধ্য দিয়া যে অনাবিল চাপল্যে আমরা দিন কাটাইয়াছিলাম তাহা স্মরণে রাখিবার মত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরেই লেখাপড়ায় আমার যে ঔদাস্য জন্মিয়াছিল, তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছিল—কমে নাই, শুধু প্রাক্-ম্যাট্রিক পাকা ভিতের জোরে বি.এস-সি.ও পাস করিয়াছিলাম। খেলাধূলা ও সাহিত্যচর্চা লইয়া অধিকাংশ সময় কাটাইতাম,—বিজ্ঞানের ছাত্র, সুতরাং সাহিত্যও খেলার পর্যায়ভুক্ত ছিল। আমার সাহিত্যজীবন গঠনে বাঁকুড়া কলেজ-হস্টেল ও অগিল্‌ভি হস্টেলের স্থান বিস্তৃততরভাবে স্মরণীয়। আপাতত এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দুই স্থানে পত্তনের কাজ নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

বি.এস-সি. পাস করিয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার জন্য প্রার্থী দাঁড়াইলাম। ডাক্তার নটবর দত্ত আমার মাতুল, তাঁহার নামে কাজ হইল। আমি নির্বাচিত হইলাম কিন্তু আমার আর এক মামা বর্ধমানের উকিল জ্ঞানেন্দ্রলাল দত্তের পুত্র বিভূতিভূষণ দত্ত আই. এস-সি. পাস করিয়া প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিল, সেও নটবর দত্তের নিকটতর আত্মীয়তার দাবি জানাইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ আমাকেই মনোনীত করিয়া তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। আমি তখন কঠিন আত্মত্যাগ করিয়া নাম প্রত্যাহার করিয়া লইলাম। বিভূতি নির্বাচিত হইল।

ইহার পর আর কলিকাতায় নয়। আমি সুদূর বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িতে গেলাম। সুবিখ্যাত কিং সাহেব তখন সেখানকার অধ্যক্ষ, তাঁহার বাঙালীপ্রীতি সর্বজনবিদিত। এই অপরাধের জন্য ইউনিভার্সিটি-প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর সঙ্গে তাঁহার প্রায়শই খিটিমিটি বাধিত। এই কলহের যুপকাষ্ঠে আমিই প্রথম

বলি। কলেজসংলগ্ন হস্টেলগুলিতে মাছ মাংস ডিম রান্না বা খাওয়া নিষেধ ছিল। আজিও সেই ব্যবস্থা আছে কি-না জানি না। কিন্তু আমরা বাঙালী ছেলেরা, তখনই বিদ্রোহ ঘোষণা করিলাম। অনেকগুলি পাঞ্জাবী ও সিন্ধী ছাত্রও আমাদের সহিত যোগ দিল। আমি হইলাম নেতা, সুতরাং পণ্ডিত মালব্যজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। আমাকে সমর্থন করিলেন কিং সাহেব, কিন্তু রক্ষা করিতে পারিলেন না। ফলে দুই মাস যাইতে না যাইতেই ইঞ্জিনীয়ারিং-সরস্বতীকে বর্জন করিতে বাধ্য হইলাম। সেকালের সেই কলহের ইতিহাস অতিশয় চমকপ্রদ, বাঙালীবিদ্বেষ তাহার পূর্ব হইতে পশ্চিম ভারতে রূপপরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যাহা হউক, আমি বীরের মতন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ফিজিক্স (হীট) বিভাগে ভর্তি হইয়া এম.এস-সি. পড়িতে লাগিয়া গেলাম। কিন্তু আমার বিজ্ঞান-সরস্বতীর ভাগ্যও তেমন জোরালো ছিল না। রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চা এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত উপভোগের সঙ্গে পাল্লা করিয়া কয়েকটি কঠিন রোগীর সেবাই মুখ্য কাজ হইয়া দাঁড়াইল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে এই সময় ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এখানে সেখানে সঙ্কটত্রাণের কাজে বিশেষ উৎসাহী হইয়া পড়ি। দুই বৎসর পরে কলেজের পাঠক্রম যখন সম্পূর্ণ এবং শেষ-পরীক্ষার দাবি যখন প্রবল, ঠিক তখনই 'শনিবারের চিঠি'র আবর্তে পড়িয়া বিজ্ঞান-জগৎ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইলাম, এবং একদা শুভ প্রভাতে অনুভব হইল নৌকাডুবির পর সাহিত্যের বালুচরে পড়িয়া আছি। "কমলা"ও পাশেই মূর্ছিতা ছিলেন কিনা উপলব্ধি হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় স্বাভাবিক সমাপ্তিরেখা আর টানা হইল না।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের সেই দিন হইতে সাহিত্য এবং তদানুষঙ্গিক নানা ব্যাপার আমার উপজীবিকা হইয়াছে এবং নানা বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়া আমি বর্তমান পরিণতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এম.এস-সি. পড়িবার সময়েই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জুন—১৩৩০ সালের ৪ঠা আষাঢ় স্বগ্রামনিবাসী ও তখন কলিকাতাপ্রবাসী পশুপতিনাথ চৌধুরীর (মৃত্যু : কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪) জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুধারাণীর সহিত আমার বিবাহ হয়। তিনি আমার সাহিত্য-জীবনে কতখানি ছায়া বা আলোক পাত করিয়াছেন আমার এতাবৎকালরচিত সাহিত্যের মধ্যে নানা স্থানে তাহা গোপনে বা প্রকাশ্যে বিধৃত হইয়া আছে।

প্রথম পরিচয়তরঙ্গ আর একটি কথা বলিয়াই শেষ করিব—আমার চাকুরি-

জীবনের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়-সরস্বতীর সেবায় ইস্তফা দিয়া 'শনিবারের চিঠি'র লেখক হিসাবে যে দিন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম, তখন পৈতৃক মাস-হারা বন্ধ হইয়াছে এবং আমি প্রাইভেট টিউশানি করিয়া কলিকাতায় দিন গুজরান করিতেছি। সে আয় এত সামান্য যে মূল্যবিনিময়ে একসঙ্গে আহার ও বাসস্থানের যোগাড় হইত না, কাজেই রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখার বদলে ১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট—বিশ্বভারতী আপিসে কিছুকাল থাকিতে হইয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি' শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের নিতান্ত শখের কাগজ ছিল। তিনি 'প্রবাসী'র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এবং তখন 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিউ' কার্যালয় ও প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ। ৯১ নং আপার সারকুলার রোডে সেই প্রেস ও আপিস ছিল এবং সেখান হইতেই সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' বাহির হইত। প্রথম সাত সংখ্যার সহিত আমার কিছুমাত্র যোগ ছিল না। হঠাৎ অষ্টম সংখ্যা হইতে আমি লেখক। এই সুবাদে অত্যল্পকাল মধ্যে 'প্রবাসী'র প্রুফ-রীডার হিসাবে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলাম, এবং সেখানে প্রায় সাত বৎসরকাল প্রুফ-রীডার, 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ' ও 'ওয়েল্‌ফেয়ার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং সর্বশেষে ছাপাখানার ম্যানেজাররূপে কাজ করিয়া ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর তারিখে চাকুরিতে ইস্তফা দিই। তখন আমার মাসিক বেতন ১৭০ টাকা।

'প্রবাসী'র সম্পর্ক ত্যাগ করিবার কিছু দিনের মধ্যেই 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গুপ্তভাবে 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদকীয় "সাময়িক প্রসঙ্গ" লেখার কাজে আমাকে নিযুক্ত করেন।

এই 'বসুমতী'র এক ২৬এ চৈত্র সংখ্যায় "বঙ্কিম-প্রসঙ্গ" লিখিয়াছিলাম। এই লেখাটি বঙ্গলক্ষ্মী মিলের স্বনামধন্য সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্নেহদৃষ্টি লাভ করে। তিনি তখন 'উপাসনা'-প্রেসের স্বত্ব ক্রয় করিয়া সম্পাদক সাবিত্রী-প্রসন্নের সহিত বন্দোবস্তে 'উপাসনা' পত্রিকাটিকে ঢালিয়া সাজিবার মতলব করিতেছেন। উক্ত "বঙ্কিম-প্রসঙ্গে"র অধম লেখককে খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। সাক্ষাতের প্রথম দিনেই তিনি আমাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে 'উপাসনা'র সম্পাদক ও মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। 'উপাসনা'র নাম বদল করিয়া 'বঙ্গশ্রী' রাখি এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ নভেম্বর হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় দুই বৎসর দুই মাস কাল ওই কার্য করিয়া শেষে মতান্তরের জন্য কাজ ছাড়িয়া দিই।

এইখানেই প্রকৃতপক্ষে আমার চাকুরি-জীবনের সমাপ্তি। ইহার পর শখের কাজ অনেক করিয়াছি, উপ্‌রি দক্ষিণাও মন্দ পাই নাই ; কিন্তু পাকা-পাকিরূপে চাকুরির যূপকাষ্ঠে আর বাঁধা পড়ি নাই। একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। ১৯৩১ সনের ৭ই অক্টোবর তারিখে যখন 'প্রবাসী'র কাজ ছাড়ি, তখন 'শনিবারের চিঠি'র নবপর্যায় সবে এক মাস সম্পূর্ণ নিজদায়িত্বে বাহির করিয়াছি এবং কেবলমাত্র টাইপ খরিদ করিয়া 'চিঠি'র নিজস্ব ছাপাখানাও স্থাপিত হইয়াছে। পরবর্তী চাকুরি-জীবনের সমান্তরাল ভাবে 'শনিবারের চিঠি' নিয়মিত চলিতেছে। এই 'শনিবারের চিঠি', 'শনিরঞ্জন প্রেস' ও 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউসে'র ইতিহাস আমার সাহিত্য-জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

বাল্যকালে স্কুল-জীবনের মাঝামাঝি পর্যায়ে বঙ্গভারতীর দরবারে প্রথম অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, সতীর্থরাই সহযোগী ছিল। কলেজ-জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বহু খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা সাহিত্যসেবীর সংস্পর্শে আসিয়াছি, উচ্চতম হইতে নিম্নতম—অনেকের প্রীতি সহানুভূতি ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছি, কলহ ও বিরোধও বড় কম ঘনাইয়া উঠে নাই। এই সকল ঘটনার বিবরণ নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস নয়, ইহার সহিত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসেরও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। দেশের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ নানা দিক দিয়া উল্লেখ-যোগ্য। যথাকালে সে উল্লেখও করিব। 'আত্মস্মৃতি'র ভূমিকা হিসাবে আমার লৌকিক বাহ্য পরিচয় সংক্ষেপে ইহাই ; কিন্তু ইহা আমার জীবনের কতটুকু ? জীবন-জলধি তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, অতঃপর, নানা সময়ে কাব্যজালে তাহা কি ভাবে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহাই বলিব।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

উন্মেষ

মালদহে দীনু পণ্ডিতের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া তখন জিলা-স্কুলে ভর্তি হইয়াছি, বয়স নয় কি দশ হইবে। গ্রীষ্মাবকাশে কি করিয়া অবসর যাপন করিব তাহাই ছিল সমস্যা। বাবা সদরের দশটা-পাঁচটা চাকরি এবং প্রায়শই মফস্বলের সফর লইয়া ব্যস্ত, বড়দা সুদূর বাঁকুড়ায় মাতুলালয়ে থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরীক্ষা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, জিলা-স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র মেজদাই (অজপেন্দ্রনাথ) বলিতে গেলে আমাদের অভিভাবক। তিনি পেল্লায় পালোয়ান, ডন বৈঠক কুস্তি কুম্ভক লইয়াই মত্ত। লেখাপড়াটা তাঁহার গৌণ-সাধনা। দাদা (সৌরীন্দ্রনাথ) ও আমি পিঠোপিঠি, মাত্র আড়াই বছরের ব্যবধান। পড়াশুনায় আমরা এক রকম খেয়াল-খুশিতেই চলি। আজকালকার মত তখন গৃহ-শিক্ষকের রেওয়াজ ছিল না; নিজের চরকায় নিজেকেই তেল দিতে হইত। আমাদের ক্ষেত্রে তাহাতে ফল যে মন্দ হইয়াছে বলিতে পারি না। পাঠ্যের সঙ্গে অপাঠ্য পুস্তক পড়িবার প্রচুর সুবিধা আমাদের দেওয়া হইত। প্রচুরতম সুযোগ মিলিত গ্রীষ্মাবকাশে। স্কুল-জীবনের মধুরতম ছুটি এই গ্রীষ্মের ছুটি, কারণ অভিভাবকেরা চাকরিতে যূপবদ্ধ, ছেলেদের ছুটি। সমস্যা ছিল বই সংগ্রহের। এত লাইব্রেরির তখন প্রতিষ্ঠা হয় নাই, সাধারণ গৃহস্থ-বাড়িতেও পাঠ্যেতর বইয়ের আমদানি ছিল না বলিলেই চলে। শিশু-সাহিত্যের একমাত্র পরিবেশক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়। বাংলা দেশের এই কালের ছেলেমেয়েদের তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহারা বড় হইয়া বিস্মৃতিপরায়ণ না হইলে তাঁহার নামে উচ্চতম স্মৃতিস্তম্ভ বাংলা দেশের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই নির্মিত হইত। আমরা প্রায়ই এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় পুস্তক সংগ্রহের অভিযানে বাহির হইতাম। যোগীন্দ্রনাথ সরকারেরই সঙ্কলিত একখানি বই সংগৃহীত হইল। গোড়া হইতে বিমুগ্ধ মন লইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সেই বাস্তব জীবনের পটভূমি হইতে এক অজ্ঞাত রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হইলাম। সামান্য একটি কবিতা, ধরন-ধারণ যে খুব অচেনা তা নয়, কথাগুলাও নূতন নয়—কিন্তু মনে কোথা হইতে একটা নূতন রঙ ধরিল, একটা অপরূপ সুরের মূর্ছনা লাগিল। সেই দিন সেই গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে উঠানের ডালিম-গাছতলায় বসিয়া পড়িতে লাগিলাম—

"দিনের আলো নিবে এল, সুয্যি ডোবে ডোবে
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠঙ ঠঙ।
ওপারেতে বিষ্টি এল ঝাপসা গাছপালা।
এপারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥"

এক সঙ্গে দেহ ও মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল, মনের মধ্যে একটা সুগভীর ব্যাকুলতা অনুভব করিলাম। তেমনটি আর কখনও করি নাই। প্রখর রৌদ্রালোকে নিখিল ভুবন পুড়িয়া যাইতেছে, একটা অলস রুক্ষ ঔদাসীন্যে চারিদিক থম্‌থম্ করিতেছে। বিরলপথিক পথের দিকে নিবিষ্ট ভাবে চাহিলে মরীচিকাও যেন দেখা যায়। শুধু গৃহপারাবতের উদাস কূজন আর দূরে ক্লান্ত ঘুঘুর একটানা ডাক প্রকৃতির সজীবতার করুণ সাক্ষ্য দিতেছে। কবিতা পড়িতে পড়িতে অবোধ বালকের মনে প্রচণ্ড মধ্যাহ্নেই নিদাঘ-দিবাবসানের রমণীয়তা নামিয়া আসিল, মেদুর মেঘে যেন সারা আকাশটা ছাইয়া গেল, বুঝি এখনি বৃষ্টি নামিবে। পড়া আর অগ্রসর হইল না, বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। হঠাৎ দাদা আসিয়া ছোঁ মারিয়া বইখানা লইয়া অন্তর্ধান করিল। আমি প্রতিকারার্থ করুণ ভাবে মাকে ডাকিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। মা রান্নাঘরে বাবার জন্য বৈকালিক জলখাবার প্রস্তুত করিতেছিলেন। তিনি আমল দিলেন না। মামলা মুলতুবি রহিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত সজাগ রহিলাম। অসন্দিগ্ধ দাদা বইখানিকে ঘরের তাকের উপর জলের গেলাস চাপা দিয়া রাখিয়া মেঝেতেই ঘুমাইয়া পড়িল, আড়চোখে দেখিলাম। পা টিপিয়া টিপিয়া তাকের ধারে গিয়া ডিঙি মারিয়া বইখানিতে হাত দিলাম। তর সহিতেছিল না। অতি ব্যস্ততায় জলের গেলাসের কথা ভুল হইয়া গেল। বইটি টানিয়া লইতেই জলসুদ্ধ গেলাস মেঝেয় শায়িত দাদার বুকের উপর আসিয়া পড়িল। তাহার পর যে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটিল তাহা অনুমানসাপেক্ষ। পালোয়ান মেজদাদা আসিয়া আমার কানে ধরিয়া শূন্যে উত্তোলন করিলেন, মা দাদার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতে বসিলেন। পাড়াপড়শিনীদের সমাগম হইল। আমার মনের সাহিত্য-ব্যাকুলতা সূচনাতেই ঘোর বাধাগ্রস্ত হইল। ব্যাপারটার জের অনেক দূর গড়াইয়াছিল বলিয়া আজও এমন স্পষ্ট মনে আছে। রাশভারি বাবা গলদ্‌ঘর্ম হইয়া কাছারি হইতে ফিরিয়া আসামী-ফরিয়াদী উভয়কেই ছাতা-পেটা করিয়া, নাই দেওয়ার অপরাধে মায়ের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে গিয়া পড়াতে কয়েকটা লঘু ছত্রদণ্ডেই আমরা নিষ্কৃতি পাইলাম।

দুর্ঘটনার পূর্বে বইখানি সেই যে সংগ্রহ করিয়াছিলাম আর ছাড়ি নাই। কোলাহল শান্ত হইলে খেলিতে যাইবার অছিলায় মহানন্দা নদীতীরবর্তী একটি কাঠের গোলার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ির উপর একলা বসিয়া আবার পড়িলাম—

"কবে বিষ্টি পড়েছিল, বান এল সে কোথা,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল কবেকার সে কথা।
সেদিনো কি এমনিতরো মেঘের ঘটাখানা,
থেকে থেকে বাজ-বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা।
তিন কন্তে বিয়ে ক'রে কী হ'ল তার শেষে,
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে।
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।"

এ যেন একান্ত আমারই কথা। এমন করিয়া আমার মনের কথা এতদিন পর্যন্ত তো আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই! তলায় নাম দেখিলাম—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুরুমন্ত্রের মত সেই নাম জপমন্ত্র হইল। কবিতাটিও মুখস্থ হইয়া গেল।

আমার জীবনের বাণী-সাধনার এইখানেই সূত্রপাত। পরের জবানিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া মন নিজের জবানিতে প্রকাশ খুঁজিতে লাগিল। আমরা প্রতিদিন যাহা দেখি, যাহা শুনি, যাহা কল্পনা করি তাহারও যে একটা ছন্দোবদ্ধ বিচিত্র রূপ দেওয়া যাইতে পারে, যাহা তুচ্ছ, যাহা সাময়িক তাহারও যে একটা বিরাট চিরন্তন মহিমা পর পর শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলা শব্দের মধ্যে প্রকাশ পাইতে পারে তাহার অস্পষ্ট অনুভূতি সেই দিন আমার মনকে আচ্ছন্ন করিল। এই অনুভূতির কথা পরবর্তী কালে 'রাজহংসে'র অন্তর্গত "তমসা-জাহ্নবী" কবিতায় এই ভাবে ধ্বনিত হইয়াছে—

কুলুকুলু মহানন্দা, দুই তীরে শান্ত জনপদ;
এপারে দাঁড়ায়ে এক ক্ষুদ্র শিশু গণে জল-ঢেউ—
এক, দুই, তিন, চারি। কাঠের গোলার আশেপাশে,
সঙ্গীরা প্রসন্ন মনে খেলিতেছে লুকাচুরি খেলা।
আকাশ আঁধার করি' ওঠে মেঘ, নামে জলধারা,
জলশরবিদ্ধ হয়ে পরপার ঝাপ্‌সা দেখায়।
স্নানার্থী এসেছে যারা তারা কলকোলাহল তুলি'
আছাড়ি' সাঁতারি' খেলে বরষার নবীন উল্লাসে।
নদীপাড়ে শিশু-মনে সহসা সে অপূর্ব প্রকাশ—
টাপুর টুপুর বৃষ্টি, কোন্ সে নদীতে এল বান;
গান তার ভেসে এল, শিহরিল বিহ্বল বালক।

এই আদি শিহরণই আমার জীবনকে প্রধানত নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে। অন্য গুরুতর স্পন্দন যে ছিল না তাহা নয়, কিন্তু বাণীতরঙ্গের আঘাতে সমস্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। শিশু যেমন অবোধ আগ্রহে মাকে খুঁজিয়া বেড়ায় আমার মনও তেমনি খুঁজিয়া ফিরিয়াছে সুর আর ছন্দ। আমার মায়ের সঙ্গে এই নবজীবন-উন্মেষের সম্পর্ক অতি গূঢ়। 'রাজহংসে'র উৎসর্গ-পত্রে মায়ের কথা স্মরণ করিতে গিয়া এই উৎস-মুখের কথাই সর্বাগ্রে মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু সেই উৎস-মুখের সঠিক সন্ধান পাই নাই। আজ যে তাহা পাইয়া জীবনের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, তাহা নয়। অ-ধরাকে ধরার প্রয়াসই সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে আমার কথা ছিল—

> যে চপল নদী পার হয়ে এল গিরি-বন-প্রান্তর,
> কখনো আলোকে, কখনো অন্ধকারে,
> থমকি দাঁড়ায়ে সহসা সে যদি চাহিত পিছন ফিরে,
> হিমালয়-শিরে পেত কি দেখিতে কোথায় উৎস তার ?
> এপারে-ওপারে ব্যবধান-ছেঁড়া গোমুখীর গূঢ় ব্যথা
> বুঝিত কি নদী নদীজল-কলকলে ?
> বুঝিত না, তবু স্রোতোজলে পেত উৎসের পরিচয়।

প্রান্তরে ক্রমপ্রসারিত শীর্ণ গিরিনদী বার বার পিছন ফিরিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু মাকে খুঁজিয়া পায় নাই। অবিচ্ছিন্ন গতিপথে তাহার সেই বেদনাই বিচিত্র মর্মরধ্বনিতে ছন্দায়িত হইয়াছে।

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর"-এর পূর্বে প্রস্তুতির আরও একটু ইতিহাস আছে, যাহা এ-যুগের অভিভাবক ও ছাত্রদের পক্ষে শোনা দরকার। কোনও মানুষই বৃন্তহীন পুষ্পের মত আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে না। তাহার বিকাশের পক্ষে পরিবেশের প্রভাব এবং জাতীয় সংস্কার—গাছের পক্ষে মাটি-জল-বায়ুর মতই প্রয়োজন। আজকাল দেখিতে পাই, অনেক শিশুই সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' এবং 'হ য ব র ল' দিয়া কল্পনা-জীবন শুরু করে। তাহাতে ছন্দ ও সুর অধিগত হয় বটে, কিন্তু যে বহু পুরাতন ধারা ধরিয়া যুগে যুগে আমরা বহিয়া আসিয়াছি তাহার কোনও সন্ধান মিলে না। যে মহৎ আদর্শ ও বিরাট চরিত্র ভারতবর্ষের মানুষকে আদি কাল হইতে গঠন করিয়া আসিতেছে, দেহে রক্তমাংসের মত যাহা আমাদের জাতীয় চরিত্রে ওতপ্রোত হইয়া আছে তাহাকে বাদ দিয়া কোনও শিশুই দেশের মনুষ্য হইয়া

উঠিতে পারে না। আমি ভারতীয় ঋষিপ্রোক্ত বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের কথা বলিতেছি না। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের সার চুঁইয়া-গড়াইয়া যে দুইটি থালায় আশ্রয় লাভ করিয়া সর্বসাধারণের ভোজে পরিবেশিত হইয়াছে সেই রামায়ণ ও মহাভারতের কথা বলিতেছি। এই থালা দুইটিও স্থানভেদে ও কালভেদে স্থান ও যুগোপযোগী আহার্যের আধার হইয়াছে। মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ বাংলা দেশে হইয়াছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পশ্চিমে হইয়াছে তুলসীদাসী রামায়ণ; বাংলা দেশে বেদব্যাসের মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পরিবেশক হইয়াছেন কাশীরাম দাস। মধ্যে এই দুইটি মহাগ্রন্থেরই চর্চা উঠিয়া গিয়াছিল ; ফলে এক ধরনের নিরাকার কল্পনারাজ্যে দেশের শিশুমন হাঁপাইয়া মরিতেছিল, থই পাইতেছিল না। আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি, দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কারের প্রতি আবার সকলের দৃষ্টি ফিরিতেছে, শুধু আরব্য উপন্যাস এবং বৈদেশিক পরীকাহিনী শুনিয়া শুনিয়া এবং ধ্বনি-অনুপ্রাসপ্রধান আজগুবি শিশু-কবিতা আওড়াইয়াই দেশের ছেলেমেয়েদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে না।

গ্রীষ্ম অথবা পূজা কোন এক অবকাশ মালদহে যাপন করিবার জন্য আমাদের প্রায় অপরিচিত বড়দাদা বাঁকুড়া হইতে আসিলেন। অপরিচয়ের দরুন আমাদের ভালবাসা ও ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পর্যায় ছাড়ায় নাই। তিনি সকলের জন্য উপহার আনিয়াছিলেন। ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকট গেলাম, আমার ভাগ্যে উঠিল—এক খণ্ড 'সরল কৃত্তিবাস'—কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু বি. এ. সম্পাদিত, বহু চিত্র সম্বলিত। বইখানি হাতে দিয়া বড়দাদা বলিলেন, যদি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, আগামী ছুটিতে একখানি কাশীরাম দাসের মহাভারত পুরস্কার মিলিবে। উৎফুল্ল হইয়া বই লইয়া মাতৃসন্নিধানে গিয়া বসিলাম। পাতা উল্টাইতেই চোখে পড়িল—

"অমৃত-মধুর এই সীতারাম-লীলা।
শুনিলে পাষাণ গলে, জলে ভাসে শিলা॥"

অত্যল্পকালমধ্যে সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ নিঃশেষে পড়িয়া ফেলিলাম এবং তাহা মর্মের মধ্যে এমনই গাঁথিয়া গেল যে, মাস ছয়েক যাইতে না যাইতেই বইখানি হাতে না লইয়াই

"গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মীসহ তথায় বৈসেন গদাধর॥
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ॥

শ্রীরাম, ভরত, আর শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ॥"

হইতে আরম্ভ করিয়া "এত দূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড" পর্যন্ত আবৃত্তি করিতে পারিলাম। সুতরাং যথাকালে কাশীরাম দাসের মহাভারতও উপহার লাভ করিলাম। শুধু রামায়ণ-মহাভারত কাহিনীই যে আয়ত্ত করিলাম তাহা নহে; পুরাতন পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের উপর দখল জন্মিল এবং অতি বাল্যকালেই আমার মনের অভিধান বহু শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ইহা হইল গৌণ লাভ, মুখ্য লাভ হইল—জীবনের জটিল দুর্গম পথে চলিতে চলিতে যেখানেই অপ্রত্যাশিত সমস্যা আসিয়া পথরোধ করিত, সেখানেই সমাধানের ইঙ্গিতও এই রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র হইতে পাইতে লাগিলাম। ইহা যে কত বড় লাভ, লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না, এখনও প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি।

এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথই আমার মনে সঞ্চারিত করিয়াছেন। 'সরল কৃত্তিবাস' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে, সেই বৎসরেই তাহা আমার হস্তগত হয়। বইটির "ভূমিকা" লিখিয়াছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার সব কথা যে বুঝিয়াছিলাম তাহা নহে, তবু তাঁহার এই কয়টি কথা মনের মধ্যে গাঁথিয়া গিয়াছিল, রামায়ণের উদ্ধৃত পয়ারের মত সেই কথাগুলি আজও সম্পূর্ণ স্মৃতি হইতে তুলিয়া দিতে পারি—

> "এই রামায়ণ, মহাভারত আমাদের সমস্ত জাতির মনের খাদ্য ছিল; এই দুই মহাগ্রন্থই আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। মহানদী যেমন সকল দেশে নাই, তেমনি মহাকাব্য পৃথিবীর অতি অল্প জাতির ভাগ্যেই জুটিয়াছে। আবার যে দেশের মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত, সে দেশের সৌভাগ্যের অন্ত নাই। এই সৌভাগ্যের ফল যে কত সুদূরবিস্তৃত, তাহা আমাদের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য বশতঃই আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। এ কথা আমাদের নিশ্চিত জানা উচিত যে, ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গভূমিকে জলে ও শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ঘরে ঘরে চিরদিন ধরিয়া যেমন আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল যোগাইয়া আসিতেছে—কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরামের মহাভারতও তেমনি করিয়া চিরদিন আমাদের মনের অন্নপানের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। এই দুইটি গ্রন্থ না থাকিলে, আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কিরূপ শুষ্কতা ও চিরদুর্ভিক্ষ বিরাজ করিত, তাহা আজ আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।" (৩০ শ্রাবণ, ১৩১৪)

পয়ার-ত্রিপদীর ভাণ্ডারে "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর"-এর ছন্দ একটা নূতনত্বের আমদানি করিল, এবং মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল আবার এই "শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" নাম। অনুসন্ধিৎসু চিত্ত এই নামের সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। মেজদাদা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পালোয়ানী জবাব দিলেন—স্বদেশী গান লেখেন, "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্" ওঁরই লেখা ; রাখীবন্ধনের গান "বাংলার মাটি, বাংলার জল"ও তিনিই রচনা করিয়াছেন। বিস্মিত মন বিমুগ্ধ হইতে বিলম্ব হইল না এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাতে পাইলাম বাল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নসম্ভার 'কথা ও কাহিনী', ওই "শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"-প্রণীত। "কথা কও, কথা কও" —এই বিচিত্র মর্মস্পর্শী আদেশ আমিও শুনিতে পাইলাম। কথা কহিতে হইবে। কবে, কখন, কোথায়, কাহাকে, কেমন করিয়া ?—এ সকল অতি সমীচীন প্রশ্ন চপল অবোধ বালকের মনে ক্ষণিকের জন্য উদয় হইল না। শুধু হুকুম শুনিলাম, কথা কও, কথা কও।

শেষ পর্যন্ত হুকুম পালন করিলাম, কথা কহিলাম।

তৃতীয় তরঙ্গ

প্রস্তুতি (১)

কিন্তু কথা কহিতে হইলে কথা শোনা দরকার। শিশু চোখ কান নাক মুখ দিয়া অবিরত কথা শোনে, বহিঃপ্রকৃতি হইতে নিজের সর্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কথা আহরণ করিয়া লয় ; দীর্ঘদিন প্রস্তুতির কাজ চলে, তবে সে সুবোধ্য কথা বলিবার অধিকারী হয়। গোড়ার দিকে অস্পষ্ট কথা, আধ-আধ কথা, ইঙ্গিত-ক্রন্দন-চিৎকারের সঙ্গে কথা সে অনেক বলে, অতিশয় ভাগ্যবান দুই-চারিজন মানুষের বেলায় তাহার ইতিহাস লিখিত বা রক্ষিত হয়, এবং সে ইতিহাস তাঁহাদের পরবর্তী জীবনের খ্যাতির অনুপাতে মানুষ কৌতুক, কৌতূহল ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে। কিন্তু আসলে সকল ক্ষেত্রেই হাঁটি-হাঁটি-পা-পা-চলার কাহিনী এক, এবং তাহা পতনে ও হোঁচট-খাওয়ায় কণ্টকিত। আমার প্রথম কথা বলার প্রয়াস আর পাঁচজনের মতই অত্যন্ত সাধারণ, ঘটা করিয়া তাহার বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা কহিবার অধিকার লাভ করিয়াছি মনে করিয়া এই যে আমার সাহিত্য-জীবন-কথা সকলের সামনে মেলিয়া ধরিতেছি—নিতান্ত শিশুকাল হইতে যে সকল কথা শুনিয়া শুনিয়া সেই

অধিকার-বোধ জন্মিয়াছে, তাহার তালিকা ও সামান্য বর্ণনা নূতন যুগের সাহিত্যকামীদের কাজে লাগিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

শিল্পী বা সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে শিশুর কথা বলার তুলনা দিয়াছি। শিশুর কথা আহরণ ও সঞ্চয়ের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করেন মা বা তাঁহার স্থানীয় কেহ; তাঁহার স্নেহ-রসধারায় সিঞ্চিত কথা শুধু ভাষাই জোগায় না, ধীরে ধীরে শিশু মনে ভাবেরও সঞ্চার করে। যে সকল সাহিত্যসাধক মায়ের মুখ হইতে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ-জীবনের মনের খোরাকও সংগ্রহ করিতে পায় তাহারা ভাগ্যবান। আমাদের শিশুকালে সে ভাগ্য কদাচিৎ ঘটিত, আমাদের মায়েরা শিক্ষায় দড় ছিলেন না, রান্না-বান্না গৃহস্থালী লইয়াই প্রত্যুষের প্রায়ান্ধকার হইতে নিশীথের নিষুতি পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকিতেন, হতভাগ্য শিশুদের কল্পনার আহার্য জোগাইবার অবসর তাঁহারা পাইতেন না। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' বা অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা' যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন, সে সৌভাগ্য তাঁহাদেরও হয় নাই; তাঁহারা প্রধানত দাসী ও দাস রাজ্যেই মানুষ হইয়াছিলেন। এ যুগের শিক্ষিত মায়েরা ছেলেদের জুজু-বুড়ির ভয় দেখাইয়া থাবড়াইয়া-থুবড়াইয়া না রাখিয়া হয়তো দেশ-বিদেশের রূপ-কথার রাজ্যে লইয়া যান, নানাভাবে মনের খোরাক জোগাইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর করিয়া তোলেন। আমাদের কালে নির্ভর ছিল ওই রামায়ণ আর মহাভারত। এই দুইটিই প্রধান। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্কলনগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' ও 'শিশু' অতি মনোরম ফাউ। আমার যখন ঠিক সাত বছর বয়স, ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'ঠাকুরমার ঝুলি' হাতে শ্রীদাক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বাংলার শিশু-রাজ্যে। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই অপরূপ দানের সহিত অনেক বিলম্বে অর্থাৎ সেয়ানাবয়সে আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল।

দুইটি স্বাভাবিক ধারার সাহায্যে সকল যুগের শিশুরাই ধীরে ধীরে মানুষ হইয়া উঠে। এক ধারা পাঠ্য পুস্তকের, অন্য ধারা অ-পাঠ্যের। সেকালের অনেক কড়া নীতিবাগীশ বাড়িতে প্রথমটিই প্রবাহিত হইত, বুদ্ধিমান ছেলের নিজের চেষ্টায় দ্বিতীয় ধারা বজায় থাকিলেও শুষ্ক মরুভূমির তলদেশে তাহা হইত ফল্গুধারা। আমাদের বাড়িতে বাবা একমাত্র প্রথম ধারাটিরই একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যিক বড়দার কৃপায় দ্বিতীয় ধারাটি একেবারে মরু-বালুতলে বিলীন হইয়া যায় নাই। বাবাকে খুশি করিবার জন্য ধাপে ধাপে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয় পার হইয়া এক দিকে যখন

চরিতাবলী ও আখ্যানমঞ্জরীতে হাত দিয়াছি, অন্য দিকে তখন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের তিন ভাগ শিশুশিক্ষার কাব্যাংশ আয়ত্ত করিয়া যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের তিন ভাগ গদ্যপাঠ মুখস্থ করা চলিতেছে। অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ তিন ভাগও আয়ত্তের মধ্যে। দ্বিতীয় অর্থাৎ অ-পাঠ্য-ধারায় রামায়ণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন স্বাধিকারে কাশীরাম দাসের মহাভারত হস্তগত করিলাম, তখন আর একটি কারণে মহাভারত সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। পাঠ্য-অপাঠ্যের সীমারেখার ঠিক মাঝখানের একখানি পুরাতন ছেঁড়া পুস্তক হাতে আসিয়াছিল—তুলোট কাগজের মতন কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা, ফাঁপাফোলা পিচবোর্ডের মলাট। অতি চমৎকার খোদাই-চিত্র সমন্বিত। অন্তত সেই কালে চমৎকার মনে হইত। বইটির নাম 'শিশুবোধক'। ইহাতে অক্ষর পরিচয় বানান শতকিয়া কড়াকিয়া সইয়া দেড়িয়া পত্র লিখিবার ধারা হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার বন্দনা গুরুদক্ষিণা কলঙ্কভঞ্জন প্রহ্লাদ-চরিত্রে হিরণ্যকশিপুবধ ও চাণক্য শ্লোক পর্যন্ত অনেক কিছুই ছিল। পড়িতে খুবই ভাল লাগিত কিন্তু সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ হইতাম "দাতাকর্ণ বা কর্ণের দান পরীক্ষা" কাহিনী পড়িয়া। এই বিচিত্র বইখানি সম্বন্ধে পরবর্তী কালে বিস্তর গবেষণা করিয়া ইহার জন্মকাল নির্ণয় করিতে পারি নাই, তবে ইহা যে দুই শতাব্দীরও অধিক কাল বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিয়াছে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি রেভারেণ্ড জে. লং-সঙ্কলিত বাংলা পুস্তক-তালিকা হইতে।* এই মহামূল্য গ্রন্থখানি কাহার রচনা বা সঙ্কলন তাহাও জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, এই "দাতাকর্ণ" কাহিনী পড়িয়া কর্ণকে আরও ভাল করিয়া জানিবার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম, মহাভারতে তাঁহার কথা আছে। মহাভারত পুরস্কার পাইয়াই কর্ণের রহস্যসন্ধানে ব্যাপৃত হইলাম।

কিন্তু 'শিশুবোধকে' দ্বিজ কবিচন্দ্র রচিত বৃষকেতু উপাখ্যানে যে মহাবীর সর্বত্যাগী কর্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, কাশীরাম দাসের বৃহৎ মহাভারতে তাঁহাকে পাইলাম না। তৎপরিবর্তে বীর ধনঞ্জয়ের সহিত পরিচয় ঘটিল। কবিচন্দ্রের পদ্মাবতী স্বামী কর্ণকে বলিতেছেন :—

---

* লং-এর *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* (১৮৫৫), ২৩৫ সংখ্যক বই 'শিশুবোধক', বর্ণনা এইরূপ—"Child's Instructor, 1854, pp. 81, 2as......This work, the Lindley Murray of Bengali, has passed through innumerable editions,......This book has been for centuries the key to

"কান্দিয়া কান্দিয়া কয়　　শুন কর্ণ মহাশয়
পাষাণে বেন্ধেছ তুমি হিয়া।
করিলে দারুণ পণ　　কাটি দিলে বাছাধন
কেমনে বাঁচিব না দেখিয়া॥
দশমাস দশদিন　　উদর হইল ক্ষীণ
যতন করিনু এই হেতু।
ভাল মন্দ না জানিল　　বাছা মোর ছাড়ি গেল
আরে মোর প্রাণ বৃষকেতু॥
পাইয়া অনেক দুখ　　দেখিয়া পুত্রের মুখ
কেন বিধি করিলে এমন।
রাণী বলে আহা মরি　　ফুকারে কান্দিতে নারি
শুন শুন প্রভু নারায়ণ॥
পুত্রমাথা হাতে করে　　দু' নয়নে বারি ঝরে
আনি দিল দ্বিজ বিদ্যমানে।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়　　ধন্য কর্ণ মহাশয়
দানশীল বিখ্যাত ভুবনে॥"

নারায়ণ স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দাতা নামে খ্যাত কর্ণের গৃহে অতিথি হইয়া মনুষ্যমাংস খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং নির্দেশ দিয়াছেন, কর্ণ ও রাণী পদ্মাবতীর একমাত্র পুত্র পাঁচ বৎসর বয়স্ক

"বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন।
তারে কাটি দেহ মাংস করিব ভোজন॥
স্ত্রীপুরুষ দুইজনে কাটিয়া করাতে।
রন্ধন করিয়া দেহ আমার সাক্ষাতে॥
হাসিয়া কাটিবে পুত্রে না হবে কাতর।
এ যশ থাকিবে তব ভুবন ভিতর॥"

Bengali reading." বইখানির এখনও যথেষ্ট প্রচার আছে। বটতলার বহু দোকানেই বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক বিভিন্ন লেখকের নামে এই একই 'শিশুবোধক' বিক্রয় করা হয়। মূল 'শিশুবোধকে'র উপর কোনও কোনও সংস্করণে একটি আধটি কবিতা সংযোজিত দেখা যায়।

মহাবীর কর্ণ রোরুদ্যমানা পত্নীকে বুঝাইয়া তাহাই করিলেন। নারায়ণ আত্মপ্রকাশ করিয়া বৃষকেতুকে ফিরাইয়া দিলেন। পৃথিবীতে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন যে কর্ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারতে তিনি অনেক হীনবর্ণে চিত্রিত হইয়াছেন। মহাভারতখানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া কর্ণের কারণে খুবই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু শিশুমনে বিষাদ-যোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাহা ছাড়া তাহারা একনিষ্ঠার জন্যও বিখ্যাত নহে। অচিরাৎ এই মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতে আমার দ্বিতীয় মনের মানুষ মহাবীর ফাল্গুনী বাহির হইয়া আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় বিপ্রগণের উক্তি মনে গাঁথিয়া গেল—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখি চারু যুগ্মভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগ্মবর জানু সুবলিত॥
বুকপাটা দন্তচ্ছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য ধরে কোথা কে কামিনী॥"

আমি কামিনী না হইয়াও গভীর প্রেমে পড়িয়া গেলাম। বিরাট-পর্বের গোধন-হরণ অধ্যায়ে যখন বিস্মিত কৌরবদের দৃষ্টিতে কুরুসৈন্যের বিপুলতায় ভীত ও পলাতক যুবরাজ উত্তরের পশ্চাতে ধাবমান বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে দেখিলাম

"পাছে ধায় রড়ে দীর্ঘ বেণী নড়ে
পৃষ্ঠোপরি শোভে চারু।
লোহিত বসন অঙ্গে বিভূষণ
যেন করিবর-উরু॥
আজানুলম্বিত অঙ্গদ-মণ্ডিত
দ্বিভুজ ভুজঙ্গ সম।

দেখিয়া কৌরব নেহালয়ে সব
মনেতে পাইয়া ভ্রম ॥
এক জন আগে পলাইছে বেগে
আর জন পাছে ধায়।
একি বিপরীত না বুঝি চরিত
কেবা যে আগে পলায় ॥
পাছুতে যে জন নহে সাধারণ
বেশধারী প্রায় লাগে।
যেন ভস্মমাঝে অগ্নি হীনতেজে
সিংহ যেন ধায় মৃগে।”

তখন আমার শিশুমনের জগৎ সম্পূর্ণ অর্জুনময় হইয়া গেল। দীর্ঘকাল পরে মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ পড়িয়াছি। রবীন্দ্রনাথের “কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ” পড়িয়াছি, কর্ণের মহত্ত্ব বারংবার উপলব্ধি করিয়াছি—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার মতে কর্ণের তুল্য মহৎ চরিত্র পৃথিবীর সাহিত্যে আর সৃষ্ট হয় নাই ; তথাপি কেন জানি না, আমি অর্জুনকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। আজও পর্যন্ত তিনিই আদর্শ পুরুষ হইয়া আমার মনে বিরাজ করিতেছেন।

মহাভারত ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর অতুলনীয় সম্পদ। যাঁহারা মূল মহাভারত অনুবাদেও পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন এই গল্পটি : দেবতারা একদিন ওজন করিয়া বেদ মহাভারত প্রভৃতির গুরুত্ব বুঝিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা দাঁড়িপাল্লা লইয়া এক দিকে চারি বেদ এবং অন্য দিকে ভারত-সংহিতা অর্থাৎ মহাভারতকে স্থাপন করিলেন। ভারত-সংহিতার কাছে চতুর্বেদ অত্যন্ত লঘু প্রমাণিত হইল। আমি যখন ‘বঙ্গশ্রী’র সম্পাদক তখন ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশের জন্য বাংলা দেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীদের বাল্যকালে কোন্ কোন্ পুস্তকের প্রভাব তাঁহারা সর্বাধিক অনুভব করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া দিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, শ্রীঅরবিন্দ বাল্মীকির রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারতকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :

“বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল সেই নীতি যেন বর্তমান কালেও জীবন্ত ভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন-উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন

ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন যে, বার বার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ কিছু লিখিয়া দিতে পারেন নাই, আমাকে মুখে বলিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে উপনিষৎ ও রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা চিরস্থায়ী হইয়াছে। কাশীরামের মহাভারত দিয়া যে বাঙালীর ছেলের বাল্যশিক্ষার পত্তন হয় নাই, সে যে অতিশয় দুর্ভাগ্য তাহাই বুঝাইবার জন্য জগদীশচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

নররক্তের আস্বাদ পাইলে সাধারণ বাঘই মারাত্মক নরখাদক ব্যাঘ্রে পরিণত হয়। রামায়ণ, মহাভারত এবং 'কথা ও কাহিনী'র গল্পের মধুর আস্বাদ পাইয়া আমিও সাংঘাতিক গল্পখাদক হইয়া উঠিলাম। বই পাইলেই হইল, তাহাতে যদি গল্পের অংশমাত্র থাকিত লোলুপভাবে তাহা নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফেলিতাম, হয়তো প্রয়োজনীয় অংশই তখন ছিবড়া-জ্ঞানে বর্জন করিতাম। যাহা দুর্বোধ্য, যাহা নাগালের বাহিরে, বামনের চাঁদ ধরার মত তাহাও ধরিবার চেষ্টা করিতাম, রুচি ও নীতির দিক দিয়া যে-সব উপন্যাস বা কাহিনীর বালকরাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল তাহাও গোপনে সংগ্রহ করিয়া সাগ্রহে পাঠ করিতাম। স্কুলে ভাল ছেলে ছিলাম, দৈনিক পাঠ্যপাঠে কখনই অবহেলা করি নাই; কিন্তু সে বয়সে যাহা অবশ্য কর্তব্য ছিল সেই খেলাধূলা-ব্যায়ামচর্চার মূল্যবান সময় চুরি করিয়া সাহিত্য-জীবনের প্রস্তুতির কাজে লাগাইতে লাগিলাম। বামনদের প্রাংশুলভ্য ফল জোগাইবার ভার সেকালে লইয়াছিলেন বটতলা ছাড়া তিনটি স্মরণীয় প্রতিষ্ঠান—বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও বসুমতী। ইঁহাদের উপহার-গ্রন্থাবলী দরিদ্র বাঙালীমনের বিশুষ্কতা কি পরিমাণে দূর করিয়াছে, তাহার ইতিহাস কোনও দিন সঠিক ভাবে লিখিত হইলে এ যুগের ভাল ছাপাই-বাঁধাই-দামী-কাগজে অভ্যস্ত মানুষেরা বিস্ময় বোধ করিবেন। সস্তা বই, পত্রিকার ফাউ বা উপহারের বই বলিয়া অভিভাবকেরা এই সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে ততটা সাবধান ছিলেন না, অন্তঃপুরে বইগুলির অবাধ গতিবিধি ছিল। ফলে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়িতেই এইরূপ বইয়ের এক-আধ খানার সন্ধান মিলিত। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ও বৈষ্ণবমহাজনপদাবলী, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য, দাশু রায়ের পাঁচালী এবং রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষা-সংস্করণ ইঁহারা নামমাত্র মূল্যে অবাধে বিতরণ করিয়া এক দিকে যেমন সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে জীর্ণ পুরুষগুলাকে সঞ্জীবিত রাখিতেন, অন্য দিকে ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র,

সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর বিপুল প্রচারে বাংলার অর্ধ বা সিকি শিক্ষিত অন্তঃপুর সুনিদ্রার সুযোগ পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাঁহারা সত্যকার চিন্তার খোরাক পাইতেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ' 'যুগান্তর' হইতে। নদীপ্রবাহের পাশে পাশে একটি অপেক্ষাকৃত মলিন নালাও কাটা হইয়াছিল, তাহার ধারা সরবরাহ করিতেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, দামোদর মুখোপাধ্যায়, এবং পরে দীনেন্দ্রকুমার রায় ও পাঁচকড়ি দে প্রভৃতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি', বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত,' 'আনন্দমঠ' এবং রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা' প্রভৃতির সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত' (১৮৮০) ও 'গ্যারিবল্‌ডীর জীবনবৃত্ত' (১৮৯০) দেশব্যাপী আর এক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিতবাদী'-কার্যালয়ের উপহার-গ্রন্থাবলীরূপে যোগেন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসও সুলভ হইল।

আমার ভাগ্যে সর্বপ্রথম উঠিল বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর 'রাজসিংহ'-খণ্ড, রমেশচন্দ্রের 'সংসার' ও 'সমাজ' এবং "হিতবাদীর উপহার"—'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী' (আগস্ট ১৯০৪)। তারক গাঙ্গুলীর 'স্বর্ণলতা' ও দামোদর-গ্রন্থাবলীর 'সোনার কমল'-খণ্ডও কেমন করিয়া যোগাড় হইয়া গেল। দীনেশচন্দ্র সেনের 'সতী' 'জড়ভরত' ও 'বেহুলা' সদ্য সদ্য হাতে পাইলাম। এইগুলি সম্বন্ধে বিশদ করিয়া কিছু বলিবার পূর্বে দুইটি তত্ত্বকথা শুনাইতে চাই।

এই যে অতি বাল্যকালে এই সকল কঠিন কঠিন বই আমি পড়িতেছিলাম, কিছু আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলাম কি? শব্দ-সম্পদ ও ভাষা-সম্পদের কথা অবশ্য প্রথমেই বিবেচ্য। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'পল্লীশ্রী' পত্রিকার ফাল্গুন-সংখ্যায় আমি লিখিয়াছিলাম—

> আমি আবাল্য সময় পাইলেই পাঠ্য-অপাঠ্য বাংলা বই পড়িতাম, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পূর্বেই বাংলা উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা এবং সাময়িক পত্রিকা যে কত পড়িয়াছিলাম, তাহার হিসাব দেওয়া কঠিন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মাইকেল, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দামোদর কেহই আমার অনধীত ছিলেন না; একাধিক সহস্র রজনী, ইহার-উহার গুপ্তকথা, বটতলার চটকদার প্রেমের ও রহস্যের উপন্যাস, রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস এবং অসংখ্য তথাকথিত উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া মনে মনে এক অদ্ভুত জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেখানে অনন্ত কৌতূহল এবং অনন্ত

বৈচিত্র্য, আমার উচ্চতর বিজ্ঞান-বুদ্ধিও সেখানে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিত। নির্বিচারে এই সকল কুপাঠ্য-অপাঠ্য পড়িবার ফলে ভাষা ও শব্দ-সম্পদে আমি বাল্যকাল হইতেই সম্পন্ন হইতে পারিয়াছিলাম।

বোঝা-না-বোঝার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জবাবদিহি আজ আমারও জবাবদিহি। আমার কথা এমন চমৎকার করিয়া বলিতে পারিব না বলিয়া তাঁহার জবানিতেই এই প্রশ্নের জবাব দিতেছি—

"নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভাল করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে, আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন, সেই জন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড় বড় কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমা-খরচ খতাইয়া বিচার করেন তাঁহারাই অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন, যাহা দেওয়া গেল তাহা বুঝা গেল কি না! বালকেরা এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে, তাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়—সেই স্বর্গ হইতে যখন পতন হয় তখন বুঝিয়া পাইবার সুখের দিন আসে। কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জগতে না-বুঝিয়া পাইবার রাস্তাই সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড় রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাট-বাজার বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে না, পর্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।"

আমিও এই না-বোঝা পাঠকদের দল ভারী করিয়াছিলাম, এবং তাহাতে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা ও আনন্দ দুই দিক দিয়াই ফাঁকিতে পড়ি নাই। আজিকার দিনে যাঁহারা একান্তভাবে শিশুদের জন্য সাহিত্য-রচনায় তৎপর তাঁহাদের প্রচেষ্টার সমবেত পরিণাম দেখিয়া সময় সময় ইহাই মনে হয়, এই জ'লো নীতি-সঙ্গত গল্প উপন্যাস পরিবেশন করিয়া ইঁহারা ভাল কাজ করেন নাই। কি ক্ষতি হইত বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বিশুদ্ধ খণ্ডিত না করিয়া সম্পূর্ণ-ভাবে শিশুদের পড়িতে দিলে? ইংলণ্ডে রবিন্‌সন ক্রুশো গালিভার্স ট্র্যাভল্‌স-এর পর ছেলেদের জন্য বিশুদ্ধ অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী অনেক রচিত হইয়াছে,

কিন্তু কালের দরবারে কোনটিই ওই দুইটির পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই। ইহার কারণ, ডানিয়েল ডিফো বা জোনাথান সুইফটের সাহিত্যবুদ্ধি এপিক বা মহাকাব্যের পর্যায়ের ছিল। ক্যারোল বা স্টিভেন্‌সন গীতিকাব্যের মানদণ্ড বজায় রাখিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে রামায়ণ-মহাভারতের পর শিশুদের জন্য কোনও কাহিনীই রচিত হয় নাই; তাহার প্রয়োজনও ছিল না। তাই সেই আশ্রয় ত্যাগ করিলে এখন আমাদের ভুল হইবে। বিদেশী সস্তা অ্যাডভেঞ্চারের অনুকরণে বাংলায় যে-সব গল্প লিখিত হইয়াছে সাহিত্যসৃষ্টির দিক দিয়া সেগুলি অক্ষম। তাই শিশু-ভারতীর দরবারে এখানে আবর্জনাই জমা হইয়া চলিয়াছে, শিশুদের হাতে তুলিয়া দিবার মত অর্ঘ্য প্রস্তুত হয় নাই। এই কারণেই আমাদের ছেলেমেয়েদের নীতির অজুহাতে মূল বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ হইতে বঞ্চিত করা আরও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। আমি ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারতের পক্ষপাতী নহি। তাহারা কৃত্তিবাস কাশীদাস মূলে পড়ুক, পরে অনুবাদে হউক, মূলেই হউক বাল্মীকি ও বেদব্যাসের দ্বারস্থ হউক, গোড়ায় বা মাঝখানে অন্য কোনও দালাল বা এজেন্টের সাহায্য লইবার দুর্ভাগ্য যেন তাহাদের না হয়।

কথা শোনা বা প্রস্তুতির কাল যদিও জীবন-ভোরই চলিতেছে, তথাপি প্রথম পরিষ্কার কথা বলার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রস্তুতির কাল ধরিয়াছি। চোখে গোগ্রাসে কথা গিলিতেছিলাম, কানে শুনিবার ধৈর্য ছিল না। স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া মাঠে খেলিতে যাইবার অছিলায় বাহির হইয়া যাইতাম এবং প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়ির খোলা ছাদে আলিসা আড়াল দিয়া বই পড়িতে বসিতাম। আলো যত স্তিমিত হইয়া আসিত ততই সরিয়া সরিয়া আলোর দিকে আগাইতে থাকিতাম। জ্বালা করিয়া চোখে জল আসিত—সে বাদশাজাদী জেবউন্নিসার দুঃখে, না, দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহারে তাহা বুঝিতে পারিতাম না; বই বা গল্প যতক্ষণ শেষ না হইত, ততক্ষণ মনের জ্বালা যাইত না। এই ভাবে কথা শোনার কাজে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় বাবা মালদহ হইতে পাবনায় বদলি হইলেন। অব্যবহিত পূর্বে অতিরিক্ত পালোয়ানির মূল্যস্বরূপ মেজদাদা মালদহেই দেহরক্ষা করিলেন। মা ও আমাদের তিন ভাই তিন বোনকে বাবা রাইপুর হইয়া মাতুলালয় বেতাল-বনে লইয়া গেলেন। বাবার পূজার ছুটি ফুরাইলে দাদা ও আমি তাঁহার সঙ্গেই মালদহে ফিরিলাম। কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতে খবর আসিল, আমার কনিষ্ঠা কমলা মানকরে ছোট মামার বাড়িতে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বাবা আবার আমাদের দুই জনকে ন'মামার

কর্মস্থল বাঁকুড়ায় পৌছাইয়া দিলেন। মানকর হইতে মা আমার অবশিষ্ট দুই বোন ও ছোট ভাইকে লইয়া আগেই সেখানে পৌঁছিয়াছেন। মাকে দেখিলাম। আর চেনা যায় না। পর পর দুইটি ধাক্কা তিনি সহিতে পারিলেন না, মূর্ছাব্যাধি ঘন ঘন দেখা দিতে লাগিল। আগুনে পুড়িবার ও জলে ডুবিবার ভয়ে সামাল সামাল পড়িয়া গেল। বাবা এই অবস্থায় চাকরির খাতিরে পাবনা চলিয়া গেলেন। মাকে লইয়া আমরা মামার বাড়িতেই বড় দাদার অভিভাবকত্বে রহিয়া গেলাম। এখানে স্কুলের বালাই ছিল না, আমার মামাতো বউদি ছিলেন বাংলা সস্তা উপন্যাসের ঘুণ, তাঁহাকে পান দোক্তা জোগাইয়া এবং বিন্তি-খেলায় সঙ্গ দিয়া আমারও কথা শোনার পালা অব্যাহত রহিল। ছয় মাসের মধ্যেই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাবা আসিয়া আমাদিগকে পাবনায় লইয়া গেলেন। নদীগত ভাবে এই বারংবার স্থান-পরিবর্তন ও বহিঃপ্রকৃতির কথা শোনার ইতিহাস এইরূপ :

সে গানের রেশ টানি এল শীর্ণ অজয়ের তীরে
বালি-কাঁকরের পথ, লালমাটি ছোট গ্রামখানি,
পূর্বপুরুষের ভিটা ; গিরিনদী গৈরিক বন্যায়
সহসা ফুলিয়া ওঠে, কৈশোরে ছাপিয়া যায় কূল।
এলোমেলো কত গান, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথের,
অদূরে নান্নুর গ্রামে রচে পদ বড়ু চণ্ডীদাস—
মেদুর মেঘের মায়া আবার ঘনায়ে এল নভে।
গুচ্ছে গুচ্ছে থরে থরে নদীচরে ফোটে কাশফুল,
শীর্ণ হ'ল জলধারা, বালুরাশি নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

বালুচরে পদচিহ্ন মুছে গেছে ; সে কিশোর কবি
দেখা দিল, নুড়ি ছুঁয়ে যেথা ধীরে বহে গন্ধেশ্বরী,
পৌষ-সংক্রান্তির উষা, মেশে আসি দ্বারকা-ঈশ্বরে।
দূরে আকাশের গায় কালোছায়া বৃদ্ধ শুশুনিয়া—
কিশোর কবির মনে ঘনাইল পাহাড়ের মায়া,
শাল ও পলাশবন, ধু-ধু মাঠ দিগন্তপ্রসারী।

নেশা না কাটিতে তার, বসন্তের সায়াহ্নে একদা
বিশাল পদ্মার তীরে এল যেথা কাঁপে ঝাউবন ;
সুপক্ক কুলের লোভে গুটি গুটি খরগোশ-দল
চমকিয়া পদশব্দে ছোটে দীর্ঘ কান খাড়া করি।

সেখানে পাড়ের গায়ে, ক্ষণে ধ'সে-পড়া খাড়া পাড়—
গর্তে গর্তে উঁকি মারে লাল-ঠোঁট পাখিদের ছানা ;
ইলিশ ধরার নৌকা সার বাঁধি চলে জাল ফেলে,
বহুদূরগামী যত স্টীমারেরা যায় ধোঁয়া ছেড়ে,
পাশে পাশে উড়ে চলে জলচর পাখি সারি সারি।
—"তমসা-জাহ্নবী", 'রাজহংস'

ঘরের ও বাহিরের, মানুষের ও প্রকৃতির কথা মন দিয়া শুনিতে লাগিলাম। বাংলার সাহিত্যগগনে তখন শরৎচন্দ্র পূর্ণ গরিমায় প্রকাশ পাইবার জন্য পূর্ব দিগন্ত হইতে সবে উঁকি দিয়াছেন।

চতুর্থ তরঙ্গ

প্রস্তুতি (২)

মায়ের মুখে শোনা কাহিনী এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের কথা বাদ দিলে ছাপার অক্ষরে প্রথম কোন্ গল্প আমার শিশু-মনকে আলোড়িত ও অস্ফুট কল্পনাবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল—দুস্তর স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহারই সন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সেই আমার ঘটনা-বৈচিত্র্যহীন শৈশবের স্বচ্ছ নির্ঝর-ধারা আজিকার বাত্যাহত তরঙ্গক্ষুব্ধ ঘূর্ণাবর্তসঙ্কুল আবিল জলস্রোত হইতে বহু দূরে পিছনে পড়িয়া আছে। কালের বিপুল ব্যবধানে প্রায় সকল ছাপার অক্ষরই সেই নির্ঝর-ধারার স্নিগ্ধ-চপল নৃত্যপ্রবাহে উপলখণ্ডের মত হারাইয়া গিয়াছে। হাতড়াইতে হাতড়াইতে অকস্মাৎ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছবি ও গল্প' আমার বিলীয়মান স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল। ভুলিয়া গিয়াছিলাম এই 'ছবি ও গল্পে'-সঙ্কলিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" কবিতাটিই আমার সাহিত্য-জীবনকে প্রথম উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল, গ্রীষ্মাবকাশের দ্বিপ্রহরে একদিন এই মহার্ঘ রত্ন-সম্বলিত বইখানি সংগ্রহ করিতে গিয়াই দাদাকে আহত করিয়া মায়ের কান্নার কারণ হইয়াছিলাম। বইখানির নাম স্মরণে উদিত হওয়া মাত্রই আমার অস্ফুট শৈশবকালকে ক্ষণকালের জন্য ফিরিয়া পাইলাম, বিচিত্র-চিত্রশোভিত সেই 'ছবি ও গল্পে'র পাতায় পাতায় আবার সেই শিশুমনের অনন্ত কৌতূহল ও অসীম আগ্রহ লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল—"আমাদের গোবর্ধন, ওরফে গোবরা"র "ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ", সহৃদয় "কেনারামে"র অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভ, বুদ্ধিমান "রামধনে"র মুক্তিলাভ এবং তাহাকে

উপলক্ষ করিয়া পাড়ার বকাটে ছেলেদের সেই ছড়া—

"বুদ্ধিমান রামধন, সাবধানে থেকো,
নাকে মুখে ছিপি এঁটে বুদ্ধি ধ'রে রেখো।"

এবং সর্বোপরি চারি ভাগে বিভক্ত চার পরিচ্ছেদের বড় গল্প "জয়-পরাজয়ে" (আমার জীবনের প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস) বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়া গল্পের নায়ক মোহনলালের শেষ পর্যন্ত এই জ্ঞানলাভ—"দেবত্বের কাছে পশুত্ব পরাজিত।" এই চারিটি গল্পের সাহায্যেই বাংলা ছোট ও বড় গল্পের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয়। এই চারিটির মধ্যেই ভৌতিক, আধি-ভৌতিক, লৌকিক, পারমার্থিক, অদ্ভুত, আজগুবি, হাস্য-ব্যঙ্গাত্মক, গম্ভীর—এমন কি, আজকাল-বহুলব্যবহৃত মনস্তাত্ত্বিক রসের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম। শুধু অধিকাংশ বাংলা গল্পের যাহা প্রাণ—সেই নারীপুরুষ-ঘটিত প্রেম বা যৌন আবেদনের কোনও সন্ধান এইগুলিতে মিলে নাই। পূর্বে 'বর্ণপরিচয়' 'কথামালা' প্রভৃতিতে অনেক গল্প পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেগুলির কোনটিতেই মনে গল্পরসের সঞ্চার হয় নাই, বানান এবং অর্থের গহনে গল্পের মাধুর্য ও আকর্ষণ হারাইয়া গিয়াছিল। এই প্রথম ছাপার অক্ষরে এমন একটি বস্তুর খোঁজ পাইলাম যাহা পাঠ্য পুস্তকে ছিল না, যাহা কাব্য না হইয়াও বাস্তব লোক হইতে কল্পনার অবাস্তব রাজ্যে আমাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। "জয়-পরাজয়" ছোট হইলেও আজিকার বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিতেছি, ইহাতে উপন্যাসের বাঁধন অতি চমৎকার; বাঙালী ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন অতি সাধারণ ঘটনার সমষ্টি হইলেও ইহা সমাপ্তি পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত রাখে, ইহার উদ্দেশ্য—অন্যায়ের সহিত সংগ্রামে ন্যায়ের জয়লাভ—অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, পাঠ্য পুস্তকের গল্পের যাহা দোষ পাঠকের চোখে আঙুল দিয়া "মরাল" প্রকট করিবার প্রয়াস ইহাতে নাই। কলিকাতা হইতে ট্রেনযোগে বাড়ি বগুলায় মায়ের কাছে যাইবার কালে নায়ক স্বপ্নে চিরশত্রু নেপালের সহিত সংঘর্ষে আহত ও মূর্ছিত হইয়া যখন "বগুলা, বগুলা" শব্দ শুনিয়া আত্মস্থ হইল, তাহার তখনকার সেই অচেতন-বিহ্বলতা আমি আজও পর্যন্ত অনুভব করিয়া থাকি; পূর্ববঙ্গ রেলপথে বগুলা স্টেশনটি যতবার পারাপার করিয়াছি ততবারই এক জাগ্রত জীবন্ত অনুভূতি আমাকে অভিভূত করিয়াছে। এই স্বপ্নদর্শন অধ্যায়ের প্রভাব পরবর্তী সাহিত্য-সাধনায় বহুবার অনুভব করিয়াছি। আমার প্রথম গল্পও এই স্বপ্নদর্শনমূলক—১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর জিলা-স্কুলের হস্তলিখিত পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হয়। পরে আমার বহু গল্পে বাস্তবের সহিত স্বপ্ন জড়াইয়া গিয়াছে। 'মধু ও হুল' ও 'কলিকালে' অনেক দৃষ্টান্ত মিলিবে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নিকট আমার—তথা সেকালের ছেলেমেয়েদের ঋণের পরিমাণের কথা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। বিদ্যাসাগর, মদন-মোহন, অক্ষয়কুমার ছানা পাকাইয়া গোল্লা প্রস্তুত করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাহা রসে ফেলিয়া রসগোল্লা করিয়া ছাড়িলেন; প্রথম দল পাঠ্য পুস্তকেই ভিয়ানের সূত্রপাত করিয়া বিদায় লইলেন, দ্বিতীয় দল তাহারই ক্রমপরিণতিতে অপাঠ্য পুস্তকে রসের সঞ্চার করিলেন। মাঝখানে ভাষা ভাব ও বিষয়বস্তুর যোগান দিয়া মনস্বী রাজেন্দ্রলাল, আলালী প্যারীচাঁদ ও হুতোমী কালীপ্রসন্ন যোগাযোগ বজায় রাখিলেন। 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে'র কৃষ্ণ-কমল ও 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র ভূদেবকেও এই যোগাযোগের দলে ফেলিতে পারি। শিক্ষিত সমাজ ধীরে ধীরে এই ক্রমপরিণতির ধারায় অভ্যস্ত হইতে হইতে অকস্মাৎ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আসিয়া যে বিস্ময়ের সম্মুখীন হইলেন, 'বঙ্গদর্শনে'র বঙ্কিম ও 'সাধনা'র রবীন্দ্রনাথ সেই বিস্ময়কেই স্থায়ী আনন্দে পরিণত করিলেন। এই গেল মূল ধারা। শিশুধারায় রস-ভগীরথ হইলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। সদর দরজা দিয়া রসের এই দুই ধারা ছাড়া জঙ্গল-ডোবা-আঁস্তাকুড়-লাঞ্ছিত খিড়কি-পথেও সাহিত্যসেবী বিশুদ্ধ ও নিষিদ্ধ রসের সংমিশ্রিত ধারা প্রবাহিত করিলেন। শিক্ষিত বাঙালী তাঁহাদিগকে সরাসরি গ্রহণ করেন নাই। সেকালের রুচিবাগীশদের বিচারে স্বয়ং শরৎচন্দ্রও গোড়ায় এই শেষের দলে পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদের কথা পরে বলিতেছি। আপাতত, যোগীন্দ্রনাথ আমাকে রসরাজ্যের যে নমুনা দিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

অব্যবহিত পরেই যে উপন্যাস আমাকে কল্পনারাজ্যের ঠিক মধ্যগগনে উড়াইয়া লইয়া গেল তাহা হইতেছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে'র বর্ধিত সংস্করণ। ছোট 'রাজসিংহ' পরে পড়িয়াছি; বড়র কল্পনা-বিলাস ও বর্ণনা-নৈপুণ্য তাহাতে নাই। "চতুর্থ সংস্করণের [১৮৯৩] বিজ্ঞাপনে"র উক্তি "এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম" তখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম কিনা মনে নাই; কিন্তু 'রাজসিংহে'র কাহিনীকে সত্য বিবেচনা করিয়া হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিগৌরব অনুভব করিয়াছিলাম স্মরণ আছে। বইখানিতে অসংখ্য চরিত্র, মহৎ চরিত্রেরও অভাব নাই। কিন্তু আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিল দস্যু মাণিকলালকে। মহারাণা রাজসিংহের হস্তে ধৃত হইয়া সে ভবিষ্যতে দস্যুতা পরিহারের শপথ করিয়া পূর্বপাপের শাস্তি নিজ হাতে যে ভাবে গ্রহণ করিল তাহাতে আমার বালক-চিত্ত বিমোহিত হইয়া গেল:

"এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া,

অবলীলাক্রমে আপনার তর্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া, ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, 'মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।'

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, 'ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?'

দস্যু বলিল, 'এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুত-কুলের কলঙ্ক।'"

এই রাজপুতকুলকলঙ্ক অধম মাণিকলালকে শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করিলাম। সে যখন রূপনগরের পানওয়ালীর সহায়তায় মোগলসৈনিক প্রেমিক মুর মহম্মদ খাঁকে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করিয়া তাহারই পোশাক ও হাতিয়ারে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মোগল-শিবিরে প্রবেশ করিল এবং যথাকালে রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোগল-রক্ষীরূপে দুর্গম পর্বতের রন্ধ্রমুখে উপস্থিত হইল তখন নিতান্ত বালক হইলেও আমিও তাহার সঙ্গে ছিলাম; রন্ধ্রমধ্যে রাজকুমারীর শিবিকা নিরাপদে রাখিয়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগর-গড় হইতে কৌশলে সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেই রন্ধ্রমুখে ফিরিলাম। "পথে যাইতে যাইতে মাণিকলাল একটি ছোট রকম লাভ করিল।"—স্ত্রীলাভ। চঞ্চলকুমারী সখী নির্মলকুমারীকে তাঁহার সঙ্গে দিল্লী লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, নির্মলকুমারী একাই দিল্লী চলিয়াছিল। মাণিকলালের সহিত তাহার এই আকস্মিক সাক্ষাতের এবং ব্লিৎজক্রিগ-বিবাহের অনুরূপ রোমান্টিক ঘটনা আমি আর কখনও কোথাও পড়ি নাই। অসহায় বাঙালী-মনের অ্যাডভেঞ্চার-পিপাসা এই মাণিকলাল অনেকখানি প্রশমিত করিয়াছে।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মোগল-আমলের খণ্ডকালের ইতিহাস ও চিরন্তন মানব-মনের ইতিহাসকে জড়াইয়া যে দ্রুততালের কাহিনী রচনা করিয়াছেন, নিয়তির অমোঘ নিয়মে আতরওয়ালী দরিয়া ও বাদশাজাদী জেব-উন্নিসা উভয়কেই এক টানে যে শোচনীয় পরিণামের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সৃষ্টিধর্মী মুনশীয়ানা কতটুকু, সে বিচার করিবার শক্তি বালকের ছিল না। তবু সে মুগ্ধ-পুলকিত হইয়াছিল এই কারণে যে, সামান্য এক রাজপুত-ভূস্বামীর সুন্দরী কন্যার অবিমৃষ্যতাপ্রসূত অভিমান বা

অহঙ্কারকে সম্মান করিবার জন্য মহারাণা রাজসিংহ সর্বস্ব পণ করিয়া প্রবল প্রতাপশালী মোগল-সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধেও সমরাভিযান করিতে ইতস্তত করেন নাই, স্বজাতীয় নারীর ইজ্জৎ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত সৈন্যসামন্তপরিজন সহ সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইয়াছিলেন। ইঁহার বীরত্বের এবং স্বাজাত্যবোধের দিকটা আমাকে মোহিত করিয়াছিল। যুগে যুগে সর্বত্র লাঞ্ছিত কলঙ্কিত ভারত-ইতিহাসের মধ্যে এই যে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একটি সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে নিঃশঙ্ক ও আত্মস্থ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহার আবেদন অন্তত আমার কাছে বিফল হয় নাই। তাই 'রাজসিংহে'র মহিমা আজও অটল হইয়া আমার মনে বিরাজ করিতেছে। পরবর্তী জীবনে বহু গল্প-উপন্যাসে মহৎ ত্যাগের বহু আদর্শকে জয়যুক্ত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু 'রাজসিংহে'র আদর্শ তুলনায় ম্লান না হইয়া দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হইয়াছে। ইহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশী-আন্দোলনের পূর্বগামী হইলেও আমি উক্ত আন্দোলনের চরমতম সংঘাতের মধ্যে উপন্যাসখানি পাঠ করিয়াছিলাম। আমার মনে মোগলে এবং ইংরেজে একাকার হইয়া গিয়াছিল, স্বদেশী-যজ্ঞের হোতারা রাজসিংহ-মাণিকলালের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

রাজধানী দিল্লীর আম-দরবারের অত্যুত্তপ্ত সামরিক পরিবেশ এবং খাস অন্তঃপুরের প্রেমবিলাসের বিশাক্ত জটিল আবহাওয়া হইতে সেদিনের সেই বিস্মিত উদ্‌ভ্রান্ত বালককে উদ্ধার করিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ 'রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন "প্রকাশক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বসুমতী অফিস।" এক খণ্ড কি করিয়া হস্তগত হইল আজ মনে নাই, কিন্তু সেই জীর্ণ গ্রন্থাবলীখানি আজিও আমার অধিকারে আছে। ৬৫৮ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ বই—'বঙ্গবিজেতা,' 'মাধবীকঙ্কণ,' 'জীবন-প্রভাত,' 'জীবন-সন্ধ্যা' পড়া হইয়া গেল। সেই উত্তাপ, সেই সংঘর্ষ, সেই কুটিল-জটিল চক্রান্ত—রাজধানী আর পার্বত্য সমরক্ষেত্র। বিষণ্ণ কম্পিত চিত্তে 'সংসারে' আসিয়া প্রবেশ করিলাম। সর্বাঙ্গ, শুধু সর্বাঙ্গ কেন, দেহ ও মন একসঙ্গে জুড়াইয়া গেল। এক নিমেষে প্রজ্বলন্ত মার্তণ্ডলোক হইতে জ্যোৎস্নাশীতল চন্দ্রলোকে অবতীর্ণ হইলাম। কোথায় দিল্লী রাজপুতানা আরাবল্লী সিতারা, আর কোথায় বর্ধমান জেলার কাটোয়াগামী রাস্তার উপর ক্ষুদ্র তালপুকুর গ্রাম! কোথায় জেবউন্নিসা-মহাশ্বেতা আর কোথায়ই বা বিন্দুবাসিনী-সুধাহাসিনী! বাংলার গ্রামের যে চিত্র দেখিলাম, যদিও বাংলা দেশের মানচিত্র হইতে আজ একে একে তাহা নিঃশেষে মুছিয়া যাইতেছে, তথাপি তালপুকুরের স্মৃতি আমার মন

হইতে মুছিয়া যায় নাই। দেশপ্রেমিক সহৃদয় কবি রমেশচন্দ্র অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইলেন—আমি দেখিলাম :—

"তালপুকুর গ্রামে একটি সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারি দিকে মাঠ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারি দিকের ক্ষেত্রে চাষ দিয়াছে। গরু ও লাঙ্গল লইয়া একে একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, দুই একজন বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রমধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছে। তাহাদিগের গৃহিণী বা কন্যা বা ভগিনী বা মাতা তাহাদের জন্য বাড়ি হইতে ভাত লইয়া যাইতেছে। চারি দিকে রৌদ্রতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুকুর গ্রাম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল। চারি দিকে রাশি রাশি বাঁশ হইয়াছে এবং তাহার পাতাগুলি অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ হইয়া ছায়া বিতরণ করিতেছে। কদলীবৃক্ষে কলা হইয়াছে, আর মাদার মনসা প্রভৃতি কাঁটাগাছ ও জঙ্গলে গ্রাম্যপথ পূরিয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে বৃহৎ অশ্বত্থ বা বটগাছ ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে বা প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের বাগান ২০।৩০ বিঘা ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাভাগে সেই স্থান অন্ধকারপূর্ণ করিতেছে। পত্রের ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে সূর্যরশ্মি রেখাকারে ভূমিতে পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে ডালে পক্ষিগণ কুলায়ে নীরব হইয়া রহিয়াছে। কেবল কখন কখন দূর হইতে ঘুঘুর মিষ্ট স্বর সেই আম্রকাননে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।"

বাংলার পতনোন্মুখ গ্রামাঞ্চলে এই দৃশ্য হয়তো আজিও অপ্রতুল নয়। কিন্তু ইহার পরেই রমেশচন্দ্র অতি সাধারণ দরিদ্রের যে কুটীরের ছবি আঁকিয়াছেন, কালের করাল কবলে পড়িয়া তাহা বিধ্বস্তপ্রায় হইতেছে। আমার মনে সেই আদর্শ-ছবি এখনও জ্বলজ্বল করিতেছে—

"সেই তালপুকুর গ্রামে একটি সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারি দিকে বাঁশঝাড় ও আমকাঁঠাল প্রভৃতি দুই একটি ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেটি ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫।৬টি নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর-বাড়ির উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটি মাচানের উপর লাউগাছে লাউ হইয়াছে, অপর দিকে কাঁটাগাছ ও জঙ্গল। একখানি বড় শুইবার ঘর

আছে, তাহার উচ্চ রক সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লেপা। পার্শ্বে একটি রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটি গোয়ালঘরে একটি মাত্র গাভী রহিয়াছে। বাড়ির লোকদের খাওয়াদাওয়া হইয়া গিয়াছে, উনুনে আগুন নিবিয়াছে, বেড়ায় দুই একখানি কাপড় শুকাইতেছে, শুইবার ঘরের রকে একটি তক্তপোষ ও দুই একটা চরকা রহিয়াছে।…”

আমাদের একান্ত পরিচিত পরিবেশে আমাদেরই আত্মীয়-পরিজনকে অবলম্বন করিয়া যে উপন্যাস লেখা যায় সেই প্রথম অনুভব করিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ‘সংসার’ ও ‘সমাজে’ একটা অতি মনোরম হৃদয়গ্রাহী স্নিগ্ধতা ও শান্তি যেন ব্যাপ্ত হইয়া ছিল। আমার বালক-মনও তাহাতে অবগাহন করিয়া স্নিগ্ধ হইল। সামাজিক যে গুরুতর সমস্যার অত্যন্ত সহজ সমাধান রমেশচন্দ্র করিয়া দিলেন, পুনর্বিবাহিতা বিধবাকে সুখী করিয়া ছাড়িলেন—সেই সব কৃতিত্ব তলাইয়া বুঝিবার বয়স তখন আমার হয় নাই, তথাপি ভাল লাগিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ‘বিষবৃক্ষে’র কুন্দনন্দিনীকে বধ করিবার জন্য চারি দিকে আটঘাট বাঁধিয়া ঘোরালো আয়োজন করিয়াছিলেন, সুধাহাসিনীকে রক্ষা করিবার জন্য রমেশচন্দ্র কোনই উত্তেজনা প্রকাশ করেন নাই, অতি নীরবে সন্দেহাতীত ভাবে কাজ সারিয়াছেন। তাঁহার এই সহৃদয় সমাধানের কৃতিত্ব পরে অনুধাবন করিয়াছি। এ যুগেও যাঁহারা রমেশচন্দ্রের ‘সংসার’ ‘সমাজ’ অনধীত রাখিয়াছেন তাঁহারা যে অত্যন্ত ঠকিয়াছেন—তাহাই বুঝাইবার জন্য বালক-আমির এই প্রিয় বই দুইখানির উল্লেখ করিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুরধার ব্যঙ্গ এবং রমেশচন্দ্রের স্বাভাবিক নির্মল হাস্য অতি বাল্যকালেই আমাকে সাহিত্যের দুইটি বিশিষ্ট রূপ সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছিল। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ তখনও পড়ি নাই, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের সহিত পরিচয় হয় নাই। সেই নির্মল অথচ নিষ্করুণ হাসি পরে আমাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু ‘সংসার’-‘সমাজে’র শান্ত সুশীতল পরিবেশে পুনরায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিবার পূর্বেই তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘স্বর্ণলতা’ হাতে পাইলাম। বাংলার নাট্যমঞ্চ—আরও খুলিয়া বলিতে গেলে রসরাজ অমৃতলালের ‘সরলা’ নাটক ‘স্বর্ণলতা’র প্রথমার্ধের বিষয়বস্তুকে দীর্ঘকাল সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল, কিন্তু আজকাল পাঠ্যপাঠের বাধ্যতা ছাড়া ‘স্বর্ণলতা’ পঠিত হয় না। তবে প্রকাশের যুগে ইহা যে আলোড়ন তুলিয়াছিল তাহার জোরেই তারক গাঙ্গুলীর ‘স্বর্ণলতা’র নাম বাংলার সাহিত্য-সমাজে অত্যন্ত পরিচিত হইয়া আছে। আমি যখন ইহা সাগ্রহে গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম, তখন গদাধরচন্দ্রের “ভুড়ও খাই টামাকও-খাই” ও “ঐ ঢরলে ডিডি” রঙ্গমঞ্চের কৃপায় প্রবাদবাক্যস্বরূপ

হইয়াছে। নীলকমলের "পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে" পথের ইয়ার-ছোকরারাও গাহিয়া থাকে। সুতরাং স্বভাবত 'স্বর্ণলতা'র করুণ অশ্রুসজল দিকটি অর্থাৎ মূল কাহিনীটি আমাকে ততটা অভিভূত করে নাই, যতটা করিয়াছিল নীলকমলের মস্তিষ্কবিকৃতিজনিত ও গদাধরচন্দ্রের উচ্চারণবিকৃতিজনিত হাস্যকর পরিবেশ। বিধুভূষণ ও সরলার বিয়োগান্ত কাহিনী অথবা গোপাল-স্বর্ণলতার মিলনান্ত প্রেমকাহিনী কোনও দিনই আমার মনের উপর চাপিয়া বসে নাই, গল্পপিপাসু এবং হাস্যরসপ্রিয় আমার মনে চিরজীবী হইয়া আছে নীলকমল ও গদাধরচন্দ্র। যাঁহারা 'স্বর্ণলতা' পড়িয়াছেন তাঁহারা নীলকমলের "বাছা হনুমান" চিত্রটি নিশ্চয়ই ভুলেন নাই।—অনাবিল হাস্যরসের নিদর্শনরূপে 'স্বর্ণলতা'র এই দুইটি চরিত্র দীর্ঘ আশি বৎসর আমাদিগকে শুধু আনন্দ দেয় নাই, আমাদের সাহিত্যিক সমাজকে অনুপ্রাণিতও করিয়াছে। সামাজিক সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়াছে বলিয়াই হয়তো আমরা ইহাকে বিস্মৃতির অতল গর্ভে ঠেলিয়া দিয়াছি, কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম প্রথম সামাজিক উপন্যাস হিসাবে ইহার মূল্য অব্যাহত আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র ইহা প্রায় সমসাময়িক। ইহার প্রথমার্ধ 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় ১২৭৯ সালের আশ্বিন হইতে ১২৮০ সালের ভাদ্র পর্যন্ত বাহির হয়; 'বিষবৃক্ষ' বাহির হয় 'বঙ্গদর্শনে' ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-ফাল্গুনে। 'স্বর্ণলতা'র পুস্তকাকারে প্রকাশের কাল ১৮৭৪ এপ্রিল, 'বিষবৃক্ষে'র ১৮৭৩ জুন। যে বড় গল্প আমাকে প্রথম উপন্যাসের আস্বাদ দেয় 'স্বর্ণলতা' নীতির দিক দিয়া সেই "জয়-পরাজয়ে"রই বৃহৎ সংস্করণ; ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় যে পরিণামে অবশ্যম্ভাবী, 'স্বর্ণলতা'র প্রতিপাদ্যও তাহাই।

বাংলা-সাহিত্যের তৎকাল-প্রচলিত যে যে জারক রসে আমার বালক-মন জীর্ণ হইয়া সাহিত্য-ভোজে আপনাকে নিবেদন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, নাম করিয়া করিয়া তাহার প্রধানগুলির উল্লেখ করিলাম। গল্পের বিচিত্র ও অনন্ত প্রবাহ তো বহিয়া চলিয়াছিলই। সেই প্রবাহের কোনটি স্বচ্ছ, কোনটি আবিল কর্দমাক্ত, কোনটি শান্ত, কোনটি আবর্তসঙ্কুল উত্তেজক। গ্রন্থ এবং উপহার-গ্রন্থাবলী পড়িয়াই চলিয়াছিলাম। মাসিক-পত্রিকার গহনে তখনও ঢুকি নাই, বাড়িতে তাহার আমদানিও ছিল না। বীরভূমের একজন অধিবাসী হিসাবে বাবা আমার জন্মকালে নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বীরভূমি' নামক একটি ক্ষীণকায় মাসিক-পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন, অনেক পরে তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম। যে সাময়িক-পত্র সর্বপ্রথম আমার

আয়ত্তে আসে বলিয়া আমার স্মরণ আছে—তাহার নাম 'সাধনা', সম্পাদক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুই খণ্ডে বাঁধানো তৃতীয় বর্ষ (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। মালদহের ইংরেজবাজার শহরের কালীতলা পল্লীর কোন্ গৃহস্থ-গৃহে আমার সাধনার বীজ লুক্কায়িত বা সংগৃহীত ছিল সে খবর হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই 'সাধনা'র বাঁধানো খণ্ড দুইটি দীর্ঘ তেতাল্লিশ বর্ষকাল সযত্নে বহন করিয়া ফিরিতেছি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন 'হিতবাদী'র উপহার-গ্রন্থাবলী মারফত আমার অতি পরিচিত। সেই বিরাট গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ দখলে না আসিলেও 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট,' 'রাজর্ষি' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' পড়িয়া ফেলিয়াছি, গল্পগুলিও চাখিয়া চাখিয়া দেখিতেছি। ১৩০০ সালের বাঁধানো 'সাধনা'র প্রথম খণ্ডে (আষাঢ়, ১৩০০) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অসম্ভব কথা" আমার নিরঙ্কুশ গল্প-গলাধঃ-করণকে চিন্তাকণ্টকিত করিয়া তুলিল। এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম ও নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেছিলাম, "এক যে ছিল রাজা।" এই নিছক গল্প শোনার সমর্থন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ দশ বৎসরের বালকটির মনে কঠিন প্রশ্ন জাগাইয়া দিলেন, কে ছিল সে রাজা, কোথাকার রাজা, কবে তিনি ছিলেন, তিনি সত্য সত্যই ছিলেন কি না—এই সব অতি-সমীচীন প্রশ্ন। এতদিন এই সব প্রশ্ন ছিল অবান্তর, বালকের মনে যুক্তির আবির্ভাব ঘটাতে বিহ্বল অসন্দিগ্ধ বালকই সচেতন তৎপর হইল, বিচারের বীজ বালক-মনে অঙ্কুরিত হইল। এই নবজাগ্রত বুদ্ধি লইয়া, বিচারের নখরদন্ত শানাইয়া মালদহ হইতে বাঁকুড়া হইয়া পাবনা পৌঁছিলাম। পূর্বেই শরৎচন্দ্রোদয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি। পাবনায় প্রথম গ্রীষ্মাবকাশে সহপাঠী বন্ধু তারাপদ লাহিড়ীর ফরাসপাতা বৈঠকখানায় সে-যুগের বিচিত্র আবিষ্কার ক্যারম-বোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটিল এবং পূজার অবকাশে সেইখানেই 'যমুনা' পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩২০) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' প্রথম কিস্তি পড়িয়া ফেলিলাম। প্রথমটা অভিভূত হইলাম বটে, কিন্তু নবলব্ধ বিচারবুদ্ধির জোরে ভাসিয়া গেলাম না।

পঞ্চম তরঙ্গ

উপোদ্ঘাত—কাকলি

প্রস্তুতির কাল নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হইতে পারে না, কারণ সজীব মানুষ প্রতিদিবসের ভাণ্ডার হইতেই তাহার আহার্য সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছে, চাল-ডাল-নুন-তেলের ভাণ্ডার রুদ্ধ হইলেও আলো-বাতাস-জলের ভাণ্ডার

খোলাই থাকে; বাস্তব জীবন যখন রসদ সরবরাহ বন্ধ করে, শিল্পী তখন কল্পনা-জীবনের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই কল্পনা-জীবনের প্রধান উপকরণ আদিমতম কাল হইতে এখন পর্যন্ত রচিত বইগুলি। এই বই সেই অস্ফুট শৈশব হইতে আজও আমার মনের রসের জোগান দিয়া চলিয়াছে। সুতরাং বইয়ের সাহায্যে প্রস্তুতি আর কোনও সীমাবদ্ধ কালের মধ্যে ফেলিতে পারিব না, আমার জীবনের অন্যান্য কর্মসাধনার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ইহা চলিয়া আসিয়াছে।

'যমুনা'য় মাসে মাসে প্রকাশিত 'চরিত্রহীনে'র অধ্যায়গুলি পড়িতে পড়িতে সর্বপ্রথম এক দেহাশ্রিত অনুভূতি আমার মনকে নাড়া দিল। এই অনুভূতি অতিশয় তীব্র, কিশোর-মনের পক্ষে ক্ষতিকর। রামায়ণ-মহাভারতে বহু কাহিনী পূর্বেই পড়িয়াছিলাম, যেগুলি আজকাল অশ্লীল বলিয়া বর্জিত হয়; রাবণরম্ভা-সংবাদ অথবা অষ্টাবক্রের জন্ম প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। যোগীন্দ্রনাথ বসু-প্রকাশিত রামায়ণ-মহাভারতে এইগুলি না থাকিলেও রামায়ণ-মহাভারত পাইলেই পড়িতাম এবং অধিকাংশ বাড়িতে বটতলার সংস্করণই পাইতাম। এই গল্পগুলি নিছক গল্প হিসাবেই পড়িয়াছিলাম, ইহারা মনে অন্য কোনও আলোড়নের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আরও বিস্ময়ের কথা, এ যুগের পাঠক হয়তো বিশ্বাসই করিবেন না, ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' বাল্যকালেই মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল অথচ "নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া" "খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে" "একদিন দিবাভাগে কবি বিদ্যা-অনুরাগে" প্রভৃতি অংশ মন ও দেহের উপর কিছুমাত্র রেখাপাত করিতে পারে নাই। 'চরিত্রহীন' পড়িতে পড়িতে দেহে নূতনের জাগরণ অনুভব করিলাম। এই উন্মেষ আনন্দদায়ক নয়, পীড়াদায়ক। সেই বাল্যকালে যে জায়গাটি আমাকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করিয়াছিল, তাহা এখনও মুখস্থ আছে। মোক্ষদা বাড়ীউলির বাসায় সতীশ উপস্থিত হইয়াছে, ঘটনাচক্রে সাবিত্রীর ঘরে তাহারই ধবধবে পরিষ্কার বিছানায় সে বসিয়াছে এবং রাত্রির আহারও তাহাকে সেখানে সমাধা করিতে হইয়াছে। "আহারান্তে সতীশ আর একবার শয্যায় আসিয়া বসিল। সাবিত্রী ডিবা ভরিয়া পান আনিয়া দিল, এবং বাঁধা হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া সতীশের হাতে দিয়া, পায়ের নীচে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া একটুখানি হাসিয়াই নিঃশব্দে মুখ নীচু করিল। সতীশের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। নাভিস্থ সমস্ত নাড়িগুলা ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া সর্বদেহে কাঁটা দিয়া যেন শীত করিয়া উঠিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার হুঁকা টানিবার সামর্থ্যটুকুও রহিল না।" পুরুষ মাত্রেরই যৌবনে ও পরে এই অস্বস্তিকর

দেহ-সংস্কারের সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় হয়, সেদিক দিয়া ইহা বাস্তব সুতরাং দোষাবহ নহে। কিন্তু এই অনুভূতির প্রতি এইভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে পূর্বে আর কাহাকেও দেখি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারকনাথ এবং আমার অধীত আরও বহু গ্রন্থাবলী ও বই, (ইহার মধ্যে 'বঙ্গবাসী'-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত নিন্দিত উপন্যাসগুলিও ছিল)—কুত্রাপি এইজাতীয় বর্ণনায় এইরূপ বিচিত্র লিপিকুশলতা প্রযুক্ত হয় নাই। ভাল সর্বদাই মন্দকে চাবুক মারিয়াছে। 'যমুনা'য় এই "চরিত্রহীন" খণ্ডশ পড়িতে পড়িতে সাবিত্রীর ঘরে সতীশের সেই দৈহিক নিগ্রহ বালক হইয়াও আমি উত্তরোত্তর প্রবলভাবে ভোগ করিতে লাগিলাম। আমার এক দিনের আদর্শ বিপর্যস্ত হওয়াতে স্বভাবতই লেখকের প্রতি মন এক দিকে যেমন বিরূপ হইল অন্য দিকে অজগর-কবলিত হরিণের মত একটা মূঢ় আকর্ষণ আমাকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিল। এই মানসিক দ্বন্দ্ব আমাকে পরবর্তী জীবনে দীর্ঘকাল শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধ-সমালোচক করিয়াছিল, নীতি-বাগীশতা আমার শিল্পবোধকে খণ্ডিত করিয়াছিল। বাল্যকালের এই ঘটনাটির উল্লেখ না করিলে শরৎচন্দ্রের প্রতি আমার সাময়িক বিরূপতার আসল কারণ অজ্ঞাত থাকিত। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে আমি আত্মস্থ হইয়াছি এবং তাঁহার বিপুল প্রতিভার প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধা আমার চিত্তকে অধিকার করিয়াছে।

কার্তিক ১৩২০ হইতে ১৩২১ বঙ্গাব্দের প্রথম কয়েক মাস 'চরিত্রহীন' 'যমুনা'য় বাহির হইতে হইতে বন্ধ হইয়া আমার আকর্ষণ-বিকর্ষণ-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। পাবনা হইতে ১৯১৪ জুলাই মাসের গোড়ায় বাবার নূতন চাকুরি-স্থান দিনাজপুরে যাইতে হয়। তৎপূর্বেই 'চরিত্রহীন' বন্ধ হইয়াছিল কি-না স্মরণ নাই; তবে পাবনাতে 'চরিত্রহীনে'র সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর বাঁকুড়ায় মামার বাড়ির চারতলার ছাদে তাহার সহিত পুনর্মিলন হয়, ইহা মনে আছে। 'চরিত্রহীন' তখন সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'যমুনা' হাতে পড়িবার পূর্বে শরৎচন্দ্রের কোনও রচনা পড়ি নাই, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে পুস্তকাকারে 'চরিত্রহীন' পড়িবার পর তাঁহার কোনও রচনাই অপঠিত রাখি নাই,—মাঝখানে পূরা চার বছরের অসহযোগ ঘটিয়াছিল।

"কথা কও, কথা কও" আহ্বান সেই যে শুনিয়াছিলাম, এতকাল তাহাতে সাড়া দিবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছিল; কিন্তু শ্রবণযোগ্য স্বর কণ্ঠে ফুটে নাই। মালদহ পরিত্যাগ করিয়া পাবনা যাইবার পথে বাঁকুড়ায় মামার

বাড়িতে স্বরচিত একটি কবিতা মাতুল-বন্ধুদের ও মামাত-মাসতুত দাদাদের (ন'মামার উদার আশ্রয়ে তখন সংখ্যায় অনেকগুলি ছিলেন) প্রায়ই শুনাইতে হইত; সেটি কোকিল-বিষয়ক এইটুকু মাত্র মনে আছে। সে কবিতা কণ্ঠেই ছিল, কণ্ঠেই হারাইয়া গিয়াছে। পাবনায় আসিয়া ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার লোভে সাবধান হইলাম। একটি কালো-মলাট-দেওয়া এক্সারসাইজ বুককে ভেলা করিয়া দুস্তর কালসমুদ্রে পাড়ি দিবার সুচিন্তিত চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহার প্রমাণ আজিও সযত্নে বহন করিতেছি। হিজিবিজি লেখায় পূর্ণ সেই খাতাটি হারাইয়া গেলে ভাল হইত, কিন্তু সব-কিছু সঞ্চয়ের বাতিকগ্রস্ত বালক এক নশ্বর সম্পত্তি হিসাবে সেটিকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এই "মূল্যবান" খাতার মলাটে কাগজ আঁটিয়া লেখা আছে "আমার শৈশব কবিতাবলী", দেশপ্রেম-পরিচায়ক ঠিকানা আছে—রাইপুর, বীরভূম। প্রথম কবিতাটি "ব্যাস-বন্দনা"—

প্রণমে তোমার পদে কবিচূড়ামণি,
করপুটে ভক্তিভরে এ অভাগা দেব!
চাহ কৃপা ক'রে তুমি সত্যবতীসুত;
অমিয় পীযূষধারা দেহ এ সন্তানে।
রচিয়া ভারতাখ্যান শিক্ষা দিলে সবে
যে মধুর ভ্রাতৃ-মাতৃ-পিতৃ-স্নেহজ্ঞান—
দেখাও আমারে সেই কল্পনা-লেখনী
শিখাও আমারে তব ভগবদ্‌জ্ঞান।

দেখিতেছি খাতার উপরে অনেক সংশোধনের চিহ্ন রহিয়াছে; কিন্তু এখানে প্রাথমিক রূপটিই হুবহু প্রকাশ করিলাম। ইহাই আমার সর্বপ্রথম সংরক্ষিত রচনা, তারিখ দেওয়া আছে—৬ই বৈশাখ ১৩২০।

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছি, ঈশ্বরভক্তিতে এবং বন্ধুপ্রীতিতে সমাচ্ছন্ন এই খাতাখানি; অদেখা যমুনা হইতে আরম্ভ করিয়া সাক্ষাৎদৃষ্ট অজয়-পদ্মার প্রশস্তি-কবিতাও অনেক আছে; "ক্ষমার জয়" নামে একটি গাথা-কাব্যও ইহাতে আছে। কোনটিই উল্লেখযোগ্য নয়।

দিনাজপুরে ১৯১৪ হইতে ১৯১৮—এই চারি বৎসরে মনে স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তখন ধীরে ধীরে রক্তাক্ত ও বিপ্লবাত্মক স্বাধীনতা-আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। প্রকাশ্য সভা-সমিতি গোপনীয় নিষিদ্ধ ষড়যন্ত্রে পর্যবসিত। অন্তর্বৃত্ত বহির্বৃত্ত প্রভৃতি দলভাগে ব্যাপারটি

রোমাঞ্চকর ও ঘোরালো হইয়াছে, বিশেষত আমাদের কিশোর-মনে এই গোপনীয়তাই অশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। আমি বহির্বৃত্তে স্থান পাইয়াছিলাম। হুকুম পালন করিতাম, ভোর রাত্রে বাড়ি হইতে পলাইয়া নিকটস্থ জঙ্গলের এক প'ড়ো বাড়িতে ছোরা-লাঠি অভ্যাস করিতাম, কিন্তু কি কেন কোথায় কবে—এ সকল প্রশ্নের জবাব পাইতাম না। স্বামী বিবেকানন্দ, অশ্বিনীকুমার দত্ত আমাদের নিত্যসঙ্গী। লক্ষ্য যাহাই হউক, উপলক্ষ চরিত্র-গঠন, ব্রহ্মচর্য। মাঝে মাঝে দুই-একজন অপরিচিত যুবক আসিয়া আমাদিগকে কাঞ্চন নদীর নির্জন তীরে লইয়া গিয়া দেশপ্রেম সম্বন্ধে খুব ভাল ভাল পাঠ দিতেন, তাঁহাদের নাম পর্যন্ত জানিতাম না। মানুষের সংখ্যাবাচক পরিচয় সমস্ত ব্যাপারটিকে আরও গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। আমি কবিতা লিখি জানিয়া নম্বরী "দাদা"রা আমাকে স্বদেশ-প্রেমের কবিতা লিখিতে উৎসাহিত করিতেন। আমি খাতার পর খাতা ভরাইতাম, পড়িয়া শুনাইতাম এবং সকলের প্রশংসায় পরিতৃপ্ত হইতাম। এই কাব্যচর্চা-সংবাদ যে গোপন থাকে নাই, তাহার প্রমাণ পাইতে দেরি হইল না। একদিন আমাদের প্রতিবেশী এবং পিতৃব্যস্থানীয় একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির গৃহে আমার ডাক পড়িল এবং বাধ্য হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে তাঁহারই চোখের সামনে তাঁহাদের বাগানের নিভৃত অংশে আমার বিবেকানন্দ-গ্রন্থগুলির সঙ্গে আমার দেশপ্রেমের কবিতার খাতাগুলি নিঃশেষে পুড়াইয়া দিলাম। কবিতাগুলির একটি পংক্তিও কাগজে অথবা মনে অবশিষ্ট রহিল না। এই ঘটনার পশ্চাতে সরকারী চাকুরিজীবী পিতার গোপন ইঙ্গিত ছিল, তিনি সরাসরি আমাকে কিছু বলেন নাই। আমি আমার সেই বিপুল কাব্যসম্ভার বিসর্জন দিয়া সংসারের সকলের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িলাম, এমন কি পড়াশুনাও একরূপ ছাড়িয়া দিলাম।

এই চরম নৈরাশ্যের মধ্যে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট-পিতার বদলি-উপলক্ষে দিনাজপুরে নবাগত শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় সেকেণ্ড ক্লাসে আমার সহপাঠী হইলেন। হেয়ার স্কুলের নাম-করা ভাল ছেলে, সুতরাং ক্লাসের ফার্স্ট বয় আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। পরিচয় হইল এবং পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। তিনি সেই সময়েই অনর্গল ইংরেজীতে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। বিস্মিত ও আকৃষ্ট হইলাম, তাঁহাদের বাড়িতে ক্যারম ও ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি অন্য আকর্ষণও ছিল। নিয়মিত আড্ডা জমিতে লাগিল। মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'প্রগ্রেস' নামে একটি ইংরেজী চটি পত্রিকা সে বাড়িতে মাসে মাসে আসিত। ছাত্রদের বহু শিক্ষণীয় বিষয় ইহাতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবিষ্ট থাকিত।

সত্যেন ইংরেজীতে অনুরূপ রচনা করিতে পারিতেন। এই 'প্রগ্রেস' লইয়া আলোচনার ফলে আমাদের দিনাজপুর-জিলা-স্কুল হইতে একটি হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশের মতলব আমাদের উভয়ের মনে জাগে। আমি সহপাঠীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। তাহারা আমাকে জোর করিয়া স্পোর্টস্, ম্যাগাজিন সকল বিভাগেরই সম্পাদক নির্বাচিত করিয়াছিল। সুতরাং আমারই সম্পাদকতায় পত্রিকা প্রকাশিত হইল, সত্যেন হইলেন প্রধান পরামর্শদাতা ও লেখক। আমি অনেকগুলি প্রবন্ধ কবিতা ও "স্বপ্নভঙ্গ" নামে একটি গল্প লিখিলাম। ইহাই আমার হাতের লেখায় প্রথম বাহিরে আত্মপ্রকাশ। পত্রিকাখানির আর সন্ধান করিতে পারি নাই, কিন্তু সেই শুভারম্ভ হইতে আমি হইয়াছি সাহিত্যসেবী। সত্যেন চাকুরির দিকে ঝোঁক দিয়া উত্তরোত্তর উন্নতি করিতে করিতে আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারি হইয়াছেন, সরকারী নথিপত্রেই তাঁহার বাগ্দেবী আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

খাতা পুড়াইয়া সেই যে আশাভঙ্গ হইয়াছিল, পড়াশুনার দিক দিয়া আর আত্মস্থ হইতে পারি নাই। সেই খাতায় নিবদ্ধ মতবাদের ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইয়াও বাঁকুড়ায় চালান হইলাম। শীতল নিরাপদ জায়গা, কিন্তু আমি পড়াশুনা করিবার মত শৈত্য আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। দল বাঁধিয়া কলেজ-হস্টেলেই নানা কসরৎ দেখাইতে লাগিলাম। মিশনরী কলেজ ও হস্টেলের শান্ত আবহাওয়া গরম হইয়া উঠিল এবং কর্তৃপক্ষের ধমক খাইতে খাইতে দলগতভাবে আমার সম্মান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

দিনাজপুর-জিলা-স্কুল-ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা বাহির করিয়াই আমার লেখার দিকটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। পিতার বদলি হওয়ার ফলে সত্যেনের দিনাজপুর ত্যাগও আমার সাহিত্যচর্চা বন্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ। বাঁকুড়ায় খাই-দাই, আড্ডা দিই, মোড়লি করি এবং সুর করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ি। দিনাজপুরে থাকিতেই জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া 'প্রবাসী'র গ্রাহক হইয়াছিলাম। সাহিত্যচর্চায় বাবার সমর্থন ছিল না, সুতরাং বই কেনার সঙ্গতিও ছিল না। চাহিয়া চিন্তিয়া কিছু কিছু বই সংগ্রহ হইত, অন্য ভাবেও যে না হইত তাহা আজ হলফ করিয়া বলিতে পারিব না; আমার লাইব্রেরির বহু বইই সেই সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু নানা ভাবে সংগৃহীত বইয়ের মধ্যে নিজের মনোমত বই কদাচিৎ স্থান পাইত। সরকারী কাগজের খাতা বাঁধাইয়া গোটা গোটা বই নকল করিতাম। শুধু রবীন্দ্রনাথের বই। 'গীতাঞ্জলি' ইংরাজী ও বাংলা, 'গোরা,' 'চিত্রাঙ্গদা,' 'বিদায় অভিশাপ,' 'রাজা ও রাণী,' 'বিসর্জন' সম্পূর্ণ নকল করিয়া লইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

পরে যখন পরিচয় হয় তখন তাঁহাকে খাতাগুলি দেখাইয়াছিলাম, তিনি সস্নেহ বিস্ময়ে সেগুলি আমার নিকট হইতে সম্ভবত একলব্য-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বঙ্গবাণীসাধক, যাঁহার রচনা আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এবং তিনিই সর্বপ্রথম কবি যাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সে কাহিনী যথাসময়ে বলিব।

বাঁকুড়াতে এই খাতাগুলিই আমার সম্বল ছিল। স্কলারশিপের টাকা হইতে দুই-একখানি করিয়া বইও কিনিতে লাগিলাম, প্রথম কিস্তিতে 'বলাকা' ও 'পলাতকা', পরে পরে খণ্ড খণ্ড অন্যান্য কবিতার বই। খাতা এবং বই লইয়া আসর সরগরম রাখিতাম, তর্ক করিতাম, মারামারি করিতাম। নিজে লিখিতাম না। হঠাৎ একদিন আমাদের হস্টেলের পাচকের এক আত্মীয়কে সাপে কামড়াইল। ওঝা বা ডাক্তার কাহার সাহায্য লওয়া হইবে—ইহা লইয়া দুই দল হইল। ডাক্তার আসিল। হতভাগ্যের জীবন রক্ষা হইল না। ওঝার দল রটাইতে লাগিল, ডাক্তার-সমর্থকেরাই লোকটিকে হত্যা করিল। সাংঘাতিক দলাদলি। আমি শেষোক্ত দলে। এই দ্বন্দ্বে আমার মা-সরস্বতী আবার কৃপা করিলেন। আমি ভাবাবেগে একটি আধ্যাত্মিক কবিতা লিখিয়া নোটিশ-বোর্ডে টাঙাইয়া দিলাম। ঝ'ড়ো হাওয়ায় তাহা উড়িয়া যাইবার কথা, গিয়াছিলও নিশ্চয়; কিন্তু আমার এক সহপাঠী বন্ধু, অধুনা বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও লেখক শ্রীরাধারমণ বিশ্বাস, বি. এ., বি. এল. সেদিন প্রীতিবশেই কবিতাটিকে মুখস্থ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন; সম্প্রতি-প্রকাশিত (১৩৫৮) তাঁহার 'মৃত্যুর পর কি হয় ও কোথায় যায়' পুস্তকে তিনি কবিতাটিকে স্থান দিয়াছেন এবং আমাকে এক খণ্ড উপহার দিয়াছেন। হারানো কবিতাটিকে আমার সাহিত্যিক নবজীবনের প্রথম অভিব্যক্তি বলিতে পারি। কবিতাটি এই—

মিথ্যা কথা, কে বলে যে হারিয়ে গেছে
কিছু কি আর হারায়?
না-হারানোর বাণী যে ভাই আছে সবার মাঝে
রবি শশী তারায়।
বিধাতার এই মধুর বাণী রটাও ভুবন ভ'রে—
মিথ্যা কান্না-হাসি
জগৎ জুড়ে জীবন-মরণ, আছে যাওয়া-আসা।
শুকায় ফুলের রাশি—
আবার মধুর প্রভাত-বায়ে ফুল যে উঠে ফুটে
দোলে সমীর-ভরে;

যুগান্তরের এমনি ধারা, ধরার জিনিস কভু
হারায় কি আর ওরে ?
ধরা যেদিন সৃষ্টি হ'ল সেদিন হতে আজও
যা ছিল তাই আছে।
বিধির মধুর দৃষ্টি যে ভাই সেদিন হতে আজও
আছে তাহার পাছে।

বন্ধুর প্রীতি সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কাল যাহাকে রক্ষা করিয়াছে, আমিও তাহাকে অক্ষম জানিয়াও রক্ষা করিলাম। আমার মনের আগল এই কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আবার খুলিয়া গেল এবং রুদ্ধ বন্যাস্রোত দুই কূল ছাপাইয়া ছুটিতে লাগিল। বন্যার জলের মতই তাহা আবর্জনা-পঙ্কিল হইলেও প্রবাহটা আমাকে সাগর-লক্ষ্যের দিকে ঠেলিয়া দিল। মৃত্যুর মুখামুখি হইয়াও আমি বাঁচিয়া গেলাম।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

দিনাজপুরের স্মৃতি

সদ্য-লব্ধ বিজ্ঞানের জ্ঞান ও কাব্য-কল্পনার মোহে বাঁকুড়া কলেজ-হস্টেলের নোটিশ-বোর্ডে তো জাহির করিলাম—

মিথ্যা কথা, কে বলে যে হারিয়ে গেছে
কিছু কি আর হারায় ?

কিন্তু হিসাব খতাইতে গিয়া দেখিতেছি, মহাকালের তরঙ্গাঘাতে বহু অমূল্য সম্পদই হারাইয়া গিয়াছে, বর্তমানের বিচিত্র মহিমায় আরও অনেক হারাইতে বসিয়াছি। মালদহের মহানন্দা ও দীনু পণ্ডিতের পাঠশালা এবং পাবনার দিগন্তবিস্তার পদ্মা মাত্র স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হইয়া আছে, বাকি কথা অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্য হইতে বহু কষ্টে আহরণ করিতেছি। কিন্তু পরিণত কৈশোরে যে দিনাজপুরের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল, সাহিত্য-জীবন-জলতরঙ্গের প্রঘাতে তাহার কথা সাময়িক ভাবেও হারাইয়া যাওয়া উচিত হয় নাই। পুস্তকগত বিদ্যা ছাড়া সাহিত্যের বাস্তব জীবনগত পাথেয় এখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম—বিশেষ করিয়া দুইটি মানুষের কাছ হইতে। তাঁহাদের কথা এইখানেই বলিয়া রাখি।

বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর অর্থাৎ বালুরঘাটের উকিল শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন ওরফে রতন আমার স্ফুটনোন্মুখ সাহিত্য-জীবনের আদি-অকৃত্রিম সঙ্গী ও সমঝদার। পরে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছি, কিন্তু সেই অপরিপক্ব ছাত্রাবস্থা হইতেই এমন গভীর চিন্তাশীল মানুষ আমার নজরে পড়ে নাই। এমন নির্ভীক স্বাধীনচেতা পুরুষও আমি কম দেখিয়াছিলাম। এই কারণে তাঁহাকে বহু দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছে, পৈতৃক পরিবার হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন এবং চিরজীবন-অনুসৃত দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মতবাদকেও পরিত্যাগ করিয়া শেষ পর্যন্ত বামপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গান্ধীজীর খাঁটি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া এবং আগস্ট-বিপ্লবে নেতৃত্ব করিয়া যিনি বার বার কারাবরণ করিয়াছেন, তিনি যে কেন আজ সে-পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার অনমনীয় স্বাধীন মতকে শ্রদ্ধা করিতাম বলিয়াই তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

পাবনা হইতে দিনাজপুর পৌঁছিয়াই বালুবাড়িতে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দিনাজপুরের সরকারী উকিল রায়সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেনের (সম্প্রতি মৃত, শেষ-জীবনে কলিকাতা কালীঘাট-নিবাসী) জ্যেষ্ঠপুত্র আমার সহপাঠী এই নরেন্দ্রমোহনের সঙ্গে পরিচিত হইলাম। অত্যল্পকাল মধ্যে পরিচয় এমন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল যে, পাড়ার প্রবীণারা আমাদিগকে রাম-লক্ষ্মণ দুই সহোদরের মত জ্ঞান করিতে লাগিলেন। পড়াশুনায় তাঁহার খ্যাতি ছিল না, কিন্তু তার্কিক বলিয়া নাম ছিল। সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতি বিষয়ক নানা আলোচনায় পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও একান্ত অনুগত হইয়া পড়িলাম। বাড়িতে অভিভাবকদের দৃষ্টি ছিল প্রখর, সুতরাং বিশ্রব্ধ আলাপের নিভৃত স্থান বাছিয়া লইতে হইয়াছিল আমাদের পল্লীর পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত দিগন্ত-প্রসারিত আম-জাম-কুরচি-সোঁদাল (কর্ণিকার) এবং বিবিধ কণ্টকগুল্মলতার জঙ্গলে—অরণ্য বলিলেও ভুল হইবে না। পরিবেশ ও পটভূমি ছিল একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র—এই অরণ্যস্থিত একটি প'ড়ো বাড়িতেই আমাদের পূর্বোল্লিখিত সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া বসিত। স্কুলের অবকাশদিনে পক্ষীকূজন-মুখর উদাস দ্বিপ্রহরে আমরা দুইজন বালক সেই বনভূমির নির্জন তৃণাস্তৃত প্রান্তরে বসিয়া বা দেহ এলাইয়া দিয়া গভীর মনোনিবেশ সহকারে কাব্য ও সমাজ-রাজনীতি চর্চা করিতাম, চিন্তা ও কল্পনার মুক্ত অবাধ গতি আমাদিগকে দূর বিদেশে লইয়া যাইত। অপরিণত বুদ্ধিতে রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য নানা বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার মল্ল করিতে করিতে একান্ত নিজস্ব এক ধরনের মতবাদ আমরা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম। নরেনের তখন লেখা আসিত না। পরে

কারা-জীবনের নির্জন অবকাশে তিনি মাতৃভাষায় গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ এবং ইংরেজী ভাষায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ অনেক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বাল্যে তাঁহার বাণী সম্পূর্ণ মূক ছিলেন। আমি অনর্গল কবিতা লিখিতাম, রতন ছিলেন আমার অনুরাগী পাঠক ও শ্রোতা। যে জ্বালাময়ী স্বদেশী কবিতাগুলি একদিন তাঁহাদেরই গৃহোদ্যানে হুতাশনসাৎ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, একমাত্র তিনিই তাহার সবগুলির সঙ্গে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

কৈশোরের শিক্ষা ও প্রস্তুতির কালে আমরা পরস্পর পরিপূরক ছিলাম, একে অন্যের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলাম। কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে উভয়েই উভয়কে যুক্তি সরবরাহ করিতাম; অন্য সহপাঠীদের কাছ হইতে আমরা একটু স্বতন্ত্র থাকিতাম। দিনাজপুরে যখন প্রথম পদার্পণ করি, তখন সবে ইয়োরোপীয় প্রথম মহাসমর বাধিয়াছে, যুদ্ধশেষ বা শান্তিচুক্তি হয় আমি যখন বাঁকুড়ায়, ১১ই নবেম্বর ১৯১৮। সুতরাং সমগ্র সামরিক উত্তেজনার কাল দিনাজপুরে উভয়ে একত্র ছিলাম, আলাপ-আলোচনা তর্কাতর্কি হাতাহাতির কারণের অভাব কোনও দিনই হইত না। এই যুদ্ধ লইয়া আমাদের দুইজনের জীবনে একটু বিপর্যয়ও ঘটিয়াছিল, যাহার উল্লেখ আবশ্যক। সাহিত্যিক খাণ্ডবদহনের পর আমি তখন প্রায় দেওয়ানা, লেখাপড়ায় বিতৃষ্ণা আসিয়াছে, ইংরেজকে এ দেশ হইতে উৎখাত করিতে না পারিলে কিছুতেই শান্তি নাই—মনের এইরূপ অবস্থা। এমন সময় দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সুললিত ইংরেজী ও বাংলা বক্তৃতার সাহায্যে দিনাজপুরের তরুণ সম্প্রদায়কে ইংরেজের পক্ষে সৈন্যদলে যোগদানে উৎসাহিত করিবার জন্য সেখানে আসিলেন। পক্ষ ও বিপক্ষ দুই দলে তুমুল সোরগোল পড়িয়া গেল, আমরা বিপক্ষে। কিন্তু বক্তৃতা শুনিয়া ব্যুমেরাঙের বিচিত্র রীতি অনুযায়ী হঠাৎ অন্য প্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইলাম। স্থির করিয়া ফেলিলাম, ইংরেজের হইয়াই লড়িতে যাইব। দিনাজপুরের সরকারী চাকুরিয়া অভিভাবকদের নাকের উপর নাম লেখানো সম্ভব নয়। সুতরাং পলাইয়া কলিকাতা যাওয়াই স্থির হইল। ভাড়ার চিন্তা মাথাতেই আসিল না, ইংরেজের পক্ষ সমর্থনে যুদ্ধ করিতে যাইব, আমাদের আবার ট্রেনের ভাড়া কি! বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। আমরা বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্য ধৃত হইয়া পার্বতীপুর জংশনের ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারের কাছে নীত হইলাম। সেই স্নেহপরায়ণ বৈদেশিক বৃদ্ধ কি বুঝিলেন জানি না, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নানা হিতোপদেশ দিয়া বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। সেদিন এই দুর্বিপাক না

ঘটিলে বঙ্গভারতীর দরবারে যে আর একজন হাবিলদার কবির আবির্ভাব ঘটিত, তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারি।

যুদ্ধে গেলাম না বটে, কিন্তু সামরিক প্রবৃত্তিটা কেমন করিয়া মনের মধ্যে আসন গাড়িয়া বসিল। অতি তুচ্ছ কারণে পাড়ার ছেলেদের এবং সহপাঠীদের সহিত মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। নালিশে নালিশে জর্জরিত পিতা আমাকে মারিতে মারিতে এলাইয়া পড়িলেন। আমার ভ্রূক্ষেপ নাই, আমি তখন উদাসীন এবং মরীয়া। একদিন দিনাজপুরের পরবর্তী স্টেশন কাউগাঁর একটি মেলায় স্বদলবলে গিয়া লুঠতরাজ পর্যন্ত করিয়া আসিলাম। ধরা পড়িয়া লেখাপড়ায় দক্ষতার গুণে হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছে রেহাই পাইলাম। ঠিক এই সময়ে সত্যেনের আবির্ভাবে আমার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল এবং নূতন বন্ধুত্বের মোহে সাময়িকভাবে রতনের সহিতও বিচ্ছেদ ঘটিল। আগেই বলিয়াছি, তখনই আমার সম্পাদক-জীবনের সূত্রপাত। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে নূতন বিদায় লইতেই দুই পুরাতন বন্ধুতে দ্বিগুণ আবেগে পুনর্মিলিত হইলাম। মিলনের স্থান পরিবর্তিত হইল। সত্যেনদের বাড়ি ছিল কাঞ্চন নদীর তীরে এক উদ্যানের মধ্যে। অভ্যাসের আকর্ষণে কাঞ্চন নদীকে আর ছাড়িতে পারিলাম না। নির্জন কাঞ্চন নদী-তীরে প্রত্যহ বৈকালে আবার আমাদের সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতির আসর বসিতে লাগিল, সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত্রি অবধি নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে দুই বন্ধুর কল্পনাবিলাস চলিত। 'রাজহংসে'র "তমসা-জাহ্নবী" কবিতায় সেই যুগের এই পরিচয় আছে—

মিলাল পদ্মার ছায়া, স্বচ্ছজল চপল কাঞ্চন,
কিশোরীর বেণী যেন, হাঁটুজল শহরের ধারে;
ভুলে-যাওয়া কবিতার অকস্মাৎ আবৃত্তির মত—
গান গেয়ে ওঠে প্রাণ, কৈশোর যৌবনে আসি মেলে।
রেল-লাইনের সাঁকো, প'ড়ো বাড়ি, আমের বাগান,
নির্জন সন্ধ্যায় যেথা মেঘে মেঘে রঙের বিলাস,
গানে গানে উন্মাদনা। স্নান করি শান্ত নদীজলে
দেবতা-মন্দিরে যেন দেখা দিল তরুণ পূজারী।

দিনাজপুর-জিলা-স্কুল ছাড়িয়া আমি গেলাম বাঁকুড়ায়; রতন কলিকাতায় মাতুলালয়ে থাকিয়া কলেজে পড়িতে লাগিলেন। ছুটির সময় দিনাজপুরে আবার মিলিতাম বটে, কিন্তু সাময়িকভাবে। আমি বি. এস-সি. পড়িতে কলিকাতায় আসিলে আবার দীর্ঘস্থায়ী মিলন হইয়াছিল। তাহার পর

আমাদের জীবনের গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে। আমি সাহিত্য এবং নরেন রাজনীতিকে মুখ্য অবলম্বন করিয়া জীবন-নদীতে পাড়ি দিয়া চলিয়াছি, মাঝে মাঝে তরণী পরস্পর সংলগ্ন হইলেও বিচ্ছেদের পারাবারই অপার। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনিও সাহিত্যিক হইবার সাধনা করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের আসামীরূপে জেলে গিয়া 'বিক্ষোভ' নামে এক সুবৃহৎ উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, আমিই তাহা দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদের দুইজনেরই কৈশোর ও যৌবনের কাহিনী উপন্যাসে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বালুবাড়িতে সেই কালে একজন মহাপুরুষ বাস করিতেন, দিনাজপুরে পৌঁছিবা মাত্রই সর্বাগ্রে তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম। তিনি সেখানে 'পণ্ডিত মশায়' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার আসল নাম ভুবনমোহন কর, পরে মহর্ষি ভুবনমোহন নামে সর্বত্র খ্যাত হন। আমি যখন তাঁহাকে দেখি, তখনই (১৯১৪) তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ, শ্মশ্রুগুম্ফ এক হইয়া আবক্ষ প্রসারিত, সাদা ধবধব করিতেছে। সৌম্যদর্শন প্রশান্তমূর্তি মুখখানি আরও সুন্দর, করুণায় মণ্ডিত, কপালের আব তাঁহার মুখ-সৌন্দর্যকে কেমন যেন প্রশান্ততর করিয়াছিল। ঢাকার কোন্ স্কুলের হেড পণ্ডিতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কোনও সূত্রে দিনাজপুর আসেন, সেও প্রায় পঁচিশ বৎসর হইতে চলিয়াছে। তিনি ধর্মবিশ্বাসে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ছিলেন, এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচার তাঁহার শেষ-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বালুবাড়ির চৌমাথাস্থিত বটতলায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদের বাসগৃহের সংলগ্ন ছিল তাঁহার দাতব্য ঔষধালয়। বটতলায় খেলিতে গিয়া প্রত্যহ প্রাতে এই ঋষিতুল্য মানুষটিকে দেখিতাম। দেখিতাম, দলে দলে বিচিত্র ধরনের স্ত্রী পুরুষ আসিয়া তাঁহার নিকটে দৈহিক দুঃখ নিবেদন করিয়া নিরাময় হইবার ঔষধ ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছে; সকাল হইতে দ্বিপ্রহর একাদিক্রমে এই কার্য চলিতেছে—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বিরক্তি নাই। মুখে সস্নেহ ও সহাস্য বরাভয়, কম্পমান হাত প্রেসক্রপশনের পর প্রেসক্রপশন লিখিয়া চলিয়াছে; পাঁচ-সাতজন স্বেচ্ছাসেবক কম্পাউণ্ডারি করিয়াও কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই অপরূপ দৃশ্য প্রত্যহ দেখিতে দেখিতে কৌতূহলী বালকের মন ভক্তি ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে তাঁহার সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। দেখিয়া ভরসা হইত—মুচি মুদ্দফরাস, চামার মেথর, এমন কি, গলিতকুষ্ঠরোগী—কেহই তাঁহার নিকট অস্পৃশ্য বা অপাংক্তেয় ছিল না, শিশু বালক কিশোরদের তো অবাধ গতি ছিল। নরেন দিনাজপুরেরই ছেলে, পণ্ডিত মশাই তিন পুরুষে তাঁহাদের চিনিতেন। নরেনকে পুরোভাগে

রাখিয়া একদিন গুটি গুটি তাঁহার কাছে গিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি দেখিলাম আমার পরিচয় জানিতেন, সস্নেহ আশীর্বাদে আমাকে অভিষিক্ত করিয়া অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তুমি বাংলা চিঠি-পত্র লিখতে পার? তোমার হাতের লেখা কেমন? বানানজ্ঞান আছে তো? সেই সহৃদয় প্রশ্নগুলি আমার কানে এখনও বাজিতেছে। আমার হাতের লেখা ভাল ছিল না—এখনও ভাল নয়, তাই সসঙ্কোচে ভয়ে ভয়ে নিবেদন করিলাম, বাংলা লিখতে পারি, কিন্তু হাতের লেখা ভাল নয়। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, ছুটির দিনে দুপুরে অবসরমত এসো। বাহির হইতে নিত্য দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের দৈনন্দিন রুটিন আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল, অনুমানে বুঝিতে পারিলাম, কাজের মানুষ তিনি, এই বালককেও কাজে লাগাইতে চান—রোগীদের চিঠিপত্রের জবাব দিবার কাজে আমাকে যোগ দিতে হইবে। তাঁহার নিজের হাতে জড়তা আসিয়াছিল, লিখিতে গেলে হাত কাঁপিত। মহতের কাজে আমারও স্থান হইবে জানিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম।

পণ্ডিত মহাশয়কে সঠিক জানিতে ও বুঝিতে হইলে তাঁহার দৈনন্দিন কাজের তালিকাটি জানা প্রয়োজন। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন, প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া কিয়ৎকাল উপাসনায় বসিতেন, মৃদু মৃদু ভগবদ্‌প্রসঙ্গের গান গাহিতেন—রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র গান তাঁহার মুখে অনেক শুনিয়াছি, ধর্মগ্রন্থ পড়িতেন। তাহার পর সমাহিত হইয়া বসিয়া আগের দিন যে সকল কঠিন রোগী দেখিয়া আসিয়াছেন, হোমিওপ্যাথির পুস্তক ঘাঁটিয়া উপসর্গানুযায়ী তাহাদের ঔষধ নির্ণয় করিতেন। যাহারা দূর হইতে অথবা মুখামুখি সাক্ষাতের লজ্জা বাঁচাইবার জন্য নিকট হইতেও অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাধির ঔষধ প্রার্থনা করিয়া পত্র দিত, নিজে বহু কষ্টে তাহাদের জবাব লিখিতেন। ধীরে ধীরে ভোর হইয়া আসিত, বিচিত্র পাখীদের কলকাকলিতে সুবৃহৎ বটবৃক্ষের সুনিভৃত শাখা-প্রশাখা মুখর হইয়া উঠিত, রাজপথে একটি দুইটি করিয়া পথিক-চলাচল শুরু হইত, তিনি খোলা ডিস্‌পেন্‌সারির গদিহীন শুষ্ক কাঠের চেয়ারে আসিয়া বসিতেন; অধীর রোগীরা ততক্ষণ এক এক করিয়া জমায়েত হইয়াছে, নিদ্রাকাতর তরুণ কম্পাউণ্ডারদের শুধু আসিবার অপেক্ষা। তাহাদের জন্য অবশ্য কখনই আটকাইত না। পণ্ডিত মহাশয়ের কৃপায় পাড়ার ছেলেরা প্রায় সকলেই এই কাজে অল্পবিস্তর দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, আমিও শুধু সামনের রাস্তায় পায়চারি করিতে করিতে ইউপেটোরিয়াম পার্‌পিউলা, বেল, ইপিকাক,

চায়না, নাক্স, কার্বোভেজ, আর্নিকা, সালফার, মায় রাস্‌টক্‌স্ পর্যন্ত ঔষধের যথাযথ প্রয়োগ অধিগত করিয়াছিলাম। উত্তরবঙ্গের বহু শহরে ও গণ্ডগ্রামে হোমিওপ্যাথির বর্তমান (পার্টিশন পর্যন্ত) ব্যাপক প্রসার পণ্ডিত মহাশয়ের কল্যাণেই ঘটিয়াছে, তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্যেরা বহু স্থলে বহু গরিবের মা-বাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাহা হউক, প্রেসক্রপশন ও ডিস্‌পেন্‌সিং-এর কাজ অচিরাৎ আরম্ভ হইত এবং বেলা বারোটা পর্যন্ত সমানে চলিতে থাকিত। গড়পড়তা প্রত্যহ প্রায় দুই শত রোগীর পরীক্ষা ও ঔষধ-ব্যবস্থা হইত, প্রত্যেককে নিজ নিজ শিশি লইয়া আসিতে হইত। ঠিক মধ্যাহ্নে পণ্ডিত মহাশয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেন এবং পাশে রক্ষিত লাঠিটি অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিতেন। পাড়ার বা কাছাকাছি অন্য পাড়ার যে সকল বৃদ্ধ, শিশু বা মহিলা রোগী ডিস্‌পেন্‌সারিতে আসিতে অপারগ হইতেন, তখন হইতে বেলা একটা পর্যন্ত তিনি স্বয়ং পদব্রজে গিয়া তাঁহাদের দেখিতেন। শ্রান্ত ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরিয়া আসিয়া বটতলায় ছোট্ট একটি মাদুর পাতিয়া বসিয়া তিনি প্রথমটা কাঁধের গামছা ঘুরাইয়া শ্রান্তি দূর করিতেন। জামা বা পিরহান তিনি কখনই ব্যবহার করিতেন না, খাটো মোটা ধুতি এবং একখানি গামছা তিনি উত্তরীয় স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। বাড়ির ভিতর হইতে এক বাটি সরিষার তেল আসিত, তিনি বসিয়া বসিয়া নিজেই সর্বাঙ্গে তাহা মাখিতেন। এই সময়ে তাঁহার আশেপাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা বহু শাস্ত্রীয় সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে পাইত। বেলা দুইটা নাগাদ স্নান সমাধা করিয়া তিনি বাড়ির উঠানে আহারে বসিতেন, বৃষ্টির দিনে বসিতেন ভিতরের বারান্দায়। আয়োজনের মধ্যে পাত্রের আয়োজনই একটু বিশেষ—থালা, বাটি, গেলাস, সমস্তই পাথরের, আমিষের ছোঁওয়া তিনি একেবারেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না তাই এই স্বাতন্ত্র্য। নিরামিষ আহার্যের আয়োজন যৎসামান্য—মোটা ভাত, একটা ডাল, একটা শাকডাঁটার তরকারি, কখনও বা অম্বল। আহারের পরিমাণ বিপুল ; আশি বছর বয়সেও তিনি যাহা আহার করিতেন, জোয়ান পুরুষদেরও তাহা বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। তিনি একাহারী ছিলেন, তাঁহার হাতের সঙ্গে মুখের সাক্ষাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার ঘটিত। পাথরের বাসন ও নিরামিষ ব্যবহার করিলেও অন্য কোনও সংস্কার তাঁহার ছিল না। অতি নিম্নশ্রেণীর পতিত অন্ত্যজদের নিমন্ত্রণ তিনি সানন্দে গ্রহণ করিতেন। পাথরের পাত্রগুলি লইয়া বহুদিন তাঁহাকে ডোম-মেথরদের পাড়ায় নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাইতে দেখিয়াছি। আহারের পর বটতলায় আর একটু দীর্ঘায়তন মাদুর বিছাইয়া বিশ্রাম করিতেন, নিদ্রাকর্ষণও হইত, তিনি বলিতেন—ভাতঘুম। অবশ্য

বর্ষাকালে বিশ্রামের স্থান-পরিবর্তন হইত। ঘড়িতে যখন ঠিক টং টং করিয়া তিনটা বাজিত, তিনি উঠিয়া পড়িতেন। চিঠিপত্র দোয়াত কলম কাগজ আসিত, সেদিনকার সংবাদপত্র হাতে লইয়া তিনি বসিতেন, মুন্সী যে থাকিত সে একটির পর একটি পত্র পড়িত এবং তাঁহার নির্দেশমত জবাব লিখিত। তাঁহার একটি এক-ঘোড়ার পাল্‌কিগাড়ি ছিল, কোচোয়ান ততক্ষণে সেটিকে প্রস্তুত করিয়া সামনে হাজির করিত, ঘোড়ার সম্মুখে ঘাসের আঁটি মেলিয়া ধরিয়া সে ঘোড়ার পিঠে সাদর সশব্দ চাপড় মারিয়া প্রভুকে জানান দিত—যান প্রস্তুত। চিঠিপত্রের দপ্তর বন্ধ হইত, তিনি শহরের দূরপ্রান্তে রোগী দেখিতে বাহির হইতেন। ঘোড়াটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সুযোগ পাইলেই তাহাকে আদর করিতেন, প্রখর রৌদ্রের সময় তাহাকে গাছের ছায়ায় দাঁড় করাইয়া নিজে হাঁটিয়া যাইতেন, ঝড়-বাদলে ঘোড়াকে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিতে না পারিলে স্বস্তি পাইতেন না। ঘোড়াটিও প্রভুর কম অনুগত ছিল না। তাহার প্রভুভক্তির প্রমাণস্বরূপ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রভুর দেহরক্ষার পরেই এই অবলা জীবটি আহার্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এবং অচিরকালমধ্যে প্রভুর অনুগামী হয়। রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি ফিরিতেন, সদ্য-দৃষ্ট রোগীদের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ডিস্‌পেন্‌সারির চেয়ারে বসিয়া অপেক্ষা করিতেন। একে একে ছাত্রেরা আসিয়া জুটিত, তিনি হোমিওপ্যাথি শিক্ষা দিতেন। রাত্রি আটটা পর্যন্ত ক্লাস চলিত। তাহার পর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রিয় গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া শয়ন করিতেন। এইরূপ প্রত্যহ। যতদিন দিনাজপুরে ছিলাম ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, তাঁহাকে অসুস্থ বা অক্ষম কখনও দেখি নাই। আমি যখন পাকাপাকি রকম দিনাজপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় বি. এস-সি. পড়িতেছি, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে অগিল্‌ভি হস্টেলে আছি, তখন তাঁহার দেহ ভাঙিয়া পড়ে। বয়স তখন নব্বইয়ের কাছাকাছি। তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ আনা হয়, কিন্তু কোনও ফল হয় না। তিনি নিজে আগ্রহ করিয়া দিনাজপুরে ফিরিয়া যান এবং সেখানেই ৪ঠা সেপ্টেম্বর চিরশান্তি লাভ করেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রদের সংসারে আজীবন বাস করিলেও তিনি তাঁহাদেরই নিজস্ব ছিলেন না, সকলের আত্মীয় ও প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সেবাকার্যের ব্যয়ভার বহন করিতেন গবর্মেণ্ট, মিউনিসিপালিটি এবং স্থানীয় সহৃদয় জনসাধারণ। সকলের সাহায্যে তাঁহার সেবাকার্য একদিনের জন্যও ব্যাহত হয় নাই।

আমি সময় পাইলেই পণ্ডিত মহাশয়ের পত্রনবিসি করিবার জন্য অপরাহ্ণে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। এই কাজ নরেনের পছন্দমাফিক ছিল না।

পণ্ডিত মহাশয়কে এই প্রত্যক্ষ সেবা পরোক্ষে আমার সাহিত্য-সাধনার সহায়ক হইয়াছিল। বৃহৎ বৃহৎ হৃদয়বিদারক মর্মান্তিক চিঠিগুলি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতাম, তিনি মোদ্দা জবাবটা সংক্ষেপে বলিয়া দিয়া সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিতেন, আমি বানাইয়া গুছাইয়া জবাব লিখিতাম। পথ্য ও ঔষধের নাম লাঞ্ছিত হইলেও তাহা ছিল রীতিমত বিদ্যালয়ের কম্পোজিশন ও এসে-রাইটিং-এর সাধনা। এই সময়ে পণ্ডিত মহাশয় বহু বিচিত্র ঘটনার কথা, সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কথা, শাস্ত্রের কথা অতি সরসভাবে বলিতে থাকিতেন। ছাপা পুস্তকের অতিরিক্ত এই শিক্ষা আমার সাহিত্যিক ও ব্যবহারিক জীবনে বহু উপকারে লাগিয়াছে। মাঝে মাঝে তাঁহার নিকটে কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা প্রচারকেরা আসিতেন, তাঁহাকে দর্শনেচ্ছু অন্য সাধু ব্যক্তিদেরও সমাগম হইত। বহু সৎপ্রসঙ্গ আলোচিত হইত, আমরা শুনিতাম। মেথরাণীদের তিনি সর্বদা জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী মা বলিতেন; কুৎসিত-ব্যাধিগ্রস্ত দুশ্চরিত্র পুরুষেরও চারিত্রিক সংযমের তারিফ করিয়া বলিতেন, ইনি ইচ্ছা করিলে ইহা অপেক্ষাও তো খারাপ হইতে পারিতেন! শুনিয়া আমরা কখনও হাসিতাম, কখনও বিস্মিত হইতাম। তাঁহাকে কখনও ক্রুদ্ধ ও ধৈর্যহীন হইতে দেখি নাই, জোরে কথা বলিতেও শুনি নাই। তাঁহার চিত্তের প্রশান্তি ও স্থৈর্য কিছুতেই বিচলিত হইত না, চরমতম দৈহিক ক্লেশও তাঁহার মুখে রেখাপাতমাত্র করিতে পারিত না। যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, যে সাধনা ও তপশ্চর্যা তাঁহার জীবনকে এই ভাবে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহার বিশদ ইতিহাস কেহ লিপিবদ্ধ করে নাই। যে অসাবধানী অথচ সৌভাগ্যবান মানুষদের সংসর্গে তিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার কথামৃত ধরিয়া রাখিতে যত্নবান হন নাই, কালের বিপুল প্রবাহে সে সকলই আজ হারাইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহার আদর্শে তাঁহারা সকলেই কিছু না কিছু অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন সৌভাগ্য-শালীদের একজন। আমি সেই কিশোর বয়সেই তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার অব্যবহিত পরে নিতান্ত অপটু হাতে একটি প্রশস্তি লিখিয়াছিলাম। ছন্দ ও রবীন্দ্রপ্রভাবের দোষ যাঁহারা ধরিবেন না, তাঁহারা ইহার মধ্যেই অবোধ বালকের দৃষ্টিতে সেই মহৎ মানুষটিকে দেখিতে পাইবেন।—

ভুবন মোহন কর তোমরাই হে মহাপুরুষ,
নহে তারা সুবর্ণ-কিরীটী শোভে মস্তকে যাদের।
ভুবনমোহন তুমি, নাহি জানি কোন্ মহাক্ষণে

কোন্ স্বর্গলোক হতে পাপতাপ-ভরা এ ধরায়
অবতীর্ণ হ'লে আসি, বিতরিলে করুণা অপার
অভাগা পতিত দলে। কর্মযোগী তুমি, ডুবে আছ
মহাকর্ম-সমুদ্রের মাঝে, ঊর্ধ্বে দেবতার পানে
আছে তবু চিত্ত স্থির তব। শুনি নাই কভু, তুমি
কর্মমাঝে আত্মহারা হয়ে তাঁহারে করেছ হেলা
কর্ম যাঁর অভিপ্রেত, সুখে-দুঃখে আহারে-বিহারে
প্রতি পলে প্রতি দণ্ডে প্রতি মুহূর্তেতে জপিতেছ
মুখে প্রিয় নাম, কর্মফলস্পৃহা ত্যজি, অবিরাম
তাঁরি পদে সঁপিতেছ জীবনের অর্জিত গৌরব।
আপনার শান্তিসুখ হে সন্ন্যাসী, দিলে বিসর্জন
নিবারিতে দুঃখশোক তাপিত জনের। না করিলে
ভীষ্মসম দারপরিগ্রহ। পূজিলে আজন্মকাল
মাতৃজ্ঞানে রমণী জাতিরে। তুমি চাও পারে যেন
এই ভ্রষ্টজাতি ধর্মরূপ বর্মমাঝে লভিবারে
পরম আশ্রয়। ঘৃণা নাহি করি' পতিত-অন্ত্যজে
বুঝে যেন এরা সার—মানুষের কর্তব্য মহান
স্নেহ করা তাপিতেরে, প্রেম করা দীনহীনজনে।
ভুবনমোহন তুমি, যশ চাহ নাই এ ভুবনে
একাকী নীরবে শুধু করিয়াছ দুঃস্থজনসেবা,
তোমারে প্রণমি' করি এ প্রার্থনা দেবতার কাছে—
তোমার আদর্শ যেন ঠাঁই পায় প্রতি ঘরে ঘরে।

আমার এই সামান্য জীবনে মানুষের মহত্তম প্রকাশ আমি তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে পাইয়া আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। নরেন্দ্রমোহন ও ভুবনমোহন এই দুইজনের মোহন স্মৃতি দিনাজপুরে আমার বাল্য ও যৌবনপ্রবাসকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে, আমার সাহিত্য-জীবনের সঙ্গেও এই স্মৃতি কম জড়িত নয়।

সপ্তম তরঙ্গ

আলো-আঁধারি

কোনও পাকাপোক্ত গৃহিণীকে যদি সামান্য কয়েক ঘণ্টার নোটিশে দীর্ঘদিনের জন্য বিদেশে যাইতে হয়, তাঁহার অভ্যস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও সেখানে গিয়া তিনি যেমন নারকেল-কুরুনি বঁটি, ফুলবড়ি অথবা মুড়িতে মাখিয়া খাইবার গোটা-ভাজার অভাবে করাঘাত করিয়া আপন ললাটকে স্মৃতিভ্রংশ-দোষে ধিক্কার দিতে থাকেন, আমারও সেই অবস্থা হইয়াছে। আসলে উভয় ক্ষেত্রে দোষ স্মৃতির নয়, দোষ তাড়াহুড়া করার। যথোপযুক্ত প্রস্তুত হইয়া পথে বাহির হওয়া হয় নাই, স্মৃতিশক্তি মাঝে মাঝে অসহযোগ করিয়াছে, ফলে অনেক অতিপ্রয়োজনীয় বস্তু অর্থাৎ কাজের কথাও ফেলিয়া যাইতে হইয়াছে। একে একে তাহা মনে পড়িতেছে। ভুল-ভ্রান্তিও ঘটিয়া যাইতেছে। ফেলিয়া-আসা একটা কথা স্মরণে তুলিয়া ধরিলেন আমার প্রায় চল্লিশ বছর আগের হারানো বাল্যবন্ধু—পাবনা-জিলা-স্কুলের ক্লাস সিক্স-সেভেনের সহপাঠী অয়স্কান্ত বক্সী, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহু-প্রশংসিত নাটক 'ভোলা মাস্টারে'র লেখক। সেদিন পথে হঠাৎ দেখা। তিনি বলিলেন, দিনাজপুর-জিলা-স্কুল-ম্যাগাজিনেই তোমার সম্পাদক-কাজের হাতেখড়ি—এ কথা সত্য নয়। তুমি পাবনা-জিলা-স্কুলেই একটি ম্যাগাজিন সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলে, আগাগোড়া তোমারই হাতের লেখায়। ঘটনাটা মনে পড়িল বটে, কিন্তু সে সেলেটের লেখা কালের ফুৎকারে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। এইরূপ তথ্যের ভুল সংশোধন করিতে আমি বাধ্য।

'জীবন-জলতরঙ্গ' বা 'আত্মস্মৃতি' প্রথম "পরিচয়"-অধ্যায় লেখার পর, ৪ঠা জানুয়ারির (১৯৫২) "দিনলিপি"তে লিখিয়াছিলাম—

"দ্বিতীয় তরঙ্গ কোথা হইতে আরম্ভ করিব? নানা রকমের চিন্তা মাথায় আসিতেছে। যদি আমার সম্পূর্ণ অন্তর্জীবন ভবিষ্যৎ কালের জন্য তুলিয়া রাখিয়া যাই অর্থাৎ আমি না থাকিলে তাহা যদি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে আমার বুদ্ধি ও মনের বিকাশের সঙ্গে দেহধর্মেরও ক্রমপরিণতি দেখানো প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানেই মাসে মাসে ধারাবাহিক ভাবে যদি এই জীবন সাধারণের গোচরে আসে তাহা হইলে এই শেষের ইতিহাস গোপন রাখিতে হইবে। শুধু কাব্যজীবন, কেমন করিয়া আমার জীবন-বীণার তারে বাহিরের আঘাত লাগিয়া সুরের ব্যঞ্জনা জাগিল, ধীরে ধীরে ছন্দায়িত হইল আমার মনের ভাব—সেইটুকুই লিখিতে পারিব। আমার মনে হয়, তাহা করাই

সমীচীন। রবীন্দ্রনাথ তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কবিরা আগাগোড়া সমস্ত উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন—যৌনজীবন ও সাহিত্য-জীবনকে তাঁহারা তফাত করেন নাই। আমি যখন 'অজয়' লিখি (১৯২৭-২৮) তখন সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিন্তু 'অজয়' উপন্যাসের আকার লইয়াছিল, সত্য ইতিহাস হইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং তাহা আরম্ভেই খণ্ডিত হইয়াছিল, ইঙ্গিতমাত্র দিয়া আমাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল। আজ পঁচিশ বৎসর পরে আবার সেই সমস্যাই উঠিতেছে। যৌবনের বিপুল প্রাণধর্ম সত্ত্বেও তখন যাহা সত্যের মুখ চাহিয়াও করিতে পারি নাই, আজ তাহা করিব কেমন করিয়া? সুতরাং কাব্য ও জীবন দুই ভাগে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করিতে হইবে। একটি আপাতত প্রকাশিতব্য, অন্যটির প্রকাশ মুলতুবি থাকিবে।"

তবে একটা কথা স্বীকার করিতেই হইবে। আদি-রস বা "লিবিডো"র উত্তাপ বা ভাবনা ছাড়া পৃথিবীর কোনও শিল্পীর জীবন সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, সাহিত্য-শিল্পীর জীবন তো নয়ই। ইহার প্রকাশ কোথাও উদ্দাম, কোথাও সংহত; সংহতি যত বেশি, শিল্পীর সাহিত্য-জীবনের প্রভাব ও পরিমাণ তত বেশি। সুতরাং সাহিত্যিকের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন যৌনজীবন কদাচ উপেক্ষণীয় নয়। যাঁহাদের হাতে লেখনী, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই নিজেদের ক্যাসানোভা অথবা শুকদেব করিয়া তুলিতে পারেন, সকল কাহিনীর তথ্যগত মর্যাদা আমরা ইচ্ছা করিলে না দিতেও পারি; কিন্তু এ কথা না মানিয়া উপায় নাই—একজন কালিদাস, একজন শেক্সপীয়র, একজন গ্যেটে অথবা একজন শেলী, একজন কীট্‌স, একজন রবীন্দ্রনাথ—প্রত্যেকেরই সাহিত্যপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরালে রক্তে-মাংসে-গড়া মোহিনী—এক বা একাধিক আছেনই, জীবনদেবতা বা "ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বিউটি" থাকুন আর নাই থাকুন। বায়রন, অমরু, ভর্তৃহরি এবং আরও অনেকে এই বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করেন বলিয়াই স্থূল; এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ক্রীশ্চিনা রসেটির মত বহু মুখচোরা পুরুষ-কবি আত্মগত থাকিয়াই সূক্ষ্ম। স্থূল বা সূক্ষ্ম তাঁহারা যাহাই হউন, যৌনপ্রেমের অপবিত্র অথবা পবিত্র স্পর্শ সর্বত্রই বিদ্যমান—কোথাও চেতন, কোথাও অবচেতন। মোট কথা, রূপান্তরিত "লিবিডো"ই, শুধু সাহিত্যের নয়, সকল শিল্পসৃষ্টিরই প্রাণ।

সাহিত্যিকের গর্ব লইয়া আমি যখন আত্মস্মৃতি লিখিতে বসিয়াছি, এই একান্ত দেহসংস্কার বা প্রাণধর্মের অতীত আমি নহি তাহা বলাই বাহুল্য। ফলাও করিয়া লেখার মত কাহিনীও আমার জীবনে অনেক আছে, কিন্তু

তাহা আমার সাহিত্য-জীবন-জলতরঙ্গের উর্ধ্ব বা দৃশ্যমান সমতলের সামগ্রী নহে, অতি গভীর নিম্নস্তরে তাহা আজ সুধীরে প্রবাহিত। উদ্দাম আবর্তের কাল কাটিয়া গিয়াছে, এখন চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে উপরে টানিয়া তুলিবার প্রয়োজনও অনুভব করিতেছি না। প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যিক-শিল্পী-সমাজে এই আদিম জৈবসংস্কারকে সামঞ্জস্য-হীন বা বি-সম ভাবে অর্থাৎ অত্যন্ত মোটা করিয়া ধ্যাবড়া রঙে প্রকট করিবার একটা দুষ্প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছিল। তাহার ঢেউ যথাকালে আমাদের বাংলা-সাহিত্যেও লাগিয়াছিল। ফলে যে রূঢ় তাল-ঠোকা বিকৃতি প্রকাশ পাইয়া-ছিল, তাহার প্রতিবাদেই আমি বিজ্ঞানের ছাত্রজীবন হইতে সাহিত্যের ভোজপুরী জীবনে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। যে পথ বাছিয়া লইয়া-ছিলাম, তাহার জন্যই কালধর্মকে অর্থাৎ যৌনপ্রবণ আত্মপ্রকাশ-পদ্ধতিকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলাম। সুতরাং সেদিন যাহা প্রকাশ করিবার স্বাভাবিক সুযোগ ছিল, তাহা জীবনের গভীরে তলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মানুষের জীবন-সংস্কার বা প্রাণধর্ম যে তাহার যুক্তি-আদর্শ অপেক্ষাও প্রবলতর ও শক্তিশালী, তাহা প্রমাণ করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে কবিতার আকারে মাঝে মাঝে দেহধর্ম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'রাজহংসে'র "পান্থ-পাদপ" কবিতাটি এই জাতীয় নানা ইঙ্গিতে পূর্ণ। দিনাজপুরের স্মৃতির সঙ্গে আমার যৌন-জীবনের উন্মেষ-কাহিনী জড়িত। আমার স্মৃতির ছায়াছবি-পর্দায় সেদিনের সেই অবোধ কিশোরের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নবজাগরণ কি মূর্তি ধরিয়াছে, "পান্থ-পাদপ" হইতে সেইটুকু মাত্র দেখাইয়া আমি এই নিষিদ্ধ কথা বন্ধ করিব। সাহিত্য ও শিল্পজীবনের রসদ বহু নিষিদ্ধ স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, বহু সহৃদয় ব্যক্তি বহুভাবে আমার প্রাণধারাকে পুষ্ট করিয়া-ছেন, দেওয়া-নেওয়ার সেই বিচিত্র ও ব্যাপক কাহিনী আপাতত মুলতুবি রাখিয়া আরম্ভের নমুনাটুকু মাত্র পরিবেশন করিতেছি—আজ ইহা নিতান্ত হাস্যকর ছেলেমানুষির মত শুনাইলেও আমার অন্তর্জীবনের উন্মেষে এই ঘটনা কম প্রভাব বিস্তার করে নাই :

> মনটারে সাদা পরদা বানায়ে স্মৃতির আলোকে দেখি,
> কত ছায়াছবি ভেসে ওঠে পর্দায়—
> মনের কবরে একটি একটি চলিয়াছে শবাধার,
> জীবনে তাহারা থাকে নাই বেশি দিন।
> স্মৃতির এ শোভাযাত্রায় তারা বিলম্ব নাহি করে।

কারো সাথে কারো নাহি কোনো যোগ, শুধু চলে সারি সারি—
আমারই খেয়ালে দ্রুত কি বিলম্বিত।
প্রখর রৌদ্রে মধ্যদিনের দাহে—
প্রভাতে যখন দিবসের কাজ শুরু,
সে স্মৃতি-খেলায় নাহি মোর অবকাশ।
রজনী যখন আঁধারিয়া আসে, গগনে ঘনায় কালো,
দূরে কোথা শুধু প্রহরী পেচক জাগে,
মেঘে মেঘে যবে ধূসর আকাশ আলো আবছায়া হয়,
অবিরল ধারে আকাশের ধারা ঝরে ;
একাকী আমার বাতায়নে বসি—মন-বাতায়নে সখী,
স্তব্ধ পুলকে দেখি চলিয়াছ সবে—
কারো চেনা শুধু সিঁথির সিঁদুর, কারো গুণ্ঠনখানি,
কারো চেনা শুধু কণ্ঠের কালো তিল,
শাড়ি পরিবার ভঙ্গিটি শুধু কারো লাগে চেনা-চেনা,
কেহ ধরা দাও পিছন ফিরিয়া চেয়ে—
পথে যেতে যেতে ক্ষ'য়ে মুছে গেছে চরণে অলক্তক।
চেয়ে চেয়ে মোর ঝাপসা হয় যে আঁখি।

সব চ'লে যায়, তুমি শুধু সখী, দাঁড়াও কি যেন ছলে,
তোমারে দেখেছি কাঞ্চন-নদীতীরে।
ফুলের ফসলে ভরা সাজিখানি ছিল না দখিন হাতে,
বাম হাতে নাহি ছিল লীলা-শতদল।
তুমি ছিলে আর ছিল বালুচর, মাছরাঙা উড়ে উড়ে
খরদৃষ্টিতে দেখে আর দেখে শিশু-মৎস্যের খেলা ;
ওপারের বন ঝাপসা হইয়া আসে।
কিছু মনে নাই, মনে আছে শুধু সীমাহীন পটভূমি,
সাঁকোর উপরে চলে আলোকিত ট্রেন।
তুমি আর আমি—তারপরে ছবি, নগরীর ধূলি-ধোঁয়া,
বালিগঞ্জের পথে ছুটে চলে ভাড়াগাড়ি একখানা,
রঙিন-শাড়ির বিজলি-ঝলক-রেখা,
অতি সুমধুর কলহাস্যের ধ্বনি,
তারপরে মনে নাই।

তবু আজো সখী, কেন নাহি জানি রয়েছি প্রতীক্ষায়,
কিশোর মনের তুমিই প্রথম প্রেম।

প্রথম প্রেমের সেই শীতল স্নিগ্ধতা কবে যে ধূমায়িত হইয়া অগ্নিদহন-জ্বালায় লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে, চপলচটুল গিরি-নির্ঝরিণীই কখন যে খরমরু-বালুতাপে শুকাইয়া গিয়া নিষ্ঠুর মরীচিকার রূপ ধরিয়া অসহায় পথিককে ছলনা করিয়াছে, সে কাহিনী যেমন কৌতূহলপ্রদ তেমনই চমকপ্রদ। কিন্তু বাহিরের কৌতূহল ও চমক ছাড়াও অন্তর-গভীরে ইহারা কম সুফলপ্রদও হয় নাই— আমার কাব্যজীবন সেই ফলভারে আনত হইয়া পড়িয়াছে। আমি অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছি—

ভাটায় যখন টানছে আমায়
সাতসাগরের পাকে,
জোয়ার এসে হাতছানিতে
বাঁকে বাঁকেই ডাকে।
মরণ বলে, দিন ফুরালো,
জ্বাল্ রে এবার মনের আলো ;
জীবন বলে, চাঁদ উঠেছে
দেখ্ রে বনের ফাঁকে।
বিবাগী কয়, জড়াস নে আর
এ সংসারের জালে ;
ভোগী দেখায়, ফুটেছে ফুল
কৃষ্ণচূড়ার ডালে।
সন্ধ্যা হ'ল সন্ধ্যা হ'ল,
হাঁকছে মরণ, তল্পি তোল ;
জীবন বলে, পাত্ রে আবার
বাসর-শয্যাটাকে।

এই ছায়ান্ধকার প্রসঙ্গ এই পর্য্যন্ত।

বাঁকুড়া-কলেজ-হস্টেলের নোটিশবোর্ড-কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ বহুদিনের মানসিক নিষ্ক্রিয়তা-ব্যাধি যেন মায়ামন্ত্রবলে দূর হইল ; যৎসামান্য খ্যাতির সুযোগও মিলিয়া গেল। পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলে নিদারুণ ঝড়-বৃষ্টিতে আক্রান্ত উদ্বাস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের আর্তনাদ উঠিল—রিলিফ চাই।

সমগ্র ওয়েস্‌লিয়ান মিশনরী কলেজ ভিক্ষায় বাহির হইবে, গান চাই। সঙ্গে সঙ্গে গান বাঁধিয়া দিলাম। প্রথম কয়েকটি লাইন মনে আছে—

ওঠ জাগো ভাই, শোন হাহাকার
ফাটিছে গগন পূব-বাংলার—
ঘরদোর গেছে, জোটে না আহার,
ডুবিল তাহারা ডুবিল।
এল কি ঝঞ্ঝা করাল ভীষণ
গৃহহারা হ'ল কত গৃহীজন···

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া খ্যাত থার্ড ইয়ারের শ্রীবিনয়কুমার সেন (অধুনা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পরিবহন-সহসচিব) কর্তৃক সুর যোজিত হইল; হারমোনিয়ম সহযোগে কলেজের ফোর্থ-ইয়ার থার্ড-ইয়ারের ধাড়ী-ধাড়ী ছেলেরাও আমার সেই গান উচ্চকণ্ঠে প্র্যাকটিস করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইল। কলেজের প্রিন্সিপাল আর্থার এডওয়ার্ড ব্রাউন সঙ্গে চলিলেন। তিনি বাঙালীর মত বাংলা বলিতে পারিতেন। তিনিও গান ধরিলেন। সদ্য-কলেজপ্রবিষ্ট আমি, আমার মনের বিচিত্র অনুভূতি অনুমেয়। আত্মপ্রত্যয় চট্‌ করিয়া বাড়িয়া গেল, নিজের লেখা গান উচ্চকণ্ঠে সকলের সঙ্গে গাহিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। হস্টেল-সংলগ্ন দীঘিতে সোল্লাসে সকলে মিলিয়া সাঁতার কাটিয়া স্নান করিলাম। পূতপবিত্র মনে ঘরে আসিয়া প্রায় গীতা-ভাগবৎ পাঠের ভঙ্গিতে 'বলাকা' হইতে পাঠ করিলাম—

"দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—"

কিন্তু সুদূর ইউরোপের রণক্ষেত্র অথবা বাংলার প্রত্যন্ত কুমিল্লা-নোয়াখালি হইতে ভাসিয়া-আসা মৃত্যুর গর্জন নয়, এক বিচিত্র মুক্তপক্ষ ছন্দের ঝঙ্কার আমার চিত্তকে আবিষ্ট করিল। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের চরণে চরণে

নিগড়বদ্ধ একঘেয়ে পয়ারের পর মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের শৃঙ্খলমুক্ত মেঘগর্জন আমার মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে নাই, কারণ অতি শৈশব হইতে কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত সে ছন্দ আমার অধিগত ছিল, প্রায় সহজাতও বলিতে পারি। ঈশ্বর গুপ্তের যুগের কাব্যপাঠকদের চিত্তে মধুসূদন হঠাৎ আবির্ভাবের যে চমক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতি-পরিচয়ের দরুন সে চমকভোগের সুযোগ ও অবকাশ আমাদের কালের পাঠকদের ছিল না; চৌদ্দ অক্ষরের চরণ ডিঙাইয়া আমরা অতি সহজেই ভিন্ন চরণে পদপাত করিতে শিখিয়াছিলাম, মিলও আর আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যদিও 'রাজা ও রাণী,' 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা'য় মধুসূদনের নাগাল ধরিতে পারেন নাই, সুকৌশলী সেনাপতির মত তিনি চরণ-উপচানো পয়ারে মিলের বন্ধন যোজনা করিয়া "বিদায়-অভিশাপ," "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ," "গান্ধারীর আবেদন" প্রভৃতি কবিতাকে যে ভাবে ব্যূহবদ্ধ করিলেন, তাহাতে মধুসূদনের মহড়া লওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ হইল; এই পদ্ধতির চরম করিয়া ছাড়িলেন 'বলাকা'য়, মিল বজায় রাখিয়া চৌদ্দ অক্ষরের খাঁচাটা তিনি ভাঙিয়া দিলেন। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর অবগাহন-স্নানান্তে আমি যেন সহসা ছন্দবোধের বরলাভ করিলাম। আমার কাছে—

> "মনে হ'ল এ পাখার বাণী
> দিল আনি
> শুধু পলকের তরে
> পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ,
> পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
> তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
> মাটির বন্ধন ফেলি
> ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
> আকাশের খুঁজিতে কিনারা।"

অর্থের বা ভাবের দিক দিয়া এই সুবিখ্যাত পংক্তিগুলি সেদিন ততখানি পুলকের সৃষ্টি করিতে পারিল না, যতখানি করিল ছন্দের দিক দিয়া। আমি এক পরম রহস্যের সম্মুখীন হইলাম। অবিলম্বে রহস্য গভীরতর হইল 'পলাতকা'য় —যখন পড়িলাম :

> "বয়স ছিল আট
> পড়ার ঘরে ব'সে ব'সে ভুলে যেতেম পাঠ।

জানলা দিয়ে দেখা যেত মুখুজ্যেদের বাড়ির পাশে
একটুখানি প'ড়ো জমি, শুকনো শীর্ণ ঘাসে
দেখায় যেন উপবাসীর মতো।"

এই আকস্মিক আবিষ্কারই আমার জীবনে অপ্রত্যাশিত বরলাভের সামিল হইল, যাহার পূর্ণ প্রকাশ 'রাজহংসে' এবং 'মানস-সরোবরে'। সূত্রপাত সেই দিন সেই সন্ধ্যায়। ছিন্ন বসনের মত লঘু মেঘখণ্ডের অন্তরাল হইতে চন্দ্রমা সেদিন নিখিল বিশ্বের মনোহরণ করিবার জন্য জ্যোৎস্নার জাল বিস্তার করিতেছিল। আমাদের হস্টেল-সংলগ্ন দীঘির জলে তাহার প্রতিবিম্ব যে মায়া বিস্তার করিয়াছিল, বিজ্ঞানের ছাত্র হইলেও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিবার শক্তি আমার ছিল না। সঙ্গীরা অনেকেই একে একে আড্ডা দিবার লোভে আমার ঘরে ঢুকিয়া "আমার ভাব লাগিয়াছে" দেখিয়া আমাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেল। আমি খাতা-পেন্সিল লইয়া লিখিতে বসিলাম। কি লিখিয়াছিলাম, তাহা হারাইয়া না গেলেও আজ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। এই কবিতাটি সম্বন্ধে এই কথাটিই সত্য যে, একটি সুবৃহৎ রবীন্দ্র-বন্দনারূপে 'বলাকা'র ছন্দে ইহা আমার নব কাব্যাভিযানের প্রথম পদক্ষেপ—বাঁকুড়া-কলেজ-হস্টেলের দোতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরে আমি নিভৃতে অসমসাহসিকতার সঙ্গে এই পদক্ষেপ করিয়াছিলাম ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

এই ধাক্কায় পর-বৎসরেই বহু ছোট বড় গীতিকবিতার সঙ্গে "বর্ষাযাপন" নামক একটি দীর্ঘ গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলাম, ইহার কেন্দ্রগত চরিত্র কবি—আমি স্বয়ং। আমার সাহিত্য-খ্যাতি যদি কোনদিন আমার রচিত আবর্জনাকেও মূল্যবান করিয়া তুলিতে পারে, সেদিন "বর্ষাযাপনে"র রস বাঙালী পাঠক উপভোগ করিবেন। আজ তাহা যাপ্য হইয়াই থাক্।

ঠিক এই সময়েই একটি উদ্দেশ্যমূলক গীতি-নাট্য আমাকে রচনা করিতে হইয়াছিল, কলেজ-হস্টেলের এক ভোজে ডাইনিং-হলে অভিনীত হইবার জন্য। অষ্টাশি জন বোর্ডার একসঙ্গে বসিয়া খাইতে পারে এত বড় হল। অভিনেতা ও গায়ক আমরাই। হস্টেলে তখন দুই দল, প্রকাশ্যে বাচনিক এবং গোপনে চোরাগোপ্তা লড়াই চলিতেছে। বিবাদের মূল কারণ এক দল টিকিওয়ালার ছুঁৎমার্গ ও গোঁড়ামি, ডাইনিং হলেই যাহা সর্বাধিক প্রকট। আমরা উচ্ছৃঙ্খল, অনাচারী—দলে ভারী। নাটিকাটির নাম দিয়াছিলাম "টিকি ও টাকা"—'বলাকা'র ছন্দে ন্যারেশন বা বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে গান, গানই সংখ্যায় প্রচুর। সামান্য রিহার্সাল দিয়া আমরা ভোজের রাত্রে প্রায় অ্যাটম বোমার

মত ফাটিয়া পড়িলাম। অভিনয় ও গানের চাইতে হল্লা এত বেশি হইল যে, প্রিন্সিপাল ব্রাউন পর্যন্ত তাঁহার অদূরবর্তী কুঠি হইতে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, হস্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুনার তো তৎপূর্বেই চেঁচাইয়া গালি দিয়া ঘায়েল হইয়াছিলেন। তিনি মিনমিনে মেয়েলী প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু ব্রাউন —একেবারে সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ। গাঁক গাঁক করিয়া এমন ধমক দিলেন যে, এক নিমেষে সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটিয়া গেল, আমরা পরম পরিতৃপ্তির সহিত গাণ্ডেপিণ্ডে পোলাও-মাংস সাবাড় করিয়া দিলাম, মাঝরাত্রে আবার রান্না চড়াইতে হইল।

যদিও মিস্‌ফায়ার হইয়া গেল, এই "টিকি ও টাকা" হইতেই আমি প্রথম অনুভব করিলাম যে, ব্যঙ্গে বা স্যাটায়ারে আমি মর্মান্তিক হইতে পারি। অর্থাৎ আর একটা অস্ত্র যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। ইহার প্রয়োগ যদিও আরও পাঁচ-ছয় বৎসর পরে 'শনিবারের চিঠি'তে সার্থকভাবে শুরু হইয়াছিল, অস্ত্রটি হাতে পাওয়া মাত্র তাহাতে গোপনে গোপনে শান দিতে থাকিলাম এবং কোনও উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই আই. এস-সি. পরীক্ষা দিয়া চিরদিনের জন্য বাঁকুড়া ত্যাগ করিলাম।

অষ্টম তরঙ্গ

কলিকাতা

পরীক্ষা দেওয়া এবং পাসের খবর পাইয়া কলিকাতার স্কটিশ চার্চেস কলেজে ভর্তি হওয়ার মধ্যে পিতার কর্মস্থল দিনাজপুরে দীর্ঘ চারি মাসের নিশ্চিন্ত অবকাশ মিলিল। পণ্ডিত মশায়ের সেবা এবং রতনের সাহচর্য এই কালকে ভরিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং সরস্বতীর শরণাপন্ন হইতে হইল। নকলে এবং ছাপায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য উপন্যাস অনেকগুলি অধিকারে আসিয়াছিল। দিনাজপুরের বন্ধু অবনীকান্ত বসুর (এখন মৃত) কৃপায় এইবারে 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' প্রথম সংস্করণ (প্রকাশকাল যথাক্রমে ২৫ ও ২৮ জুলাই ১৯১২) আয়ত্তে আসিল। আয়ত্ত সকল অর্থে। অপূর্ব বিস্ময়-পুলকে চিত্ত ভরিয়া গেল। এতাবৎকাল মাতৃভাষায় বহু সদসৎ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু একজন লেখকের জীবন ও অলস চিন্তাধারা এমন সাহিত্যের সামগ্রী হইতে পারে, তাহার আভাসমাত্রও তৎপূর্বে পাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' মনে সাহিত্য-অতিরিক্ত অন্য ভাবের সঞ্চার করিত,

চার্লস ল্যাম্বের আত্মগত কথার মর্মগ্রহণ তখনও পুরাপুরি করিতে পারিতাম না। 'জীবনস্মৃতি'তেই সর্বপ্রথম দেখিতে পাইলাম, একজন সাহিত্যিকের জীবন কোরক-অবস্থা হইতে কি ভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার ছন্দসুরময় বাণী উন্মেষ লাভ করিয়া কেমন করিয়া লহরে লহরে সঙ্গীত-তরঙ্গে বিশ্বভুবন ছাইয়া ফেলিতেছে; কি তাহার আয়োজন, কত দিক হইতে কত ভাবে তাহার ক্রমপরিপুষ্টি! যে অগ্নি একদা প্রদীপ্ত তেজে প্রজ্বলিত হইবে, তাহার সমিধ্-সংগ্রহেরই বা কি বিচিত্র সাধনা! কবির অস্ফুট কলগুঞ্জনই 'কড়ি ও কোমলে' শেষ পর্যন্ত বাঁধা পড়িয়া কি ভাবে অর্থময় হইয়া উঠিয়াছে—'জীবনস্মৃতি' তাহারই অপরূপ কাহিনী; 'ছিন্নপত্র' টুকরা টুকরা কথায় কবির অন্তর্গূঢ় জীবনের সরস ইঙ্গিত। নবরহস্যলোকের দ্বার এই দুইখানি গ্রন্থ এই সাহিত্যপথযাত্রীর মনের সম্মুখে খুলিয়া দিল। শুধু বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া নয়, কাগজ-ছাপাই-বাঁধাই-ছবিও অভিনবত্বের পরিচয় বহন করিয়া আনিল; বই দুইখানি আমার মন ও গ্রন্থ-ভাণ্ডারের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী আসন লাভ করিল।

কিন্তু ইহারাও আমার দীর্ঘ অবকাশ-রঞ্জনের পক্ষে যথেষ্ট হইল না। যৌবনের উদগ্র কামনাতুর মন তখন অন্য খাদ্যের জন্য লালায়িত। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র তারকনাথ শিবনাথ রবীন্দ্রনাথ নয়, কাব্যে মধুসূদন রঙ্গলাল বিহারীলাল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথও নয়, মহাজনপদাবলী মঙ্গলকাব্য ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তও নয়,—আরও কিছু, অন্য কিছু। হুতোমের 'নক্শা' পড়া হইয়া গিয়াছে, দীনবন্ধুও পড়িয়াছি, 'কামিনীকুমার' 'চন্দ্রনাথ'ও পড়া; 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' 'মডেল-ভগিনী' 'এই এক নূতন' এবং 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র মধ্যেও আর রস পাই না, বটতলার 'চুম্বনে খুন', 'বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন'ও নীরস মনে হয়—এই অবস্থায় বিলাতী বটতলার দিকে স্বতই লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম। সন্ধানী উপদেষ্টারও অভাব হইল না। রেনল্ডস্-এর 'মিষ্ট্রিজ' হইতে আরম্ভ করিয়া কত যে কদর্য কাগজে ও খুদে-খুদে হরফে প্যারিস-মাদ্রাজ-লাহোর-চন্দননগর হইতে ছাপা বই পড়িলাম, তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়া এ যুগের মার্ক্স-মুগ্ধ তরুণদের মাথা খাইব না। মোটের উপর, দুষ্টা সরস্বতীর কৃপায় ছাপার অক্ষরের পথে 'অনঙ্গ-রঙ্গে' পারঙ্গম হইয়া উঠিলাম। আমার বাণী-সাধনার তিন নম্বর খাতা আগাগোড়া আষ্টেপৃষ্ঠে নানা ইঙ্গিতপূর্ণ কবিতায় এই কালের আদর্শ-বিপর্যয়ের অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। নমুনাস্বরূপ একটি বড় কবিতার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমার মনের সেই সময়কার অবস্থাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। এই

কথা যদি আজ বলি, সেই সময় আমার সহচারী এবং পরে কলিকাতায় আমার সহাধ্যায়ী ও সহবাসী হস্টেল-বন্ধুরা এবং আরও পরবর্তী কালে মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকেরা এই আদিরসাত্মক কবিতাটিকে সবিশেষ তারিফ করিয়াছিলেন, আশা করি আমার অহমিকাকে সহৃদয় পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন। কবিতাটি দীর্ঘ, আমার হাতের লেখায় নয় পাতা, সমগ্রটি আইনের চোখে নিরাপদও নহে। কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিলেই ভাষা ও ছন্দে আমার ক্রমোন্নতির কথঞ্চিৎ পরিচয় সম্ভবতমিলিবে :

কলস কাঁখে বকুলবীথির পথে
বধূ যেথায় আনতে চলে জল,
সাঁঝের কোলে রয় না কেহ সেথা,
আঁধার বিজন বকুলগাছের তল।
আমি রহি সেই আঁধারের মাঝে
দেখি বধূ আপন মনে চলে
ঘোমটা মুখে দেয় না সে তো লাজে
কলসখানি ভাসায় দীঘির জলে।
বসে গিয়ে বাঁধাঘাটের 'পরে,
আঁচল পড়ে জলের তলে লুটি,
বুকের পিঠের কাপড় পড়ে খ'সে
যত্নে মাজে ছোট্ট চরণ দুটি।
আঁধার হতে বাহির হয়ে এসে
আমি ধীরে দাঁড়াই ঘাটের পাশে ;
বধূ করে আপন মনে গান,
কলসীটি তার দীঘির জলে ভাসে।
একটি চরণ স্বচ্ছ জলতলে
জানুর 'পরে আরেকটি পা তুলে
গামছা ল'য়ে ঘষে আপন মনে,
বিশ্বজগৎ সব গেছে সে ভুলে।
কেশের রাশি বাঁধা মাথার 'পর,
স্রস্ত হয়ে বুকের আবরণ
কটিতটে লুটিয়ে এসে পড়ে,
নিরাবরণ দুইটি শ্রীচরণ।

সাঁঝের বাতাস বইতেছিল ধীরে,
কলসীটি তাই ঢেউয়ের তালে নাচে,
বকুল-ডালে একটি কোকিল শুধু
ডেকে কেবল প্রিয়ার দেখা যাচে।
আমি হঠাৎ শুধাই, "ওগো বধূ,
খুলে ফেল তোমার কেশপাশ,
দেহের বসন যাক না গেছে স'রে,
চুল এলিয়ে কর গায়ের বাস।"
চমকে উঠে লজ্জা পেয়ে বধূ
জলের মাঝে চকিতে দেয় ঝাঁপ,
পাষাণঘাটে বসন মরে কেঁদে,
কাটল বুঝি জলের মনস্তাপ!
আবার বলি, "লজ্জা তোমার কেন,
আঁধার দেখ এল নিবিড় হয়ে,
হেরি শুধু চোখের আলো তব—
তাতে তোমার কিই বা গেল ব'য়ে!"
বধূ তখন ক্ষণিক হেসে কয়,
পূবগগনে মৃণাল বাহু তুলে,
"জ্যোৎস্না উঠে আঁধার হবে ক্ষয়
এ কথা কি গেছই তুমি ভুলে?
থেকো না আর ঘাটের পথ জুড়ে,
পথিক, তুমি যাও না আপন কাজে,
রাত্রি ক্রমে ঘনিয়ে আসে ওই
যেতে হবে বকুলবনের মাঝে।"

ইহার পর আরও অনেক আছে, কিন্তু আর নয়; ছন্দ আর কাব্যকৌশল অনুমান করিতে না পারিলেও রসিকজন এই "বকুলবন" কবিতার বিষয়-বস্তু সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন এবং তাহা হইতে আমার তৎকালীন অজ্ঞাতকান্তাবিরহী মনের সকরুণ গুরুবেদনা অনুভব করিবেন।

এই অস্পষ্ট অথচ তীক্ষ্ণ বেদনা লইয়া পাঠ্য-জীবনের শেষকালটুকু যাপন করিবার জন্য ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতায় পদার্পণ করিলাম। ডাকযোগে স্কটিশ চার্চেস কলেজে তৎপূর্বেই ভর্তি হইয়াছিলাম। আসিয়া

পৌঁছিতে একটু বিলম্ব হইল, সুতরাং টমরি-অগিল্‌ভি-ওয়ান-ডান্‌ডাস প্রভৃতি সাধারণ হস্টেলগুলিতে স্থান হইল না ; খ্রীষ্টীয়ান-ছাত্র-অধ্যুষিত অগতির গতি ডাফ হস্টেলই আমাকে আশ্রয় দিল। সেকালের ডাফ হস্টেল একটা বিরাট দৈত্যের মত বিডন স্ট্রীটের উপর দাঁড়াইয়া থাকিত। প্রাসাদোপম অট্টালিকা তেমনই আছে, কিন্তু সামনে-পিছনে নূতন সংযোজনের ফলে ইহার ভয়াবহতা অনেকখানি দূর হইয়াছে। আমি দিনাজপুর হইতে মনসিজ-লাঞ্ছিত সরস সাহিত্যে পঙ্ক-স্নান করিয়া শুষ্ক ও তৃষিত ক্ষুধিত মাশুল-কালেক্টরের মত পাষাণ-নগরীর বেগম-বাদশাজাদীদের চটুলচপল হাসি নয়—ভূতের অট্টহাস্যমুখর সেই বিপুলায়তন হর্ম্যের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইলাম। যে ঘরে আমাকে থাকিতে দেওয়া হইল, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় তাহাকে বিরাট বলা চলে, পাশাপাশি পাতা চৌকিতে আমরা কয়েকজন শয়ন করিতাম। আমাদের একজন একদিন নিশীথ রাত্রে ভূত দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল—মেয়ে-ভূত। কড়িকাঠে গলায় দড়িবাঁধা অবস্থায় সে নাকি ঝুলিতেছিল ! আমরা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্ক্রীমজার সাহেব সংবাদ পাইলেন, আমাদের নিত্যখাদ্যভাগাপহারক তাঁহার সহকারী হেলিতে-দুলিতে অবিলম্বে দর্শন দিলেন। পুরাতন ইতিহাস শুনিতে শুনিতে আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। বহুদিন পূর্বে উহা মেয়েদের বোর্ডিং ছিল। এক হতভাগিনী প্রেমে ব্যর্থ হইয়া ওই ভাবে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে। সে-ই মাঝে মাঝে দর্শন দিয়া থাকে। ভয় পাইবার কিছু নাই। নানা অজুহাত দেখাইয়া এক এক করিয়া আমার নির্ভীক কক্ষসঙ্গীরা কক্ষান্তরে যাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত আমি একা সেই পেল্লায় ঘরে রহিয়া গেলাম। মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া বহুদিন অন্ধকারে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া ভূত দেখিবার প্রবল চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু একদিন একটি কালো বিড়াল ছাড়া ভয় পাইবার মত আর কিছু প্রত্যক্ষ করি নাই। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জোরেই পরবর্তী কালে ভূতবিশ্বাসী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভূতের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া প্রবল তর্ক করিয়াছি ; বলিয়াছি, তেমন সুবর্ণ-সুযোগে যে-প্রেমাতুরা আমাকে একা পাইয়াও দেখা দেয় নাই তাহার জন্ম অলস এবং ভীত মানুষের কল্পনা হইতে। বিভূতিভূষণ ঘোরতর আপত্তি করিতেন, আমাদের আসর জমিয়া উঠিত। কিন্তু সে পরের কথা পরে বলিব।

সেই প্রাচীন ইষ্টকপ্রাসাদ যে এই ক্ষুধিত-পাষাণবৎ তরুণটিকে এমনিই নিষ্কৃতি দিল তাহা নয়। ডাফ হস্টেলের পূর্বার্ধে আমরা থাকিতাম।

পশ্চিমার্ধের দ্বিতল দীর্ঘকাল হইতেই তালাবদ্ধ ছিল। কলেজেরই একজন সাহেব অধ্যাপক প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিতে গিয়াছিলেন, আর ফিরেন নাই। তাঁহার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি সেই দ্বিতলে রক্ষিত ছিল। একেলা দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে পার্টিশনের ওপারে দ্বিতলের ঘরগুলি সম্বন্ধে মনে উগ্র কৌতূহল জাগিত। কি আছে সেখানে, কি যে রহস্য সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে জানিতে হইবে। রহস্যভেদ করিব। একদিন নির্জনতার সুযোগ লইয়া রেলিং টপকাইয়া রহস্যলোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। খড়খড়ির ফাঁক দিয়া হাত গলাইয়া ছিটকিনি খুলিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। হঠাৎ যে ধূলিজঞ্জালের মধ্যে গিয়া পড়িলাম তাহার ধাক্কা সামলাইতেই কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। শুনিয়াছিলাম, অধ্যাপকটি অবিবাহিত ছিলেন। তাহার প্রমাণ মিলিল আসবাবের অপ্রতুলতা দেখিয়া। ধূলিমলিন খানকয়েক বই, একটি বেতের বাক্সে কিছু কাগজপত্র, ফুটবল খেলার বুট, একান্ত পুরুষের ব্যবহার্য টুকিটাকি আরও কয়েকটা জিনিস। রহস্যের কণামাত্র বাহিরের কোথাও নাই—বহুদিনের পুরাতন অসংস্কৃত ধূলিজঞ্জাল ছাড়া। ধূলির আবরণ সরাইয়া বইগুলি দেখিতে দেখিতে চারি খণ্ডে সমাপ্ত রলাঁ্যার 'জন ক্রিস্টোফার' আবিষ্কৃত হইল। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিব, অলস কৌতূহলবশে বেতের বাক্সটি একবার খুলিয়া দেখিলাম। প্রথমেই অতি চমৎকার সিল্কের ফিতায় বাঁধা একতাড়া চিঠি নজরে পড়িল, সেগুলি তুলিয়া লইতেই কয়েকটি ফোটোগ্রাফ ও ক্রীসমাস গ্রীটিংস কার্ড, প্রত্যেকটিতে পরিষ্কার নারী-হস্তাক্ষরে একটি ইউরোপীয় রমণীর সুমধুর সংক্ষিপ্ত নাম। দেওয়ালের অপর পার হইতে এতকাল যে রহস্যের আভাস পাইতেছিলাম, সহসা তাহার সহিত মুখামুখি হইয়া গেল। স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া চিঠিগুলি পড়িতে বসিলাম।

আমার সদ্য-অধীত 'মিস্ট্রিজ অব দি কোর্ট অব লণ্ডন'-এর লেখক রেনল্ডস্ ইংলণ্ডের কোনও শহরের পোস্টমাস্টার ছিলেন এইরূপ শুনিয়াছিলাম; সন্দেহজনক যাবতীয় চিঠিপত্রের রহস্য বেআইনী ভাবে ভেদ করিয়া তিনি তাঁহার গল্প-উপন্যাসের রসদ সংগ্রহ করিতেন; কি জাতীয় চিঠিপত্র সচরাচর তাঁহার ভাগ্যে জুটিত তাহার মোটামুটি আভাস তাঁহার রহস্য-গ্রন্থগুলিতেই পাওয়া যায়। তাঁহার পোস্ট-অফিসকে মধ্যস্থ রাখিয়া যাঁহারা হৃদয়ের কারবার চালাইতেন তাঁহারা নূতন মহাদেশের নূতন মানুষ, আপাতত সভ্য হইলেও রক্তে মাংসে গড়া অতি জীবন্ত দেহসচেতন জীব, বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে বশে আনিলেও স্বভাবসুলভ দেহধর্মকে প্রাচ্যবাসীর মত বুদ্ধ-প্রভাবিত নিবৃত্তিমার্গে

বিসর্জন দিতে পারেন নাই। সুতরাং রেনল্ডস্‌কে কখনও গরম-মসল্লাদার উপকরণের অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। আমিও সেই-দেশীয় এবং সেই-জাতীয় একজন স্বাধিকারপ্রমত্তা কুমারীর প্রেমপত্র ঘাঁটিতেছিলাম, উত্তাপে আমার হাত পুড়িয়া গেল, দেহ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কয়েকটি পত্র এখনও আমার সংগ্রহে আছে। সর্বাপেক্ষা নির্দোষ অংশ যাহা উদ্ধৃত করিতে পারি, তাহা হইতেছে এই :

> "Can you imagine me sitting at a small table in the bedroom in my nightgown and my hair down and my bare feet halfway in slippers writing to my darling little love in old Calcutta ? Why aren't you here now to kiss and cuddle me and to hold me as tight as possible to you, so that our lips meet, our chests, our knees and our feet. Would there be space for my old nightgown ? And your pyjamas ?"

বেতের বাক্সটি এবং চার খণ্ড 'জন ক্রিস্টোফার'সহ পলাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। সেই উদগ্র কামনা-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া শেষ পর্বে একটি সকরুণ বিচ্ছেদ-কাহিনী আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আঘাত দিল। মহাযুদ্ধের তরঙ্গাভিঘাতে একটি পরিপূর্ণ আকাশপ্রাসাদ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। আমি রেনল্ডসের মত উদ্যোগী হইলে এই পত্রগুলির সাহায্যে একটি মনোরম কাহিনী রচনা করিয়া যশস্বী হইতে পারিতাম। আমার দুর্ভাগ্যবশে এগুলি সুফলপ্রসূ হইল না, আমার দেহটাকে নাড়া দিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া দুমড়াইয়া বিপর্যস্ত করিয়া দিল। এই বিপর্যয় আমাকে প্রায় সর্বনাশের মুখামুখি আনিয়া ফেলিল।

ঠিক এই সময়ে একদিন টেবিলে আহার্য-পরিবেশনের ব্যাপার লইয়া হস্টেলের মুসলমান 'বয়'কে বেদম প্রহার করিয়া বসিলাম। মামলা খোদ প্রিন্সিপাল ওয়াট সাহেবের কাছ পর্যন্ত পৌছিল, এবং আমি নিরুপদ্রব আশ্রম-সদৃশ ডাফ হস্টেলকে নিষ্কৃতি দিয়া সেখানকার ভয়াবহ নির্জনতা-প্রসূত কামনাকূপ হইতে নিজেও নিস্তার পাইলাম। অগিল্‌ভি হস্টেলের সুস্থ স্বাভাবিক কোলাহলমুখর যৌবনচঞ্চল পরিবেশে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। 'জন ক্রিস্টোফার' আমাকে দূরবিসর্পী পথের সন্ধান দিল ; গোপাল হালদার, পরিমল রায় (এক নং ও দুই নং), বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত সরকার, গিরিধর চক্রবর্তী, সুধীন্দ্র ঘোষ, অনুকূল লাহিড়ী, উপেন্দ্র রায়,

সুধানলিনীকান্ত দে প্রভৃতি সহবাসী বন্ধুজন তাঁহাদের সাহিত্য-মজলিসে স্থান দিয়া পথভ্রষ্টকে আবার পথের সন্ধান দিলেন।

ডাফ হস্টেলের নিষিদ্ধ দুর্গে রক্ষিত বেতের পেটিকার অভ্যন্তরে সেই দিন যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের হঠাৎ অধঃপাতের কারণ বুঝিতে তাহা আমার সহায়ক হইয়াছিল। জেম্‌স্ জয়েস, ডি. এইচ. লরেন্স, আলড্‌স হাক্সলি, কামিংস, স্পেণ্ডার, অডেন প্রভৃতি নব্যপন্থী সাহিত্যিকেরা দেহধর্মের বিকৃতিকে প্রাধান্য দিয়া পরবর্তী কালে যে সাহিত্য-সৃষ্টিতে তৎপর হইয়াছিলেন, তাহার আদিম প্রেরণার সন্ধান আমি অত্যাশ্চর্য-ভাবে পাইয়াছিলাম। পশ্চিমের বুভুক্ষু মানবীদের নিদারুণ অতৃপ্তিজনিত লালসার উদগ্রতা-বৃদ্ধি এবং যুদ্ধসংক্রান্ত নানা বিক্ষোভে ও বিক্ষেপে পৌরুষের শোচনীয় পতন—ইহাই নানা ভাবে এই কালে ইংলণ্ডীয় সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কন্টিনেণ্টেও অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ঘটে নাই। স্যানিন, ব্রেকিং পয়েণ্ট; এ রুম ইন বার্লিন, উওম্যান অ্যাণ্ড মঙ্ক প্রভৃতি পুস্তকে ইউরোপের এই অধঃপতনের পরিচয় মিলিবে। মোটের উপর মহাযুদ্ধসঞ্জাত যে ভয়াবহ মহামারী ব্যাধি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল, তাহার প্রারম্ভিক সূচনা আমি পত্রাকারে দেখিয়া শুধু লুব্ধ হই নাই, আতঙ্কিতও হইয়াছিলাম। শোচনীয় পরিণাম হইতে আমাকে অংশত রক্ষা করিলেন মনীষী রম্যা রলাঁ্যা 'জন ক্রিস্টোফারে'র গঙ্গাস্নান করাইয়া, অংশত রক্ষা করিলেন অগিল্‌ভি হস্টেলের সাহিত্যরসিক বন্ধুরা, এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ।

ইতিমধ্যে বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় (ভাদ্র ১৩২৭) কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসিল। সত্যেনের সাহায্যে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবকদের সঙ্গে তখন আমি একাত্ম হইয়াছি। ওয়েলিংটন স্কোয়ার অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রধানত সে-যুগের বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীরা লাভ করিলেও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। জ্যোতির্ময়ী গাঙুলীর নেতৃত্বে মহিলা-বিভাগের তদ্বির-তদারকের কাজে আমিও নিযুক্ত হইলাম। আমি মফস্বল হইতে সদ্য আগত এবং কলিকাতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক সাধারণ ছাত্র মাত্র। কিন্তু এই স্বেচ্ছাসেবকের কাজের সুযোগ লাভ করিয়া আমি সপ্তাহকালের মধ্যেই শুধু রাজনৈতিক মহলেই নয়, তদানীন্তন কলিকাতার অভিজাত ও বিদগ্ধ মহলে অল্পবিস্তর পরিচিত হইয়া উঠিলাম। মহাত্মা গান্ধী, অ্যানি বেসাণ্ট, চিত্তরঞ্জন দাশ ও লালা লাজপত রায় প্রমুখ দেশনেতাদের সেবা করিতে গিয়া তাঁহাদের

স্বাভাবিক সভাবহির্ভূত রূপ দেখিলাম, স্বেচ্ছাসেবক-নেতা-উপনেতাদের ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি এবং গোপন ও প্রকাশ্য প্রেমের দ্বন্দ্বে অশোভন ঈর্ষা-হানাহানি দেখিলাম, অতি সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া কার্যক্ষেত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে বিশেষ ও অসাধারণ হইয়া উঠিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম; মোটের উপর সেই সাত দিনের মধ্যেই সাত বৎসরের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আমি লায়েক হইয়া উঠিলাম। কলিকাতা-মণ্ডলীর সম্পূর্ণ বাহিরের লোক হইয়াও আমি যাহা দেখিবার ও শুনিবার সুযোগ পাইলাম, বাহিরের ছেলেদের কদাচিৎ সে সুযোগ ঘটে। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়া গেল। একটা মহৎ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকিবার গর্ব লইয়া আমি আবার হস্টেলের আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলাম, ঠিক আবুহোসেনের মত। হস্টেলের বন্ধুদের কয়েকদিন অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, মনে হইল আমার বাদশাহী ন্যায্য আসন হইতে কে যেন আমাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া পথে বসাইয়া দিল। কয়েক দিন খুব মনমরা হইয়া রহিলাম। যখন আবার আত্মস্থ হইয়া কাছের মানুষদের বন্ধু ও প্রিয়জন বলিয়া চিনিতে পারিলাম, তখন ডাফ হস্টেলের ভূত আমার কাঁধ হইতে সম্পূর্ণ নামিয়া গিয়াছে, অলস মস্তিষ্কে শয়তানের কারখানা চুরমার হইয়াছে এবং আমি আবার সহজ ও স্বাভাবিক হইতে পারিয়াছি। ঠিক সেই অবস্থায় একটা নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ততাও মনের মধ্যে যে অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার প্রমাণ একটি চতুর্দশপদী কবিতায় রক্ষিত আছে দেখিতেছি। আমি সেই মুহূর্তে আর পথের ধূলার, হাটের কোলাহলের মানুষ নই—উচ্চ বাতায়ন হইতে বিশাল সংসারকে প্রত্যক্ষ করিতেছি:

বাতায়নিক

সংসারের বহু উর্ধ্বে বাতায়ন হতে
বিশাল সংসার পানে শান্ত চক্ষে চাহি—
দেখি চলে মানব-প্রবাহ কত মতে
কত পথে, কোথাও বিরাম তার নাহি।
দলিয়া পিষিয়া এরা চলে পরস্পরে,
যন্ত্রণার আর্তস্বর ঢাকে কলরব—
নাহি শান্তি শ্রান্ত-ক্লান্ত বিশ্বচরাচরে
বন্ধনের বেদনায় ব্যথিত মানব।
স্বার্থের জঞ্জালে বদ্ধ পথ দেবতার,
খর্ব ক্ষুদ্র আজ প্রেম স্নেহ ভালবাসা—

প্রতিঘাতে খুলিবে কি হৃদয়ের দ্বার,
রুদ্ধবায়ু প্রবাহিয়া দিবে কভু আশা ?
মুক্তির আশায় আজ ধরা কম্পমান,
বেদনা-বন্ধন হতে লভিবে কি ত্রাণ ?

দেখিতে দেখিতে ১৯২১ আসিয়া গেল। কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এবং তিন মাস পরে ডিসেম্বরের শেষে (পৌষ ১৩২৭) নাগপুর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর যে অসহযোগ-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহাকে কার্যকরী রূপ দিবার জন্য তোড়জোড় চলিতে লাগিল। আমি তখন সংস্পর্শ-সঞ্জাত উচ্চপদবী-আরূঢ়, অন্তরে অন্তরে নেতৃত্বের মহড়া দিতেছি। কলেজের পড়াশুনা প্রায় শিকায় উঠিয়াছে। দুষ্টামি বুদ্ধির নিত্য নব নব উদ্ভাবনা কলেজে পরীক্ষিত হইতেছে। কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া আর কিছু লাভ না হউক, নারী সম্বন্ধে মফস্বলের ছেলের যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ ও সমীহা ছিল তাহা দূর হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখে স্বতই আর মাথা নত হয় না, বাক্য রুদ্ধ হইয়া আসে না; যথেষ্ট সাহস লাভ করিয়াছি, তাহাদের মুখা-মুখি দাঁড়াইয়া চটপট উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে পারি, চপল-চটুলতা প্রকাশেও বাধে না। আমাদের সময়েই সর্বপ্রথম স্কটিশ চার্চেস কলেজে ছাত্রী-সমাগম আরম্ভ হয়। তৎপূর্বে সিটি ও অন্যান্য কলেজে অধ্যাপকদের অন্তরালে খ্রীষ্টান-ব্রাহ্ম-ছাত্রীরা কিছুদিন পড়িয়াছিলেন, শুনিয়াছিলাম। তাহার পর আমাদের সময়েই কলিকাতার কলেজের ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমাদের বি. এস-সি. ক্লাসে অঙ্কে অনার্স লইয়া একজন—বর্মী মাতা ও বাঙালী পিতার সন্তান, এবং আই. এ. ক্লাসে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—দুইজন ছাত্রীকে লইয়া পাঁচ শত তরুণের কৌতূহল-কৌতুকপূর্ণ মাতামাতি শুরু হইল। অর্ধবর্মিনী অতিশয় শান্ত ধীর প্রকৃতির, তাঁহার সহাস্য ধৈর্যের কাছে আমরা পরাজিত হইলাম। বেচারা ইঙ্গ-ভারতীয়া হইল সারা কলেজের টার্গেট। তখনও ঘণ্টায় ঘণ্টায় কক্ষবদলের রীতি ছিল, কোনও নির্দিষ্ট কক্ষে একই শ্রেণীর বরাবর ক্লাস বসিত না। উক্ত মেয়েটির জন্য কলেজের যাবতীয় ছাত্র রুটিন মুখস্থ করিয়া ফেলিল। আমি তাহাকে লইয়া একটা গান বাঁধিয়া বসিলাম। কেমিস্ট্রি ক্লাসে অধ্যাপক বরুণ দত্তের উদারতার সুযোগ লইয়া হাতে হাতে দশ-বারোটি নকল হইয়া গেল। ল্যাবরেটরি ঘরে সুর যোজনা ও প্র্যাকটিস হইল এবং অকস্মাৎ অপরাহ্নে একটি সঙ্কটত্রাণ-ধাঁচের গানের শোভাযাত্রা ক্লাস-পরিবর্তনশীলা বেণী-দোলানো মেয়েটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সারা

হেদুয়া অঞ্চল সচকিত করিয়া দিল। গানটির প্রথমাংশ মনে আছে।—

হঠাৎ আমি বাইরে এসে অবাক চোখে চাহি,
সে যে চমক দিয়ে চ'লে গেল
আমার চোখে নিমেষ নাহি।
দুলিয়ে বেণী চলে আমার আগে
কি ভাব আহা, বুকের মাঝে জাগে
ও তার পায়ে চলার তালে তালে
উঠিনু গান গাহি।

কলেজ তোলপাড়। দেখিতে দেখিতে হোঁৎকা ওয়াট, সুচতুর ধীর স্থির আরকুহার্ট, চুলবুলে কিড্ বড় বাড়ির সিঁড়ির উপরে এবং বিজ্ঞান বিভাগের দ্বারপথে ছাত্রসূদন নিবারণ রায় রাগে গরগর করিতে করিতে দর্শন দিলেন। আমরা কয়েকজন বমাল গ্রেপ্তার হইয়া ফিজিক্স থিয়েটারে নীত হইলাম। "কে লিখেছে, কে লিখেছে" এ প্রশ্নের উত্তর নিবারণবাবু পাইলেন না। তিনি গোটা ক্লাসটাকেই এক টাকা করিয়া জরিমানা করিয়া ছাড়িলেন। সেখান হইতে কেমিস্ট্রি ক্লাসে ঢুকিতে যাইব, বরুণ দত্ত আমাকে পাকড়াও করিয়া বলিলেন, শয়তান, এ তোর কাজ; যা, বেশ করেছিস। আমাদের সেই ভক্তিভাজন সুরসিক সহৃদয় অধ্যাপকের কণ্ঠস্বর যেন আজও শুনিতে পাইতেছি।

এই সহশিক্ষা-ঘটিত সহযোগ আন্দোলনের জের মিটিতে না মিটিতে নূতন ইংরেজী বৎসরের গোড়া হইতেই অসহযোগের প্রবল বন্যায় কলিকাতার ছাত্র-সমাজ ভাসিয়া গেল। আমাদের কলেজের পিকেটিং ইত্যাদির ভার আমি গ্রহণ করিলাম। প্রিন্সিপাল ওয়াটের সঙ্গে ইহা লইয়া একদিন গুঁতাগুঁতি করিয়া এমনই মিথ্যা সোরগোল তুলিলাম যে, সুযোগ বুঝিয়া দেশবন্ধু সি. আর. দাশ হেদুয়ায় ছুটিয়া আসিয়া সভা করিলেন, সংবাদপত্রে ওয়াট সাহেব কর্তৃক "ইন্‌ডিস্‌ক্রিমিনেট কিকিং"এর সংবাদ বিঘোষিত হইল। সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের বেঞ্চে বসিয়া কালো চশমা আঁটা চোখে আমাদের মুখে সে কাহিনী শুনিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ এতই উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন যে, পরের মাসের 'প্রবাসী'তে তাঁহার কটূক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ কবিতা "কোনও ধর্ম্মধ্বজীর প্রতি" (ফাল্গুন ১৩২৭) বাহির হইয়া নির্দোষ ওয়াটকে সারা বাংলা দেশে নিন্দিত ও ধিক্কৃত করিয়া দিল।

ইহারই কিছুকাল পরে বন্ধুবর গোপাল হালদার প্রভৃতির চেষ্টায় হাতের লেখা 'অগিল্‌ভি হস্টেল ম্যাগাজিনে'র একটি সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন

চলিয়াছিল। তাঁহারা জোর করিয়া আমাকে দিয়া পাঁচ-পাঁচটি কবিতা লিখাইলেন, তন্মধ্যে একটি মহাত্মা গান্ধীর উপর ও একটি রবীন্দ্রনাথের উপর। রবীন্দ্রনাথের উপর লেখা কবিতাটি শেষ পর্যন্ত হাতের লেখা পত্রিকার পৃষ্ঠা উপচাইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌঁছিল, এবং আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সৌভাগ্য অর্জন করিলাম।

নবম তরঙ্গ

বোলপুর

অসহযোগ-মন্দাকিনীর প্রথম বন্যা যেমন প্রবল তোড়ে কলিকাতার ছাত্র-সমাজকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, ঠিক তেমনই প্রবল তোড়ে তাহা নামিয়াও গেল ; ঐরাবতরা একে একে আত্মস্থ হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-যূথও। নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ-বিরোধী সি. আর. দাশ মহাত্মা গান্ধীকে সমর্থন ও মাসিক অর্ধ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যারিস্টারি বিসর্জন করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হইয়া বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় যে বিপর্যয় আনিয়াছিলেন, জাতীয় শিক্ষালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নেতৃবৃন্দ তদুপযুক্ত তৎপর হইতে না পারিয়া অসহযোগী ছাত্রদের সহযোগিতা হারাইলেন। কলিকাতায় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং সুদূর আমেরিকা-ইউরোপের প্রবাসবাস হইতে রবীন্দ্রনাথ বারংবার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরোধিতা আত্মঘাততুল্য ; হে ছাত্রগণ, বাহির বিশ্বের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কূপমণ্ডূক হইও না ; আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠুক তবে তোমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্জন করিও, ইত্যাদি। চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্বপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন পার্কে ও স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত সভায় চিত্তরঞ্জন-বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি নেতারা বেকার ছাত্রদের দ্বারা বারংবার আক্রান্ত হইয়া উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। আমরা কয়েক জন একদিন চিত্তরঞ্জনের গৃহে তাঁহাকে গিয়া ধরিলাম, নূতন শিক্ষাব্যবস্থা চাই। সেখানে সেদিন বিপিনচন্দ্র ও সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ উপস্থিত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন স্পষ্ট রূঢ়ভাবে বলিলেন, শিক্ষা অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু স্বরাজ পারে না। তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন, আমি কাল কি খাইব জানি না, তবু বৃত্তি ছাড়িতে দ্বিধা করি নাই ; তোমরাও বৈদেশিক শিক্ষা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া বৎসর খানেক ধীর ও স্থির থাকিলে স্বরাজ অবশ্যম্ভাবী, এবং তখন স্বদেশী শিক্ষাপদ্ধতির চমৎকার ব্যবস্থা হইবেই। অধিকাংশ ছাত্রই

এই ফাঁকা কথায় স্থির থাকিতে পারিল না, প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মুখেই নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম হইয়া প্রায় সকলেই একে একে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। আমিও করিলাম। যে কয়েক জন দৃঢ়চিত্ত যুবক মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-মন্ত্রকে গুরু-মন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা আর ফিরিল না। সংখ্যায় তাহারা কম নয়।

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই প্রত্যাবর্তনের পালা শেষ হইল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাৎ সার্ আশুতোষের সাময়িক দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গেল; নিয়মিত স্কুল কলেজ চলিতে লাগিল। ক্লাস প্রমোশনের জন্য এপ্রিল মাসেই আমাদের একটা বার্ষিক পরীক্ষা হইল; অধ্যক্ষ ওয়াট বিদ্রোহী নেতাকে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। তিনি কিছুতেই আমাকে পরীক্ষায় বসিতে দিবেন না। শেষ পর্যন্ত আমাদের হস্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জে. সি. কিড ও কেমিস্ট্রির অধ্যাপক আমার এখন-পর্যন্ত ভক্তিভাজন শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বিপদ উত্তীর্ণ হইলাম। আসলে ওয়াট সাহেব নিজেও অত্যন্ত ভাল-মানুষ ছিলেন, কাহারও ক্ষতি করিতে চাহিতেন না।

গ্রীষ্মাবকাশ আসিল। অসহযোগ পরিত্যাগের গ্লানি কাটাইবার জন্য আমরা হস্টেলের সকলেই মফস্বলে স্থান পরিবর্তনে গেলাম। বস্তুত, অসহযোগকে একটা পবিত্র মহদ্ধর্মরূপে ছাত্র-সমাজ প্রথমে গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং ধর্মত্যাগের গ্লানি প্রত্যেকের অন্তরেই ছিল। জুলাই মাসে কলেজ খুলিতে আবার সকলে যখন সমবেত হইলাম, গ্লানিহীন নিরাবিল আনন্দে অকস্মাৎ বাধা পড়িল—দার্জিলিঙে মিসেস কিডের অকালমৃত্যু-সংবাদে। পত্নীহারা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিড্ অত্যন্ত অভিভূত ও বিচলিত হইয়া আর বিদেশে থাকিতে চাহিলেন না, ২০এ আগস্ট (১৯২১) আমরা তাঁহাকে একটা গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্যে চিরবিদায় দিলাম। আমাদের স্নেহশীল বিদেশী অভিভাবক অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে স্কটল্যাণ্ডে চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থলে আমাদের অভিভাবক হইলেন তরুণ মিঃ ডি. টি. এইচ. ম্যাক্‌লেলান। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধ-ফেরত মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, সাহিত্য ব্যাপারে অতিশয় উৎসাহী, তাঁহারই উদ্দীপনায় সুধানলিনীকান্ত দে, গোপাল হালদার, বিমলাকান্ত সরকার, সুধেন্দুমোহন ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার, শৈলেশ কর, যতীন্দ্রনাথ দত্ত (বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী গম্ভীরানন্দ) ও আমি উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। অগিল্‌ভি-হস্টেল-ম্যাগাজিন দীর্ঘকাল বাহির হয় নাই, ষষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত কয়েকটি সংখ্যার প্রকাশ পুরাতন ইতিহাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা সপ্তম খণ্ডের (১৯২১) প্রথম সংখ্যা প্রকাশের জন্য

উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে এবং বাংলা-সাহিত্যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হইল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে অতিশয় শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূ সহ ইয়োরোপ যাত্রা করেন। অমৃতসর-জালিয়ানওয়ালাবাগের হাঙ্গামা তখন থিতাইয়া আসিয়াছে, নাইটহুড ত্যাগ করিয়া সম্রাটকে তিনি যে অপমান করিয়াছিলেন (১৯১৯) তাহার জের ইংলণ্ডে একটু আধটু থাকিলেও এ দেশে আর নাই। কিন্তু কবির বিদেশে অবস্থানকালেই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের গোড়া হইতে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগতত্ত্ব সারা ভারতবর্ষে তোলপাড় তুলিল, ঢেউ গিয়া নিখিল বিশ্বের সহযোগকামী, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে বিশ্বের বিবুধমণ্ডলীর আমন্ত্রণ-বাহী রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করিল। বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠারূপ সুমহৎ কার্যের প্রাক্কালেই এই জাতিগত বাধার আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন। ইতিমধ্যে নাগপুরে অসহযোগকে কার্যকরী করার প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং নূতন বৎসরের প্রারম্ভেই তাহা উত্তাল হইয়া সমগ্র দেশকে গ্রাস করিল। সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ ও বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদলাভে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাভূমি শান্তিনিকেতনেই অসহযোগ প্রবল আকারে দেখা দিল। দূর হইতে প্রেরিত সত্য-মিথ্যা নানা খবরে বিচলিত, বিরক্ত ও বিব্রত রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিরোধ পূর্বে ও পশ্চিমে ঘনাইয়া উঠিতেছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহারই প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি আশ্রমে ফিরিয়াই "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধ রচনা করিয়া ১১ই আগস্ট কলিকাতায় আসিলেন।

তখন পর্যন্ত, আমার জীবনে কাব্য ও সাহিত্য অনুভূতির উদ্বোধক, আমার শৈশব-কৈশোরের পরম বিস্ময় "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" ও 'কথা ও কাহিনী'র কবি, আমার যৌবন-প্রারম্ভের ধ্যান ও জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। সেই শুভদিন অকস্মাৎ সমাগত ভাবিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম। ১৫ই আগস্ট—৩০এ শ্রাবণ কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত• সভায় তিনি স্বয়ং "শিক্ষার মিলন" পাঠ করিবেন—এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইল। কিন্তু আমার আন্তরিক চেষ্টা ও প্রভূত কায়িক উদ্যম সত্ত্বেও যাহা হইবার নয় তা ঘটিল না, নিদারুণ ভিড়ের চাপে বিপর্যস্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের দর্শন না পাইয়াই হস্টেলে ফিরিয়া আসিলাম।

আমার জন্ম ভাদ্র মাসে। আমি বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, আমার জীবনের গণনীয় ও স্মরণীয় যাবতীয় ব্যাপার এই ভাদ্র মাসেই ঘটিয়া থাকে। পরে 'শনিবারের চিঠি'র সহিত আমার সংযোগ এই মাসেই ঘটিয়াছিল। সুতরাং অদম্য ইচ্ছা লইয়াও রবীন্দ্র-সন্দর্শনের জন্য সেই ভাদ্র মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। সুযোগ ঘটিতে বিলম্ব হইল না। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন ও মহাত্মা গান্ধীর সহিত বিরোধিতা লইয়া তখন কলিকাতার ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ; হস্টেলে মেসে সর্বত্রই দুই দল। অগিল্‌ভি হস্টেলে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শিবদাস রায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের কল্যাণে আমরা অসহযোগের পলাতক ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্তরে অন্তরে রাবীন্দ্রিক ছিলাম। বিদেশ হইতে সদ্যপ্রত্যাবৃত্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎকামী আমাদের কয়েক জনের আগ্রহাতিশয্যে শিবদাস অচিরাৎ সে ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল; শান্তিনিকেতন আশ্রম দলের সহিত অগিল্‌ভি হস্টেল দলের ফুটবল খেলা প্রতিযোগিতার দিন ধার্য হইয়া গেল, ভাদ্র মাসে শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতন আমার পৈতৃক নিবাস রাইপুরের সন্নিকট, রাইপুরেরই ভুবনমোহন সিংহের নামাঙ্কিত ভুবনডাঙার উপর অবস্থিত, সুতরাং আমার স্বদেশেই বিশ্বের মহাকবির সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার অসীম সৌভাগ্যেরই পরিচায়ক।

আমি কোনকালেই খেলায় দড় ছিলাম না, তবু বারীন ঘোষেদের মানিকতলার বোমার আড্ডার পাশেই অবস্থিত স্কটিশ চার্চ কলেজের মাঠে হস্টেলের দলে ভিড়িয়া ফুটবল ও হকি খেলিতাম। এইটুকুই মূলধন, কিন্তু আসলে ইহা খেলার অভিযান ছিল না, সাহিত্য-তীর্থযাত্রাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল। ১৯২১, সেপ্টেম্বরের শেষে প্রকাশিত হস্টেল-ম্যাগাজিনে গোপাল হালদার লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিপিবদ্ধ আছে—

> "We went to Santiniketan Bolpur on a 'literary excursion'; never probably in the history of the hostel had there been such a pilgrimage."

বন্ধুমহলে আমার কবিখ্যাতি ছিল, গোলকীপারের পদের জন্য নির্বাচিত হইয়া আমিও তীর্থযাত্রার অধিকার লাভ করিলাম। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ হইতে বাবার সহিত স্বদেশযাত্রার ঠিক দশ বৎসর পরে আবার সেই পুরাতন বোলপুরে বহু বন্ধু-সমাবৃত হইয়া উপস্থিত হইলাম। খেলায় দুই গোলে হারিয়া ফিরিলাম বটে, কিন্তু জীবনের খেলায় সেই প্রথম গুরুদর্শনের দিন হইতেই যে-জিত হইল আজিও তাহার ফলভোগ করিতেছি।

বোলপুর। শরতের প্রসন্ন প্রভাত, স্বর্ণরৌদ্রোজ্জ্বল। আকাশের হালকা মেঘ আর প্রান্তরের কাশফুল একই শ্বেতবরণী দেবীর মন্দিরে চামর ব্যজনরত। সেদিন বোলপুরের এই রূপ মাত্র দেখিয়াছিলাম। পরে আরও নিবিড় করিয়া আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখা বোলপুরের রূপ আমার 'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যে এইভাবে ধরিয়াছি :

রেল-লাইনের ধারে ধারে দেখি সারি সারি ধান-কল
চোঙার আকারে আকাশে তুলেছে মাথা,
কয়লা খাইয়া মিশকালো ধোঁয়া উদ্গারে অবিরল,
ধূম্র-মলিন সবুজ গাছের পাতা।
পথের দু ধারে সেই পাতাদের দেখি গৈরিক শোভা—
কখনো সবুজ ছিল তা হয় না মনে,
ধূলো আর ধোঁয়া ডাঙা ও খোয়াই খ'ড়ো ঘর আর ডোবা—
এ বোলপুরের পরিচয় মোর সনে।
দূর হতে দেখি, পথ চলিতেছে গেঁয়ো লোক দলে দলে—
ভিন গাঁ হইতে আসে হেথাকার হাটে,
লাঠির আগায় বোঁচকা বাঁধিয়া যত সাঁওতাল চলে
যেতে হবে দূর—সূর্য নামিছে পাটে।
কৌপীন-পরা পুরুষ এবং মেয়েরা গামছা-পরা
যত চলে পথ তত বেশি কয় কথা ;
কলের কবলে প্রকৃতি মানুষ এখনো পড়ে নি ধরা,
ধূলি-ধোঁয়া ঠেলে জাগে প্রাণ-ব্যাকুলতা।
ভারমন্থর গরুর গাড়ির চাকার কান্না শোনো—
ধূলি-বালি কেটে চলে ঘস ঘস করি।
দূর-দিগন্তে পথ চলিয়াছে নাই তার শেষ কোনো
নিশিদিন চলে গো-গাড়ির খেয়াতরী।
কথনো দেখি যে মোটরের ছই, কভু টায়ারের চাকা,
পুরাতন আর নূতনেতে মেশামেশি
এই বোলপুর—নূতন ধোঁয়া ও পুরাতন ধুলা ঢাকা ;
নূতনো হতেছে পুরাতন শেষাশেষি।
ডাঙায় ডাঙায় ছাড়াছাড়ি হয়ে তাল-খেজুরের মেলা—
তারি মাঝ দিয়ে চলিয়াছে রাঙা পথ,

তৈলবিহীন চাকার ভাষণে মুখরিত দুই বেলা,
চলে অবিরাম জগন্নাথের রথ।
পাশ দিয়ে গেছে রেলের লাইন, প্রহরে প্রহরে চলে
মাল ও মানুষে বোঝাই বাষ্পগাড়ি,
ঘরের ছন্দ কেটে কেটে যায় বাহিরের কোলাহলে,
অটুট তবুও রয়েছে বনেদী বাড়ি।
উত্তরে যাবে? উত্তরায়ণ—সেখানে ঠাকুর রবি··

"উত্তরায়ণ" নয়, তাহারও উত্তরে "কোনারক" সদ্য-নির্মিত প্রস্তরশোভিত খর্বায়তন সৌধ। বাতায়ন ও দ্বারের অবকাশ-পথ দিয়া পশ্চিমে উত্তরে দিগন্ত-বিস্তার প্রান্তর—সেই তরুণ প্রভাতেও রুক্ষ নিষ্করুণ। শালপ্রাংশু মহাভুজ কবি সেই খাটো ঘরে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া ছিলেন, প্রসন্ন হাস্যে আমাদের সম্ভাষণ জানাইলেন। দীর্ঘ প্রবাসান্তে ইযোরোপ হইতে সদ্য ফিরিয়াছেন, গায়ের রঙ টক্‌টক্ করিতেছে। বিস্ময়বিমূঢ় আমরা প্রথমটা প্রণাম করিতেও বিস্মৃত হইলাম। কবির সুধাবর্ষী কণ্ঠনিঃসৃত কৌতুক-প্রশ্নে আমাদের চমক ভাঙিল।

—তোমরাই বুঝি অগিল্‌ভি হস্টেলের দল! শুনলাম, ডাঙার মাঝখানে বেকায়দায় পেয়ে তোমাদের এঁরা হারিয়ে দিয়েছেন!

মন বলিতে চাহিল—হারি নাই, আমাদের জিত হইয়াছে; কিন্তু বলিতে পারিলাম না। বিশ্বমৈত্রীর পুরোহিত কবির চিত্ত তখন অতিথি-বিমুখ অসহযোগী ভারতবর্ষের দুর্ব্যবহার-চিন্তায় কাতর, "শিক্ষার মিলন" ও "সত্যের আহ্বান"-এর ছাপাখানার কালি তখনও শুকায় নাই। স্বতই প্রসঙ্গ প্রাচীন ভারতের উদারতা ও আধুনিক ভারতের সঙ্কীর্ণতা-ক্ষুদ্রতার প্রতি নিবদ্ধ হইল। সেদিন তাঁহার মুখে যে সুগভীর বেদনা এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কাজনিত উত্তেজনার প্রকাশ দেখিয়াছিলাম তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই অভিভূত হইয়াছিলাম। প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা, সব কথা পূর্বাপর মনেও নাই। শুধু এইটুকু মনে আছে, সেই কথাগুলিই তাঁহার তৎকালীন ভাষণ-সমূহে বিস্তৃততরভাবে স্থান পাইয়াছিল। যাহা স্থান পায় নাই তাহা আমার অন্তরে আজও স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান আছে। আমাদের বর্তমান জাতিগত চরিত্রহীনতা ও ক্ষুদ্রতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমরা যে কোথায় নেমে গেছি তা বোঝাতে আমি আমাদের দেশের বহুপ্রচলিত একটা গুজবের কথা বলব। দেশে কোথাও ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হ'লেই শুনতে পাই, এত জন আহত মুমূর্ষুকে মেরে মাল-গাড়িবন্দী ক'রে কর্তৃপক্ষ জলে ফেলে দিয়েছে। আমরা সহজেই বিশ্বাস

করি এবং উত্তেজিত হই। একবার ভেবে দেখি না, এই কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেক দেশী লোক আছেন, ঘাতকরা তো নিশ্চয়ই দেশী। বছরে বছরে এ ভাবে দেশের এতগুলো নিরীহ লোককে খুন ক'রে জলে ফেলা হচ্ছে অথচ এদের মধ্যে আজ পর্যন্ত একজনও কি দাঁড়াল না এই নির্মম নৃশংসতার প্রতিবাদ করতে? মেরে ফেলাটা যদি সত্যি হয় তা হ'লে আমরা জাত হিসেবে কত ছোট ভেবে দেখ। আর সবটাই যদি মিথ্যে গুজব হয়, তা হ'লে মানুষের সততা ও মহত্ত্বকে এমনভাবে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও সন্দেহ করবার প্রবৃত্তি আমাদের হ'ল কি ক'রে? আসলে আমরা সর্বদাই অক্ষম দুর্বল হীনের যা ধর্ম তাই অবলম্বন করি, সব বড়কেই সব মহৎকেই টেনে ধুলোয় নামিয়ে ধুলোসাৎ করলেই আমাদের আনন্দ, সবাইকে অবিশ্বাস্য ও হেয় প্রমাণ করতে পারলেই আমাদের উল্লাস। এই দুর্ভাগা দেশে কোনো দিক দিয়ে বড় যাঁরা হয়েছেন যেমন ক'রে হোক তাঁদের ছোট প্রমাণ করতে না পারলে আমাদের স্বস্তি নেই। এ যুগের ছেলেরা অর্থাৎ তোমাদের ওপর আমার অটুট বিশ্বাস আছে। তোমরা এই হীন কলঙ্ক থেকে জাতিকে মুক্ত ক'রো।"

ইয়োরোপ ও ইংলণ্ডের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলিলেন—

"একটা বিরাট ফাঁকির ওপর গ'ড়ে উঠেছে আজ সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের অভিমান। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বলতে যা বোঝায় ওরা মোটে তার এক টুকরোর মালিক, এতেই ওদের বাহাদুরি কত, গর্ব কত! ফ্রান্সে যাও, জার্মানিতে যাও, তবেই যথার্থ ইয়োরোপীয় সভ্যতা কি বুঝতে পারবে। এ দেশের অনেকে ভাবেন ওয়েস্টার্ন সিভিলিজেশনের গোড়ার সুরটা তাঁরা ধরতে পেরেছেন; কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, সুর জিনিসটা সূক্ষ্ম, মোটা মোটেই নয়, চট্ ক'রে তা ধরা যায় না, নিখুঁত হ্যাট কোট টাই পরলেও না; তার জন্যে দেখা চাই এবং দেখার দৃষ্টি চাই। যাঁরা সত্যের ওপর জীবন গ'ড়ে তুলেছেন তাঁরাই মিথ্যেটাকে স্পষ্ট দেখতে পান। পুলিসে চোর ধরে, কিন্তু চৌর্য বস্তুটার ভয়ানকত্ব বুঝতে পারেন কেবল সাধুরাই। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমাজের ব্যাধি তাঁরাই পুরোপুরি ধরতে পারেন, যাঁরা ব্যাধিমুক্ত। খেলোয়াড়ের চাইতে খেলার দোষগুণ মাঠের বাইরে যারা থাকে তারাই ভাল দেখতে পায়। লেখা অনেক লেখা হয়, বেরও হয়; কিন্তু অধিকাংশ লেখাতেই শুধু কথা থাকে, বাণী থাকে না। লেখক হয়তো অনেক ভেবে লিখেছেন, কিন্তু পাঠককে

ভাবিয়ে তোলার মসলা সে লেখায় নেই। এ সব লেখা অসার্থক, ইয়োরোপে আজকাল যে সব লেখক পাঠককে ভাবিয়ে তুলতে পারেন তাঁদের মধ্যে রম্যা রলাঁ্যা প্রধান, বার্নার্ড শ'য়ের প্রভাবও কম নয়।"

"স্বদেশী" ও "জাতীয়"—প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—

"আমরা নামে ন্যাশনাল ফ্যাক্টরি খুলি, স্বদেশী আন্দোলন করি, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ গড়ি, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান ব'লে চেঁচিয়েই মরি; কিন্তু কাজে কি করি, ইণ্ডিয়ান আর্টের হাল দেখলেই বুঝবে। কত কষ্টে, কত চেষ্টায় একে বাঁচিয়ে তোলা হ'ল, কিন্তু সারা দেশের লোক চোখ ফিরিয়ে তাকালেও না, পশ্চিম একে একে সব লুট ক'রে নিয়ে গেল, আমরা হাত তুলে বারণ পর্যন্ত করলাম না। দেশের জিনিস তো যাচ্ছেই, পশ্চিম থেকে যদি কেউ কিছু আহরণ ক'রেও নিয়ে আসে তখন জাত যাওয়ার কথা ওঠে, যেমন উঠেছে আজ।"

অসহযোগের অতিথি-বিমুখতার কথা রবীন্দ্রনাথ ভুলিতে পারিতেছিলেন না। আমরা মুগ্ধ অথচ বেদনাহত চিত্ত লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু এমনই আমাদের সৌভাগ্য যে, বোলপুরও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আসিল, অর্থাৎ কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে "সত্যের আহ্বান" পাঠ ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রথম "বর্ষামঙ্গল" উৎসব করিতে রবীন্দ্রনাথ স্বদলবলে কলিকাতায় আসিলেন। রবীন্দ্রনাথকে পুনঃ পুনঃ দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিতে লাগিল। "শিক্ষার মিলনে"র অভিজ্ঞতায় "সত্যের আহ্বান" আর শুনিতে যাই নাই, কিন্তু "বর্ষামঙ্গলে"র অপূর্ব স্বপ্নময় পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম। ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯ ভাদ্র, ১৩২৮) আবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে অনুষ্ঠিত কবির ষষ্টিতম বার্ষিক সম্বর্ধনায় যোগ দিবার সুযোগও লাভ করিলাম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বহু সাহিত্যিকই সমবেত হইয়াছিলেন; কিন্তু এক ছাড়া দ্বিতীয় দেখিতে পাইলাম না; সেই রাত্রেই একটি কবিতায় কবিকে বন্দনা করিলাম—

রবীন্দ্রনাথ

ওগো আঁধারের রবি,
ওগো মরতের কবি,
স্বরগে মরতে ঘটালে মিলন
দেবতার কৃপা লভি।

আকাশে মাটিতে তৃণে ফুলে ফলে
প্রতি গৃহকোণে প্রতি হৃদিতলে
চিরবিচিত্র যে সুর উথলে
আঁকিছ তাহারি ছবি।
তুমি সন্ধানী, কবি।

আনন্দ দিয়ে দুখ-শোক করি জয়,
অসীমের পানে চলেছ ছুটিয়া
নিশঙ্ক নির্ভয়।
মূক প্রকৃতিরে তুমি দিলে ভাষা,
ক্ষুদ্রে জাগালে বৃহতের আশা,
যেথা সুন্দর যেথা ভালবাসা—
সেখানে সত্য সবি
তুমিই দেখালে, কবি।

মঙ্গলগানে অশুভে করিয়া ক্ষয়,
আঁধারবিনাশী আলোক আনিলে
হে চিরজ্যোতির্ময়।
নিরাশ পরাণে তুমি দাও আনি
আশা-আনন্দ-আশ্বাস-বাণী :
আছে দেবতার বরাভয়-পাণি
নিত্য তা অনুভবি
তব আশ্বাসে, কবি।

তুমি আনো সুর অসুর ভুবনময়
নব নব গানে দাও প্রাণে প্রাণে
অধরার পরিচয়।
তোমারে প্রণাম কবি,
তুমি আঁধারের রবি,
মোদের মাঝারে তোমারে পেয়েছি
দেবতার কৃপা লভি॥][ঈষৎ পরিবর্তিত]

এই কবিতা সঙ্গে সঙ্গে আমারই হস্তাক্ষরে হস্টেল-ম্যাগাজিনভুক্ত হইল। পরবর্তী ৭ই পৌষের উৎসবে একেলাই শান্তিনিকেতন গেলাম কবিতাটির নকল পকেটে লইয়া। প্রত্যুষে কাচ-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের উপাসনা শুনিলাম। পরদিন ৮ই পৌষ—২৩এ ডিসেম্বর শুক্রবার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কুড়ি বৎসরের লালিত সাধের বিশ্বভারতীকে একটি মনোরম অনুষ্ঠানের মধ্যে দেশ-বাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ আশ্রম-বালিকাদের দ্বারা আলিম্পনে ও ফুলসজ্জায় সজ্জিত হইল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন; সভাপতিকে বরণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। এবার তমোহন্তা একচন্দ্রকেই শুধু দেখিলাম না; চোখ মেলিয়া নক্ষত্রমণ্ডলীকেও দেখিবার অবকাশ পাইলাম; তন্মধ্যে আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি, মাদাম লেভি, সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ, উইলিয়াম পিয়ার্সন, এল. কে. এল্ম্হার্স্ট, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এক ফাঁকে নামো-বাংলোয় গিয়া ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথকেও শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া আসিলাম। তিনি তখন রকম-বেরকমের কাগজের বাক্স বানাইতে ব্যস্ত এবং ভৃত্য মুনীশ্বর-প্রসাদাৎ কোনও রকমে লজ্জানিবারণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু এবারকার একক তীর্থযাত্রায় রবির যে গ্রহটি সর্বাপেক্ষা আমার চিত্ত আকর্ষণ করিলেন, তিনি হইতেছেন প্রমথনাথ বিশী। দেখিতে বালকের মত, বেঁটেখাটো কিন্তু তখনই খ্যাতিমান, অন্তত আমার প্রভূত হিংসার উদ্রেক করিবার মত তাঁহার খ্যাতি। কাব্যে গল্পে প্রবন্ধে ভ্রমণকাহিনীতে বিশ্ব-সাহিত্য-সমালোচনায় তখনই তিনি সার্থক সাহিত্যিক, তদুপরি রবীন্দ্রনাট্য, সংস্কৃত নাট্য ও যাত্রাগান অভিনয়েও যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। বয়স তখন তাঁহার কতই হইবে? উনিশ-কুড়ি। রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই বাংলা দেশের দ্বিতীয় নাম-করা সাহিত্যিক যাঁহার সহিত পাঠ্যাবস্থাতেই আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে। অবশ্য একটা অভিসন্ধি লইয়া প্রমথনাথের শরণ লইয়াছিলাম, তিনি যদি দয়া করিয়া আমার রবীন্দ্র-বন্দনাখানি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির করিয়া দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লজ্জায় মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না, কবিতাটি পকেটে লইয়াই ফিরিয়া আসিলাম।

আজ প্রমথনাথ বিশী আমার প্রীতিভাজন এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। তিনি হয়তো আজ আমার এই কাহিনী পড়িয়া হাসিবেন, কিন্তু সেদিন সত্য সত্যই তাঁহাকে দেখিয়া আমি মজিয়াছিলাম। আজিও সেই

সুবাদে তাঁহার প্রতি আমার প্রীতি কিঞ্চিৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত হইয়া আছে। তাঁহার প্রসঙ্গ পরে আসিবে। আপাতত, অমন পারমার্থিক কবিতাটির গতি কি হয় সেই দুর্ভাবনা লইয়াই কলিকাতায় হস্টেলে ফিরিয়া আসিলাম। ডাকযোগে পাঠাইব? কিন্তু অকারণে একটা কবিতা পাঠাইলে তিনি কি মনে করিবেন? কারণই বা কি লেখা যায়? ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল, স্কুল-জীবনে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বইখানি সম্পূর্ণ নকল করিবার কালে একটা বৈজ্ঞানিক ভুল আমার নজরে পড়িয়াছিল। মুদ্রাকর-প্রমাদ নয়, রবীন্দ্রনাথ সময়ের হিসাব না রাখিয়াই লিখিয়াছিলেন। 'গোরা'র ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয়। বর্ণনাটি এইরূপ ছিল—

> "ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটা দীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।"

"মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে" ছায়া "দীর্ঘতর" হইতে পারে না—একটি সুচিন্তিত পত্রে সবিনয়ে ইহাই নিবেদন করিলাম এবং কবিতাটি ফাউস্বরূপ পত্রে পুরিয়া গোপনে তাহা পোস্ট করিলাম। লজ্জায় কাহাকেও জানাইতে পারিলাম না। দুই দিন পরে আমার চিরস্মরণীয় ৫ই মার্চ (১৯২২) তারিখে চমৎকার হস্তাক্ষরে অগিল্‌ভি হস্টেলের ঠিকানায় ও আমার নামে একখানি লেফাফা আসিল; পোস্টমার্ক—"শান্তিনিকেতন, ৪ঠা মার্চ"। দেখিয়াই বুঝিলাম, দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন। এই আমার তাঁহার সহিত সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত যোগাযোগ। স্বামীর সর্বপ্রথম-পত্রপ্রাপ্ত নববধূর মত উর্ধ্বশ্বাসে ঘরে গিয়া খিল দিয়া চিঠিটি পড়িলাম—

> "ওঁ
>
> কল্যাণীয়েষু
>
> গোরার কোন্‌ জায়গা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছ মনে পড়িতেছে না, বইখানিও হাতের কাছে নাই। যদি মধ্যাহ্ন কালের বর্ণনা হয় তবে ছায়ার দীর্ঘতা অসম্ভব বটে, যদি মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়া থাকে তবে ছায়া দীর্ঘ হওয়ার বাধা নাই বিশেষত ঋতুবিশেষে।
>
> তোমার কবিতাটি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩২৮
>
> শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

মনে হইল, গলা ফাটাইয়া চেঁচাইয়া কথাটা রাষ্ট্র করি। লজ্জায় বাধিল। একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। আমার এই পত্র বিফলে যায় নাই।

'গোরা'র পরবর্তী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ "দীর্ঘতর" কাটিয়া "খর্ব" করিয়াছেন। আমি ধন্য হইয়াছি।

এই দীর্ঘতরকে খর্ব করা—ইহাই বাংলা-সাহিত্যে আমার সর্বপ্রথম কীর্তি, আধুনিক ভাষায় "অবদান"ও বলিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার জীবনে দীর্ঘতরকে খর্ব করার ইহাই শেষ নয়।

দশম তরঙ্গ

দুই নৌকা

দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলিতে পারি না, জীবনে আমাকে প্রায় বরাবরই দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে হইয়াছে। বিজ্ঞানের ছাত্র হইয়া আর্টের অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথে চিত্তসমর্পণ করিয়া শিক্ষাজীবনে যে মানসিক দ্বন্দ্বের কবলে পড়িয়াছিলাম, তাহার জের সম্পূর্ণ মিটিতে আরও পূরা তিন বৎসর সময় লাগিয়াছিল। সে কথা যথাসময়ে বলিতেছি। কিন্তু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া হইতে ধীরে ধীরে আরও যে একটি আকর্ষণের কবলায়িত হইতেছিলাম, তাহাও আমাকে কম দোটানায় ফেলে নাই। তাহা ঠিক পলিটিক্স নয়। কৈশোরে দিনাজপুরে থাকিতে মনেপ্রাণে বিপ্লববাদী ছিলাম, মার্-কাট্ ছাড়া যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে না সেই বিশ্বাসই মনে মনে পোষণ করিতাম। হঠাৎ ১৯২০ সনের শেষে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আদর্শ আমার বিশ্বাসকে টলাইয়া দিল। মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া সেই ১৯২০ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৮, ৩০ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত পলিটিক্স অনেক হইয়াছে, আমি তাহার কোনটিই কখনও অবলম্বন করিতে পারি নাই। তাঁহাতে ভারতীয় ঋষিদের সর্বশেষ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আমি তখন হইতেই তাঁহার প্রতি এক নৈতিক ও আত্মিক আকর্ষণ অনুভব করিতাম। বহুকাল পরে 'শনিবারের চিঠি'র গান্ধীভক্তি দেখিয়া বহু সাহিত্যিক বন্ধু আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন এবং অনেকের ধারণা গান্ধীজীর নোয়াখালি-সচিব অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর প্রভাবই ইহার কারণ। কিন্তু আসলে এই ভক্তি যে সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসরের পুরাতন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সেই সময়ে রচিত আমার সর্বপ্রথম গান্ধী-বন্দনাটি এখানে দাখিল করিতেছি। ইহার রচনাকাল ১৯২০ সেপ্টেম্বর; ১৯২১ সেপ্টেম্বরে 'অগিল্ভি-হস্টেল-ম্যাগাজিনে' আমার হস্তাক্ষরে ইহা বিধৃত হইয়াছিল:

মহাত্মা গান্ধী

ঘুচালে অন্ধকার।
ধন্য তুমি হে মহাত্মা, ধন্য শেষ ঋষি
তোমায় নমস্কার।
তব সুকঠিন অহিংসা-ব্রতে
দিতেছ চেতনা তন্দ্রা-আহতে
নিত্য স্বাধীন শাশ্বত যাহা
মানুষের অধিকার—
তাহার লাগিয়া জাগালে ভারতে,
তোমায় নমস্কার।

তোমার সত্য-আগ্রহ-বেগে
মহাস্পন্দন উঠিয়াছে জেগে ;
"মিথ্যার সাথে ছাড় সহযোগ"
তীক্ষ্ণ বাণী তোমার
মোহ করে দূর মুগ্ধ মনের ;
তোমায় নমস্কার।

স্বদেশের লাগি ভিক্ষার ঝুলি
নিজের স্কন্ধে নিলে তুমি তুলি,
ধূলির মাঝারে হইতেছ ধূলি
প্রতিদিন শতবার,
সেই ধূলিমাঝে পেতেছ দীপ্তি—
তোমায় নমস্কার।

খৃষ্টের সম মানুষের লাগি
হে দধীচি, তুমি রহিয়াছ জাগি,
আপন বুকের রক্তে মানুষে
দেখাও মুক্তিদ্বার ;
সত্যে ও শুভে ঘটাও মিলন—
তোমায় নমস্কার॥ [ঈষৎ পরিবর্তিত]

আমাদের কলেজ-জীবনে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতায় গান্ধীভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আমাদের হৃদয় হরণ করিয়াছিলেন; হেদুয়ার দক্ষিণে তিনি নিবাত-নিষ্কম্প শিখার মত চোখে ঠুলি বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন, আমি মাঝে মাঝে তাঁহার আশেপাশে ঘুরঘুর করিতাম। উত্তেজনার মুখে তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া একদিন তাঁহাকেও উত্তেজিত করিয়াছিলাম, সে কথা বলিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা-সভায় তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের বাসনা জাগিয়াছিল। কিন্তু তখন রবির প্রদীপ্ত তেজ আমার চোখ দুইটিকে এমনই ধাঁধিয়া দিয়াছিল যে, সামলাইয়া আশেপাশে সহজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে খানিকটা সময় গেল। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি পাওয়ার প্রায় দেড় মাস পূর্বে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'র "কষ্টিপাথর" বিভাগে ওই সালের কার্তিক মাসের 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী" কবিতা পাঠে মনে ছন্দের দোলা ও ভাবের দ্বন্দ্ব জাগিয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথকে ছন্দের রাজা বলিয়া তখনই চিনিয়াছিলাম। গান্ধী-বন্দনা কবিতাটি পকেটে এবং নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা মনে লইয়া একদিন বৈকালে মফস্বলীয় মূঢ়তাসহ সত্যেন্দ্রনাথের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। স্বল্পভাষী সত্যেন্দ্রনাথ চক্ষুপীড়ায় অস্বচ্ছ রূঢ় দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভয়ে এবং সঙ্কোচে মরীয়া হইয়া শেষ পর্যন্ত "বিদ্রোহী" সম্বন্ধে আমার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলাম। বলিলাম, ছন্দের দোলা মনকে নাড়া দেয় বটে, কিন্তু 'আমি'র এলোমেলো প্রশংসা-তালিকার মধ্যে ভাবের কোনও সামঞ্জস্য না পাইয়া মন পীড়িত হয়; এ বিষয়ে আপনার মত কি? প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমটা বোধ হয় সত্যেন্দ্রনাথ একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরে একটা মৃদু হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বুঝি বিজ্ঞানের ছাত্র? বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, বি. এস-সি. পরীক্ষা দিচ্ছি। বস্তুত তখন পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে এবং প্র্যাকটিক্যাল ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পরীক্ষা দেওয়াও হইয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ আমার প্রশ্নের জবাবে সেদিন মোদ্দা কথাটা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমি কোনদিনই ভুলিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন, কবিতার ছন্দের দোলা যদি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়া কোনও একটা ভাবের ইঙ্গিত দেয় তাহা হইলেই কবিতা সার্থক। "বিদ্রোহী" কবিতা কোনও ভাবের ইঙ্গিত দেয় কি না, তুমিই তাহা বলিতে পারিবে। বৎসর দেড়েক পরে সেই কথাই বলিতে গিয়া আমার "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দে"র অন্তর্ভুক্ত করিয়া "বিদ্রোহী"র একটা মারাত্মক প্যারডি লিখিয়াছিলাম, যাহার আরম্ভটা ছিল এইরূপ—

"আমি ব্যাঙ্
লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ্ ।
আমি ব্যাং·· ···
দুইটা মাত্র ঠ্যাং ।···"

এই কবিতাই সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র একাদশ বা পূজা সংখ্যায় (১৯২৪, ৪ঠা অক্টোবর) প্রকাশিত হইয়া বিবিধ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বয়ং নজরুল ইসলাম ইহা তাঁহার গুরুকল্প মোহিতলাল মজুমদারের রচনা অনুমান করিয়া পরবর্তী সংখ্যা 'কল্লোলে' তাঁহাকে একটি কবিতায় ভীষণ আক্রমণ করেন এবং 'শনিবারের চিঠি'র সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন মোহিতলাল 'চিঠি'র পরবর্তী সংখ্যায় (২৫ অক্টোবর, ১৯২৪) "দ্রোণ-গুরু" শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশ করিয়া 'শনিবারের চিঠি'র সহিত যুক্ত হইয়া পড়েন। আমি আরও কিছুকাল পরে বিচিত্র ছন্দে ভাবলেশহীন কয়েকটি কবিতা লিখিয়া ও 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের কথার সমর্থন করি। আমার বিশ্বাস, পরীক্ষামূলক সেই সকল কবিতার দ্বারা আমার ধারণা আমি প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলাম।

যাহা হউক, "বিদ্রোহী"-প্রসঙ্গশেষে পকেট হইতে আমার ব্যাঙের আধুলিটি অর্থাৎ গান্ধী-বন্দনা বাহির করিলাম। গান্ধীজীকে মাত্র পক্ষকাল পূর্বে (১০ই মার্চ) কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের চিত্ত বেদনাকাতর। পরিবেশও ছিল আমার সহায়। হেদুয়ায় গ্যাসের বাতি তখন জ্বলিয়াছে এবং মৃদুতরঙ্গায়িত সরোবরে তাহাদের প্রতিবিম্ব আন্দোলিত হইয়া জনবহুল কলিকাতার সন্ধ্যাকেও স্বপ্নময় করিয়া তুলিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ মন দিয়া শুনিয়া বলিলেন, এ বিজ্ঞানও নয়, কবিতাও নয়, এ দেখছি তোমার তিন নম্বর নৌকো ; এত সামলাতে পারবে কি ?

সত্যই সামলাইতে পারি নাই। আমার পলিটিক্সের নৌকা কোনও কালেই চলে নাই এবং মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে উপজীবিকার অবলম্বন বিজ্ঞানের নৌকাও বানচাল হইয়াছিল।

পরীক্ষা দিয়া দিনাজপুরে অবকাশ যাপনের জন্য আসিলাম। সেখানেও ধরপাকড় চলিতেছে। একরূপ নির্লিপ্ত অজ্ঞাতবাসে সেখানে থাকিতে থাকিতেই মে মাসের মাঝামাঝি সংবাদ পাইলাম, পাস করিয়াছি। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবার জন্য কলিকাতায় আসিলাম। প্রবেশাধিকার পাইয়াও মামাতো

ভাইয়ের জন্য সে অধিকার ত্যাগ করিলাম। কি করিব, কোন্ পথে চলিব—ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার রাস্তায় নিঃসঙ্গ ভ্রমণ করিতেছি, সহসা ২৬শে জুনের (১৯২২) সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মর্মঘাতী আঘাত পাইলাম, ১০ই আষাঢ় শনিবার রাত্রি আড়াইটায় (ইংরেজী মতে ২৫শে জুন প্রত্যুষ আড়াইটা) কবি সত্যেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে (জন্ম ১৮৮২, ১০ই ফেব্রুয়ারি) বঙ্গবাণীর মন্দিরে স্বীয় আসন শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ১৩২৯ শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সত্যেন্দ্র-পরিচয়ে" কবিতা বিষয়ে আমার সহিত সত্যেন্দ্রনাথের আলাপ সম্পর্কে আরও স্পষ্টতর ইঙ্গিত পাইলাম। অস্পষ্ট দুর্বোধ্য এলোমেলো ছন্দোবদ্ধ কথাকে তিনি কবিতা বলিতেন না, বলিতেন "হেঁয়ালি"। কবিতার ক্ষেত্র হইতে স্পষ্ট ও সত্য ভাষণ তাঁহার সঙ্গেই বিদায় গ্রহণ করিল। বঙ্গভারতীর মন্দির-প্রাঙ্গণে নাম-লেখানো ভক্তের দলের একজন না হইয়াও সত্যেন্দ্র-বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান হইলাম।

বিজ্ঞানের নৌকাই শেষ পর্যন্ত আমাকে জীবনসমুদ্রে তরাইতে পারে কি না—সে বিষয়ে শেষ চেষ্টা করিবার জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া কাশী যাত্রা করিলাম। সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু ছাড়াও হৃদয়ঘটিত অন্য কারণ ছিল যাহা নিষিদ্ধ পর্যায়ভুক্ত। দাদা এবং রতন দুইজনে আমাকে খুব উৎসাহ দিয়া বিদায় দিল। কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য-স্থাপিত ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে তড়িৎ-ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্ররূপে পরদিন দর্শন দিলাম। মা-সরস্বতীর সিংহাসন নিশ্চয়ই একবার টলিয়া উঠিল। কয়েকটি বিরহব্যঞ্জক এবং যৌবনপ্রবুদ্ধ কবিতা রচনা ছাড়া কাশীর তিন মাস প্রবাসবাসে আর যাহা করিয়াছিলাম তাহা মোটেই বিদ্যা-বিষয়ক নয়। সে পথে সহৃদয় অধ্যক্ষ কিং সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রবল থাকিলেও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরম কর্তৃপক্ষের বঙ্গবিরোধী খুঁটিনাটি বাধাই শেষ পর্যন্ত পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিল। সেই সকল বাধা অপসারণে দল বাঁধিতে ও ঘোঁট পাকাইতেই সময় গেল। মৎস্য-মাংস-ডিম্ব-নিষেধক হুকুমগুলি কৌশলে অমান্য করিবার ফিকিরে সর্বদা ফিরিতে হইত বলিয়া হস্টেলগুলির বাঙালী ছাত্রদের লেখাপড়া করিবার অবসর মিলিত না। তিন মাসে ছুতারমিস্ত্রীর কাজে হাত পাকাইয়া একটি চেয়ারের তিনখানি পায়া নিখুঁতভাবে নির্মাণ করিয়া একদিন সেগুলি ফেলিয়াই বি. এন. ডব্লু. আর. পথে দিনাজপুরে উপস্থিত হইলাম।

কাশীতে থাকিতে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম, যাহার নাম দিয়াছিলাম "যৌবন"; নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী"র প্রভাব স্পষ্ট, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশমত নানা অসম্বদ্ধ উপমার মধ্যে একটা ভাবের ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা

ইহাতে আছে। এই কবিতাটিই "বিদ্রোহী"র বিরুদ্ধে আমার প্রথম বিদ্রোহ হিসাবে শুধু নয়, আমার তখনকার উদ্দাম মনের পরিচয় হিসাবেও উদ্ধারের যোগ্য। কবিতাটি এই—

আমি আলেয়ার আলো
আপন খেয়ালে চলি,
ঝঞ্ঝা মানি না, মানি না বাত্যা-ভয়,
আমি উল্কার মত
আপন বেগেতে জ্বলি;
পথহারা, নাহি কারো সাথে পরিচয়।
আমি পর্বত হতে
দুর্জয় বেগে নামি,
বাধাবন্ধন দু ধারে ঠেলিয়া যাই,
কভু নহি কো কাতর
হতেও নিম্নগামী
নিম্নে যদি বা সাগরের খোঁজ পাই।
আমি বৈশাখী ঝড়,
বিপুল রুদ্র তেজে
আঁধারি জগৎ উড়াই ধূলার রাশি,
ঘন শ্রাবণের মেঘ—
ভীষণ সাজেতে সেজে
ডুবাতে ধরণী বড় আমি ভালবাসি।
আমি বিদ্যুৎ-শিখা
জ্বলি তির্যক বেগে
অট্টহাস্যে আকাশের বুক চিরি।
আমি মহা মহামারী
জনপদ মাঝে জেগে
মৃত্যুরে মোর সাথে সাথে ল'য়ে ফিরি।
আমি জ্যৈষ্ঠের রোদ
আগুনের মত জ্বলি
পরশে আমার ওঠে মাটি ফেটে ফেটে—
আমি সমর-ভীষণ
মূর্খ মানবে ছলি,

মরে দলে দলে নিজেরে নিজেরা কেটে।
আমি যৌবন, আমি
নিত্য নূতন রূপে
আপনার বেগে আপনি ছুটিয়া চলি,
আমি হুঙ্কারি চলি
চলি নাকো চুপে চুপে
বিঘ্ন বিপদ পদতলে আমি দলি।
উল্কা আলেয়া এরাই তুলনা মোর
প্রকৃতি আমার তবু না প্রকাশ হয়,
আমি যৌবন
আমি উন্মাদ ঘোর
ছুটিব, মরিব, লভিব নিত্য জয়।

কিন্তু কবিতায় বন্দিত এই নিত্যজয়ী দুর্মদ যৌবন আমার কর্মহীন মনকে এতটুকু আশ্বাস দিতে পারে নাই। বুঝিতেছিলাম, বিজ্ঞানলক্ষ্মী আমাকে দূরের ইঙ্গিত দিবেন না, নিরুদ্দেশ-যাত্রায় ডাকিবেন না। সাহিত্য-লক্ষ্মীও যে বিশেষ ভরসা দিতেছিলেন তাহাও নয়। তথাপি সর্বাধ্যক্ষ মালবীয়জীর সঙ্গে একদিন বচসা বাধাইয়া বারাণসীধাম পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম। দিনাজপুর হইতেই দরখাস্ত করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সায়েন্স কলেজে ফিজিক্সের "হীট" বিভাগে ভর্তি হইলাম এবং পূজার ছুটি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া ক্লাসে যোগদান করিলাম। আশ্রয় লাভ করিলাম ৬নং বাদুড়বাগান লেনে—সায়ান্স কলেজের মেসে।

যে দোটানার মধ্যে পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য এইটিই শেষ চেষ্টা। নিজের ভবিষ্যৎ যদিচ গণৎকার ছাড়া আর সকলের নিকটই অন্ধকারসমাচ্ছন্ন থাকে, তবু এই চেষ্টার মধ্যে কে যেন আমাকে কানে কানে বলিত—তোমার বিজ্ঞানের নৌকা বেশি দূর অগ্রসর হইবে না, নামিয়া পড়, নামিয়া পড়। মেসের সহপাঠী বন্ধুরা যখন নিষ্ঠার সহিত পাঠাভ্যাস করিতেন, আমি তখন অশান্ত চিত্তে সে সময়ের ফ্যাশন কন্টিনেণ্টাল সাহিত্য-সমুদ্রে পাড়ি দিতাম। বন্ধুবর অজিতনারায়ণ চৌধুরী (ফলিত রসায়নের ছাত্র) দাশরথি সান্যালের সুবিখ্যাত ব্যক্তিগত লাইব্রেরি হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিতেন। নরওয়েজিয়ান, স্ক্যাণ্ডানেভিয়ান, আইসল্যাণ্ডিক, ডেনিশ, পোলিশ ভাষার বহু গল্প উপন্যাস তখন ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আমি একে একে সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া যাইতেছি। ইহার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ,

জার্মান ও রুশীয় ভাষার বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা যে ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। আমার অবস্থা শিশুপাঠ্য বইয়ের সেই হতভাগ্য বালকটির মত হইল, যে বিদ্যালয় পলাইয়া পথে পথে পশু-পক্ষী-পতঙ্গের সহিত খেলা যাচিয়া বেড়াইত। কলের পুতুলের মত বই বগলে সি. ভি. রমন, মেঘনাদ সাহা, ডি. এম. বোস, সুশীল আচার্য, বিধুভূষণ রায় ও ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ক্লাস করিতাম, প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়া যে যে দিন প্রশান্ত মহলানবীশ ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট যথাক্রমে রিলেটিভিটি ও রেডিও অ্যাকটিভিটি পড়িতে যাইতাম সেদিন পথে একটু মুখবদলের নূতনত্ব থাকিত। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কি যে মাথামুণ্ড করিতাম—একটা এক্সপেরিমেণ্টও যে শেষ করিতে পারিয়াছিলাম তাহা মনে হয় না। ক্লাসে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন শ্রীঅমূল্য সেন (অধুনা কলিকাতা করপোরেশনের ইঞ্জিনীয়ার), তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতেই আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার কৃপায় নিঃসঙ্গ কলিকাতাতেও একটা মধুর সামাজিক জীবনের আস্বাদ পাইয়াছিলাম। যে হতাশা ও রুক্ষতা আমার মনকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছিল, চমৎকার পারিবারিক পরিবেশে তাহা কাটিয়া গিয়া আশ্বাস ও স্নিগ্ধতায় চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের মেসের ঠিক উত্তরে বাদুড়বাগান লেন এবং তাহারও উত্তরে একটি চতুষ্কোণ পার্ক। এই বাড়িটিরই দক্ষিণের অর্ধাংশে থাকিতেন দেশনেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। নিষিদ্ধ বাতায়নপথে এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করা আমার একটা ব্যসন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখিতাম, সংসারে ইনি ঠিক বিগ্রহের মতই পূজিত ও সেবিত হইতেন; সভা-সমিতি নিত্য লাগিয়াই থাকিত, ফুলের মালা আসিত, তোড়া আসিত—চক্রবর্তী-গৃহিণী সেগুলি ধবধবে বিছানার চারিপাশে পরিপাটি করিয়া সাজাইতেন। চক্রবর্তী মহাশয় খুব গম্ভীর মেজাজের লোক ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে রাজনৈতিক নেতা হইবার লোভ জাগিত।

উত্তরে আমার ঘরের বাতায়নপথে প্রত্যহ সকাল বিকাল আর একটি মানুষকে দেখিতে পাইতাম, দেহ ঈষৎ স্থূল, কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু মনোরম মুখশ্রী। ছাতা হাতে বেলা দশটা নাগাদ সম্মুখের পথ দিয়া কোথায় যাইতেন, আবার বৈকালে ফিরিতেন। কে একজন বলিয়া দিল, ইনিই কবি মোহিতলাল মজুমদার, কাছাকাছি কোনও মেসে থাকেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ-কবিতার শেষে নামটি দেখিতাম বটে, কিন্তু তাঁহার কোনও লেখার সহিত পরিচিত ছিলাম না। প্রত্যহ দেখিতে দেখিতে এই বঙ্গকবির প্রতি মনে মনে স্বতই শ্রদ্ধাশীল হইতেছিলাম, তিনি আমাদেরই নিকট-প্রতিবেশী জানিয়া একটা

গর্বও অনুভব করিতে লাগিলাম। পরিচিত হইবার খুবই বাসনা হইতেছিল, কিন্তু সুযোগ মিলিতেছিল না।

আর দেখিতাম শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। রোজ এগারোটায় আমার ক্লাস। আহারান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে (তখন পর্যন্ত সিগারেট স্পর্শ করি নাই) বইখাতা হাতে সংকীর্ণ গলিপথ পার হইয়া যেমনই আপার সারকুলার রোডের প্রশস্ত পরিসরে আসিয়া পা দিতাম, দেখিতে পাইতাম রিক্‌শারোহণে শ্বেতশ্মশ্রু প্রশস্তললাট রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' আপিসে চলিয়াছেন—সায়ান্স কলেজেরই ঠিক দক্ষিণে ৯১নং আপার সারকুলার রোডে। তিনি তখন থাকিতেন ৮নং রামমোহন রায় রোডে। আমি জানিতাম, তিনি আমার বড় ও মেজ মামা নন্দলাল ও কানাইলাল দত্তের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু। সেই পরিচয়ে আলাপ করিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু সাহসে কুলাইত না। ঘড়ির কাঁটা মিলাইয়া লওয়া যায়—এমনই নিয়মিত তাঁহার গতায়াত ছিল।

এই যে সামান্য সামান্য ঘটনা, বিজ্ঞান পড়িতে পড়িতে সাহিত্যিক সন্দর্শন, এবং কাচপোকা-তেলাপোকার চিরন্তন কাহিনী অনুযায়ী ধীরে ধীরে তেলাপোকা-আমির মানসিক রূপান্তর গ্রহণ—আমার স্বভাবত-পলাতক মনকে আরও দ্বিধাগ্রস্ত, আরও বৈরাগী করিয়া তুলিতেছিল। পাঠে সম্পূর্ণ অসহযোগ ও নিত্য হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যেও শান্তি পাইতেছিলাম না। ঠিক এই সঙ্কটকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিয়া আমাকে আরও বিচলিত করিয়া দিল। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বিবাহিত জীবনের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে একটু বেশি অবহিত ছিলাম—পিতামাতার আশ্রয় সত্ত্বেও। বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আর পাঁচ-জনের মত উচ্চতম ডিগ্রীলাভ ও চিরাচরিত প্রথায় সরকারী বেসরকারী ভাল-মন্দ-মাঝারি চাকুরিতে প্রবেশলাভ আমার ভাগ্যে নাই। দিনাজপুরের পার্টিশন ডেপুটি কলেক্টর পিতার বাসনা ছিল ডেপুটিগিরির আশ্রয়ে নিরাপদ জীবন-যাত্রায় আমাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন। আমার তাহা মনঃপূত হয় নাই, অমান্য করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলাম। ভাগ্যে যাহাই থাকুক, সাহিত্য-সাধনাকেই উপজীবিকা-স্বরূপ গ্রহণ করিবার বাসনা অবচেতন মনে তখন হইতেই ছিল। বিবাহ করিলে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইবে এবং মনের বাসনা ফলবতী হইবে না, ইহা জানিতাম। প্রথমেই প্রবল অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং প্রায়-বালিকা আমার ভাবী পত্নীকে শ্যামবাজারের এক সঙ্কীর্ণ গলির শেষপ্রান্তে দূর হইতে একদিন প্রত্যক্ষ

করিয়া এমন একটা অলৌকিক আবেশ আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত হইল, অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও যাহার প্রভাব এড়াইতে পারিলাম না। এই ঘটনার কথা আমার সেকালের বন্ধুরা সকলেই জানেন, তাই তাহার উল্লেখ করিতে সাহসী হইতেছি, সাধারণ পাঠকের নিকট আজগবি ঠেকিবে বলিয়া তাহার বিস্তারে নিরস্ত হইলাম। যাহা হউক, আমি প্রত্যাদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তির মত বিবাহে রাজী হইলাম। মনের দ্বন্দ্ব তবু সম্পূর্ণ ঘুচিল না। ঠিক এই সময়ে লেখা "হতাশা" কবিতায় তখনকার মনের ভাব কিছু প্রকাশ পাইয়াছে। বিবাহিত এবং অবিবাহিত জীবনের দ্বন্দ্বই শুধু নয়—বিজ্ঞান না সাহিত্য, সেই দ্বন্দ্বের আভাসও ইহাতে আছে। কবিতাটি অংশত এই—

আমার মনের গভীর আঁধার মাঝে
উঁকি-ঝুঁকি ক্বচিৎ আসে আলো,
আশার বাণী হঠাৎ কানে বাজে
ঘনায় যখন মনের আঁধার কালো।
চেয়ে চেয়ে দেখি সমুখ পানে
পথের আভাস কিছুই নাহি পাই,
তবু চলি কোন্ অজানার টানে,
ভয়ে ভয়ে পিছন পানে চাই।
ডুবেছে মন গভীর হতাশায়
বুঝতে নারি চলব যে কোন্ পথে,
বিজ্ঞানেতে বন্দী হয়ে হায়,
ভাবি—জীবন কাটাই কোনো মতে।···

আশা-হতাশার দোলায় আরও বাউণ্ডুলে হইয়া উঠিলাম; সঙ্কটত্রাণ বা অন্যান্য ব্যাপারে ভলান্টিয়ারি করিবার সুযোগ পাইলেই হইল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে কলেজে দুই বেলা দেখিতাম। তিনিই হইলেন আদর্শ। তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার স্নেহভাজন হইয়া উঠিতেও বিলম্ব হইল না। সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (১৩২৯) পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ, সন্ধ্যার দিকেই গ্রাস আরম্ভ। চন্দ্রগ্রহণের সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। সায়ান্স কলেজের একটা দল এই কাজে আহিরীটোলা ঘাটের ভার পাইল। মেসের বন্ধুরা প্রায় সকলেই ছিলাম। দল বাঁধিয়া সন্ধ্যার একটু আগেই আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরিয়া ঘাটের দিকে যাইতেছি, সুকিয়া স্ট্রীট জংশন পার হইয়াই ডান দিকের একটা বাড়ির ফুটপাথে অনেক জনসমাগম

দেখিলাম। চেয়ারে বেঞ্চে টুলে বসিয়া এবং দাঁড়াইয়া অনেক লোক। ঠিক রাস্তার পাশের একটা ঘরে প্রবল উৎসাহে গানবাজনা চলিতেছিল। উদাত্ত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কানে বাজিল—

"বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ওই এল ওই
এল ওই রক্ত যুগান্তর রে—"

পুলকে বিস্ময়াভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একজন ঝাঁকড়াচুল বৃষস্কন্ধ সুদর্শন যুবক কোলের উপর হারমোনিয়াম তুলিয়া বাজাইতে বাজাইতে গান গাহিতেছেন এবং তাঁহার ঠিক সম্মুখে আমাদের পথের নিত্যদৃষ্ট পথিক কবি মোহিতলাল মজুমদার আসর জাঁকাইয়া বসিয়া বেশ একটা সাফল্য-গর্বের ভঙ্গিতে এদিকে ওদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। ভাবটা —দেখ, এটি আমারই কীর্তি। আশেপাশের অস্ফুট গুঞ্জনেই সঙ্গীতরত যুবকটির পরিচয় মিলিল—কাজী নজরুল ইসলাম। গৃহস্বামী মোহিতলালের গুণমুগ্ধ বন্ধু সাহিত্যরসিক কবিরাজ জীবনকালী রায় আমাদিগকেও আপ্যায়িত করিলেন। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। চন্দ্রে গ্রহণ লাগিল বলিয়া। আমরা শকুন্তলা-সমাগমান্তে রাজধানী-প্রত্যাগমনবাধ্য রাজা দুষ্মন্তের মত বিশেষ অনিচ্ছার সঙ্গে আহিরীটোলা ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলাম। গান চলিতে লাগিল।

অনেক রাত্রে নয়নমনোহারী বিবিধ পুরস্কারাকীর্ণ কর্তব্য সমাপন করিয়া যখন মেসের দিকে ফিরিলাম, তখন বাসন্তী নিশীথে সদ্য-রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্র প্রসন্ন হাস্য বিকিরণ করিতেছেন। আমরাও আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে লঘু মেঘের মত পক্ষবিস্তার করিয়া আসিতেছিলাম। ভাঙা মানিকতলা হইতে আমহার্স্ট স্ট্রীটে ঢুকিতেই সেই স্বরালঙ্কৃত বজ্রনির্ঘোষ কানে আসিল—

"নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান—"

জলসা তখনও শেষ হয় নাই জানিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিলাম। পথের জনতা তখন বিরল হইয়া আসিয়াছে। মোহিতলাল বাহিরের একটা চেয়ারে আসিয়া বসিয়াছেন; তাঁহার পাশে একজন নগ্নগাত্র স্বর্ণবর্ণ পুরুষ গামছা কাঁধে বসিয়া হাস্য-পরিহাসে অবশিষ্ট কয়েকজনকে মাতাইয়া রাখিয়াছেন। ভিতরে গান চলিতেছে। নজরুল ইসলামের বোতাম-খোলা পিরহান ঘামে এবং পানের

পিচে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কলকণ্ঠের বিরাম নাই। "বিদ্রোহী"র প্রলাপ পড়িয়া যে মানুষটির কল্পনা করিয়াছিলাম, ইঁহার সহিত তাঁহার মিল নাই। বর্তমানের মানুষটিকে ভালবাসা যায়, সমালোচনা করা যায় না। এটনা-বিসুভিয়াসের মত সঙ্গীতগর্ভ এই পুরুষ, ইহার ক্রেটার-মুখে গানের লাভাস্রোত অবিশ্রান্ত নির্গত হইতেছে।

গান থামিতেই আমরা সরিয়া পড়িলাম, কিন্তু তৎপূর্বে সেই বিদূষক ব্রাহ্মণটির পরিচয় সংগ্রহ করিলাম। তিনি স্বনামখ্যাত শরৎ পণ্ডিত—দাঠাকুর। পরে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছে। এইদিনকার গানের আসরে আরও দুইজন সাহিত্যিককে দেখিয়াছিলাম, তাঁহারাও পরে আমার বন্ধু হইয়াছেন—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। আমার যাত্রাপথে বিজ্ঞানের নৌকাকে বানচাল করিবার শৈবালদাম এইভাবে সঞ্চিত হইতে লাগিল।

গ্রীষ্মাবকাশে দিনাজপুরে আসিলাম। কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ বৈশাখে (১৩৩০) আমার বিবাহ ৪ঠা আষাঢ়। দিনাজপুরে গিয়াই নিদারুণ অর্শরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। বহু কষ্টে সামলাইয়া লইয়া মাত্র পাঁচ-ছয় জন আত্মীয় ও বন্ধুসহ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ১৯শে জুন (১৯২৩) মঙ্গলবার প্রায় গোধূলিলগ্নে শ্যামবাজারে শ্যাম স্কোয়ারের পূর্বদিক-সংলগ্ন একটি বৃহৎ বাড়িতে (রামলাল দত্তের) অগিল্ভি হস্টেল ও সায়ান্স কলেজ মেসের বন্ধুদের আনন্দহুলাহুলির মধ্যে শ্রীমতী সুধারাণী চৌধুরীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। সেই দিন সেই শুভলগ্নেই আমার নিরুদ্দেশযাত্রার পরিবহন-বিভাগের একটি ছাড়া আর সব কয়টি নৌকাই ভাঙিয়া খান খান হইয়া গেল। আমার যান ও পথ নির্দিষ্ট হইল। আমি অনেক অশান্তি হইতে বাঁচিয়া গেলাম। বঙ্গবাণী সেই ১লা আষাঢ়ে আমার মুখ দিয়া বলাইলেন—

গুরু গুরু গুরুধ্বনি আমার বুকের মাঝে
সে কি তুমি আসছ ব'লে, সে কি তোমার চরণ বাজে,
আমার বুকের মাঝে?

অতীত আমার লুপ্ত হ'ল
স্মৃতি অনাদরেই ম'ল
পিছনে মোর সব একাকার, সমুখে দীপ তোমার রাজে।
বাতাস আনে গন্ধ তোমার আঁচল হতে
দূর সাগরে টান পড়েছে ভাসব এবার জীবন-স্রোতে।

শুনতে পেলাম তোমার ভাষণ,
মন্দিরে ওই পাতব আসন,
তোমার চরণ লাগি বল রইব সেজে কেমন সাজে!

একাদশ তরঙ্গ

নিরুপায় অবতরণ (Forced landing)

তথাপি তখনও বিজ্ঞানের আশ্রয় ত্যাগ করিলাম না, এক রকম বুড়ি ছুঁইয়া জীবনের লুকাচুরি খেলায় যত রকমের অনাচার সম্ভব সকলই করিতে লাগিলাম। বন্ধু শৈলজারঞ্জন মজুমদার (অধুনা শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতাচার্য) নারীসুলভ মধুর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিতেন, নিত্যসঙ্গী অজিতনারায়ণ চৌধুরী বাঁশের বাঁশীতে সেই গান বাজাইতেন, আর আমি সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ালোকে ছাদের ময়লা জলের ট্যাঙ্কের উপর চড়িয়া পশ্চিম দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া "সুদূরের পিয়াসী" হইয়া বসিয়া থাকিতাম ; শহরের ধূলিধূম্রজালের মধ্যে ক্লান্ত রক্তাভ সূর্য কখন যে অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িতেন জানিতেও পারিতাম না, অন্ধকারে ও শিশিরে চারিদিক কালো ও আর্দ্র হইয়া একটা দুশ্ছেদ্য আবরণ রচনা করিয়া আমার দৈনন্দিন কঠিন কর্তব্য হইতে আমাকে সস্নেহে আড়াল করিয়া রাখিত, উৎকল-নন্দন পাচকপ্রভুর কাংস্য কণ্ঠে যখন খাওয়ার ঘণ্টা নিনাদিত হইত, তখন নামিয়া আসিতাম। যদিও সদ্য-বিবাহিত, তবু তখনও আইবুড়োর আবেশ ও অভ্যাস কাটে নাই। এই অবস্থাতেই "ছাদ-বিহার" কবিতা লিখিয়াছিলাম, ইহাতে মেসের বন্ধু সকলেরই নাম ছিল, পরে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র নবম সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইয়া মেসে পাড়ায় এবং কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। দীর্ঘ কবিতা, গোড়া ও শেষটুকু উদ্ধার করিতেছি, সমগ্র কবিতাটি আমার 'অঙ্গুষ্ঠে' আছে—

বিকেল হ'লেই ছাদ আমারে ক'ষে যে দেয় টান,
কত প্রেমের 'ওজোন'-বাতাস বয় সেথা উজান ;
(আমি) থাকতে নারি ঘরে
তাড়াহুড়ো ক'রে
যা হোক কিছু মুড়ি-চিঁড়ে না চিবিয়ে গিলে
(মেসের) জনকয়েক মিলে
ছাতে ছুটি বেহুঁশ হয়ে যেন
মৌতাতেরি সময় হ'লে কালাচাঁদের প্রিয় ভক্ত হেন।

পরস্পরের অগোচরে হেথাহোথা দৃষ্টিবাণ হানি,
মনের কোণে দুষ্ট আশা করে কানাকানি—
একটা মাছও পড়বে নাকি জালে ?
এদিক-ওদিক দেখা তো যায় পালে পালে
পঞ্চ হতে পঞ্চাশৎ পার।—

* * *

পায়চারিতে শ্রান্ত হয়ে এক দিকেতে দৃষ্টি স্থির করি
ময়লা জলের ট্যাঙ্কের উপর চড়ি
একটি হৃদয় জয়ের তরে করি বিষম ধ্যান
হারায় চেতন হারায় সকল জ্ঞান।
ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে আঁধার
ছোট বড় যায় না বোঝা লাল কি কালো পাড়,
যায় না বোঝা, তবু তাকাই
অন্ধকারের আড়ালেতে ইশারা তার যদি একটু পাই !
চক্ষু টাটায়, দৃষ্টি নাহি চলে,
ভুলি আশার ছলে
তবু দেখি আঁধার ঠেলে ঠেলে
ঐটুকু মোর চরম আরাম আমি মেসের ছেলে।

আমার রচনাশক্তির নিদর্শন হিসাবে এই উদ্ধৃতি নয়, মেস-হস্টেলবাসী কলিকাতার ছাত্র-সমাজের তৎকালীন রমণীয়তাবিহীন রুক্ষ-মরুতৃষ্ণার পরিচয় ইহাতে আছে। ছাদে উঠিয়া এই বৈকালিক মরীচিকা দর্শন তাহাদের অকারণ বিলাস ছিল না, বুভুক্ষিতের নিদারুণ হাহাকার ইহার মধ্যে ধ্বনিত হইত। তাহারা সত্য সত্যই এক ক্লেশকর অবস্থায় 'হুলো'দের অতৃপ্ত হুলাহুলির মধ্যে কাল কাটাইত। সহশিক্ষার স্নিগ্ধতার সুযোগপ্রাপ্ত এ যুগের সৌভাগ্যশালীরা আমাদের সে যুগের আশ্রমপীড়ার বেদনার পরিমাণ বুঝিবেন না। স্কুল-কলেজ পথ-ঘাট পার্ক-লেকের নয়নমনোবিহারের অবাধ অধিকারের মধ্যে "ছাদ-বিহার" তাঁহাদের কাছে বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইবে।

আমার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে একে একে মেসের অনেকের আইবুড়ো অপবাদ ঘুচিতে লাগিল, এবং ১৩৩০, ৪ঠা আষাঢ়ের পর দুই মাসের মধ্যেই শুষ্ক রুক্ষ তপ্ত পরিবেশই ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ ও সরস হইয়া উঠিল। আমার সহবাসী (রুম-মেট) প্রফুল্লেরও বিবাহ হইল শ্যামবাজার অঞ্চলে। তাহার

শ্বশুরবাড়ি-যাত্রার দৈনন্দিন আনুষ্ঠানিক পর্ব উপলক্ষ্যে প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমরাও মাতিয়া উঠিতাম। প্রফুল্লের কালো মুখের ব্রণসঙ্কুল-কলঙ্ক-মুক্তির সাধনায় রোজ এক শিশি হ্যাজেলিন স্নো খরচ হইত, সাবানও লাগিত একাধিক। তাহাকে সাজাইয়া-গুছাইয়া পরিপাটি করিয়া অভিসারে পাঠাইবার কাজে আমরা এমনি ব্যস্ত হইয়া থাকিতাম যে, ছাদের সিঁড়িতে দেখিতে দেখিতে শ্যাওলা পড়িল; প্রফুল্লের এসেন্স-স্নোয়ের গন্ধ মরিতে না মরিতেই বন্ধু রমেশচন্দ্র সেনের (বর্তমানে বঙ্গবাসী কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক) ইহ-লৌকিক সদ্গতি করিবার জন্য আমরা সদলবলে ট্রেন, স্টীমার ও নৌকাযোগে বরিশাল ঝালকাঠি হইয়া কুলকাঠিতে উপস্থিত হইলাম।

আমি আবাল্য উত্তরবঙ্গে মানুষ। প্রধানত পূর্ববঙ্গের "কলোনি" হইলেও বরেন্দ্রভূমের নিজস্ব বিশেষত্বে উত্তরবঙ্গ পূর্ববঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই। রমেশের বিবাহে প্রথম পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়া পূর্ববঙ্গের বিশেষত্ব প্রণিধান করিলাম। তাহার পর অসংখ্য বার যাতায়াত করিয়াছি, নানা বন্ধু ও বান্ধবীর মধ্যস্থতায় ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে, কিন্তু সেই ১৯২৩ সনের জুলাই মাসে প্রথম সন্দর্শনেই যে নিবিড় প্রেম উপজিয়াছিল, তাহার ঘোর আর কাটাইতে পারি নাই। সন্ধানী আলোক ফেলিয়া নিশীথ অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া স্টীমার চলিয়াছে। নদীবক্ষে সততসঞ্চরমাণ কচুরিপানাগুলি ঢেউয়ের আঘাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে—তীব্র আলোকে সে দৃশ্য অপরূপ লাগিয়াছিল। ভোরের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে শৈবালাকীর্ণ জলস্রোতের মোহ কাটিয়া গিয়া নদীর দুই তীরে দিগ্বলয় পর্যন্ত বিস্তৃত নারিকেল-গুবাক-জাতীয় তরুশ্রেণীর ঋজু দীর্ঘায়ত সমারোহ জাগিল,—কালিদাস সম্ভবত 'রঘুবংশে' ইহাকেই "তমালতালীবনরাজিনীলা" বলিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ খালপথে নৌকাযোগে যখন কুলকাঠি গিয়া পৌঁছিলাম, পূর্ববঙ্গের মহিমা তখনই প্রথম আমার প্রত্যক্ষগোচর হইল। ওই জলকাদা-পিচ্ছিল অরণ্যের মাঝখানে মানুষ যে অত সহজে অমন সুখে বাস করিতে পারে, তাহা এই ভাবে না দেখিলে আমার প্রত্যয় হইত না। মানুষগুলা সজীব ও কষ্টসহিষ্ণু, প্রতিনিয়ত বিরূপ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া সব-কিছু সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লইতেছে, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের আলস্য ও অবসাদ হইতে আসিয়া সে দৃশ্য সত্যই বিস্ময়কর ঠেকিল। যে ডাব কাটিয়া আমাদের প্রাথমিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইল, তাহা আকারে যেমন অতিকায় তাহার আভ্যন্তরীণ সলিল পরিমাণে তেমনই পর্যাপ্ত। সেই সর্বপ্রথম কাছিমের ডিম খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। যাহারা অস্বাভাবিক ও আকস্মিক দেশবিভাগের ফলে ছিন্নমূল হইয়া এই

স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের সর্বনাশা ক্ষতির পরিমাণ আমি অন্তত কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারি। তাহা অপূরণীয় এবং তাহার স্মৃতি হৃদয়বিদারক।

কিন্তু এই রম্য সজল বনভূমি হইতে সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মেস হইতে শ্যামবাজারে শ্বশুরালয়ে সুচিকিৎসার্থ নীত হইলাম। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর ছয় বৎসর যে পরিবেশের মধ্যে প্রধানত বাস করিতেছিলাম, তাহার সহিত আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। অসার সংসারে একমাত্র সার শ্বশুরমন্দিরে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিদি-শাশুড়ী ও শ্যালিকা-শ্যালক সম্প্রদায়ের (সংখ্যায় অনেকগুলি) সেবায় এমন একটা নূতন বাদশাহীর আস্বাদ পাইলাম, যাহা ছাড়িয়া পুরাতন মেসে প্রত্যাবর্তন আর সহজ ছিল না। আমার মতিগতিই কেমন যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল। পাস করিতে হইবে, পাস করিয়া অচিরাৎ উপার্জনক্ষম হওয়াও প্রয়োজন, অবিমিশ্র আরামের মধ্যে এই বোধটুকু খোঁচার মত জাগিয়া রহিল। এই কালে একটি মাত্র সৎকার্য করিয়াছিলাম, তাহা সাহিত্য-বিষয়ক ;—জর্জ সেণ্টস্‌বেরির সুবৃহৎ ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসখানি বিশেষ যত্নে আয়ত্ত করিয়াছিলাম, বইখানি কোনও এম. এ.-পরীক্ষার্থী বন্ধুর কৃপায় সংগ্রহ হইয়াছিল। পরে এই জ্ঞান অতিশয় কাজে লাগিয়াছিল।

ছয় নম্বর বাদুড়বাগান লেনের মেসে না ফিরিবার অজুহাত মনে মনে খুঁজিতেছিলাম, শেষ পর্যন্ত ফিরিতেই হইল—কিন্তু অল্পকালের জন্য। একাসনী (single seated) ঘর না হইলে পরীক্ষার পড়া করা সম্ভব নয়, ইহাই অবিরত প্রচার করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত ২৭নং বাদুড়বাগান লেনের সাত-মিশালী মেসে (প্রধানত চাকুরি-জীবীদের) তেতলার একটি সিঙ্গেল-সীটেড ঘরে লটবহর লইয়া উপস্থিত হইলাম—১৯২৩ সনের ডিসেম্বর মাসে। তেতলায় নূতন সংযোজিত নয়খানি পাশাপাশি সঙ্কীর্ণ একাসনী ঘর। ইহারই একটিতে কবি মোহিতলালের সাময়িক আশ্রম ছিল, আর একটিতে থাকিতেন বিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে যুগের সর্বোত্তম ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র রায়। বৎসরাধিককালের মধ্যেই তিনি সেখানেই নিজের ঠিকুজি বিচার করিতে করিতে পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রয়োগে আপন বহুমূল্য জীবনকে প্রায় সূত্রপাতেই খণ্ডিত করিয়া বাংলা দেশেরও সমূহ ক্ষতি করেন। তাঁহার মত অসাধারণ প্রতিভাধরের সংস্পর্শে আমি কমই আসিয়াছি। আমি এবং আমার স্কটিশচার্চ কলেজের সহপাঠী, তখন বিজ্ঞান কলেজের কেমিস্ট্রির কৃতী ছাত্র যোগেন্দ্রমোহন সাহা উভয়ে এই বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত ভক্ত ছিলাম।

এই আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুর পরে একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত আপার সারকুলার রোডে হাত ধরাধরি করিয়া পায়চারি করিতে করিতে দুইজনেই খুব কাঁদিয়াছিলাম, মনে আছে। যোগেন্দ্রমোহন সুগার টেক্‌নলজিতে পৃথিবী-জোড়া নাম কিনিয়া অনেক নূতন আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করিয়া শ্রদ্ধেয়ের যথার্থ স্মৃতিতর্পণ করিতেছেন, আমিও আত্মস্মৃতি মন্থনের অবকাশে সেই পথভ্রান্ত বৈজ্ঞানিককে স্মরণ করিয়া ধন্য হইলাম।

সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেনের মেসটি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে একটি আদর্শ স্থান ছিল। ইহাকে সাহিত্যের প্রথম শিক্ষার্থীর "হেয়ার হিন্দু স্কুল" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মোহিতলালের উল্লেখ করিয়াছি, তেতলার আর এক ঘরে থাকিতেন বেথুন কলেজের গণিতাধ্যাপক প্রসিদ্ধ পরেশচন্দ্র সেনের পুত্র শিক্ষাবিদ্ যতীশচন্দ্র সেন; তিনি নিজে সাহিত্য-রসিক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঘরে সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের সমাগম হইত। এইখানেই নিয়মিত আসিতেন কবি ও কবিরাজ জীবনময় রায় এবং ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের পুত্র অস্থির প্রতিভাবান লেখক যোগানন্দ দাস। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমৃদ্ধ আমার আশ্চর্য স্মৃতিভাণ্ডারের খবর কেমন করিয়া একদিন শেষোক্ত দুইজন পাইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানই শেষ পর্যন্ত আমার বিজ্ঞানের কাল হইল।

আমি যে কবিতা লিখি, সে খবরও তাঁহাদের অজ্ঞাত রহিল না। পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। স্বভাবত স্নেহশীল জীবনময় রায় অচিরাৎ আমার জীবনদা হইলেন। যোগানন্দ আত্মসমাহিত গম্ভীর পুরুষ, তাঁহার সহিত যথেষ্ট মাখামাখি হইল বটে, কিন্তু 'আপনি'র ব্যবধান আজিও ঘুচিল না, যদিও আমি তাঁহাকে সেই সময় হইতেই দাদা বলিয়া আসিতেছি। সেখানেই আর এক ঘরে ছিলেন অগিল্‌ভি হস্টেলে আমার সাহিত্যসাধনার উৎসাহদাতা, গোড়ায় কবিতা-গল্প এবং শেষে অর্থনৈতিক প্রবন্ধলেখক সুধানলিনীকান্ত দে—এখন নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সচিব সুধাকান্ত দে। তিনি আমার পূর্বপরিচিত, প্রথমে তাঁহার ঘরেই আড্ডা জমিত। পরে যতীশচন্দ্রের ঘরেও প্রবেশাধিকার পাইলাম, সেখানে প্রধানত সাহিত্য-বিষয়ক মজলিস বসিতে লাগিল। সুতরাং যথাবিহিত বিজ্ঞানের পরীক্ষায় বসার সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইতে লাগিল।

আমি যে কবিতা লিখি এবং রবীন্দ্রনাথকে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছি—এই সংবাদ অচিরকাল মধ্যে মোহিতলালের কর্ণগোচর হইল। তিনি আপনাতে আপনি মত্ত দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ, আমাকে ডাকিয়া আলাপ করিবার

কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। অভিমানে আঘাত লাগিল। দমিয়া গেলাম, কিন্তু হাল ছাড়িলাম না। সুকৌশলে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রবেশ করিবার কালেও এই একই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। দুর্বল মানুষের অহমিকার সুযোগ লইতে জানিলেই কাজ হয়!

বস্তুত, মোহিতলাল সম্পর্কে তখন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই জানিতাম না। তিনি কবিতা লেখেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহার ঘরে আগত ব্যক্তিদের সুললিত উচ্চকণ্ঠে তাহা পড়িয়া শোনান—এইটুকুই জানা ছিল, বুঝিতে পারিতাম তাঁহারা ভক্তজন, কেহই সাহিত্যিক নহেন। সংবাদ পাইলাম কিছুদিন পূর্বে (ফেব্রুয়ারি ১৯২২) 'স্বপন-পসারী' নামক তাঁহার একখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে পাওয়া যায়। পাঁচ সিকা পয়সা কষ্টে যোগাড় করিয়া এক খণ্ড 'স্বপন-পসারী' সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। রাত্রে বইখানি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া "পুরূরবা" কবিতাটি বাছিয়া লইলাম। পরদিন অতি প্রত্যুষে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলাম।

কানে পৈতা তুলিয়া একটা নীল-ডোরাকাটা-লুঙ্গি-পরিহিত নগ্নগাত্র কৃষ্ণকায় কবি দাঁতন মুখে এবং বদনা হাতে প্রত্যুষেই আমার দ্বার-আঙ্গিনা পার হইয়া যাইতেন। খুব যে সুদৃশ্য বোধ হইত তাহা নয়, তবু সহিয়া গিয়াছিল। শীতকালে একটা মোটা ঢিলাঢালা গেঞ্জি গায়ে চড়িত। সেদিন তাঁহার দরজায় তালা বন্ধ করিবার শব্দ কানে আসা মাত্রই আমি প্রস্তুত হইলাম। উচ্চৈঃস্বরে "পুরূরবা"-পাঠ শুরু হইল। সেই স্বল্প ব্যবধান পার হইতে হইতে মোহিতলাল সম্ভবত "পরিস্থিতি"টা ঠিক ঠাহর করিতে পারিলেন না, একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তিনি যখন ফিরিলেন আমার পাঠ তখন জমিয়া উঠিয়াছে। তিনি সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বদ্‌নাটি বারান্দায় নামাইয়া রাখিলেন। আড়চোখে সকলই দেখিলাম, কিন্তু পড়া থামাইলাম না। মহাদেবের পরাজয় হইয়াছিল, মোহিতলালেরও পরাজয় ঘটিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া চৌকাঠের উপর বসিতে বসিতে বলিলেন, ও, "পুরূরবা" পড়ছেন বুঝি! আমি তখন "বালারুণ-রক্তরাগে অমৃতায়মান্" বলিয়া পাঠ সাঙ্গ করিতেছি। বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, চমৎকার! বলিলেন, আপনার পড়া ভালই, কিন্তু একটু দোষ আছে।—বলিয়া নিজেই বইখানা টানিয়া লইয়া দীর্ঘ কবিতাটি আদ্যন্ত পড়িয়া দিলেন। চৌকাঠ দখল করিয়া তিনি স্বয়ং বসিয়া আছেন, বাহিরে বারান্দায় ভিড় জমিয়া গেল। সাঙ্গ হইলে সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, আপনিও নাকি কবিতা লেখেন? শোনা যাবে একদিন।—বলিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, শুনলাম রবীন্দ্রনাথকে নাকি

আপনি গুলে খেয়েছেন, এদিকে পড়েন তো এম. এস-সি ! সামলান কি ক'রে ?

সত্যই তার সামলাইতে পারিতেছিলাম না। এই মেসের পরিবেশ ছিল প্রধানত সাহিত্যিক। এক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র রায়, তিনিও সাহিত্যরসিক ছিলেন, দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ে সরস প্রবন্ধ দুই-চারিটি লিখিয়া 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিও হঠাৎ চলিয়া গেলেন। তা ছাড়া মূলেই আমার বিজ্ঞানের "ধর" নয় তো আমি কি করিব? যত দিন যাইতে লাগিল আরও অনিশ্চিতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলাম।

ভগবান আমার সহায় হইলেন। ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ ও কঠিন ব্যাধি-ব্যপদেশে মাসিক বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে—এই সংবাদ বাবাকে জানাইয়াছিলাম। শেষ কয়েক মাসের বেতন কলেজে দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু পরীক্ষার মোটা ফীও দেয় হইয়াছে। একটি পোস্টকার্ডের "পুনশ্চে" সবিনয়ে তাঁহার নিকট বাকি মাহিনা ও ফী অবিলম্বে প্রেরণ করার কথা নিবেদন করিলাম। আমাদের সংসারে তখন "ডায়ার্কি" চলিতেছে, পিতার নির্ব্যূঢ় মালিকানা স্বত্বে সদ্য-উপার্জনশীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তাবলেপ পড়িয়াছে, বাবাও সুবিধামত রাশ ছাড়িয়া কিছু কিছু বোঝা বড়দার স্কন্ধে চাপাইতেছেন। দ্বন্দ্বও যে না বাধিতেছে তাহা নয়। বাবা অক্ষমতার অজুহাতে আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া বড়দার দরবারে বিষয়টি "রেফার" করিতে বলিলেন। বিরক্তির সঙ্গে তাহাই করিলাম। সেখান হইতে অবিলম্বে প্রার্থিত জবাব আসিল—আমার হাত খালি, পুনরায় বাবার শরণাপন্ন হও। আমার পরীক্ষা না-দেওয়ার মতলব হাসিল হইল। কপট ক্রোধে বাবাকে জানাইলাম, আমি পরীক্ষা দিব না এবং অতঃপর আমার মাসিক বরাদ্দ আমাকে পাঠানোর দায় হইতে আপনাকে অব্যাহতি দিলাম। নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করিয়া লইব। তিনি যেন ক্ষমা করেন। বাবা বা বড়দার নিকট হইতে নিয়মিত অর্থাগমের সেই শেষ। পরীক্ষার হাত হইতে এই ছলে বাঁচিতে গিয়া আমি স্বেচ্ছায় কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইলাম।

এরোপ্লেনে একক বিমানচারী ব্যক্তির পেট্রলের তহবিল অকস্মাৎ শূন্যে ফুরাইয়া আসিলে তাহাকে বাধ্য হইয়া নিরুপায় ভাবে অবতরণ করিতে হয়—সেই অবস্থায় যেখানেই আসিয়া প্লেন ভূমি স্পর্শ করুক তাহাকে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেই হয়। আমারও পেট্রল ফুরাইয়া আসিয়াছিল, সম্বল ছিল এম. এস-সি.র মূল্যবান বইগুলি। লক্ষ্য ছিল সাহিত্যসেবা; কিন্তু কোথায় "বাধ্যতামূলক" অবতরণ ঘটিবে, তাহা আন্দাজ করা কঠিন ছিল।

কঠিন ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রথমেই একটা রূঢ় ধাক্কা খাইলাম, দেখিলাম, এতদিনের আশ্রয় প্লেনখানি ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে—নিজে অক্ষত আছি। তাহারই ভগ্নাবশেষগুলি অর্থাৎ পাঠ্য বইগুলি বেচিয়া জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

এই অসহায় অনিশ্চিত অবস্থায় মনের মধ্যে কি বিপর্যয় ঘটিল জানি না, কলমের ডগায় ব্যঙ্গকবিতার বান ডাকিল। কামস্কাটকীয় ছন্দ রচনার ছলে কাজী নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী"কে ব্যঙ্গ করিয়া একদিন "ব্যাঙ" লিখিয়া ফেলিলাম এবং প্রত্যহই একাধিক কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম। আমার জীবনে এই রকমই ঘটে। পরে মায়ের কঠিন অসুখের কালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ব্যঙ্গগল্প "হসন্ত তরফদার" লিখিয়াছিলাম—অশোক চট্টোপাধ্যায় তাহার কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করিয়া কুড্মলরামের লেখা বলিয়া 'প্রবাসী'তে (ফাল্গুন ১৩৩২) ছাপিয়াছিলেন। আরও পরে যেদিন নিতান্ত সহায়সম্পদহীন বিপন্ন অবস্থায় 'প্রবাসী'র চাকুরিতে ইস্তফা দিই, ঠিক সেই দিনই (৭ অক্টোবর ১৯৩১) 'শনিবারের চিঠি'র সদ্য-স্থাপিত ছাপাখানার ভাঙা তক্তায় বসিয়া "বিবাহের চেয়ে বড়ো" নামক একটি দীর্ঘ ব্যঙ্গকবিতা লিখিয়াছিলাম।

একদিন প্রাতে আমার ঘরে বেশ ঘটা করিয়া বসিয়া দুই-চারিজন বন্ধুর নিকট কামস্কাটকীয় ছন্দ এবং বিশেষ জোর দিয়া "আমি ব্যাঙ" পাঠ করিতেছি, মোহিতলাল ধীরে ধীরে আমার দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই "পুরূরবা"-পাঠের পর তাঁহার আর এই অধীনের দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ হয় নাই—কবিতা শোনা তো দূরের কথা। পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তিনি তখন নজরুল ইসলামের প্রতি অপ্রসন্ন তাই "বিদ্রোহী"র প্যারডি কানে প্রবেশ করিতেই আত্মবিস্মৃত ভাবে আমার ঘরে চলিয়া আসিয়াছেন। সমগ্র কবিতাটি আবার তাঁহাকে শুনাইতে হইল। তিনি আমাকে আশাতীত রূপে তারিফ করিলেন এবং মেঝেয় পাতা শতরঞ্চিতে বসিয়া আমার অন্যান্য রচনাও শুনিতে চাহিলেন। সেই দিনই সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত পূর্বে উল্লিখিত "বকুলবনের পথে" তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই কবিতা আপনি এতদিন ফেলে রেখেছেন, ছাপিয়ে দিন, ছাপিয়ে দিন। তাঁহার সেই আদেশের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে সেই কবিতা খণ্ডিত ভাবে ১৩৫৯ সালের শারদীয়া সংখ্যা 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

মোহিতলালের সার্টিফিকেট পাইয়া আমি অকূল পাথারের সমূহ বিপদের মধ্যেও যেন কূল পাইলাম। ধীরে ধীরে আমার লক্ষ্য ও গম্য স্থল যেন নির্দিষ্ট

হইয়া আসিতে লাগিল। আরও শুভ যোগাযোগ ঘটিতে বিলম্ব হইল না। এই সময় যোগানন্দ দাসের মুখে প্রায়ই একটি নূতন পত্রিকার আশু প্রকাশ সম্ভাবনার কথা শুনিতাম। বিলাত হইতে সদ্য-প্রত্যাবৃত্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল হইয়াছে, তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। উইট, হিউমার ও স্যাটায়ার রচনায় তাঁহার অসাধারণ স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল—পরে তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে তাহা বুঝিয়াছিলাম। এই বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি বাংলা দেশে আমি দেখি নাই। এ দেশের হাস্য ও ব্যঙ্গ রসিকদের রুচি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নগামী; অশোক চট্টোপাধ্যায় ছিলেন শিক্ষিত মার্জিতরুচি রসিক, কাহাকেও "বিলো দি বেল্ট হিট" করিতে হইলে নিভৃতে একান্ত অন্তরঙ্গ মহলেই তাহা করিতেন। যাহা হউক, গুরুগম্ভীর 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় তাঁহার এই রস-রসিকতা চরিতার্থ হইবার উপায় ছিল না বলিয়া তিনি পত্রান্তর প্রকাশের সঙ্কল্প করিতেছিলেন। কারণও ঘটিয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-প্রবর্তিত স্বরাজ্য দলের রাজনীতি চট্টোপাধ্যায়-গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করে নাই। 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" প্রবীণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তর্কশাস্ত্রসম্মত যুক্তি প্রয়োগে যে চেষ্টা করিতেন, তরুণ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের তাহা মনঃপূত হইত না। সুতরাং 'শনিবারের চিঠি'র উদ্ভব অনিবার্য হইল।

পরে জানিয়াছিলাম, একদা সন্ধ্যার আবছায়া-অন্ধকারে হেদুয়া পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া চানাচুর-চিনাবাদাম চিবাইতে চিবাইতে 'শনিবারের চিঠি'র নাম ও নীতি পরিকল্পিত হয়। অশোক চট্টোপাধ্যায়ই প্রধান, সঙ্গে ছিলেন যোগানন্দ দাস, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সুধীরকুমার চৌধুরী ও বর্তমানে সার-কারখানা-খ্যাত সিঁদরির টাউন অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর প্রভাকর দাস। আমি তখন সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেন মেসের সঙ্কীর্ণ কোটরে ক্ষুৎপিপাসাতুর অসহায় অবস্থায় চিঁহি চিঁহি করিতেছি, পাখায় জোর পাইলে কোন্ গগনে উড্ডীন হইব তাহাও নিজে জানি না।

ব্যঙ্গরচনায় হাত পাকাইতেছিলাম, সুতরাং একটি ব্যঙ্গপত্রিকা প্রকাশিত হইবে জানিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম, কে বা কাহারা তাহা প্রকাশ করিবে তাহা জানা আমার পক্ষে অনাবশ্যক ছিল। যোগানন্দ দাস আসিতেন যাইতেন, বাপের বাড়ির দেশের কোন লোক শ্বশুরবাড়িতে বেড়াইতে আসিলে সদ্য-বিবাহিতা বধূ বাপের বাড়ির খবর শুনিবার জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, সেই ব্যাকুলতা লইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতাম। আমার মনের বিরহকাতর অবস্থা যোগানন্দদা বুঝিতেন না, কাটা কাটা কঠিন জবাব দিয়া

তিনি আমাকে নিরস্ত ও নিরাশ করিতেন। তাঁহার ভাবখানা সর্বদাই এইরূপ ছিল—সে সব অতি গোপনীয় গুহ্য কথা; তুমি বিজ্ঞানের আদার ব্যাপারী, সাহিত্যের জাহাজের খবরে তোমার প্রয়োজন কি? তাঁহার নিকট হইতে কোনদিন কোন কথাই আদায় করিতে পারি নাই—এই ক্ষোভ আমার এখনও যায় নাই।

কিন্তু স্নেহাশ্রয় বিস্তার করিয়া আপন তপ্ত পক্ষপুটে আমাকে আশ্রয় দিলেন জীবনময় রায়। তিনি সর্বপ্রকারে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য উদ্যত হইয়াই ছিলেন। আমার মাসিক অর্থাগমে ছেদ ঘটিয়াছে সে সংবাদ তিনি জানিতেন, এম. এস-সি.-র পাঠ্যপুস্তক দামে ও ওজনে ভারী হইলেও পরিমাণে অফুরন্ত নয়; সুতরাং আমার কৃপোদক ধীরে ধীরে কাদায় আসিয়া ঠেকিতে-ছিল, দৈনিক জীবনযাত্রা ক্রমশ ঘোলাটে হইয়া আসিতেছিল।

একটি প্রশ্ন স্বতই বুদ্ধিমান পাঠকের মনে জাগিবে, এখানেই যাহার জবাব দেওয়া প্রয়োজন। এই নিদারুণ অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্যে কলিকাতাবাসী শ্বশুর মহাশয়ের গৃহে আমি আশ্রয় লইলাম না কেন? সত্য বটে, তিনি কলিকাতাতেই স্থায়ীভাবে সপরিবারে বসবাস করিতেছিলেন এবং একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীও ছিলেন। তাঁহার ঘাড়ের উপর একবার চাপিতে পারিলে তাঁহার দ্বারাই আমার তদানীন্তন ও ভবিষ্যৎ আর্থিক যাবতীয় বেদনার উপশম অচিরাৎ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। আদি লর্ড সিংহের সহিত সম্পর্কের দরুন কলিকাতার প্রতিষ্ঠাপন্ন মহলে তাঁহার প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু আমার অভিমানে বাধিল। তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, একান্ত আত্ম-নির্ভরশীল ও সক্ষম না হইয়া স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য শ্বশুরবাড়িমুখো হইব না। অনুরোধ-উপরোধ সবিনয়ে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। আজ নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, সেদিন উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই জামাই-বারিকের আস্তাবলে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার অকালমৃত্যু ঘটে নাই। ভগবান আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

আমি তখনও মেসে খাই-দাই এবং আড্ডা দিয়া বেড়াই, আমার চাকুরির খোঁজে কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান স্নেহময় জীবনময়; এই সময়ে মোহিতলালের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করিলাম। আমার খাতাখানি যতই ব্যঙ্গকবিতায় বোঝাই হইতে লাগিল, তিনিও ততই খাতা-বগলে আমাকে লইয়া পরিচিত মহলে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমটা গিয়া আমার পরিচয়-পর্বটা শেষ করিলেই আমি দম দেওয়া ঘড়ির মতন বাজিতে থাকিতাম—কাজী নজরুলের প্যারডিটাই বেশি বাজাইতে

হইত। একদিন মেসের তেতলার বারান্দাতেই তিনি একটি গানের মজলিসের আয়োজন করিলেন, হাস্যরসিক নলিনীকান্ত সরকার হাসির গান গাহিবেন। চন্দ্রগ্রহণের দিন কবিরাজ জীবনকালী রায়ের ঘরে তাঁহাকে তবলা বাজাইতে দেখিয়াছিলাম, তিনি যে স্বয়ং গান গাহিতে পারেন, আবার হাসির গান রচনা করিতেও পারেন তাহা দেখিয়া ও জানিয়া বিস্ময় বোধ করিলাম। তাঁহার সহিত সহজেই পরিচয় ঘটিল। সে পরিচয় কখনও একদিনের জন্য ক্ষুন্ন হয় নাই, অথচ আমরা দুই জনেই পরস্পরের নাকের কাছে বহুবার আগুন লইয়া মহরম খেলিয়াছি। ইহার কারণ, এমন বন্ধুবৎসল অথচ নির্বিরোধ মানুষ কদাচিৎ মেলে। নজরুল এবং দিলীপকুমার উভয়েই তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, অথচ আমি এই দুই জনকেই কম আঘাত হানি নাই। ইহাতে বন্ধুবিচ্ছেদ হয় নাই, ইহার কারণ নলিনীদা গোড়া হইতেই বুঝিয়াছিলেন, আমার ব্যঙ্গ কখনই ঈর্ষা-((malice)-প্রণোদিত ছিল না। সাহিত্য-সংস্কারে আঘাত লাগিলে লেখার দ্বারাই যথাসাধ্য আঘাত করিতাম, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোনও দিনই সেই বিবাদকে টানিয়া আনি নাই।

সেই হাসির গানের আসরেই পরবর্তীকালে আমার বন্ধু ও সহকর্মী সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বয়সে আমার অপেক্ষা চার-পাঁচ বছরের ছোট হইলেও তখনই লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া সওদাগরী আপিসে কেরানীগিরি করিতেন। মোহিতলালের প্রত্যক্ষ ছাত্র না হইলেও ছাত্রের বন্ধু হিসাবে তিনি মোহিতলালকে গুরুর মত সমীহ ও শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন, এবং তাঁহার প্রতি ছাত্রের মত সস্নেহ ও সকর্তৃত্ব ব্যবহার করিতে করিতে মোহিতলালও ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি ছাত্র নন। সুবলচন্দ্র স্কুলজীবন হইতেই সাহিত্যিক-ঘেঁষা ছিলেন, প্রসব না করিয়াই গোপালের মা হইয়াছিলেন। তাঁহার এঁচোড়পক্কতার (অবশ্য সাহিত্য ব্যাপারে) বহু কাহিনী পাঁচজনকে শুনাইবার মত। নিতান্ত কাঁচা বয়সেই দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহার সাহিত্যসঙ্গী ছিলেন, আমার সঙ্গে পরিচয়ের সময় তিনি মোহিতলালকে নিত্য সঙ্গদান করিতেছিলেন। মজলিসে পাঁচজনকে "এণ্টারটেন" করিবার মত বিবিধ গুণ তাঁহাতে ছিল—ভাল ম্যাজিক দেখাইতে পারিতেন, মিমিক্রি বা কণ্ঠানুকৃতিতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা যে গুণের জন্য তিনি বাংলা দেশের সাহিত্য-সমাজে পরিচিত হইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়া শেষ পর্যন্ত একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের বৈবাহিক পদে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা হইতেছে তাঁহার নিরলস অকুণ্ঠ সেবা ও সাহচর্যের

ক্ষমতা। আমাদের সুবলচন্দ্র বৃদ্ধবয়সে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্ধের নড়ি হইয়া পড়াতে অনেকের হিংসা উদ্রিক্ত হইয়াছে।

জীবনদার কৃপায় সর্বপ্রথম শ্যামবাজারে একটি ট্যুইশানি জুটিল, মাসিক বেতন কুড়ি টাকা, ছাত্রটি আই. এস-সি. পড়ে। তিন মাস যাইতে না যাইতে জীবনদা ঝামাপুকুরে আরও এক জোড়া ছাত্র জুটাইয়া দিলেন, ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার্থী, বেতন একুনে পঁচিশ। পঁয়তাল্লিশ টাকায় রাজার হালে চলিবার কথা, কারণ তখনও সিগারেট ধরি নাই। কিন্তু জীবনদা চেষ্টা করিলে কি হইবে? ভাগ্য মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। তিন মাস পরে একদিন শ্যামবাজারের ছাত্রটির পিতা দোতলার বারান্দায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া নীচে দণ্ডায়মান আমাকে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ম্যাস্টার, ছেলে কেমন পড়ছে? পরে জানিয়াছিলাম ভদ্রলোক আমাকে অপমান করিবার জন্য প্রশ্ন করেন নাই, তাঁহার ওইসাই বদন, কিন্তু আমার চট্ করিয়া রাগ হইয়া গেল। তর তর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে অভদ্র অসভ্য প্রভৃতি গালাগালি দিয়া তেমনই দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলাম। আর পড়াইতে গেলাম না। অর্থাৎ আমার আয়ের পারা চট্ করিয়া পঁয়তাল্লিশ হইতে পঁচিশে আসিয়া দাঁড়াইল। জীবনদা একবার মাথা চুলকাইলেন, একটু বকিলেন এবং শেষ পর্যন্ত 'কুছ পরোয়া নেহি' বলিয়া আমাকে আশ্বাস দিলেন।

ঠিক এই সময়ে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই শনিবার (১০ই শ্রাবণ ১৩৩১) সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। সম্পাদক ও মুদ্রাকর—যোগানন্দ দাস। ৯১ নং আপার সারকুলার রোড প্রবাসী প্রেসে মুদ্রিত এবং ১০৫নং আপার সারকুলার রোড ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের ঠিকানা হইতে প্রকাশিত।

দ্বাদশ তরঙ্গ

আশ্রয়-কোটর

যত কৃচ্ছ্রসাধনই করা যাক, মাসিক পঁচিশ টাকায় ঘরভাড়া সমেত দৈনিক খোরাক চলে না। এক বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলাম—ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ, তা সে শ্বশুরবাড়িতেই হউক বা বন্ধুবান্ধবদের কাছেই হউক। জীবনদার চেষ্টার বিরাম ছিল না। সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টাখানেকের জন্য ঝামাপুকুরে পড়াইতে যাই, প্রায় বেকারই ছিলাম। প্রচুর লিখিয়া ও পড়িয়াও সময়

কাটিতেছিল না। পরবর্তী জীবনে কি করিব তাহার ঝাপসা নীহারিকা মূর্তি মানস-আকাশে ভাসিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছিল। সে মূর্তি যে ছাপাখানার, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। প্রুফ দেখিতে শেখার তাগিদ স্বতই মনের মধ্যে জাগিতে লাগিল, সওদাগরী আপিসে কেরানীগিরির বা লেজার-রক্ষার নয়। মোহিতলাল তখন 'নব্যভারতে' ও 'ভারতী'তে নিয়মিত লিখিতেছেন। তাঁহার নিকট প্রুফ আসিত, তিনি একা বসিয়া বসিয়া দেখিতেন। সে সুযোগ অবহেলা করিলাম না। মোহিতবাবুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার কাপি-হোল্ডারের পদে বহাল হইয়া গেলাম ; মাঝে মাঝে তাঁহার পড়া প্রুফ টানিয়া লইয়া চিহ্ন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে হইতে দুই-একটা খোদকারি করিয়াও আনন্দ পাইতে লাগিলাম।

ডবল-ক্রাউন ষোলপেজী আকারের একখানি খাম, উপরে সবুজ কালিতে ছাপা চাবুকপ্রহাররত এক ভীম অথচ সুঠাম বীরমূর্তি—যোগানন্দ দাস তাঁহার ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া আমার নাকের সম্মুখে ধরিলেন। সময় প্রাতঃকাল হইলেও শ্রাবণের আকাশে মেঘ থমথম করিতেছিল, সদ্য-বর্ষণে আমার ঘরের সম্মুখের বারান্দা সিক্ত। উল্লাসে ছোঁ মারিয়া খামটি কাড়িয়া লইয়া মূল্যসংগ্রহে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলাম। খামে কাদাজল মাথামাখি হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আবরণ খুলিয়া ভিতরের বহুমূল্য বস্তুটিকে রক্ষা করিতে গিয়া প্রথম সন্দর্শন ঘটিল,—প্রতিকূল অবস্থায় প্রথম সন্দর্শনেই নিবিড় প্রেম জন্মিল। এক আনা মূল্য দিয়া বস্তুটির মালিক হইলাম। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যা। তারিখটাও স্পষ্ট মনে আছে ১১ই শ্রাবণ রবিবার ১৩৩১—২৭ জুলাই ১৯২৪ ; প্রথম প্রকাশের ঠিক পরের দিন।

যোগানন্দ দাসের দাঁড়াইয়া বা বসিয়া আড্ডা দিবার সময় ছিল না, তিনি কাগজ বেচিতে ও বিলি করিতে বাহির হইয়াছেন। তিনি বিদায় লইতেই আমি গুরু গুরু মেঘগর্জনের মধ্যে বত্রিশ পাতার চটি পত্রিকাখানি পড়িতে বসিলাম। মনে হইল, মেঘমেদুর অম্বরের তলে শ্যামবনভূমির মাঝখানে সেই প্রথম প্রিয়সম্ভাষণ শুনিলাম। কোন লেখাতেই যথাযথ নাম নাই, প্রত্যেকটি বেনামে লেখা—একমাত্র সম্পাদক যোগানন্দ দাসের কোনও লেখা থাকিলে তাহার লেখককে চিনি, বাকি সব অজ্ঞাত লেখক। কিন্তু হইলে কি হয়! মনে হইল, সবই যেন আমার লেখা, আমি লিখিলেও ঠিক এমনই লিখিতাম। একটা অদ্ভুত আত্মীয়তা-রস অন্তরে সঞ্চারিত হইল, অকারণ পুলকে মন ভরিয়া গেল। প্রথমেই "মুখবন্ধে" পড়িলাম—

"...আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। এমন কি উদ্দেশ্যহীনতাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য যদি কথনো আপনা-আপনি ফুটেও ওঠে, তা হ'লে আশা যে, তা আপনা-আপনি ঝ'রেও পড়বে। আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমাদের স্বভাবই আমাদের কথনো উদ্দেশ্যযুক্ত ও কথনো উদ্দেশ্যহীন ক'রে চালাবে। উদ্দেশ্যের বা উদ্দেশ্যহীনতার খাতিরে আমরা নিজেদের বিসর্জন দেব না। নিজেদের স্বভাব, জীবন ও আগ্রহের ক্রমবিকাশের পথ ধ'রে চলতে চলতে আমাদের যা ভাল মনে হবে আমরা তারই অনুসরণ করব—কোন নির্দিষ্ট 'পলিসি'র অনুসরণ করতে গিয়ে জীবন, স্বভাব ও চিরপরিবর্তনশীল হৃদয়াকাঙ্ক্ষাগুলিকে আড়ষ্ট ও প্রাণহীন ক'রে ফেলব না। এই যে আমাদের উদ্দেশ্য,—জগতে স্বাধীনতার প্রয়াস, এর ছায়া আমাদের সব কাজের উপর পড়বে।

...ধর্ম-জগতে আমরা কোন-কিছুকে সাধারণত অভ্রান্ত, চিরসত্য অথবা শেষ ব'লে স্বীকার করব না।...ভৌগোলিক ক্ষেত্রে যেমন দূর দেশকে মানব না—সময়ের ক্ষেত্রে তেমনি অতীতকে মানব না। দূর বা অতীত আমাদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে আমাদের মধ্যে স্থান পেতে পারে, কিন্তু সে আমাদের মন জুগিয়ে—জোর ক'রে নয়।

..অনেক রকম গোলমালই আমরা বাধাব, কিন্তু অলমতি-বিস্তরেণ।"

বলা বাহুল্য, ইহা 'শনিবারের চিঠি'র ভগীরথ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের রচিত সিদ্ধান্ত। তিনি আজ পর্যন্ত ইহাতে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাঁহার মূল সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় হয় নাই। অপরে ক্রোধে বা উত্তেজনার বশে উদ্দেশ্যমূলক হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তিনি বরাবর বৈদান্তিক নিষ্কাম নির্লিপ্ততা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন।

আর পলায়নী নিষ্ক্রিয় মনোবৃত্তি বরাবর বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন আদি সম্পাদক যোগানন্দ দাস। 'শনিবারের চিঠি'র প্রবর্তক-দলে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ রচনাকুশলী, যেমন তাঁহার তীক্ষ্ণ ধী, তেমন তাঁহার বক্রোক্তি জ্ঞান, ছন্দজ্ঞান নিখুঁত। কিন্তু কোন কিছুকে আগ্রহ ও নিষ্ঠাসহকারে ধারণ করিবার শিবশক্তি তাঁহাতে ছিল না; যখনই বুঝিতেন তিনি কাজে লাগিতেছেন তখনই তিনি পলায়ন করিতেন। প্রতিভার এত বড় ব্যর্থতা আমার জীবনে আর দেখি নাই। প্রথম সংখ্যাতেই "প্রকাশ রায়" এই বেনামীতে যোগানন্দ দাসের "জীবন-দর্শন" প্রকাশিত হইয়াছিল। উদ্ধৃত কয় লাইনে তিনি যে আত্ম-কাহিনী সেদিন লিখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার যথার্থ পরিচয়—

"শুধু 'বেঁচে থাকার নাম কি জীবন?'—না।

আমি যে বেঁচে থাকতে আরম্ভ করেছিলাম তার কৃতিত্বটা আমার ছিল না। সেখানে আমার বাবা-মার দায়িত্ব। তার পর তাঁদের লালনে আর তাড়নে পাঁচ-আর-দশে পনেরো বছর বেঁচেছি (শাস্ত্রমতে)। তার পর প্রাইভেট টিউটর, তার পর শ্বশুর-মশাই ও তাঁর সুপারিশে-পাওয়া চাকরির বড়-কর্তারা আমাকে 'বাঁচিয়ে' রেখেছেন। বুড়ো বয়সে আমার দেড় গণ্ডা ছেলের শ্বশুরদের টাকা আমাকে বাঁচিয়েছে। আমার স্ত্রীরাও আমায় কম বাঁচায় নি। সত্যিই আমি বেঁচে গেলাম। জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে মৃত্যু পর্যন্ত আমি বেঁচেই চলেছি।

কিন্তু এর মধ্যে জীবন কই? কোথাও নেই। কেন না, কোনদিনই তাকে জন্ম দিই নি। আমার বাবা ও মা আমারই জনক-জননী, আমার জীবনের নন। তার একমাত্র জন্মদাতা আমি নিজে।"

নিজেকে ব্রহ্মচারী বানাইয়া যোগানন্দ দাস সে দিক দিয়াও "বাঁচিয়া" গিয়াছেন!

"মৌলা দোপেঁয়াজি" বেনামে হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "বিজ্ঞাপনী-সাহিত্যে" সেই দিনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। উদ্দেশ্য বা দর্শনের বালাই তাঁহার ছিল না, তিনি ছিলেন নিছক হিউমারিস্ট, নাম-করা সার্কাস দলের অতি সক্ষম ক্লাউন, ঝালে ঝোলে অম্বলে সবেতেই আছেন, কিন্তু কিছুতেই স্পেশিয়ালিস্ট নন। "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে"র বিজ্ঞাপনকে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি সে দিন লিখিয়াছিলেন—

"গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!

আবার গর্জিয়া উঠিল, সারা বাংলা দেশ কেরামতী-সাহিত্য-মন্দিরের কামান-গর্জনে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ দেখুন, পিল্ পিল্ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা বাংলার সকল নরনারী কামান-গর্জনে সচকিত হইয়া কেরামতী-সাহিত্য-মন্দিরের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে! কিন্তু এ কামান মানুষ মারিবার জন্য নহে—বিলাতী হিংস্র শ্রাপ্‌নেল্ নহে, ইহা তাপিত হৃদয়ে শান্তিবারি বরিষণকারী জলদগোলা। বেদ-বিশারদ মহাপণ্ডিত প্যালারাম কাব্যতীর্থের 'চক্ষুবিক্রমণিকা' এই কামান!! ছেলেমেয়ে কিম্বা যুবাবৃদ্ধকে উপহার দিবার এমন উপদেশপূর্ণ বই আর নাই। প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'কবুতরে'র সম্পাদক এই পুস্তক পাঠে বলেন, 'এই বইয়ের মধ্যে যুবক-যুবতীর চপল হাস্য-পরিহাস নাই, ঘটনা-বৈচিত্র্যের ম্যাজেণ্টা রং নাই, বিরহী-বিরহিণীর চোখের জল নাই।'…"

বস্তুত, 'শনিবারের চিঠি' গোড়া হইতে কিছু কাল পর্যন্ত শিশু-বাহহার্য খর্বায়তন ত্রিচক্রযানই ছিল ; অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত এই তিন চাকায় উচ্চাবচ অনেকেই ঠেলা মারিয়াছেন, কিন্তু ভূমিস্পর্শ করিয়া ইঁহারা তিন জনই মাত্র ছিলেন।

আমি সর্বাপেক্ষা বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলাম শেষ পৃষ্ঠার ইস্তাহারদৃষ্টে—

"লেখা চাই না। টাকা ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা…"

"লেখা চাই না" এমন দম্ভোক্তি ইতিপূর্বে আর শুনি নাই। নিজে লিখিয়া থাকি, লেখা প্রকাশের স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে, তথাপি কথাটা ভাল লাগিল। আজ বলিতে বাধা নাই, 'শনিবারের চিঠি' যদি কোনও মন্ত্রবলে আজও পর্যন্ত টিকিয়া থাকে তাহা এই মন্ত্র—"লেখা চাই না"। আমাদের বলিবার কথা আছে, আমরা নিজেরা লিখিয়া অন্যকে শুনাইব, অন্যের কথা অন্যকে শুনাই-বার জন্য আমাদের কাগজ নয়। আজকালকার ছেলেরা নূতন পত্রিকা-প্রকাশে মনস্থ করিয়া যখন লেখার জন্য আমাদের দ্বারস্থ হয়, তখন তাহাদিগকে এই মন্ত্রটি শিখাইবার চেষ্টা করি। যাহারা শোনে তাহারা বাঁচে, যাহারা শোনে না তাহারা হীন উঞ্ছবৃত্তি করিতে করিতে শোচনীয় ভাবে মৃত্যু বরণ করে। শিশু-মৃত্যুর আবর্জনায় বাংলার সাময়িকপত্রের প্রাঙ্গণ রুদ্ধ হইয়া আছে। সম্পাদক বা পরিচালকদের পরমুখাপেক্ষিতাই ইহার কারণ। 'শনিবারের চিঠি'ই এ যুগে স্বাবলম্বিতার পথ দেখাইয়াছিল।

যাহা হউক, প্রথম সংখ্যাতেই তিন প্রধানের পরিচয় পাইলাম, দুইজনকে একেবারে না চিনিয়াই। ইঁহারা দীর্ঘকাল আমার সহযোগী ছিলেন এবং এখনও বন্ধু আছেন। পরে ইঁহাদের মুখে 'শনিবারের চিঠি'র সূত্রপাতের ইতিহাস যেরূপ শুনিয়াছিলাম ঠিক কুড়ি বৎসর পূর্বে 'শনিবারের চিঠি'তেই ("নিবেদন"—পৌষ, ১৩৩৯) তাহা এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম—

> ১৩৩১ সালের আষাঢ় মাসের এক ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যায় উত্তর কলিকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্বদক্ষিণ সীমান্তের এক বেঞ্চির উপর বসিয়া ভাজা চিনাবাদামের খোসা ছাড়াইয়া খাইতে খাইতে যাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে কল্পনা-রূপী 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম আবির্ভাব ঘটে…কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি তখন সদ্য দেশে ফিরিয়াছেন। নূতন কিছু, অদ্ভুত কিছু করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল। বঙ্গদেশের সাহিত্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করিয়া শনিবারে শনিবারে একখানি চটি সাপ্তাহিক বাহির করিবার প্রস্তাব তিনিই করেন। 'শনিবারের চিঠি'র ইতিহাসে ইঁহার স্থান সর্বপ্রথম ; ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়।

কল্পনাব্যাপারে ইঁহার সঙ্গী দুইজনও পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না—শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস সম্পাদক ও মুদ্রাকর হইবেন স্থির হইয়া গেল; শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় হইলেন কর্মাধ্যক্ষ। বর্ষারজনীর অন্ধকার আকাশের তলে গ্যাসালোকিত হেদুয়া পুষ্করিণীর তীরে 'শনিবারের চিঠি' নাটকের 'প্রস্তাবনা'-পাঠ হইয়া গেল।

১০ই শ্রাবণ যবনিকা উঠিলে দেখা গেল এই ত্রয়ীর সঙ্গে আরও দুইজন আসিয়া জুটিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত প্রভাকর দাস। ইহার পর আরও অনেকে জুটিয়াছেন এবং এমন সকল ব্যক্তি জুটিয়াছেন যাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইলে বাঙালী পাঠক বিস্মিত হইবেন কিন্তু তবু এই পঞ্চরত্নই প্রথম।

'শনিবারের চিঠি'র ভঙ্গী আমার ভাল লাগিয়াছিল—ইহাতে লিখিবার জন্য আমি উৎসুক হইলাম। সম্পাদক শ্রীযোগানন্দ দাসের সহিত মৌখিক পরিচয় ছিল, তাঁহার নিকট ঘুষ কবুল করিয়াও কৃতকার্য হইলাম না।

ইহা মোটেই অত্যুক্তি নয়। যোগানন্দ দাসকে আমি সত্যসত্যই সেই নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে একটি লেখা ছাপাইবার জন্য দশ টাকা পর্যন্ত দিতে চাহিলাম। তিনি তাঁহার সেই দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িলেন। বুঝিলাম, সহজ পথে কাজ হইবে না, কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম সংখ্যাতেই কাজী নজরুল ইসলামকে ব্যঙ্গ করিয়া "গাজী আব্বাস বিটকেল" এই নামে দুইটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল; আমিও স্বাধীনভাবে "বিদ্রোহী"র কবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলাম। মনে মনে আঁচিয়া রাখিলাম, এই বিটকেলী-পথই 'শনিবারের চিঠি'র সহিত আমার সংযোগের পথ।

এক সংখ্যা, দুই সংখ্যা, তিন সংখ্যা—পর পর পাঁচ সপ্তাহে পাঁচটি সংখ্যা বাহির হইল; এক আনা হিসাবে পাঁচ আনা ব্যয় করিয়া সব কয়টিই স-খাম সংগ্রহ করিলাম এবং আয়ত্তও করিলাম; ঢং-ঢাং ধারন-ধারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মজাই যেখানে মোদ্দা উদ্দেশ্য, সেখানে বুঝিবার হাঙ্গামা নাই। মজাতে আমারও আসক্তি। মেসে নোটিশ পড়িয়াছে, তহবিল শূন্য, ডাইং ক্লীনিং হইতে কাপড়জামা ছাড়াইয়া আনিবারও সঙ্গতি নাই। জীবনদা একদিন শুভপ্রাতঃকালে আসিয়া বলিলেন, চল, একটা মতলব ঠাউরাইয়াছি। বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার অনুগমন করিলাম। গলি পার হইয়াই সারকুলার রোড, সারকুলার রোড কোণাকুণি পার হইয়া রামমোহন রায় রোড, পনের নম্বর বাড়ি। ভালই জানা ছিল—'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি।

তখন বেলা নয়টা বাজিয়াছে। দেউড়িতে দারোয়ান ছিল। জীবনদা অগ্রসর হইয়া ক্ষুদুবাবুকে খবর দিতে বলিলেন। ক্ষুদুই যে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ডাকনাম তাহা তখনও জানা ছিল না। কিছুক্ষণ সঙ্কীর্ণ বারান্দায় অপেক্ষা করিবার পর রাত্রিবাসপরিহিত একজন সুশ্রী সবলকায় যুবকের দর্শন মিলিল। আমার সহিত মুখামুখি হইবার পূর্বে জীবনদা তাঁহাকে সম্ভবত আমার পরিচয় ও আর্জি পেশ করিলেন। তারিখটা যত দূর মনে পড়ে, ৯ই ভাদ্র—আমার জন্মদিন। আমি এক পাশে দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিলাম—হঠাৎ দক্ষিণ বাহুমূলে একটা রূঢ় আঘাত খাইয়া চমকাইয়া উঠিলাম। চিত্র-বিচিত্র গাত্রবাস, সহসা মনে হইল রয়াল বেঙ্গল টাইগারের থাবা। ব্যাঘ্র মহারাজ বলিলেন, শরীরটা তো ভাল, শুনলাম, কবিতা লেখেন, পাঞ্জা লড়তে পারেন কি? জীবনদা বলিবার পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম, ইনিই 'শনিবারের চিঠি'র ব্রহ্মা—অশোক চট্টোপাধ্যায়। এক মুহূর্তের দ্বিধা, সঙ্গে সঙ্গেই বলিলাম, পারি বইকি। বারান্দায় দাঁড়াইয়াই নিঃশব্দে পাঞ্জা লড়া হইল—জীবনদা কুতূহলী দর্শক। ডান হাতের লড়াইয়ে আমি হারিলাম, বাম হাতের যুদ্ধে অশোক চট্টোপাধ্যায়। উভয়েই ঘর্মাক্ত; অশোক চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, এর ওপরে আপনার কবিতা যদি ভাল হয় তা হ'লে আপনার ছবিসুদ্ধ 'প্রবাসী'তে ছাপিয়ে দেব। বলিবার অধিকার তাঁহার ছিল, তিনি তখন 'প্রবাসী'-'মডার্ন রিভিউ'-এর সর্বময় কর্তা। বলিলেন, স্বাস্থ্যের সঙ্গে কবিতা এ দেশে বেমানান। দেখা যাক। আজ সন্ধ্যেয় 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় হাজির হবেন—'প্রবাসী' আপিসের দোতলায়। সঙ্গে লেখা নিয়ে যাবেন 'শনিবারের চিঠি'র জন্যে। আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলে জীবনদাকে আরও কিছু বলিলেন, অনুমানে বুঝিলাম আমার চাকুরি-সংক্রান্ত। জীবনদা আমাকে বিশেষ কিছু বলিলেন না, শুধু নির্দেশ দিলেন সন্ধ্যার আড্ডায় "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ" যেন নিশ্চয়ই লইয়া যাই।

কিন্তু জীবনদার আমার উপর যত বিশ্বাসই থাকুক, আমি ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাইব স্থির করিলাম। প্রথম চার সংখ্যায় কবিবর গাজী আব্বাস বিটকেলকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়া সম্ভবত বাড়াবাড়ির ভয়ে তাঁহাকে আসর হইতে সরাইবার জন্য 'শনিবারের চিঠি'র কর্তৃপক্ষ চতুর্থ সংখ্যার শেষে তাঁহাকে মহরমের গোঁয়ারায় অগ্নিদগ্ধ করিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদেরই ধারা ধরিয়া একটি কবিতায় তাঁহাকে আবার "আবাহন" করিলাম। নাম লইলাম "ভাবকুমার প্রধান"। "প্রকাশের বেদনা," "ছাদবিহার" ও "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দে"র সঙ্গে সেটি লইয়া অতীব ভয় ও

সঙ্কোচের সহিত ৯১ নং আপার সারকুলার রোডের দ্বিতলের একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে—‘শনিবারের চিঠি’র আড্ডায় প্রবেশ করিলাম। ঘরটির মাঝখানে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তাহার কেন্দ্রস্থলে অশোক চট্টোপাধ্যায়, আশেপাশে—চেয়ারে টুলে বেতের সোফায় জানালার পৈঠায় আট-দশজন আড্ডাধারী বসিয়া, একসঙ্গে শিককাবাব-পরোটা ও সিগারেট চলিতেছে, এবং কেহ কেহ ‘শনিবারের চিঠি’ থামে ভরিতেছেন। যোগানন্দ দাস এই দলে ছিলেন। আমিও আহূত হইলাম। খাওয়া-পর্ব চুকিলে আপনা হইতেই অনুভূত হইল থামে পত্রিকা ভরাটা একটা কম্পিটিশনের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একটা মজার খেলা যেন। ঘড়ি ধরিয়া দেখা গেল, ডাক্তার শরদিন্দু ঘোষাল ফার্স্ট হইলেন। পকেটে লেখাগুলি খোঁচাইতেছিল, আমি সুবিধা করিতে পারিলাম না। শেষে এক ফাঁকে মরীয়া হইয়া ভাঁজ-করা লেখাগুলি অশোক চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে ডান পাশের দেরাজ খুলিয়া সেগুলি তাহার গহ্বরে প্রায় নিক্ষেপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন গর্তে পড়ার আঘাত পাইলাম। আজ ঝুনা সম্পাদক হইয়া বুঝিতে পারি, এই আঘাত লেখক মাত্রকেই অনিবার্য ভাবে পাইতে হয়। বিচারকদের পক্ষে লেখকের মর্জিমত লেখা পড়িয়া দেখা কদাচিৎ সম্ভব হয়, ইহাকে সম্ভব করিতে হইলে সম্পাদক বা নির্বাচককে যতটা সদয় ও সহৃদয় হইতে হয় বর্তমান যুগে তাহা একান্ত দুর্লভ।

পরদিন যথাসময়ে হাজিরা দিবার জন্য হুকুম হইল, আমি রায়ের প্রতীক্ষায় মামলার আসামীর ব্যাকুলতা ও অস্বস্তি লইয়া কোন প্রকারে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইয়া আপিসে বা আড্ডায় দর্শন দিলাম। নির্মম অশোক চট্টোপাধ্যায় যেন আবহাওয়ার সংবাদ দিতেছেন এইরূপ উদাসীন ভাবে একবার মাত্র বলিলেন, আপনার লেখা মনোনীত হয়েছে। হ্যাঁ, আপনি প্রুফ দেখতে জানেন? বলিলাম, একটু একটু। ষষ্ঠ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত “খাঁটি” নামক একটি রচনার প্রুফ আমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া অশোক চট্টোপাধ্যায় চলিয়া গেলেন। আমি সর্বাগ্রে লেখকের নাম দেখিলাম—“বিনামা”, কিন্তু পড়িতে পড়িতে লেখার ঢং ও বানানের কায়দা দেখিয়া অবিলম্বে বুঝিতে পারিলাম, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের লেখা। ‘প্রবাসী’র নিয়মিত পাঠক আমি, তাঁহার ভঙ্গি আমার অপরিচিত ছিল না, বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রুফটি দেখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় খালি গায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি সপরিবারে তখন ‘প্রবাসী’ আপিসেরই একাংশে বসবাস করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দ দাস আসিলেন এবং একটি ছোটখাট দলসহ

অশোক চট্টোপাধ্যায়ও পুনরাবির্ভূত হইলেন। আসর জাঁকিয়া উঠিল। আমি বোকার মত অশোকবাবুকে বলিলাম, এ যে দেখছি যোগেশচন্দ্র রায়ের লেখা! অশোকে-যোগানন্দে-হেমন্তে চোখে-চোখে কথা হইয়া গেল, বুঝিলাম তাঁহারা আমার সাহিত্য-বুদ্ধির তারিফ করিলেন। প্রুফ কেমন দেখি সে পরীক্ষা লইলেন হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, দুই-চারিটা ভুল নিশ্চয়ই আমার অপটু দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তেমন মারাত্মক কিছু নয়। সেই রাত্রে সভাভঙ্গের পূর্বে আমি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে, 'প্রবাসী'র নয়, 'শনিবারের চিঠি'র নয়—অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী নিযুক্ত হইলাম; পুলিনবিহারী দাসের 'লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা' পুস্তক মুদ্রণের ভার আমার উপর পড়িল। ভাষা সংশোধন করা, প্রুফ দেখা এবং প্রেস-ম্যানেজার অবিনাশচন্দ্র সরকারকে নিয়মিত তাগাদা দিয়া দ্রুত কার্যোদ্ধার করা—ইহাই হইল আমার বৈতনিক কাজ। অবৈতনিক কাজই বেশি, 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা, খামে চিঠি ভরা এবং প্রয়োজন হইলে প্রুফ দেখা। চারিটি লেখা আগাম দেওয়া ছিল, সুতরাং লেখার কাজ আপাতত নয়।

নিয়মিত আড্ডায় উপস্থিত হওয়ার অর্থই হইল ঝামাপুকুরের পঁচিশ টাকা বেতনের টিউশনিটি খোওয়া যাওয়া। গেলও। আবার সেই হরেদরে পঁচিশ। সুতরাং বিদায় সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেনের মেস, বিদায় মোহিতলাল প্রমুখ সাহিত্যিকগোষ্ঠী, বিদায় স্নেহপ্রবণ বঙ্কিমচন্দ্র রায়। কিন্তু যাই কোথায়? অগতির গতি জীবনময় রায় ছিলেন, তিনি আমাকে এক রকম হাত ধরিয়াই ১০ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে লইয়া গেলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সদ্য-স্থাপিত বিশ্বভারতীর আপিস ও গ্রন্থালয়। চারতলার একটি অব্যবহৃত ক্ষুদ্র শৌচ-প্রকোষ্ঠে আমার স্থান হইল। আসবাবের মধ্যে সামান্য বিছানাপত্র, তাহা সেই খুপরিতে ফেলিয়া রাখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে সস্তা আহার্যের সন্ধান পাইয়াছিলাম, দৈনিক আহার্যের ব্যয় পাঁচ আনার বেশি লাগিত না। বাকিটা চায়ের দোকানে ব্যয় করিতাম।

বিশ্বভারতীর স্থানীয় কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সাঁতরা তখন নিদারুণ ফুসফুসের ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দশ নম্বরেই শয্যাশায়ী ছিলেন, বিশ্বভারতীর কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। তাঁহার অনুমতি প্রয়োজন। জীবনদা পরদিন আমাকে লইয়া তাঁহার কাছে হাজির করিলেন। প্রশান্তবাবু বৈজ্ঞানিক লোক, যুক্তিবাদী—অকারণে কোনও কিছু করা বা হওয়াটা তাঁহার পছন্দ নয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখার বিনিময়ে আমি সেখানে বাসের অধিকার পাইব ইহাই সাব্যস্ত হইল।

জীবনদা তখন ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে মাস্টারির সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজী-হোমিওপ্যাথী-বায়োকেমিক-টোট্‌কা চিকিৎসায় হাত পাকাইতেছিলেন। হোমিওপ্যাথী-বায়োকেমিকে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শিষ্য, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পুস্তকও তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। কিশোরীমোহন সাঁতরাকে তখন প্রসিদ্ধ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা জবাব দিয়াছিলেন। জীবনময় তাঁহাকে স্রেফ লাউয়ের রস খাওয়াইয়া সঞ্জীবিত করিবার শেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। পালা করিয়া রোগীর সেবা চলিতেছিল, আমিও আসিয়া জুটিলাম। জীবনদা ছিলেন, যোগানন্দ দাস, যতীশচন্দ্র সেন নিয়মিত আসিতেন, আর আসিতেন হাবল সান্যাল নামে খ্যাত হিরণকুমার সান্যাল, প্রভাস ঘোষ (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক) ও শরদিন্দু ঘোষাল (পাটনার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক) এবং সুশান্তকুমার ঘোষাল (ট্রপিকাল স্কুল, কলিকাতা, সম্প্রতি মৃত)। ইঁহাদের সকলের সহিত পরিচয় আমার জীবনকে নানাভাবে সম্পন্ন করিয়াছে। একদিন রবীন্দ্রনাথ কিশোরীমোহনকে আশীর্বাদ করিতে আসিলেন, এখন-তখন অবস্থা। গুরু শিষ্যের সেই মর্মান্তিক মিলন আমরা দেখিলাম, কিন্তু জীবনদার লাউ-রস অঘটন ঘটাইল। সাঁতরা মহাশয় সুস্থ সবল কর্মক্ষম হইয়া আবার বিশ্বভারতীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; অনেক বৎসর পরে রক্তের চাপবৃদ্ধির ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

বিশ্বভারতী আপিসে আশ্রয় পাইয়া আমি নানা ভাবে উপকৃত হইলাম, আমার অব্যবস্থিত জীবন একটা বাঁধা রুটিনের খাতে পড়িল। দ্বিপ্রহরে 'লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা'র ধকল সামলাইয়া সন্ধ্যায় আড্ডা ও আহারের ফাঁকে ফাঁকে 'শনিবারের চিঠি'র কাজ অবসর বিনোদন মাত্র ছিল। ১০ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে রাত্রি নয়টা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত কপি মিলাইয়া রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখিতাম। এখানেই ১২৯২ সালের 'বালক' হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ মিলাইয়া বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'রাজর্ষি' (জানুয়ারি, ১৯২৫) প্রকাশ করি। জীবনময় রায়ের সহযোগে ইহাই আমার সর্বপ্রথম পুস্তক-সম্পাদন। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের সহিত এখানেই ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হয়।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র সপ্তম সংখ্যায় (২১ ভাদ্র, ১৩৩১) হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় লিখিত "সংবাদ-সাহিত্যে" একটি সংশোধন সাময়িক-পত্রে ছাপার অক্ষরে আমার প্রথম সাহিত্যিক "অবদান"। অষ্টম সংখ্যা (২৮ ভাদ্র) হইতে আমি রীতিমত লেখক। আমার প্রথম মুদ্রিত কবিতা "আবাহন"

ইহাতেই প্রকাশিত হয়। আমার জীবনে কবিতাটির ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে বলিয়া কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

ওরে ভাই গাজি রে
কোথা তুই আজি রে
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা!
কোথা গিয়ে নিরিবিলি
ঝোপে-ঝাপে ডুব দিলি
তুই যে রে কাব্যের গগনের সবিতা!…
দাবানল-বীণা আর
জহরের বাঁশীতে
শান্ত এ দেশে ঝড় একলাই তুললি,
পুষ্পক দোলা দিয়া
মজালি যে কত হিয়া
ব্যথার দানেতে কত হৃদি-দ্বার খুললি…

কিন্তু অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পোস্ট-পাঙ্গা প্রতিশ্রুতি আমি ভুলি নাই। শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী তখন 'প্রবাসী'র রচনা-নির্বাচন-ভারপ্রাপ্তা। তাঁহার দরবারেও দুইটি গুরুগম্ভীর কবিতা প্রেরণ করিলাম। তিনি সেগুলি যথা-সময়ে মনোনীত করিয়া সম্পাদকীয় বিভাগে পাঠাইলেন। সম্পাদকীয় বিভাগে তখন প্রধান হইতেছেন অশ্বিনীকুমার ঘোষ,—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ও প্রভাত সান্যাল তাঁহার সহযোগী। নির্বাচন-কর্ত্রীর কৃপালাভ করিলেও সম্পাদকীয় দলে কিছুতেই আমল পাইতেছিলাম না। ভাদ্র মাসেই কবিতা মনোনীত হইয়াছিল, কিন্তু ভাদ্র আশ্বিন দুই মাস চলিয়া গেল, লেখা আর প্রকাশ হয় না। ইতিমধ্যে একাদশ বা শারদীয় সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে (১৮ই আশ্বিন) আমার "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ" প্রকাশিত হইয়া বাংলা-সাহিত্য-সংসারে যথেষ্ট সোরগোল তুলিল; এই কবিতাই আমাকে প্রতিষ্ঠার পথে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিল। আমার আশ্রয়-কোটর শুধু রচিত হইল না, 'শনিবারের চিঠি'ও নবজন্ম পরিগ্রহ করিল। 'কল্লোল' পত্রিকা মারফত কাজী নজরুল ইসলামের সহিত সংঘর্ষ ঘটিল, মোহিতলাল আসিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র পলিটিক্সের ক্ষেত্র সাহিত্য অধিকার করিল।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

'কল্লোল'

সবে যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম, নির্ঝর তখনও গিরিবত্ম অতিক্রম করে নাই, দিগন্তপ্রসারী সমতল শ্যামল প্রান্তর তখনও বহু নিম্নে ক্ষীণ রজতমেখলা-মণ্ডিতবৎ বোধ হইতেছিল, সহসা জল-কল্লোল কানে আসিল। যুক্তিবিচারহীন অসাবধানী আত্মভোলা পথিকের নিশ্চয়ই সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু আমরা খেলাচ্ছলে যাত্রা করিলেও উৎকর্ণ হইয়াই ছিলাম, শ্রবণমাত্র একটু চকিত হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, গিরি-প্রপাতেরই কল্লোল—সমুদ্রের নহে। পূর্বগামী অন্য এক নির্ঝরিণী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক স্থানে স্খলিত হইয়া একটা বড় রকমের পতনের ফলে "ফল্‌সে"র (falls) সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সর্বৈব "ফল্‌স্" (false) সমুদ্র-কল্লোল। আমরাও নাগাল ধরিয়া ফেলিলাম, ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

তরুণ হনুমান জননী অঞ্জনার স্নেহক্রোড় ছাড়িয়া নিদারুণ ক্ষুধার বশে পাকা ফল ভ্রমে রক্তবর্ণ সূর্যকে করায়ত্ত করিবার জন্য মহাশূন্যে লম্ফ প্রদান করিয়াছিল। ভ্রম তাহার তারুণ্যের ; বস্তু ও মানুষের যথাযথ মূল্যবোধ এই অবস্থায় থাকে না—ছোটকে বড় মনে হয়, বড়কে ছোট। উভয় পক্ষেই এই ভুল ঘটিয়াছিল, ফলে সম্পূর্ণ বাহিরের নিরীহ ভালমানুষ লোকের কাছাতেও টান পড়িয়াছিল। কবি মোহিতলাল মজুমদার এই ভালমানুষ সম্প্রদায়ের একজন। তিনি কাছা সামলাইতে সামলাইতে এই কল্লোলের আবর্তে একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রগড় জমিয়া উঠিল।

এতদিন পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'র প্রধান উপজীব্য ছিল পলিটিক্স, স্বরাজ্য-পলিটিক্স। এ-পক্ষের রথচূড়ায় আত্মগোপন করিয়া ছিলেন স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, অভিযানের লক্ষ্য ছিলেন সি. আর. দাশ—তখনও পাকাপাকি রকম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হন নাই। গড়পার অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এক ক্ষুদ্র জনসভায় দাশ মহাশয় 'শনিবারের চিঠি'র উল্লেখ করিয়া "চ্যালেঞ্জ অ্যাক্‌সেপ্ট"ও করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পর্ব জমিতে না জমিতে আমি আসিয়া পড়িয়া ভাগের মায়ের বোঝা স্কন্ধে লইলাম, বাকি কয়েকজন কাঁধ সরাইয়া লইয়া এদিকে ওদিকে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন ; সাপ্তাহিকের অষ্টম হইতে একাদশ সংখ্যার মধ্যেই এইরূপ ঘটিল। একাদশ সংখ্যার "কামস্কাট্‌কীয়

ছন্দে"র শেষ "অসম ছন্দ" অন্য উপদ্রব টানিয়া আনিল। "আমি ব্যাঙ" বলিয়া আরম্ভ হইয়া হঠাৎ তাল-ফেরতায় ব্যাঙ সাপ হইয়া গেল—

> আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,
> আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর-ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।
> আমি ভীম ভুজঙ্গ ফণিনী দলিতফণা,
> আমি ছোবল মারিলে নরের আয়ুর মিনিট যে যায় গণা—
> আমি নাগশিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
> আমি "বে অব বিস্কে," "সাইক্লোন" আমি, মরু সাহারার আঁধি।

এবং পরেই, "আমি খোদার ষণ্ড, নিখিলের নীল খিলানে যে ক্ষুর হানি…।" আবেদন যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিল। হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিরীক্ষণ করিয়া সম্মুখে কাহাকেও না পাইয়া মোহিতলাল মজুমদার নেপথ্যে আছেন কল্পনা করিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই কবিতার গদা নিক্ষেপ করিলেন। গুরুর সহিত শিষ্যের তখন মনোমালিন্য গাঢ়তর হইয়াছে। এই গদার বাহন হইল 'কল্লোল' নামক মাসিকপত্রের দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩১) ষষ্ঠ বা আশ্বিন সংখ্যা। 'কল্লোল' আসিয়া আমাদের পাড়ায় পৌঁছিল। ইতিপূর্বে তেইশ সংখ্যা ধরিয়া ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে এই পত্রিকা নিয়মিত বাহির হইয়াছে। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত এমন কিছু নহে; আর পাঁচটা পত্রিকা যেমন হয় সেই রকমই পাঁচমিশেলি ব্যাপার, থোড় বড়ি খাড়া—খাড়া বড়ি থোড়; লেখক রবীন্দ্রনাথ, জলধর সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্য নৃপেন্দ্র বুদ্ধদেব পর্যন্ত; পুরাতন এবং নূতনের মিশাল, ভাল মন্দ মাঝারি সব রকমের লেখাই ইহাতে থাকিত। যুগ-পরিবর্তনের কোন সূচনাই ইহাতে ছিল না। ১৩২০ বঙ্গাব্দে 'যমুনা'তে ধারাবাহিক ভাবে 'নারীর মূল্য' ও 'চরিত্রহীন' ছাপিয়া শরৎচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ওই বৎসরেই প্রথম-প্রকাশিত 'ভারতবর্ষে' নবভাব-ধারার যে জোয়ার আসিয়াছিল তখন পর্যন্ত তাহারই জের চলিতেছিল। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস হইতে সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আওতায় তাঁহারই আশ্রয় হইতে 'বঙ্গবাণী' বাহির হইয়া বঙ্গভাষায় মৌলিক চিন্তাশীল প্রবন্ধ-সাহিত্যে যে অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, আমরা তখন পর্যন্ত তাহাতেই মুগ্ধ বিস্মিত ছিলাম। আমাদের সামাজিক এবং অন্য বহুবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত সাহিত্যিক আন্দোলন তুলিয়াছিলেন ১৩২৯-৩০ বঙ্গাব্দে তিন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ—ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য 'বেপরোয়া' নামক অসাময়িক পত্রিকায়। যে

বিপ্লব ও বিদ্রোহের ধুয়া ইঁহারা এই চটি সচিত্র পত্রিকায় তুলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার মত, তাহার তুলনা হয় না। এই সব দিক দিয়া 'কল্লোলে'র কোনও বৈশিষ্ট্যই ছিল না। বাংলা-সাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র যে নূতন ধারার প্রবর্তক তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল অন্যত্র, শৈলজানন্দের কয়লা-কুঠির গল্পগুলিতে। প্রথম গল্প "কয়লা-কুঠী" প্রকাশিত হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিকের 'মাসিক বসুমতী'তে। সেই বৎসর বৈশাখেই 'মাসিক বসুমতী' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। যে অশ্লীলতার দাপাদাপি করিয়া 'কল্লোল' তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে অন্য ধরনের নূতনত্ব সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিল তাহারও আরম্ভ হইয়াছিল চিত্তরঞ্জন দাশ-প্রবর্তিত 'নারায়ণে' (১ম বর্ষ ১৩২১-২২)। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ছিলেন জগদীশ গুপ্ত যুবনাশ্ব অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধদেব বসুর পূর্বগামী।

যাহা হউক, "আমি ব্যাঙ" পড়িয়া কাজী নজরুলের রক্তে "সর্বনাশের নেশা" জাগিয়া উঠিল, গুরুসম্বোধনে মোহিতলালকে রণে আহ্বান করিয়া তিনি লিখিলেন, "রক্ত অসির কৃষ্ণ মসী"র যে কোন যুদ্ধে তিনি গুরুর সহিত বোঝাপড়া করিতে প্রস্তুত আছেন এবং মোহিতলালকে শেষে এই বলিয়া শাসাইলেন "ভূধরপ্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার।" মোহিতলাল হন্তদন্ত হইয়া 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে ছুটিয়া আসিলেন। হাতে একটি দীর্ঘ রচনা—"দ্রোণ-গুরু" নামে একটি কবিতা। বলিলেন, নজরুল গালাগালি দিলেও 'শনিবারের চিঠি'র সহিত সরাসরি যুক্ত হইতে তাঁহার আপত্তি আছে। তাঁহার কবিতাটি 'শনিবারের চিঠি'র "ক্রোড়পত্র" করিয়া ছাপাইতে হইবে। আমরা তাহাতেই রাজী হইলাম। "বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা" বা দ্বাদশ সংখ্যায় (৮ কার্তিক ১৩৩১) কবিতাটি মুদ্রিত হইল। কবিতাটিতে তিনি একটি ভূমিকা যোজিত করিয়া আমাকে অর্জুন বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। অংশত উদ্ধৃত করিতেছি—

> "কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য কুরু সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলে, তিনি প্রাচীন ও অকর্মণ্য বলিয়া দ্রোণ-বিদ্বেষী কর্ণের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যায়। এদিকে দ্রোণ-শিষ্য অর্জুনের কৃতিত্বও কর্ণের দুঃসহ হইয়া উঠে।...দ্রোণাচার্যের মনে অর্জুনের প্রতি আন্তরিক স্নেহ নষ্ট করিবার জন্য, এবং তাঁহার উপর যাহাতে গুরুর নিদারুণ অভিশাপ বর্ষিত হয় এই উদ্দেশ্যে অর্জুন কর্তৃক লিখিত বলিয়া একখানি গুরুদ্রোহসূচক কুৎসাপূর্ণ পত্র দ্রোণাচার্যের নিকট প্রেরিত হয়। বলা বাহুল্য, এই কৌশল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল।"

এই নিদারুণ কবিতার শেষ কয়েক পংক্তি মারাত্মক, বাংলা-সাহিত্যে অভিশাপের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ—

"আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর—
অধঃপাতের দেরি নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর!
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি তুই হাতে—
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,
গুরু ভার্গব দিল যা তুহারে!—ওরে মিথ্যার রাজা!
আত্মপূজার ভণ্ড পূজারী! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার,—মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাতলে!
দুদিনের এই মুখোশ-মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে!
অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস—
চরমক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস!"

অতঃপর রণদামামা বাজিয়া উঠিল, আর ঠেকানো গেল না। দুইটি নিরীহ শান্ত সমুদ্রপথযাত্রী স্রোতস্বিনীর মধ্যে কলহের কল্লোল ফেনিল হইয়া উঠিল। 'শনিবারের চিঠি' ও 'কল্লোল' দুই পত্রিকারই কর্তৃপক্ষ পরস্পর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন প্রখ্যাত সংস্কৃতি-সংঘ 'ফোর আর্টস্ ক্লাবে'র সদস্য উভয় পক্ষেই ছিলেন। 'কল্লোলে'র সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশই 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম প্রচ্ছদপট অঙ্কিত করিয়াছিলেন, অনেকটা চাবুকহস্তে সমুদ্র-শাসনরত কান্যুটের ছবি যেন; আবার তাঁহারই আঁকা 'কল্লোলে'র প্রচ্ছদপট—সমুদ্রতটে নৃত্যরত নটরাজের চরণতল স্পর্শ করিতেছে সমুদ্রের উদ্বেল তরঙ্গমালা—প্রায় একই ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। দুই সহোদরা দিতি ও অদিতির সন্তানদের মত 'শনিবারের চিঠি'র আর 'কল্লোলে'র কলহ বাধিবে, ইহার সম্ভাবনাও প্রারম্ভে অভাবনীয় ছিল। কিন্তু সেই অভাবনীয়ই ঘটিল। দুই সখীর সহজ দৃষ্টি প্রায় অকারণ ক্রোধে কুটিল হইয়া উঠিল। আশ্বিনের (১৩৩১) 'কল্লোলে' কাজী নজরুল ইসলাম যে কলহের সূত্রপাত করিলেন, আমরা তাহার জের টানিয়া "বিদ্রোহ সংখ্যা"র ভূমিকায় লিখিলাম—

"...আজ বাংলা দেশেও তেমনি একটা বিদ্রোহের রোমাঞ্চ, একটা পুলকস্পন্দন জাগছে। সকলের চেয়ে তা প্রকাশ পাচ্ছে বাংলা-সাহিত্যে—বিশেষত কাব্যে। ঝঞ্ঝার ঝনৎকার, প্রলয় ঝড়ের বিষম ঝড়ৎকার, মহাকুলিশের কড়ক্কাকড়ি আজ বাংলার সাহিত্যগগনকে দিকে দিকে বিদীর্ণ বিশীর্ণ ক'রে ফেলছে। বিদ্রোহী রক্তাশ্বের উন্মত্ত হ্রেষা যাদের চিত্তে বিপ্লবের চিঁহি-রব প্রতিধ্বনিত করছে, বিশ্বের খিলানে তার প্রচণ্ড খুরক্ষেপ

যাঁরা মুহূর্তে মুহূর্তে লক্ষ্য ক'রে চলেছেন, বাংলা দেশের সেই প্রধান কয়েকটি বিদ্রোহী কবির লেখা এইবার দেওয়া গেল। বাংলার প্রত্যেক পাঠকেরই এই কবিদের সঙ্গে পরিচয় থাকা আবশ্যক। যে মুটে দুপুর-বেলায় ঝাঁকায় শুয়ে ঘুমোয় তার অন্তরে তখন কি ব্যথা জাগছে—পাহারা-ওয়ালারা যখন মোড়ে মোড়ে রোঁদ দিয়ে ফেরে, তাদের সেই নীরব গাম্ভীর্যের মধ্যে অত্যাচারের কি বিকট মূর্তি লুক্কায়িত রয়েছে—নবোঢ়া পত্নী বায়োস্কোপ-দর্শনাভিলাষিণী হয়ে যখন পতির অনুমতি না পেয়ে ক্ষুণ্ন হয়ে অশ্রুবর্ষণ করে, তার সেই নিবিড়-হৃদয়-নিঙড়ানো ব্যথার ধারায় যুগে-যুগে সঞ্চিত অবরুদ্ধ পীড়িত অত্যাচারিত নারীর বিদ্রোহী অন্তরের কি করুণ অথচ কি রূঢ় ইতিহাস জলের মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে—সেই সব গণপ্রাণের কথা জানতে গেলে এই কবিদের লেখা পড়া একান্ত প্রয়োজন, কারণ এঁদের ছন্দে স্বরে সমস্তই ধরা পড়েছে, যেমন ক'রে ধরা পড়ে নব কিশোরী তার প্রণয়পাগল মনোচোরের বাহুবন্ধনের মধ্যে।"

'নব-শিহরণে' অশোক চট্টোপাধ্যায় 'হর্ষক' বেনামীতে লিখিলেন—

"শিহরণ জেগেছে রে কি হরণ করিব ?
স্ত্রীহরণ বিহরণে যুঝে রণ মরিব।"

সম্পাদক যোগানন্দ দাস নামহীন "ছড়া"য় লিখিলেন—

"ভেপসে উঠে খেপলি কেন কী হ'ল তোর খাপ্পা খোকা,
খাবড়া মেরে হাবড়া গেল ঘাবড়ে গিয়ে বাপ খামোখা ?"

এবং পরবর্তী ত্রয়োদশ সংখ্যায় (১৫ কার্তিক, ১৩৩১) "বিদ্রোহী-সংখ্যা"য় স্বাতন্ত্র্য-প্রার্থী মোহিতলাল "চামার খায়-আম" বেনামীতে সরাসরি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া লিখিলেন—

"চাহি না আঙুর—শুধু চানাচুর,
কাঁকড়ার ঠ্যাং খান দুই,—
ঘলঘসে ফুল নিয়ে আয় সখি,
চাই না গোলাপ বেল যুঁই।
লোকে বলে গানে আঁশটে গন্ধ,
বোঝে না আমার এমন ছন্দ !—
আর কিছু দিনে ইহারি ক্ষুধায়
নাড়ী যে করিবে চুঁই চুঁই !
চাবে না আঙুর, চাবে চানাচুর
চিংড়ির চপ খান দুই।"

ফলে 'শনিবারের চিঠি'র পলিটিক্সের দুই নয়ন ক্রমশ স্তিমিত হইয়া আসিল; সাহিত্যের তৃতীয় নেত্র, যাহা এতদিন অলক্ষ্য ছিল, ধীরে ধীরে বিস্ফারিত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

এই সময়ে আমার ভাগ্যের বাসস্থানে শনির দৃষ্টি পড়িল। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বিশ্বভারতীর হর্তাকর্তা বিধাতা; তিনি সর্বগ্রাসী মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ, তাঁহার আশ্রয়ে অর্ধেক মাথা গলাইয়া থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। গভীর রাত্রে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রুফ দেখিতেছি, তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ" তোমার লেখা? কোন্ দিকে নীত হইতেছি ঠিক ঠাহর করিতে না পারিয়া সগর্বে উত্তর দিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। স্ফীংক্সের মুখে সস্মিত হাসি ফুটিল, বলিলেন, খুব ভাল লেখা, কিন্তু এ সব বাজে কাজে সময় নষ্ট না ক'রে বিশ্বভারতীর সেবায় পুরোপুরি লেগে গেলে কতকটা স্থায়ী কাজ করতে পার। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা বাকি আছে। সে কথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না, এবং স্বয়ং প্রশান্তচন্দ্রের অনেক গভীর গবেষণা সত্ত্বেও আজিও অনেক কিছু করিবার আছে সে বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু যে "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দে"র জন্য 'শনিবারের চিঠি'র ভোলই বদলাইতে চলিয়াছে, তাহার রচনাকে বাজে কাজের পর্যায়ভুক্ত মনে করিতে পারিলাম না। সুতরাং পরদিনই প্রশান্ত-শাসিত বিশ্বভারতীকে সেলাম বাজাইয়া আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করিলাম। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে থাকিলে হয়তো তাঁহার দরবার পর্যন্ত যাইতাম, কিন্তু তিনি তখন "পশ্চিম-যাত্রিকী"।

এবার আমার মুরুব্বি হইলেন স্বয়ং সম্পাদক যোগানন্দ দাস; তিনি মতান্তর ব্যপদেশে পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের উপরে মানিকতলা মেন রোডের ঠিক দক্ষিণে "সায়ান্স কট" নামক গালভরা নামওয়ালা একটি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাস্থ্যকর মেস সন্ধান করিয়া পাশাপাশি দুইটি ঘর ভাড়া লইলাম। পূর্ব-পরিচিত বিপিনবাবুর রেস্তরাঁয় ধারে কারবার ছিল, সুতরাং এখানকার কদর্য আহার-ব্যবস্থায় বিশেষ আহত হইলাম না। রাত্রির ভয়াবহ পরিবেশকে প্রায়শই সঞ্জীবিত ও সুসহ করিয়া দিতেন খুড়দা—অশোক চট্টোপাধ্যায়। রামমোহন রায় রোডের অদূরবর্তী এই মেসে তিনি নৈশ-আহার-প্রারম্ভিক ভ্রমণে আসিতেন, একটা ভাঙা চেয়ার ছিল, তাহাতে প্রায় 'ময়ূর সিংহাসনে' বসার ভঙ্গিতে বসিতেন এবং কবিতা লেখার কম্পিটিশন লাগাইয়া যোগানন্দদা ও আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিতেন। নীচের অখাদ্য চায়ের দোকান

হইতে পেয়ালার পর পেয়ালা চা আসিত, খুড়্‌দা যোগানন্দদা উভয়ে মোটা মোটা বর্মাচুরুট ধরাইয়া বসিতেন, আমি চায়ের ও চুরুটের পরস্মৈপদী ধোঁয়ায় মশগুল হইয়া কবিতা লিখিয়া যাইতাম। এই সময়ে আমরা পরস্পর পাল্লা দিয়া অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলাম। মোহিতলালও ধারাবাহিকভাবে "রুবাইয়াৎ-ই-চামার-খায়-আম" লিখিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

একদিন এই সময়ে 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে অর্থাৎ 'প্রবাসী' আপিসেই "কম্পিটিশনে"র আসর বসিল। সেই বৎসরের ডিজ লণ্ঠনের ক্যালেণ্ডারে এক সুন্দরী বিদেশিনীর অপরূপ রঙিন চিত্র ছিল। তিনিই হইলেন কবিতা-প্রতিযোগিতার বিষয়। অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত-সজনীকান্ত এই চারিজন প্রতিযোগী; এই অধমই সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম হইল; ২২শে কার্তিকের (১৩৩১) 'শনিবারের চিঠি'তে কবিতাটি প্রকাশিতও হইল; আরম্ভটা এইরূপ—

ওগো তুষার দেশের মেয়ে—
কেন এই বাংলা দেশের গোবেচারীর পানেতে রও চেয়ে।
তোমার ওই নীল নয়নে নিমেষ নাহি
ফ্যালফেলিয়ে আছ চাহি,
প্রণয়-ভীতু কুমারীদের
নয়কো রীতি যে এ!
ওগো তুষার দেশের মেয়ে!
যেদিন কিনে ছ আনাতে
গোলদীঘির ওই পূব কোণাতে;
সুমুখের এই দেয়ালটাতে
টাঙিয়ে দিলেম তোমায়,
সেদিন হতে আজও
তোমার একটু নাহি লাজও,
তোমার নিমেষবিহীন নয়নবাণে
বিঁধছ কেবল আমায়!
আমার কাজ-অকাজে ঘুমের মাঝে
মনটি আছ ছেয়ে—
ওগো তুষার দেশের মেয়ে!

এই সময়ে বাংলা দেশের সংস্কৃতি-রাজ্যের তিনজন ধুরন্ধর পণ্ডিতের সহিত

আমাদের প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক জন্মে। 'প্রবাসী' আপিসে ও বিশ্বভারতী আপিসে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর কালিদাস নাগের নিত্য যাতায়াত ছিল। ডক্টর নাগ তখনই 'প্রবাসী'র সহিত ঘনিষ্ঠতর হওয়ার সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সুতরাং তিনি 'কল্লোলে'র সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগের জ্যেষ্ঠ সহোদর হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আত্মীয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অতি সামান্য সহজ কথাবার্তায় এমন একটা আবেগ-স্পন্দন থাকিত যে, আমাদের চিত্তও কিছু একটা করিবার জন্য ব্যাকুল ও স্পন্দিত হইয়া উঠিত ; তিনি সর্বদাই নিজের চতুর্দিকে একটা মহত্ত্বের ও বিশ্বসৌহার্দ্যের তপ্ত পরিমণ্ডল সৃজন করিয়া রাখিতেন ; অথচ তাঁহার বিচিত্র সম্ভাষণ শুনিতে শুনিতে আমাদের মনে হইত, কি যেন একটা করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয় নাই। ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকরকে বৃহৎ ভাবনায় ভাবিত করিবার মন্ত্র তাঁহার জানা ছিল। তিনি এখনও সেই মন্ত্রেরই কারবার করিতেছেন।

সুনীতিকুমার সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির মানুষ ; তিনি কত বড় তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া তাহা বুঝিবার জো নাই। তখন হইতেই আমাদের সকল সংশয়ের মীমাংসা একমাত্র তাঁহার নিকটেই ছিল। তিনি ভাষাতত্ত্বের টাইটানিক জাহাজ, কিন্তু পৃথিবীর এমন কোনও তত্ত্ব নাই যাহাতে ডিঙি বাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসুকে পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে না পারেন ; আরবের মরুভূমিতে তাঁহার গল্প আরম্ভ হইলে জাপানের ক্রিসেন্থিমাম-উদ্যানে গিয়া তাহা শেষ হইত, মুণ্ডাদের কথা শুরু হইলে তাহা শেষ হইত ক্রোম্যাগ্‌নন মানুষের মুণ্ডুতে। মহাভারত কথাসরিৎসাগর আরব্য উপন্যাসের মত গল্প হইতে গল্পান্তরে বিচরণ করিতে করিতে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে কোনও আসর সরগরম করিয়া রাখিতেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়কদের মত তাঁহার প্রেম-প্রীতি বিশেষ স্ফূর্তি পাইত আহার্যবস্তুর মাধ্যমে, এত বড় খাদ্যরসিক এ যুগে আমি আর দেখি নাই। দেশভ্রমণে তাঁহার ক্লান্তি নাই, বুড়া বয়স পর্যন্ত সকল দৈহিক অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া তিনি সারা পৃথিবী চষিয়া বেড়াইতেছেন, আর সমস্ত পৃথিবীর সুন্দর ও উৎকট "কিউরিও"-নিচয় তাঁহার বৃহৎ লাইব্রেরি-ঘরে ভিড় জমাইয়া সেটিকে স্বল্প-পরিসর করিয়া তুলিতেছে। তিনি 'শনিবারের চিঠি'র গোড়া হইতে অন্যতম প্রধান হিতৈষী, তাঁহারই কৃপায় তাঁহার মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে আমরা নিজস্ব করিতে পারিয়াছিলাম। সুনীতিকুমার 'শনিবারের চিঠি'তে খুব কমই লিখিয়াছেন। অনেকের ধারণা 'শনিবারের চিঠি'র বহু পাণ্ডিত্যমূলক প্রবন্ধ তাঁহার রচনা। তাহা নয় ; কিন্তু হাতেকলমে তাঁহার রচনা না হইলেও 'শনিবারের চিঠি'র সকল পাণ্ডিত্যের নীচে তাঁহারও স্বাক্ষর

আছে। এমন সহজ সবল সুস্থ স্বধর্মনিষ্ঠ ও স্বদেশ-প্রেমিক আনন্দময় পুরুষ আমি কমই দেখিয়াছি, তাঁহার সাহচর্যে আমাদের অনেক লাভ হইয়াছে।

তৃতীয় পণ্ডিতের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইলেন মোহিতলাল, তিনি তাঁহারই যৌবনের বন্ধু ডক্টর সুশীলকুমার দে। সুশীলকুমার কথায় চিঁড়া ভিজাইবার লোক নহেন, কাজের লোক। আমাদের চেষ্টাকে আশীর্বাদের দ্বারাই সমর্থন করিলেন না, একেবারে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ত্রয়োদশ সংখ্যা সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে (১৫ কার্তিক, ১৩৩১) তিনি প্রেমমুকুল জানা ও শান্তশিব গাজনদার এই দুইটি বেনামীতে যথাক্রমে "অজানা প্রেম" কবিতা ও "আর্ট ও আলোক-পন্থা" প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। সেই দিন হইতে আজও পর্যন্ত তিনি 'শনিবারের চিঠি'র প্রায় কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার বহু গদ্য-পদ্য রচনায় 'শনিবারের চিঠি' সমৃদ্ধ হইয়াছে। তিনি বাহিরে মৃদু স্বল্পভাষী হইলেও আমাদের আসর জমাইয়া মুখরোচক গল্প বলিতে ওস্তাদ ছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র প্রাথমিক দলের যে চিত্র প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে সুনীতিকুমার-মোহিতলালের সঙ্গে তিনিও আছেন।

'কল্লোল'-সংঘর্ষের দরুন 'শনিবারের চিঠি'র ক্রম-সাহিত্য-পরায়ণতার মোট ফল কিন্তু এই সাপ্তাহিক পর্যায়ে ভাল হইল না। তবে এ কথাও সত্য যে, পলিটিক্সের পথও আর তাহার পক্ষে কুসুমাস্তীর্ণ হইত না। যে স্বরাজ্য পার্টির বিরুদ্ধে ইহার প্রধান অভিযান ছিল, তাহার নেতা ও কর্মীরা ধৃত ও কারান্তরালে নীত হইয়া দেশের ও দশের চোখে জয়ী হইয়া গেলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি আর শোভনভাবে চলিত না; যে ভাবেই হউক বিষয়ান্তরে যাইতেই হইত।

'কল্লোলে' তখন ফুটকি-কণ্টকিত গল্প-কথিকার রেওয়াজ আরম্ভ হইয়াছে, আর আরম্ভ হইয়াছে অবাস্তবের সঙ্গে অতি-বাস্তবের বিচিত্র সংমিশ্রণ—গোকুল নাগের সঙ্গে যুবনাশ্ব। 'শনিবারের চিঠি'র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ সেই পথেই নূতন অভিযান শুরু করিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পুলিনবিহারী দাস প্রভৃতি যাঁহারা ইহাতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা একেবারেই বিদায় লইলেন, এবং নানা কারণে রুধিরেরও অভাব ঘটিতে লাগিল। আমি পর পর রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার প্যারডি লিখিয়া নাম করিয়া ফেলিলাম। প্রমথনাথ বিশী (১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩১) এবং রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (২১ অগ্রহায়ণ ১৩৩১) 'শনিবারের চিঠি'র দলে নেপথ্যে যোগ দিলেন—ইঁহারা সশরীরে

রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন আরও অনেক পরে। সে কাহিনী যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

সপ্তদশ সংখ্যা পর্যন্ত সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র কিছু সৌষ্ঠব ছিল, পঞ্চবিংশ সংখ্যা পর্যন্ত কোনও রকমে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩২ বজায় রাখিয়া বিপন্ন পণ্ডিতের মত সে দেহের অর্ধেক ত্যাগ করিল এবং আরও দুই সংখ্যা সেইরূপ কাহিল ভাবে চলিয়া ৯ই ফাল্গুন ১৩৩১ সপ্তবিংশ সংখ্যায় একেবারেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, তাহার সাপ্তাহিক জন্ম চিরদিনের মত ঘুচিয়া গেল। 'কল্লোল' তখন মহাসমারোহে প্রতি মাসে অনিয়মিত ভাবে হইলেও বাহির হইতেছে। ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ ৫ই ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫) তারিখে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ পাশ্চাত্য সফরান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই ঘটনার সহিত আমার পরবর্তী সাহিত্যজীবন বিশেষভাবে যুক্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে সাহিত্যসাধনার লোভে আমি প্রায় সর্বস্ব—আত্মীয়-স্বজন পিতামাতা বিজ্ঞানাধ্যয়ন উচ্চ-চাকুরিগত আরাম, এমন কি শ্বশুরবাড়ির স্নেহাশ্রয় ত্যাগ করিয়াছিলাম, ধীরে ধীরে তাহার মূল আসনটি কাঁচা মাটির সরার মত গলিয়া গেল। ইহাতে আমাদের দলের একমাত্র আমিই মর্মান্তিক আঘাত পাইলাম। যোগানন্দ দাস সন্ন্যাসী—মায়ামমতাহীন অর্থাৎ নির্মায়িক পুরুষ, বাকি সকলেরই অন্য অবলম্বন ছিল। আমার সম্বল অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কৃপাকণা মাসিক পঁচিশটি রৌপ্যমুদ্রা। 'প্রবাসী' আপিসে তখন পর্যন্ত আমার অবস্থান অনধিকার-প্রবেশের সামিল হইয়া ছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় লেখক হিসাবে আমার প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছিল। সে কাহিনীও কম করুণ নয়। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা-নির্বাচক শ্রীমতী শান্তা দেবী আমার দুইটি কবিতা 'প্রবাসী'র জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন সেই ভাদ্র মাসে। কিন্তু তাহা আর বাহির হয় না। সেখানেই 'শনিবারের চিঠি'র আপিস, নিত্য যাই আসি। অশ্বিনীকুমার ঘোষ, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সহ-সম্পাদকমণ্ডলীর প্রত্যহই খোসামোদ করি, কিন্তু আবেদন মঞ্জুর হয় না। শান্তা দেবী থাকেন নেপথ্যে, তাঁহার নিকট নালিশ রীতিমত আয়াসসাপেক্ষ; অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রধান কর্মাধ্যক্ষ, কিন্তু আমার কবিতা ছাপা হইতেছে না এ কথা তাঁহার কর্ণগোচর করাইলে তিনি আমার মেয়েলিপনায় কিরূপ হাসিবেন তাহা অনুমান করিয়া তাঁহার দরবারও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সরাসরি ছোট কর্তাদেরই শরণাপন্ন হইতাম; শেষ পর্যন্ত এক প্লেট করিয়া মতিবাবুর দোকানের ('প্রবাসী' আপিসের সংলগ্ন)

রান্না মাংস ও এক ভাঁড় করিয়া রাবড়ি কবুল করিয়া কথা আদায় করিলাম —অগ্রহায়ণে আমার "স্বপ্ন-জাগরণ" কবিতা বাহির হইবে। কার্তিক মাস শেষ হইয়া আসিল, "বিবিধ প্রসঙ্গ"ও ছাপা শেষ হয় হয়, আমার কবিতা সম্পাদকীয় টেবিলের ঝুড়িতেই পড়িয়া থাকে। শেষে কোনও প্রকারে তখন আমার পক্ষে মহামূল্যবান তিনটি টাকার মায়া কাটাইয়া মাসের শেষ রাত্রে তিন প্লেট মাংস ও তিন ভাঁড় রাবড়ি লইয়া মরীয়া হইয়া 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদকদের দরবারে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা নিমকহারামি করিলেন না, কবিতাটি "বিবিধ প্রসঙ্গে"র পরে 'প্রবাসী'তে স্থান পাইল। আমি এতদিনে স্বনামে বাংলা দেশের অসংখ্য ভাগ্যবান সাহিত্যিক দলে পাংক্তেয় হইলাম।

চতুর্দশ তরঙ্গ

মাটি

৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১ (১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫) পশ্চিমযাত্রী রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চার দিন পরে ৯ই ফাল্গুন তারিখে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র সপ্তবিংশ বা শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইল।

মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আমার অন্নের অবলম্বন পুলিনবিহারী দাস প্রণীত 'লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা' পুস্তকাকারে বাজারে বাহির হইয়া আমাকে সম্পূর্ণ নিরালম্ব করিয়া দিয়াছে। অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে স্বনামে কবি হিসাবে স্থান পাইয়া নিজের সাহিত্যিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হইলেও 'লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা'র মুদ্রণ যতই অগ্রসর হইতেছিল ততই অনুভব করিতেছিলাম, আমার পায়ের তলার মাটি ক্রমশ সরিয়া যাইতেছে, বেকার হইবার আর বিলম্ব নাই। এই সময়ে অদ্ভুতকর্মা সিদ্ধেশ্বর ভাদুড়ীর সহিত পরিচয় ঘটে। তিনি ছিলেন বাৎতাল্লা-বিশারদ, কথার যাদুকর, শুধু কথার তোড়ে শ্রোতার অন্তরের সাহারা মরুভূমিকে কুলুকুলু-কলধ্বনিময় স্বর্গোদ্যানে পরিণত করিতে পারিতেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তাজাত অভিনয়-কুশলতা তিনি একটু তির্যকভাবে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া মাঝে মাঝে বেশ সাফল্য অর্জন করিতেন। তাঁহার কথাবার্তায় মুগ্ধ হইয়া আমরা 'শনিবারের চিঠি'র দল তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িলাম। তিনি স্রেফ মুখের কথায় 'শনিবারের চিঠি'র বিজ্ঞাপনের যে স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া দেখাইলেন, তাহারই লোভে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও জোর করিয়া 'শনিবারের চিঠি' চালাইতে

লাগিলাম। অশোক চট্টোপাধ্যায় সপ্তাহে সপ্তাহে "আউট অব পকেট" হইয়া বিপন্ন হইতে লাগিলেন। ইহার শোধ অবশ্য তিনি পরে 'প্রবাসী'তে তুলিয়াছিলেন—সিদ্ধেশ্বরের আদর্শে "পীতাম্বর স্যাণ্ডেল" নামক সচিত্র গল্পটি লিখিয়া। আমরা যখন প্রায় ডুবু-ডুবু, সিদ্ধেশ্বর ভাদুড়ী তখন 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদক অশ্বিনীকুমার ঘোষকে সম্পাদক করিয়া নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' বাহির করিলেন। ৫ই পৌষ শনিবার (২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪) 'বিচিত্রা' প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। বলা বাহুল্য, আমি বিনা মাহিনায় ইহার লেখক শ্রেণীভুক্ত হইলাম। সিদ্ধেশ্বর মাথার উপরে থাকিলেও 'বিচিত্রা'র পরিচালনা করিতেন একজন উৎসাহী প্রিয়দর্শন যুবক; তিনিই পরবর্তী কালে প্রবোধকুমার সান্যাল নামে খ্যাত হইয়াছেন। প্রথম বা দ্বিতীয় সংখ্যা 'বিচিত্রা'তেই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা "লাল [অথবা রাঙা] শাড়ী" নামক একটি গল্প আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি নিতান্ত আর্থিক কারণে 'বিচিত্রা'র দিকে ঝুঁকিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সিদ্ধেশ্বর ভাদুড়ী ফুঁয়ে কাজ চালাইতে চান—পাঁচ সংখ্যা চলিয়া 'বিচিত্রা' বন্ধ হইল, সিদ্ধেশ্বর স্বয়ং অশোক চট্টোপাধ্যায়ের স্কন্ধে ভর করিলেন। তাঁহার সৎ-পরামর্শে যোগানন্দদা ও আমি একটি বিচিত্র ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইলাম। পরিপূর্ণ যৌবনে আশা ও আশ্বাসে মন ভরপুর, সাহিত্যের অর্থকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত হতাশ হইবার কারণ ঘটে নাই। ১১ই মাঘের (ত্রয়োবিংশ সংখ্যা) 'শনিবারের চিঠি'তে সুতরাং আমাদের এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইল—

"Applied Literature Society

—। আর ভাবনা নাই।—

কবিতার ঝরণা আপনার দ্বারে প্রবহমানা। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, সম্বর্ধনা, বিদায় ইত্যাদি সকল বিষয়ের গভীর ভাবযুক্ত কবিতা আপনার জন্য সকল সময় ফরমাস মাফিক তৈয়ার থাকিবে। দক্ষিণার হার—বিদায় ও সম্বর্ধনা কবিতা ১০৲, বিবাহ কবিতা ৮৲, শ্রাদ্ধাদি কবিতা ৪৲, অন্যান্য উৎসব ও পর্বাদি বিষয়ক গাথা ৫৲।

প্রত্যেক কবিতার স্বত্ব ক্রয় করিবার ব্যবস্থা এবং হার স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণের জন্য কার্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখুন। অর্ধমূল্য অগ্রিম দেয়।

ফলিত সাহিত্য কার্য্যালয়

১০৯, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।"

ঠিকানা যোগানন্দ দাসের পিতৃগৃহের। বলা বাহুল্য, আমাদের "সায়েন্স-

কট” বা বিজ্ঞানকুঞ্জ বিহার তখন সমাপ্ত হইয়াছে ; যোগানন্দদা পিতৃগৃহে এবং আমি ২৭ নং বাদুড়বাগান লেনের মেসে বাইবেলোক্ত “প্রডিগাল সানে”র মত পুনরধিষ্ঠিত হইয়াছি।

সিদ্ধেশ্বর ভাদুড়ীর পরম আশ্বাস সত্ত্বেও “ফলিত সাহিত্য” সুফলপ্রসূ হইল না। গুটিতিনেক অর্ডার বাবদ গোটাকয়েক টাকা পাইয়াছিলাম ; কিন্তু গ্রাহক অপেক্ষা লেখকের আবেদন এত বেশি আসিতে লাগিল যে, আমরা তিন সপ্তাহের মধ্যে ব্যবসায় গুটাইতে বাধ্য হইলাম।

রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া আসিলেন। অগ্রহায়ণ মাস হইতে ‘প্রবাসী’তে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার পশ্চিম যাত্রার কাহিনী প্রকাশিত হইতেছিল ; মাঘ পর্যন্ত বাহির হইয়া উহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। তিনি দেশে ফিরিবামাত্র “কপি”র জন্য তাঁহাকে জোর সম্পাদকীয় তাগাদা দেওয়া হইল। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, লেখা বীজাকারে তাঁহার নোট-বইয়ে রহিয়াছে, নিজের হাতে তাহাকে প্রকাশযোগ্য রূপ দিবার উৎসাহ তাঁহার নাই ; তবে উপযুক্ত লেখক পাইলে মুখে মুখে বলিয়া যাইতে রাজী আছেন। ‘প্রবাসী’-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন শান্তিনিকেতন-প্রবাসী। পত্রযোগে তাঁহার নিকট হইতে হুকুম আসিল।

রবীন্দ্রনাথের ভাবণের অনুলিখন-কর্মে আমি ইতিপূর্বেই প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলাম, আমার সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথের তাহা মনেও ছিল। ‘শনিবারের চিঠি’ তখনও বাহির হয় নাই সুতরাং সাহিত্যিক হিসাবে সে অধিকার পাই নাই। ১৯২১ হইতে কয়েকবার শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করিয়া এবং সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর সভ্য হিসাবে নাম লিখাইয়া কর্তৃপক্ষ মহলে একটু পরিচিত হইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সনের ২১শে মার্চ চীন-ভ্রমণে যাত্রা করেন। এই উপলক্ষে আলিপুরের হাওয়া-আপিসে বিদায়-সম্বর্ধনার বিশেষ আয়োজন হয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তখন হাওয়া-আপিসের অধ্যক্ষ। সেখানকান মাঠে বেশ একটি জনসমাগম হয় এবং সেই দিনই সর্ব-প্রথম আমরা বেতার-যন্ত্রের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময় বোধ করি। বেতার-প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীমতী সাহানা বসু রবীন্দ্রনাথের “এখন আমার সময় হ’ল” গানটি গাহিয়া যন্ত্রগত নানা বাধা ও বিপর্যয় সত্ত্বেও শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথ একটি ক্ষুদ্র মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমিও তাহার অনুলিখন লই। রবীন্দ্রনাথ আমার লেখাটি পছন্দ করেন। চীন হইতে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন ২১শে জুলাই ১৯২৪। সেই দিনই কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। সেই

সভাতেও আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষণ লিখিবার জন্য আহূত হইয়াছিলাম। মহাচীন কর্তৃক সম্মানার্ঘ স্বরূপ প্রদত্ত স্বর্ণ-পীত-ক্ষৌম-বহির্বাস-পরিহিত কবি সেদিন রবির উজ্জ্বল দীপ্তিতেই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সভার শেষে অনুলিখিত ভাষণটি লইয়া তাঁহার নিকট হাজির হইলাম। তিনি কিঞ্চিৎ সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া সেইটিকেই বহাল রাখিয়া আমাকে সম্মানিত করিলেন।

এ হেন আমাকে ত্রিশঙ্কু-অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সহৃদয় অশোক চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি" লিখিতে পাঠাইয়া এক ঢিলে দুই পাখি মারিলেন ; "কপি" সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং আমাকেও সরাসরি 'প্রবাসী'র কর্মী-শ্রেণীভুক্ত করিবার সুযোগ পাইলেন। আমি মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে প্রূফ-রীডার নিযুক্ত হইলাম। মেশিনে যখন ফর্মা চড়িবে সম্পাদকীয় বিভাগের দেখা প্রূফ যথাযথ সংশোধিত হইয়াছে কি না তাহা মিলাইয়া লওয়া আমার একমাত্র কাজ হইল। অবশ্য গোড়ার কাজ "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"র কপি আহরণ। রবীন্দ্রনাথের অধিষ্ঠান তখন সাময়িকভাবে আলিপুরের হাওয়া-আপিসেই অধ্যক্ষ প্রশান্তচন্দ্রের অতিথি-রূপে। আমাকেও সাময়িকভাবে সেখানে ডেরা বাঁধিতে হইল। পূর্বে উল্লিখিত কৃতিত্বের জোরে হাজির হওয়া মাত্র রবীন্দ্রনাথের সাদর আপ্যায়ন লাভ করিলাম।

রবীন্দ্রনাথকে আশৈশব ভালবাসি, ভক্তি করি, তাঁহার সহিত কৌশলে পত্র-ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহার সান্নিধ্যেও আসিয়াছি, কিন্তু এতখানি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সম্ভাবনার কথা আমার সুদূরবর্তী কল্পনাতেও ছিল না। দিনরাত্রি সর্বদা কয়েকদিন একসঙ্গে থাকিতে হইয়াছিল, এক টেবিলে আহার করিতাম, এক ঘরে শয়ন করিতাম। খেয়াল হইলেই তিনি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া নোট-বইটি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া মুখে মুখে ডায়ারি রচনা করিয়া চলিতেন, আর আমি লিখিয়া যাইতাম। ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫ তারিখ হইতে শেষ পর্যন্ত আমার অনুলিখন। মাঝে মাঝে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সুষ্ঠু শব্দ হাতড়াইতেন, আমি সাধ্যমত কথা যোগাইতাম, অনেক শব্দ এবং কিছু কিছু বাক্য যে আমার রচনা নয় তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারিব না। অবশ্য পরবর্তী কালে তাঁহার বক্তব্যের সম্পূর্ণ মৎকৃত রচনার নীচে স্বাক্ষর করিয়া তিনি আমাকে প্রভূত সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু সেই গোড়ার দিকে নিতান্ত কাঁচা বয়সে এই সম্মানে আমার দেহে রীতিমত স্বেদ-পুলক-কম্প হইত। নিভৃত আলাপের সুযোগে তাঁহার কাছ হইতে বাংলা-সাহিত্য বিষয়ে অনেক অভিমত ও উপদেশ আদায় করিয়া লইয়াছি, তাঁহার সেই সময়কার অনেক ইঙ্গিত আমার জীবনের সাহিত্য-পথের পাথেয় হইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া

অবিশ্রাম দেশ-বিদেশ ভ্রমণের ফলে বিশেষ নজর দিয়া সমসাময়িক বাংলা-সাহিত্যচর্চার অবকাশ তাঁহার ছিল না, কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞ দৃষ্টি এক নজর যাহা দেখিত তাহারই সঠিক মূল্য বিচার করিয়া লইতে পারিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি নূতন কবিতা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে তখন আকৃষ্ট করিয়াছিল, তিনি প্রায়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। আমি বাল্যে ও কৈশোরে পয়সার অভাবে তাঁহার বই খরিদ করিতে না পারার দুঃখ কি ভাবে তাঁহার সতেরখানি বই ('গোরা' তন্মধ্যে একখানি) হাতে নকল করিয়া মিটাইয়াছিলাম, সে কথা শুনিয়া তিনি একদিন যথেষ্ট কৌতুক ও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। নকলগুলি তখন পর্যন্ত আমার নিকটে কলিকাতাতেই ছিল, আমি প্রমাণ দাখিল করিলাম। এতখানি তিনিও আশা করেন নাই। তিনি সেগুলি আমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অনেককেই সেগুলি দেখাইয়াছেন এবং অনেকের কাছে গল্প করিয়াছেন সে কথা পরে জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার বহুমূল্য নকলগুলির কি দশা হইয়াছে তাহা আর জানিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত পরবর্তী যাবতীয় পুস্তকের এক এক খণ্ড আমাকে বিনামূল্যে দিবার হুকুম দিয়াছিলেন, ইহাতেই আমার বাল্য-কৈশোরের শ্রম সার্থক হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ তখনই আমার কয়েকটি প্যারডি-কবিতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। "মৎস্যগন্ধার প্রতি পরাশর" এবং "শীত-মঙ্গলে"র কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। এই সময়ে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'গুলি তাঁহাকে আমি এক-একটি করিয়া দেখাইতাম। সেই হাওয়া-আপিসে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে বসিয়াই একটি কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইবার মত ছেলেমানুষিও করিয়াছিলাম, তিনি তখন তারিফ করিয়াছিলেন। কবিতাটির নাম "অগ্নিদূত"। কবিতাটিকে তিনি ভুলেন নাই। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (প্রায় ১৪ বৎসর পরে) যখন 'বাংলা কাব্যপরিচয়' সঙ্কলন করেন তখন তিনি আমার "অগ্নিদূত"কে সেই সঙ্কলনভুক্ত করেন। কিছু টীকাও স্বয়ং যোজনা করিয়া দেন। কবিতাটির খানিকটা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; কবিতাটি অনেক দিন পরে (১৩৩৩ বৈশাখের) 'প্রবাসী'তে বাহির হইয়াছিল—

ফাগুন-দুপুরে আগুন জ্বলিছে খাঁ-খাঁ করে চারিদিক,
ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর শূন্য ছাদের 'পরে
সৃজন করিছে দগ্ধ মরুর মরীচিকা যেন ঠিক
শ্মশান-নগরী ঝিমায় তন্দ্রাভরে।

অর্গল-আঁটা সব বাতায়নে পাণ্ডুর নীলাকাশ,
ঝাঁকে ঝাকে চিল উড়িছে কিসের লোভে,
কপোত-কপোতী আলিসার কোণে ফেলিছে ক্লান্ত শ্বাস,
কা-কা করে কাক যেন কি মনঃক্ষোভে!
পতিতপত্র দেবদারু-শাখে ঝলসিছে কিশলয়,
নারিকেল-তরু এলায়েছে পাতাগুলি।
চড়াই খুঁজিছে শূন্য খোপেতে সুনিভৃত আশ্রয়,
তপ্ত উঠানে ফেরে না কাকলী তুলি।
ঘূর্ণি হাওয়ায় শুষ্ক পত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়ে,
ধূলি-কুণ্ডলী কভু বা ধরিছে ফণা ;
বাতাস কাঁদিছে অতি দূরে কোথা চাপা কান্নার সুরে
ফাগুন-আগুনে যেন সে ক্ষুণ্ণমনা।...

হাওয়া-অপিসের উপযুক্ত কবিতা তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তখন শূন্য হাওয়া-লোক হইতে শক্ত মাটিতে আশ্রয় লাভ করিয়াছি ; চাকরিতে কায়েম হইয়া মনে কবিতার বান ডাকাইয়াছি। যখন নিরাশ্রয় হইয়া ভাসিয়া যাইবার কথা, বেকার অবস্থায় বাংলা দেশের আরও হাজার হাজার বেকারের মত জনতার ভিড়ে হারাইয়া যাইবার কথা, তখনই রবীন্দ্রনাথের আহ্বান আমাকে রক্ষা করিল। আমার জীবনে আরও কয়েকবার রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সঙ্কটকালে আমার রক্ষার উপলক্ষ্য হইয়াছেন, শনিগ্রহের তিনি মঙ্গলগ্রহ।

যাহা হউক, আমি মফস্বলের ছেলে, এখানে এই কয়দিনে স্থূলে-বাস্তবে এবং আভাসে-ইঙ্গিতে উচ্চতম নাগরিক জীবনের স্পর্শ পাইলাম ; যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যাঁহাদের স্নেহ-সমীহ করেন, তাঁহাদিগকে চিনিলাম ও জানিলাম। আজ দীর্ঘকাল পরে মনের অতলে ডুব দিয়া তাঁহাদের কথা স্মরণে আনিতে চেষ্টা করিতেছি, দেখিতেছি, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার মনে শ্রদ্ধা বা প্রসন্নতা সঞ্চিত নাই। অবশ্য আর কাহারও কাছ হইতে স্মরণীয় কিছু লাভ না হইলেও আমার দুঃখ নাই ; প্রদীপ্ত ভাস্করের মত রবীন্দ্রনাথ সমগ্র আকাশখানাকে একলা এমন ভাবে জুড়িয়া থাকিতেন যে, ভাল মন্দ অন্য কোনও গ্রহ-উপগ্রহের কাছে হাত পাতিবার প্রয়োজনও হইত না।

কবি রবীন্দ্রনাথের খেয়ালের কিছু কিছু পরিচয় পাইতাম। সেদিন দক্ষিণের গাড়ি-বারান্দার উপরে আরাম-কেদারায় কবির আসন পাতা হইয়াছে, আমরা চুপচাপ মেঝেতে বসিয়া আছি। রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইয়া

আসিয়াছে। বিজলী আলো জ্বালিবার হুকুম নাই। গুন্ গুন্ করিয়া কবি নিজেরই রচিত গান গাহিতেছেন, সহসা অন্যের কণ্ঠে নিজের গান শুনিবার ঝোঁক চাপিল। চলনসই গোছেও কেহ কাছাকাছি ছিল না। সেই নিশীথ-রাত্রে ডালহৌসি-স্কোয়ারের সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে লোক ছুটিল শান্তিনিকেতনে জরুরি তার করিতে—রমা মজুমদারের অবিলম্বে আসা চাই। পরদিন রৌদ্র প্রখর হইবার পূর্বেই রমা দেবী উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি না আসা পর্যন্ত কবি শিশুর মত অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রমা দেবী প্রায় ধূলাপায়ে গান ধরিলে তবে তিনি শান্ত হইলেন।

"পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"র "কপি" লেখা শেষ হইলে আমি স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া মর্ত্যের ধরণীতে চিরপুরাতন সাতাশ নম্বরে ফিরিয়া আসিলাম। 'শনিবারের চিঠি'র আসর তখনও সরগরম, যদিও "অতি আধুনিক সাহিত্য" কথাটাই তখন পর্যন্ত জন্মলাভ করে নাই। নজরুল ইসলামের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও 'কল্লোল' তখনও ধীরবাহিনী নদী মাত্রই ছিল, ইহাতে তারুণ্যের সফেন উদগ্র উগ্রতা প্রকাশ পাইতে থাকে আরও কিছুকাল পরে। মোহিতলাল তাঁহার নাদিরশাহী কবিতা দিয়া তখন আমাদের আবিষ্ট রাখিয়া-ছিলেন। সারকুলার রোডের উপরে প্রায় সুকিয়া স্ট্রীট জংশনের কোণে বিপিনবাবুর চায়ের দোকান ছিল। রোগা কালো লম্বা অথচ প্রিয়দর্শন লোকটি খরিদ্দার-ভগবানে সর্বদাই তদ্গতচিত্ত—একটি সহ্যাদ্রি বলিলেও হয়। কত ব্যাট্‌ল অব ওয়াটারলু, কত পানিপথ-থানেশ্বরের যুদ্ধের মীমাংসা তাঁহার ক্ষুদ্র দোকান-ঘরটিতে হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিপিনবাবু স্বয়ং পানিপথ-সমর-ক্ষেত্রের মতই বিকারহীন; শিবনেত্র হইয়াই আছেন। যোগানন্দদা আর আমি দিনরাত্রির প্রায় সকল প্রহরেরই খরিদ্দার ছিলাম, সুতরাং আমাদের খাতির একটু বেশী ছিল। স-সুবল মোহিতলাল আসিতেন সকাল বিকাল। অধুনা বাঁকুড়া শহরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত, উখ্‌রার জমিদারদের পারিবারিক ডাক্তার বিরিঞ্চিবিলাস রায়, কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-শিয়েশন ও পরে পাটনার 'ইণ্ডিয়ান নেশনে'র সম্পাদক এখন ডক্টর শচীন সেন তখনকার শচীন বাঙাল, পক্ষিতত্ত্ববিদ সুধীন্দ্রলাল রায়, কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অনেক কৃতী ছাত্র—পরে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, যতীশচন্দ্র সেন, জীবনময় রায়, সুধানলিনীকান্ত দে, ডাক্তার শরদিন্দু ঘোষাল, হেমন্ত চট্টো-পাধ্যায় এবং কখনও কখনও অশোক চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিও বিপিনবাবুর পান্থশালায় পদার্পণ করিয়া এক পাত্র চায়ের প্রত্যাশায় বসিতেন, দোকানের নানা দিক হইতে রাজনীতি

সমাজতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব সাহিত্য বিজ্ঞানের নানা ধারা প্রবাহিত হইয়া পরস্পর কাটাকাটি করিত—হট্টগোলে কান পাতা দায়। ইহার মধ্যে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে আলাপচারি করিতেন সম্মুখের মূকবধির বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা। তাঁহারা অনেকেই নিয়মিত খরিদ্দার ছিলেন। আমরা ঘর ফাটাইয়া পথচারীর পিলে চমকাইয়া অনর্গল কথার তোড়ে যখন তর্কে এতটুকু অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, তাঁহারা তখন নিঃশব্দে শুধু হাত ও মুখ নাড়িয়া সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া যাইতেছেন—এই বিচিত্র দৃশ্য দার্শনিক দর্শকেরা প্রায়ই উপভোগ করিতেন। মোহিতলাল 'স্বপন-পসারী'র পরে তখন তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিস্মরণী'র জন্য প্রস্তুত হইতেছেন—প্রায়শই নূতন কবিতাপাঠের আড্ডাপীঠ হইত বিপিনবাবুর দোকান অথবা তৎসম্মুখস্থ গাছতলা, গাছটা কি গাছ ছিল আজ মনে নাই, গাছটিও আর নাই। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মোহিতলাল কিছুদিন পূর্বে মেস ছাড়িয়া মানিকতলা অঞ্চলে বাসা ভাড়া করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। সংসার নামমাত্র, দিবারাত্র কাব্য-কবিতা লইয়া বিভোর, তাঁহার কাব্যের শ্রোতারাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা নিকট-আত্মীয়। তাঁহার এই সাহিত্য-প্রীতি আমাকে এতখানি মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল যে, সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র পঞ্চবিংশ সংখ্যায় (২৫ মাঘ, ১৩৩১) আমাকে ও তাঁহাকে লইয়া একটি গল্প ("দুই দিক") লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ, এখন হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা, মোহিতলাল তখন চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক, কিন্তু তাঁহার তখন-কার সাহিত্য-প্রীতির ধরন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বদলায় নাই বলিয়া গল্পচ্ছলে তাঁহার সেদিনের যে ছবি আঁকিয়াছিলাম তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

> একদিন ছিন্নবেশে দরিদ্র ভিখারীর মত সারকুলার রোড ধরিয়া চাকুরির খোঁজে চলিয়াছি, পথে এক স্থানে হঠাৎ নিজের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, এক চায়ের দোকান হইতে 'ম'বাবু বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন। খাঁটি কবি। কোন্ এক স্কুলে মাস্টারি করেন। অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও কবিতা আর বনিতা লইয়াই ভরপুর আছেন। কাছে আসিতেই 'কি হে কেবলরাম ভায়া?' [কেবলরাম বেনামীতে আমি তখন লিখিতাম] বলিয়া একেবারে আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন, আমার জীর্ণ বেশ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'কি হে, কবিতাদেবী তোমার স্কন্ধেও ভর করলেন না কি?' আমি আগাগোড়া সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। তিনি ব্যথিত চিত্তে বলিলেন, 'তুমি আমার ওখানে যাও নি কেন ভাই? আড়াই জনের পেট যদি ভরে, তবে সাড়ে তিন জনের পেটও ভরবে।'

দোকানে উপবিষ্ট তাঁহার বন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়া আমাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

অত্যন্ত এঁদোগলিতে একটি জীর্ণ বাড়ি। তেতলায় দুইটি মাত্র ঘর। আর একটি নামমাত্র রান্নাঘর। দুইটি ঘরের মধ্যে একটিকে ঠাকুরঘর বলিলেও চলে। সেইটি 'ম'বাবুর বৈঠকখানা। তাঁহার আদরের মেয়ে [তাঁহার প্রথম সন্তান, ডাকনাম পেলা, ঢাকায় গিয়া ইহার মৃত্যু হয় এবং ইহারই মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন পিতা তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ "মৃত্যুদর্শন" লেখেন] 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়াই আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। 'ম'বাবু তাহাকে কোলে লইয়া আমাকে তাহার কাকাবাবু বলিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন। গিন্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওগো, আজ আমাদের অতিথশালা সরগরম।' আমরা গিয়া বৈঠকখানায় বসিলাম। বাড়ির চতুর্দিকের জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা দেখিয়া লজ্জিত হইতেছিলাম, —এই দুঃস্থ পরিবারের ঘাড়ে বোঝা হইয়া থাকা! আমি অবিলম্বে প্রস্থান করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলাম।

'ম'বাবু বলিলেন, 'ভায়া, গিন্নী রান্না করুন, আমরা ততক্ষণ একটু কাব্যচর্চা করি। খুকী ঘুমিয়েছে।' তিনি তাঁহার দপ্তরপত্র টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

'ম'বাবু ৪৫ টাকা মাহিনার সামান্য স্কুল-মাস্টার; মাসে ১৫ টাকা তাঁহার ঘরভাড়াতেই লাগে। আজ মাসের ২৯ তারিখ, হয়তো কাল কি করিয়া রান্না চড়িবে তাহার ঠিক নাই। সেই লোক একটি স্থায়ী অতিথিকে ঘরে আনিয়াও নিরুদ্বেগে কবিতা শোনাইতে বসিলেন! ধন্য কবিতাদেবী!

কবিতার পর কবিতা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা অন্তরাল হইতে 'ম'বাবুর গিন্নীর ইশারা আসিল। রান্না হইয়াছে। 'ম'বাবু বলিলেন, যাও তুমি ভাত দাও গিয়ে, আমরা যাচ্ছি।' বলিয়াই তাঁহার গম্ভীর গলায় পড়িতে লাগিলেন তাঁহার একটি কবিতা, যাহাতে তিনি কবিতা-কল্পনাকে ঘোড়া ও নিজেকে তাহার আরোহী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—অবশ্য একটি বিখ্যাত ইংরেজী কবিতার অনুসরণে। দরিদ্র কবির সেই অদ্ভুত উচ্চাভিলাষ ছন্দোবদ্ধভাবে এখনও আমার কানে বাজতেছে—

আমি তবু তার কেশরের মুঠি ধরেছিনু দৃঢ় বলে,
দেখাইনু তারে স্বপনের ফুলবন—

প্রকৃতি যেথায় বিলাস-লীলায় মুনিদেরো মন ছলে,
জোনাকীরা জ্বলে শিলাগৃহে অগণন !…

শুনিতে শুনিতে ভুলিয়া গেলাম—আমি দরিদ্র, দরিদ্রের সহবাসে রহিয়াছি, ভুলিয়া গেলাম কল্য প্রাতেই আমাকে চাকুরির জন্য পথে পথে অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইবে। কানে শুধু বাজিতে লাগিল—

ততবার তত তারকাপুঞ্জ নিবায়ে তাদের আলো
গভীর আঁধারে অসীমায় ডুবে যায় !

শুধু সে যুগের কেন, সর্বযুগের মোহিতলালের ইহাই খাঁটি পরিচয় ; তাঁহার সান্নিধ্যে আসিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম বলিয়া আমি সেই দুঃসময়েও ভাঙিয়া পড়ি নাই, এবং সাহিত্যকেই তরণী করিয়া দুস্তর জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিবার সাহস করিয়াছিলাম।

'শনিবারের চিঠি'র শেষ কয়েক সংখ্যার কিছু খবর এখানেই দিয়া সাপ্তাহিক পর্ব শেষ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র "তালতলা সাহিত্য" লইয়া অষ্টাদশ সংখ্যায় (২১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩১) 'শনিবারের চিঠি'র রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন ; তাঁহার কর্মস্থান ছিল রংপুরে। তিনি সুনীতিকুমারের প্রিয় শিষ্য ও ছাত্র, এবং পত্রযোগে তাঁহার সহিত আমাদের যোগাযোগও ঘটাইয়াছিলেন সুনীতিকুমার। কাঠমোল্লারা কেচ্ছা-সাহিত্যের মারফতে বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে, স্বভাবত ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের যে সর্বনাশসাধনে ব্যাপকভাবে তৎপর ছিল, রবীন্দ্রনাথ মৈত্রই সর্বপ্রথম তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন,—'শনিবারের চিঠি'ই তাঁহার প্রচারের বাহন হয়। তিনি নিজের সামান্য সাধ্যমত রংপুর-বগুড়া অঞ্চলে ইহার প্রতিকারও করিতেছিলেন। লাঞ্ছনাও তাঁহাকে কম সহিতে হয় নাই। তাঁহার দেহের একাধিক স্থলে প্রতিপক্ষের গুলির চিহ্ন ছিল, পরে সাক্ষাৎ-দর্শনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। সুদূর রংপুর (মাহিগঞ্জ) হইতেই তিনি সপ্তাহে সপ্তাহে অভিযান চালাইতে লাগিলেন। একবিংশ সংখ্যায় তাঁহার "টেক্সট-বুক সাহিত্য" বাংলা দেশের শিক্ষা-বিভাগে এক তুমুল সোরগোল তুলিল। মক্তব-প্রাইমাররূপে যে সকল পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হইত, সেগুলি হিন্দুসমাজের পক্ষে কি পরিমাণ ক্ষতিকর —দৃষ্টান্ত তুলিয়া তুলিয়া তিনি তাহা দেখাইলেন। তাঁহার কল্যাণে 'শনিবারের চিঠি' চিন্তাশীল বাঙালী সমাজে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে লাগিল। তিনি তখনই দিবাকর শর্মা নামে খ্যাত হইয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তেও নিয়মিত লিখিবার জন্য আহূত হইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি,

বাংলা-সাহিত্যে তখনও তথাকথিত আধুনিকতা প্রকট হয় নাই, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের বিখ্যাত হরিকুমারের আবির্ভাবও ঘটে নাই। তাহার আগমন হয় আরও পরে। মোটের উপর, ডাকযোগে রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া 'শনিবারের চিঠি' আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

নজরুল-মোহিতলাল সংঘর্ষ সত্ত্বেও 'কল্লোলে' ও সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে রীতিমত দোস্তি ছিল। আসল কর্ণধার গোকুলচন্দ্র নাগ তখন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি "তরুণ" কবি ও শিল্পী হইলেও ভদ্ররুচিসম্পন্ন সংযত মানুষ ছিলেন, কোনও দিক দিয়া শালীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না। মূর্তিমান বিদ্রোহের মত মাঝে মাঝে পটলডাঙার পাঁচালিকার যুবনাশ্বের (মনীশ ঘটক) আবির্ভাব ঘটিলেও 'কল্লোলে'র মোটামুটি আবহাওয়া ছিল শান্ত ও সুন্দর। প্রমথ চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নৃসিংহদাসী দেবী, কালিদাস নাগের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র শৈলজা অচিন্ত্য গোকুলচন্দ্রের আদর্শগত কোনও বিরোধ ছিল না; আর পাঁচটা কাগজ যেমন ভালমন্দে পাঁচমিশালি হইয়া বাহির হইত, 'কল্লোল'ও ছিল তেমনই। প্রথম বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিলেন ১৩৩১-এর মাঘ সংখ্যা হইতে শ্রীকালিদাস নাগ মূল ফরাসী রম্যা রলাকে আসরে অবতীর্ণ করাইয়া। অনুবাদে কনিষ্ঠ গোকুলচন্দ্র জ্যেষ্ঠ কালিদাসের সহকর্মী ছিলেন। ব্যাপারটা 'শনিবারের চিঠি'র এতই মনঃপূত হইয়াছিল যে, মাঘের 'কল্লোলে' প্রকাশিত কালিদাস নাগের ভূমিকাটি ৪ঠা মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে হুবহু মুদ্রিত হইল। সংঘর্ষের কোনও সমীচীন কারণ ঘটিবার পূর্বেই সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র দেহান্ত ঘটিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবন্ধু এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম ও হেমেন্দ্রকুমার রায় সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিলেন; শেষোক্ত দুইজন বিদ্রূপে ব্যঙ্গে বার বার আক্রান্ত হইয়াছেন। আর কোনও সাহিত্যিকের কথা আমার মনে পড়ে না। হেমেন্দ্রকুমারের ভাষা ও ভঙ্গির তারল্য 'শনিবারের চিঠি' বরদাস্ত করিত না। হয়তো অন্য কারণও ছিল; সম্পাদক যোগানন্দ দাসের ব্যক্তিগত বিরূপতা। তাসপাশার আড্ডায় কবে কলহ হইয়াছিল তাহার জের চলিয়াছিল 'শনিবারের চিঠি'তে ছন্দোবদ্ধ ব্যঙ্গ-কবিতায়। আমিও অকারণে শুধু হস্ত-কণ্ডূয়ন-নিবৃত্তির জন্যই যোগ দিয়াছিলাম। সে কলহ মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

যাহা হউক, সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' মরিল বটে, কিন্তু আমি 'প্রবাসী'তে মাটির আশ্রয় পাইলাম। শান্তা দেবী কর্তৃক মনোনীত বাকি কবিতাটি "মানস-অভিসার" মাঘের (১৩৩১) 'প্রবাসী'তে এবং চৈত্র মাসে

সদ্য-রচিত "নারী" কবিতাটি বাহির হইয়া আমাকে মাটিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিল। পর-বৎসর অর্থাৎ ১৩৩২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'প্রবাসী'তে যখন আমার পূর্ণ তিন পৃষ্ঠাব্যাপী (ছয় কলম) "সভ্যতা" কবিতাটি বাহির হইল, তখন আর আমাকে পায় কে? 'মানসী ও মর্মবাণী' এবং 'নবযুগ' পত্রিকার মাসিক-সাহিত্য-সমালোচকেরা আমাকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিলেন। এই কবিতাটি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তা শান্তা দেবীকে শান্তিনিকেতনে তাঁহার পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ভার আমার উপর পড়িল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার ভক্ত ও কর্মচারী হিসাবে পাদস্পর্শ করিয়া সেখানেই প্রথম প্রণাম করিলাম। তিনি সস্মিত মুখে আমাকে সম্ভাষণ জানাইয়া আবেগহীন শান্ত কণ্ঠে এইটুকু মাত্র বলিলেন, তোমার একটি দীর্ঘ কবিতা বৈশাখের 'প্রবাসী'তে বের হয়েছে দেখলাম! এখনও পড়ি নি। এ দেশে যারা কবিতা লেখে তারা কাজের লোক হয় না। দেখি, তুমি কি কর! আমার কর্মক্ষমতা-সম্পর্কিত বিচারের ফলাফল তিনি কখনও ঘোষণা করেন নাই বটে, কিন্তু পরে অনেক কঠিন কঠিন কাজের ভার আমাকে দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু নন্দলাল ও কানাইলাল দত্তের ভাগিনেয়—ইহা জানিবার পর তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, কিন্তু কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতে কখনও কসুর করেন নাই। দীর্ঘ সাত বৎসর কাল আমি তাঁহার স্নেহাশ্রয়ে থাকিয়া অনেক কিছুই শিখিবার সুযোগ পাইয়াছি, নানা দিক দিয়া সুবিধাও কম পাই নাই। তাঁহার প্রসঙ্গ সূত্রপাতেই শেষ হইবার নয়, আমাকে আরও অনেক বলিতে হইবে।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র একেবারে অন্তিম কালে ষড়বিংশ সংখ্যায় (২ ফাল্গুন ১৩৩১) আমার একটি পত্র প্রকাশিত হয়, পত্রটি আমার মাত্র দেড় বৎসরের পুরাতন পত্নীর নিকট কবিতায় লিখিত হইয়াছিল। পূর্বতন "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দে"র ন্যায় এই কবিতাটিও আমাকে সাহিত্যিক মহলে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল; জীবনময় রায় ও মোহিতলাল কবিতাটি অনেককে আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ইহা পড়িয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তো বড় দুষ্ট হে! আজ গৃহিণী পঞ্চাশৎ না হইলেও বত্রিশ বৎসরের পুরাতন হইয়াছেন, নাতিনী এখনও আসেন নাই বটে তবে নাতিরা আসিয়াছেন—আমার ভবিষ্যৎ কল্পনা বাস্তবকে প্রায় ছুঁই-ছুঁই করিতেছে। সেই কল্পনা একদিন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইবে এই ভরসায় এবং ইহার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করিবার জন্য সেটি এখানে অংশত পুনর্মুদ্রিত করিতেছি, 'আত্মস্মৃতি'র পাঠকেরা অপরাধ লইবেন না।—

আজি হতে দীর্ঘ পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে
ষষ্টিপঞ্চ বয়সে তোমার, হে প্রেয়সী,
ছবিটি জাগিছে তব মুগ্ধ এ অন্তরে—
লোলচর্ম বৃদ্ধাবেশ, অয়ি পঞ্চদশী।
সুকৃষ্ণ কুন্তল ঘন শনশুভ্র হয়ে
শোভিতেছে ক্ষুদ্র তব বিরল মস্তকে,
কপোল কুঞ্চিত শীর্ণ কাল-ঝঞ্ঝা স'য়ে,
অধর পাণ্ডুর জীর্ণ সংসার-পরথে।
দশন অভাবে মুখে ভীষণ ভ্রূকুটি,
কুব্জ হয়ে ফিরিতেছ ভগ্ন কটিদেশ,
কপালে গণ্ডেতে রেখা উঠিতেছে ফুটি,
নয়ন-কমলে আর নাহি জ্যোতিলেশ।
বিশীর্ণ অঙ্গুলি তব কাঁপে থরথরি
মুখে বাক্য বাহিরায় অবোধ্য অস্ফুট,
বিড় বিড় বকিতেছ রাত্রিদিন ধরি,
অকারণে বধূদের ধরিতেছ খুঁত!
নাতি ও নাতনী ল'য়ে কাটাইছ বেলা
রঙ্গরস পরিহাস বিরক্তি বিভ্রাটে,
বিনিদ্র রজনী বুকে আনে স্মৃতিমেলা—
অষ্টোত্তরশত নামে শেষরাত্রি কাটে।
শীতে অঙ্গ জরজর, নামাবলী গায়ে
বসেছ উঠান-কোণে রোদে পিঠ দিয়া,
নাতিনী লেপিছে তৈল শুষ্ক তব পায়ে
তার সাথে পরিহাস কর মোরে নিয়া।
আমার এ পত্রগুলি কাল-জর্জরিত
দেখাও তাহারে গর্বে অতি সঙ্গোপনে,
গোপনে শুধাও নাতজামাতার রীত—
কহিয়া আমার কথা হৃষ্ট মনে মনে।
সন্ধ্যায় লেপেতে তব সর্বাঙ্গ মুড়িয়া
কহিছ কাহিনী কত, অতীতের কথা,
স্মৃতি যত আছে তব হৃদয় জুড়িয়া
জীবনের সুখদুঃখ বিষাদবারতা।

মুকুরে দেখিয়া মুখ ভাবিছ বিরলে
পঞ্চাশ বছর আগে কে ছিল সুন্দরী—
বেঁধেছিল হৃদি কার চঞ্চল অঞ্চলে
কে রাখিত প্রেমপাত্র পরিপূর্ণ করি!…
ফাগুন-যামিনী একা কাটাই প্রেয়সী,
ভাবী জীবনের কথা ভাবি অকারণ,
সেদিনের কথা ভেবে ওগো পঞ্চদশী,
কবিতা-কল্পনা মোর মানে না বারণ।…

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' আপনি মরিয়া আমার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নূতন পরিচয়ের জোরে আবার বিশ্বভারতীতে তাঁহার পুস্তক-মুদ্রণ ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য নিয়মিত যাতায়াতের অধিকার অর্জন করিলাম। 'শনিবারের চিঠি'হীন ১৩৩২ বঙ্গাব্দ মোটের উপর নানা দিক দিয়া আমার কল্যাণেরই সূচনা করিল।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

আসন

শস্যশ্যামল প্রান্তরে বিপুল কলোচ্ছ্বাসে প্রবাহিত তরঙ্গভঙ্গময় নদী যেন অকস্মাৎ অজ্ঞাত মরুবালুকার তলদেশে হারাইয়া গেল। সকলে ভাবিল, নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি জানিতাম, উহা আমাদেরই অবহেলার পাপে অন্তঃসলিলা হইয়া ফল্গুধারায় বিরাজ করিতেছে। আমার অন্তঃকরণ তাহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিত। আমাকে মাটিতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া জলধারা যেখানেই আত্মগোপন করুক, আমি এ কথা প্রতিনিয়ত বিশ্বাস করিতাম, একদিন তাহা আবার আত্মপ্রকাশ করিবেই। মাটির আশ্রয় লাভ করিয়া আমি তাহার উপরেই তপস্যার আসন পাতিলাম, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা পাপক্ষালন করিতে হইবে। মাসিক মাত্র চল্লিশ টাকা বেতনে আসন দৃঢ় হইবার কথা নয়, সুতরাং কৃচ্ছ্রসাধন স্বতঃপ্রবৃত্ত না হইয়া "বাধ্যতামূলক" হওয়াতে আমার মনের গ্লানি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের কৃপায় বিশ্বভারতীতে পুনরায় প্রুফ দেখার কাজে বহাল হইলাম বটে, কিন্তু সে কাজ তো নির্বেতন আপখোরাকি। দেবদ্বিজে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, স্বভাব ও বয়োধর্মে একমাত্র নারী-শক্তির নিকট

মস্তক অবনত করিতাম, সেই ঘোরতর দুর্দিনে কাজেই তাঁহারই বন্দনা রচনা করিলাম—

…পূর্ণ আজি অনন্ত নিখিল
তব স্নেহরসসুধাধারে। অন্তরের প্রতি বিন্দু রক্তকণাদানে
জীয়াইয়া রাখো তুমি শুষ্ক শীর্ণ পুরুষ-পাদপে ; সে ত নাহি জানে
কোথা কোন্ অন্ধকার ভূমিবক্ষ হতে লুব্ধপ্রেমে করে আহরণ
আপন জীবনীরসধারা। অন্তঃপুর অন্তরালে রহিয়া গোপন
কে যোগায় প্রাণের পীযূষ ! কত স্নেহ, কত ব্যথা, শঙ্কা দ্বিধা কত
বিনিদ্র রজনী, অনাহার, দেবতা-দুয়ারে শত প্রার্থনা নিয়ত
আজন্ম রেখেছে তারে ঘেরি ! সে কি জানে কভু হায়, নিয়ে কত ব্যথা
বাহিরে পাঠাল তারে সংসারের জয়যাত্রা-পথে আর্ত ব্যাকুলতা
জননীর ! নিষ্ফল ক্রন্দনে দীর্ণ করি জীর্ণ বক্ষ দেবতা চরণে
জানায়েছে করুণ মিনতি। উল্লাসে যে ছুটে চলে মরণ-বরণে
সে কি জানে প্রেয়সীর নিদারুণ বিরহ-যন্ত্রণা মরণ-অধিক,
সে কি জানে ভগিনীর অশ্রু ছলছল ; কত শুষ্ক শূন্য চারিদিক
জননীর নয়নে বিরাজে ? সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে আজো তুমি নারী
অন্তরালে রয়েছ গোপনে, আঁধার মৃত্তিকা হতে সঞ্জীবনী-বারি
যুগে যুগে করিছ প্রদান।…

১৩৩১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে দীর্ঘ "নারী" কবিতাটি প্রকাশিত হইল এবং আমার অন্তরের গভীর আবেদন ব্যর্থ হইল না। ভ্রাতা যখন বন্ধুত্ব ও অতি-পরিচয়ের দরুন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অন্তরাল হইতে ভগিনী তখন কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করিলেন ; আমি অচিরাৎ চল্লিশ টাকা হইতে মাসিক পঁচাত্তর টাকাতেই শুধু উন্নীত হইলাম না, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার স্থায়ী পোক্ত সহকারী-সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইয়া জীবনে ও সাহিত্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলাম।

শান্তা দেবীকে লইয়া শান্তিনিকেতন পৌঁছিয়াছিলাম ১৩৩২ বৈশাখের মাঝামাঝি ; গিয়াই দেখি, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিপুল আনন্দের আয়োজন চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে দলে দলে ভক্তেরা আসিতেছেন, শান্তিনিকেতন সরগরম। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক, তখনও পর্যন্ত আমার বিস্ময় শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সহিত অন্তরঙ্গ হইবার কারণ ইতিমধ্যে ঘটিয়াছিল, "নূতন কথামালার গল্প" লইয়া শ্রীবিষ্ণুশর্মা রূপে তিনি সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র আসরে সপ্তদশ (১৪ অগ্রহায়ণ

১৩৩১) হইতে পর পর কয়েক সংখ্যায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এবারেও মুরুব্বি পাকড়াইলাম। মাত্র মাসাধিক কাল আগে রবীন্দ্রনাথের সহিত কতকটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ব্যাকুলতা ছিল না। এবারে প্রমথনাথ ও কালিদাস নাগকে ধরিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও ক্ষিতিমোহনের সহিত পরিচিত হইলাম। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সেখানেও সর্বময় কর্তা, সুরুল শ্রীনিকেতনে তৎপ্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান-সম্মত কৃষিকার্য মহাসমারোহে চলিতেছিল, স্বদলবলে তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। একজন উৎসাহী সংবাদদাতা সংবাদ দিলেন, এই নবপদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিলাতী বেগুন পিছু খরচা পড়িয়াছে কয়েক আনা করিয়া। কৌতুক বোধ করিলাম ; সেই দিনই আমার মনে পরবর্তী কালে রচিত "হসন্ত তরফদার" গল্পের গোড়াপত্তন হইল। পরে আরও উপকরণ জুটিয়াছিল।

বিগত দোলপূর্ণিমার দিন (২৬ ফাল্গুন ১৩৩১) বসন্ত উৎসবের মধ্যে 'সুন্দর'কে সঙ্গীতে বরণের মনোহারী আয়োজন কালবৈশাখীর অকাল-অভ্যাগমে ব্যর্থ হইয়াছিল। শুনিলাম, বর্ষশেষের দিন সেই 'সুন্দর'-বরণ সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। 'সুন্দর' তেরোটি সঙ্গীতের মালা, তন্মধ্যে এগারোটিই নূতন রচিত। আরও সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সর্বসাধারণের জন্য নহে। শ্রীমতী রাণী মহলানবীশকে লক্ষ্য করিয়া রচিত একটি গানের প্রথম দুই পংক্তি লইয়া আমরা খুবই হুল্লোড় করিয়াছিলাম—

"চৈত্র-রজনী আজ যাবে অ-ফলা,
বিরহিণী জপে ব'সে প'য়ে র-ফলা ॥" [অপ্রকাশিত]

বলা বাহুল্য, প্রশান্তচন্দ্র সেই বসন্তোৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, সুন্দরের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য আমরা কবির নিকট আবেদন জানাইলাম। আবেদন মঞ্জুর হইল। কবির জন্মদিনে সকাল সাড়ে সাতটায় উত্তরায়ণেরও উত্তরে অশ্বত্থ বট বিল্ব অশোক আমলকী অর্থাৎ "পঞ্চবটী" রোপিত হইল, সন্ধ্যায় কলাভবনে মেয়েদের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয়ান্তে 'সুন্দরে'র গান হইল। মুগ্ধ হইয়া গেলাম ; গান শুনিতে শুনিতে এই চির-পুরাতন পৃথিবীর এক চিরনূতন রূপ যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। সেই দিনই প্রথম শুনিলাম—

"আজ কি তাহার বারতা পেল রে কিশলয় ?
ওরা কার কথা কয় বনময় ?"

এবং

"কুসুমে কুসুমে চরণ-চিহ্ন
দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা নাহি যেতে
খেলা কেন তব যায় ঘুচে!"

সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, এই "কিশলয়ের বারতা" ও "কুসুম-চরণ-চিহ্নে"র গানের উৎস কবিকে ও আমাকে একই সঙ্গে স্পর্শ করিয়াছিল। আমার নাড়া-খাওয়া মন "অগ্নিদূত"কে আহ্বান করিয়াই শান্ত হইয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন 'সুন্দরে'র অজস্র গান। আলিপুর হাওয়া-আপিসের অরণ্যময় পরিবেশই যে এই উৎস, তাহা প্রমথনাথের সম্পাদকীয় দপ্তরে রবীন্দ্রনাথের নববর্ষের ভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশ দৃষ্টে বুঝিতে পারিলাম—

"এবার অসুস্থ শরীর নিয়ে মৃত্যুর পশ্চিম কূলে ব'সে ম্লান প্রাণের আলোকে অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা থেকে দূরে আপনাকে ও বিশ্বকে দেখবার অবকাশ পেয়েছিলুম। কলকাতায় যেখানে ছিলুম সেখানে শহরের পাথরে-বাঁধানো শুষ্কতা ছিল না, চারদিক গাছপালায় ছিল শ্যামল। সেখানে এবার অনেক দিন পরে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন স্পর্শ করে দেখতে পেলুম। হঠাৎ গাছপালার তন্দ্রা ছুটে গেল, বিশ্বযজ্ঞের নিমন্ত্রণ তাদের কাছে এসে পৌঁছল, সাজসজ্জার সাড়া প'ড়ে গেল; ফিকে সবুজে, গাঢ় সবুজে, নীলে, লালে, সোনালীতে প্রত্যেকে নিজের বিশেষত্ব নিয়ে আনন্দিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে এল; দেখে আমার মন পুলকিত হয়ে উঠল। কোথা থেকে এ ডাক এল, যার সাড়া সমস্ত পৃথিবীর বুক থেকে উঠছে! আকাশের কোন্ গূঢ় অলক্ষ্য চঞ্চলতা দক্ষিণ হাওয়াকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে! তরুলতার প্রাণশক্তি রূপের লীলায় দিকে দিকে বিচিত্র হয়ে উঠল। প্রত্যেক গাছ আপনার স্বরূপকে পরিস্ফুট ক'রে তুলছে। প্রাণ যেখানে আপন বিশেষত্বের ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় সেই-খানে তার অকৃপণ দাক্ষিণ্য, সেইখানে সে বিশ্বকে উদারভাবে আহ্বান করে। এক ধারে অশ্বত্থ, তারি পাশে শিরীষ, তারি পাশে কাঞ্চন—তারা সকলেই রূপে স্বতন্ত্র অথচ সেই স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণতাতেই তাদের পরস্পরের ভাবের মিল। আকাশ-বীণার একই আলোকের সুরে তাদের নিজ নিজ বিভিন্ন রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। অরণ্যব্যাপী প্রাণের আনন্দ-সঙ্গীতে তাদের অবিরোধ মিলন। প্রত্যেক গাছ আপনার বিশেষ আতিথ্য দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আপন আত্মীয়তা জানাচ্ছিল। তা না হ'লে গাছ দেখে আমার মনে কোনো ভাব আসত না। যখনই সে নিজেকে পূর্ণ করলে,

তখনই সে আমাকেও আহ্বান করলে—তার আপনার পূর্ণতা আমারও পূর্ণতাকে উদ্বোধিত করলে।” [পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত]

নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমিও কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম এবং আসিয়াই পূর্বোল্লিখিত উন্নত বেতন ও পদমর্যাদার দ্বারা সম্মানিত হইলাম। ‘প্রবাসী’-কার্যালয়েই কাজের বহর এত বাড়িয়া গেল যে, বিশ্বভারতীয় সেবা কদাচিৎ করিতে পারিতাম। একদিন সেখানে গিয়া শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্যগ্রন্থ ‘পূরবী’র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছে প্রধানত ‘পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি’র কবিতাগুলি লইয়া। আমার অনুলিখিত ডায়ারির শেষাংশও জ্যৈষ্ঠের ‘প্রবাসী’তে মুদ্রিত হইয়াছে, সুতরাং পুস্তকাকারে প্রকাশের বাধা নাই। প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ নয় বৎসরকাল কবির কোনও কাব্যগ্রন্থ বাহির হয় নাই, সেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘বলাকা’ প্রকাশিত হইয়াছে ; ‘পলাতকা’ (১৯১৮) এবং ‘শিশু ভোলানাথ’ (১৯২২) অবশ্য হিসাবের মধ্যে ধরিতেছি না। নূতন কবিতাগুলির সঙ্গে কাজেই পুরাতন ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কবিতাগুলিও ছাপাইবার প্রস্তাব হইল। আধুনিক পুরাতন খুঁজিতে খুঁজিতে অতি পুরাতন অনেকগুলি কবিতাও আবিষ্কৃত হইল—অনেকগুলি স্বদেশী আমলের বিখ্যাত কবিতা—যাহা এতাবৎকাল পরিত্যক্ত হইয়া আসিয়াছে। আমার খাতায় নকল ছিল, আমিই সেগুলি সরবরাহ করিলাম। বইখানির তিন ভাগ হইল, “পূরবী”-অংশে হালী পুরাতন কবিতা, “পথিক”-অংশে নূতন ডায়ারির কবিতা এবং “সঞ্চিতা”-অংশে হারাইয়া যাওয়া পুরাতন কবিতা। কলিকাতা বিশ্বভারতী আপিসের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইয়া শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি ‘পূরবী’ বাহির হইল। যথাসময়ে এক কপি হাতে পাইয়া পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল। অসংখ্য ভুল এবং বিশ্রী ভুলে ভরা বইখানি আমার শিরঃপীড়ার কারণ হইল। রবীন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোতেই ছিলেন। অবিলম্বে সংশোধিত কপিখানি সরাসরি তাঁহার নিকট দাখিল করিলাম। তিনি অতি সংযত ধীরস্থির পুরুষ ; সেদিন দেখিলাম, রাগে আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং তখনই কাহাকে যেন ডাকিয়া বিশ্বভারতীর তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের মুণ্ডপাত করিতে করিতে হুকুম দিলেন, সব আগুনে পুড়িয়ে ফেলে নতুন ক’রে ছাপাও। এই সকল ভুলের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব অনবধানতা দুই এক ক্ষেত্রে ছিল, সেগুলির প্রতিও আমি সভয়ে ও ও সাবধানে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। এই ধরনের ভুল কবি মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক, সুতরাং সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা দোষের হইবে না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিয়োগে রবীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ কবিতাটি লিখিয়াছিলেন ও রামমোহন

লাইব্রেরিতে স্বয়ং পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে গোড়াগুড়ি এই পংক্তি কয়েকটি ছিল—

"সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন ; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত ; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার।..."

আঠারো অক্ষরের পয়ার। পয়ারের ধর্ম অনুযায়ী চার বা আট অক্ষরের পরে যতি স্বাভাবিক ও নিরাপদ। ছয় বা দশ অক্ষরের পর যতি দিতে গেলেই বিপদ অনিবার্য ; "দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত..." পংক্তিতে সেই বিপদ ঘটিয়াছে, যতি পরিবর্তনের ফলে দুইটি অক্ষর আপনা হইতেই বাড়িয়া গিয়া পংক্তিটি কুড়ি অক্ষরে দাঁড়াইয়াছে। ইহা ভুল। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেও কয়েকবার এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন, 'পূরবী'তেও অন্যত্র এই ভুল ঘটিয়াছে। অমন যে ছন্দ-সাবধানী মোহিতলাল, তিনিও 'বিস্মরণী'র "সুইনবার্নের অনুসরণে" কবিতায় যতিভঙ্গের জন্য এই অক্ষরাতিশয্যদোষ এড়াইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ আমারই 'পূরবী'তে স্বয়ং এই সংশোধন করিলেন—

"দিয়ে গেলে গীতচ্ছন্দ ; কাননের পল্লবে কুসুমে..."

পরবর্তী সংস্করণ ছাপিবার সময় আমার বইখানিই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অন্য সকল ভুল আদর্শানুযায়ী সংশোধিত হইলেও "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" কবিতার এই পংক্তি সংশোধিত হয় নাই, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তেও ভুল থাকিয়া গিয়াছে। "গ্রন্থ-পরিচয়ে" শ্রীপুলিনবিহারী সেন অবশ্য ভুলটির উল্লেখ করিয়া অন্য সংশোধন দিয়াছেন।

শ্রীনিকেতনে কৃষিকর্মের মত আর একটি কঠিন ও কৌতুককর কাজে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কলিকাতার বিশ্বভারতী আপিসেই হাত দিয়াছিলেন —গণভোটের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-বিচার। তাঁহার অদম্য স্ট্যাটিসটিকস্-বুদ্ধি এই ধরনের "একটা নতুন কিছু করা"র দিকে তাঁহাকে এই কালে অবিরত প্ররোচিত করিতেছিল ; তিনি বিশ্বভারতীর উপর দিয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালাইতেছিলেন। এই পরীক্ষা যদি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারেই শেষ হইত, তাহা হইলেও রক্ষা ছিল। তিনি ভোট-মাহাত্ম্য বিচারে তৃতীয় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ 'চয়নিকা' ছাপিতে বসিলেন। আমরা প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম, কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স্ কখনও যুক্তি মানে না। ফাল্গুন মাসে (১৩৩২) সেই বিপুলকায় বিচিত্র 'চয়নিকা' বাহির হইয়া রবীন্দ্রনাথকেও

বিচলিত করিয়াছিল, কিন্তু ইহার প্রতিকার করিতে তাঁহাকে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে তাঁহার 'স্বয়ং'-নির্বাচিত 'সঞ্চয়িতা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিয়া কবি গণ-'চয়নিকা'র সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করেন।

বাহিরের সঙ্গে সংযোগ আমার আর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, 'প্রবাসী' কার্যালয়ই আমাকে ধীরে ধীরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিতেছিল। মাসিক পঁচাত্তর টাকা তখন আমার প্রয়োজনের অতিরিক্তই মনে হইয়াছিল। বাবা, মা বা অপর কেহ আমার উপর নির্ভরশীল ছিলেন না, গৃহিণী ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত কখনও ধানবাদে মাতুলালয়ে, কখনও শ্যামবাজারে পিত্রালয়ে দোল খাইয়া ফিরিতেছিলেন। আকস্মিক সমৃদ্ধির মোহে সংসার পাতিবার বাসনা স্বতই হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেনের মেসে আমাকে আর যেন ধরে না, বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের অপঘাত-মৃত্যু এবং মোহিতলাল মজুমদারের মেস-ত্যাগেও মনটা উদাস হইয়াছিল। বিপিনবাবুর চায়ের দোকানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, যিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে একুশ-কামান-গর্জন-সম্বর্ধিত প্রথম অস্ত্রোপচারী ডাক্তার মধুসূদন গুপ্তের অন্যতম বংশধর। কথায় কথায় জানিলাম, তাঁহাদের বাহির-মির্জাপুর রোডের বাড়ির নীচের অংশ ভাড়া দেওয়া হইবে। মাসিক ভাড়া ত্রিশ। একা অতখানি সামলাইতে পারিব না ভাবিয়া শিল্পীবন্ধু এবং মেসের রুমপ্রতিবেশী শ্রীহরিপদ রায়ের সঙ্গে একযোগে বাড়ি ভাড়া লইব স্থির হইল। তখন আমার আসবাব ও বইয়ের সংখ্যা নিতান্ত মন্দ নয়; হরিপদ রায় তো চিরকালই খুদে লাট। আমার জীবনে যে কয়েক জন খাঁটি অ্যারিস্টক্র্যাটকে আমি দেখিয়াছি, তিনি তাহাদের অন্যতম ও প্রথম। তাঁহারও লটবহর বড় কম নয়। একদিন প্রাতে আমাদের মালবাহী ক্যারাভ্যান বাদুড়বাগান লেন হইতে বাহির হইয়া আপার সারকুলার রোড অতিক্রম করিয়া রামমোহন রায় রোড ধরিয়া বাহির-মির্জাপুরের দিকে চলিল, পিছনে পিছনে জলভরা কুঁজা হস্তে আমরা দুই হাফ-গৃহস্থ পরস্পর সহযোগে পুরা গৃহস্থালী পাতিতে চলিলাম। হঠাৎ আমার পিছনে টান পড়িল। ফিরিয়া দেখি, আমার বাঁকুড়া কলেজ হস্টেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিরণচন্দ্র দত্ত, উস্কখুস্ক রুক্ষ বেশ; আমার প্রশ্নাতুর বিস্মিত দৃষ্টির কোনও জবাব সে দিল না; কোনও রকমে শ্রান্ত দেহ টানিয়া নীরবে আমার পশ্চাদ্ধাবন করিল। চার নম্বর বাহির-মির্জাপুর রোডে আমরা তিনটি প্রাণী একতলায় অধিষ্ঠিত হইলাম। কিরণচন্দ্র কুচবিহারের দেওয়ান কালিকাদাস দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র, চারুচন্দ্র দত্ত আই. সি. এস. এর

খুল্লতাতপুত্র ; চারু বাবুদেরই কলিকাতা গঙ্গাধর বাবু লেনের বাড়িতে আরাম-আলস্যে থাকিয়া সে লেখাপড়া করিতেছিল। কিরণেরই সম্পর্কে চারুচন্দ্র দত্তকে আমি দাদা বলিতাম, তিনিও কনিষ্ঠবৎ আমাকে স্নেহ করিতেন। বুঝিলাম, পারিবারিক কলহের ফলেই কিরণ দেওয়ানা হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। তাহাকে আর ঘাঁটাইলাম না, চুপচাপ নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে দিলাম।

হরিপদ রায়ের চেষ্টায় গোবিন্দ নামধেয় এক মদ্রদেশীয় কমবাইণ্ডহ্যাণ্ড জুটিল, সে-ই একাধারে আমাদের ঠাকুর চাকর ঝি দারোয়ান সব। হরিপদ রায় স্বয়ং অত্যন্ত সুগৃহিণী, রান্নায় দ্রৌপদী বলিলেও হয়। তিনি একদিন গুরুতর একটা ভোজের আয়োজন করিলেন। তাঁহার গৃহিণী দূর বরিশালে শ্বশুরালয়ে ছিলেন ; তাঁহার এক শ্যালিকা এবং আমার গৃহিণী সেই ভোজে আমন্ত্রিত হইয়া আমাদের সংসারাশ্রমের গোড়াপত্তন করিলেন। কিরণ তখনও অবিবাহিত, সুতরাং সে বৈঠকখানায় রহিল। সেই প্রায় "ব্যাচিলার্স ডেনে" অকস্মাৎ নারীসমাগম হওয়াতে পাড়ায় বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল।

'শনিবারের চিঠি'র পরবর্তী পুনর্জীবনে এই হরিপদ রায়ের স্থান প্রায় সর্বাগ্রে ; ইনি বর্তমানে একজন প্রসিদ্ধ কমার্সিয়াল আর্টিস্ট, কিন্তু গোড়ায় অবিরত উৎকৃষ্ট কার্টুন আঁকিয়া মাসিক 'শনিবারের চিঠি'কে মাসে মাসে ইনি সমৃদ্ধ না করিলে ইহার এত দ্রুত প্রতিষ্ঠা হইত না। আমাদের লেখার সঙ্গে রেখায় তিনি সমানে তাল রাখিয়া চলিবার ক্ষমতা রাখিতেন। 'শনিবারের চিঠি'র মাসিক প্রথম পর্যায়ে ইনি শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন। নব পর্যায়ে ফেনী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (পি. সি. এল. ও কাফী খাঁ নামে খ্যাত) হরিপদ রায়ের স্থলাভিষিক্ত হন। আমারই আকর্ষণে তিনি অধ্যাপনা ছাড়িয়া শুধু কার্টুন-শিল্পী হিসাবে কলিকাতার সাময়িক-পত্রজগতে ভাগ্যপরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং অশেষ যোগ্যতার সহিত আজ এই পথেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। এই দুই শিল্পীর কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়।

আমার এই বাহির-মির্জাপুরী জীবনের একটি প্রায় নিখুঁত চিত্র "গল্প" নাম দিয়া ১৩৩২ সালের পৌষের 'প্রবাসী'তে বাহির করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, এখানে বেশিদিন আমাদের থাকা হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার কারণ সেই "গল্প" হইতেই একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

পেয়ালার [চায়ের] ঠন্‌ঠন্‌ যত দ্রুততর এবং সিগারেটের ধোঁয়া যত নিবিড়তর হইতে লাগিল, মাসিক সত্তর-পঁচাত্তর টাকা কোথায় ফুঁকিয়া গিয়া দেনার অঙ্ক ততই ভারী হইতে লাগিল, এবং একদিন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বোধোদয় হইল। ভাবিলাম, এ লাটীয় চাল চলিবে না—পুনর্মূষিক হইতে হইবে। মেস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শ্বশুরের কাছে টাকা ধার করিতে গেলাম, তিনি খুব একচোট ধমকাইয়া লইয়া বাড়ি এবং চাকর ছাড়িয়া দিয়া বাগবাজারে [শ্যামবাজারে] তাঁহার কেয়ারে থাকিতে আদেশ করিলেন। আমি সেইটাই সুবিধা ও লাভজনক ভাবিয়া যতীনকে [বাড়িওয়ালা] নোটিশ দিলাম। গোবিন্দকেও অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করিতে বলিলাম।

আশ্বিন মাসের (১৩৩২) মাঝামাঝি এই ঘটনা ঘটিল। হরিপদ রায় বরিশালে পূজাবকাশ যাপন করিবার জন্য চলিয়া গেলেন, কিরণও ছুটিতে দেশে গেল। আমি দিনাজপুর হইতে হঠাৎ তারযোগে মায়ের নিদারুণ অসুখের সংবাদ পাইয়া ছুটি লইয়া সেখানে চলিয়া গেলাম। আমাদের সাধের সংসার সূত্রপাতেই ছারখার হইল।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র মরুবালুতলে প্রথম অন্তর্ধানের (৯ ফাল্গুন ১৩৩১) পর ১৩৩২-এর আশ্বিন পর্যন্ত এই আট মাস কালে সাহিত্যের দিক দিয়া আমার অনেক লাভ হইয়াছিল—অধিকাংশই মোহিতলালের দৌলতে, একটি শুধু শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু মহাশয় ছিলেন আমার শ্বশুর মহাশয়ের প্রতিবেশী। প্রায় সামনাসামনি ঘর। দুই বাড়িতে নিত্য যাতায়াত ছিল। বসু মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী আমার গৃহিণীকে নাতনী বলিতেন, আমি হইলাম তাঁহাদের নাতজামাই। রসরাজ বহুদিন আমাকে ধরিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের আড্ডায় লইয়া যাইতেন। বহু পুরাতন কাহিনী, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক ব্যাজস্তুতিমূলক কথা তাঁহার নিকটে শুনিতে পাইতাম। যে বার শেষ জেলে-পাড়ার সং হয় সে বার আমরাই দুই জনে মিলিয়া সঙের গানগুলি লিখিয়া-ছিলাম; দাদাশ্বশুর-নাতজামাইয়ের সম্পর্ক ইহা দ্বারা ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল। এই কালে অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র যখন ফল্গু-অবস্থা, তখন তিনি আধুনিক প্রেমের কবিতা পাঠে অপ্রসন্ন হইয়া "শ্রীকবরীরঞ্জন গ্যাংগার্জি" এই বেনামে কয়েকটি অতি সাংঘাতিক ব্যঙ্গকবিতা লিখিয়া আমাকে প্রকাশার্থ দিয়া-ছিলেন। সেগুলি প্রকাশ করিতে পারি নাই, একটি মাত্র আজও আমার

সংগ্রহে আছে, নাম "তুলীনী-দোলন"; সবটা ছাপিবার সাহস নাই, শেষ চারিটি পংক্তি এই—

"মজালে, গজালে বুঝি তাজা ভালবাসা—
কালো-কোলো তুলীনীর এই যাওয়া-আসা।
পোয়েটিক প্রেম লিখি ঢেলে দিয়ে দেল,
হই-হবো হই-হবো ম্যাট্রিক ফেল॥"

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মোহিতলাল আমাকে এক রকম হাতে ধরিয়া ইঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন; আর একটি বিচিত্র মানুষের সহিত তাঁহারই দৌলতে আলাপ হইল—তাঁহার অতিপ্রিয় ছাত্র শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী। প্রথম দর্শনে করুণানিধানের যে ভাবে-ভোলা দিগম্বর মূর্তি দেখিয়াছিলাম, তাহার পর পূরা ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, তিনি এখনও ঠিক তেমনটি আছেন। যে উত্তপ্ত সমাদরে তিনি সেদিন আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া "ভাই সজনী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, আজিও উত্তাপ সমান আছে, সমাদরের এতটুকু ব্যত্যয় হয় নাই। কাব্যই জীবন—ইহা তাঁহার মধ্যে যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও মধ্যে নহে। তিনি অত্যন্ত ঈশ্বরপরায়ণ সাধুসন্ত শ্রেণীর মানুষ, অথচ খাঁটি কবি; ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার কান যেমন এক দিকে নিখুঁত যন্ত্রের মত কাজ করে, তেমনই অন্য দিকে তাঁহার মন ভাব সম্পর্কে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। যেখানে ভাবের স্পর্শ নাই সেখানে কবিতা তাঁহাকে স্পর্শ করে না; শুধু ছন্দের ঝঙ্কার তাঁহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে—এ বিষয়ে তাঁহার বিচার অতিশয় নির্মম ও কঠিন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়কেও ভাল লাগিয়াছিল। প্রথম পরিচয়েই তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম; এইটুকুও বুঝিয়াছিলাম, তিনি হিসাবী ভদ্রলোক। তাঁহার কাব্যবুদ্ধি তাঁহার বিষয়বুদ্ধিকে কখনই পরাভূত করিতে পারে নাই। দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে তাঁহার মান-অভিমান অনেক সময় পীড়াদায়ক বলিয়া ঠেকিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার অনাবিল কাব্য ও সাহিত্য প্রীতি আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার সান্নিধ্যে আমি খুব বেশি আসি নাই; কিন্তু যখনই গিয়াছি, তিনি দুই বাহু প্রসারণ করিয়া আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

যতীন্দ্রমোহনেরই মিতা-সুবাদে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সহিত আমাদের পরিচয়। তাঁহার কাব্যে যেমন একটা বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততা সুপরিস্ফুট, মানুষটির মধ্যেও তেমনই উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি ছিল না, তাঁহার মুখের শান্ত

সংযত মৃদু হাসি তাঁহার উদাসীন নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও আমাদের আকর্ষণ করিত। এই সংসার-মরুভূমিতে তিনি 'মরীচিকা', 'মরুমায়া', ও 'মরুশিখা' দেখাইয়া হয়তো আমাদিগকে নির্ভয় হইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাই, তাঁহার বিজ্ঞান দর্শনের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। যে দুর্জ্ঞেয় শক্তির বিরুদ্ধে 'মরীচিকা'য় "ঘুমের ঘোরে" তাঁহার অভিযান, বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিতে পাইতেছিলাম তিনি শেষ জীবনে ধীরে ধীরে সেই শক্তিরই নিকট ধরা দিয়াছিলেন, অবশ্য তাঁহার সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতির (হাতুড়ে অনুসন্ধান নয়!) দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া বুঝিয়া। এই কয়জন কবির মধ্যে একমাত্র তিনিই 'শনিবারের চিঠি'র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া আমাদের সুখদুঃখনিন্দাপ্রশংসার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৩৬১ বঙ্গাব্দের ৩১এ ভাদ্র তাঁহার মৃত্যুদিবস পর্যন্ত লেখক হিসাবে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই তাঁহার সৌজন্য ও শালীনতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একত্রে এমন ভদ্রতা, সাহিত্যবুদ্ধি, রুচিবোধ ও সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতি রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে আর কোনও বাঙালী সাহিত্যিকের মধ্যে দেখি নাই। তাঁহার মাথা হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত অসাধারণ দৈহিক ও মানসিক কষ্টসহিষ্ণুতার সাক্ষ্য বহন করিত; কিন্তু তাঁহার মুখের প্রসন্ন হাসি ক্ষণেকের তরেও মিলায় নাই। তিনি যে জাপানে কিছুকাল শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার রচিত 'জাপান' ও 'চিত্রবহা'য় যতটুকু আছে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, তাঁহার আতিথেয়তায়, তাঁহার গৃহশ্রীতে, সেখানে ধূপদীপের সুন্দর সন্নিবেশে। তিনি খুব ধীর শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাঁহার উচ্চকণ্ঠ কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি তখন তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'চিত্রবহা' রচনা করিতেছেন, আমরা সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে সমবেত হইয়া একটু একটু করিয়া শুনিতেছি, সঙ্গে আহার্যের যে সামান্য আয়োজন থাকিত পরিবেশন-পারিপাট্যে তাহা পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিত। আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সহিত আমি এখানেই প্রথম পরিচিত হই। দেবীপ্রসাদ অশোক চট্টোপাধ্যায়েরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং আমাদের পরস্পর অন্তরঙ্গ হইতে বিলম্ব হয় নাই। দেবী-প্রসঙ্গ আমার জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া আছে, যথাস্থানে তাহা নিবেদন করিব।

সুরেশচন্দ্রের মৃত্যুর দিনটি আমার মনে পড়ে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—বাতি দুই দিকে জ্বলিয়া দ্রুত নিঃশেষ হওয়ার কথা; দেখিলাম, তিনিও দুই দিকে জ্বলিয়া দ্রুত ফুরাইয়া গেলেন। বর্ধিষ্ণু পিতার সন্তান

তিনি; পিতার সহিত সত্য ও নীতি লইয়া সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, কিন্তু তিনি সত্যচ্যুত হইয়া পিতার আশ্রয়ে বাস করেন নাই—বীরের ন্যায় তাঁহার সত্যকে লইয়াই পৃথক হইয়াছিলেন। অনেক দুঃখ পাইয়াছেন, কিন্তু কখনও অনুশোচনা করেন নাই। চাকুরি করিয়াছেন এবং সামান্য অবসরকালে সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন; বাহিরে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করেন নাই, অন্তরে বাণীর আশীর্বাদ পাইয়াছিলেন কি না তিনিই বলিতে পারেন। আমরা তাঁহার মধ্যে একজন আদর্শনিষ্ঠ সাহিত্যিককে পাইয়া শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে তাঁহাকে অন্তরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। হয়তো ইহাই তাঁহার নীরব সাধনার নীরব পুরস্কার।

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীকে বিচিত্র মানুষ বলিয়াছি। বেঁটেখাটো মানুষটি অথচ বিদ্যার জাহাজ। সাত সমুদ্র তেরো নদীর খবর তাঁহার নখাগ্রে ছিল, ফরাসী-সাহিত্যের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভক্ত এবং সারা পৃথিবীর সামরিক বিদ্যার তিনি ছিলেন মানোয়ারী জাহাজ। তাঁহার ভাল-লাগা এবং মন্দ-লাগা গুরু মোহিতলালের মতই অতি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ছিল; একটু খামখেয়ালি প্রকৃতির ছিলেন, বিপুল সমারোহে কাজ আরম্ভ করিয়া মধ্যপথে থামিয়া যাওয়া তাঁহার একটা বিলাস ছিল; আরম্ভ করিয়া তিনি শেষ করিতেন না, গাছে উঠিয়া নিজেই মই ফেলিয়া দিতেন। তখনই ইউরোপীয় জ্ঞান ও আদর্শকে এত উচ্চে স্থান দিতেন যে, দেশের সব কিছুর প্রতি একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব তাঁহার কথায় বার্তায় প্রকাশ পাইতেছিল। এই ভাবেরই চরম পরিণতি তাঁহার 'অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান'। মনোরথের উত্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে পতনের ফলে অর্থাৎ ফ্রাস্ট্রেশনের দরুন তাঁহার চিত্ত বিযাক্ত হইয়া তাঁহাকে কাজেকর্মেও খর্ব করিয়াছিল, নতুবা তাঁহার মত হিমালয়-প্রতিভা হ্রস্ব বিন্ধ্যগিরি হইয়া কখনই থাকিতেন না; নিশ্চয়ই তাঁহার সাধনার দ্বারা স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বসাহিত্যকে প্রসন্ন করিতেন, আঘাত করিয়া উল্লাস করিতেন না। তিনি পরবর্তী কালে 'শনিবারের চিঠি'র কর্ণধারগণের অন্যতম প্রধান হইয়াছিলেন। তাঁহার সরস বিদ্যাবত্তার ফলে ইহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনই 'শনিবারের চিঠি'র আপন হইতে পারেন নাই।

মাটি পাইলাম, মাটিতে আসন বিছাইয়া সাধনা আরম্ভ করিলাম। অকস্মাৎ যে প্রবাহ রুদ্ধ হইয়াছিল, যে প্রবাহ আমাদেরই দোষে মরুবালুতলে লুকাইয়া গিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহাকে পুনরায় সমতলক্ষেত্রে বহমান

করিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইতেছিলাম। 'প্রবাসী'তে গল্প কবিতা প্রবন্ধ পুস্তক-পরিচয় পঞ্চশস্য লিখিতাম, কিন্তু তাহাতে আমার মন ভরিত না। 'শনিবারের চিঠি'র উপকরণ আমার জীর্ণ শীর্ণ বাজে খাতার পাতায় সঞ্চিত হইতেছিল। দরিদ্রা শবরীর মত আমি ব্যাকুল প্রাণে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

মায়ের কঠিন ব্যাধির খবর পাইয়া 'শনিবারের চিঠি'র চিন্তা-ভাবনা কলিকাতায় ফেলিয়া আমি দ্রুত দিনাজপুরে উপস্থিত হইলাম। উনিশ শ পঁচিশ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস।

ষোড়শ তরঙ্গ

অলৌকিক

রান্না করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া জ্বলন্ত উনানের উপর পড়িয়া মা বিশ্রীভাবে পুড়িয়া গিয়াছিলেন, মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন; বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না। আমি যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন বাবা অস্থিরচিত্তে বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন; দাদারা, বউদিরা ও ছোট ভাই মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন।

মায়ের এই মূর্ছারোগের একটা অলৌকিক ইতিহাস আছে। আমার জীবনে আমি বহু বিচিত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বহু অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিয়া আমাকে আসিতে হইয়াছে; আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা আমাকে একজন বিচিত্র-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ বলিয়া জানেন। আমার সেই সকল অভিজ্ঞতা আমার সাহিত্যিক আত্মস্মৃতির পর্যায়ভুক্ত নহে। তাঁহারা অনেকেই আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করিয়া থাকেন, আমি কখনও অলৌকিক কোনও ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কি না? আমি বিজ্ঞানের ছাত্র; আচারে-ব্যবহারে, ভ্রমণে-পর্যটনে, খাদ্যে-পানীয়ে কালাপাহাড় বলিয়া পরিচিত মহলে আমার অখ্যাতি আছে। তবু আজ অস্বীকার করিতে পারি না অলৌকিক শ্রেণীর দুইটি ঘটনার আমি সাক্ষী হইয়া আছি। দুইটি ঘটনাই আমার মনের উপর এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছে যে, আমার ধর্মবিশ্বাস পর্যন্ত তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সাহিত্যবুদ্ধি ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ঘটনা দুইটির উল্লেখ আমার সাহিত্যজীবনে অবান্তর নহে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ-ইংরেজবাজার শহরের কালীতলা পল্লীতে আমার মেজদাদা নিদারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আমরা পালা করিয়া

তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিলাম। সেদিন সকালে বাবা আমাকে ঘুম হইতে তুলিয়া মেজদার শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া একতলা বাড়ির ছাদে চলিয়া গেলেন। নিদ্রাবিজড়িত চোখে পাখা করিতে করিতে ঠিক মাথার উপরে বাবার ভারি পায়ের শব্দ শুনিতেছিলাম। মেজদা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। হঠাৎ বাবার পায়ের শব্দ থামিয়া গেল। প্রতিবেশী বন্ধু যতীনকাকা প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া মেজদার সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। বাবার দৃঢ়কণ্ঠ কানে আসিল, আজই শেষ হয়ে যাবে। আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। ঘুমজড়ানো চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গেল! সে কি?—বলিতে বলিতে যতীনকাকা বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন, বাবাও ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন। আমি আড়ালে থাকিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিলাম। বাবা যাহা বলিলেন তাহার তাৎপর্য এই : মা তাঁহার পালা শেষ করিয়া পাশের ঘরে একটু গড়াইয়া লইতে গিয়াছেন, বাবা একা পুত্রের শিয়রে বসিয়া রাত্রির শেষ প্রহর জাগিতেছেন। সহসা একটা অস্বাভাবিক লাল আলোতে সমস্ত ঘরটা উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত চমকিত হইয়া কারণ অনুসন্ধানের জন্য ইতস্তত চাহিলেন, কোথাও কিছু নাই। মুমূর্ষু মেজদা হঠাৎ শয্যায় উঠিয়া বসিয়া যেন অভ্যাগত কাহাকেও সম্বর্ধনা করিয়া বলিলেন, এই যে আমি যাচ্ছি।—বলিয়া তিনি আবার বালিসে মাথা রাখিলেন, লাল আলো মিলাইয়া গেল। বাবা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। সর্বশেষে বাবা বলিলেন, দাদার (অর্থাৎ আমার জ্যাঠামহাশয়ের) মৃত্যুশয্যায় বসিয়া ঠিক এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। দাদা সেদিন মৃতা পত্নীকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, আজ অজুর কাছে কে আসিয়াছিল জানি না।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত না হইতেই সত্যই সব শেষ হইল। আমাদের ক্ষুদ্র সুখী সংসারে সেই প্রথম মৃত্যু প্রবেশ করিল। আমার জন্মের পূর্বে আমার এক দিদি নিতান্ত শিশু অবস্থায় বিদায় লইয়াছিলেন, সে বিরহ-বেদনা আমাকে স্পর্শ করে নাই। মেজদার মৃত্যুতে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বাবা খুবই বিচলিত হইলেন। মা কিন্তু ধীর স্থির ছিলেন। মৃত্যুর পরদিন দ্বিপ্রহরের ঠিক পূর্বে বাবা ও ভাইবোন সকলে আমরা মায়ের শয়নঘর অর্থাৎ বড় ঘরের মেঝেতে চৌকিতে বসিয়া মেজদার প্রসঙ্গ আলাপ করিতেছিলাম। মা দুধ গরম করিতে সামনেই রান্নাঘরে ঢুকিয়াছিলেন। হঠাৎ বাবা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মেজদার নাম ধরিয়া ডাকিতেই আমরা সকলেই বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দেখিলাম, মেঝের ঠিক মাঝখানে রক্ষিত একটা খালি চেয়ারে একটা লাল আলোয়ান গায়ে জীর্ণ শীর্ণ মেজদাদা আসিয়া বসিয়াছেন। বাবা চিৎকার করিয়া মাকে

ডাকিলেন, ওগো, কে এসেছে দেখে যাও। মা গরম দুধের বাটি আঁচলে ধরিয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে শোওয়ার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আসিয়া মেজদাকে দেখিয়াই "বাবা আমার" বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুধের বাটি ছিটকাইয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিতে করিতে মেঝেতে গড়াইতে লাগিল। আমার দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। পরক্ষণেই ফিরিয়া দেখি, মেজদা অন্তর্ধান হইয়াছেন। মায়ের মূর্ছার সেই সূত্রপাত। তাহার পর ঘন ঘন মূর্ছা হইতে লাগিল। মা কোথাও স্তব্ধ হইয়া বসিলেই বুঝিতে পারিতাম, বিপদ আসিতেছে। তিনি, কি জানি, সম্ভবত মেজদাকে দেখিতে পাইতেন এবং একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন।

মৃত মেজদাকে আমরা সকলেই দেখিয়াছিলাম। বাবা মেজদার নাম ধরিয়া ডাকাতেই আমরা হিপ্‌নোটাইজ্‌ড হইয়াছিলাম, ঘটনাটিকে কখনই সেই ভাবে উড়াইয়া দিতে পারি নাই। পরে এই বিষয়ে বহু বই পড়িয়াছি, বড় বড় নামকরা পথভ্রষ্ট (?) বৈজ্ঞানিকদের আলোচনাও দেখিয়াছি এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে অনেক তত্ত্ব জানিয়াছি। বিভূতিকে বাহিরে কখনই আমল দিই নাই, ঠাট্টা করিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাসকে উড়াইয়া দিয়াছি ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফল্গুধারার মত মৃত্যুপরপারের এই টুকরা রহস্যটি আমাকে বরাবরই প্রভাবিত করিয়াছে। সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গেই মানুষের আরম্ভ নয়, এবং চিতায় দগ্ধ হইয়াও যে তাহার শেষ নয়—এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়মূল। যাঁহারা এই ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—আমার মেজদাদা, মা, বাবা, বড়দাদা—তাঁহারা প্রত্যেকেই বর্তমান আছেন, আমি যেমন গতজন্মে বর্তমান ছিলাম এবং পরজন্মে থাকিব। এই বিশ্বাস আমার কাব্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে। যথা—

মোদের ভাবনা-ভয় মিছা রে।
মৃত-জীবিতের মাঝে হে বন্ধু, কিসের ব্যবধান,
মৃত্যুরে কে জানিয়াছে, কে পেয়েছে জীবন-সন্ধান ?
মরণ-তীর্থের যাত্রী, মায়ের কোলের শিশু
একাকার নির্মম বিচারে !
মোদের ভাবনা-ভয় মিছা রে।

কে জেনেছে সবখানি আকাশে ?
অনন্ত জীবনে মোর খণ্ড খণ্ড তার পরিচয়,
অসম্পূর্ণ প্রাণ-মৃত্যু কান্না-হাসি সম্ভব-বিলয়,

রহস্যের যবনিকা আজো উঠিল না মোর,
যাহা বুঝি, বুঝি শুধু আভাসে।
কে জেনেছে সবখানি আকাশে?

'রাজহংসে'র উৎসর্গ-পত্রে মাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলাম—

জননী, কঠোর মৃত্যু তোমারে ঢেকেছে অন্ধকারে,
হ'ল সে অনেক দিন—
দেখিতে পাই না দেহ-ক্ষয় করা সেই করুণার ধারা।
ওপার হইতে এপারে আমারে তুমি এনেছিলে মাতা,
হারাইয়া আজ গিয়াছ আমার জ্ঞান-বুদ্ধির পারে;
বুঝিতেও নাহি পারি,
যে পথে চলেছি সেই পথে মোর ক্লান্ত দিনের শেষে
রেখেছ কি পেতে স্নেহ-কোলখানি তব?
বুঝিতে পারি না, তবু আছে আশ্বাস।

জননী, আমার জন্মদিবসে তুমি রচেছিলে সেতু
আমার আঁধারে আলোকে, আমার অতীতে বর্তমানে।
তুমি নাই তাই এত ব্যবধান আলোকে অন্ধকারে,
ব্যবধান-মুখে তড়িৎ-তীব্রজ্বালা।
যেখানেই থাকো জননী, আবার সেতু কর নির্মাণ,
সহজ-ব্যথায় আমারে প্রসব কর তুমি পরপারে।

এবং সেদিন একটি গানে এই কথাটাই স্পষ্টতর করিয়াছি—

জনম-মরণ পা-ফেলা আর পা-তোলা তোর ওরে পথিক,
স্মরণ যদি রাখিস তবে পদে পদে ভুলবি না দিক।
নয়কো শুরু আঁতুড় ঘরে
শেষ নয়কো চিতার 'পরে
আগেও আছে পরেও আছে এই কথাটা বুঝে নে ঠিক।

এই বিশ্বাসের সমর্থন আমি পাশ্চাত্ত্য আধুনিক বিজ্ঞানেও পাইয়াছি; সার্ অলিভার লজ প্রমুখ স্পিরিচুয়ালিস্টদের কথা বলিতেছি না; অ্যালেক্সিস ক্যারেল, জে. বি. রাইন, কেনেথ ওয়াকার, জে. ডব্লিউ. এন. সালিভান প্রমুখ খাঁটি বৈজ্ঞানিকেরা নিছক বিজ্ঞানের পথে মানুষের হদিস না পাইয়া

"আন্‌নোন্" বা অজ্ঞাতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ক্যারেল বলিয়াছেন, মানুষ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে স্বশরীরে প্রিয়-সমাগমে আসিতে পারে, স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তাও বলিতে পারে।* আধুনিক পাশ্চাত্ত্য উচ্চ বিজ্ঞান মানুষের আত্মার রহস্যসন্ধানে পরাজিত হইয়া চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকদের মনে অজ্ঞাতের যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত জাগাইয়া তুলিতেছে, মানুষের আদিমতম ছন্দোবদ্ধ চিন্তাধারায় সেই অজ্ঞাতই আশ্চর্য রকম স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ঋগ্বেদের কথা বলিতেছি। এই বিচিত্র ব্যাপার কি করিয়া সম্ভব হইল, আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা সাধারণ বুদ্ধি তাহা নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সম্ভব যে হইয়াছে তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলে ঋষি বামদেব-রচিত সূক্তে আছে। বামদেব আমাদের ভৌতিক ইহজীবনকে বলিয়াছেন—গর্ভবাস। মৃত্যুতে আমরা যেখানে ভূমিষ্ঠ হই সেখানে আমরা পূর্ণ পরমাত্মাকে অবগত হইব, এই প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করিয়া বামদেব বলিতেছেন,

> "ভাই সকল! তোমরা কি বলিতেছ? দ্যুতিমান স্বর্গে জন্মলাভ করিয়া পরমাত্মাকে অবগত হইবে? আমি বলি যে, তাদৃশ জন্মলাভের পূর্বে এই গর্ভবাসকালেই (মাংসময় দেহে বর্তমান থাকিয়াই) আমি পরমাত্মাকে অবগত হইয়াছি।"*

বামদেবের আত্মকাহিনী বড়ই বিচিত্র। জীবনে অশেষ দুঃখ-নির্যাতন ভোগ করিয়া তিনি একদিন মনে মনে স্থির করিলেন,

> "সকল লোকে যে দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, আমি সে দ্বার দিয়া বাহির হইব না। আমি মাতার উদর বিদীর্ণ করিয়া (অর্থাৎ আত্মহত্যা করিয়া) বাহির হই (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করি)।"

এই কথা মনে উদিত হইবামাত্র তাঁহার অন্তর্যামী ইন্দ্র বলিলেন,

> "ঋষি, তুমি যে দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করিতেছ না, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ বিধাতৃবিহিত জন্মলাভের পথ। যত মনুষ্য স্বর্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবত্বলাভ করিয়াছেন, সকলকেই এই দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হইতে হইয়াছে। এখনও তোমার অবয়ব সকল পূর্ণ হয় নাই, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ধিত হইলে তুমিও এই পথেই ভূমিষ্ঠ হইবে। বিদীর্ণ হইয়া

---

* Alexis Carrel : 'Man, the Unknown'—"Mental Activities" অধ্যায়।

* এই পৃষ্ঠার ও পর-পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিগুলি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের অনুবাদ।

বাহির হইব বলিয়া যে পথের চিন্তা করিতেছ, এই পথের অনুসরণ করিয়া তোমার মাতার (দেহের) পতন সাধন করিও না। উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির করিলে কি সন্তান বাঁচে?"

বামদেবের চৈতন্য হইল। তিনি দুঃখ দারিদ্র্য যন্ত্রণার মধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই দৈহিক মর্ত্যজীবনের কঠোরতার মধ্যে এই পরম সত্য উপলব্ধি করিলেন, যে "যেমন গর্ভযন্ত্রণার মধ্যে শিশুর অবয়ব পুষ্টি হয়, তেমনিই সাংসারিক ক্লেশপুঞ্জের মধ্যে মানুষের আত্মা দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া স্বর্গে জন্মলাভের উপযুক্ত হয়।" এই মহাজ্ঞান লাভ করিয়া ঋষি বামদেব ভবিষ্যতের মানবসমাজের জন্য যে আশ্বাস রাখিয়া গিয়াছেন, চারি সহস্র বৎসরের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া তাহা আজিও আমাদের বরাভয় দান করিতেছে—

> "আমি উদরান্নের অভাবে কুক্কুরের অন্ত্র পাক করিয়া ভক্ষণ করিয়াছি, দেবতার উপাসনা করিয়া ধনলাভ করিতে পারি নাই। প্রাণসমা পত্নীকে জনসমাজে লাঘব প্রাপ্ত হইতে দেখিলাম। (সে যাহা হউক) প্রভু পরমেশ্বর শ্যেন পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে আমাকে মধু আনিয়া দিয়াছেন।"—৪।১৮।১৩

জড়বিজ্ঞানও আজ উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়া জড়ত্বের জটিলতা ত্যাগ করিয়া সেই মধু-সন্ধানী হইতেছে—আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ইহাই সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ সংবাদ।

প্রথম সংসার পত্তনে যে বন্ধু সহসা আবির্ভূত হইয়া নীরবে আমার সঙ্গ লইয়াছিল, আমার জীবনের দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা সেই কিরণচন্দ্র দত্তকে লইয়া। তখন বাঁকুড়া হস্টেলে থাকি, আই. এ., আই. এস-সি.র টেস্ট পরীক্ষা আসন্ন। সকলেই পরীক্ষা-প্রস্তুতির জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি। কিরণ একটু বেশি রকম। সে প্রায় দিবারাত্রি বইয়ে-মুখে বসিয়া থাকে উচ্চৈঃস্বরে লজিক অথবা ইংরেজী পাঠ্য মেকলের 'হিস্ট্রি অব ইংলণ্ড' প্রথম ভাগ আওড়ায়। পাঠে অতি-নিষ্ঠার জন্য সে আমাদের হিংসা ও পরিহাসের বিষয় হইয়া উঠিল। একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঠিক পূর্বে এইভাবে পড়িতে পড়িতে সে হঠাৎ গোঁ-গোঁ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গেল। এক নাগাড়ে সাত দিন মুহূর্তের জন্য তাহার জ্ঞান ফিরিল না। হস্টেলের ডাক্তার, শহরের সেরা ডাক্তার সকলেই পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ও ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন, আমরা কয়েকজন—কিরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিবারাত্র পালা করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলাম। পড়াশুনায় আমার একেবারেই মন ছিল না। আমার ভালই

লাগিল এবং এই সেবাদলের নেতৃত্বভার আমিই গ্রহণ করিলাম। অসুখের গোড়ায় রোগীর কাছে বসিয়া আমরা শুধু "ওয়াচ" বা পর্যবেক্ষণ করিতাম, সম্পূর্ণ অজ্ঞান রোগীকে লইয়া আর কিছু করিবার ছিল না। দ্বিতীয় দিনে অজ্ঞান অবস্থাতেই কিরণের মুখে কথার খই ফুটিতে লাগিল। শুরু হইল মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস লইয়া। বইটির প্রথম লাইন হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে শেষ লাইন পর্যন্ত সে অনর্গল মুখস্থ বলিয়া গেল। বইটি আমারও পাঠ্য, সুতরাং কিরণের কেরামতি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। হলফ করিয়া বলিতে পারি, সজ্ঞানে কিরণ বইটির দশ লাইনও একসঙ্গে মুখস্থ বলিতে পারিত না। ভাবিতে লাগিলাম, এই অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সে কোথায় পাইল! বেশিক্ষণ ভাবিবার সুযোগ মিলিল না। কিরণ আমাদের আরও চমকিত করিয়া তাহার সুবিস্তৃত জীবন-নাট্যের হুবহু পুনরভিনয় করিয়া যাইতে লাগিল। অর্থাৎ সুদূর শৈশব হইতে আধুনিকতম বর্তমান পর্যন্ত এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছে সেগুলিতে তাহার নিজের ভূমিকা সে নিজেই যথাযথ পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল, ভাবভঙ্গি কণ্ঠের উঁচুনীচু পরদা সমেত। অনেকগুলি ঘটনায় আমরাও জড়িত ছিলাম, মনে মনে মিলাইয়া দেখিলাম এক চুল এদিক ওদিক হইতেছে না। কিরণ বাল্য ও শৈশব মেমারিতে তাহার ভগিনীপতির নিকট কাটাইয়াছিল, আমাদের সহপাঠী নিতাই দাঁ সেখানে তাহার সঙ্গী ও সহপাঠী ছিল। মেমারির ঘটনার নিখুঁতত্বে নিতাই সাক্ষ্য দিল। এমন সব গূঢ় গোপনীয় কথাবার্তাও রোগী বলিতে লাগিল যে অন্তরঙ্গ দুই-তিন জন ছাড়া আর কাহাকেও তাহার কাছে রাখা সমীচীন বোধ করিলাম না। কথাবার্তা অবশ্য কেবল তাহার একলার। যেন টেলিফোনের এক দিকের কথাই আমরা শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। যাহা ঘটিয়াছিল অর্থাৎ যে যে শব্দ কিরণ যেভাবে প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিল পুনরাবৃত্তিতে তাহার কোথাও এতটুকু ভুল হইল না। মনে হইল, যেন কেহ কিরণের জীবন-নাট্য রচনা করিয়া তাহার অংশ তাহাকে "পার্টে"র মত লিখিয়া দিয়াছিল, সেই লেখাটি হাতে পাইয়া সে আবার তাহা অভিনয়োপযোগী স্বেদকম্পসহকারে পাঠ করিয়া চলিয়াছে, কমা-সেমিকোলোনেরও কোথাও অদলবদল হইতেছে না। আমাদের জ্ঞাত ঘটনার সহিত মিলাইয়া লইয়া এই উক্তি আমি জোরের সঙ্গে করিতেছি। ব্যাপার দেখিয়া আমরা দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। কিরণের তদানীন্তন অভিভাবক তাহার ভগিনীপতি শিববাবুকে তার করিলাম। কিন্তু রোগীর দায়িত্ব আমাদের হাতেই রহিল।

বাঁকুড়ার কোনও ডাক্তার কূলকিনারা করিতে পারিলেন না। পরম্পরায়

সংবাদ পাওয়া গেল, মেজর বিয়ানি নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ তুর্কী ডাক্তারকে যুদ্ধকালে বাঁকুড়ায় "ইনটার্নড্" রাখা হইয়াছে, তিনি রেললাইনের ওপারে একটি গৃহে নজরবন্দী অবস্থায় আছেন। আমরা একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া তাঁহাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া লইয়া আসিলাম। তিনি আসিয়াই অজ্ঞান রোগীকে আকণ্ঠ গরম জলে চুবাইয়া মাথায় বরফ প্রয়োগ করিতে করিতে জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন। এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, কিরণ তাহার কিছুই জানে না। সে সুখনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াই প্রথম কথা বলিল, আমার বই! তাহাকে বই হাতে দিয়া আশ্বস্ত করিলাম।

কিন্তু অনন্ত জীবনের যে আশ্বাস সে আমাকে দিল, তাহার তুলনা হয় না। তুর্কী ডাক্তারকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তিনি সংক্ষেপে জবাব দিয়াছিলেন, মানুষের মস্তিষ্ক-কোটরে সমস্ত জ্ঞানই সঞ্চিত থাকে, কোটর-দ্বার সকলের পক্ষেই চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়, কাহারও কাহারও পক্ষে যদি পুনরায় খোলে তখনই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটে।

জড়বাদী ডাক্তারের এই জবাবে আমি সন্তুষ্ট হই নাই। ভারতীয় যোগ সম্পর্কে দেশী ও বিলাতী অনেক বই পড়িয়া ঘটনাটির ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ অতীতস্মর হইতে পারে, কিরণ তাহার প্রমাণ। মানুষ চেষ্টা ও সাধনা করিলে শুধু অতীতস্মর নয়, জাতিস্মরও হইতে পারে। জন্মজন্মান্তরে সে কি ছিল, কি করিয়াছে সে তাহা হুবহু স্মরণ করিতে পারে, অনেকে স্মরণ করিয়াছেন। মস্তিষ্কের কোনও কোটরে নয়, কারণ দেহের সঙ্গে সঙ্গে সে কোটরও ধ্বংস হয়, আত্মার সঙ্গেই এই জন্মান্তর-স্মৃতি জড়িত থাকে, যোগবলে বলীয়ান মানুষ অথবা ভাগ্যবান অবতারকল্প পুরুষ সেই স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন। কিরণের ঘটনায় এই "অলৌকিকে"র প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি পাইয়াছি, ইহা জড়বিজ্ঞান বা ডাক্তারী শাস্ত্রের আয়ত্তে নয়।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মা ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিলেন। মায়ের কাছে বসিয়াই "হসন্ত তরফদার" ব্যঙ্গচিত্রটি রচনা করিয়া অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। ইচ্ছা ছিল, আরও কিছুদিন মায়ের কাছে কাটাইয়া কলিকাতা ফিরিব। কিন্তু অক্টোবর মাসের শেষ তারিখে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি পাইলাম। চিঠিটি ইংরেজীতে লেখা, কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বভাব ও স্বাভাবিক ভঙ্গির পরিচয় আছে বলিয়া এখানে পুনর্মুদ্রিত করিলাম—

"15 Rammohan Roy Road
Calcutta 29. 10. 25

My dear Sajani,

I am very sorry to hear about your mother's condition. I shall do the needful. As to your scribbling I have not yet received anything. I shall do what I can "with" [হসন্ত] when I can lay my hands on it. Kalida [Kalidas Nag] has gone to Gidney in Chhota Nagpur to keep company with the wild animals there. When he gets back (about 1. 11. 25) I shall send you all about Karl Spitteler. I am going to be branded on the 23rd Nov. Try to come before that. I have got your Vol. of Kalidas.

Yours affly

Khududa"

এই সময়ে আমি ডক্টর কালিদাস নাগের সাহায্যে রম্যাঁ রলাঁ, কার্ল স্পিট্‌লার প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমিক ও সাহিত্যে নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তদের সম্বন্ধে 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম, রলাঁ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরেজী প্রশস্তিরও (রলাঁর ষষ্টিতম জন্মদিবসে প্রদত্ত) অনুবাদ করিয়াছিলাম, অনুবাদকের নাম দিই নাই। 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমার অনুবাদটিকে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা হিসাবে তাঁহার জীবনীভুক্ত করিয়াছেন। বলাই বাহুল্য, ইহাতে আমি গৌরব বোধ করিয়াছি। ক্ষুদুদার পত্রে মনস্বী কার্ল স্পিট্‌লার সম্পর্কিত উপকরণ আমার নিকট প্রেরণের কথা আছে। আমি ততদিন পর্যন্ত দিনাজপুরে অপেক্ষা করিলাম না, নবেম্বরের গোড়াতেই কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। এবং আসিয়াই "কার্ল স্পিট্‌লার —বিংশ শতাব্দীর এপিক্ প্রতিভা" লিখিয়া ফেলিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অগ্রহায়ণের (১৩৩২) 'প্রবাসী'তে সেই তেরো পাতার সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি বাহির হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই ক্ষুদুদার বিবাহ ; আমাদের 'শনিবারের চিঠি'র দলের সেই প্রথম আনন্দোৎসব। ইতিপূর্বে কালিদাসদার বিবাহে ক্ষুদুদা, হেমন্ত ও আমি দীর্ঘ দীর্ঘ উপহার-কবিতা লিখিয়া কম্পোজ করিয়া লম্বা লম্বা প্রূফের কাগজে তুলিয়া আলপিন আঁটিয়া বিলি করিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন অভিনব বিবাহোপহার আর কুত্রাপি বিলি হয় নাই। ক্ষুদুদা গোড়া

হইতেই সাবধান হইলেন। তিনিই ছাপাখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর, খিড়কি-পথে আমাদের অভিযান সহজেই রোধ করিতে পারিলেন। এই বিবাহে আমি সর্বপ্রথম সামাজিক ব্যাপারে টেবিল-চেয়ার ও খাওয়ার টেবিলে নিউজ-পেপাররোলের ব্যবহার দেখিয়াছিলাম।

শ্বশুরালয়ে অবস্থান আমার স্বাধীনতা সাংঘাতিক ভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। মনমরা হইয়া একদিন দ্বিপ্রহরে বৈঠকখানায় আমারই হস্টেল-মেস-জীবনের দীর্ঘকালের শয্যাসঙ্গী ছারপোকা-শোণিত-লাঞ্ছিত ফাঁসিলায়িত তুলার তোষক-টিকে বালিশ করিয়া চিত হইয়া কড়িকাঠ গনিতেছিলাম, সহসা সদর দরজায় তিন জোড়া পায়ের শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলাম। হল্লা করিতে করিতে কিরণ ও রতন (দিনাজপুরের বন্ধু) প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমার আই. এস-সি.-সহপাঠী বাঁকুড়া হস্টেলের বন্ধু গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়—তাহারা ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে একটি বাসা ঠিক করিয়া এক মাসের ভাড়া আগাম জমা দিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া সেখানে স্থানান্তরিত করিতে আসিয়াছে। শ্বশুর মহাশয় গৃহে ছিলেন না, হাঁ-না কি বলিব ভাবিতেছি, কিরণ আমার সেই বহুমূল্যবান তোষকটিকে কুক্ষিগত করিয়া হুকুম দিল, আয়। আমি কপাল-কুণ্ডলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নবকুমারের মত দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে তাহাদের অনুসরণ করিলাম। সেই দিনই আমার অসার সংসারে সার শ্বশুর-মন্দিরবাস খতম হইল।

সাহিত্যচর্চার দিক দিয়া ভালই হইল সন্দেহ নাই। তিন বোহেমিয়ানে মিলিয়া ১।১ই ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনের মধ্য ব্লকের দ্বিতল ফ্ল্যাটে রীতিমত ল্যাটিন কোয়ার্টার ফাঁদিয়া বসিলাম, গৌরীশঙ্কর ফাউ। রতন পিতৃদত্ত মাসোহারার সাহায্যে এবং কিরণ জমিদারির আয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ওকালতির তকমা লইবে, বাহিরে তাহাই প্রকাশ থাকিল—কিন্তু আসলে তাহারা অল্প মূলধনে কলিকাতা শহরে বৃহৎ ব্যবসায় ফাঁদিবারই মতলব করিয়াছিল। রতন বোম্বাইয়ের সিডেন্‌হাম কলেজ ফেরতা, কিরণের বুদ্ধি সর্ববিষয়েই প্রখর ও চৌকস। আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ততদিনে একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে, আমার কাজ-কারবার সকলই মা-সরস্বতীর এলাকাভুক্ত হইয়াছে। তিন বন্ধুর তিনখানি ঘর, রান্নাঘর স্বতন্ত্র, মাসিক ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা। যে সামান্য আসবাব আমার ছিল তাহাই সকলের আসবাব। দীর্ঘকাল মাটিতে খবরের কাগজ বিছাইয়া শয়ন করিতাম, একটি-মাত্র মগে শৌচক্রিয়া ও রন্ধনক্রিয়া চলিত, তিনখানি ভাঙা সান্‌কি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাতেই আহার করিতাম। এই অবস্থায় গৌরীশঙ্করকে

লইয়া বিব্রত হওয়া স্বাভাবিক। সে বিবাহিত, বাড়িতে ঝগড়া করিয়া ভাগ্যান্বেষণে পথে বাহির হইয়াছে—একটা হেস্তনেস্ত না করিয়া ফিরিবে না। আমাদের আড্ডাটাই তখন পথ অথবা পান্থশালা। গৌরীকে রান্নাঘর আশ্রয় করিতে হইল। সে পাড়াগাঁয়ের ব্রাহ্মণসন্তান, আমাদের হেঁসেলের ভার সম্পূর্ণ তাহার উপর বর্তাইল। সে লেখাপড়ায় ভাল ছেলে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় জিলা-স্কলারসিপ পাইয়াছিল, আই. এস-সি.তেও ফার্স্ট ডিভিশনে উপরের দিকে নাম ছিল; কিন্তু সহায়সম্পদহীন অবস্থায় আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আমরা শুধু তাহারই আশ্রয় নয়, পরে আরও কয়েকজন ভাগ্যান্বেষীর অবলম্বন হইয়াছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত রীতিমত একটা "এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো" খুলিয়া বসিয়াছিলাম। বেকার গৌরীশঙ্করকে ক্রমশ আরামপ্রিয় হইয়া যাইতে দেখিয়া সেই বৎসরেই বড়দিনের দিন আমরা এই বলিয়া বাড়ি হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলাম, একটা যাহা হউক কিছু চাকরি না জুটাইয়া সে ফিরিতে পারিবে না। সে প্রথমে হগ্ সাহেবের বাজারে কুলিগিরির চেষ্টায় লাইসেন্স অভাবে বিফলমনোরথ হইয়া খিদিরপুর অঞ্চলে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা-নির্মাণক্ষেত্রে ইট বহিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে চায়; সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ স্টোর্সের বাড়ি, একজন খাস বিলাতী সাহেব তদারক করিতেছিলেন। আসল গৌরীশঙ্করকে চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই, তিনি সেই দিনই তাঁহার সহকারী হিসাবরক্ষকরূপে তাহাকে বহাল করিয়াছিলেন। গৌরী যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া আজ উক্ত প্রতিষ্ঠানের বড়বাবুর পদ অলঙ্কৃত করিতেছে। গৌরীর গৌরব আমাদের হিসাবে সর্বপ্রথম জমা, পরে আরও অনেক আছে। বর্তমান কালেও বেকার থাকিতে থাকিতে যাঁহাদের আশাভঙ্গ হইয়াছে, তাঁহারা গৌরীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইতে পারিবেন।

ডিসেম্বর মাসে নূতন সংসার পাতিয়াছিলাম। ওই মাসেই কানপুরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশন, সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী। রামানন্দ-বাবু মাঘ মাসের 'প্রবাসী'র জন্য সরোজিনী নাইডুর জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিবার আদেশ দিলেন। আমি অনন্য-চিন্ত হইয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটি জীবনী রচনা করিলাম, তাঁহার কয়েকটি কবিতারও কবিতায় অনুবাদ দিলাম। নূতন বাড়িতে ইহাই আমার প্রথম সাহিত্যকীর্তি। পরে স্বয়ং সরোজিনী দেবীকে সেই প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইতে হইয়াছিল। তিনি কবিতা-অনুবাদের বিশেষ তারিফ করিয়া

স্বহস্তলিখিত একটি ইংরেজী কবিতা উপহার দিয়া আমাকে পুরস্কৃত করেন। আমার সাহিত্যিক-জীবনে ইহা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

নূতন এজমালি বাড়ি আমাকে যেমন নানা ভাবে অসুবিধায় ফেলিয়াছিল, তেমনই ব্যাপক অবিচ্ছিন্ন আড্ডার মধ্যে 'শনিবারের চিঠি'-পুনঃপ্রবর্তনের উৎসাহ ও উপকরণ এখানেই সংগৃহীত হইতেছিল। এই আড্ডায় জীবনদা ও ক্ষুদুদা প্রায়ই আসিতেন, আমাদের অগৃহস্থসুলভ হল্লা সংলগ্ন গৃহস্থ বাড়িগুলির ঈর্ষা ও বিরক্তিরও কারণ হইতেছিল। কিরণ তখনও অবিবাহিত; একদিন কিরণ ও আমি বাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের কন্যাকে দেখিয়া আসিলাম। কথাবার্তা পাকা হইতেই আমরা ঘটা করিয়া কিরণকে আইবুড়ো-ভাত দিলাম—আমরা অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র দল; আহারের পরিমাণ যাহাই হউক, উল্লাসের পরিমাণ এত বেশি হইল যে আমাদের ঠিক নিম্নতলস্থ মাদ্রাজী পরিবারের কর্তা থানায় ডায়েরি পর্যন্ত করিয়া আসিলেন; ক্ষুদুদা কেম্‌ব্রিজী আদিরসাত্মক গল্পে আসর মাত করিয়া রাখিলেন, সঙ্গে জীবনদার অনুপ্রাস। তখন আরও তিনজন বেকার আমাদের আশ্রয়ভুক্ত—বাঁকুড়া হস্টেলের ও পরে অগিল্‌ভি হস্টেলের দাদা ও বন্ধু গিরিধর চক্রবর্তী, বাঁকুড়া হস্টেলে দাদার সহপাঠী শৈলেশ্বর সিংহ রায় ও অগিল্‌ভি হস্টেলে আমার রুম-প্রতিবেশী ও সহপাঠী বিমলাকান্ত সরকার। গিরিধর চক্রবর্তী ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস এম. এ., তিনি বাংলা দেশে ও বাংলার বাহিরের কলেজগুলিতে দরখাস্তের উপর দরখাস্ত করিতে লাগিলেন, শৈলেশ্বরদা ও বিমলাকান্ত সরকারী চাকুরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। আজ গিরিধরদা বিহারের বেগুসরাই কলেজের প্রিন্সিপাল, শৈলেশ্বরদা সাব ডেপুটি কালেক্টর হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন এবং বিমলাকান্ত সাব ডেপুটিগিরি ত্যাগ করিয়া অর্থনীতির নামকরা লেখক। ইঁহারাও আজ আমাদের সেই পুরাতন বেকার-অ্যাসাইলামের গৌরব।

গুরুতর অসুবিধা আপিস-যাতায়াত লইয়া। তখনও সারকুলার রোডে ট্রাম হয় নাই, ট্রাম কোম্পানির বাসও খুব আরামপ্রদ ছিল না। প্রায় হাঁটিয়া কয়েকটি ভীতিসঙ্কুল ঘাঁটি পার হইয়া আসিতে হইত। এই অবস্থায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল ঠিক গুড ফ্রাইডের দিন কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পৈশাচিক তাণ্ডব শুরু হইল; ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট হইতে যে ভয়াবহ "ক্যালকাটা কিলিং" আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা তাহারই বর্ণপরিচয়। আমি প্রথম দিকেই দুর্ভাগ্যক্রমে এই পৈশাচিক তাণ্ডবের ঠিক মাঝখানে নিক্ষিপ্ত

হইয়াছিলাম। সে কাহিনী বিস্তারিত ভাবে লিখিবার যোগ্য, কারণ 'শনিবারের চিঠি'র পুনর্জাগরণ এই দাঙ্গার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লইয়া উল্লেখযোগ্য সাহিত্যও রচনা করিয়াছিল একমাত্র 'শনিবারের চিঠি'। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'শনিবারের চিঠি'র পুনর্জীবনের প্রধান উদ্যোক্তা হইয়াছিলেন।

সপ্তদশ তরঙ্গ

পুনর্জীবন

বর্ধমান-রাজের এলাকায় কিরণের কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল। সেকালে ইংরেজ-রাজত্বে সূর্যাস্ত হইত না, কিন্তু বর্ধমান-মহারাজের রাজত্বে খাজনা দাখিলের দিন সূর্যাস্ত হইলে অপারগ হতভাগ্য পত্তনিদারের জমি লাটে উঠিত। সামনে চোত্‌-কিস্তি। কিরণের হাজার পাঁচ-ছয় টাকা খাজনা চৈত্রের শেষ তারিখে জমা দিবার কথা; কোনও রকমে বত্রিশ শো টাকা জোগাড় হইয়াছিল। ১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল ১৯২৬) গুড ফ্রাইডের দিন ওই টাকা লইয়া কিরণ দেশে যাইতেছিল, গুণ্ডা-পকেটমারের আক্রমণ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আমি তাহার সঙ্গে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যাইতেছিলাম হ্যারিসন রোডের ট্রামে। সময় বৈকাল। কলেজ স্ট্রীট জংশনে ওয়াই. এম. সি. এ.র কাছাকাছি একটা হট্টগোল শুনিলাম; দোকানপাট সশব্দে বন্ধ হইতেছে। হাওড়ার দিক হইতে একখানা ট্রাম আসিতে দেখা গেল, জানালার খড়খড়ি বন্ধ কিন্তু সর্বাঙ্গে ইষ্টকাঘাতের চিহ্ন। সর্বত্র একটা ত্রাস ও আতঙ্কের ভাব। আমাদের ট্রাম হইতে অনেক যাত্রী নিঃশব্দে নামিয়া গেল, জানালার খড়খড়িও তুলিয়া দেওয়া হইল। ট্রাম-চালক ইতস্তত করিতেছিল, মোড়ের পুলিস তাহাকে আশ্বাস দিয়া অগ্রসর হইতে বলিল, চাহিয়া দেখিলাম—আমরা সাকুল্যে চারজন প্যাসেঞ্জার। একটু আগাইয়া তদানীন্তন হ্যালিডে স্ট্রীট অধুনা সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের জংশনে পৌঁছিয়াই স্থানীয় পরিবেশদৃষ্টে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সুবিখ্যাত দীনু মিঞার মসজিদের সম্মুখে রক্তারক্তি কাণ্ড,—আস্ত, ভাঙা ও গুঁড়া ইষ্টকখণ্ডে চারিদিক আকীর্ণ। মাথাফাটা, নাকভাঙা লোকেদের রিকশাযোগে অথবা হাঁটাইয়া হাসপাতালে কিংবা ডাক্তারখানায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। পূর্বদিকে পেল্লায় পেল্লায় জোয়ান মুসলমান, পশ্চিমে ততোধিক ষণ্ডা ভোজপুরীর দল, আহত অবস্থাতেও

খাঁচায় বদ্ধ সদ্য-ধৃত ব্যাঘ্রের মত ফুলিয়া ফুলিয়া গর্জন করিতেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপর্ব তখন শেষ, স্ত্রীপর্বে ক্রন্দন-আস্ফালন চলিতেছে। পানের দোকান ছাড়া সমস্ত বাড়িঘর রুদ্ধদ্বার, একটা ভয়াবহ থমথমে ভাব আসন্ন নব সংঘর্ষের সূচনা করিতেছে। ব্যাপার কি? এ পারের কুহু এবং ও পারের কেকাধ্বনি শ্রবণে বেপথু অন্তরে এইটুকু মাত্র বোধ জন্মিল যে, দীনু মিঞার পবিত্র মসজিদে ধার্মিক মুসলমানেরা একান্তে আল্লাভজনা করিতেছিলেন, বাদ্যভাণ্ডসহকারে একটি বিধর্মীদের শোভাযাত্রা তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করাতে নিমেষমধ্যে ধর্মস্থান আল্লার নামে কেল্লায় রূপান্তরিত হইয়াছে এবং অবিশ্রান্ত ইষ্টক-বোমায় শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিয়া ধার্মিকেরা খোদার মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিধর্মীদের প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি ও প্রতিরোধশক্তি পথে ঘাটে অনর্থের সৃষ্টি করিতে ছাড়ে নাই। ট্রাম অগ্রসর হইয়া অনাবিল বিধর্মী এলাকায় প্রবেশ করিলে আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম; কিন্তু মনে মনে ভয় রহিয়া গেল যে মামলা এখানেই থামিবে না। পোল পার হইয়া স্টেশনে পৌঁছিতেই কিরণ বলিল, দুর্ভাগ্য আমার নিত্যসঙ্গী, পথে কি হইবে বলা যায় না। টাকাগুলা তোর কাছেই থাক্‌, বাকি টাকা যোগাড় করিয়া আসিয়া আমি এখানকার কাছারিতেই জমা দিব।

কিরণ তো "গুডবাই" করিয়া চলিয়া গেল। আমি সেই পবিত্র গুড ফ্রাইডের দিন ট্যাঁকে দুই শতাধিক তিন হাজার টাকা লইয়া ওয়ালফোর্ড কোম্পানির বিপুলকায় বাসে চাপিয়া স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরিয়া এসপ্ল্যানেডে উপস্থিত হইলাম। সেখানে তখন সাংঘাতিক অবস্থা! চিৎপুর লাইনের একখানা সম্পূর্ণ খালি ট্রাম একজন হিন্দু ড্রাইভার কাঁপিতে কাঁপিতে লইয়া আসিয়াছে, কন্‌ডাক্টারকে মারিয়া দুমড়াইয়া একটি বেঞ্চের তলায় গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি উপস্থিত হইয়াই দেখিলাম, ফালতু ভিড় অকারণ জটল্লা করিতেছে, কেহ বলিতেছে—লোকটা বাঁচিয়া আছে, কেহ বলিতেছে—মরিয়াছে। সম্মুখেই কার-মহলানবীশের দোকান, আমি ছুটিয়া গিয়া বুলা মহলানবীশকে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করিতে বলিলাম। অ্যাম্বুলেন্স আসিয়া মুমূর্ষু লোকটাকে হাসপাতালে লইয়া গেল। তাহার পর আর ট্রাম আসিতে দেখা গেল না, কিন্তু রক্তাক্তকলেবর কয়েকজন লোককে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে দেখিলাম। বুঝিলাম, নাখোদা মসজিদ অঞ্চলে হাঙ্গামা থামে নাই। ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ মনে কি করি, কোথায় যাই ভাবিতে ভাবিতে ম্যাডান থিয়েটার অ্যাণ্ড প্যালেস অব ভ্যারাইটিজে সন্ধ্যার শোয়ে যীশুখ্রীষ্টের জীবনী দেখিতে ঢুকিলাম; প্রেম ও শান্তির দূতের জীবনালেখ্য দেখিয়া উদ্বেগ ও অশান্তির

মধ্যে যদি শান্তি পাই! ইন্‌টারভাল হইয়া গেল, ছবিও প্রায় সমাপ্তির দিকে, অকস্মাৎ বাহিরে অতি নিকটেই "মার্-মার্ কাট্-কাট্ আল্লাহো আকবর" রব উঠিল। বিধর্মীরা সেদিন পর্যন্ত "বন্দে মাতরম্" বা অন্য কোনও নির্দিষ্ট আওয়াজকে অবলম্বন করিতে পারে নাই। কয়েকটা ঢিলজাতীয় পদার্থ প্যালেস অব ভ্যারাইটিজের টিনের চালে বজ্রপাতের মহড়া দিল, ছবিহীন অন্ধকারে দর্শকেরা সকলেই সভয়ে ও শশব্যস্তে পায়ের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিরুপায়ভাবে "আলো আলো" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। আমার সঙ্গে অনেক টাকা, আমি ভয়ে আধমরা হইয়া গেলাম। হল্লা বেশিদূর অগ্রসর হইল না। ছবি শেষ হইল। আমিও এ-গলি ও-গলি করিয়া কোনক্রমে গা বাঁচাইয়া ইয়োরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনের বাসায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম।

পরদিন প্রাতে সংবাদপত্র খুলিয়া চক্ষুস্থির! বুঝিতে পারিলাম, আগুন নিভে নাই, সারা রাত্রি ধিকিধিকি করিয়া কলিকাতা শহর জুড়িয়া জ্বলিয়াছে, হতাহতের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। দীনু মিঞার মসজিদ যে অঞ্চলে অবস্থিত তাহাকে গ্যাঁড়াতলা বলে, আমরা নাম দিলাম—ব্যাট্‌ল অব গ্যাঁড়াতলা। তিন দিন চলিয়া ব্যাট্‌ল থামিল; কিন্তু তখন কে জানিত ইহা ব্যাট্‌ল নয়—ওয়ার, এবং দীর্ঘ বিশ বৎসর চলিয়া ভারত-বিভাগে ইহার পরিসমাপ্তি! দুই দিন যাইতে না যাইতে সেকেণ্ড ব্যাট্‌ল অব গ্যাঁড়াতলাও লাগিয়া গেল। এই কালেই বিখ্যাত 'ছোলতানে'র জন্ম হইল।

পথ-ঘাট নির্জন, ট্রাম-বাসও কচিৎ চলে। এই অবস্থায় আমাকে প্রত্যহ ইয়োরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন হইতে সারকুলার রোড ধরিয়া মেছুয়াবাজার স্ট্রীট পার হইয়া ৯১ নং আপার সারকুলার রোডে 'প্রবাসী' আপিসে যাইতে হইত। অধিকাংশ দিনই ট্রাম-বাস মিলিত না, পদব্রজে যাইতাম। একদিন মেছুয়াবাজারে চৌরাস্তার ঠিক দক্ষিণে অতর্কিতভাবে একটা নিদারুণ হাল্লার মাঝখানে পড়িয়া গেলাম। সম্মুখেই "শান্তি-কুটীরে" মোটর-বাসের কারবারী সোভান সাহেব থাকিতেন। তিনি বারান্দা হইতে দেখিয়া আমার বিপদ বুঝিতে পারিলেন এবং ছুটিয়া আসিয়া আমাকে টানিয়া নিজের কম্পাউণ্ডের ভিতর লইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না, সেই দিন পরিচয় হইল। তাঁহাকে আমি এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। মানবীয় সহৃদয়তার বশে তিনি সেদিন আমাকে রক্ষা না করিলে এই আত্মকাহিনী লিখিবার অবকাশ আমার মিলিত না। সেদিন পর্যন্ত আমি কোমরে জামার তলায় একটি পিস্তলাকার ভারী লৌহদণ্ড লইয়া চলাফেরা করিতাম।

তখনও তাহা কোমরেই ছিল, অধিকন্তু ছিল কাছায় বাঁধা কিরণের বত্রিশ শো টাকা। সোভান সাহেবের ব্যবহারে সাধারণ ভাবে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিল, লৌহদণ্ডটি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া কয়লা-ভাণ্ডার কাজে লাগাইলাম। টাকাটাও সেদিন অশোক চট্টোপাধ্যায়ের জিম্মায় রাখিয়া দিলাম।

আপিস যাতায়াতের পথে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইতেছিল তাহা হইতেই এই দাঙ্গা সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য মন উন্মুখ হইয়াছিল। কয়েকটি প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা লিখিয়াও ফেলিলাম। সেগুলি প্রকাশ করিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। 'প্রবাসী'তে কাজ করি, কিন্তু 'প্রবাসী' সে সব ছাপিবে না। একমাত্র অবলম্বন আমাদের নিজস্ব 'শনিবারের চিঠি' তখন মৃত। তাহাকে পুনর্জীবন দান করা ছাড়া গত্যন্তর দেখিলাম না। তাহারই আয়োজন করিতেছি, শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদিন আমাকে ডাকিলেন, প্রশ্ন করিলেন, 'শনিবারের চিঠি'র পুনঃপ্রকাশের কোনও মতলব আমাদের আছে কি না! মনে হইল, তিনি সর্বজ্ঞ, আমাদের মনের কথা টের পাইয়াছেন। হাতে স্বর্গ পাইলাম। বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ, একটা দাঙ্গা-সংখ্যা বাহির করিব মনে করিতেছি। তিনি বলিলেন, মারামারি সম্বন্ধে লেখা দিও, কিন্তু সংখ্যাটির নাম দিও—জুবিলী-সংখ্যা। আমি কিছু লেখা দিব।

জুবিলী-সংখ্যা নামের মানে তখন বুঝি নাই, তবু খোদ কর্তার সমর্থন, উৎসাহভরে লাগিয়া গেলাম। দুই দিন পরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা দুইটি বেনামী রচনা আমার হাতে আসিল। আবরণী-চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন, "সজনীকান্ত, অসুস্থ শরীরে এইগুলি লিখিলাম। তোমাদের চলে কি না ভাল করিয়া দেখিয়া তবে ছাপিতে দিবে।" সোল্লাসে ছাপিতে দিলাম। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' বন্ধ হওয়ার ঠিক পনের মাস ছয় দিন পরে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পুনর্জীবিত অসাময়িক 'শনিবারের চিঠি'র "জুবিলী-সংখ্যা" মহাসমারোহে বাহির হইল। ১৯২৬ সনের দাঙ্গার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার কারণ এই যে, ইহাই মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করিয়াছিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনার প্রথমটি দাঙ্গা-সংক্রান্ত; সার্ আবদার রহিম সাহেব তখন ইংরেজের মসনদে প্রধান অমাত্য। তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিলেন, "পীর তাঁবেদার হালিম ছাহেবের কোকিল-ধ্বংস-ফতোয়া"। এই রচনা কখনই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে না; কিন্তু সংযত সরস ব্যঙ্গাত্মক রচনার নমুনা হিসাবে লেখাটি সর্বসাধারণের দরবারে আর একবার দাখিল করা উচিত বিবেচনায় এখানে খানিকটা পুনর্মুদ্রিত করিলাম—

"আরবদেশে মেদিনা নামে একটি শহর আছে। নগরকে ফারসীতে শহর ও সংস্কৃতে পুর বলে। এই জন্ত কাফেররা মেদিনা শহরকে বাংলা দেশের মেদিনীপুর মনে করে। পীর তাঁবেদার হালিম ছাহেবের জন্ম হয় বাস্তবিক আরবদেশের মেদিনা শহরে, কিন্তু কাফেররা ভুল করিয়া বলে তিনি পয়দা হন মেদিনীপুরে। আরবদেশে জন্ম বলিয়া তিনি আকছার আরবী জবানেই গুফ্‌ত্‌গু করেন, কিন্তু কাফেররা বুঝিতে না পারিলে বাংলা লব্‌জ্‌ও ইস্ত্‌মাল করেন।

তাঁহার বাড়ীর নিকট একটি মস্‌জিদ আছে। তাহার মোল্লা ছাহেব একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জনাব, মস্‌জিদের ছাম্‌নে কেহ গাওনা বাজনা গোলমাল আওয়াজ করিলে কি করিব?' পীর হালিম বলিলেন, 'তাড়াইয়া দিও।' মোল্লা ছাহেব ফের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ট্রাম গাড়ী, মোটর গাড়ী, মোটর ভেঁপুর আওয়াজ হইলে কি করিব?' পীর তাঁবেদার মনের কথা গোপন রাখিয়া বলিলেন, 'ওগুলার জান্‌ নাই, উহারা জানোয়ার নহে। উহাদের আওয়াজ মস্‌জিদে শুনা গেলে গুনাহ্‌ হয় না, যাহাকে কাফেররা পাপ বলে।'

মোল্লা ছাহেব ফের পুছিলেন, 'মানুষের ত জান্‌ আছে। মানুষে মস্‌জিদের ছামনে গোলমাল করিলে মারধর করিয়া তাড়াইব কি?' পীর ছাহেব আবার আসল কারণ ছিপাইয়া বলিলেন, 'মানুষের জান্‌ আছে বটে, কিন্তু মানুষ জানোয়ার নহে। জানোয়ারে আওয়াজ করিলে যে মন করিয়া হউক তাড়াইয়া দিও।'

তাহার পরদিন মোল্লা ছাহেব ফের হাজির হইয়া বলিলেন, 'মস্‌জিদের ছাম্‌নে কাকগুলা বড় আওয়াজ করে, ছাম্‌নের বাগানে কোকিলগুলাও কুহু কুহু করে। কি করিব?'

তাঁবেদার হালিম ছাহেব কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, 'কাক ও কোকিল কাফের কি না তাহা আগে ঠিক কর। তাহারা কোন্‌ জবানে কথা বলে?' মোল্লা ছাহেব পণ্ডিত দীনদয়াল শর্মা হইতে মৌলানা শৌকত আলী পর্যন্ত সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কাক-কোকিলের ভাষার কোন সন্ধান পাইলেন না। তাহ হালিম ছাহেবকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন উপায় কি?' পীর ছাহেব বলিলেন, 'কাক ও কোকিল আমাদের খানা খায় কি?' মোল্লা ছাহেব বলিলেন, 'কাককে আমাদের গোস্তের হাড় ও টুক্‌রা ঠোকরাইতে দেখিয়াছি বটে, কোকিলকে দেখি নাই।' তখন পীর ছাহেব আঁধারে আলোক পাইয়া খুসী হইয়া বলিলেন,

'কাক কাফের নহে, কোকিল কাফের, কোকিল কুহু কুহু করিলেই মারিবে, কাককে কিছু বলিও না।' মোল্লা ছাহেব বলিলেন, 'কোকিলকে ত প্রায় দেখাই যায় না, আওয়াজই শোনা যায়। মারিব কেমন করিয়া?' পীর তাঁবেদার হালিমের তখন হঠাৎ মনে পড়িল কলেজে পড়িয়াছিলেন ইংরেজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন :

'O Cuckoo! Shall I call thee Bird
Or but a wandering Voice...'

তিনি বলিলেন, 'কোকিল দেখিতে নাই বা পাইলে? ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, কোকিল চিড়িয়া নহে, সেরেফ একটা মুসাফির-আওয়াজ মাত্র। যেদিক হইতে কুহু কুহু ডাক শোনা যাইবে সেই দিকে আল্লার নাম করিয়া ঢিল ছুঁড়িবে এবং তাহার পর গিয়া দেখিবে কোন জানোয়ার মরিল কি না।...'"

রামানন্দবাবুর দ্বিতীয় লেখাটির শিরোনামা "'শনিবারের চিঠি'র জুবিলী সংখ্যা"। আরম্ভটি এই—

"উনপঞ্চাশ বৎসর পরে 'শনিবারের চিঠি'র পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবে। সেইজন্য আমরা উহার এই জুবিলী সংখ্যা প্রকাশ করিতেছি।"

এই নামকরণের আসল রহস্যটি একটু পরেই আছে এই শিরোনামায় : "প্রবাসী-সম্পাদকের মাসতুতো দিদিমা"—

"সর্বসাধারণের বোধ হয় জানা নাই যে, 'ভারতী'র সম্পাদিকা পণ্ডিতানী সরলা দেবী চৌধুরাণী 'প্রবাসী'-সম্পাদকের মাসতুতো দিদিমা হন। সেইজন্যই তিনি 'ভারতী'র ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় উক্ত সম্পাদককে শুধু 'রামানন্দ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ষীয়সীদের দুটি সদ্‌গুণ আছে। এক নম্বর, তাঁহারা নিজেদের বয়স বাড়াইয়া বলেন, এই জন্য 'ভারতী'র পুনঃ পুনঃ পুনর্জন্মের মোট সময় যোগ করিলেও যদিচ উনপঞ্চাশ বৎসর হয়, তথাপি পঞ্চাশ পূর্ণ হইলে যে জুবিলী লোকে করে, তাহা 'ভারতী'র সম্পাদিকা প্রাপ্তে তু উনপঞ্চাশ বর্ষেই করিয়াছেন, এবং তাহাও উনপঞ্চাশের মধ্যে অনেক মাস বাদ পড়া সত্ত্বেও। বস্তুতঃ উনপঞ্চাশ সংখ্যাটার নানা সুপ্রভাব আছে।

দু নম্বর, বর্ষীয়সীরা নাতি-প্রনাতিদের বয়স কমাইয়া বলেন। যথা, 'ভারতী'র সম্পাদিকা দেবী-চৌধুরাণী মহোদয়া কেবল যে তাঁহার মাসতুতো নাতি 'প্রবাসী'-সম্পাদককে বালকের প্রাপ্য ডাকনাম দ্বারা,

অভিহিত করিয়াছেন তাহা নহে, প্রনাতি 'প্রবাসী'র বয়স পূরা পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা অল্প বেশী হইলেও তাহা চব্বিশ বৎসর বলিয়াছেন।"

কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ইহা তাহার একটি সদৃষ্টান্ত। যাহা হউক, উহার ফলে 'শনিবারের চিঠি' অসাময়িক ভাবে হইলেও পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল। শুধু তাই নয়, এই বিচ্ছিন্ন সংখ্যাটিতেই বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার প্রথম সাহিত্যিক রূপ দিল 'শনিবারের চিঠি'। এই সকল রচনার অনেকগুলি কালের প্রবাহে হারাইয়া গেলেও ইহাদের কাজ নিঃশেষে ফুরাইয়া যায় নাই। "মুসলমান" নামক আমার একটি পুস্তকাকারে অপুনর্মুদ্রিত দীর্ঘ কবিতা হইতে দুইটি স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি—

…মসজেদে নামাজ পাঠে ভেবেছ তুষিবে ভগবান
হৃতগর্ব নত মুসলমান?
প্রীতি নাই, প্রেম নাই, ধর্ম শুধু নররক্তপাতে?
যে বলে বলুক মোল্লা আল্লা তব খুশি নন তাতে।
মোল্লার রচিত শাস্ত্রে আপন বুদ্ধিরে বলি দিয়া
ধর্মেরে জবাই করা—নররক্তে প্লাবিয়া দুনিয়া
আল্লা নাম নিয়া—
এই শিক্ষা দিতে নবী অবতীর্ণ হলেন ভূতলে,
শাস্ত্র এই বলে?

পরধর্ম হিংসা করি নিজধর্ম ক'রো না সন্ধান,
পর-অসহিষ্ণু মুসলমান!
দেখ বিশ্ব ছুটিয়াছে জ্ঞানের বর্তিকা উচ্চে ধরি,
ধর্মভানে অতীতেরে কেহ নাই একান্ত আঁকড়ি;
যে দেশে জন্মেছ সেই দেশের কল্যাণে মুক্তি তব,
যে ভাষা মায়ের ভাষা আনিবে তা জ্ঞান নব নব
অতুল বৈভব।
যে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে ফিরো না তাহারে স্কন্ধে টানি
প্রীতি-সূত্র মানি।…

দাঙ্গা বা জুবিলী সংখ্যা কলিকাতার সদ্য-লাঞ্ছিত মধ্যবিত্ত সমাজে বিশেষ আগ্রহের সহিত গৃহীত হইল, এই প্রথম কিঞ্চিৎ অর্থাগমও হইল। সুতরাং এক মাসের মধ্যেই পরবর্তী আষাঢ় (১৩৩৩) মাসেই আর একটি বিশেষ সংখ্যা—"বিরহ সংখ্যা" বাহির করিয়া ফেলিলাম। অতি-আধুনিক সাহিত্যের

ন্যাকামি ও সম্পর্ক-বিরুদ্ধ যৌন আবেদনের বিরুদ্ধে আমাদের সেই প্রথম সর্বোদয়-অভিযান, শুধু আমাদের নয়—প্রকাশ্যে সেই সর্বপ্রথম অভিযান। ইহারও ছয় মাস পরে পৌষ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীঅমল হোম "অতি-আধুনিক কথাসাহিত্য" নামক নিবন্ধ পাঠ করেন।

'কল্লোল' তখনও উদগ্র হইয়া উঠে নাই, ১৩৩২ সালের শেষ পর্যন্ত তাহার কলধ্বনিই কানে বাজিতেছিল। তখন বাংলা-সাহিত্যে ক্রিমিনলজি-সাইকলজির নামে বিবিধ নূতনত্বের সম্পাদন করিয়া আসর মাত করিয়া রাখিয়াছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; সেনগুপ্ত মহাশয়ই প্রধান। নূতন বৎসরের গোড়া হইতে জল-'কল্লোল' হঠাৎ যৌন-কল্লোল হইবার সাধনায় মাতিল। আমি "Orion বা কাল-পুরুষ" নামক একটি দীর্ঘ নীহারিকা-নাটক রচনা করিয়া বিরহ-সংখ্যায় শ্রীকেবলরাম গাজনদারের বেনামীতে প্রকাশ করিলাম। "অবতরণিকা"য় লিখিলাম—

> …আমরা নূতন যুগের প্রবর্তন করিতে চাই। পুরাতনের দিন চলিয়া গিয়াছে, ক্রিমিনলজি ও সাইকো-এনালিসিসের শুষ্ক পাতায় যৌন সম্বন্ধীয় আধুনিক থিওরিগুলি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমরা সরস নাটকে তাহাদিগকে সজীব ভাবে জগতের সম্মুখে ধরিতে চাই।…শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় ও ঢাকা-প্রবাসের পর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের গুরু এবং কলিকাতার 'কল্লোল'-সম্প্রদায় আমাদের পৃষ্ঠপোষক। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'শুভা', 'শাস্তি', 'পাপের ছাপ', 'ব্যবধান', 'দত্তগৃহিণী' প্রভৃতি পুস্তক ও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'নষ্টচন্দ্র', 'হাইফেন' ও কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত ফোটো-চিত্র-সম্বলিত 'রূপের ফাঁদ' প্রভৃতি পুস্তকগুলির ভিতর দিয়া আমাদের সূক্ষ্ম প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছে এবং 'কল্লোলে'র নব নব রূপ আমাদিগকে নব নব ভাবের আহার্য যোগাইতেছে। ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে পাপ হইবে।
>
> মানব যন্ত্রবিশেষ মাত্র নহে; দম দিয়া তৈলরূপ আহার্য জোগাইয়া দিলেই কল নির্বিবাদে চলিতে পারে; কিন্তু মানুষের হৃদয় বলিয়া আর একটি সূক্ষ্ম জগৎ আছে। সেখানে সে রচনা করে, সে গ্রহণ করে, সে বিলাইয়া দেয়। সে ভালবাসে, সে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়; সে বাঁচিতে চায়—সে নিঃশেষে মরিতে চায় না। সে ডোবে, সে ওঠে, সে কাঁদে, সে

কাঁদায় ; সেখানে সে চিরবুভুক্ষু। আর একটি বা একাধিক হৃদয়-জগৎকে সে গ্রাস করিতে চায় এবং একাধিক দেহকে সে ভোগ করিতে চায়। কিন্তু সে তাহা পারে না, সমাজ ও শাস্ত্র, লোকাচার ও লোকলজ্জা সঙীন উঁচা করিয়া বসিয়া আছে। হৃদয়কে পীড়া দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য। কখনো কখনো এই সংকীর্ণ গণ্ডী ভাঙিয়া ফেলিয়া মানব-হৃদয় মহাসাগরের কল্লোল শুনিতে পায়—আমরা সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। আমরা এই বাঁধভাঙার কাহিনী লিপিবদ্ধ করি।

তথাকথিত অতি-আধুনিকতার বিরুদ্ধে ইহাই আমাদের প্রথম ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ।

১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'কালি-কলম' বাহির হইতেছিল। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র 'কল্লোলে'র দল ভাঙিয়া শ্রীমুরলীধর বসুর সঙ্গে যোগ দিয়া 'কালি-কলম' প্রকাশ করিয়াছিলেন, বরদা এজেন্সির শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী হন পরিবেশক। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র এই দুই জনই ছিলেন 'কল্লোল'-দলে সত্যকার সাহিত্যস্রষ্টা ও শিল্পী, 'কল্লোলে'র হালচাল ও পরিবেশ তাঁহাদের শিল্পসাধনার আর অনুকূল ছিল না। সুতরাং তাঁহারা সরিয়া পড়িলেন। বাকি যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা প্রধানত ঘষিতে-ঘষিতে-প্রস্তর-ক্ষয়-করার দল ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের অনেকে ঘষিতে ঘষিতে নিজেরাই ক্ষয় হইয়া গিয়াছেন। যে দুই-একজন টিঁকিয়া আছেন, তাঁহারা খুব সময়ে বুদ্ধি করিয়া ধর্মের ধাতুতে তলা বাঁধাইয়া ব্যক্তিগত দৌর্বল্য সারিয়া লইয়াছেন।

'কালি-কলম' শুরু হইতেই 'কল্লোল' অপেক্ষা মার্জিত ও ভদ্র রুচির পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু প্রথম সংখ্যাতেই হাবিলদারী "কামকণ্টকব্রণ"-দুষ্টতার জন্য আমাদের আক্রমণের বিষয় হইয়াছিল। রাধিকা যেমন সারা বৃন্দাবন কৃষ্ণময় দেখিতেন, হাবিলদার-কবি তেমনি সারা বনভূমি "সুরত-কেলি"-ময় দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া "প্রলাপ" বকিয়াছিলেন—

> "করে বসন্ত বনভূমি সুরত কেলি
> পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি।...
> আসে ঋতুরাজ, ওড়ে পাতা জয়ধ্বজা।
> হ'ল অশোক শিমুলে বন পুষ্পরজা।"

এতটা আমরা বরদাস্ত করিতে পারি নাই, 'কালি-কলমে'র সহিত আমাদের মোহিতলাল ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও। বিরহ-সংখ্যাতেই 'কালি-কলম'কেও শত্রু করিয়া ফেলিলাম।

অসাময়িক হইলেও আমি মনে মনে নিয়মিত মাসিকের মহড়া দিয়া চলিয়াছিলাম। জ্যৈষ্ঠের পর আষাঢ় বাহির করিলাম বটে, কিন্তু পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশ হইতে আরও চার মাস লাগিল—কার্তিকে "ভোট-সংখ্যা"। বাংলা দেশে নূতন ইলেকশনের দামামা বাজিতেছে, চারিদিকে শুনিতেছি, "সবার উপরে ভোটই সত্য তাহার উপরে নাই।" চিত্তরঞ্জন গত, কিন্তু স্বরাজ্য পার্টির তখন প্রবল প্রতাপ। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ভোট-ব্যাপারটাকেই নস্যাৎ করিয়া ভোট-সংখ্যা বাহির করিলাম, ছাপিলাম চার হাজার। দলে দলে দলাদলির জন্য চার হাজার কপিই গরম চানাচুরের মত বিকাইয়া গেল। আরও কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইল। অর্থাৎ ফণ্ডে টাকা জমিল। নিয়মিত মাসে মাসে 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

কিন্তু স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিতে আরও দশ মাস সময় লাগিল। এই কালেও আমি নিশ্চেষ্ট ছিলাম না। রবি মৈত্র তখন কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনিই আমাকে সঙ্গে করিয়া গোলদীঘির পাশে অবস্থিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আপিসে লইয়া গেলেন। 'আনন্দবাজারে'র সহিত 'শনিবারের চিঠি'র একটা যোগ স্থাপিত হইল এবং আর একটি বিচিত্র ঘটনা-চক্রে পূর্ব-পরিচিত শরৎচন্দ্রের সহিতও ঘনিষ্ঠ হইয়া গেলাম।

অতি-আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের লইয়া একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করিয়া ফেলিলাম, নাম দিলাম "কচি ও কাঁচা"; নিদারুণ ব্যঙ্গাত্মক আঘাত ইহাতে ছিল। বন্ধু ও পরিচিত সাহিত্যিক মহলে নাটকটি পড়া হইল। মোহিতলাল প্রমুখ অনেকেই খুব তারিফ করিলেন। খ্যাতি শত্রুশিবিরেও পৌঁছিল। একদিন স্বয়ং 'কল্লোল'-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব)-সমভিব্যাহারে আমার বাসায় দর্শন দিলেন এবং একথা-সেকথার পর নাটকটি শুনিতে চাহিলেন। আমি সোৎসাহে পড়িয়া শুনাইলাম। দীনেশরঞ্জন অতিশয় ভদ্র পয়োমুখ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মনে যাহাই থাকুক, মুখে লেখাটির বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং 'কল্লোলে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশার্থ প্রার্থনা করিলেন। প্রস্তাবের অসম্ভবতা বুঝিয়াও আমি অনুগৃহীত হইলাম। আমার বাল্যবন্ধু 'কল্লোলে'র একাধিক গল্প-লেখক দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় মনীশ ঘটকের সহিত আলাপ ছিল। মনীশ শক্ত জোরালো মানুষ, ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড়ের দলে নয়, সে অকুণ্ঠচিত্তে "কচি ও কাঁচা"র ব্যঙ্গকে অতিশয় সক্ষম রচনা বলিয়া স্বীকার করিল। পরে মাসিকের প্রথম সংখ্যা হইতে "কচি ও কাঁচা" প্রকাশিত হইয়া বিষম কোলাহল ও হট্টগোলের সৃষ্টি করে; মামলা স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পৌছায়। তাঁহারই অনুরোধে চতুর্থ অঙ্কের পরবর্তী অংশ আর প্রকাশ করা হয় না। সে বৃত্তান্ত পরে বলিব।

ইতিমধ্যে নানা কারণে ইয়োরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনের একাধারে সন্ন্যাস-আতুরাশ্রমটি ভাঙিয়া গেল। নৃতন আইন পাসকরিয়া বিদায় লইল, কিরণের সেই শিবপুরেই বিবাহ হইয়া গেল। এবার সত্যকার সংসার পাতিতে হইবে। বন্ধু সুবলচন্দ্রের আগ্রহ ও চেষ্টায় ঘোষ লেনে তাহার বাড়ির পাশে একটি বাড়ি ভাড়া করা হইল, কিরণ ও আমি সপরিবারে সেখানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষে এই বাড়িটি সত্যসত্যই পয়া। এখানেই এক প্রভাতে চা-পান করিতে করিতে যোগানন্দদা ও আমি —সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক—'শনিবারের চিঠি' নিয়মিত পুনঃপ্রকাশের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলাম।

তৎপূর্বে আর দুইটি কাজ করিয়াছিলাম। সমসাময়িক বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

> গত ২৪শে মাঘ [১৩৩৩] আমার শ্রদ্ধাভাজন কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের সহিত আমি শরৎবাবুর রূপনারায়ণ-নদীতীরস্থ গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। নানা কথাবার্তার পর মোহিতবাবু বাংলা-সাহিত্যে বর্তমান দুর্নীতি বিষয়ক একটি চমৎকার প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করেন। শরৎবাবু প্রবন্ধটি অবিলম্বে কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বলিয়া বলেন যে, বাংলা-সাহিত্যে যে জঘন্যতা প্রকাশ পাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন আবশ্যক। 'কল্লোল', 'কালি-কলম', শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে কথা হয়। শরৎবাবু এই সকল পত্রিকার ও লেখকদের রুচি দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে তিনি এ বিষয়ে নিজেই লিখিতেন। তিনি বলিলেন, শিক্ষাদীক্ষাহীন অর্বাচীন ছেলেরা সাহিত্যের আবহাওয়া দূষিত করিলে সহ্য করা যায়, নজরুল ইসলামের অশিক্ষিতপটুত্ব তাঁহাকে কোন বন্ধনের মধ্যে রাখিতে পারে না। কিন্তু নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মত পণ্ডিত জন যখন এই পঙ্কিলতার সৃষ্টি করেন তখনই তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে সাধারণের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তিনি ভুঁইফোঁড় লেখক, কোনো দিন কোনো বিষয়ে পড়াশুনা করেন নাই, এমন কি তিনি ইংরেজী পর্যন্ত ভাল জানেন না। সেই জন্য এই সকল স্বভাব-সাহিত্যিক দল তাঁহাকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া থাকে। তিনি পরিহাস করিয়া

বলিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষা না থাকিলেও রেঙ্গুনে অবস্থানকালে সেখানকার লাইব্রেরিতে এমন কোনো ইংরেজী বাংলা পুস্তক ছিল না যাহা তিনি পাঠ করেন নাই। পতিত ও পতিতাদের সম্বন্ধে তিনি তাঁহার লেখায় যে সহৃদয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়াই এই অভিনব দুর্নীতিসমর্থক সাহিত্যিকমণ্ডলী তাঁহাকে নিজেদের দলে টানিয়া থাকে। "কিন্তু", তিনি বিশেষ জোরের সহিত বলিলেন, "আমি আজ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছি, তার প্রত্যেকটি কথা ওজন ক'রে লিখেছি, আমি কখনো ফাঁকি দিয়ে লিখি না, আমার কোনো লেখায় একটি কথাও আমি অযথা লিখি না—একটি কথাও বদলাতে পারি না। আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, আমি পাপের বিকৃত জঘন্য রূপ দেখাবার জন্যেই পাপচিত্র এঁকেছি, সাহিত্যের রুচির বা নীতির কোনো আইন কখনো অমান্য করি নি।"···অন্যান্য আরো অনেক কথাবার্তা শুনিয়া আমাদের এই ধারণা হয় যে, আগাছাক্লিষ্ট বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের দুর্দশায় শরৎচন্দ্র নিতান্তই ব্যথিত আছেন। সাহিত্য সাধনার সামগ্রী, সেই সাহিত্যকে লইয়া এ ভাবে নাস্তানাবুদ করাকে তিনি দেশের পক্ষে অত্যন্ত কুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার মতে, কলঙ্কিত বিষাক্ত সাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্য একেবারে লুপ্ত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়।

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, মোহিতলালের প্রবন্ধটি মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা হউক, শরৎচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথ। আমি রবীন্দ্রনাথকেও টলাইতে চাহিলাম। ১।১ ইয়োরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন হইতেই ২৩শে ফাল্গুন ১৩৩৩ তারিখে শান্তিনিকেতনে তাঁহাকে এক দীর্ঘ পত্রাঘাত করিলাম। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁহার 'কল্লোল-যুগে' আমার পত্র ও রবীন্দ্রনাথের জবাব উদ্ধৃত করিয়াছেন।* আমি আর তাহা করিব না। তখনকার বাংলা-সাহিত্যে আমার মতে যে সকল অনাচার চলিতেছিল, আমি সেই সকলের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার দ্বারাই প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাঁহারই আগেকার সাহিত্য-সমালোচনা হইতে নিম্নলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া আমি তাঁহাকে সচেতন ও সক্রিয় হইতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম—

"পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে

* মাসিক 'শনিবারের চিঠি' প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৪, প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইবে এমন কোনো কথা নাই ।…কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা ?…যাহাতে বিশ্বজনীন নীতি নাই, তাহা কি কাব্য হইতে পারে ?”

ঠিক দুই দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জবাব পাইয়াছিলাম :

“আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে আছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল ক'রো না। কেন করি নে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হ'তেও পারে। …সুসময় যদি আসে আমার যা বলবার বলব।”

সুসময় আসিতে বিলম্ব হয় নাই ; ১৩৩৪ সনের আষাঢ় মাসে বাংলা-সাহিত্য-সরোবর তোলপাড় করিয়া মহাসমারোহে ষড়ঋতুর কানামাছি খেলার নৃত্যচ্ছন্দে ‘বিচিত্রা’ আবির্ভূত হইল। কান্তিচন্দ্র ঘোষ তবলা ও শ্রীঅমল হোম বাঁয়া সঙ্গত করিয়া এবং সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সানাইয়ের পোঁ ধরিয়া এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করিলেন যে, মনে হইল দীনবন্ধুর “দীনাহীনা-পিঁচুটি-নয়না” বঙ্গবাণী অকস্মাৎ পাটরাণীর পদে বৃতা হইলেন এবং রবীন্দ্রনাথ পাকাপাকি রকমে এই কানামাছি খেলার বুড়ী হইয়া বসিলেন ! কলিকাতার পথঘাট, প্রাচীর ও প্রান্তর ‘বিচিত্রা’র বিচিত্র বিজ্ঞাপনী-কলরবে মুখর হইয়া উঠিল। সাহিত্যে “অভিজাত” কথাটা সেই প্রথম শুনিলাম। বস্তুত, বাংলা-মাসিকপত্রের এক বিচিত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত ‘বিচিত্রা’ আনিয়া দিল।

দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ শ্রাবণের ‘বিচিত্রা’য় রবীন্দ্রনাথের “সাহিত্য-ধর্ম” নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক এই কারণে যে, ইহা লইয়া বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যাপক ও গুরুতর আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ইহার ফলে এমন বহু শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি বাংলা-সাহিত্যের উপর পতিত হয় যাঁহারা এতাবৎকাল মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে উপেক্ষাই করিয়া আসিতে-ছিলেন। নানা দিকের মতবিরোধ স্পষ্ট ও মুখর হইয়া আবর্ত ও কোলাহলের সৃষ্টি করে, এবং ‘শনিবারের চিঠি’কেই কেন্দ্র করিয়া শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ও কৃতী ব্যক্তিরা এই কলহের আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

আমার ব্যাকুল পত্র-আবেদনের ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার “সাহিত্য-ধর্ম” প্রবন্ধে “আধুনিক সাহিত্যে”র বিরুদ্ধে কি লেখেন তাহা আজ নূতন করিয়া জানিবার প্রয়োজন আছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের লক্ষ্য, তাঁহাদেরই

মধ্যে অতি-সেয়ানা কেহ কেহ শাসনকে সম্মানভাবে গায়ে মাখিয়া আজকাল সোল্লাসে নৃত্য করিতেছেন দেখিতেছি। দুই যুগেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, আসল খবর এ যুগের পাঠকেরা বড় একটা রাখেন না। তাঁহাদিগকে ভুল বোঝানো হইতেছে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং বাধ্য হইয়া আসলের খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা [আমার নিকট রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য] এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করচেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান-মদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলচে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙট্-পরা গুলি-পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই,—পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক ক'রে তুলে তাই চিৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেচে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙীন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্য-কারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে-উৎসের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দ প্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এক্ষেত্রে অসঙ্গত ব'লেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।

সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ-সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি? এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাৎলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচো-খচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে তখন আর্তব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কি না, যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে এটা সঙ্গীত কি না। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে একরকম উল্লাস হয়। কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব একটা জোরও আছে।

মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরী দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্য-কলার নয়।

…যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায় নি, সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে? ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায়, 'তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন?' উত্তর পাই, 'হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেচে!' ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, 'হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী!'

ইহার জের দীর্ঘকাল চলিয়াছিল এবং সম্ভবত এখনও চলিতেছে। যাঁহারা সেদিন প্রতিপক্ষ ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই যথাসময়ে মত পরিবর্তনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধর্মকে মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু নূতনেরা আসিয়া তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের নজির খাটিবে না, অন্য নজির দিতে হইবে।

শরৎচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয়ের কাহিনী পূর্বে বলি নাই। সে কাহিনীও বিচিত্র এবং "জড়"কেন্দ্রিক। ১৩৩১ সালের ফাল্গুনে যখন সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' সদ্য বন্ধ হইয়া যায়, তখন বড়ই দমিয়া গিয়াছিলাম। দমনেরই রূপান্তর বিদ্রোহ বা বিপ্লব। আমিও বিদ্রোহ করিলাম—ভগবানের বিরুদ্ধে। কোয়াণ্টাম থিয়োরি, রিলেটিভিটি ও রেডিও-অ্যাকৃটিভিটি তখনও মাথায় গজগজ করিতেছে, অধিকন্তু কাগজ-পরিচালনায় মার খাইয়াছি। সুতরাং তারস্বরে চেঁচাইয়া উঠিলাম—কেহ নাই, কিছু নাই, নিষ্ঠুর জড় প্রকৃতিই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, চাপিয়া পিষিয়া মারিতেছে, আমরা বৃথা ঈশ্বর ঈশ্বর করিতেছি। চিৎকারটি স্বভাবতই একটি দীর্ঘ কবিতার রূপ লইল—"জড়"। লিখিলাম—

প্রকৃতির নিয়ন্তা সে জড় মূক প্রকৃতি আপনি,
ঈশ্বরের খেলা ইহা অক্ষমের ভ্রমান্ধ কল্পনা,
কেহ জাগরূক নাই ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য গনি,
দণ্ডহাতে এতদিন বিশ্বে কেহ করে নি চালনা।

আপনি চলেছে সৃষ্টি বীজ হতে হতেছে অঙ্কুর,
কদর্যতা বীভৎসতা পাপপুণ্য কোথা কিছু নাই,
অন্ধ কবি ভাবে—শোনে কত মধু অন্তহীন সুর,
ধূলিরে ভাবে না ধূলি, ভাবে ছাই নহে শুধু ছাই।

আছে সুর উঠে তাহা নিখিলের গতির প্রবাহে,
জন্ম আর মৃত্যু আছে এইমাত্র নিয়ম অনাদি ;
প্রেমিক ধূলির সনে আপন যোগের গান গাহে,
অস্তিত্ব নাহিক যার, পায়ে তার চিত্ত রাখে বাঁধি।

কভু কি দেখেছ তুমি আর্ত যবে পীড়িত ধরণী
মানুষের হাহাকারে মেঘ হতে ঝরিয়াছে জল,
তোমার হৃদয়ে যবে উঠে ব্যর্থ ক্রন্দনের ধ্বনি
থেমেছে কি ক্ষণতরে প্রকৃতির নিত্য কোলাহল ?

দেখেছ কখনো তুমি নীলাকাশ হয়েছে মেদুর,
রৌদ্রতাপে দগ্ধ যবে শস্যভরা শ্যাম বসুন্ধরা,
রোগ-যন্ত্রণায় রোগী শোনে কভু তারকার সুর,
ব্যথায় ব্যথিত হয়ে রজনী কি পলায় সত্বরা ?

প্রাণহীন জড়ে ল'য়ে কল্পনার নাহিক অবধি,
ছন্দ গান কবিত্বের প্রস্রবণ নিত্য উৎসারিত !
যে কাঁদে সে কাঁদে, আর যে হাসে সে হাসে নিরবধি,
জর্জর যে বেদনায় সে হতেছে নিত্য জর্জরিত !

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে প্রচণ্ড রাগ-অভিমানের বশে পদ্যটি রচিত, "ভিট্রিয়লিক ভল্‌টেয়ার" আমার অজ্ঞাতসারে কাঁধে চাপিয়াছিলেন। তখন বাদুড়বাগান মেসেই আমার অবস্থান। শ্রীযতীশচন্দ্র সেন ও জীবনদা পদ্যটির তারিফ করিলেন। যতীশচন্দ্রের ঘরে তখন প্রভাসচন্দ্র ঘোষের নিত্য যাতায়াত। তিনিই তখন 'নব্যভারত' পরিচালনা করিতেন। আদি সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী নাই, তৎপুত্র প্রভাতকুসুমও গত। প্রভাতকুসুমের সহধর্মিণী ফুল্লনলিনী দেবী মৃত 'নব্যভারত'কে পুনরুজ্জীবিত করিলেন, প্রভাস ঘোষ প্রধান সহায়—যতীশ সেন, জীবনময়ও সঙ্গে আছেন। ১৩৩১-এর বৈশাখ হইতে 'নব্যভারত' বেশ সজীব ভাবেই বাহির হইতেছিল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি

প্রভাসদা আমার "জড়" পদ্যটি কাড়িয়া লইয়া গিয়া চৈত্র-সংখ্যায় শেষ রচনা হিসাবে বেনামী ["শ্রী—"] ছাপাইয়া দিলেন। এই "জড়"-বিকারই 'নব্য-ভারতে'র কাল হইল। সমাজে তুমুল সোরগোল উঠিল। সম্পাদিকা বিরক্ত হইলেন। কাগজ অনতিবিলম্বে বন্ধ হইয়া গেল।

'নব্যভারতে'র যাহাই হউক, আমার লাভ হইল। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' তখন ধারাবাহিক ভাবে ইহাতে বাহির হইতেছিল। শরৎচন্দ্র নিজে একজন উপন্যাসের আসামী, তিনি আগ্রহের সঙ্গে 'নব্যভারত' পাঠ করিতেছিলেন। যে কোনও কারণে তাঁহার তৎকালীন জড়ীভূত দৃষ্টি আমার "জড়ে"র উপর পড়িল। তিনি এত খুশি হইলেন যে, বিশেষ অনুসন্ধানে শিবপুরের প্রতিবেশী শ্রীকালিদাস নাগ মারফত লেখকের পরিচয় সংগ্রহ করিলেন। কালিদাসদা পরিচয়-পত্রসহ আমাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। বাজে-শিবপুরের বাড়িতে গেলাম। ভেলিকে দেখিলাম এবং শরৎচন্দ্রের পিঠচাপড়ানি খাইয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ফিরিয়া আসিলাম। প্রথম পরিচয় এই পর্যন্ত।

তাহার পর, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র পাকাপাকি অবস্থানের জন্য রংপুর-মাহিগঞ্জ হইতে কলিকাতায় আসিলেন। পত্রযোগে নিবিড় পরিচয় জন্মিয়াছিল, কলিকাতায় আসিতেই আমরা একাত্ম হইয়া গেলাম। তাঁহার মত আশাবাদী সাহিত্যিক আমি আর দেখি নাই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আশাবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ঢিলাঢালা—হচ্ছে-হবে-গোছের মানুষ, সুচিরকাল অপেক্ষা করার স্থৈর্য তাঁহার ছিল। রবি ছিলেন অস্থিরপ্রকৃতির সক্রিয় আশাবাদী। 'শনিবারের চিঠি'র অভাবে আমাকে মনমরা দেখিয়া তিনি আমার পিঠে সজোরে থাবা মারিয়া সোৎসাহে বলিলেন, কুছ পরোয়া নেহি, চল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আপিসে, সেখানেই ব্যবস্থা হবে। গোলদীঘির পূর্বপারে এখন যেখানে বিশ্বভারতী পুস্তকালয় সেই বাড়িতে কিংবা তাহারই আশেপাশে কোনও একটা বাড়িতে তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আপিস। রবি 'আনন্দবাজারে' নামে বেনামে লিখিতেন। প্রথম দিনেই টের পাইলাম, শ্রীমাখনলাল সেন, প্রফুল্লকুমার সরকার ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার রবিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাঁহার পরিচয়ে পরিচিত হইয়া আমিও সেই দিন হইতেই স্নেহাশ্রিত হইলাম। ব্যবস্থা হইল শনিবাসরীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা 'শনিবারের চিঠি'র জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে; তাহাতে আমরা শনিমণ্ডলী যাহা খুশি লিখিব। কয় সপ্তাহ 'শনিবারের চিঠি' এইভাবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ক্রোড়স্থ হইয়া বাহির

হইয়াছিল সঠিক তাহা বলিতে পারিব না, পুরাতন ফাইল ঘাঁটিয়া বাহির করাও আজ দুর্ঘট, তবে এইটুকু বেশ মনে আছে মাসাধিক কাল তো বটেই। এইভাবে ক্ষেত্রান্তরে উপ্ত হইয়া 'শনিবারের চিঠি'র আর একটু প্রসার বাড়িল, আমার লাভ হইল বেশ কয়েকজন নূতন বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত এইখানেই পরিচিত হইয়াছিলাম। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই স্নেহ আমি বরাবর সমানে পাইয়া আসিয়াছি।

যাহা হউক, যে কাহিনী বলিতেছিলাম। ১৩৩২-এর চৈত্রে কলিকাতায় যে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত শুরু হয় তাহার জের টানিয়া আমরা ১৩৩৩-এর জ্যৈষ্ঠে জুবিলী বা দাঙ্গা সংখ্যা বাহির করিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানেই জের মিটে নাই। "শুদ্ধি-আন্দোলন" নাম দিয়া আমি তখনই একটা দুর্দান্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা উক্ত 'শনিবারের চিঠি'তে পত্রস্থ করিতে দেন নাই। লেখাটি আমার এতই প্রিয় ছিল যে, প্রায় সর্বদা তাহা পকেটে পকেটে ফিরিত। লোক পাইলেই পড়িয়া শুনাইতাম। 'আনন্দবাজার'-আপিসে ভাদ্র মাসের কোন একদিনে রবির আগ্রহাতিশয্যে প্রবন্ধটি খুব হৃদয়গ্রাহী করিয়া পড়িলাম। সত্যেনদা ও প্রফুল্লবাবু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন; রবি তো ওই কাজেরই কাজী ছিল, সুতরাং তাহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। সেখানে আর একটি আমার অজ্ঞাত-পরিচয় যুবক বসিয়া ছিলেন; প্রবন্ধ পাঠ সাঙ্গ হইলে তিনি বিনীতভাবে আমার নিকটে প্রবন্ধটি প্রার্থনা করিলেন। সত্যেনদা পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি 'হিন্দু-সঙ্ঘ' সাপ্তাহিকের সম্পাদক অনুজাচরণ সেনগুপ্ত। তিনি বলিলেন, পূজার বিশেষ সংখ্যায় প্রবন্ধটি ছাপিবেন। আমি সানন্দে দীর্ঘকাল পরে প্রবন্ধটির ভারমুক্ত হইলাম। ১৯শে আশ্বিন ১৩৩৩ (৬ অক্টোবর ১৯২৬) বুধবার 'হিন্দু-সঙ্ঘে'র পূজা-সংখ্যা বাহির হইল। এক খণ্ড হাতেও আসিল। আনন্দের সঙ্গে দেখিলাম, আমার "শুদ্ধি-আন্দোলন" বাহির হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিলাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা" নামক একটি প্রবন্ধ "শুদ্ধি-আন্দোলনে"র পাশাপাশি ছাপা হইয়াছে। সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হইতেই আমার উল্লাস বাধাগ্রস্ত হইল। সংবাদপত্রে দেখিলাম, শরৎচন্দ্র ও আমার প্রবন্ধের জন্য অনুজাচরণ ধৃত হইয়াছেন, 'হিন্দু-সঙ্ঘে'র পূজা-সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, বিচারেরও বিলম্ব হইল না। অনুজাচরণের প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হইল। অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। এই অবস্থায় কালিদাসদা সংবাদ আনিলেন, শরৎচন্দ্র আমার সাক্ষাৎকামী। সেই দিনই হাওড়া টাউন হলে কোনও সভায় সায়াহ্নে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করিবেন, আমাকে সেখানে

তাঁহার সহিত দেখা করিতে হইবে। অনুজাচরণের কঠোর শাস্তি এই আহ্বানের আনন্দ অনেকখানি খণ্ডিত করিয়া দিল, তবুও গেলাম।

উত্তর দ্বার দিয়া ঢুকিয়া সিঁড়িপথে দোতলায় উঠিলেই চওড়া বারান্দা এবং তাহারই সংলগ্ন প্রকাণ্ড হল। লোকে লোকারণ্য। শরৎচন্দ্র সভা আলো করিয়া সভাপতির আসনে বসিয়া আছেন। আমি বারান্দা ও হলের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছি, তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সভার শালীনতা ভঙ্গ করিয়া আমাকে বেশ জোরেই নাম ধরিয়া ডাকিয়া চৌকি হইতে নামিয়া পাশের উত্তরপূর্ব কোণের বিশ্রামঘরে গিয়া ঢুকিলেন। সভায় বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, শরৎচন্দ্র ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পরে বুঝিয়াছিলাম, সভাপতির আসনে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত অস্বস্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন, আমাকে উপলক্ষ্য পাইয়া তিনি বাঁচিয়া গেলেন। তাঁহার এই সভা-ভীতি বরাবরই ছিল।

আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে বিশ্রামকক্ষে উপনীত হইলাম। একটা আরাম কেদারায় তিনি ততক্ষণে বসিয়াছেন এবং ভক্তবৃন্দ গড়গড়ায় সাজা কলিকা বসাইয়া তাঁহার হাতে সট্‌কা তুলিয়া দিয়াছে। আমি আসিতেই তিনি আমাকে প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া পাশের চৌকিতে বসিতে আদেশ করিলেন। হলের গুঞ্জন অনুযোগের আকারে সভার উদ্যোক্তাদের মুখে তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন, আর কাউকে বসিয়ে দাও গে, সজনীর সঙ্গে আমার জরুরী কাজ আছে। আমি তাঁহার নিকট ঘণ্টাখানেক ছিলাম, ইহার মধ্যে তিনি আর সভামঞ্চে প্রবেশ করিলেন না। সকলকে বিশ্রামকক্ষ ত্যাগ করিতে বলিলেন, শুধু আমি আর তিনি রহিলাম। একান্তে পাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, আমাদেরও ধরবে না কি হে? দেখ তো কি কাণ্ড! মনে হইল, তিনি সত্যসত্যই ভয় পাইয়াছেন। তিনি আমার লেখার অন্তর্নিহিত যুক্তির বিশেষ প্রশংসা করিলেন। নানা কথাবার্তার মধ্যে এই দ্বিতীয় দিনেই আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে তাঁহার সামতাবেড়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই মোহিতলালকে সঙ্গে লইয়া মাঘ মাসের ২৪ তারিখে তাঁহার রূপনারায়ণাবাসে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলাম এবং আধুনিক সাহিত্য-প্রসঙ্গে আলাপ হইয়াছিল।

প্রসঙ্গত এখানে বলা প্রয়োজন যে, অনুজাচরণ সেনগুপ্ত কারামুক্তির কিছুকাল পরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে লালদীঘির ধারে তদানীন্তন কলিকাতার পুলিস-কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করিতে গিয়া স্বদলীয় বোমার

আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার নাম রহিল না বটে, কিন্তু আমার মনোমন্দিরে তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে।

শরৎচন্দ্রের রচনাটি ("বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা") 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী'তে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু আমার "শুদ্ধি-আন্দোলনে"র প্রয়োজন আমাদের বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে একেবারেই শেষ হইয়াছে। তাই অতীত ইতিহাসের টুকরা হিসাবে তাহার কিঞ্চিৎ এই 'আত্মস্মৃতি'তে ধরিয়া রাখিলাম—

ভারতবর্ষে মুসলমান প্রভাব আরম্ভ হইবার সময় হইতে আজ পর্যন্ত হিন্দু উৎপীড়িত হইয়াছে, উৎপীড়ন করে নাই। মুসলমানধর্ম রাজধর্ম বলিয়া, উৎপীড়ক ধর্ম বলিয়া ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইয়া মুসলমান-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্দুর এই সংখ্যাহ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ, হিন্দুর সামাজিক অত্যাচার ও অবিবেচনা। সম্প্রতি সেগুলি দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে, এইটাই ভারতবর্ষের পরম শুভ লক্ষণ। শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন এই সামাজিক দুর্নীতি দূর করিবার প্রচেষ্টা মাত্র।

অবশ্য এ কথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে যে, শুদ্ধি-আন্দোলন নিছক সামাজিক দুর্নীতি উচ্ছেদের প্রচেষ্টা; ইহার অন্য একটি দিকও আছে; ইহা শুধু আত্মরক্ষা করিবার উপায় নহে, আক্রান্ত ব্যক্তির উদ্ধারসাধনও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। মুসলমানের সহিত বিরোধ বাধিতেছে শুদ্ধি-আন্দোলনের এই দিকটি লইয়া।…

জয়চাঁদের সময় হইতে জে. এম. সেনগুপ্ত মহাশয় পর্যন্ত সকল তথাকথিত হিন্দুই আপনার পায়ে আপনি কুঠার হনন করিয়া আসিতেছেন—জ্ঞানোন্মেষ কবে হইবে ব্যথিত হইয়া তাহাই ভাবিতেছি। দেখিলাম মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সকল মহাপুরুষই ভয়ে হউক বিশ্বাসে হউক মুসলমানের অন্যায় আবদার সহিয়া আসিতেছেন। চিত্তরঞ্জন মরিয়া বাঁচিয়াছেন, নতুবা আজ তাঁহার প্যাক্টের দুর্দশা দেখিয়া মর্মাহত হইতেন। গান্ধীজী খিলাফতের জন্য প্রাণপাত করিলেন, তবুও সোহাগিনী মুসলমানের মন রাখিতে পারিলেন না দেখিয়া 'দুত্তোর' বলিয়া কোণা লইলেন। আর আজিও এত দেখিয়া শুনিয়াও ইঁহারা সেই প্রাচীন ভুল করিতেছেন দেখিয়া চোখে জল আসে।…

বাংলা দেশে দেখিতেছি স্বরাজ্য দলের মত আর একটি দল প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহারা নিজেদের কম্যুনিস্ট আখ্যা দিয়া থাকেন।

কম্যুনিস্ট বলিতে তাঁহারা কি বুঝেন জানি না, কিন্তু আমরা তাঁহাদের পরিচালিত পত্রিকা পড়িয়া ও দুই-এক স্থলে তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিয়াছি যে, মধ্যবিত্ত লোকের ধ্বংসসাধন করিয়া সমাজের তথাকথিত নিপীড়িত জাতিকেই দেশের পরিচালনার ভার দেওয়াই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। আশ্চর্য এই যে, এই মতবাদ তাঁহারা যাহাদের কাছে প্রচার করিতেছেন তাহারাও মধ্যবিত্ত।···

গত এপ্রিল মাস হইতে পর পর যে কয়েকটি দাঙ্গা বাংলার উপর হইয়া গেল তাহাতে হিন্দু এই বুঝিয়াছে যে, ক্ষমা ও প্রেম নিরীহের মহত্ত্ব নহে, দুর্বলতা মাত্র ; হিন্দু যদি সবল হইত, ঠেঙ্গানির উত্তর যদি সে ঠেঙ্গানি দিয়া দিতে পারিত তাহা হইলে প্রীতি-মৈত্রীর কথা অপ্রাসঙ্গিক হইত না বটে, কিন্তু এখন যখন মার খাইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই তখন প্রীতির বার্তা প্রচণ্ড উপহাস ছাড়া কিছুই নয়।···

ভারতের হিন্দুর অবমাননা ও লোকক্ষয়-রোগের একমাত্র প্রতিকার শুদ্ধি-আন্দোলন ও সংগঠন। হিন্দু দলবদ্ধ হউক। প্রাণ দিয়া ধর্ম রক্ষা করুক। যদি বীরের মত মরিতে প্রস্তুত না থাকে, অলক্ষ্যে ছুরি খাইয়া মরিতে হইবে। যদি মৃতপ্রায় এই হিন্দুজাতিকে বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা তুমি আমি প্রত্যেকেই না করি, তাহা হইলে সকলের মুসলমান হইয়া মুসলমান সাম্যবাদের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া হাসান-হুসেন বলিয়া বুকে করাঘাত করত পরের মাথায় লোষ্ট্র নিক্ষেপ করাই চরম পথ বলিয়া মানিয়া লওয়া ভাল।

অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার মন্ত্র জানিত, বাহিরে আসিবার মন্ত্র শিখে নাই বলিয়া প্রাণ হারাইল। হিন্দু-সমাজ বাহিরে যাইবার মন্ত্র জানে, ভিতরে প্রবেশ করিতে জানে না বলিয়াই এমন লাঞ্ছিত ও হীনবল হইতেছে। বহির্গত হিন্দুকে সমাজ-গোষ্ঠীতে ফিরাইয়া আনিবার শুদ্ধিই একমাত্র উপায়। এই শুদ্ধি-আন্দোলনকে মূর্খের মত নিন্দা করিয়া আমরা যেন আত্মহত্যার পাতকী না হই।
—'হিন্দু-সঙ্ঘ', ১৯ আশ্বিন ১৩৩৩

স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহা আটাশ বৎসর পূর্বের রচনা ; হিন্দু যদি সত্যই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিত, তাহা হইলে আজ ভারত-বিভাগের সর্বনাশা অবস্থার উদ্ভব হইত না।

যাহা হউক, এক দিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতি এবং অন্য দিকে শরৎচন্দ্রের সুচিন্তিত অভিমত সংগ্রহ করিয়া 'শনিবারের চিঠি'র মাসিকরূপে পুনর্জন্মের তোড়জোড় করিতে লাগিলাম। রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে (শ্রাবণ ১৩৩৪) প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন এবং তাহার পরেও পরবর্তী অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে আধুনিক সাহিত্যে বাহির-হইতে-আমদানি-করা নকল "কারি-পাউডরে"র বিরুদ্ধে শক্ত প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহা তাঁহার 'সাহিত্যের পথে' পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আবাল্য সাধনার দ্বারা তাঁহার জন্মার্জিত সংস্কার ধর্মে পরিণত হইয়াছিল এবং সাহিত্যধর্মে তিনি দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, কখনও তাঁহার মতের নড়চড় হয় নাই।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের হইয়াছিল। সেই কথাই বলিতেছি।

১৩৩৪ সালের ৯ ভাদ্র তারিখে আমার জন্মদিনে মাসিক 'শনিবারের চিঠি' বিবিধ শঙ্কা ও সংশয়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল। সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক পূর্ববৎ শ্রীযোগানন্দ দাস, আমি তাঁহার সহকারী। প্রথম প্রবন্ধ আমার সেই রবীন্দ্রনাথের নিকট আবেদন, তাঁহার আশ্বাস ও শরৎচন্দ্রের সহিত "ইণ্টারভিউ"-প্রসঙ্গ লইয়া—নাম "আধুনিক বাংলা সাহিত্য"। স্বয়ং সম্পাদক মহাশয় লিখিলেন "নব যুগান্তর" কবিতা এবং "পুরুষসিংহম্" প্রবন্ধ। তাহার পর, পর পর আমার দীর্ঘ ব্যঙ্গকবিতা "অঙ্গুষ্ঠ", শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক গল্পের প্যারডি "সব শেয়ালের এক—", সম্পাদক মহাশয়ের চুটকি কবিতা "বাদলাতে" যাহার প্রথম দুই পংক্তি প্রবাদ-বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

> "বাদলাতে যদি মন ভারী
>
> মুড়িতে মেখে নে লঙ্কা নুন—"

তাহার পর আমার সেই "কচি ও কাঁচা" নাটকের ভূমিকা ও প্রথম অঙ্ক, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা "তোমাদের প্রতি", "সংবাদসাহিত্য" (আমার), 'প্রবাসী'র "বেতালের বৈঠক"কে ঠাট্টা করিয়া হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের "চাতালের বৈঠক", অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প "আজি হ'তে কিছু বর্ষ পরে" এবং সর্বশেষে মোহিতলাল মজুমদারের "পত্র"। মাসিকের প্রথম সংখ্যার ইহাই সূচী। বলা বাহুল্য, "আধুনিক বাংলা সাহিত্য" ও "পুরুষসিংহম্" ছাড়া বাকি সবগুলিই বেনামী রচনা। মোট চৌষট্টি পাতা, মূল্য দুই আনা। কর্মাধ্যক্ষ শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, ঠিকানা—৯১ আপার সারকুলার রোড (প্রবাসী আপিসের ঠিকানা)। প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ছিল চার পাতা—

তিন পাতা মলাটের এবং এক পাতা ভিতরের। বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন—বেঙ্গল কেমিক্যাল, দি ইণ্ডিয়ান ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং, বুক কোম্পানি ও এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স। এই সংখ্যার মলাটেই ত্রিবর্ণ মুরগির প্রথম আবির্ভাব, মুরগির সঙ্গে মলাটে শনিগ্রহ যুক্ত হন আরও অনেক পরে। গত পঁচিশ বৎসর বহু লোকে বহুবার মুরগির অর্থ সম্বন্ধে আমাকে মুখে ও পত্রযোগে প্রশ্ন করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রতীক, দীর্ঘ নিশাবসানে প্রত্যূষের আভাস ইত্যাদি নানা গুরুগম্ভীর ও মুখরোচক ব্যাখ্যা দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার কোনটিই সত্য হইত না। আসল লক্ষ্য ছিল স্বরাজ্য পার্টি, এবং আদর্শ ছিল তদানীন্তন বাঙালী প্রেমিক সম্প্রদায়ের "যাও পাখি বোলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে"-বয়েৎ মুদ্রিত চিঠির কাগজ। মোটের উপর ইহা ছিল আমাদের নিছক ছেলেমানুষী খেয়াল। বাজার-প্রচলিত চিঠির কাগজে ছাপা থাকিত পারাবতের মুখে চিঠি—আমাদের পত্রিকার নাম যখন 'শনিবারের চিঠি' তখন তাহারও বাহক দরকার, মুরগির চাইতে ভাল বাহন তখন আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই। মুরগির গলায় স্বরাজ্য মেলব্যাগ ঝুলাইয়া দেওয়া হইল, এবং আধুনিক সাহিত্যিক প্রেমিকের হস্তধৃত চিঠিতে লেখা হইল, "যাও পাখি বোলো তারে।" চিত্রকর তখনকার বিখ্যাত কার্টুনিস্ট বিনয়কৃষ্ণ বসু। ভিতরের প্রথম পাতায় 'কল্লোল'-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের আঁকা সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র সেই চাবুক-মার্কা ছবি। ইহাই মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যার মোট পরিচয়।

শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্ম" প্রবন্ধটি ছিল নৈর্ব্যক্তিক, অর্থাৎ লক্ষ্য অলক্ষ্য কাহারও নাম ছিল না, ছিল নিত্য-সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্বের কথা। তাহাতেই শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বিচলিত হইয়া ভাদ্রের 'বিচিত্রা'য় গুরুতর প্রতিবাদ জানাইলেন ("সাহিত্য-ধর্মের সীমানা"), কিন্তু ভাদ্রের 'শনিবারের চিঠি'তে আমার প্রবন্ধে অনেকগুলি নাম একসঙ্গে কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভীরু শরৎচন্দ্র প্রমাদ গনিলেন, বিশেষ করিয়া নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিমত আমি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলাম দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন। তাড়াতাড়ি সামলাইবার জন্য আশ্বিনের 'বঙ্গ-বাণী'তে (১৩৩৪) "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ফাঁদিয়া বসিলেন। ফাঁদাই বটে কারণ প্রবন্ধটি "ধরি মাছ না ছুঁই পানি"-প্রবাদের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহা তাঁহার 'স্বদেশ ও সাহিত্য' পুস্তকে তাঁহার জীবৎকালে মুদ্রিত হইয়াছে, যে কেহ পড়িয়া বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। গোড়ার অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং পরবর্তী সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উক্ত ধর্মের সীমানা নির্দেশ করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাভরে কবির উদাহরণগুলিকে রূপক এবং যুক্তিগুলিকে সবিনয়ে রস-রচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উভয়ের মতদ্বন্দ্ব ঘটিয়াছে প্রধানত আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া।

ইতিমধ্যে বিনা দোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেশ-চন্দ্রের বিরুদ্ধ দলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে আমার মতামত এমনি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, ঢোক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছলাইয়া পালাইবার আর পথ রাখেন নাই। একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

এদিকে বিপদ হইয়াছে এই যে, কালক্রমে আমারও দুই-চারি জন ভক্ত জুটিয়াছেন; তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন্ কম? দাও না তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।

আমি বলি, সে যেন দিলাম, কিন্তু তার পরে? নিজে যে ঠিক কোন্ দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তা ছাড়া ওদিকে নরেশবাবু আছেন যে। তিনি শুধু মস্ত পণ্ডিত নহেন, মস্ত উকিল।"

ইহা শরৎচন্দ্রের নিছক ব্যঙ্গোক্তি নহে, সকল সাধু ব্যক্তির ন্যায় তিনিও উকিলের জেরাকে অতিশয় ভয় করিতেন—মস্ত উকিলের তো কথাই নাই। হাওড়া টাউন হলেরও সেই "আমাদেরও ধরবে না কি হে?" এই ভয়েরই প্রকাশ। তাঁহার ব্যাঘ্রভীতি যতই থাকুক, সত্য কথা এই যে আমি তাঁহাকে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিই নাই। তিনি নরেশচন্দ্রের রচনাকে কখনই অনবদ্য জ্ঞান করিতেন না, তর্কের ঝোঁকে হঠাৎ বিড়ালকে বাঘ কল্পনা করিয়া বসিলেন।

ফলে কোলাহল জমিয়া উঠিল। আমার বয়স তখন অল্প, এই বিবদমান সম্প্রদায়ের সর্বকনিষ্ঠ আমি। আমার স্বভাবত গরম রক্ত আরও গরম হইয়া উঠিল, আমি প্রবল বেগে তাঁহাকেই আক্রমণ করিলাম। দুঃখের বিষয়, আমাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা তখন খুবই বাড়িয়াছে; আমরা অর্থাৎ অশোক চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ ও আমি ঘন ঘন ট্রেনযোগে ও পদব্রজে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়-পানিত্রাস-ভবনে যাতায়াত করিতেছি এবং যে শরৎচন্দ্রের মূল বাংলা রচনা নৈতিক কারণে একদা 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় স্থান পায় নাই, তাঁহারই গল্পের অশোক চট্টোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজী অনুবাদ

সাদরে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেছি। পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পুত্র করিতেছেন। ঠিক এই গভীর মিলনাত্মক দৃশ্যে বিচ্ছেদের ছায়াপাত হইল। সমালোচনার নামে আমি শরৎচন্দ্রকে মর্মান্তিক আঘাত দিলাম। সে আঘাতের কথা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সম্ভবত ভুলিতে পারেন নাই, পারিলেও আমি তাহা জানিতে পারি নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি তাঁহার মৃত্যুর পর একাধিক বার।

শুধু আর একবার তাঁহার স্নেহস্পর্শ পাইয়াছিলাম। ঘটনাটি আকস্মিক। আমার মনের মণিকোঠায় সেদিনের স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া আছে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাঁকুড়া শহরে মায়ের মৃত্যু হইয়াছিল। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আমি মায়ের শ্রাদ্ধে বাঁকুড়া যাইতেছিলাম। কাছা গলায় খালি পায়ে হাওড়া স্টেশনে বাঁকুড়াগামী ট্রেনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ কে যেন আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, সেকেণ্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার একজন। আগাইয়া গিয়া বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলাম—স্বয়ং শরৎচন্দ্র। প্রশ্ন করিলেন, কোথায় চলেছ? আমার সেই বেশ নিশ্চয়ই তাঁহার স্নেহের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিল। সমস্ত নিবেদন করিলাম। তিনি সস্নেহে আমাকে তাঁহার কামরায় আহ্বান করিলেন। আমি সবিনয়ে আমার নিম্নশ্রেণীর টিকিটের কথা জ্ঞাপন করাতে তিনি একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন, বেশি ভাড়া দেওয়া যাবে, তুমি এস। আমার সঙ্গে বন্ধু সুবলচন্দ্র ও অজিতনারায়ণ শ্রাদ্ধে যোগদানের জন্য বাঁকুড়া যাইতেছিলেন। তাঁহাদিগকে জানাইয়া আমি ঘণ্টা দুয়েকের জন্য শরৎচন্দ্রের সহযাত্রী হইলাম—দেউলটি পর্যন্ত।

সেই শ্রাবণ শেষের বর্ষণমুখর একটি রাত্রি। সশব্দে ট্রেন চলিতেছে—বি. এন. আর,এর ট্রেন। শরৎচন্দ্র কথা বলিতেছেন, আমি নির্বাক শ্রোতা হইয়া বসিয়া আছি। বাংলা দেশের কোথায় সদ্য একটা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর বেদনার উত্তেজনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার একটি কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, আমি না বলিলে এ কথা আর কাহারও জানা সম্ভব নয়। তিনি কম্পিত গাঢ়কণ্ঠে বলিলেন, দেখ, ধর্মটা বড় নয়, বড় হইতেছে মনুষ্যত্ব, ধর্ম রাখিতে গিয়া আমরা অমানুষ হইয়া পড়িয়াছি। যদি বাংলা দেশের সমস্ত হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াও মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে পারে, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তাহাদের প্রতিদিনকার এই হীনতা-বরণ আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তিনি এই প্রসঙ্গে যে সকল অভিজ্ঞতা-প্রসূত দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণে আছে, কিন্তু

প্রকাশ করিবার উপায় নাই। সেদিন সাহিত্য সম্পর্কে একটিও কথা হয় নাই। বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ বিষয়ে এই জটিল সমস্যাই দেউলটি পর্যন্ত তাঁহার ভাবপ্রধান চিত্তকে অধিকার করিয়া ছিল। ইহার পর তিনি দীর্ঘ সাড়ে সাত বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার সহিত আর কোনও উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার ঘটে নাই।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

সংগ্রাম

মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত মাসিক 'শনিবারের চিঠি'ও ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত হইল। বালক অভিমন্যুও তাহাকে বলা চলে। 'কল্লোল' 'কালি-কলম' 'প্রগতি' 'ধূপছায়া' 'উত্তরা' চোখা-চোখা অস্ত্র লইয়া মার্-মার্ করিয়া আসিল; শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্র-রাধাকমল প্রমুখ সপ্তরথীও এই কৌরব-অক্ষৌহিণীর সঙ্গে যোগ দিলেন। কুরুক্ষেত্র জমিয়া উঠিল। সেদিন অভিমন্যু-বধ সম্ভব হয় নাই শুধু এই কারণেই যে, কৌরব-অক্ষৌহিণী সমবেত ভাবেও অভিমন্যুর সমকক্ষ ছিল না এবং সপ্তরথীরও কৌরবপক্ষে আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল না। অন্তত শরৎচন্দ্রের যে ছিল না, তাহার প্রমাণ 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্মে"র প্রতিবাদে লিখিত "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" প্রবন্ধেই আছে—

> "...কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দুটি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে এইটেই হইল আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক ইহাই হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন। নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহার সীমা নির্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার আছে নাকি যে ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর, অপরের হাতে তাহাই কদর্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু এ সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] আসল উপদেশটি সকল সাহিত্যসেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত।"

আসলে ইহাই হইল শরৎচন্দ্রের অন্তরের কথা। কিন্তু তিনি তর্কের ভান

করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পরিহাস করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই, কোনও কারণে সাময়িকভাবে তিনি কবিগুরুর প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। শরৎচন্দ্রের আসল মনের কথাটা বাদ দিয়া আমি তাঁহার ধানাই-পানাই লইয়াই তাঁহাকে এই বলিয়া আঘাত করিলাম—

> মনস্তত্ত্ববিদেরা এক প্রকার কম্‌প্লেক্স-এর কথা উল্লেখ করেন, যাহার প্রভাবে পড়িয়া লোকে বিনা প্রয়োজনে মিথ্যা কহে। মিথ্যা বলিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত কোনও লাভ নাই, তবু মিথ্যা বলিবার লোভ তাহারা সংবরণ করিতে পারে না। আইন-আদালতে এই শ্রেণীর মিথ্যা সাক্ষী অনেক দেখা যায়, সাহিত্যের আদালতেও সম্প্রতি দেখা দিয়াছে।

এই আঘাত শরৎচন্দ্র সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি আমার প্রতি এমনই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পরবর্তী কালে যত্রতত্র আমাকে পাগল বলিয়া অভিহিত করিয়া মনের ঝাল মিটাইতেন। তাঁহার ভক্ত শ্রীঅবিনাশ-চন্দ্র ঘোষাল-সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘বাতায়ন’ পত্রে তাঁহার এই উক্তি একাধিক বার প্রচারিত হইয়াছে—আমি বিশ্বাস করি নাই, ব্যক্তিগত আক্রোশে শরৎচন্দ্র এতখানি আত্মবিস্মৃত হইতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীঅতুল বসুর মুখে যখন সেই কথাই শুনিলাম, তখন আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। ১৯৩৪ সনে শ্রীঅতুল বসু তেলরঙে আমার একটি পোর্ট্রেট আঁকেন। কলিকাতা যাদুঘরে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীতে উহা প্রদর্শিত হয়। শরৎচন্দ্র প্রদর্শনী দেখিতে দেখিতে আমার ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তাহা নিরীক্ষণ করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান শিল্পী অতুল বসুকেই বলেন, “দেখেছ, লোকটার চোখে পাগলের দৃষ্টি, একেবারে পাগল! হবে না, ওর মা যে পাগল ছিলেন!” আশ্চর্য, আমার মায়ের মূর্ছারোগ যে শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্করোগে পরিণত হইয়াছিল শরৎচন্দ্র সে খবরও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিস্মিত হইবার কারণ এই যে, প্রায় ঠিক এই সময়েই আমি তাঁহার নিকট স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানির হইয়া বই বেচিতে গিয়া সবিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় আমি ‘বঙ্গশ্রী’র চাকুরিতে ইস্তফা দিই। শ্রীপরিমল গোস্বামী তখন ‘শনিবারের চিঠি’র বেতনভোগী সম্পাদক, এবং আমারই মত অসহায়। তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিতে মন সরে না, অথচ অন্নসংস্থানের অন্য উপায়ও জানা নাই। শ্রীনিখিল দাস স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানির নামকরা সেল্‌স্‌ম্যান, আমি এক সময় তাঁহার একজন বড় ক্রেতা ছিলাম, পরে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

তিনি ভরসা দিলেন, কুচ পরোয়া নাই, দুই জনে বই বেচিয়া কমিশন ভাগাভাগি করিয়া লইব ; একসঙ্গে খাটিলে আয় মন্দ হইবে না। আমি তখন নিমজ্জমান, যে কোনও কুটাই আমার হস্তধার্য। সুতরাং নিখিল দাস সজনী দাস—দুই দাসে মিলিয়া দাস অ্যাণ্ড কোং প্রতিষ্ঠিত হইল, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ-স্থিত "ভারত-ভবনে" একটি কামরা ভাড়া লইয়া রীতিমত সাহেবী মেজাজের অফিস হইল, টেলিফোন হইল। নিখিলদার একখানা মোটরকার ছিল, নানা কারণে তিনি তাহা নিজেই চালাইতেন, কখনও ড্রাইভারের সাহায্য লইতেন না। আপিস তালাবদ্ধ করিয়া দুই দাসে শিকারে বাহির হইতাম। দিনান্তে আপিসে ফিরিয়া চা-চুরুট খাইতে খাইতে যখন হিসাব খতাইতাম, আমার চারিদিকে চা-চুরুটের ধূম্রজালের সঙ্গে ভাবনার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত। যাহা হউক, একদিন দুই জনে মিলিয়া শরৎচন্দ্রকে তাঁহার অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে বধ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে পাইয়া বিশেষ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। সেই আস্ত রেঙ্গুন লাইব্রেরী গিলিয়া খাওয়ার গল্প আরও সরস করিয়া বলিলেন এবং এক সেট বহুমূল্য বিজ্ঞানের বই নগদ দামে খরিদ করিয়া আমাদের বিদায় দিলেন। সেদিন স্নেহবিগলিত শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরে শ্রীঅতুল বসুর নিকট পূর্বোক্ত কাহিনী শুনিয়া আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, পাগলকে সর্বরকমে তুষ্ট করিয়া ভয়ে ভয়ে সেদিন বিদায় করেন নাই তো ! জবাব দিবার জন্য শরৎচন্দ্র তখন আর ছিলেন না।

যৌবনের উত্তেজনা বড় ভয়ঙ্কর, শক্তির উন্মাদনাও কম ভয়ঙ্কর নয়। আমরা একে একে প্রখর ব্যঙ্গে সপ্তরথীকে ধরাশায়ী করিতে লাগিলাম। এই কালের 'শনিবারের চিঠি' যাঁহারা দেখিবার সুযোগ পাইবেন তাঁহারাই লক্ষ্য করিবেন, কি প্রচণ্ড বিস্ফোরণই না আমরা মাত্র তিন-চার জনে ঘটাইয়াছিলাম ! আমরা কয়েক জন একক, 'শনিবারের চিঠি' একা—বিরুদ্ধ পক্ষে বড় বড় মহারথী, একুনে সাতাশটি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র। চারিদিকে "ত্রাহি ত্রাহি" রব উঠিয়াছিল ; সেকালের "অতি-আধুনিক" ও আধুনিকত্বের সমর্থক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা খুলিলেই ইহার পরিচয় মিলিবে।

একমাত্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের পক্ষে ছিলেন। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁহার 'কল্লোল যুগে' অনবধানতা অথবা বিস্মৃতি-বশত রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে কিছু ভুল সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। আমিই রবীন্দ্রনাথকে তৎকালীন সাহিত্যের অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলাম—ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ "সরাসরি খারিজ ক'রে

দিলেন আর্জি।” আমার আবেদনের দুই-তিন মাসের মধ্যেই তিনি যে “সাহিত্য-ধর্ম” প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, আমার আবেদন-পত্র ও তাঁহার জবাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতি-পত্র ‘কল্লোল যুগে’ পুনর্মুদ্রিত করিয়া সেই সত্য স্বীকার করা সত্ত্বেও “আর্জি খারিজ” করার কথা অন্তত তাঁহার লেখা উচিত হয় নাই।

সত্য কথা এই যে, আমার আবেদনের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথের “সাহিত্য-ধর্ম” প্রবন্ধ ঠিক আণবিক বোমার মত নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ১৩৩৪ সালের ১লা শ্রাবণ ‘বিচিত্রা’য়। বোমা নিক্ষেপ করিয়া তিনি মালয় ভ্রমণে চলিয়া যান, ফিরিয়া আসেন কার্তিকের মাঝামাঝি। তাঁহার আরও মারাত্মক বোমা “সাহিত্যে নবত্ব” ১৯২৭ সনের ২৩শে আগস্ট ‘প্রানসিউস’ জাহাজে নির্মিত হইয়া অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ ‘প্রবাসী’র “যাত্রীর ডায়ারি” শিরোনামায় নিক্ষিপ্ত হয়। তাহাতে তিনি লেখেন—

> “শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল ক’রে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গীতে কেবল জলের নীচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুরাই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধি গতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব’লেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক’রে রাখে। বিলিতী পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি ক’রে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে,—লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে—অপটু লেখকদের পাকশালায় সেই-গুলো হচ্ছে ‘রিয়ালিটির কারি-পাউডর।’ ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম।”

হিরোশিমার পরে নাগাসাকি: “সাহিত্য-ধর্মে” আহত আধুনিক সাহিত্যিকেরা “সাহিত্যে নবত্বে”র আঘাতে মর্মাহত হইলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকেই সভা আহ্বান করিতে হইল তাঁহার জোড়াসাঁকোর “বিচিত্রা-ভবনে”। কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহার অপরাধ আরও গুরুতর হইয়া উঠিল ২৩ পৌষ ১৩৩৪ তারিখে লেখা তাঁহার একখানি

পত্র 'শনিবারের চিঠি'র মাঘ (১৩৩৪) সংখ্যায় মুদ্রিত হইবার ফলে। পত্রটি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত। ইহাতে 'শনিবারের চিঠি'র ও আধুনিক তরুণদের সাহিত্যিক মামলার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

> "শনিবারের চিঠি"তে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে। আর্ট পদার্থের একটা গৌরব আছে—তার পরিপ্রেক্ষিত খাটো করলে তাকে খর্বতার দ্বারা পীড়ন করা হয়। ব্যঙ্গসাহিত্যের যথার্থ রণক্ষেত্র সর্বজনীন মনুষ্যলোকে, কোনো একটা ছাতাওয়ালা-গলিতে নয়। পৃথিবীতে উন্মার্গযাত্রার বড়ো বড়ো ছাঁদ, type আছে, তার একটা না একটার মধ্যে প্রগতিরও গতি আছে। যে-ব্যঙ্গের বজ্র আকাশচারীর ... তার লক্ষ্য এই রকম ছাঁদের 'পরে !···
>
> তারুণ্য নিয়ে যে-একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখতে দেখতে মাসিক-সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে পড়ল এটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো আধো কথা কয় সেটা ভালোই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো আধো কথা নিয়েই গর্ব ক'রে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় "আমি কচি খোকা", তখন বুঝতে পারি কচি ডাব অকালে ঝুনো হয়ে উঠেচে। তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার একটা স্থান আছে। স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেইটেকে নিয়ে যখন সে স্থানে-অস্থানে বাহাদুরি ক'রে বেড়ায়, 'আমরা তরুণ, আমরা তরুণ' ক'রে আকাশ মাত ক'রে তোলে, তখন বোঝা যায় সে বুড়িয়ে গেছে, বুড়ো-তারুণ্যের অজ্ঞানকৃত প্রহসনে হেসে উঠে জানিয়ে দিতে হবে যে, এটাকে আমরা মহাকালের মহাকাব্য ব'লে গণ্য করি নে। চিরকাল দেখে এসেচি তরুণ জ্বর নিজেকে তরুণ ব'লে কম্পান্বিত ক'রে দেখায়, তরুণ স্বাস্থ্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলেই থাকে।—আজকাল তারুণ্য হঠাৎ একটা কাঁচা রোগের মতো হয়ে উঠল, সে নিজেকে ভুলচে না, এবং পাড়াসুদ্ধ লোককে চব্বিশ ঘণ্টা মনে করিয়ে রাখচে যে, সে টন্‌টনে তরুণ, বিষফোড়ার মতো দগদগে তার রঙ। শুধু তাই নয়, তরুণরা যে তরুণ, বুড়োদের অধ্যাপকপাড়া থেকে তার প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা চলচে। এর মধ্যে কৌতুকের কথাটা হচ্চে এই যে, তারুণ্যটা হ'ল বয়সের ধর্ম, ওটা স্বভাবের নিয়ম,—ওটার জন্য রুষীয় সাহিত্যশাস্ত্র থেকে নোট মুখস্থ ক'রে কাউকে এগজামিনে পাস করতে হয় না,—বিধাতার

বিধানে ঐ বয়সটাতে মানুষ আপনিই আসে। কিন্তু আজকালকার দিনে তারুণ্যের বিশেষ ডিগ্রীধারীরা নিজেদের দুঃসহ তরুণতা সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের থীসিস্ লিখতে শুরু করেচে। তারা বলচে, আমরা তরুণ-বয়স্ক ব'লেই সবাই আমাদের সমস্বরে বাহবা দাও,—আমরা যুদ্ধ করেচি ব'লে না, প্রাণ দিয়েচি ব'লে না, তরুণ বয়সে আমরা যা-ইচ্ছে-তাই লিখেচি বলে। সাহিত্যের তরফে বলবার কথা এই যে, যেটা লেখা হয়েচে সাহিত্যের আদর্শ থেকে হয় ভালো নয় মন্দ বলব, কিন্তু তরুণ বয়সে লেখার একটা স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়া করতে হবে এ তো আজ পর্যন্ত শুনি নি।…এখন থেকে লেখকদের কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে লেখার ভালোমন্দ ঠিক করতে হবে? কোনো তরুণবয়স্কের লেখার নির্লজ্জতাদোষ ধরলে নালিশ উঠবে যে, সেটাতে কেবলমাত্র লেখার নিন্দা করা হ'ল না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত তরুণ আছে সবাইকেই গাল দেওয়া হ'ল! যা হোক, আমার বক্তব্য এই যে, যথার্থ সাহিত্যের হাসি বিরাট, দূরগামী।…ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আর্টের দাবি আছে। 'শনিবারের চিঠি'র অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান,—নব-নব হাস্যরূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়।"

গোটা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ ব্যাপিয়া প্রকাশ্যভাবে অর্থাৎ বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ধনুর্ধরদের লইয়া এত যে সব কাণ্ড ঘটিয়া গেল 'কল্লোল যুগের' লেখকের তাহা না-জানিবার কথা নয়; তিনি নিজেই বিশিষ্ট ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই আশ্চর্য হই যখন দেখি, তাঁহার গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন—

"সব চেয়ে লাঞ্ছনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। সে এক হীনতম ইতিহাস। 'শনিবারের চিঠি'র হয়তো ধারণা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের উপর সম্পূর্ণ বীতরাগ নন—তাঁরই প্রশংসার আশ্রয়ে তারা পরিপুষ্ট হচ্ছে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিচিত্রাভবনে যে বিচার-সভা বসে তা উল্লেখযোগ্য।…দু দিন সভা হয়েছিল। অপূর্ব ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেটি 'সাহিত্যধর্ম' নামে ছাপা হ'ল 'প্রবাসী'তে।…এই 'সাহিত্যধর্ম' নিয়েও তর্ক ওঠে। শরৎচন্দ্র প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখেন 'বঙ্গবাণী'তে—'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শরৎচন্দ্রকে সমর্থন করেন।"

'কল্লোল যুগে'র ইতিহাস-অংশের ইহাই স্বরূপ ! জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা-ভবনে" সভা অনুষ্ঠিত হয় ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র ১৩৩৪, শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় ('প্রবাসী'তে নয়) "সাহিত্য-ধর্ম" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার ঠিক আট মাস পরে ; শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্রের প্রতিবাদও ততদিনে পুরাতন হইয়া বিস্মৃতির পর্যায়ভুক্ত। আমাদের আপত্তি করিবার কিছু নাই ; সময়ের পারম্পর্য রোমান্টিক স্মৃতিকথায় অতি সহজেই গুলাইয়া যায়।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত নজির ছাড়াও আমাদের নিজস্ব কিছু নজির আছে, যদ্দ্বারা আমরা জানি, আধুনিকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সত্য মনোভাব কি ছিল। "হয়তো ধারণা হয়েছিল" এইরূপ উক্তির কোনও অবকাশ কোন দিক দিয়াই নাই। ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ ২৮শে কার্তিক ১৩৩৪ (১৫ নবেম্বর ১৯২৭) শান্তিনিকেতন হইতে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি এই—

"কল্যাণীয়েষু—

তোমার বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে বড় বড় মহামহোপাধ্যায়দের পণ্ড পাণ্ডিত্যের বর্মচ্ছেদন যখন করো তখন তার মধ্যে একটা মহাকাব্যিক মহিমা দেখতে পাই—তাতে খুশি হই—কিন্তু তোমাদের 'শনিবারের চিঠি'র সমরাঙ্গণে আহতদের মধ্যে কোনো নারীকে ধরাশায়িনী দেখলে আমার মন অত্যন্ত কুণ্ঠিত না হয়ে থাকতে পারে না—তারা অপরাধিনী হ'লেও। নারীদের প্রতি পুরুষ-স্বভাবের অন্তর্গূঢ় করুণাই তার একমাত্র কারণ নয়—আরো একটা কারণ আছে। তোমাদের হাতে মার খেয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকের যে লজ্জা সেটা সাহিত্যিক লজ্জা,—কিন্তু মেয়েদের লজ্জা তার উপরে আরো বেশি, সেটা সামাজিক। সিভিল ক্রিমিন্যাল দুই আদালতেই তাদের দণ্ড। শাস্তির পরিমাণে এই যে অসাম্য এতে আমাকে বাজে। তার পরে ভেবে দেখো, বৈদিক মন্ত্রে বলেচে 'ছায়েবানুগতা', ওরা যদি দোষ ক'রে থাকে তবে সেটা পুরুষের অনুবর্তী হয়ে। এ স্থলে স্থূল বস্তুটাকে আঘাত ক'রে যদি পেড়ে ফেলতে পারো তা হ'লে ছায়ার টিকি দেখা যাবে না। অনেক সময় স্থূল বস্তুর চেয়ে ছায়াকে দীর্ঘতর দেখতে হয়—মেয়েদের অপরাধ তেমনি পরিমাণে বেশি বড়ো ব'লে মনে হয়, কিন্তু তবুও সেটা ছায়া। সহধর্মিণীর সহধর্মিতার জন্যে দোষ দিয়ে কি হবে, আগে আগে যে দুঃসহধর্মীটা চলে, চেপে ধরো তাকে। তোমাদের শনির সম্বন্ধে রবির এই বক্তব্যটা চিন্তা ক'রে দেখো। ইতি ২৮শে কার্তিক ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, আমরা কার্তিক সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'র "মণি-মুক্তা" বিভাগে কোনও মহিলা-লেখিকার গল্প হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সামাজিক লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে 'শনিবারের চিঠি'তে আধুনিক সাহিত্য-প্রসঙ্গে কিছু লিখিতে আহ্বান করিলাম। চার-পাচ দিনের মধ্যেই তাঁহার জবাব পাইলাম—

"কল্যাণীয়েষু—

দোহাই তোমাদের, 'শনিবারের চিঠি'তে আমাকে টেনো না। নিজে যদি সাহিত্যিক না হতুম তা হ'লে তোমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজি হতুম—কেন না আমার পক্ষে এটা ক্যানিবলিজ্‌ম্ দাঁড়ায়। 'প্রবাসী'তে এবার যেটা লিখেচি ["সাহিত্যে নবত্ব"] সেটাতেও হয়তো অনেকের গায়ে বাজবে—কারণ গায়ের শিরগুলো অনেকেরই টন্‌টনে হয়ে রয়েছে। যৌবনের তীব্রতা গিয়ে অবধি আমার কলম প্রায় জৈনমতে চলতে চায়; এখন সময় অল্প ব'লেই সেই সঙ্কীর্ণ সময়টার গায়ে রক্তের দাগ লাগাতে সঙ্কোচ হয়—ধুয়ে ফেলবার অবকাশ পাব না। অল্প কটা দিন আছে—শেষ ব্যবহারের জন্যে স্বচ্ছ রাখতে ইচ্ছা করে। তোমার হ'ল সার্জিকাল ডিপার্টমেণ্ট, আর আমার আরোগ্য-স্নানের মহল। তোমার বয়স যদি পেতুম তোমার ব্রতে যোগ দেওয়া সহজ হ'ত। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

ঈস্টইণ্ডিজ ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম করিতে-ছিলেন—শুধু বিশ্রাম নয়, তাঁহার বিচিত্র গানে গানে ঋতুরঙ্গশালা মুখর হইয়া উঠিতেছিল। কলিকাতার সাহিত্য-প্রাঙ্গণে যে কোলাহল আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, যাহা আসলে আমাদের আহ্বান ও তাঁহার উত্তর "সাহিত্য-ধর্মে"রই জের, তাহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা তাঁহাকে পত্রাঘাত করিতেছিলাম তর্কের কোলাহলে নামিতে নয়, সম্পূর্ণ দলাদলি-নিরপেক্ষভাবে চিরন্তন সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে। তিনি লিখিলেন—

"কল্যাণীয়েষু,

চেষ্টা করব কিন্তু কি রকম ব্যস্ত হয়ে আছি, তা তোমরা ঠিক বুঝতে

পারবে না। এর ওপরে হিবর্ট লেকচার এখনো লিখতে বসতে পারি নি ব'লে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে।

তর্ক-বিতর্কের যে ঘোরতর আন্দোলন চলচে তাতে আরো ঠেলা মারতে ইচ্ছে করে না। আমাকে তো সবাই মিলে বরখাস্ত ক'রে দিয়েচে, যদি না জানতুম যে তরুণেরা চতুর্মুখের মুখোশ প'রে আমাকে ভয় দেখাচ্চে তা হ'লে তো মুখ শুকিয়ে যেত। কিন্তু এদের এই সমস্ত পিতামহগিরি নিয়ে যে পেট-ভরে হাসব তারো সময় আমার নেই— চতুর্মুখ বোধ হয় এই সমস্ত নকল বিধাতাদের উদ্দাম ভঙ্গী দেখে স্বয়ং হাসচেন, তাঁর কাছে তো অগোচর নেই এদের আয়ু কতদিনের। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

ইহার পরই তিনি কলিকাতায় আসিলেন এবং আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি মত "বিচিত্রা-ভবনে" সভা আহ্বান করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, চৈত্র মাসের ৪ঠা ও ৭ই দুই দিন এই সভা বসিল। প্রথম দিন আমরা উপস্থিত ছিলাম না। ৬ই চৈত্রের 'বাংলার কথা' নামক দৈনিকে প্রথম দিনের সভার এক সম্পূর্ণ কল্পিত মিথ্যা বিবরণী প্রকাশিত হওয়াতে রবীন্দ্রনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠেন। বলা বাহুল্য, এই বিবরণী অতি-আধুনিকদের রচিত। তিনি সুতরাং পরদিন ৭ই চৈত্র আবার সভা ডাকেন, উভয় পক্ষই সদলবলে এই সভায় উপস্থিত হই। রবীন্দ্রনাথ রিপোর্টারদের আর বিশ্বাস না করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় দুই দিনের সভার বিবরণ স্বয়ং লিখিয়া দেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখের ও জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে সেগুলি যথাক্রমে "সাহিত্যরূপ" (পৃ. ১২২-১২৯) ও "সাহিত্য-সমালোচনা" (পৃ. ২২২-২২৭) শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার কাহিনী অচিন্ত্যকুমারের কতখানি স্বকপোলকল্পনাপ্রসূত, এই দুইটি বিবরণীতেই তাহার প্রমাণ আছে, আমাদের নিকট লিখিত চিঠির প্রমাণ অধিকন্তু। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য দুইটি প্রবন্ধ হইতেই কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি—

"সম্প্রতি সাহিত্যের 'যুগ' 'যুগান্তর' কথাটার উপর অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দিতে আরম্ভ করেছি। যেন কালে কালে 'যুগ' ব'লে এক-একটা মৌচাক তৈরি হয়, সেই সময়ের বিশেষ চিহ্নওয়ালা কতকগুলি মৌমাছি তাতে একই রঙের ও স্বাদের মধু বোঝাই করে,—বোঝাই সারা হ'লে তারা চাক ছেড়ে কোথায় পালায় ঠিকানা পাওয়া যায় না, তার 'পরে

আবার নতুন মৌমাছির দল এসে নতুন যুগের মৌচাক বানাতে লেগে যায়। সাহিত্যের যুগ বলতে কি বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কয়লার খনির বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে লিখলেই কি নবযুগ আসে? এই রকমের কোনো-একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায় এ কথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিস আর কিছু নেই।"—"সাহিত্যরূপ," 'প্রবাসী', বৈশাখ ১৩৩৫, পৃ. ১২৫।

'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনা-নৈপুণ্যেরও আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি; তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করবার উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্যের প্রমাণ হবে। সাহিত্য-সংস্কারকার্যে তাঁদের কর্তব্যের ক্ষেত্র আছে—কিন্তু কর্তব্যটি অপ্রিয় ব'লেই এই ক্ষেত্রের সীমা তাঁদেরকে একান্ত ভাবে রক্ষা করতে হবে। অস্ত্র-চিকিৎসায় অস্ত্রচালনার সতর্কতা অত্যন্ত বেশি দরকার, কেন না, আরোগ্য-বিধানই এর লক্ষ্য, মারা এর লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের চিকিৎসাই 'শনিবারের চিঠি'র লক্ষ্য, এই কারণেই এই লক্ষ্যের একটু মাত্র বাইরে গেলেও তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে। চিকিৎসকের পক্ষে অস্ত্রচালনার কৌশলই একমাত্র জিনিস নয়, প্রতিপত্তিও মহামূল্য। সেই প্রতিপত্তি রক্ষা ক'রে 'শনিবারের চিঠি' যদি কর্তব্যের খাতিরে নিষ্ঠুরও হন তাঁকে কেউ নিন্দা করতে পারবে না। যাঁদের শক্তি আছে তাঁদের কাছেই আমরা যথাস্থানে ক্ষান্তি দাবি করি।"—"সাহিত্য-সমালোচনা," 'প্রবাসী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ. ২২৭।

'কল্লোল যুগে'র ঐতিহাসিকের যদি এই তথ্যগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে তিনি "সাহিত্য-ধর্ম" ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ও 'শনিবারের চিঠি'র বিরোধ-প্রসঙ্গ অত ফলাও করিয়া প্রচার করিতে ইতস্তত করিতেন; 'কল্লোল যুগ' নামটা সম্বন্ধেও তাঁহার সঙ্কোচ আসিত। তবে কবি অচিন্ত্য-কুমারের যদি এই আত্মবিশ্বাস থাকে—সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে, তাহা হইলে আমরা নাচার।

১৩৩৪, চৈত্রের 'কল্লোলে' (পৃ. ১৪৩-৪৫) সম্পাদককে লিখিত "কশ্চিৎ মৃত-জীবিত বৃদ্ধের" এক "পত্র" প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহাতে আসল ইতিহাসের আভাস আছে। সম্পাদক মহাশয় ইহা পত্রস্থ করিয়াছেন, কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। বৃদ্ধ বলিতেছেন—

"আপনারা এমন কিছুই ভাল লেখেন নি যাতে সহসা বাংলা-সাহিত্যের একটা নতুন দিক খুলে গেছে—তা হ'লে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অন্তত তাঁর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আপনাদের কোথাও না কোথাও স্বীকার করতেন। কারণ, তিনি বরাবরই বাংলা-সাহিত্যের অথবা রূপকলার যেখানে যা নতুন অভ্যুদয় হয়েছে, তাকেই আপনার উদার স্নেহস্পর্শে ধন্য করেছেন—তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথে মঙ্গলআশিসের শুভবাণী বর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়া আপনাদের ওপর নেই, এতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আপনাদের সাহিত্যে অভিনবত্ব কিছুই নেই, থাকলেও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না। বাংলা-সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক লেখা যে আর্ট হয়ে উঠেছে, তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। যথাসময়ে তিনি তাকে যথাভাবে স্বীকারও করেছেন।"

আরও একটি সমসাময়িক সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া এই প্রসঙ্গের ইতি করিতেছি। সাক্ষী 'প্রগতি' পত্রিকা—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীঅজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, ঢাকার 'প্রগতি'-বাদী হইলেও উভয়েই কলিকাতার 'কল্লোলে'র দুইটি উত্তাল ঢেউ। সম্পাদকীয় "মাসিকী"তে 'প্রগতি' সেদিন লিখিয়াছিলেন—

"'শনিবারের চিঠি' দেশের লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। করবেই বা না কেন? বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদক যার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যাকে সস্নেহ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করেছেন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা যার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা—সে পত্রিকার কিছুমাত্র মর্যাদা বা মূল্য নেই এ-কথা কেমন ক'রে বলি? 'চিঠি'র লেখকদের রচনাভঙ্গীর চাতুর্য, জ্ঞানের অদ্ভুত বিস্তার, কোনো বিশেষ লিখনভঙ্গী হুবহু অনুকরণ করবার আশ্চর্য শক্তি, হাস্যরসের ওপর অধিকার —এ-সব কাকে না মুগ্ধ করেছে? প্যারডি করায় এঁদের বেশ হাত আছে, কবিতা লিখতে গিয়ে এঁদের ছন্দপতন হয় না, এঁরা অনায়াসে অজস্র লিখতে পারেন, এ-সব গুণ কি উপেক্ষণীয়?"

কিন্তু আসল সত্য কথা হইতেছে এই যে, মাসিক 'শনিবারের চিঠি' সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল সম্পূর্ণ একক, একান্ত আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া। তাহার নিয়মিত লেখকসংখ্যা প্রারম্ভে মুষ্টিমেয়—মোহিতলাল, অশোক, যোগানন্দ ও আমি। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, নীরদ চৌধুরী, গোপাল হালদার প্রমুখ শক্তিমানেরা পরে একে একে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু শুরুতেই এমন প্রবল বিক্রমে আমরা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলাম যে, মনে হইয়াছিল

সপ্তরথীশাসিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মহড়া আমরা লইতে পারিব, অবশ্য জনার্দন রবীন্দ্রনাথ আমাদের পক্ষে আছেন—এই বিশ্বাস আমাদিগকে কম বলীয়ান করে নাই।

প্রথম সংখ্যা মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র পরিচয় দিয়াছি, দ্বিতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র আবার আসিয়া জুটিলেন, এবারেও বিষয় সেই মুসলমানী সাহিত্য—"তারিখ-ই-বাঙ্গালা।" বাংলা দেশের পূর্বতন শাসন-পদ্ধতি আরও পাঁচ শো বছর বজায় থাকিলে কি ঘটিতে পারিত তাহার আভাস এই কল্পিত ইতিহাসে ছিল। আরম্ভটি এইরূপ—

> "এই যে নক্সা দেখিতেছ ইহার নাম বাঙ্গালা মুলুক। এই দেশের উত্তরে পাহাড়, দক্ষিণে সমন্দর, পূর্বে আছাম ও পশ্চিমে বিহার শরিফ। সেকালে এই দেশে হিন্দু নামে এক জাতি বসতি করিত। তাহারা বোত পরস্তি করিত। ইঁট-পাথরের মূরত গড়িয়া তাহাকে ছেজদা করিত। আজ সহর কলিকাতা, যেখানে তোমাদের দেশের বাদশাহ বাস করেন, সেইখানে তাহাদের এক বোত ছিল তাহার নাম কালী। আজ যেখানে বাঁটু জুতাওয়ালার মছজেদ দেখিতে পাইতেছ সেইখানে এই বোতের ঘর ছিল।…"

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী এই মাস হইতেই নিয়মিত আমাদের আসরে যোগ দিলেন ও পরবর্তী কার্তিক সংখ্যার জন্য তিনি কয়েকটি সাহিত্য-প্রসঙ্গ লিখিয়া আনিয়া আমাদিগকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ছাত্র-গৌরবে মোহিতলালের গর্ব ও আনন্দের অবধি ছিল না। নীরদচন্দ্র তখন পর্যন্ত ইংরেজীনবিস ছিলেন, বাংলা লিখিতেন না। মাতৃভাষা-সাধনার প্রথম প্রয়াসই তাঁহার এমন পরিণত রূপ লইল যে, বিস্মিত না হইবার উপায় ছিল না। তিনি "বলাহক নন্দী" এই নামে লেখা ছাপিতে দিলেন। প্রথম কিস্তি "প্রসঙ্গ-কথা" দিয়াই তিনি স্বদেশ কিশোরগঞ্জে (মৈমনসিংহ) গেলেন। কার্তিক সংখ্যা সেখানে ডাকে পাইয়া ২৯. ১০. ২৭. তারিখে আমাকে লিখিলেন (স্বভাবতই ইংরেজীতে)—

"Dear Sajani Babu,

Many thanks for the 'শনিবারের চিঠি' which reached me yesterday. I had thought of waiting till I went back to Calcutta to congratulate you on the excellence of this number, but that is seven days, a good deal too far off

to satisfy me. I cannot rest till I have dropped a few lines to tell you how I enjoyed it all. When I come back would you introduce me to the wonderfully clever writer of the 'Bastabika' [বাস্তবিকা]? Mohit babu had prepared me for the প্রবীণ পুরোহিত and I do think he had not praised it enough. I am glad that you have given an example of forceful plain-speaking in your "সাহিত্য-ধর্ম প্রসঙ্গে". I enjoyed the সংবাদ-সাহিত্য and the "Mani-Mukta" [মণি-মুক্তা] too well to have words adequate for my delight in them...I am writing some more notes about style and language this time.

Yours sincerely

Nirad"

এই কার্তিক সংখ্যা (১৩৩৪) নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের "বাস্তবিকা"-আসরে হরিকুমারের আবির্ভাব ঘটে, নীরদ চন্দ্রের "প্রসঙ্গ-কথা" প্রবর্তিত হয় এবং 'মণি-মুক্তা'র প্রথম সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। "শ্রীসরেস্‌চন্দ্র বেশ লিখচ" বেনামে "প্রবীণ পুরোহিত" সম্পাদক যোগানন্দ দাসের একটি অত্যুৎকৃষ্ট রচনা—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ "স্যাটায়ার"। "সাহিত্য-ধর্ম প্রসঙ্গে"—শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আমার তীব্র আক্রমণ। অর্থাৎ এই সংখ্যা হইতেই সক্ষমভাবে সংগ্রামের আরম্ভ। স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই সংখ্যাতে "আদালৎ-ই-ফানুস-ই-ঘর্মবাণী"তে "সেকেলে কবির একেলে বিচার" নামে 'মানসী-মর্মবাণী'র সাহিত্য-সমালোচনাকে ব্যঙ্গ করিয়া সাহিত্যের লড়াই আরও জমাইয়া তোলেন। মোটের উপর এই কার্তিক মাসেই আমরা তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইলাম।

নীরদচন্দ্র কিশোরগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। "বাস্তবিকা"-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল এবং তিনি ধীরে ধীরে পুরাপুরি ভাবে 'শনিবারের চিঠি'র সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। পরবর্তী মাঘ সংখ্যা হইতে সম্পাদনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁহার উপর বর্তাইল, শ্রীযোগানন্দ দাস সম্পাদকপদ হইতে বিদায় লইলেন। আমি হইলাম কর্মাধ্যক্ষ।

উনবিংশ তরঙ্গ

"সমবেতা যুযুৎসবঃ"

তরুণেরা সেদিন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রৌঢ় বয়স উত্তীর্ণ হইয়া আজিও ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও করিতেছেন যে, 'শনিবারের চিঠি'র অভিযান ছিল অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। কথাটা ঠিক নয়। আমাদের জেহাদ ঘোষিত হইয়াছিল ভানের বিরুদ্ধে, ন্যাকামির বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সৃক্কণীলেহনের বিরুদ্ধে। "সাহিত্যের আদর্শ" সম্বন্ধে আমরা সূত্রপাতেই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলাম—

> "সাহিত্যের যদি কোনও নীতি থাকে—তাহা প্রেম, সৌন্দর্য ও জ্ঞানের নীতি। এই নীতি শাস্ত্রগত নয়, ইহা জ্ঞানবান ও হৃদয়বান হৃদয়ের অন্তরনিহিত নীতি, ইহা লোকব্যবহাররটিত সংস্কার নহে। সাহিত্যও একটি অপূর্ব জ্ঞানযোগ। ইহা মানুষের সমগ্র জীবনের প্রতিবিম্ব—পূর্ণদৃষ্টির সহায়। **সাহিত্য অশ্লীল হইতে পারে না।** যেখানে এই অশ্লীলতার বাধা রসাস্বাদে সত্যকার বাধা হইয়া দাঁড়ায় সেখানে কবির Inspiration বা দিব্যানুভূতিই মিথ্যা—তাহা জাগে নাই; সেখানে তাঁহার ভাবদৃষ্টি অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ।...সাহিত্যই আধুনিক মানবের জীবন-বেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিখিল মানবপ্রাণের অসীম কাকুতি, মানব-চরিত্রের অপার রহস্য, মন্থিত জীবনসিন্ধুর সুধা ও ফেন-গরল—এ সকলই সাহিত্যের অধিকারভুক্ত। এখন কবির দায়িত্বের অবধি নাই। **জীবনের কিছুকেই তিনি বর্জন করিতে পারেন না।** তাঁহাকে সেই প্রেমিক হইতে হইবে, যাঁহার চক্ষে "সকল সলিল তীর্থ-সলিল, জীবের আনন চন্দ্রানন।"...কিন্তু আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে মানুষের স্বরূপ ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবার অজুহাতে তাহার জীব-জীবনের মসীপঙ্ক উদ্ধার করিয়া এক নূতন আদর্শ সৃষ্টির উদ্যম চলিতেছে।...যাহা কিছু সুন্দর তাহারই বিরুদ্ধে ইহাদের আক্রোশ।... মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান যদি দুর্নীতি না হয়,—ভগ্নজানু, বক্রমেরুদণ্ড, বিকলচক্ষু প্রভৃতি যদি শক্তিমত্তার লক্ষণ হয়, তবে শাস্ত্র ও সমাজনীতি বহুগুণে শ্রেয়; সাহিত্যের মুক্তবায়ু অপেক্ষা কারাগৃহের রুদ্ধশ্বাস অধিকতর স্বাস্থ্যকর। যাহাকে বাঁধিয়া রাখা উচিত তাহাকে স্বাধীন করিয়া দেওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নাই। যে ফুল ফুটাইতে পারে না সে গাছ ছিঁড়িয়া বাগান উৎসন্ন করে; যে গান করিতে পারে

না, সে বাদ্যযন্ত্র আছড়াইয়া কোলাহল করে—ধুনুরীর ধুননযন্ত্র বাজাইয়া তুলা উড়াইতে থাকে। সত্য-সুন্দরকে চিনিবার শক্তি যাহার নাই, সে ভানুমতীর ভেল্কী দেখাইয়া রাস্তায় লোক জড় করে।…”—সত্যসুন্দর দাস : ‘শনিবারের চিঠি’, আশ্বিন ১৩৩৪

মোহিতলালের এই অকপট উক্তি যে সেদিনকার চিন্তাশীল বাঙালীকে ‘শনিবারের চিঠি’র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত ও আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহার প্রমাণ—বৎসর শেষ না হইতেই আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পরশুরাম (শ্রীরাজশেখর বসু), শ্রীসুশীলকুমার দে প্রভৃতি খ্যাত-নামা লেখকেরা মাসিকের রঙ্গমঞ্চে পুনরায় অবতরণ করিলেন; রবীন্দ্রনাথ মৈত্র নূতন করিয়া “বাস্তবিকা”র আসর খুলিয়া বসিলেন, এবং শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রথমে লেখক ও পরে সম্পাদকরূপে ইহাতে যোগ দিলেন। আর একজন লেখক আমরা পাইলাম, তিনি শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় “শ্রীউদ্‌ভ্রান্ত পাঠক” এই বেনামীতে তিনি “সাহিত্য-বিকারের প্রতিকার” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলেন, যাহা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিক সমাজকে এবং বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিল। এমন সার্থক তীব্র ব্যঙ্গ যাঁহার হাতে বাহির হইয়াছিল তিনি অনুরূপ আর কিছু লিখিলেন না—ইহা আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হইয়া আছে। আর দুইজন অতি শক্তিমান লেখককে আমি আকর্ষণ করিলাম—একজন, ইঞ্জিনীয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং অন্যজন ডাক্তার লেখক শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বাংলা-কাব্যসাহিত্যের উপর তখন যতীন্দ্রনাথের ‘মরীচিকা’র অত্যন্ত প্রভাব। তরুণেরা এমন কথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, যতীন্দ্রনাথের “চেরাপুঞ্জীর থেকে—একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে”—এই দুই পংক্তি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-সম্পদ অপেক্ষাও মূল্যবান। যতীন্দ্রনাথের অনুকরণে তাঁহারা ‘কল্লোল’, ‘প্রগতি’, ‘কালি-কলমে’ এন্তার কবিতা লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার সংযত সহজাত বাক্‌ভঙ্গি স্বভাবতই তাঁহাদের ছিল না, তাঁহারা অনুপ্রাসের বাহুল্য দিয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন। এই অক্ষম সৃষ্টিগুলিকে ব্যঙ্গ করিয়া আমি আশ্বিনে ঠিক অনুরূপ ঢঙে দুইটি কবিতা লিখিলাম। এক “ফাটা ফুস্‌ফুসে আমি আর হুতো চোপসান-কাশি কাশি” উদ্ধৃত করিলে ঢঙটা বুঝা সহজ হইবে, শুধু ঢঙ নয়—তৎকালীন তারুণ্যের অন্য পরিচয়ও মিলিবে—

ও-পাড়ার ওই পটলির মুখে পাণ্ডু-পাটল হাসি
ফাটা ফুস্‌ফুসে আমি আর হুতো চোপসান-কাশি কাশি;

সে কাশির পিছে পিছে
কোটি কামিনীর কত না কাতর কামনা নিঃশ্বসিছে !
বিবশ দিবসে অলস বাসনা অবশ বসুন্ধরা,
তাতল তটিনীতটে তেঁতুলেতে পট্‌লি ঘষিছে ঘড়া ;
নিদয় নিঠুর নিদাঘ রৌদ্র মন্তের মত তিতা—
মিতালি করিছে মাতাল বাতাস, শ্মশানে জ্বলিছে চিতা।
মোরা সে ঘাটের কূলে—
ক্যাওড়া ভাবিয়া শ্যাওড়ার আড়ে আড়ি পেতেছিনু ভুলে।
হুতো দিল গুঁতো মিছা ছুতো ক'রে জুতো ভেদি ফুটে কাঁটা,
চমকি চাহিনু, পট্‌লির পিসী পিছনে তুলেছে ঝাঁটা।
ভয়েতে দিলাম রড়—
কামিনীকুসুমে এত কালকূট, কাংস্য কণ্ঠস্বর !
ঘরে এসে ডরে বাক্‌ নাহি সরে, মাথা ঢাকি কাঁথা দিয়া,
প্রেয়সীর সাথে নয়, বুঝি হয় মৃত্যুর সাথে বিয়া !
উসুখুসু করে মন—
মিশিমুখো পিসী কবে ম'রে যাবে, ঘাট হবে নিরজন !

দুই নম্বর কবিতা "কাব্যসৃষ্টি হয় শুধু ভাই বেদনার কালিদহে"। লিখিলাম—
দল বেঁধে সবে মামুলী ছন্দ করিয়াছ একচেটে,
কাব্যসৃষ্টি হয় নাকো ভাই এঁটো কলাপাত চেটে।···
বুকের রক্ত উজাড় করিয়া যে রচিল 'মরীচিকা',
বিড়াল-ভাগ্যে সহসা তাহার ছেঁড়ে নি কাব্য-শিকা।
কথার উপরে কথা গেঁথে শুধু রচে নি অনুপ্রাস—
প্রতি পংক্তিতে জমাট বেঁধেছে বুকের দীর্ঘশ্বাস !
কেবল ছন্দ নয়—
বিশ্বের সাথে 'হাতুড়ে' কবির সুনিবিড় পরিচয়।
তোমরা করিছ কাব্যসৃষ্টি বাক্য উলটি নিয়া,
বিরোধী কথায় অনুপ্রাসের ছিটা মাঝে মাঝে দিয়া—
কাব্য সে নহে নহে—
কাব্যসৃষ্টি হয় শুধু ভাই বেদনার কালিদহে।
উপমার সাথে চাই নিরুপমা ভারতীর কৃপাকণা—
উদ্ভট কথা নহে শুধু, চাই অপরূপ কল্পনা !···

আমার আবেদন তরুণদের নিকট পৌঁছিল কি না জানা গেল না, কিন্তু স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন। "তরুণের লজ্জা" উদ্রেকের জন্য তিনি পৌষে 'শনিবারের চিঠি'র আসরে অবতীর্ণ হইলেন। সেই হইতে পুরা সাতাশ বৎসর কাল তিনি লেখক, সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে 'শনিবারের চিঠি'র সহিত যুক্ত ছিলেন, তাঁহার প্রথম আবির্ভাবকে তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি। নিষ্ফল তারুণ্যের অশোভন দম্ভ ও নির্লজ্জ বাহ্বাস্ফোটে সেদিন বাংলার সাহিত্যমণ্ডপ কি ভাবে আবিল ও কলুষিত হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় যতীন্দ্রনাথের "তরুণের লজ্জা"য় আছে। সে রচনা আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, আমি এখানে সেটি অংশত উদ্ধৃত করিয়া আমার 'স্মৃতিকথা'কেই সমৃদ্ধ করিতেছি—

"আরও লজ্জার কথা হ'ল এই,—ঠিক যে যুগে বাংলার তরুণের ললাট কলঙ্কমসীলিপ্ত, আধুনিক ইতিহাসের যে সময়টিতে বাংলার তরুণের তীব্রতম ব্যর্থতা দিকে দিকে অঙ্কিত,…ঠিক সেই সময় তরুণের এই জয়ঢক্কা বাজান হচ্চে। আজ বাংলার তরুণ অন্তরে অন্তরে অনুভব করে,—জীবনের ক্ষেত্রে তার নূতন নূতন পথ কেটে বার হবার সাধনা নানা দিকে ব্যর্থ হয়েছে ব'লেই সে একমাত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে কালি-কলমের সাহায্যে তার তরুণত্ব সপ্রমাণ করতে বাধ্য হয়েছে। চীনের তরুণ, তুরস্কের তরুণ জীবনযাত্রায় তাদের পিছিয়ে ফেলে জয়োল্লাস করতে করতে অনেক দূর এগিয়ে গেল! তরুণ কবি নজরুলের তরুণত্ব যে আজ নবীন তুরস্কের অভিযান-গীতি সম্পর্কে মৌন হয়ে প্রবীণ পারস্যের যৌন-গজলে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হ'ল, এর জন্য বাংলার সমস্ত তরুণ দায়ী। কর্মের সংগ্রামে তরুণ চারদিক থেকে হঠে এসেছে; সেই বিফলতার ছায়া আজকের সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে যে নূতনত্ব প্রকাশ করছে, তাকে একটি অসামান্য সাফল্যের অগ্রদূত ব'লে নিঃসঙ্কোচে প্রচার করা মর্মান্তিক পরিহাস।…হায় বাংলার তরুণ! তোমারই মুখের পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত স্বদেশী প্রতিজ্ঞা বিদেশী সিগারেটের ধূমে কুণ্ডলায়িত হয়ে পশ্চিম আকাশে ফুল ফোটাচ্ছে! যে জীবনের সাধনায় বিফল, সে সাহিত্যে আশাতীত সফলতা লাভ করছে, এ কি সত্য হতে পারে? ঋজু কঠিন মেরুদণ্ড কোনো দেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে জীবনের নব নব তরুণ অনুভূতি ও বিচিত্র প্রকাশকে তো বাধা দেয় নি। কিন্তু তোমার ভাষা পর্যন্ত যে ক্রমে ভাঙা শিরদাঁড়ার কুচো হাড়ের মত এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ছে, সে কি শুধুই ভাবের আতিশয্যে, না, জীবনের বিফলতায়! আরও আশঙ্কার কথা এই, তোমার সব ত্রুটি তারুণ্যের আড়ালে ঢেকে রাখবার,

জন্য প্রবীণ বন্ধুর অভাব হবে না। কিন্তু এই বন্ধুত্ব কি একান্তই স্নেহ-প্রসূত? প্রবীণে প্রবীণে যে সব মনোমালিন্য বহুদিন থেকে সঞ্চিত হয়েছিল, তোমাকে আশ্রয় ক'রে, সাহিত্যের আদর্শ বিচারের অছিলায়, সেই সব লুকানো অগ্নি তোমারই তোমাদের ইন্ধন পেয়ে আজ দীপ্তিমান হয়ে উঠছে না, সে বিষয়ে কি নিঃসন্দেহ হয়েছ?"

তরুণ সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের আস্ফালন এবং শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্র-রাধাকমলের গায়ে-পড়া ওকালতির লজ্জাকর মর্মকথাটা যতীন্দ্রনাথ যে ভাবে ধরাইয়া দিয়াছিলেন, তেমন আর কেহ করেন নাই। ইহার কারণ, তিনি আন্তরিক ভাবে দেশের তরুণদের শুভকামী ছিলেন, তাহাদের ব্যর্থতার লজ্জা তাঁহাকে মর্মান্তিক আঘাত দিয়াছিল, শিখণ্ডীরূপে তরুণদিগকে সম্মুখে রাখিয়া কোনও হীনতর উদ্দেশ্য সাধন—feeding fat some ancient grudge-এর মতলব তাঁহার ছিল না। যে সকল অবাস্তব বিকৃত সামাজিক সমস্যা উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান-চেষ্টার নামে বিকৃত রুচির ব্যাপক প্রচার তথাকথিত অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা কয়েকটি সাময়িকপত্রে করিতেছিলেন, সে সম্বন্ধেও যতীন্দ্রনাথ এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন—

"ব্যষ্টিগত জীবনের সমষ্টিই সমাজ। যে সমস্যা সমাজে আজও প্রকট নয়, জীবনে তা সত্য না হতে পারে; আর সাহিত্যে তার প্রকাশ হয়তো বিলেতের আমদানী বায়োস্কোপের মতই অসার্থক।...সমাজ ও রুচিকে আঘাত দিলেও সাহিত্য হতে পারে—এ কথা সত্য; কিন্তু তাদের আঘাত দিলেই সাহিত্য হয় না—এ কথা ততোধিক সত্য।"

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম. বি. তখন 'বঙ্গবাণী'র আসরে খ্যাতিমান। তাঁহার সামাজিক নাটক 'একাল,' উপন্যাস 'যোগভ্রষ্ট', 'দশচক্র', গল্প "সিরাজীর পেয়ালা" বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতেছে। ১৩৩৩ হইতে ১৩৩৪এর মাঘ মাসের মধ্যেই তাঁহার গল্প-উপন্যাস-প্রতিভা তাঁহার প্রাচীনতর কীর্তি 'বেপরোয়া'কে অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাঁহার কবিতা ও কার্টুন-ছবি সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষে' জলধরদাদা সার্টিফিকেট দিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি'র রচনাভঙ্গি ও ব্যঙ্গপ্রিয়তা এই গুণী ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিল, আকর্ষণের বিশেষ কারণ শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আমার অভিযান। বাংলা দেশের ব্যর্থ তারুণ্যের দম্ভকে তিনি বরাবরই অত্যন্ত ঘৃণা ও অনুকম্পার সঙ্গে দেখিতেন। 'বেপরোয়া'তেও তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তিনি সুদূর মফস্বল হইতে (খুব সম্ভবত ময়মনসিংহ, সেখানে তখন তিনি সিভিল সার্জন) "আমিও আছি" বলিয়া সাড়া দিলেন। ফাল্গুন সংখ্যার জন্য আসিয়া পৌঁছিল

"আধ্যাত্মিক জাতি"র বিরুদ্ধে একটি সচিত্র কবিতা—একটি বমশেল! বলা বাহুল্য, চিত্রগুলি তাঁহারই অঙ্কিত। ঠিক তাঁহার জাতের কার্টুনিস্ট আর এ দেশে হয় নাই। লেখা এবং ছবি—এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্, অদ্ভুত সামঞ্জস্য! অত্যদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহার! তিনি উল্টা চাপ দিয়া শুরু করিলেন, বৈজ্ঞানিক তারুণ্যের স্বপক্ষে আমাদের পচা প্রাচীনতার বিরুদ্ধে—

> "জেনেছি আত্মা অবিনশ্বর, জেনেছি মিথ্যা দুনিয়া।—
> তাই আমাদের নাহি ভয় কানা-কৌড়ি;
> তাই পথ চলি দিনক্ষণ বেছে, খনার বচন শুনিয়া,
> সাহেব এড়াই সেলাম করি' বা দৌড়ি';
> কারণ আমরা আধ্যাত্মিক জাতি!
> ইহকালে যারা মজা লুটিবার লুটে নিক,—
> আমরা রহিনু পরকালে হাত পাতি'।"

এই কালাপাহাড়ী সুরটাও 'শনিবারের চিঠি'র নিজস্ব, পূর্বাপর বজায় আছে। বনবিহারীবাবু আসিয়া এই দিকটাতে বিশেষ জোর দিলেন। আসর আরও জমিয়া উঠিল। পরশুরাম—রাজশেখরের সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক গিরীন্দ্রশেখর আসিলেন "কচিসংসদের ডায়ারী" লইয়া, সঙ্গে চিত্রশিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন। পরশুরামের "সাহিত্য-সংস্কার," "তামাক ও বড় তামাক" প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গরচনা 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে। গিরীন্দ্রশেখরের "ঝরা শেফালির মতো" (মাঘ, ১৩৩৪) সম্ভবত বাংলা-কথাসাহিত্যে তাঁহার একমাত্র "অবদান"—তাহাও পুনঃপ্রকাশিত হয় নাই। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের তৎকালীন ভয়াবহ কাব্যচর্চাকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত "লুই পাস্তোর"-হস্তে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের শ্রীনির্মল মৈত্রও মাঘে আবির্ভূত হইলেন। এই ধরনের প্যারডিতে তিনি বিদগ্ধ জনের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

ফাল্গুন সংখ্যায় বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবর শ্রী গোপাল হালদার 'শনিবারের চিঠি'র মণ্ডল-ভুক্ত হইলেন, "শেষ মহাসঙ্গীতি" দিয়া তাঁহার আরম্ভ। তিনি আমার পূর্বতন ঘনিষ্ঠ বন্ধু (অগিল্‌ভি হস্টেলের) হিসাবেই শুধু নয়, একেবারে নিজগুণে অর্থাৎ ইংরেজী লেখার জোরে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'ওয়েলফেয়ারে'র সহিত যুক্ত হইলেন। পরে 'প্রবাসী', 'মডার্ন

রিভিউ'-এও প্রবেশ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল, প্রায় কুড়ি বৎসর 'শনিবারের চিঠি'র সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল।

বৎসরের শেষে অর্থাৎ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে পরবর্তী কালে 'শনিবারের চিঠি'র লেখক-প্রধানদের অন্যতম 'বনফুল'—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম শুভাগমন ঘটিল। আমি যখন ইস্কুলে পড়ি এবং জল-খাবারের পয়সা বাঁচাইয়া 'প্রবাসী'র গ্রাহক হইয়াছি, বনফুল তখনই 'প্রবাসী'র লেখক-শ্রেণীভুক্ত। ছোট ছোট কবিতা লেখেন, আমার ধারণা ছিল তিনি স্ত্রীলোক, দেখিতে ছোট্টখাট্টটি। স্বচ্ছন্দ-সরসতা ও সরল বলিষ্ঠতার জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতও ছিলাম। হঠাৎ একদিন 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে তিনি স্বশরীরে আবির্ভূত হইলেন, আর সে কি শরীর! বিপুল, বিশাল! গায়ে ঢিলাঢালা খদ্দরের পাঞ্জাবি, আমাদের রবি মৈত্রের মতই অসম্বৃতবাস। পরিচয় শুনিয়া তো আমার মনের বনফুল শুকাইয়া মরিয়া গেল। কিন্তু জীবন্ত যে মানুষটি অন্তরে প্রবেশ করিল তাহাকে আর ছাড়িতে পারি নাই। ১৩৩৪ ফাল্গুন মাসে প্রথম দেখার পর অনেক দিন ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল, সে পুনরাগমনায় চ।

সর্বাধিক আশ্চর্য এই, ঠিক এই মাসেই 'শনিবারের চিঠি'র পরবর্তী কালের অন্যতম প্রধান লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও পরিচয় পাইলাম, সরাসরি নয়—একটু তির্যকভাবে। তিনি 'কল্লোলে'র (ফাল্গুন, ১৩৩৪) আবর্তে "রসকলি"র ছাপ লইয়া আমাকে দর্শন দিলেন। 'কল্লোল,' 'কালি-কলম', 'প্রগতি,' 'ধূপছায়া' পাইলেই লাল-নীল পেন্সিল হাতে বসিয়া যাইতাম "মণি-মুক্তা" ও "সংবাদ-সাহিত্যে"র খোরাকের জন্য। অতিরিক্ত জিদের বশে ইহা বদ্‌অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। তারাশঙ্করের "রসকলি"তেও যে দাগ মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আমার সে বৎসরের বাঁধানো 'কল্লোল' তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু যে কারণেই হউক, চাঁদমারির ওই দাগমারা পর্যন্ত। গুলি ছুঁড়িতে আরও দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল।

যাহা হউক, বনফুলের কথা হইতেছিল। আপ্যায়ন, আলাপ ও পরিচয়ের পর জানা গেল, আমরা উভয়েই একই বৎসরের (১৯১৮) ম্যাট্রিকুলেট এবং উভয়েই বিজ্ঞানের ছাত্র। বনফুল আই. এস-সি. পাস করিয়া ডাক্তারি লাইন ধরিয়াছিলেন, সবে ডিগ্রী পাইয়া বাহির হইয়াছেন। আমিও বি. এস-সি. পাস করিয়া মেডিকেল কলেজের দরজা-ফেরত। পরস্পর মুখ শোঁখাশুঁখি পর্যন্ত হইয়া রহিল। ডাক্তারকে ধরিলাম, অতি-আধুনিকতা-ব্যাধির ডাক্তারী মতে একটা ব্যবস্থা দিতে। ডাক্তার "আধুনিক গল্প-সাহিত্যে করুণ রস"

লিখিয়া দিলেন। চৈত্রের 'শনিবারের চিঠি'তে তাহা বাহির হইল। যতদূর মনে পড়িতেছে, বনবিহারীবাবুই বনফুলের সহিত যোগাযোগ ঘটাইয়াছিলেন। তিনি শুধু ডাক্তারিতেই বনফুলের গুরু নন, সাহিত্যিক উপদেষ্টাও ছিলেন।

১৩৩৪ সালের আশ্বিনে মাসিকের আরম্ভ হইতে চৈত্র পর্যন্ত সাত মাস কালকে 'শনিবারের চিঠি'র উদ্যোগপর্ব বলিতে পারি। সাপ্তাহিকের পুরাতন রথী ও পদাতিকেরা তো ছিলেনই, নানা দিগ্দেশ হইতে শুধু আদর্শের আকর্ষণেই আরও অনেকে একে একে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন—কুরুক্ষেত্রের আয়োজন ক্রমেই জমজমাট হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই উদ্যোগ-পর্বেই ভীষ্মপর্বের বিষাদ-যোগ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নিজের অবিমৃষ্যকারিতা এবং বিপক্ষীয় দলের সমর্থকদের ষড়যন্ত্রে বা চক্রান্তে আমাদের একমাত্র ভরসা ও আদর্শ স্বয়ং জনার্দন সাময়িকভাবে 'শনিবারের চিঠি'কে নয়, একমাত্র আমাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই বিরূপতাজনিত বিষাদ-যোগ দিয়াই আত্মস্মৃতির দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ।

প্রথম খণ্ডের উপসংহারে মোহিতলালের কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়। এই অবস্থায় তিনি নিজে শুধু কর্ণধার হইলেন তাহা নয়, তাঁহার অনুরাগী শিষ্য নীরদচন্দ্রকেও টানিয়া আনিলেন। শক্তিমান রবীন্দ্রনাথ মৈত্র আসিলেন নিজের টানে। অবসন্ন আমাকে এই তিন জনই কর্ম ও জ্ঞানযোগের মন্ত্র শুনাইয়া সঞ্জীবিত করিলেন। মোহিতলাল সারথ্য গ্রহণ করিয়া মুহ্যমানকে নিত্যসাহিত্যের সঞ্জীবনী গীতা শুনাইতে লাগিলেন। বিচলিতকে আত্মস্থ করিবার জন্য তিনি আমার উদ্দেশে যে কবিতাটি এই দুঃসময়ে লিখিয়াছিলেন, পৌষের 'শনিবারের চিঠি'র একেবারে গোড়ায় তাহাই "'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশে" এই নামে ছাপা হইল—

"'শিব'-নাম জপ করি' কালরাত্রি পার হয়ে যাও—
হে পুরুষ! দিশাহীন তরণীর তুমি কর্ণধার!
নীর-প্রান্তে প্রেতচ্ছায়া, তীরভূমি বিকট আঁধার—
ধ্বংস দেশ—মহামারী!—এ শ্মশানে কারে ডাক দাও?
কাণ্ডারী বলিয়া কারে তর-ঘাটে মিনতি জানাও?
সব মরা!—শকুনি গৃধিনী হের বেরিয়া সবার
প্রাণহীন বীর-বপু, ঊর্ধ্বস্বরে করিছে চীৎকার!
কেহ নাই!—তরী 'পরে তুমি একা উঠিয়া দাঁড়াও!

ছল-ভরা কলহাস্যে জলতলে ফুঁসিছে ফেনিল
ঈর্ষার অজস্র ফণা, অর্ধমগ্ন শবের দশনে
বিকাশে বিদ্রূপ-ভঙ্গি, কুৎসা-ঘোর কুহেলি ঘনায়—
তবু পার হতে হবে, বাঁচাইতে হবে আপনায়!
নগ্ন বক্ষে পাল তুলি' একমাত্র উত্তরী-বসনে,
ধর হাল—বদ্ধ করি' করাঙ্গুলি আড়ষ্ট আনীল!"

আসলে মোহিতলাল স্বয়ং হাল ধরিয়া মাসে মাসে নিত্য-সাহিত্যবিষয়ক সুচিন্তিত ও গম্ভীর প্রবন্ধ দিয়া আমাদের লঘু হাস্যের ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ভারসাম্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। চিন্তাশীল পাঠকের কাছে 'চিঠি'র মর্যাদা তিনিই বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার 'আধুনিক বাংলা-সাহিত্য' গ্রন্থের "মুখবন্ধে" এই কালের ইতিহাসকে তিনি এই ভাবে স্থায়িত্ব দান করিয়াছেন—

"এই সময়ে 'শনিবারের চিঠি' নামক বহুনিন্দিত পত্রিকার উদ্ভব হয়; ঐ পত্রিকাতেই সাহিত্য-সমালোচনার মূলসূত্র ও আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছিলাম। যাঁহাদের অকৃত্রিম আগ্রহ ও সাহিত্যিক সমপ্রাণতা এই কার্যে আমার উৎসাহ রক্ষা করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান সজনীকান্ত দাস, শ্রীমান নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের নাম আমি এক্ষণে স্মরণ করিতেছি। শ্রীমান সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে অতিশয় অপ্রিয় ও দুঃখকর আলোচনার ভার লইয়া যেভাবে আমার লেখাগুলির জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিতেন—নিন্দার বিষ নিজ অংশে রাখিয়া যেভাবে প্রশংসার মধু আমার জন্য সংগ্রহ করিতেন, এবং তাহাতেই কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেন—আজিকার দিনে সেরূপ সাহিত্য-প্রীতি যথার্থই দুর্লভ। এই গ্রন্থের প্রায় সকল রচনাই এমনই ভাবে এই কালে লিখিত হইয়াছিল।"—১৩৪৩

মোহিতলাল আমার বিষপানটাই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু আমার চিত্ত তখন অমৃতের জন্য হাহাকার করিতেছিল। গূঢ় গোপন অন্তরলোকে এই কালে যে বিপর্যয় চলিতেছিল কবিতাকারে তাহার পরিচয় দিয়াই আমি প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি-রেখা টানিতেছি—

* * * *

॥ আত্মস্মৃতি ॥

যোগী নীলকণ্ঠ সম মহোল্লাসে করি আত্মসাৎ
বিশ্ব-হলাহল,
আমার বক্ষের মাঝে নব জন্ম লভে অকস্মাৎ
শুষ্ক তৃণদল।
নিখিলের পুষ্প যত চিত্তে মোর উঠে বিকশিয়া,
অনন্ত আনন্দ-রস ধরা-বক্ষে পড়ে যে ক্ষরিয়া;
কলহ ডুবিয়া যায়—সত্য শিব বিরাজে সুন্দর,—
বিরহ পলায় দূরে, মিলনেতে বিশ্ব-চরাচর
শোভে মনোহর।
শুধু শান্তি অবিরাম, নিখিলের সঙ্গীত-কাকলী
উঠে যে উছলি।

*   *   *   *

মথিয়া বিশ্বের বিষ সুধা যত আহরণ করি
বিশ্ব করে পান।
কল্পনা-মৃণাল-বৃন্তে চিত্তপদ্ম রাখি নিত্য ধরি;
সঙ্গীত মহান্
মনোবীণা হতে মোর উচ্ছ্বসিত হয় শূন্য মাঝে,
কর্মভারাতুর যবে কর্ণে মোর সে সঙ্গীত বাজে;
চমকিয়া জাগি আমি—পান করি নিস্যন্দিনী ধারা,
কে আনিল স্বর্গজ্যোতি! চারিদিকে অন্ধকার কারা,—
সুপ্তি দীপ্তিহারা!
ক্ষণে জাগ নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নসম মিলাও চকিতে—
ক্ষুব্ধ করি চিতে।

কঠিন উপলখণ্ড পদে পদে বাধা হয় পথে;
ক্ষণে ভুলি দিক—
ধূলায় কর্দমে হই নিষ্পেষিত মহাকাল-রথে,
দুর্বল পথিক!
আবরণ টুটে যায়, প্রকটিত রন্ধ্রমুখ যত,
ন্যুব্জ হয়ে পথ চলি সংসারের গুরুভার-নত,
হিংসা দ্বেষ অপমান চারিদিকে বহ্নিজ্বালা জ্বলে,

তুমি কোথা গুপ্ত রহ হৃদয়ের গোপন অতলে—
কোন্ মন্ত্রবলে
বেদনা-জ্বালায় চিত্ত ছিন্ন-ভিন্ন শ্রান্ত ব্যথাতুর
আঘাতে নিষ্ঠুর !

কেন আস কেন যাও, কোন্ কল্পলোকে তব স্থান,
স্বপ্ন-সহচরী !
বার বার পরিচয়ে আজো তার হ'ল না সন্ধান।
মায়া-যাদুকরী,
তোমারে চিনি না, শুধু ক্ষণে ক্ষণে পাই পরিচয়,
অন্তরের পূজা মোর বার বার লভে পরাজয়,
মায়াবিনী, তুমি তব অন্ধকার চিত্তগুহা হতে
চমক হানিয়া যাও, সংসারের কণ্টকিত পথে
আমার জগতে।
কর্মক্লান্ত হয়ে যবে খুঁজি শান্তি আগ্রহে ব্যাকুল
নাহি মিলে কূল।

এই লুকাচুরি-খেলা, এও ভাল বস্তুর জগতে,
স্বপ্ন অবাস্তব
যত ক্ষণিকের হোক এই সত্য মিথ্যাময় পথে—
আলোক দুর্লভ !
পাষাণ-পঞ্জর টুটি' ক্ষণিকের এই উৎস-ধার,
কারাগারে রন্ধ্র-পথে এই স্পর্শ আলোক-রেখার,
ঘোর বিভীষিকা-মাঝে নন্দনের আনন্দের ছবি,
ক্লেদপঙ্ক মাঝে এই সুবাসিত কুসুম-সুরভি—
ধন্য মানে কবি !
যেথা থাকো পাই যেন রহি' রহি' রহস্য-আভাস।
জীবন-নিশ্বাস !

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

আত্মস্মৃতি

দ্বিতীয় খণ্ড

উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে—

বন্ধু, তোমার নাটকের প্লট মরিতেছে মাথা খুঁড়ে,
উদাসী আজিও একাকিনী কাঁদে মাঠে ;
থার্ড ক্লাস সেই র'য়ে গেল থার্ড ক্লাস—
তবে কেন ছিঁড়ে চ'লে গেলে মায়াজাল ?
বাস্তবিকার আসরে আজিও হরিকুমারেরা বসি
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদিতেছে নাকী সুরে,
শেষ না হইতে, দিবা, তুমি কেন ছেড়ে গেলে দিবাকরী,
বলিয়া গেলে না, কোথা থাকে তব ত্রিলোচন কবিরাজ !
বন্ধু, তুমি তো দেখে গেলে নাকো মানময়ী গার্ল-স্কুলে
বদনের মুখে ছাই দিয়ে মেয়ে হাজারে হাজারে আসে,
ঘৃতকুম্ভটি প্রাঙ্গণে আছে প'ড়ে—
দধিকর্দমে পিচ্ছিল প্রাঙ্গণ।

আত্মস্মৃতি

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম তরঙ্গ

বিষাদ-যোগ

দ্বিতীয় খণ্ডের ধরতাই-স্বরূপ প্রথম খণ্ডের শেষ (উনবিংশ) তরঙ্গ হইতে একটু উদ্ধৃতি প্রয়োজন :

> ১৩৩৪ সালের আশ্বিনে মাসিকের আরম্ভ হইতে চৈত্র পর্যন্ত সাত মাস কালকে 'শনিবারের চিঠি'র উদ্যোগপর্ব বলিতে পারি। সাপ্তাহিকের পুরাতন রথী ও পদাতিকেরা তো ছিলেনই, নানা দিগ্‌দেশ হইতে শুধু আদর্শের আকর্ষণেই আরও অনেকে একে একে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন—কুরুক্ষেত্রের আয়োজন ক্রমেই জমজমাট হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই উদ্যোগপর্বেই ভীষ্মপর্বের বিষাদ-যোগ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নিজের অবিমৃষ্যকারিতা এবং বিপক্ষীয় দলের সমর্থকদের ষড়যন্ত্রে বা চক্রান্তে আমাদের একমাত্র ভরসা ও আদর্শ স্বয়ং জনার্দন সাময়িকভাবে 'শনিবারের চিঠি'কে নয়, একমাত্র আমাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই বিরূপতাজনিত বিষাদ-যোগ দিয়াই আত্মস্মৃতির দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ।

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনাবিল প্রীতি যে-ব্যাপারের মূলে, তাহাই ঘটনাচক্রে তাঁহার চোখে বিপরীতরূপে প্রতিভাত হইবার কাহিনী আমার পক্ষে অতিশয় মর্মান্তিক।

১৩৩৪ শ্রাবণ মাসে 'বিচিত্রা' মাসিকপত্র রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ' গীতি-নাট্যখানিকে পুরোভাগে রাখিয়া প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহাতে সন্নিবিষ্ট বিচিত্র সুরের সুমধুর সঙ্গীতগুলি গান হইয়া কানের ভিতর দিয়া আমার মর্মে তখনও প্রবেশ করে নাই। 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠায় নিতান্ত কবিতারূপে সেগুলিকে পড়িয়াছিলাম ; ভাল লাগে নাই, শ্রুতিমধুরও ঠেকে নাই। মনে হইয়াছিল, ভাবের দিক দিয়া তাহা পুরাতন রবীন্দ্রনাথেরই অনুকরণ এবং অক্ষম অনুকরণ, ছন্দ ও মিল শিথিল। একদিন নিরবচ্ছিন্ন অবসর পাইয়া সেই কথাগুলিই প্রবন্ধের আকারে লিখিয়া ফেলিলাম। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' 'চিত্রা' 'কল্পনা' 'খেয়া' প্রভৃতি এবং প্রচলিত পুরাতন গানগুলি হইতে দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া 'নটরাজে'র পংক্তির সহিত তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম যে, 'নটরাজ' রবীন্দ্র-প্রতিভার আরোহণ নয়, অবতরণ। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল, ১৪।২ ঘোষ লেনের বাসায় এবং বিপিনবাবুর চায়ের দোকানে

বন্ধু বান্ধবদের কাছে একাধিকবার পড়াও হইল। সকলেই তারিফ করিলেন, কোনও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আমাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। খেয়ালের বশে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু উহা প্রকাশ করিবার তাগিদ নিজের মনে অনুভব করি নাই। স্বভাবতই অনিচ্ছুক চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, লেখাটি আমার দপ্তরেই পড়িয়া থাকে। পরে বিপিনবাবুর চায়ের দোকানের আড্ডার বন্ধু "শচীন বাঙাল" অধুনা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম সমঝদার, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইংরেজী-বাংলা একাধিক গ্রন্থের লেখক ডক্টর শচীন সেন একদিন জোর করিয়াই প্রবন্ধটি লইয়া যান, বলেন, তুই যখন ছাপবি না, ওটা আমার "অরসিক রায়" বেনামে 'আত্মশক্তি'তে ছাপিয়ে দেব। তিনি তখন 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিকের সহিত যুক্ত। আমার অপরাধ হইয়াছিল লেখকসুলভ মোহের বশে "না" বলিতে পারি নাই। পরবর্তী ভাদ্র ও আশ্বিনের পর পর পাঁচ সংখ্যা 'আত্মশক্তি'তে যখন আমার "নটরাজ" প্রবন্ধ বাহির হয়, তখন বিশেষ উৎসাহ বোধ করি নাই এবং শেষ পর্যন্ত সে ব্যাপার স্মরণেও ছিল না। এমন উদাসীন ছিলাম যে, প্রবন্ধের "কপি" সংগ্রহ করিয়া রাখার আবশ্যকতাও অনুভব করি নাই। চিন্তালেশহীন অবোধ বালক ঢিলটি নিক্ষেপ করিয়াই খুশি ছিল, আম পড়িল কি পাখি মরিল—সে সম্বন্ধে ভাবিয়াও দেখে নাই। সে চকিত হইয়া উঠিল তখনই, যখন ঢিলটি ফিরিয়া তাহারই গায়ে আসিয়া লাগিল।

অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি'র আন্দোলন তরুণদের সমর্থক রবীন্দ্র-পরিবেশভুক্ত কয়েকজন প্রধানকে আমাদের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন দুই অধ্যাপক—অপূর্বকুমার চন্দ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এই দলে ছিলেন।* 'শনিবারের চিঠি'র অপরাধে রবীন্দ্রপৃষ্ঠপোষিত সদ্য-প্রকাশিত 'বিচিত্রা'র প্রতি পুরাতন 'প্রবাসী'কে ঈর্ষাদুষ্ট প্রমাণ করিবার চেষ্টাও গোপনে গোপনে চলিয়াছিল, অরসিক রায়ের "নটরাজ" প্রবন্ধটিকে তাঁহারা প্রমাণস্বরূপ দাখিল করিতে চেষ্টা করিলেন। শেষে স্বয়ং প্রশান্তচন্দ্র আমাকে পর পর দুই দিন পাকড়াও করিয়া বিশ্বভারতী আপিসে লইয়া গেলেন এবং স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্যের সহিত জ্ঞাপন করিলেন, কাজটা আমি ভাল করি নাই। রবীন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। আমার গহন মনে কি কি গূঢ় উদ্দেশ্য গোপন ছিল বৈজ্ঞানিক

* 'রবীন্দ্রজীবনী'—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সং, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩২।

প্রশান্তচন্দ্র তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম, নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম আমার অসাবধানে-ফেলা-জল অনেক নীচ পর্যন্ত গড়াইয়াছে। আমি সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া সরাসরি রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হওয়াই সমীচীন সাব্যস্ত করিলাম। সোজাসুজি সামনে যাইবার সাহস হইল না, একখানি দীর্ঘ পত্রযোগে আমার বক্তব্য নিবেদন করিলাম। পত্রটি অংশত এই :—

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৭

শ্রীচরণকমলেষু,

সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র কয়েক সংখ্যায় 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত আপনার 'নটরাজ' গীতিনাট্যখানির সমালোচনাটি লইয়া কিছুদিন যাবৎ গোপনে ও প্রকাশ্যে একটু আন্দোলন চলিতেছিল পরম্পরায় তাহার আভাস পাইয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার কিছু জবাবদিহি করিবার আছে কি না ভাবিয়া তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া এতকাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই বা পত্র লিখি নাই। কিন্তু গত পরশু ও কাল প্রশান্তবাবুর সহিত দুই-একটি কথাবার্তার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, অবিলম্বে আপনার নিকট আমার নিজের দিকটা খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক, নতুবা আমার সহিত অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জড়াইয়া অকারণে তাহাদের ক্ষতি করার চেষ্টা চলিতে পারে।

সমালোচনাটি আমার লেখা। অরসিক রায়ের নামের আড়ালে আমি যে-কারণেই আত্মগোপন করিয়া থাকি, ভাবিয়াছিলাম ওই নামটিই ওই প্রবন্ধটি সম্পর্কে অন্য আলোচনার অবকাশ দিবে না। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি বাংলা দেশে লেখার দ্বারা লেখার বিচার হয় না, লেখকের কুলজীকোষ্ঠীরও প্রয়োজন হয়। এ দেশের লোকেরা সত্য-অনুসন্ধিৎসু, গোপনতম সত্যটি তাহারা টানিয়া বাহির করিবেই ; কারণ কোন বিশেষ বস্তুর উপর স্বকপোলকল্পিত বিশেষ উদ্দেশ্যটি আরোপ করিতে না পারিলে তাহাদের সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখানো হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।···

আমি শুনিয়াছি আপনি এই লেখাটি সম্পর্কে একাধিক পত্র পাইয়াছেন, তাহার একটিতে নাকি লেখা আছে আমি অপরের প্ররোচনায় প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম,···ইহাও কেহ বলিয়া থাকিবেন যে,

যেহেতু আমি 'প্রবাসী' অফিসের বেতনভোগী কর্মচারী এবং যেহেতু 'বিচিত্রা' পত্রিকাটি ব্যবসায়ক্ষেত্রে 'প্রবাসী'র প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই হেতু শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে দিয়া এই প্রবন্ধ লিখাইয়া 'বিচিত্রা'কে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আপনাকে জানাইতেছি যে আমার লিখিত উক্ত সমালোচনাটিতে সত্য, মিথ্যা, বাতুলতা, প্রলাপ, ঔদ্ধত্য, ঈর্ষা যাহা কিছু আছে তাহা সম্পূর্ণ আমার, অন্য কাহারও তাহাতে বিন্দুমাত্র প্ররোচনা বা অংশ নাই।...

যে রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে বেনামীতে 'মেঘনাদ বধে'র সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, যিনি বয়সের হিসাব ভুলিয়া গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ [বড় দাদা], চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সহিত সত্যের খাতিরে দ্বন্দ্ব করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনের সময় দেশব্যাপী নৈতিক ভয় দূর করিবার জন্য "সত্যের আহ্বান" করিয়াছিলেন, তিনিই যদি আজ কাহাকেও স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করিতে দেখিয়া গোপন অনুসন্ধান ও হীন চরবৃত্তির প্রশ্রয় দেন তাহা হইলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।...বাংলা দেশের মানুষকে আপনি ৬৭ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছেন, আমার ভয় হয়, পাছে যাহারা নিরন্তর আপনাকে ঘিরিয়া থাকে, তাহাদের ফেরে পড়িয়া আপনি ভুল করেন।...

আমার এই ২৬ বৎসরের জীবনে মানুষকে ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পাই নাই, সুতরাং ভুল করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। আপনি বহুবর্ষ যাবৎ এই পৃথিবীর হালচাল দেখিয়া আসিতেছেন, আপনি ভুল করিবেন না, এ বিশ্বাস আমি করিতে পারি। আপনার অনেক ভক্ত আছে। কেহ কাছে থাকিতে পায়, কেহ পায় না। দূরে যাহারা থাকে তাহাদের ভক্তি বিন্দুমাত্র কম নহে। অন্তত, আমার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ এবং এতকাল খোরাকও রবীন্দ্রনাথই যোগাইতেছেন। আমার ভক্তি বা শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ করেন তাহা হইলেই আমার চরমতম শাস্তি ঘটিবে। আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া অন্তত সেই শাস্তিটুকু হইতে আমাকে রেহাই দিবেন।—প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস

বেলা তিনটা নাগাদ 'প্রবাসী'-অফিসের পিওন-বুক-ভুক্ত করিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চিঠিটি পাঠাইয়া দিলাম। কবি প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদের সম্বর্ধনা গ্রহণের জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। আমার পত্র এই অবস্থায় তাঁহাকে অতিশয় উত্ত্যক্ত করিয়া থাকিবে, কারণ

তিনি বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব লিখিয়া তখনই ডাকে দেওয়ান। রবীন্দ্রনাথের সামান্য চিঠিপত্রেও কখনও সাধু-চলিত ভাষার সংমিশ্রণ দেখি নাই; কিন্তু সেদিন তিনি এমনি রাগিয়া গিয়াছিলেন যে, গুরুচণ্ডালী দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার পত্রটি হুবহু এই :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আত্মশক্তিতে কয়েক সংখ্যা ধরে নটরাজের যে সুদীর্ঘ নিন্দাবাদ প্রকাশ হয়েছিল সেটা তোমার লেখা বলে আমি জানতুম না বা সন্দেহ করি নি। বাইরে থেকে চিঠি পাই। তার উত্তরে লিখি, যাঁদের আমি বন্ধু বলে বিশ্বাস করি তাঁরা আমার নিন্দা-প্রচারে আনন্দ বোধ করেন, এত বার বার ইহার প্রমাণ পাইয়াছি যে ইহাতে আমি বিস্মিত হই না এবং এ কথা লইয়া আলোচনা করিতে আমার লেশমাত্র ইচ্ছা নাই।

নিঃসন্দেহ আমার দীর্ঘকালের কাব্যরচনায় মন্দ লেখা বিস্তর আছে। সেইগুলির উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়া ইতিপূর্বে তুমি কখনো লেখ নাই। সম্প্রতি যদি আমার কোনো লেখা মন্দ হইয়া থাকে সেটা কি পাঁচখানা কাগজ ভরাইবার মতো এতই অসহ্য মন্দ? এ সম্বন্ধে তোমার মত যদি আমাকে লিখিয়া জানাইতে, আমার কৈফিয়ৎ আত্মীয়ভাবে তোমাকে জানাইতে পারিতাম। কিন্তু আত্মশক্তিতে তোমার সহিত পাল্লা দিতে পারি না, সে কথা তুমি জানো। এমন অবস্থায় ছাপার কাগজের উচ্চাসনে গুপ্তভাবে বসিয়া আমার প্রতি সরাসরি বিচারে যথেচ্ছ দণ্ড বিধান করা তোমার পক্ষে সহজ কিন্তু এমন কাজ তুমি করিতে পারো তাহা সন্দেহ করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

মেঘনাদ বধের সমালোচনা যখন লিখিয়াছিলাম তখন আমার বয়স ১৫। তা ছাড়া তখন মাইকেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল না। বঙ্কিম ও মহাত্মাজির সঙ্গে আমার যে দ্বন্দ্ব তাহা নৈতিক; তাহা কর্তব্যের বিশেষ প্ররোচনায়। বঙ্কিমের কোনো গ্রন্থের সাহিত্যিক সমালোচনা যদি করিতাম তবে প্রধান ঝোঁক দিতাম তাঁহার গুণের উপর, ত্রুটির উপর নহে, কারণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। শ্রদ্ধাই পজিটিভ গুণকে বড় করিয়া দেখে। এই জন্যেই রাজসিংহের সমালোচনা করিয়াছিলাম।

এত কথা লিখিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি তোমার কথা জানাইয়াছ বলিয়াই লিখিতে হইল। ইতি ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুঃখের বিষয়, এই চিঠিখানি লিখিয়াও তাঁহার সমস্ত রাগটা পড়িল না। এই হতভাগ্যের অপরাধে সমগ্র দেশের উপর তাঁহার রাগের শেষটুকু বর্ষিত হইল, আমার পক্ষে সর্বনাশা ওই ১৩ই ডিসেম্বর (১৯২৭) অপরাহ্নে। রবীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মধুর সম্বর্ধনার উত্তরে সভাস্থ সকলের এবং পরদিন দেশবাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটু বেসুরা গাহিলেন। উহার প্রকৃত মর্ম একমাত্র আমিই বুঝিলাম, অন্য সকলের নিকট অজ্ঞাত রহিল। তিনি বলিলেন :

> দেশের লোক কাছের লোক—তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থককে দেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে। আমার নানা মত আছে, নানা কর্ম্ম আছে, সংসারে নানা লোকের সঙ্গে আমার নানা সম্বন্ধ আছে, কাছের মানুষের কোনো দাবী আমি রক্ষা করি, কোনো দাবী আমি রক্ষা করতে অক্ষম, কেউ বা আমার কাছ থেকে তাঁদের কাজের ভাবের চিন্তার সম্মতি বা সমর্থন পান, কেউ বা পান না, এই সমস্তকে জড়িয়ে আমার পরিচয় তাঁদের কাছে নানাখানা হ'য়ে ওঠে; নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অনভিরুচি ও রাগ-দ্বেষের ধূলিনিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান। যে-দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টি-বিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে দেশের লোকের চোখের সামনে সেই দূরত্ব দুর্লভ। মুক্ত কালের আকাশের মধ্যে সঞ্চরণশীল যে-সত্যকে দেখা আবশ্যক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্তমান কালের আল্‌পিন দিয়ে রুদ্ধ ক'রে ধরে, তার পাখার পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ ও যথার্থ পরিচয় দেখে না। এই রকম দেশের লোকের অতি নিকট দৃষ্টির কাছে নিজের যে-খর্বতা তা আমি অনেক কাল থেকে অনুভব করে এসেচি। দেশের লোকের সভায় এরই সঙ্কোচ আমি এড়াতে পারিনে।...এদেশে, এমন-কি অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সামনেও দাঁড়াতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়,—জানি যে, কত কি ঘরাও কারণে ও ঘর-গড়া অসত্যের ভিতর দিয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁদের বিচারের আদর্শ উদার হওয়া সম্ভবপর হয় না।

১৪ই ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই ভাষণ পড়িয়া ও বেলা দশটায় রবীন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া আমি মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

আশা

১৩ই ডিসেম্বর ১৯২৭-এর পত্রে আমার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড অভিমান প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছিলাম যে, আমাদের অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি তিনি বিরূপ হন নাই। ওই ১৩ই ডিসেম্বর রবীন্দ্র-পরিষদে প্রদত্ত ভাষণ তিনি এই বলিয়া শেষ করিয়াছিলেন—

> সৃষ্টিশক্তির যখন দৈন্য ঘটে তখনি মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃত-রস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোন একজন বাঙালী কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেচেন "খুন"। পুরাতন "রক্ত" শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তা'হলে বুঝব সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক্ লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে। সাহিত্যে এই রকম নতুন হয়ে ওঠবার জন্যে যাদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের উষাকে নিউমার্কেটে "খুন" ফরমাস করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক।

সুনীতিকুমারের নিকট লিখিত যে পত্রে ('আত্মস্মৃতি', ১ম খণ্ড পৃ. ২৫৭) রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'র "ক্ষমতার অসামান্যতা অনুভব" করার কথা বলিয়াছিলেন তাহাও ১৯২৮ সনের ৮ই জানুয়ারী (২৩ পৌষ, ১৩৩৪) লিখিত। প্রথম খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ৪ঠা মার্চ, ১৯২৮ (২০ ফাল্গুন, ১৩৩৪) তারিখের পত্রও 'শনিবারের চিঠি' সম্বন্ধে তাঁহার অ-বিরূপতার আর একটি প্রমাণ। বস্তুত, "নটরাজ" লইয়া আত্মশক্তিতে আমার নির্বোধ হঠকারিতা আমার প্রতি ব্যক্তিগত অভিমানেরই কারণ হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ক্রোধ বা অভিমান 'শনিবারের চিঠি'কে স্পর্শ করে নাই। 'আত্মশক্তি'-ঘটিত দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে আমি তাঁহাকে আর একবার উত্ত্যক্ত করিতে ছাড়ি নাই। 'প্রবাসী'র অল্প মাহিনার চাকুরি আমার আত্মীয়-স্বজনের পছন্দমাফিক ছিল না। তাঁহারা বলিতেন, পারমার্থিক উন্নতি যতই হউক, ঐ চাকুরিতে

আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তাঁহাদের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে পরে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। আসলে এইরূপ ব্যবহার একমাত্র 'প্রবাসী'রই বৈশিষ্ট্য নয়, বাংলা দেশে সাময়িক পত্র-সেবার সাধারণ পুরস্কারই এই। যাহা হউক, ওই সময় কলিকাতা মহাকরণিকে বাংলা অনুবাদক-পদের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনদৃষ্টে আত্মীয়েরা আমাকে আর স্বস্তিতে থাকিতে দিলেন না। দরখাস্তের সঙ্গে প্রশংসাপত্র প্রয়োজন। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিবেদন করা মাত্রই দীর্ঘ এবং সুদীর্ঘ পরিচয়-পত্র দিলেন। বন্ধুরা বলিলেন, এতৎসহ রবীন্দ্রনাথের কলম হইতে সামান্য কিছু যুক্ত হইলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে এক পত্রাঘাত করিয়া বসিলাম। জানাইলাম, ১৬ই ফেব্রুয়ারীর (১৯২৮) মধ্যে প্রশংসাপত্র আমার হস্তগত হওয়া চাই। ১৫ই তারিখে নিষ্পত্র চার ছত্র ইংরেজী রচনা রবীন্দ্রনাথের সহিসম্বলিত হইয়া আমার নিকট পৌঁছিল—

Santiniketan, Feb. 13, 1928

I know Babu Sajanikanta Das and I can certify that he is an author whose mastery of Bengali language and knowledge of our literature is remarkable.

Rabindranath Tagore

কবির সহৃদয়তায় ও বদান্যতায় মরমে মরিয়া গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিয়া ফেলিলাম, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রের অপমান ঘটিতে দিব না, সরকারী ভাল চাকুরি মাথায় থাক্‌। সুতরাং ১৯২৮ সনের দরখাস্ত আজও পর্যন্ত অ-প্রেরিতই রহিয়া গিয়াছে, 'প্রবাসী'র মায়া কাটাইব কাটাইব করিয়াও তখন কাটাইতে পারি নাই। এই আত্মঘাতী সঙ্কল্পের দ্বারা আমি যে কবিকে কতখানি সম্মান করিলাম তাহা তিনি জানিতেই পারিলেন না। তাঁহার সহিত আমার দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ রহিয়াই গেল, এদিকে আত্মীয়েরাও আমার প্রতি বিরূপ হইলেন।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে আমার গ্রহ-সংস্থানে রবির কুপিত দৃষ্টি সত্ত্বেও অন্যান্য নানা দিক দিয়া ভাগ্যকে সুপ্রসন্নই বলিতে হইবে। জীবনের এতকাল পর্যন্ত বাংলা দেশের বৈচিত্র্যহীন শ্যামল সমতল ক্ষেত্রেই প্রধানত আমার বিহার ছিল; বিদেশ বলিতে একবার মাত্র কাশী গিয়াছিলাম। অবশ্য মানভূমকে আমি বঙ্গবহির্ভূত বলিয়া কখনই ধরি না। এই বৎসরের প্রারম্ভে হিমালয় এবং

মধ্যভাগে সাগর-দর্শন ঘটিল। কূপমণ্ডুক মন প্রসারতা লাভ করিল। প্রকৃতির উত্তুঙ্গ ও উত্তাল পরিধি আমার কবি-মনে যথেষ্ট আলোড়ন তুলিল। কিন্তু ইহার অধিক যাহা লাভ করিলাম তাহা হইতেছে কালিম্পংয়ে অন্তরীণ-বদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এবং পুরীর সমুদ্রতীরে একসঙ্গে তরুণ সাহিত্যিকদ্বয় অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের সাক্ষাদ্দর্শন।

এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা দেশের চিত্র-শিল্পীদের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সুযোগ আমার মত আর কোনও বাঙালী সাহিত্যিকের ঘটে নাই। ভাস্কর-শিল্পী-সাহিত্যিক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সহিত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আড্ডায় প্রথম সাক্ষাৎ অচিরকাল মধ্যে অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যে পরিণত হইয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি'র সাপ্তাহিক যুগে কখনও গভীর রাত্রে, কখনও রাত্রির শেষ যামে খামখেয়ালী শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের মোটর-বিহারের সঙ্গী হইয়া বহুদিন দেবীপ্রসাদের শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটস্থ আবাসিক স্টুডিওতে হানা দিয়াছি। চিরতরুণ চিরহাস্যময় উদারহৃদয় বাবুজী—দেবীপ্রসাদের বৃদ্ধ পিতা—আমাদিগকে সাদর আপ্যায়ন জানাইয়া ভাজি-লুচি-সহযোগে সোৎসাহে অতিথি-সৎকার করিয়াছেন, তাঁহাকে কখনও অপ্রস্তুত করিতে পারি নাই। আমাদের হৈ-হুল্লোড়ে তিনি সর্বদা অবাধে যোগ দিয়াছেন। পিতাকে মধ্যস্থ রাখিয়া পুত্রের সহিত আমার প্রেম দিনে দিনে প্রগাঢ় হইয়াছে। ছবি-আঁকা, মূর্তি-গড়া, খাওয়া, গল্পগুজব একসঙ্গে চলিতেছে, বাবুজীর স্নেহাশীর্বাদ চন্দ্রাতপের মত আমাদিগকে ঘিরিয়া আছে। দেবীপ্রসাদ তখনও প্রসিদ্ধ হন নাই, কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা বাবুজীর সঙ্গে আমাদের চিত্তকেও উদ্বেল করিতেছে। তাঁহার বিচিত্র অনন্যচিত্ত অধ্যবসায়ের সাক্ষী আজ আমরাই আছি। শিল্পীর নিশীথ সাধনা শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিবার সুযোগই লাভ করিতাম তাহা নহে, তিনি আমাদিগকে নানা ভাবে উপকরণ হিসাবেও ব্যবহার করিতেন, আমাদিগকে জড়পদার্থ জ্ঞানে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আঁকাইয়া বাঁকাইয়া পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং পর্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান চিত্রে বা মূর্তিতে প্রয়োগ করিতেন। একদিনের ঘটনা মনে পড়িতেছে, তাঁহার বিখ্যাত রঙিন চিত্র "মুসাফিরে"র যষ্টিধৃত একটা হাত তাঁহার কিছুতেই মনঃপূত হইতেছে না—বার বার আঁকিতেছেন, বার বার মুছিতেছেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে মুসাফিরের ভঙ্গিতে লাঠি ধরিয়া বসিতে হইল, আমার হাতের ছায়া ছবিতে চিরদিনের জন্য রহিয়া গেল। ছবিটি ১৩৩৪, আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে বাহির হয়। দেবীপ্রসাদ তখন শিশু-সাহিত্য রচনা করিতেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা অবশ্য শেষ পর্যন্ত শৈশবের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে নাই। ইদানীং যৌবনের সাহিত্য

তিনি প্রচুর রচনা করিয়াছেন, বন্ধুত্বের বশে তিনি এই বিষয়ে আমাকে গুরুর মর্যাদা দিয়া ধন্য করিয়াছেন।

আমার দ্বিতীয় শিল্পীবন্ধু শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। বয়সে তিনি আমার চেয়ে বড়, কিন্তু তাঁহার মন এমনই উপাদানে গঠিত যে তাহাতে কখনও বার্ধক্যের ছোপ লাগিবে না। আমার মত যাঁহারা তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ-সৌহার্দ্য পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন, তাঁহার তুল্য ভাবুক রসিক এবং রসস্রষ্টা শিল্পীসমাজে দুর্লভ। তিনি সংসার-বিরাগী হইয়া, দীর্ঘকাল হিমালয়ের নিঃসঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তাঁহার 'কৈলাস ও মানস-সরোবর'। সংসারের আকর্ষণ প্রবলতর হইলে তিনি যখন ফিরিয়া আসেন, তখনই আমার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু আমাকে শান্তিনিকেতন হইতে নির্দেশ দেন, মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের বাসায় শিল্পী প্রমোদ-কুমারের সহিত আমি যেন সাক্ষাৎ করি। প্রথম দর্শনেই প্রেম জন্মে। তিনি আমাকে সস্নেহে বুকে জড়াইয়া 'ভাই' বলিয়া গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল সে সম্পর্ক অটুট আছে। প্রমোদকুমার সেই কালে বিপুল বহরের ছবি আঁকিতেন, অধিকাংশই পৌরাণিক বিষয়ে। সেই সকল ছবি বহন করিতে আমি গলদ্ঘর্ম হইয়া উঠিতাম। প্রমোদকুমার আজ বাংলা-সাহিত্যে তন্ত্রসাধনার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সে যুগে তাঁহার মুখে শুধু অবিমিশ্র হিমালয়-বন্দনাই শুনিতে পাইতাম।

তৃতীয় শিল্পীবন্ধু শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দলে স্বদেশী ডাকাতিতে লিপ্ত সন্দেহে তিনি ধৃত হন, পরে সন্দেহের বশেই কালিম্পংয়ে তাঁহাকে নজরবন্দী রাখা হয়। ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসে আমি কালিম্পং যাই। একমাত্র দ্রষ্টব্য হিমালয় দেখিতে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না, কমলালেবুর বাগানের আকর্ষণও দীর্ঘস্থায়ী নয়। সুতরাং মানুষের সন্ধানে মন দিলাম। সেখানে স্বাস্থ্যকামী আর আপিসমুখী এই দুই শ্রেণীর লোক, পুলিসের ভয়ে তখন সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত। ধরপাকড় তখনও খুবই চলিতেছে। চৈতন্যদেবের খবর পাইলাম, ভয়ে তাঁহার সহিত কেহ আলাপ পর্যন্ত করে না; তিনি পাহাড়ীদের মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। সাহসে ভর করিয়া একদিন তাঁহার আস্তানায় গেলাম। সঙ্কীর্ণ অগোছালো ঘর, রঙে তুলিতে ছবিতে বিচিত্র। দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। শিল্পী সেখানে ছিলেন না। কাছেই বৌদ্ধ-গুম্ফায় ছবি আঁকিতে গিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখি গুম্ফার অভ্যন্তরে তাঁহার ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি। রক্ষকের সহিত বন্ধুত্ব জমাট বাঁধিয়াছে, তিনি যাবতীয় সযত্নরক্ষিত অন্যের অদৃষ্ট প্রাচীন পট শিল্পীর

সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, শিল্পী নিবিষ্ট চিত্তে বুদ্ধলীলা ধ্যান করিতেছেন। নিজেই নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার কাছে তো বাঙালীরা কেহ পুলিসের ভয়ে আসে না, আপনার ভয় করিল না? আমি বলিলাম, আমি শিল্পীকে দেখিতে আসিয়াছি, বিপ্লবীকে নয়; এই পরিবেশে আপনার সত্যকার মূর্তি আমি দেখিতে পাইতেছি। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে বিলম্ব হইল না। আমি কলিকাতায় ফিরিবার কালে সঙ্গে তাঁহার কয়েকটি ছবি লইয়াই ফিরিলাম না, একজন ভাবুক সাধকের স্মৃতি আমার চিত্তে অক্ষয় হইয়া রহিল। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত চিত্র "কালিম্পংয়ের ভুটিয়া ভিখারী" শ্রাবণের (১৩৩৮) 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়া দিলাম। চৈতন্যদেবের শিল্পসাধনা যে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হইবে—এ অনুমান আমি প্রথম পরিচয়েই করিতে পারিয়াছিলাম। চৈতন্যদেবের সহিত 'বঙ্গশ্রী'র যুগে সম্পর্ক গাঢ়তর হইয়াছিল।

বৈশাখে নগাধিরাজ হিমালয় দিলেন শিল্পীকে, আশ্বিনে পুরীর সমুদ্র-সৈকতে দেখিলাম সাহিত্যিকদ্বয়কে। অচিন্ত্যকুমার তাঁহার আত্মজীবনী 'কল্লোল যুগে' এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

> পুরীতে বেড়াতে গিয়েছি, সঙ্গে বুদ্ধদেব আর অজিত। একদিন দেখি সমুদ্র থেকে কে উঠে আসছে। পুরাণে-মহাভারতে দেখেছি কেউ কেউ অমনি উদ্ভূত হয়েছে সমুদ্র থেকে। তাদের কারুর হাতে বিষভাণ্ডও হয়তো ছিল। কিন্তু এমনটি কাউকে দেখব তা কল্পনাও করতে পারি নি। আর কেউ নয়, স্বয়ং সজনীকান্ত।
>
> একই হোটেলে আছি। প্রায় একই ভোজনভ্রমণের গণ্ডির মধ্যে। একই হাস্যপরিহাসের পরিমণ্ডলে।
>
> সজনীকান্ত বললে, শুধু বিষভাণ্ড নয়, সুধাপাত্রও আছে। অর্থাৎ বন্ধু হবারও গুণ আছে আমার মধ্যে।*

অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাস-উপমা-প্রবণতা স্বভাবতই তাঁহার স্মৃতিকে প্রতারিত করিয়াছে। আশ্বিনের 'শনিবারের চিঠি' বাহির করিয়া মাত্র তিন দিনের জন্য সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুরী বেড়াইতে গিয়া এক পাণ্ডার আশ্রয়ে ভাড়া-করা ঘরে ছিলাম। পরস্পর সাক্ষাৎ অবশ্য একাধিকবার হইয়াছিল, কিন্তু আলাপের প্রসঙ্গ কখনও সাহিত্য-প্রসঙ্গে পৌঁছায় নাই। সাহিত্যের যাহা চিরন্তন বিষয় তাহারই সন্ধানে সকলেই এতই ব্যাকুল ছিলাম

* কবি শ্রীঅজিতকুমার দত্ত সেই দলে ছিলেন না।

যে, প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অচিন্ত্যকুমার এইখানে আমার মুখ দিয়া এক গাদা কথা বলাইয়াছেন এবং নব-সাহিত্যবন্দনা বিষয়ক একটি কবিতাও আবৃত্তি করাইয়া লইয়াছেন। মগজে কল্পনা এবং হাতে কলম থাকিলে এ সবে আটকায় না। কবিতাটি যে আমি পরবর্তী পৌষ মাসে রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলাম ইহা জানা থাকিলে অচিন্ত্যকুমার সাবধান হইতে পারিতেন।

পুরীর সমুদ্রকে সাক্ষী রাখিয়া 'কল্লোল'-পক্ষ ও 'শনিবারের চিঠি'-পক্ষে সেদিন যে মিলন হইয়াছিল তাহার প্রভাব শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে স্পর্শ করে নাই। অচিন্ত্যকুমার বন্ধুপদবাচ্য হইয়াছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া পরস্পর নিমন্ত্রণ-আদান-প্রদানও হইয়াছে। অচিন্ত্যকুমারের "তিরিশ গিরিশে"র বাসায় গিয়া আমরা রসগোল্লা খাইয়াছি এবং আমার ঘোষ লেনের বাসায় আসিয়া তাঁহারা চা খাইয়াছেন। পুরী-পর্ব এই পর্যন্ত।

"সাহিত্য-ধর্মে"র যুদ্ধে এই সময়ে আমরা আরও সমর্থন লাভ করিলাম, রবীন্দ্র-স্নেহ-বিপর্যয়ের মধ্যে ইহাই হইল সান্ত্বনা। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় একটি পত্রে আমাকে লিখিলেন—

> দৈবক্রমে "সাহিত্য" শব্দের মূল অর্থ সমাজ; সমাজের ইষ্ট বা প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া বাঙ্‌ময় রচনা সাহিত্য নাম পাইয়াছে। মানুষের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণ; এই তিন গুণ হইতে যেমন বায়ু-পিত্ত-কফ তিন ধাতু কল্পনা; তেমনই জ্ঞান, কর্ম, রস এই তিন ভাগে তাহার প্রয়োজন বিভক্ত করিতে পারি। অতএব, সাহিত্যের তিন ভাগ, (১) জ্ঞান-সাহিত্য যেমন দর্শন বিজ্ঞান, (২) ক্রিয়ার সাহিত্য যেমন স্থাপত্য অন্নপাক; (৩) রস-সাহিত্য, যেমন পদ্যে কাব্য, গদ্যে উপন্যাস। উপস্থিত আলোচনায় রস-সাহিত্য লক্ষ্য। দেখা যাইতেছে সমাজের হিতচিন্তাই রসের লক্ষ্য। সমাজধর্ম সে-ধর্ম, যাহা থাকিলে সমাজ সম্ভব হয়, সাহিত্যধর্ম সে-ধর্ম, যাহা থাকিলে সাহিত্য সম্ভব হয়। ইহার অধিক বলিতে পারা যায় না। কাজেই সীমা কল্পনা অসম্ভব। কিন্তু আর একটু স্পষ্ট করা যাইতে পারে। বহুজন সমাজের যে বিধির প্রশংসা করে, যেমন সদাচার, সে বিধিদ্বারা সমাজ নিয়মিত হয়। সেইরূপ, সাহিত্যধর্ম, সে-ধর্ম বহুজন যে-ধর্মের স্তুতি করে। ইহার প্রকাশ-রীতি সম্বন্ধে আমাদের আলঙ্কারিকগণ তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারের উপর কথা কহিতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

'পুরাতন-প্রসঙ্গে'র লেখক প্রবীণ অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখিলেন—

কুক্ষণে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বাংলা সাহিত্যে "বস্তুতন্ত্র" শব্দটি আমদানী করিলেন।...আজিকার এই আধুনিক বস্তুতন্ত্রতার দুঃশাসন সভামধ্যে কলালক্ষ্মীর বস্ত্রহরণ করিতেছে দেখিয়া প্রবীণ সমাজ লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন।...ইহা একটা সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিমা। সেই ভঙ্গিমায় রূঢ়তা আছে, পৌরুষ নাই; বর্বরতা আছে, বীর্য নাই; ক্ষুধা আছে, সংযম নাই। ইঁহাদিগকে তরুণ দল বলিলে ঠিক এই সকল সাহিত্যসেবীর সংজ্ঞানির্দেশ করা হয় না। ইঁহারা কি বলিতে চাহেন, ইঁহাদের কণ্ঠ হইতে নূতন কোনও বাণী উদ্‌গিরিত হইতেছে কিনা, বহু আয়াসেও তাহা ধরা যায় না। কোনও নূতন প্রেরণা, কোনও অজ্ঞাতপূর্ব দার্শনিকতত্ত্ব,—এমন কিছু, যাহা সংসারকে সৌন্দর্যস্নাত ও কল্যাণমণ্ডিত করিবে? যদি না থাকে, তাহা হইলে এই সাহিত্যিক বিক্ষোভের, এই বীভৎস ভঙ্গীর সার্থকতা কি?

তরুণদের কবিতার বিষয় এবং ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিয়া ১৩৩৪ মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে আমার "চাটাই বিছায়ে কাটাই প্রহর, ঢাকাই পরোটা খাই" এবং ফাল্গুনে "আমি যে প্রথমতম" বাহির হয়। জবাবে অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ও অজিতকুমার তিনজনে মিলিয়া "ঢাকা-টিক্কি" নামক একটি কবিতা রচনা করিয়া 'শনিবারের চিঠি'তেই প্রকাশার্থ পাঠান। অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যুগে' লিখিয়াছেন, ইহা "কবিতার অনুপ্রাস নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র বিদ্রূপের প্রত্যুত্তর।" 'কল্লোল যুগ' পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত এই পাঁচ স্তবকের কবিতাটির প্রথম স্তবকটি দেখিলেই বুঝা যাইবে, ইহাতে কেবল শব্দের অনুপ্রাসই ছিল, অর্থের বালাই ছিল না:

ফাগুনের গুণে 'সেগুনবাগানে' আগুনে বেগুন পোড়ে,
ঠুনকো ঠাটের 'ঠাঠারি বাজারে' ঠাঠা ঠেকিয়াছে ঠিক;
ঢাকার ঢেঁকিতে ঢাকের ঢেঁকুর টিটিক্কারেতে ঢোঁড়ে,
সং 'বংশালে' বংশের শালে বংশে সেঁধেছে শিক।

পাশাপাশি আমার "আমি যে প্রথমতম" কবিতাটি পড়িলেই এ-পক্ষে ও-পক্ষে সাহিত্যিক তফাতটা ধরা সহজ হইবে:

তাজা-বয়লার কয়লাকুঠির ময়লা-গাদার ধারে,
গয়লা-বধূর* পয়লা সোয়ামী ফেরে কম্পাস ঘাড়ে।

* "গয়লা-বধূ" শুধু অনুপ্রাসের খাতিরে

বিশাই তাহার নাম—
যত বাড়ে বেলা বোঝা ঠেলে ঠেলে ছোটে তত কালঘাম।
ফার্লং দূরে লং সাহেবের অবলং বাংলায়,
ধানী গয়লানী সানি দানি' ঘানী-বলদে পানি পিলায়।
পাশে হাসি' হাসি' বাঁশী-চাপরাসী কাশির ইশারা করে,
কটক-চটকে ভুলিয়া কামিনী চলিল ফটক 'পরে—
বিশাই দেখিল হায়,
পহেলি সহেলি 'বহেলি তাহারে আন্ খাড়ি পানে যায়।
মেদল হইল দীবল বদন মুঘল-চিত্রসম,
দাঁড়ায়ে বিশাই—ভাবে, ত্বনিয়ায় কে বুঝে বেদন মম ?
কহিল, "প্রেয়সী ধানী,
শীতল করুক শয্যা তোমার আমার চোখের পানি।
ধূধূ মরুভূমি হেথায় আমার, ক্লান্ত পথিক চলি—
আমার বুকের সাহারা শ্যামাক তোমার বনস্থলী।
নিরালা যাত্রা মম
প্রিয়তম তব যে হবে হউক, আমি যে প্রথমতম।"

স্থতরাং ত্রয়ীর "টরেটক্কা"-কাব্য অমনোনীত হইয়া ফেরত গেল ; সমুদ্র-বেলায় সদ্য-রচিত বালুঘর সামান্য আঘাতেই ভাঙিয়া চুরমার হইল।

আমার ব্যঙ্গকবিতাটি পড়িয়া শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। বাঙালী জাতির তৎকালীন চরিত্র-শৈথিল্য এবং শিল্প-সাহিত্য ও জীবনে তাহার প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার তীব্র বক্রোক্তি আজিও স্মরণ করিবার যোগ্য। তিনি লেখেন :

"গয়লা-বধূর পয়লা সোয়ামী" ক্যারিকেচার বলে লোকে বুঝতে পারবে তো ? আজকালকার বাজারে ঐ রকম ভাষা ও ভাবই যে সাব্লাইম ! তরুণের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযান কেন ? তাঁরা কিছু বলেছেন নাকি ? হরতাল ছাড়া কিছু করেছেন নাকি ? আমার তো মনে হয় তাঁদের এতটা আস্ফালনের জন্য তাঁরা মোটেই দায়ী নন। ভ্রম, সমস্তটাই হচ্ছে ট্রান্‌স্‌মিশন অব ফোর্সেস,—কুলোর ওপর ভাঙা কলায়ের নৃত্য। আপনারা ভয় পাবেন না, যাকে প্যাথলজিকাল মনে করছেন, সেটা একেবারেই ফিজিকাল ; গ্রীষ্মকালে কোল্ডব্লাডেড অ্যানিমালের টেম্পারেচার বাড়ে, সেটা জ্বর নয়। আমাদের এ এক অপূর্ব দেশ ! এখানে সাম্যের ধারণা জাগলে লোকে পৈতে পরে বামুন

হতে চায়। এখানে সমানাধিকারবাদের ফলে মেয়েদের খোঁপা কমে না, পুরুষের খোঁপা বেড়ে যায়।

উদ্ধিপরা ঝিতে আপত্তি করলে চলবে কেন? ওছাড়া লোক কোথায়? আমরা যখন রাণী, বাণী, শ্যামা, এলা, বেলা, স্টেলার কথা লিখি, তখন যে মনে পড়তে থাকে ঐ ঝিটাকে। উর্বশী মেনকার কটাক্ষে কাজ হ'ত। ঝির বেলায় চাই হেমেন্দ্র মজুমদারিজম্—তা না হ'লে প্রেম জাগবে কেন? যাঁদের অবশ্য হায়ার সেন্‌সিবিলিটিজ তাঁদের এতটা দরকার হয় না। তাঁদের এক-গাল ভাত বেশী খাইয়ে দিতে হয়। প্রমাণ 'পথের দাবী'র ভারতী। তিনি নামলেন জুতো পায়ে—কিন্তু কথা কইলেন সাবিত্রী রাজলক্ষ্মীর সুরে—"আর দুটি ভাত খাও।"

এই বৎসরের শেষের দিকে অর্থাৎ মাঘ মাসে চিত্রশিল্পী শ্রীমুকুল দের সহিত পরিচয় ঘটিল। তিনি লণ্ডনের নাইট্‌স্‌ব্রিজে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার নিজস্ব স্টুডিওর পাট তুলিয়া দিয়া সদ্য দেশে ফিরিয়াছেন, ড্রাই-পয়েণ্ট এচিংয়ে তাঁহার বিশেষ নাম হইয়াছে; কলিকাতা গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ-পদপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। 'প্রবাসী'তে তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ভার আমার উপর পড়িল। উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া পরিচয় হইল। ফাল্গুন মাসে আটপৃষ্ঠাব্যাপী আমার সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইল। নিমন্ত্রণ-যাতায়াত-চিত্রোপহার সবই হইল; কিন্তু অন্তরের মধ্যে কোথায় কিসের যেন অভাব ছিল, "সিটি-লাইট্‌স্"-এর নৈশ প্রেম দিনের আলোকে স্থায়ী হইল না, ভালবাসা ত্বক ভেদ করিয়া গভীরে প্রবেশ করিল না। এই বিচিত্র আত্মসর্বস্ব শিল্পী মানুষটির সহিত বন্ধুত্ব আজিও সেই প্রথম স্তরেই আছে, তবে খণ্ডিত হয় নাই। ইঁহারই সহোদর শিল্পী শ্রীমান মনীষী দের সহিত পরে আমার ঘনিষ্ঠ স্নেহসম্পর্ক ঘটিয়াছিল।

আজকাল বোম্বাই-সিনেমা-গানের বিকৃত অনুকৃতিতে আমাদিগকে যেমন পথে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে এবং লাউড স্পীকারের জ্বালায় শয়নে স্বপনে উদ্বেজিত হইতে হয়, সেই সময় নজরুলী-গজলের স্থানকাল-পাত্রনিরপেক্ষ আক্রমণও ছিল সেইরূপ মারাত্মক। বাড়িতে বাড়িতে স্নানঘরে অবিশ্রাম কলজলপতনের সঙ্গে তাল রাখিয়া ছেলেমেয়েদের করুণ "কে বিদেশী" গান অভিভাবকদের অতিশয় উত্ত্যক্ত করিত। দিলীপকুমার-পরিচালিত কয়েকটি আসরে স্বয়ং নজরুল স্বদেশী গানে ইস্তফা দিয়া এই গজল-গান একটু বেশী প্রচার করিতেছিলেন; গ্রামোফোন কোম্পানিগুলিতেও তখন তিনি প্রধান সঙ্গীত ও সুর-কার। লাউড স্পীকারের রেওয়াজ না থাকিলেও ঘরে ঘরে এবং পানবিড়ির

দোকানে গ্রামোফোনে গজল গান অবিরাম চলিতে থাকিত। স্রেফ ব্যঙ্গ করিয়া এই মন্দাকিনী-স্রোত রোধ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম। ঠিক ঐরাবতের মত ভাসিয়া যাইতে হয় নাই, কারণ বহু সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন রসিক আমাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। পৌষ সংখ্যার "কচি ও কাঁচা"য় কবি বাইরনের (নজরুলেরই কল্পিত নাম) মুখ দিয়া গাওয়াইয়া দিলাম :

জানালায় টিকটিকি তুই টিক্‌টিকিয়ে করিস নে আর দিক।
ও-বাড়ির কল্‌মিলতা কিসের ব্যথায় ফাঁক করেছে চিক॥
বহুদিন তাহার লাগি রাত্রি জাগি গাইনু কত গান।
আজিকে কারে জানি নয়না হানি হাসল সে ফিক ফিক॥ ইত্যাদি

ফাল্গুন সংখ্যায় বাহির করিলাম "জলসা"—দিলীপী নাচগানের আসরকে ব্যঙ্গ করিয়া। তখনও উদয়শঙ্কর-কনকলতা-অমলানন্দীর আবির্ভাব ঘটে নাই, শ্রীমতী রেবা রায় তখন শ্রেষ্ঠ নৃত্য-পটীয়সী। তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া লেখা আমার "জলসা"র অন্তর্গত "হাঘরে"-নৃত্যের গান বিশেষ সোরগোলের সৃষ্টি করিল। "জলসা"য় দুইটি গজল-গানও সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলাম, মূল গজল গানগুলিকে ছাপাইয়া সেইগুলিই দীর্ঘকাল কলিকাতার পথে ঘাটে গীত হইতে শুনিয়াছি। সুতরাং অনুমান করিতে পারি, ঔষধ ধরিয়াছিল। আমার গজল দুইটির কথা ছিল এই :

কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,
বাঁশী-সোহাগে ভিরমি লাগে, বর ভুলে যায় বিয়ের ক'নে।
ঘুমিয়ে হাসে দুষ্টু খোকা, বেরিয়ে আসে দাঁতের পোকা—
বোকা-চাঁদের লাগল ধোঁকা শ্যাওলা-পড়া নীল গগনে।
কুকুরবালা অনেক রাতে দেয় নাক' মুখ এঁটো পাতে,
বিড়াল-বধূ দুধ ও ভাতে তেয়াগি কাঁদে হেঁসেল-কোণে।
সাবল হাতে সিঁধেল চোরে—ভাসে সে সুরে নয়ন-লোরে,
দোহাই তোরে আর বেঘোরে মারিও নাক' গরিব জনে॥

দ্বিতীয় গজলটি এই :

তেপায়ায় ট্যাঁকঘড়ি তুই টিক্‌টিকিয়ে ক'স কি নিশিদিন!
কচি সব পাড়ার ছুঁড়ি—ওই যা, থুড়ি, বালিকা আই মীন—
তারা সব হয় না বড়, জল্‌দি কর, বাড়াও বয়স ভাই,

এখনও বুঝতে নারে ঠোরে-ঠারে চোখের আলাপিন।
আজো যে ফ্রক প'রে হায়, ঘুরে বেড়ায়, চায় না আঁখি তুলে,
কবে যে ঘোমটা চিরি, ধীরি ধীরি বাজবে আঁখি-বীণ?
কবে যে দখ্‌নে হাওয়ার বুঝবে পাওয়ার প্রেম-টাওয়ারে উঠে,...
ঘড়ি তুই চল ছুটিয়া টিক্‌টিকিয়া বাড়িয়ে গতি ক্ষীণ।
তোরে যে ফি বছরে 'অয়েল ক'রে তোয়াজ করি কত,
সময়ে পারিস না কি দিতে ফাঁকি, ওরে স্থইস-জীন্‌॥

বৎসরের শেষ মাসে অর্থাৎ চৈত্রে আমার প্রথম উপন্যাস 'জীবনের খরস্রোতে'র প্রথম কিস্তি "ডালি" বাহির হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, ইহা আমার শেষ উপন্যাসও বটে। অর্থাৎ উপন্যাস রচনার শুরুতেই আমার শেষ। ইহাই বৎসরকাল পরে রঞ্জন প্রকাশালয়ের দ্বিতীয় উপন্যাসরূপে পুস্তকাকারে বাহির হয়। নাম বদলাইয়া 'অজয়' রাখি। রঞ্জনের প্রথম উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'। যে উপন্যাস আমার মনে ছিল তাহার ভূমিকামাত্র আমি লিখিতে পারিয়াছিলাম, আসল গল্প আর লেখা হয় নাই। সেই ভূমিকাই 'অজয়'। 'কল্লোল যুগে' অচিন্ত্যকুমার লিখিয়াছেন ঃ

> তখন একটা বাগ্‌ভঙ্গি চলেছে আধুনিকদের লেখায়। সেটা হচ্ছে গল্পে-উপন্যাসে ক্রিয়াপদে বর্তমানকালের ব্যবহার। এ পর্যন্ত রাম বললে, রাম খেল, রাম হাসল ছিল—এখন শুরু হল রাম বলে, রাম খায়, রাম হাসে। সর্বনাশ, প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম যে, 'শনিবারের চিঠি' ব্যঙ্গ শুরু করল। অথচ সজনীকান্তর প্রথম উপন্যাস 'অজয়ে' এই বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ।

অচিন্ত্যকুমারের এই সমালোচনা সমীচীন। আসলে আমি গোড়ায় আধুনিকদের গল্প-উপন্যাসের বিষয় ও রচনাভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই 'জীবনের খরস্রোতে' লিখিতে আরম্ভ করি। কিন্তু এক কিস্তি লিখিতে না লিখিতেই নিজের প্যাঁচে নিজে ধরা পড়ি। আমার কবিসত্তা ব্যঙ্গ করিতে গিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। উহা আমার নিজেরই কবি-জীবনের কাহিনী হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য ভূমিকামাত্র। তবে স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, লিখিতে-লিখিতে আমি অনুভব করি নিত্যবর্তমান ক্রিয়াপদে ভাবের গভীরতা বৃদ্ধি পায়।

এই সময়েরই আর একটি ঘটনার কথা অচিন্ত্যকুমার লিখিয়াছেন ঃ

> সজনীকান্ত একদিন 'কল্লোল'-আপিসে এসে উপস্থিত হল। আড্ডা

জমাতে নয় অবিশ্যি, কখানা পুরানো কাগজ কিনতে নগদ দামে। উদ্দেশ্য মহৎ, সাধ্যমত প্রচার করতে কাউকে। ভাবখানা এমন, একটু প্রশ্রয় পেলেই যেন আড্ডার ভোজে পাত পেড়ে বসে পড়ে। আসলে সজনীকান্ত তো 'কল্লোলে'রই লোক, ভুল করে অন্য পাড়ায় ঘর নিয়েছে। এই রোয়াকে না বসে বসেছে অন্য রোয়াকে।...প্রেমেন শুয়ে ছিল তক্তপোশে। বললুম, "আলাপ করিয়ে দিই—"...

কলির ভীমের মত প্রেমেন হঠাৎ হুমকে উঠল: "কে সজনী দাস?"

এ একেবারে দরজায় খিল চেপে চাপিয়ে ঘর বন্ধ করে দেওয়া। আলো নিবিয়ে মাথার উপরে লেপ টেনে দিয়ে ঘুমুনো। প্রশ্নের উত্তর থাকলেও প্রশ্নকর্তার কান নেই। আবার শুয়ে পড়ল প্রেমেন।

সজনীকান্ত হাসল হয়তো মনে মনে। ভাবখানা, কে সজনী দাস, দেখাচ্ছি তোমাকে।

টেকনিক বদলাল সজনীকান্ত। অত্যল্পকালের মধ্যে প্রেমেনকে বন্ধু করে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে শৈলজা। ক্রমে ক্রমে নজরুল, পিছু পিছু নৃপেন।

শক্তিধর সজনীকান্ত। লেখনীতে তো বটেই; ব্যক্তিত্বেও।

এই উক্তি মোটামুটি সত্য হইলেও ঘটনার পূর্বাপরতা ঠিক নাই, এবং অচিন্ত্য-কল্পনার হাইড্রলিক প্রেসারে সময়ের পরিধি কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে। অচিন্ত্যকুমার আরও কয়েকটি নাম করিতে ভুলিয়াছেন—যথা অচিন্ত্যকুমার, অজিতকুমার, যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল এবং স্বয়ং দীনেশরঞ্জন দাশ। কিন্তু সজনীকান্ত মোটেই টেকনিক বদলায় নাই। সৃষ্টির আদিকাল হইতে যে-টেকনিকে বুনো হাতী এবং বন্য ব্যাঘ্রও পোষ মানে, সেই চিরন্তন টেকনিকেই ইঁহারা বশ মানিয়াছেন।

দীর্ঘ আটাশ বৎসর পরে আজ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের সালতামামি করিতে বসিয়া দেখিতেছি, ঝড়ঝঞ্ঝাবিরহবিচ্ছেদকণ্টকিত হইলেও এই বৎসরেই আমার জীবনের যাবতীয় শুভ-সূচনা লক্ষিত হইয়াছে। মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র ইহা আরম্ভ-বৎসর; এবং বনস্পতির সাময়িক বিরূপতা সত্ত্বেও ছোট-বড় বহু পাদপপত্র-বীজনে আমার অরণ্যজীবন শীতল ও স্নিগ্ধ হইয়াছে। এই বৎসরকে আমি নানা কারণে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সরকারী চাকুরির যূপকাষ্ঠে বাঁধা পড়িতে পড়িতে এই বৎসরেই আমি চিরতরে বাঁচিয়া গিয়াছি, যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পরে শনিমণ্ডলকেও জ্যোতিষ্মান করিয়াছেন তাঁহাদের স্পর্শ

বা দৃষ্টি এই বৎসরেই অনুভূত হইয়াছে এবং 'প্রবাসী'র গতানুগতিক সহ-সম্পাদকীয় কর্তব্য ধীরে ধীরে আমার শ্বাসরোধ করিয়া আমাকে মুক্তির জন্য বিচলিত করিয়াছে। সে মুক্তি পাইতে এক মাসের অধিক বিলম্ব হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের সূচনাও এই বৎসরে—'অজয়' রচনার সঙ্গে সঙ্গে। এই বৎসরের সমাপ্তিতেই সাহিত্যিক যুদ্ধ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিলাম :

> বুয়ারে-ইংরাজে যুদ্ধ বাধিয়াছে, যুদ্ধ কভু ভাল নয়—
> মশা ও ছারপোকা দু হাতে মেরে মেরে কেহ কি করিয়াছে ক্ষয় ?…
> বুয়ারে-ইংরাজে যুদ্ধ বুড়া রাজা লিখিলা এই লিপিখান—
> "দু দল দুই দলে করুক বিনিময় চুরুট, চা ও মিঠাপান।
> বেচারা এক পাশে আছি,
> আমারে ছুঁয়ো নাক' করিয়া বুড়ি, যদি বা খেল কাণামাছি।
> পাঞ্জা লড়িবার সুবিধা নাহি পাও, বগলে দিও কাতুকুতু,
> মিটিবে গুঁতাগুঁতি, হস্তে এঁটোপাত আদরে ডাক দিলে তুতু।"

এই সাদর আহ্বানেই শেষ পর্যন্ত বুয়ার-ইংরেজের যুদ্ধ মিটিয়াছিল, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে।

তৃতীয় তরঙ্গ

"গুণ হইয়া দোষ হইল"

১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী'-প্রেসের দীর্ঘকালের ম্যানেজার ও মুদ্রাকর অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয় নিজে স্বতন্ত্র ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন। তিনি সুবিখ্যাত ব্রাহ্মপ্রচারক হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের অনুজ ছিলেন। 'প্রবাসী' যখন ব্রাহ্মমিশন প্রেসে ছাপা হইত, তখন তিনিই ছিলেন উক্ত প্রেসের ম্যানেজার। 'প্রবাসী' স্থানান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও অনুগামী হইয়া গোড়া হইতেই নূতন প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার মত অমায়িক মিষ্টস্বভাবের লোক ছাপাখানা-লাইনেও আমি কম দেখিয়াছি। ম্যানেজারের পদ শূন্য থাকিতে পারে, কিন্তু মুদ্রাকরের পদ আইনত শূন্য থাকিতে পারে না। হাতের কাছে আর

কাহাকেও না পাইয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় সরাসরি আমাকেই ওই পদে বহাল করিলেন। রাতারাতি সহ-সম্পাদক-পদ হইতে মুদ্রাকর-পদে উন্নীত হইলাম অর্থাৎ আমার পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। মাসিক ৯৫৲ টাকা হইতে এক ধাক্কায় ১৪৫৲। এই আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিল বলিয়াই ওখানে টিকিয়া গেলাম, নতুবা সহ-সম্পাদকের একঘেয়ে রুটিনমাফিক কাজে আমার দম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, পালাই-পালাই করিতেছিলাম। তখন সম্পাদকীয় বিভাগে আমার উপরওয়ালা ছিলেন পাঁচ জন; স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার সহকারী চতুষ্টয়—শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ, শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত এবং শ্রীপ্রভাত সান্যাল। ইঁহাদের মধ্যে জীবিতেরা কেহই আর 'প্রবাসী'র সহিত যুক্ত নহেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পর 'প্রবাসী'র দীর্ঘস্থায়ী সহ-সম্পাদকের ট্র্যাডিশন ভঙ্গ হইয়াছিল। এই ট্র্যাডিশন পুনঃস্থাপন করিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। আমি পদান্বিত হইবার অত্যল্পকালমধ্যে সম্পাদকীয় বিভাগে বিপর্যয় উপস্থিত হয়; প্যারীমোহন বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় যান শ্রীরাজশেখর বসুর সহায়তায় বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রচার-সচিব হইয়া; প্রভাত সান্যাল ই. বি. রেলের কি একটা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। সম্পাদকীয় বিভাগ অচল হইবার উপক্রম। তখন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং অধুনা 'প্রবাসী' 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার) চেষ্টায় ও আগ্রহাতিশয্যে কলিকাতার কোনও বিদেশী সওদাগরী আপিসের স্টেনোগ্রাফার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী বাংলা দুই পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে আগমন করেন ১৯২৯ সনের জানুয়ারি মাসে। কেদারনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ উভয়েই তখন ১৪ নং পার্সিবাগান লেনের বসুভ্রাতৃগণের (শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর) "উৎকেন্দ্র-সমিতি"র নিয়মিত সভ্য এবং সেই বাবদেই পরস্পর পরিচিত। ব্রজেন্দ্রনাথ তখনই নানা প্রসিদ্ধ ইংরেজী-বাংলা মাসিকপত্রে গবেষণামূলক ইংরেজী-বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাত হইয়াছেন এবং আচার্য যদুনাথ ও পরশুরামের বইয়ের নিখুঁত প্রুফ দেখিয়া প্রুফসংশোধনবিশারদ বলিয়া তাঁহার নামডাক হইয়াছে। সুতরাং সহ-সম্পাদক হিসাবে তিনি দুর্লভ সংগ্রহ। কৃতিত্ব কেদারনাথের। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলকে সংগ্রহ করার কৃতিত্ব আমার। সুদূর বরিশালের এই দরিদ্র যুবকটি পাঠ্যাবস্থাতেই এমন বিপন্ন হন যে, চাকুরি ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার আবেদনে প্রথম দিনেই আমার মন ভিজিয়া-

ছিল। আমি তাঁহাকে ছাপাখানার প্রুফরীডার-পদে বহাল করিয়াছিলাম ১৯২৮ সনের শেষে। তিনি নিজের যত্নে ও একনিষ্ঠ সাধনায় ধাপে ধাপে উন্নতি করিয়া গবেষণার ক্ষেত্রে নাম করিয়াছেন এবং আজিও কৃতিত্বের সহিত 'প্রবাসী'-'মডার্ন রিভিউ'য়ের সহ-সম্পাদকত্ব করিতেছেন। ৩রা অক্টোবর ১৯৫২ ব্রজেন্দ্রনাথ চাকুরি করিতে করিতেই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

নূতন বন্দোবস্তে আমার যাহাই হউক, 'শনিবারের চিঠি'র খুব সুবিধা হইল। মিষ্টভাষী অবিনাশচন্দ্রের প্রেসের বিলের তাগাদা মাঝে মাঝে এতই মর্মান্তিক হইয়া উঠিত যে, ভাবিতাম ছাড়িয়া-ছুড়িয়া পালাই। তিনি চাকুরি ছাড়িবার মুখে এই তাগাদা চরমে উঠিয়াছিল। তখন 'শনিবারের চিঠি' ছাপা-বাবদ প্রেসে বেশ কিছু ধার হইয়াছিল। খোদ কর্তার কাছে প্রায়ই এই সূত্রে অনুযোগ করা হইত। ইহার মধ্যে আর একটা কথা ছিল। 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে মালিকপুত্র অশোক ও কর্মচারী সজনীকান্তের ঘনিষ্ঠতা আপিস এবং সম্পাদকীয় বিভাগের কেহই বড়-একটা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। আমি যতদিন 'প্রবাসী'তে ছিলাম, এই বিরাগ অন্তঃশীলা ফল্গুর মত প্রবহমাণ ছিল।

আমি ছাপাখানার ম্যানেজার হইবামাত্রই বিরুদ্ধবাদীরা দেখিলেন, ভক্ষকই রক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। দুই-দশ দিনের মধ্যেই খোদ কর্তার কানভারী করিবার গোপন চেষ্টা হইল। ফলে মুদ্রাকর-জীবনের এক সপ্তাহের মধ্যে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ (২১ মে, ১৯২৮) সোমবার সকালে ছাপাখানায় ঢুকিয়াই একেবারে প্রিভি কাউন্সিল হইতে এক ক্রুদ্ধ আদেশ পাইলাম ঃ

21st May, 1928

কল্যাণীয়েষু,

প্রিয় সজনীকান্ত,…[অমুকের] মুখে শুনিলাম, তুমি বলিয়াছ, প্রবাসী আপিসের সহিত 'শনিবারের চিঠি' amalgamated হইয়াছে। আমার অজ্ঞাতে ইহা হইতে পারে না। আমি ইহাতে একেবারেই সম্মত নহি জানিবে। এরূপ বন্দোবস্ত না করিলে যদি তোমাদের কাগজ না চলে, তাহা হইলে উহা অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিও। প্রেসের সহিত উহার account শোধ আছে কিনা, দেখিবে।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

"শুভাকাঙ্ক্ষী" পাঠও ছিল না। বুঝিলাম, অবস্থা সঙ্গীন। প্রথম দিককার অনুযোগ মিথ্যা, সুতরাং জবাব ছিল। কিন্তু শেষের অ্যাকাউন্ট

সংক্রান্ত পংক্তিটি মারাত্মক রকম সত্য। অশোক চট্টোপাধ্যায় অথবা আর কাহারও সহিত পরামর্শেরও সময় ছিল না, কর্তা সঙ্গে সঙ্গে জবাব চাহিয়াছেন। আমার যাবতীয় ডিপ্লোম্যাটিক বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া একটি জবাব মুসাবিদা করিলাম। প্রথম অভিযোগের উত্তরে লিখিলাম :

> বাহিরের আর পাঁচটা কাজ যেমন হইয়া থাকে 'শনিবারের চিঠি'ও প্রবাসী প্রেসে সেই ভাবে ছাপা হয়। বাহিরের অন্য কাজের সহিত আপনি যেমন সম্পর্করহিত, 'শনিবারের চিঠি'র বেলাতেও তাই। তবে আপনি যদি মনে করেন ইহাতে আপত্তিকর রচনাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি বলিলেই ইহার মুদ্রণ অন্য ছাপাখানায় স্থানান্তরিত করিব। আমাকে যদি জানাইবার অসুবিধা হয় আমি খুড়দাকে [অশোক] বলিব, তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, একটি বাহিরের পার্টির সহিত প্রেসের যেরূপ বন্দোবস্ত 'শনিবারের চিঠি'র সহিতও তদ্রূপ, তাহার অধিক নহে। আপনার সহিত ইহার যে কোনও সম্পর্ক নাই, সে কথা আমরা আমাদের পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপিত করিয়াছি দেখিয়া থাকিবেন।

হিসাব ব্যাপারে যাহা লিখিলাম, তাহার মোদ্দা কথাটা এই যে, 'শনিবারের চিঠি' গরিব এবং আমাদের একান্ত শখের জিনিস। ঠিক সময়ে টাকা না দিলেও ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। যদি কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় এই কারণে বলি, ইহার জন্য আমার বেতন জামিন রহিল।

পিওন পত্র লইয়া টাউনশেণ্ড রোডে চলিয়া গেল। বিকালে ছুটি হইবার পূর্বেই জবাব পাইলাম :

> কল্যাণীয়েষু,
>
> [অমুক] শনিবারের চিঠির বন্দোবস্ত ভুল বুঝিয়াছিল। যেরূপ বন্দোবস্তের কথা তুমি লিখিয়াছ, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। এবং তাহা করিবার জন্য খুড়র আমাকে জিজ্ঞাসা করিবারও দরকার নাই। তোমরা তোমাদের কাগজে লিখিয়াছ যে, উহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই এবং আমিও লোককে তাহাই বলি; এইজন্য আমি amalgamationএ আপত্তি করিয়াছিলাম। কারণ, আমি উহা supervise করিতে চাই না, পারিবও না।
>
> প্রেসের টাকা দিতে অল্প-স্বল্প বিলম্ব বাহিরের অন্য কাজেরও হয়।
>
> শুভাকাঙ্ক্ষী
>
> শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আসলে স্নেহপরায়ণ পিতা পুত্রদের যেমন অতিশয় ভালবাসিতেন তেমনই ভয়ও করিতেন। পাছে এই ব্যাপার লইয়া অশোক আঘাত পান—এই কারণে তিনি স্বয়ং তাড়াতাড়ি এই প্রসঙ্গ চাপা দিলেন, আর উঠিতে দিলেন না। মামলা সূত্রপাতেই মিটিয়া গেল এবং 'শনিবারের চিঠি' আরও বৎসরাধিককাল 'প্রবাসী' প্রেসের আশ্রয়েই রহিয়া গেল। সে আশ্রয় ঘুচাইলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কেমন করিয়া তাহা বলিতেছি।

নূতন বিরাগের গোড়াপত্তন হইল বৈশাখেই। সম্পাদক নীরদচন্দ্র একটি বেনামী প্রবন্ধ লিখিলেন—"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—পেন্সিল ড্রয়িং", "তাঁহার 'কালি-কলমের পেশা'র পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে"। প্রবন্ধটি মোটের উপর নিরীহ অথচ উচ্চাঙ্গের রচনা। লেখক প্রমথ চৌধুরী ও মানুষ প্রমথ চৌধুরীর রচনা ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক এমন সরস লেখা আর প্রকাশিত হয় নাই। নীরদচন্দ্র লেখক ও মানুষের সামঞ্জস্য বিধান করিতে প্রভূত জ্ঞান ও মুনশীয়ানা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় প্রবন্ধ কিঞ্চিৎ ব্যাজস্তুতিমূলক হইতে বাধ্য। হইয়াছিলও তাহাই। ফলে চিন্তালেশহীন বঙ্গীয় বিদগ্ধমহলে বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইল। তাহার ফেনপুঞ্জ রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়া বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। ইহা স্বাভাবিক, শুধু জামাতা হিসাবে নয়, বন্ধু ও ভাষায় তখন সমানধর্মী বলিয়া চৌধুরী মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ-সমীহ করিতেন। তাঁহার ক্ষোভ যে ক্রমশ ক্রোধে পরিণত হইতেছে লোকপরম্পরায় তাহা জানিতে লাগিলাম।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্যধর্ম" প্রবন্ধ লইয়া যে গোলযোগ শুরু হইয়াছিল, ১৩৩৫ সালের বৈশাখে নীরদচন্দ্রের এই প্রবন্ধও অনুরূপ কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

> প্রমথবাবুর জীবন একটা ট্র্যাজেডি। প্রমথবাবু "পলিটিকস, ইকনমিকস, শিক্ষা, সমাজ, হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম ইত্যাদি যে কোন একটা অথবা সব কটা নিয়ে অতি গম্ভীর ও অতি রাগত ভাবে নানারূপ প্রভুসম্মত বাণী ঘোষণা" করিতে পারেন না, ইহাই তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি নয়। তাঁহার জীবনের ট্র্যাজেডি ইহাই যে এই বৈদগ্ধ্য-বর্জিত বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করার ফলে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহার অতি তুচ্ছ রসিকতাকেও লোকে একটা গুরু-গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্ব বলিয়া ভুল করিয়া বসে। আমরা বিষবৃক্ষের ফলের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু বিষবৃক্ষে কি ফুল ফুটে না? প্রমথবাবু বৈদগ্ধ্য-বিষবৃক্ষের ফুল।

যে সমাজ তাঁহার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে মাথায় করিয়া রাখিত সে সমাজ আর নাই। যে সমাজ কোনো অবস্থাতেই তাঁহাকে লেখক, দার্শনিক, পণ্ডিত, যুগপ্রবর্তক বলিয়া ভ্রম করিয়া তাঁহাকে মনে কষ্ট দিত না, সে সমাজ আজ কোথায়?...বড় দেরি হইয়া গিয়াছে। প্রমথবাবুর স্বধর্মী ধর্ম-অর্থ-কামশাস্ত্রজ্ঞ পাটলিপুত্রকদের ধূলি আজ ধরণীর ধূলির সঙ্গে মিশিয়া দিকে দিকে উড়িতেছে। তাই যে বিদগ্ধচূড়ামণি, নগর ও উজ্জয়িনী, বিদিশা ও কৌশাম্বীর গৌরব ও মুকুটমণি হইতে পারিত, সে অদৃষ্টের ফেরে "ফিলিস্টিন"-শাসিত কলিকাতা-শহরে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্য বোঝা বহিতেছে।

এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আলোচনা ও কটূক্তির ঝড় উঠিল, একসঙ্গে পঞ্চাশটা তোপ এদিকে ওদিকে সেদিকে গর্জিয়া উঠিল। ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচি প্রমুখ মহাপণ্ডিতেরাও রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মেলনের উচ্চাসন হইতে আমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপ করিলেন। আমরা সংখ্যালঘু, আমাদের অক্ষৌহিণীতে মাত্র দুই পদাতিক—সম্পাদক নীরদচন্দ্র এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক সজনীকান্ত। আমরা এই সকল আক্রমণকারীর সম্মুখীন না হইয়া একটু তির্যক পথ ধরিলাম। এইরূপ করিবার সঙ্গত কারণ প্রতিপক্ষই যোগাইয়াছিলেন। প্রথমে এই কয়েকটি সাময়িক পত্র রণদামামায় ঘা দিলেন —'ফরোয়ার্ড' 'বাংলার কথা' 'আত্মশক্তি' 'নবযুগ' 'কালি-কলম' 'নাচঘর'। ইঁহারা কেহই সরাসরি জবাব দিলেন না। 'বাংলার কথা' বলিলেন, প্রবন্ধ-লেখক "অতিশয় কৃশ," সুতরাং তাহার রুচি নীচ হওয়াই স্বাভাবিক; 'আত্মশক্তি' বলিলেন, লেখক "অতিশয় বেঁটে" হওয়াতেই এইরূপ ঘটিয়াছে; 'নবযুগ' বলিলেন, লেখক উন্মাদরোগগ্রস্ত এবং অকারণে "রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়"; বাপ তুলিতেও ইঁহারা দ্বিধা করিলেন না।* এই বিপুল "বদজবান"কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমরা খোদ প্রমথ চৌধুরীকে শরজর্জরিত করাই সাব্যস্ত করিলাম। জ্যৈষ্ঠে আমি লিখিলাম, "বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের দান"—তাঁহার 'সনেট পঞ্চাশৎ'এর যাবতীয়

* পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল যাঁহাদের আয়ত্তে আছে, তাঁহারা নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি দেখিতে পারেন: 'বাংলার কথা' ২২শে বৈশাখ ১৩৩৫; 'Forward' May 13, 1928; 'আত্মশক্তি' ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।

দুর্বলতা বিশ্লেষণ ও "প্যারডি" করিয়া দেখাইলাম। বলা বাহুল্য, প্রশংসাচ্ছলে সবিনয়ে বলা হইলেও লেখাটিতে যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্য ও ইয়ার্কির অসম্মান ছিল। তবে আমার বিশ্বাস, কাব্যহিসাবে 'সনেট পঞ্চাশৎ'এর অসার্থকতা কথঞ্চিৎ প্রকট করিতে পারিয়াছিলাম। চৌধুরী মহাশয়ের আদর্শে রচিত আমার দুইখানি সনেট সর্বাধিক আঘাত হানিয়াছিল এবং সে সময় মুখে মুখে চলিয়াও গিয়াছিল। এই যুগের পাঠকদের কাছে সেই জোড়া সনেট পুনরায় নিবেদন করিতেছি :

বালিগঞ্জ

সার্থক ধরেছ নাম ওগো বালিগঞ্জ।
বারিধির বেলা নহ তবু তালী নীল।
তাই বুঝি পথে পথে উড়ে গাংচিল—
মৎস্য-লোভে এক ঠ্যাঙ্গে বসে যেন খঞ্জ।
মধুরে বহিছে হেথা সদাই প্রভঞ্জ,
মনে নাই, বুকে নাই, ঘরে নাই খিল;
ধনে মানী সকলেই, উচ্চকুলশীল—
তোমাতে যে বাসা বাঁধে হৃদি তার রঞ্জ।

সানি পার্ক, রেনি পার্ক, লাভলক প্লেস—
নিশাশেষে প্রেয়সীর যেন কণ্ঠাশ্লেষ।
দিক-দৌড়া মাঠে তব ঘোড়ার টহল,
বয়-বাবুর্চিরা ঢুলে দেয়ালে হেলিয়ে,—
তুমি এই নগরীর বেগম-মহল,
সবে ডাক অভিসারে নয়ন খেলিয়ে॥

বেগুন

আলু নহ, কদু নহ, তুমি যে বেগুন।
লজ্জায় বেগুনী বুঝি কালো তব দেহ!
পোড়ায়ে কাঠের আঁচে সাথে তিল-স্নেহ
নুন আর লঙ্কা, তুমি নহ তো বে-গুণ।
বৃক্ষমাঝে মূল্যবান যেমন সেগুন,
আনাজেতে তুমি তথা; গরিবের গেহ

আলো করি ঝোলো যেন বিভু-"অম্বুলেহ"—
সীমাহীন বারিধির কোরাল লেগুন।*
ভাজিতে, অম্বলে, ঝোলে কিম্বা নিম-সঙ্গে
বসন্তের† রঙ্গ ভাঙ্গ অপাঙ্গ ভ্রূভঙ্গে।
বেসনলেপিত অঙ্গে ভাজি হয়ে তৈলে
সুরা-সংযোগে তুমি ফাউলের বাবা,
গরীবের চলে নাক' তুমি সখা নইলে,
হিন্দুর প্রয়াগ তুমি, মুসলিমের কাবা॥

জ্যৈষ্ঠে নীরদচন্দ্র আরও মারাত্মক অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন—"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—জের"। স্পষ্টত বলিয়া ফেলিলেন :

> প্রমথবাবুর যে বৈশিষ্ট্য সকলের আগে লোকের চোখে পড়ে, সেটা তাঁহার রচনার গুণ অথবা দোষ নয়, তাঁহার টেম্পারামেণ্টের বিশেষত্ব। তাঁহার সকল রচনাতেই এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখিতে পাই। এই মার্কা-মারা বিশেষত্বের একটা সৌন্দর্য ও আকর্ষণ আছে তাহা আমরা মানি। সমাজবিশেষে ইহার প্রয়োজনীয়তাও আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি : কিন্তু আমাদের দেশে, আমাদের কালে, প্রমথবাবুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের এই উগ্র ও অবিরত আত্মপ্রকাশ ও তাঁহার ইন্টেলেক্‌চুয়াল ফ্রিভোলিটি —শিক্ষা, সাহিত্য ও "কালচারে"র পক্ষে একটা গুরুতর অনিষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ও-পক্ষে গালাগালির বন্যা প্রবলতর হইল। আমরাও সংযত থাকিতে পারিলাম না। আক্রমণে আক্রমণে আমাদের সরস চিত্তও তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেটা আমাদের অপরাধ সন্দেহ নাই। আষাঢ়ে ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষের সাহায্য লইয়া আমি লিখিলাম "পণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী" প্রবন্ধ, পূর্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড ; ইহাতে তাঁহার সংস্কৃত-পাণ্ডিত্যের যে কতখানি অভাব তাহা দেখাইলাম। হালকা ইয়ার্কি এবারে গভীর অসম্ভ্রম হইয়া উঠিল। ফলে আমরা আমাদের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক বহু বিদগ্ধজনের বিরাগভাজন হইলাম। রবীন্দ্রনাথ "নটরাজ" ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ ছিলেন। "প্রমথ চৌধুরী" ব্যাপারে তাঁহার ক্ষুব্ধতা ক্রোধে পরিণত হইল। তাঁহার ক্রোধ আমাদের ক্ষতির কারণ হইতে বিলম্ব হইল না।

---

* Coral Lagoon

† মা শীতলা।

এই কলহ-কচকচির মধ্যে একা মোহিতলাল বাংলা-সাহিত্য-বিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধ ও আলোচনা দিয়া 'শনিবারের চিঠি'র ওজন ঠিক রাখিয়া চলিলেন। শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মৈত্র ও আমার নিছক দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সমালোচনামূলক ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ারও দাঁড়িপাল্লার দক্ষিণ দিক সামাল দিয়া চলিতেছিল। মোটের উপর তখন আমাদের কলমে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের যেন বান ডাকিয়াছিল, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা আত্মসমালোচনামূলক হওয়াতে অনেকের প্রশংসালাভও করিয়াছিল। বনবিহারীবাবুর "সাম্য" কবিতাটি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বহু সভায় এই কবিতার আবৃত্তি হইয়াছে, বহু রসিক ইহা মুখস্থ করিয়াছেন। প্রথম স্তবকটি এই :

হিস্টলজির পাতায় না কি মিললো প্রমাণ,
বর্তমানের ওম্যানরা সব ম্যানের সমান।
কাজেই স্ত্রীরা ফেল্‌লো ছেঁটে ঘাড়ের রোঁয়া,
দু নাক দিয়ে ছাড়লো চুরুট-বিড়ির ধোঁয়া,
ভোট কুড়ালো, ফুঁড়লো কলেজ।
তেল পুড়ালো, চুঁড়লো নলেজ।
লিখলো নভেল, লিখলো নভেল,—লিখলো নভেল।
চেনাই কঠিন নর কি নারী, আস্‌লি না ভেল।

শিল্পী শ্রীহরিপদ রায়ের অপরূপ চিত্র লেখাটিকে আরও চমকপ্রদ করিয়াছিল। "বিচিত্রা"-ভবনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সভার আমার রচিত কবিতার ক্যাপশনসহ যে "চিপোর্ট" (চিত্র+রিপোর্ট) বৈশাখে বাহির হইল তাহাও হরিপদ রায়ের কার্টুন-কেরামতির বিশিষ্ট নিদর্শন। বস্তুত তিনি কার্টুন-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কমার্শিয়াল আর্টের ক্ষেত্রে চলিয়া যাওয়াতে বাংলা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সেদিনের যুগাবনতিকে ব্যঙ্গ করিয়া আমার "সোনার পাথরবাটি" (বৈশাখ, ১৩৩৫) কবিতাটি এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, পরে কাজী নজরুল ইসলাম ইহাতে সুরযোজনা করিয়া স্বয়ং কলিকাতা বেতার-আসরে গাহিয়াছিলেন। অংশত তাহা এই :

হায় রে—
"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা!"—
বারি নাই একবিন্দু তবু পূর্ণ ঘড়া।
মন নাই মনস্তত্ত্ব যায় গড়াগড়ি,
মাথা নাই মগজের বহরেতে মরি।

পৌরুষ নাহিক আছে দর্প পুরুষের,
বিদ্যা নাই পেটে তবু ফোয়ারা বাক্যের
নিত্য উৎসারিত হয় হাটে মাঠে বাটে,
যে গরু দেয় না দুধ মরি তার চাটে।
হায় রে!…

হায় রে—
যে গুটি পাকিল পুন কাঁচিয়া তা যায়,
ধর্ম এসে ঠেকিয়াছে গোবর-ন্যাতায়।
বোমা কেঁচে হ'ল কালী-পূজার আতস
প্রেমে প'ড়ে বিপ্লবীর বিষম ধাধস।
পূজার মণ্ডপ হ'ল গাঁজার আসর,
রাষ্ট্রে ধর্মে ভূতো ক্ষেন্তি জাগিছে বাসর।
পড়িছে দশের পিঠে বেটনের গুঁতা,
হোটেলে বোতল শুঁকে নেতাদের ছুতা—
হায় রে!

আমাদের এই মানসিক অধোগতির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া একটা হদিস বাংলাইতে অধ্যাপক রঙীন হালদার 'শনিবারের চিঠি'র আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বন্ধুবর গোপাল হালদারের সুবাদে আমাদেরও দাদা, 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকাল হইতে শুভানুধ্যায়ী ও সমর্থক। তিনি তখন পাটনা বি. এন. কলেজের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। সেখান হইতেই আমাদের অকুণ্ঠিত তারিফ করিতেন। "আর্ট ও মনোবিকলন" মতে অতি-আধুনিক লেখকদের অন্তরগহনের কামনারহস্য তিনি উদ্‌ঘাটন করিলেন। জ্যৈষ্ঠের প্রথম প্রবন্ধরূপে ইহা প্রকাশিত হইল। সোরগোল পড়িয়া গেল। কে লিখিল, কে লিখিল—প্রশ্ন চারিদিক হইতে উত্থিত হইল। গিরীন্দ্রশেখর আমাদের সমর্থক ছিলেন, তাঁহাকে দায়ী করা গেল না কারণ লেখক, গিরীন্দ্রশেখরের "মনো-ব্যাকরণ" সংজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া রবীন্দ্রনাথের "মনোবিকলন" সংজ্ঞা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মনোবিকলনগত সমর্থন পাইয়া আমাদের জোর বাড়িল। অধ্যাপক হালদারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আজও পর্যন্ত বাতিল হইয়া ইতিহাসের কুক্ষিগত হয় নাই। সুতরাং তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে:

আজকাল বাংলা মাসিক-সাহিত্যে সাইকো-অ্যানালিসিসের নামে যা চলিতেছে তা দেখিলে মনে হয়, অশিক্ষিতপটুত্ব আর যেখানেই চলুক বিজ্ঞানে চলে না। আচার্য ফ্রয়েড যদি বাংলা পড়িতে পারিতেন, তবে বোধ হয় তিনি পুস্তকপ্রণয়ন বন্ধ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন।···আজকালকার নবীন সাহিত্যিকের দল ফুল-ফলের সঙ্গে সারের কোনো প্রভেদ নাই বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের লেখা পড়িলে মনে হয়, মানুষ সজ্ঞানে কামোপহত হইয়াই ঘুরিয়া মরিতেছে। মনোবিকলনের মতে মানুষের বহু চিন্তা, বহু ইচ্ছা অ-জ্ঞানের যৌন-এষণা দ্বারা নিয়মিত হয় সন্দেহ নাই; এবং ইহা মানসিক নিয়তিরই (psychical determinism) অন্তর্গত। অ-জ্ঞানের যৌন ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইলেই যে, সকল চিন্তা সকল ক্রিয়াজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যৌনতার দিকে ধাবিত হইবে—তা নয়। সুতরাং, পৌরুষ-কামোন্মাদের (satyriasis) ও নারীয়-কামোন্মাদের (nymphomania) চিত্র আঁকিয়া যদি কেহ বলেন, ফ্রয়েডের মতে এই-ই আসল মানুষের চিত্র, তবে সেই সত্যান্বেষী মনোবিদ্‌কে অপমানই করা হইবে।···ফ্রয়েড কখনও "কামকে জীবনের কাম্য বস্তু" বলেন নাই, এবং আধুনিক সাহিত্যের এই যৌন অতিবেদনের (sexual hyperaesthesia) সহিত ফ্রয়েডের মনোবিকলনের কোনো সম্পর্ক নাই।

মোটের উপর, এবার আমরা আটঘাট বাঁধিয়াই অগ্রসর হইতেছিলাম, ক্ষুরধার শাণিত ব্যঙ্গের তরবারি পাণ্ডিত্যের খাপে মুড়িয়া শুধু যুদ্ধজয় নয়, বিপক্ষকে তাক লাগাইবারও বাসনা জন্মিয়াছিল। এই ব্যাপারে শুধু একাধিক বঙ্গীয় পণ্ডিতই আমাদের সাহায্য করেন নাই, বিদেশী মহাপণ্ডিতদের কোটেশন সংগ্রহও বড় কম করি নাই। কিন্তু এই সাফাই সংগ্রহ আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। শুধু প্রতিপক্ষের কোটেশন-লাঞ্ছিত উত্তেজনাই আমাদিগকে স্বধর্মভ্রষ্ট করিয়াছিল। আমাদের সম্পাদক নীরদচন্দ্র তখন কোটেশন-প্রয়োগে অদ্বিতীয় ছিলেন—এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। লারসফুকো-প্যাস্কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত তাঁহার নখাগ্রে ছিল। সুতরাং কোটেশন-সংগ্রামে প্রতিপক্ষকে অচিরাৎ হটিতে হইল; নিছক ব্যঙ্গের দিক দিয়া অশোক চট্টোপাধ্যায়ও এ বিদ্যায় কম পারদর্শী ছিলেন না। আমার যতদূর স্মরণ হয়, এই কোটেশন-কণ্টকিত পাণ্ডিত্যযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যে এই পর্বেই শেষ হইয়াছে, নিতান্ত টেক্‌নিকাল প্রবন্ধ ছাড়া কেহ বড় একটা কোটেশন ব্যবহার করেন না। সাধারণ জনপ্রিয় প্রবন্ধে

বিদেশী বা স্বদেশী পণ্ডিতদের নজিরও আজকাল দৃষ্টিকটু বিবেচিত হয়—বড় একটা দেখা যায় না; আমাদের ব্যঙ্গে চূড়ান্ত প্রয়োগের দ্বারা এই পদ্ধতির প্রায় জীবনান্ত ঘটাইয়াছিলাম।

চতুর্থ তরঙ্গ

"ধর্মরক্ষা"

ঈর্ষা হইতেও হীনতর রিপু হইতেছে মদ বা গর্ব, এবং মাৎসর্য বা পরশ্রীকাতরতা অপেক্ষা মারাত্মক হইতেছে ধর্মের বা পরকল্যাণের ভান। "প্রমথ চৌধুরী" প্রসঙ্গে বারংবার আক্রান্ত হইয়া আমরা অকারণে উদ্ধত ও দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছিলাম। প্রতিপক্ষ দলে ঈর্ষা করিবার মত কাহাকেও না পাইয়া আমরা পাণ্ডিত্যমদভরে স্বয়ং চৌধুরী মহাশয়কেই নস্যাৎ করিতে বসিলাম। পরশ্রীকাতরতায় প্রবৃত্তি না হওয়াতে সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া অতি-পাণ্ডিত্যের ভানও করিয়া ফেলিলাম। আমাদের শুভানুধ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ এই বাড়াবাড়িতে অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে বিলম্ব হইল না; তিনি সম্মানের উপহার অর্থাৎ "কম্‌প্লিমেণ্টারি" 'শনিবারের চিঠি'র পরবর্তী সংখ্যা স্বহস্তে "রিফিউজড্''—"অগ্রাহ্য'' লিখিয়া ফেরত পাঠাইলেন। প্রধানতম পৃষ্ঠপোষকের এই বিমুখতায় সাময়িক মদোন্মত্ত আমাদের শঙ্কা বা লজ্জা হওয়া দূরে থাকুক, আমরা চৌধুরী মহাশয়কে অপদস্থ করিবার জন্য আরও নির্মম হইয়া উঠিলাম।

অবশ্য কিছু উত্তেজনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষ হইতেও আসিয়াছিল। প্রমথ-প্রসঙ্গে যতই মনোমালিন্য ঘটুক, রবীন্দ্রনাথের স্নেহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার একটা সুযোগ স্বয়ং মা সরস্বতী ঘটাইয়াছিলেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাল্গুন—২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৮, কলিকাতায় সিটিকলেজ-সংলগ্ন রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে সরস্বতীর প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার দাবিতে কলেজের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের সংঘর্ষজনিত গোলযোগের সূত্রপাত হয়। অন্যায় কারণে আন্দোলনের নামে ছাত্রসমাজের ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতার ইহাই আরম্ভ, আমি আমার জ্ঞানে এইরূপ অবাঞ্ছিত ঘটনা ইহার পূর্বে ঘটিতে দেখি নাই। সুতরাং ইহা একটি গুরুতর জাতীয় শুভাশুভমূলক ঘটনা, ঘটনাটিকে ঐতিহাসিকও বলা চলিতে

পারে। তদানীন্তন বহু স্থানীয় প্রসিদ্ধ নেতা অন্যায় জানিয়াও এই ব্যাপারে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিয়া নেতৃত্ব কায়েম করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জে. এল. ব্যানার্জি), শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতারা পুরোভাগে দাঁড়াইলেন; অমৃতলাল বসু, পঞ্চানন তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্তক বংশধর বিজয় সিংহ প্রভৃতি হিন্দু-কুলতিলকরাও কোমর বাঁধিয়া যোগ দিলেন। রাস্তায় রাস্তায় ঘোর লাল কালিতে ছাপা প্রচারপত্রে "হিন্দু রিলিজিয়ন ইন্‌সাল্টেড, ডোণ্ট জয়েন সিটি কলেজ" প্রত্যাদেশের মত জনসাধারণের ভীতির সঞ্চার করিল। সিটি কলেজের যায়-যায় অবস্থা। চারিদিকে "সাজ-সাজ, মার-মার, ভাঙ-ভাঙ" রব উঠিল; কাটতি-বৃদ্ধির সুযোগ বুঝিয়া কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্র চমকপ্রদ ছবি এবং মিথ্যা ও কল্পিত সংবাদ ছাপিয়া ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। পথে পথে, পার্কে পার্কে সভা; হ্যাণ্ডবিল এবং কেচ্ছা ও ছড়া-পুস্তক যে কত বাহির হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। সিটি কলেজের নিরীহ কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গনিলেন, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ অকারণে এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়া কোণঠাসা হইতে বসিলেন। ক্ষিপ্ত ছাত্রসমাজকে শান্ত করিবার জন্য 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার আসরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হইলেন। 'শনিবারের চিঠি'র মারফতে আমরা কয়েকজনও সিটিকলেজ-পক্ষে যোগ দিলাম, তবে নিতান্ত শান্ত নিরীহ ভূমিকায় নয়, কিঞ্চিৎ "যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি" ভাবে। আমাদের উষ্মা যে ন্যায়ানুমোদিত—এই বিশ্বাস আমাদের ছিল। কেন ছিল তাহা বুঝাইতে আসল ঘটনার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, কয়েকটি সংবাদপত্রের সংবাদে ও চিঠিপত্রে নিছক মিথ্যা বিবরণী তখন প্রচারিত হইয়াছিল। ঘটনা এই:

রামমোহন রায় ছাত্রাবাসের কয়েকজন ছাত্র সেখানেই প্রতিমা স্থাপনপূর্বক সরস্বতীপূজা করিতে চাহিলে কর্তৃপক্ষ তাহাতে রাজী হন না। পরে তাঁহাদের অনুমতি অনুসারেই স্থির হয়, ছাত্রাবাসের বাহিরেই পূজা হইবে। কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রেরা রাতারাতি ছাত্রাবাসের প্রাঙ্গণে প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার বন্দোবস্ত করিলে ছাত্রাবাসের পরিচালক অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় তাহাতে বাধা দেন। ইহা সত্য যে, তিনি এই সময়ে অধ্যাপকোচিত স্থৈর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অবশ্য এই কারণে তিনি ও কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনধিকারী ছাত্রেরা অন্যায় অধিকার সাব্যস্তের এই সুযোগ ছাড়েন নাই, তাঁহাদের তাতাইবার লোকেরও অভাব হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা

শহরময় রটিয়া গেল যে, মৈত্র মহাশয় শুধু সরস্বতী-প্রতিমাই ভাঙিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করেন নাই, লাঠির আঘাতে কলেজের দারোয়ানদের নিত্যপূজিত শিবলিঙ্গও দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বাস্, আর যায় কোথায়! বহু-দিনের বহু লোকের যত্নে ও অর্থে তিলে তিলে গড়িয়া তোলা একটি জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিবার পক্ষে সেদিন এই সম্পূর্ণ মনগড়া সংবাদই যথেষ্ট বিবেচিত হইল। এইরূপ ঘটনা সেই প্রথম বলিয়া আমরাও কোমর বাঁধিয়া প্রতিবাদ করিতে ছুটিয়াছিলাম; আজ হইলে নিশ্চয়ই সে সাহস করিতাম না। তখনও "চল্‌বে না, চল্‌বে না" শ্লোগান বা ধ্বনির আবির্ভাব এ দেশে ঘটে নাই।

যাহা হউক, এক-সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইলাম। রবীন্দ্রনাথ 'মডার্ন রিভিউ'য়ে এক পত্র এবং ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে "সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী-পূজা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। এই প্রবন্ধের মূল পাণ্ডুলিপি এবং পর পর দুইবার ব্যাপক পরিবর্তন সম্বলিত প্রুফ আমার নিকট আছে। অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছিল যে, সত্য কথা বলিবার জন্যও রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি'তে আমরা ছিলাম বেপরোয়া। আমরা বলিতে একা প্রায় আমিই, অন্যেরা ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্কের দরুন কড়া কিছু লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। আমি নির্ভেজাল হিন্দু, সুতরাং হিন্দুর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিতে আমার দ্বিধা হইবার কথা নয়; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দের নজির সম্মুখে জ্বলজ্বল করিতেছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও তৎকালীন ব্রাহ্মপ্রধানদের সাময়িক সঙ্কীর্ণতার দরুন তখন হিন্দুত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার মন্তব্যেও জোর পাইলাম। তিনি লিখিলেন:

> আমাদের দেশে বরযাত্রীরা প্রায়ই নিরুপায় কন্যাকর্তার অতিথিরূপে তাকে অন্যায় উৎপীড়ন করে থাকে। তাতে প্রমাণ হয়, যেখানে নিরাপদে জোর খাটাতে পারি সেখানে উপদ্রবের দ্বারা অন্যকে অপদস্থ ক'রে নিজের প্রভুত্ব প্রমাণ করাতে আমাদের আনন্দ। এই মনোবৃত্তিকে গৃহস্থের ঘরে, বা শিক্ষার ক্ষেত্রে, বা রাষ্ট্রিক দলাদলিতে যদি আমরা সর্বদা প্রবল হতে দেখি, যদি দেখি পরের মতকে গায়ের জোরে চাপা দিতে, পরের বৈধ স্বাতন্ত্র্যকে অবৈধ উপদ্রবের দ্বারা বিপর্যস্ত করতে আমাদের সঙ্কোচ নেই, তবে সেটা কি গভীর উদ্বেগের বিষয় নয়?

প্রতিমাপূজার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও যে সিটি কলেজকে দেশের সকল সম্প্রদায় অনায়াসে এতকাল স্বীকার ও ব্যবহার ক'রে এসেছে আজ তাকে নানা উৎপাতে ধ্বংস ক'রে দেওয়া দুঃসাধ্য না হতে পারে কিন্তু এই আঘাতে আমাদের দেশের এক সম্প্রদায়ের মনে যে কাঁটা-গাছ রোপণ ক'রে দেওয়া হবে, সেটা দিয়ে আমাদের এই শতধাবিচ্ছিন্ন দুর্ভাগা দেশে আস্ফালন করাতে কি পৌরুষ আছে, না তাতে ধর্মবুদ্ধি বা কর্মবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়? সবশেষে এঁদের কাছে আমার এই বক্তব্য, নীতিকথা যখন যেমন সুবিধা তখন তেমন ক'রে বলা চলে না। পরের প্রতি আমার ব্যবহারে ও আমার প্রতি পরের ব্যবহারে কর্তব্য-নীতির পার্থক্য করা অসঙ্গত। ভারত-রাজ্য-শাসন যাঁদের হাতে তাঁরা খৃষ্টান,—জোর আমাদের সকল পক্ষের চেয়েই তাঁদের বেশি। সেই সঙ্গে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের প্রতি খৃষ্টানের অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের অভাব নেই। তৎসত্ত্বেও খৃষ্টান কর্তৃপক্ষ আমাদের গৃহে, দেবালয়ে, বিদ্যায়তনে জোর ক'রে খৃষ্টান উপাসনা-বিধির প্রবর্তন করেন নি।...যাঁরা গোবর জল, পাঁক ও পানের পিকবর্ষণ, জুতোর মালা ও লগুড়াঘাতের সাহায্যে তাঁদের পবিত্র ধর্মকে জয়যুক্ত করবার পৌরুষ প্রকাশে উদ্যত ও এই রোমাঞ্চকর অধ্যবসায়ে দেশাত্মবোধী ধার্মিকদের কাছ থেকে উৎসাহ পাচ্চেন, অন্তত বাধা বা লেশমাত্র তিরস্কার পাচ্চেন না, একান্ত মনে আশা করি, তাঁদেরই শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠ গুরুদের কাছ থেকে আমাদের ম্লেচ্ছ কর্তারা যেন ধর্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ না করেন।

রবীন্দ্রনাথের কথাগুলির প্রয়োজনীয়তা আজিও নিঃশেষিত হয় নাই। অন্যায় অবাঞ্ছিত জবরদস্তি শিক্ষাক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, সমাজে ও রাষ্ট্রে দিনে দিনে ব্যাপক ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

আমি আমাদের 'শনিবারের চিঠি'তে একটি মারাত্মক কালাপাহাড়ী স্যাটায়ার "হিন্দু রিলিজিয়ন ইনসাল্‌টেড—(স্বপ্নদর্শন)" প্রকাশ করিলাম। অশোক "এই কি হিন্দু জাগরণ" এবং যোগানন্দ "নায়মাত্মা চৌর্য্যেণ বা লভ্যতে" লিখিলেন বটে; কিন্তু আমার রাইফেলী বুলেটের তুলনায় সেগুলি মৃদু লাঠিচার্জ মাত্র বলিয়া বোধ হইল। 'মধু ও হুলে' আমার নিবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রাবণে বাহির হইল আমার "ধর্ম্মরক্ষা"—সচিত্র ব্যঙ্গ-কবিতা। সিটি কলেজকে ধ্বংস করিতে অ্যালবার্ট হলে যে বিরাট সভা হইয়াছিল তাহাকেই

ব্যঙ্গ করিয়াছিলাম। কবিতাটি সেকালে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল, নেতাদের সদৃশ-প্রতিকৃতি-সম্বলিত কার্টুন আঁকিয়া শ্রীহরিপদ রায় বিশেষ বাহবা পাইয়াছিলেন। আমি যাবতীয় বক্তার কুলজী-কোষ্ঠী ধরিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম। এই সিটি কলেজের সরস্বতী-পূজা ব্যাপারেই সুভাষচন্দ্র আমাদের "টার্গেট" হইয়াছিলেন, পরে দীর্ঘকাল প্রধানত এই রাগেই তাঁহার প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়াছিলাম। "ধর্ম্মরক্ষা" কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ :

অ্যালবার্ট হলে মহতী সভা,
টিকিতে বাঁধিয়া রক্তজবা
আসে দর্শক, আসিল শ্রোতা—
যেন বর্ষার খরস্রোতা
গঙ্গা নদীর গেরুয়া বান,
টিকি খাড়া আর খাড়া যে কান।
সভা গমগম স্টেজের মতো,
গোটা ও অটুট চেয়ার যত,
দেয়ালে ছিল না পানের পীচ,
সমানে ভরিল উপর নীচ।
কেশব সেনের মূর্তিখানা
বক্ষে সবার দেয় যে হানা ;
বামেতে দত্ত অশ্বিনীর—
তাঁর দিকটায় জমিল ভিড় !

* *

খোকা ভগবান আসিল নিজে
চোখের জলেতে বেজায় ভিজে।
বুকেতে কি জানি ঘটিল দোষ,
সাক্ষী বৈদ্য কুলীন বোস।
দেবদ্বিজে অতিভক্তিমান,
সন্ধ্যা করিয়া তামাক খান।
জগন্নাথের মহিমা জানে
চুল ছিঁড়ে আসে টিকির টানে।
ম্লেচ্ছেরে কহি প্যাক্ট-বচন
টিকির ধর্ম্মে দেছেন মন।

কেম্‌ব্রিজে আজ গজায় টিকি,
এল নবযুগ বৈদ্যুতিকী।
ছোটে গোঠে গোঠে খোকার বাণী
নববেদ বলি তারে বাখানি।
পণ্ডিতে কয়, "কল্কি নিজে
ধারণ করিল বি-পি-সি-সি যে!"
বিবাহযোগ্যা পান নি ক'নে
কেহ নাই বামে সিংহাসনে।
পদধূলি দিয়ে সে দুখ ভুলে,
নাক ডাকে শুধু চিতিয়ে শুলে।
হিন্দুয়ানির পাণ্ডা পাড়—
জয়রব তাই উঠিল তাঁর।...

আমার 'বঙ্গরণভূমে' কাব্যে সম্পূর্ণ কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

ভাবিয়াছিলাম ইহাতেই প্রমথ-দূষণ-ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ শান্ত হইবেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না। সেই শ্রাবণেরই (১৩৩৫) 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের খাস কলমচী শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর নামে 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রবন্ধ বাহির হইল—"সাহিত্য-ব্যবসায়"। ইহা দক্ষতর হস্তের বেনামী লেখা বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিলেন; তবে হাতের লেখার মত রবীন্দ্রনাথের ভাষাও যে চক্রবর্তী মহাশয় অনুকরণ করিতে পারিতেন না, এমন কথা আমরা ভাবি নাই। তিনি যে যথেষ্ট মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়াছিলেন, প্রবন্ধটির উদ্ধৃতাংশ হইতেই তাহা উপলব্ধি হইবে:

> এ কথা সত্য, বাংলা ভাষায় সম্প্রতি সহসা তারুণ্যের আস্ফালন সহকারে সাহিত্যবিকার দেখা দিয়েছে। সেটা বিলিতি ব্যাঙো এবং দরিদ্র নারায়ণের আর্তস্বর, কুশ্রী-কাল্পনিকতা, আত্ম-ঘোষণা ও মহত্ত্বের প্রতি অশ্রদ্ধায় মিশ্রিত ব্যাপার। অতি-তারুণ্যের পিছনে যশোবণিক সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষকতা যথেষ্ট ছিল, অধ্যাপনজীবীদেরও অসদ্ভাব ঘটে নি, কিন্তু মোটামুটি রচনায় তাঁরা প্রকাশ্যত বিধর্মী; ধার্মিক ব্যবসায়ীর আবির্ভাব হ'ল সর্বশেষে। এই সমাজ-সংস্কারকের দল সাহিত্যের কমলবনে প্রবেশ করেন পঙ্কোদ্ধারের সাধুসঙ্কল্পে; রাতারাতি এঁরা সাহিত্যের নীতি, আদর্শ, গতিবিধির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ক'রে দেবেন,

প্রশংসাপত্র, ব্যঙ্গচিত্র, অভদ্র সমালোচনা এঁদের হুকুমজারি, সাহিত্য-সিংহাসনে এঁরা শাসনদণ্ডধারী।...এই মলিন পন্থায় সাহিত্য-সমালোচনার সংযম ও শিষ্টাচার পরিত্যাগ ক'রে একদল বিদ্যাদাম্ভিক লেখক দেশমান্য সাহিত্য-স্রষ্টা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে ইতরভাবে আক্রমণ করলেন।

অর্থাৎ আমরা সরস্বতী-পূজার ব্যাপারে হিন্দুধর্ম-ধুরন্ধরদের চোখে হইলাম বিধর্মী কালাপাহাড় এবং সাহিত্যে রবীন্দ্রানুকারীদের নিকট হইলাম ধার্মিক ব্যবসায়ী। রবীন্দ্রনাথের কলমচীর খোঁচা খাইয়া আমাদের উত্তপ্ত মগজ উত্তপ্ততর হইয়া উঠিল ; এভারেস্টের দিকেও হাত বাড়াইব কি না এইরূপ জল্পনা আমাদের মধ্যে চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে "সাহিত্য-ব্যবসায়" প্রবন্ধের রচয়িতা যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—এই জনরব রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌছিল। ফলে যাহা ঘটিল ১৩৩৫ শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি' হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি। অশোক চট্টোপাধ্যায় "সাহিত্য-ব্যবসায়" প্রবন্ধে দশ দফায় অমিয় চক্রবর্তীকে একরূপ "নিকেশ" করিয়া সর্বশেষে লিখিলেন—

> ভবিষ্যতে অমিয়বাবু কিছু লিখিলে, আমাদের অনুরোধ যেন তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষা অলঙ্কার ও ভাবের বৃথা অনুকরণের চেষ্টা না করেন। আটপৌরে সংস্কার ও সাধারণ বুদ্ধির কথা সহজ ভাষায় প্রকাশ করিলে লেখক-পাঠক উভয়েরই সুবিধা।

মোহিতলাল "অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী বনাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" এই আলোচনায় লিখিলেন—

> স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জানিয়েছেন যে, জনরব মিথ্যা, ও-লেখা তাঁর নয় এবং ও-লেখার সঙ্গে তাঁর সহানুভূতিও নেই। জানি, জনরবটা বাইরের, আর রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ব্যক্তিগত, অর্থাৎ ভিতরের, এতে ক'রে জনরবকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সবটা প্রকাশ করবার অধিকার আমাদের নেই। এই মন্তব্য শুনে আমরা আবার ভাল ক'রে উক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর "সাহিত্য-ব্যবসায়" প্রবন্ধ প'ড়ে দেখলাম। এবারে আর সংশয় রইল না, সত্যই তো, এ লেখা রবীন্দ্রনাথের হতেই পারে না। অসম্ভব!

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাথার উপরেই রহিয়া গেলেন ; কিন্তু প্রমথ চৌধুরীকে আমরা ছাড়িলাম না, জের চলিতেই লাগিল। আমরা যখন তাঁহার

পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে সচেষ্ট, তখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক "ভদ্রবিবুধমণ্ডলী" সমালোচনায় নিম্নোদ্ধৃত উচ্চ আদর্শ দেখাইতে লাগিলেন :

[সম্পাদক নীরদচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া লিখিত]

শনিবারে পাও বুঝি সজনীর চিঠি ?
যাহা দেখ মার শুধু নাসিকার খোঁচা,
বোঁচা-নাক গুরুজীর ছাত্র তুমি ওঁচা।
কাছের কলেজে যাও নাম তার সিটি ॥
সজনী গায়েতে দেয় গোলাপী সেমিজ,
পছন্দ হয় না তব,—ভারি বেতমিজ !
কে জানে এমন তুমি ডাহা ইডিয়ট !

সুভাবচন্দ্র সরস্বতী-পূজা ব্যাপারে ছাত্রদের পক্ষে জেদ প্রকাশ করাতেই মামলা মিটিতে দেরি হইয়াছিল। অতি-আধুনিক সাহিত্যিক এবং তাঁহাকে জড়াইয়া আমি তখনই "মর্ত্য হইতে সরস্বতী-বিদায়" কবিতাটি লিখিয়াছিলাম :

কাতরে ভারতী কন, "শুন শুন দেবগণ,
আমার দুর্গতি বাখানিব,
মর্ত্ত্যেতে বাঙ্গালা নাম আছে অনঙ্গের ধাম"—
সভাজন কহে, "শিব, শিব !"
"সেথায় তরুণ দল জীবনে হয়ে বিফল
ব্রতী হ'ল সাহিত্যিক-ব্রতে,
মাসিক ছাপিয়া তারা অধীনীরে করে তাড়া—
অঙ্গ মোর ভরি দিল ক্ষতে।
বঙ্গের কি গাব গুণ, তরুণ টানিছে গুণ,
নয়ন অরুণ বারুণীতে ;
ভাসিতেছি বিভু স্মরি' কলার মান্দাস 'পরি
প্রগতি-কল্লোল-কালিন্দীতে।
অনঙ্গ ধরিয়া অঙ্গ শান্তি মোর করে ভঙ্গ,—
পীড়িতা নিতম্ব-স্তনভারে
লোলুপ-লালসা-লালা মুখ-বুক-করে জ্বালা,
ডোবে পদ্ম পঙ্কের পাথারে।

মরাল বাহন মম হয়েছে শকুনি সম,
শ্মশানে করিছে শবাহার,
বীণা ফেলে ঝাঁটাগাছি দেছে, তাই ধ'রে আছি
শতমুখী-সঙ্গীত-আধার।

বিমলিন নগ্ন গায় বসাল আমারে, হায়,
রাজপথে জনতার মাঝে,
কামাতুর দৃষ্টি হানি মোরে করে টানাটানি
বাঁচি আমি যদি মরি লাজে।

হংসপদ্মাসন যার আকাঙ্ক্ষিত কমলার,
বীণা যার মোহিল ত্রিদিব—
অনঙ্গের রঙ্গধামে মর্ত্যে খ্যাত বঙ্গনামে"—
দেবগণ কহে, "শিব, শিব!"
"সে নন্দন-নন্দিতার সীমা নাই লাঞ্ছনার
প্রজাপতি করহ বিহিত,
ক্লেদপঙ্কে করি বাস ছিন্নদেহ নগ্নবাস,
সবি মোর লাগে বিপরীত।
আমার পূজার ছলে মিলেছে তরুণদলে
আমারে করিতে বহিষ্কার,
নিত্য যেথা পূজা মোর সেথায় পশিয়া চোর
ধর্মছলে করে অধিকার।
পূজা যেথা সত্যকার সেথা ঢোকে মিথ্যাচার
মোরে নিয়ে পিশাচের খেলা
সহে না হে চতুর্মুখ, যন্ত্রণায় ফাটে বুক,
হে বিধি, বাঁচাও এই বেলা।"

নীরব চতুরানন সজল হ'ল নয়ন,
ক্ষণ পরে কন মৃদু হাসি,
"বন্ধ এবে যজ্ঞবাগ, দেবতার রাজ্যভাগ
জনগণ লইতেছে আসি;
তুমি মিছা কর শোক, দেবের এ দেবলোক,
মর্ত্যলোকে দেবতা গণেশ

ভোগ পাবে সুরসাল গণবাদ যতকাল
প্লাবিত করিবে বঙ্গদেশ।
"খোকা ভগবান" নামে গজানন বঙ্গধামে
সম্প্রতি খুলেছে রাজ্যপাট,
তুমি মাতা এস চ'লে চাড়ি স্বর্গ-চতুর্দোলে,
বঙ্গভূমি হউক স্বরাট।"

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শেষে আরম্ভ হইয়া প্রায় জুলাইয়ের শেষাশেষি আসিয়া সিটি কলেজের গোলযোগের নিষ্পত্তি হইল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম ধাক্কার পর এত দিন ধরিয়া এত অধিক ছাত্রকে আর শিক্ষাস্থানভ্রষ্ট হইতে দেখা যায় নাই। ১৩৩৫ ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বিবিধ প্রসঙ্গে" "সিটি কলেজে মিটমাট" শিরোনামায় লিখিলেন :

> সিটি কলেজ সমস্যার উপযুক্তরূপ সমাধান হইয়া যাওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। যে সময়ে বাংলার সমগ্র হিন্দুজাতি একজোট হইয়া সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যের ভিতর দিয়া জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, সেই সময়ে এরূপ একটা বিসদৃশ ঘটনা ঘটিয়া আমাদের বিশেষ চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ, বহু অন্ধ বা স্বার্থান্বেষী প্রাচীনপন্থী লোক এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়া যুবকমহলে নেতার আসন গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সামাজিক বিষয়ে তাঁহাদিগের মতামত বর্তমান কালের উন্নতিশীল হিন্দুর আদর্শের বিরুদ্ধ হওয়াতে যুবকদিগের দ্বারা তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ সুফলপ্রদ না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক ছিল।

দেখিতে দেখিতে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র বৎসর ঘুরিয়া গেল, ভাদ্র মাসে (১৩৩৫) উহা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। অর্ধ বৎসর সাপ্তাহিক জীবনশেষে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে যে নকল "জুবিলী সংখ্যা" বাহির করিয়াছিলাম তাহারই ধারা ধরিয়া 'শনিবারের চিঠি' মাসিকের ঊননবনবতি-শতবার্ষিকী বেশ ঘটা করিয়া অনুষ্ঠিত হইল। অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ অবাধ আড্ডা। সেকালে কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজ উদ্দেশ্যহীন আড্ডা দিতে জানিত। সুকিয়া স্ট্রীটের (অধুনা কৈলাস বোস স্ট্রীট) কান্তিক প্রেসে ভাঙা 'ভারতী' দলের আড্ডা, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে গজেনদার (ঘোষ) বাড়িতে সর্বদলীয় সাহিত্যিকদের কিঞ্চিৎ আদিরসাশ্রিত আড্ডা, পটলডাঙায় 'কল্লোল' দলের বোহেমিয়ান আড্ডা, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উপর পাশাপাশি বরদা এজেন্সিতে 'কালি-কলমে'র এবং আর্য পাবলিশিং হাউসে শশাঙ্ক-বন্ধুদের

অপেক্ষাকৃত উন্নাসিক আড্ডা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের দোকানে শিশুসাহিত্যস্রষ্টা, ভ্রমণবিশারদ ও যাযাবরদের রাজা-উজীরমারী আড্ডা (যাহা ১৩৩৫ বৈশাখ হইতেই 'হসন্তিকা'র আড্ডায় পরিণত হয়), 'উপাসনা' কার্যালয়ে রাজনীতিগন্ধী সাহিত্যিকদের আড্ডা, 'আনন্দবাজার' গৌরাঙ্গ প্রেসে লাপসি-গেরুয়াভক্ত সঙ্কটত্রাণী সাংবাদিকদের পলিটিকোসোশ্যাল-লিটারারি আড্ডা, 'বঙ্গবাণী' আপিসে বিশ্ববিদ্যালয়-আশ্রিত পণ্ডিত সাহিত্যিক-দের আড্ডা এবং 'বিচিত্রা'য় অভিজাত সাহিত্যিকদের আড্ডা প্রধান ছিল—কয়েকটি ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতেছিল, কয়েকটির ভাঙন-দশা। কিন্তু আমাদের 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা রসে ও রঙে, চায়ে ও সিগারেটে অন্য সকল আড্ডাকে প্রায় ছাড়াইয়া উঠিতেছিল। প্রত্যহ প্রায় অষ্টপ্রহরব্যাপী আড্ডা, মুখাগ্নি অনির্বাণ। স্বতন্ত্র ঘর বা আশ্রয় ছিল না, 'প্রবাসী' প্রেসের ম্যানেজারের অপ্রশস্ত কক্ষই আড্ডার জাদুস্পর্শে বৃহদায়তন হইয়া উঠিত। নীরদ, অশোক, যোগানন্দ ও আমি তো সর্বদা থাকিতামই; মোহিত, হেমন্ত, গোপাল, হরিপদ, সুনীতিকুমার, কালিদাস এবং ঢাকা, রংপুর ও পাটনা হইতে আসিলে সুশীল, রবি ও রঙীন নিয়মিত আসিতেন। এতদ্ব্যতীত, কবি হেমচন্দ্র বাগচী, অধুনা-নিরুদ্দিষ্ট কবি সুবল মুখোপাধ্যায়, বন্ধু সুবল বন্দ্যো-পাধ্যায়, কবি জীবনময় রায়, হিরণকুমার সান্যাল, দিলীপ সান্যাল, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ জীবনকালী রায় সুবিধা পাইলেই আসিয়া জুটিতেন। আমাদের আড্ডা সম্বন্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি কৌতুককর কথা স্মরণে আছে। একদিন তিনি একটু অসময়ে আপিসে আসিয়া আমার সহিত ছাপাখানা-সংক্রান্ত কোনও প্রয়োজনীয় কথা বলিবার জন্য দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা এতই মশগুল ছিলাম যে তাঁহাকে লক্ষ্য করি নাই। তিনি তাঁহার স্বস্থানে ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, "গিয়েছিলাম তো কিন্তু ধোঁয়ার চোটে বেলুনের মত উড়ে ফিরে এলাম।" এই আড্ডাই 'শনিবারের চিঠি'র প্রাণ ছিল। বিপিনবাবুর রেস্টুরেণ্টে এবং মতিবাবুর চায়ের দোকানে (দুইটিই আপার সারকুলার রোডে অবস্থিত ছিল) মাঝে মাঝে আড্ডা স্থানান্তরিত হইত, তখন খরচের ভার পালা করিয়া বহন করা হইত। আমরা কচিৎ কদাচিৎ গজেনদার আড্ডায়, 'আনন্দবাজার' গৌরাঙ্গ প্রেসের আড্ডায় অথবা 'কালি-কলমে'র আড্ডায় গিয়া যোগ দিতাম। অন্যত্র আমাদের গতিবিধি ছিল না। কিছুকাল পরে অবশ্য 'প্রবাসী' প্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়া আমরাই কান্তিক প্রেসের ভাঙা হাটে আসর জমাইয়াছিলাম। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সহিত এই আড্ডাতেই পরিচয় ঘটে।

'শনিবারের চিঠি'র শতবার্ষিকী-আড্ডা স্মরণীয়। এই আড্ডাতেই আমার "শনিবারের চিঠি centenary" কবিতাটি পঠিত হইয়াছিল। নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হয়। ইহাতে সেদিনকার সাহিত্য-পরিবেশের এবং আমাদের ভবিষ্যতের একটা ছবি ছিল, যাহা চিত্তাকর্ষক ও স্মরণীয়:

ভাবতে মনে লাগছে চমৎকার—
নবনবতি বছর পরে শতেক হবে পার।

* * *

বলত যারা, নোংরা কর ফিরি—
সেদিন তারা সবাই এসে বসবে তোমায় ঘিরি।
জানি তাদের রাত্রি হবে, যোগ দেবে এই মহোৎসবে
কায়াবিহীন তখন সবাই ছায়া অশরীরী।
তাদের নাতি-নাতিনীরা কেউ প্রগল্‌ভ, কেউ সুধীরা,
উপল-পথে কেউ বা চপল ঝরনা ঝিরি-ঝিরি—
যেথায় যত তরুণ আছে রঙিন হবে তোমার আঁচে,
'কালি-কলম', 'প্রগতি' আর 'কল্লোল' সুচ্ছিরি!

"মণি-মুক্তা" তখন হবে খাঁটি,
বীণাপাণি উল্লাসেতে সাজবে পারিপাটী।
সেদিন নরেশ রাধাকমল বস্তি মাঝেই রইবে অমল,
পাখোয়াজে বোল ফোটাবে ধূর্জটিরই চাঁটি।
জানি সেদিন 'হসন্তিকা' পরবে সত্য হাসির টীকা,
"সওদা" ছেড়ে 'ধূপছায়া' তার ভুলবে খুঁটিনাটি।
সেদিন তোমার আড্‌ডা-ঘরে মিলবে এরা পরস্পরে
আসবে তারা আজকে যারা দুয়ার আছে আঁটি,
"মণি-মুক্তা" তখন হবে খাঁটি।

কত কথাই জাগছে আজি মনে,
প্রকাশ করতে ভাষা না পাই থাকুক সংগোপনে।
ভাবীদিনের প্রেমেন কি সে দৈনিকেতে কলম পিষে
মনের দুখে কাল কাটাবে আঁধার কক্ষ-কোণে?
শৈলজা কি ছুটবে কাশী মুরলী কি ছাড়বে বাঁশি,
গজল-কবি ভজবে নবী ক্রমিক বিবর্তনে!

অচিন্ত্যেরই চিন্তা-জ্বরে আগুন দেবে বুদ্ধ ঘরে,
ডুব দেবে কি শরৎচন্দ্র শ্রীরূপনারায়ণে ?
কত কথাই জাগছে আজি মনে।

* * *

মরুর পথে আজকে অভিযান,
পূর্ণিমাতে অমানিশার মিলবে কি সন্ধান ?
আজকে যারা আঁধার পথে ক্ষীণ আলোকে কোনো মতে
অনেক আশায় বুক বাঁধিয়া চলছে গেয়ে গান—
সেদিন শনিমণ্ডলীরা পাহাড়-ভাঙা পথের পীড়া
বুঝবে কি হায়, গলায় প'রে বিজয়-মাল্যখান ?
তুমি শুধুই জানবে সখী, কোন্ সোলা আর চকমকি
আজকে নিবিড় অন্ধকারে করল দীপ্তিদান !

* * *

তারা কি আর চাইবে পিছন ফিরে,
নবতি-নব বছর পারের টুকরা কালের তীরে !
যেথায় মোরা কজন মিলে ঝাঁপ দিয়েছি হিমসলিলে
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘট ভরেছি নীরে।
তারা কি আর করবে মনে জন্মদিনের শুভক্ষণে
দেখবে চেয়ে এড়িয়ে আসা আঁধার চিরে চিরে !
সেদিনে হায় কোন্ ষোড়শী বাতায়নে রইবে বসি'
মোদের ছন্দ বাজবে কি তার চরণ-মঞ্জীরে ?
তারা কি আর চাইবে পিছন ফিরে !

কালের স্রোতে হারাই মোরা যদি,
ক্ষতি কি তায়, পৃথ্বী বিপুল, কাল সে নিরবধি।
মোরা জানি নূতন এসে নেবে তোমায় ভালবেসে
সাগরপানে বিপুল বেগে বইবে তব নদী।
মোদের শ্মশান-ভস্ম 'পরে জানি সুদূর যুগান্তরে
রইল পাতা ভাবী কবির অচল পাকা গদি।
আজ জেনেছি ছুটবে তুমি প্লাবন করি নূতন ভূমি
নারবে বাধাবন্ধ কোনো রাখতে তোমায় রোধি।
কালের স্রোতে হারাই মোরা যদি।

'শনিবারের চিঠি' নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা সামলাইতে পারিবে কি না জানি না, আমার আশার একের চার ভাগ পূর্ণ হইয়াছে ; সবাই না আসুন অনেকে আসিয়াছেন, আমি নূতনদের হাতে সকল ভার সমর্পণ করিয়া কালের স্রোতে হারাইবার অপেক্ষায় আছি।

সিটি কলেজের হাঙ্গামা মিটিলেও 'শনিবারের চিঠি'র "ধর্মরক্ষা"র জের কিন্তু প্রথম বৎসরেই মিটিল না। বাংলা দেশের দুর্বলচিত্ত নরনারীদের ধর্মাশ্রমব্যাধির বিরুদ্ধে কঠিন সমরে অবতীর্ণ হইলাম—দ্বিতীয় বৎসরের গোড়া হইতেই। এই সর্বনাশা ব্যাধি তখনই অত্যন্ত প্রবল ছিল ; এখন যে প্রশমিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ-নেতারা নিজেদের স্বার্থে এই বিষয়ে কখনই সচেতন হইতে চাহেন নাই, কিন্তু ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে দিনে দিনে দুর্বল করিয়া বাঙালী জাতিকে অধঃপাতের চরম সীমায় আনিয়া ফেলিয়াছে। ভুয়া গণৎকার ও ভুয়া ধর্মাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ মৃত্যুর প্রায় মুখামুখি দাঁড়াইয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমি একা কি ভাবে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলাম, সে কাহিনী শুনাইতেছি।

পঞ্চম তরঙ্গ

রাজদ্বারে

মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই অর্থাৎ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে আমার "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" নামক উপন্যাসের প্রথম কিস্তি বাহির হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালীর মেরুদণ্ড শক্ত ছিল। ভূদেব-রাজনারায়ণের স্বদেশ-স্বধর্মমূলক প্রবন্ধ-পুস্তকাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', স্বামী বিবেকানন্দের রচনা-বক্তৃতা-পত্রাবলী, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-রচিত ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডির জীবনেতিহাস, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত টডের রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ, অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ' প্রভৃতি বাংলা দেশের তৎকালীন যুবসম্প্রদায়কে কথঞ্চিৎ আত্মস্থ ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারা নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া

কতকটা চরিত্রবল অর্জন করিতেছিল। এইভাবে বাংলা দেশের "ভদ্রলোক"-সম্প্রদায়ের যুবকেরা যে শক্তি অর্জন করিয়াছিল, রাউলাট বা সিডিশন কমিটির রিপোর্টে তাহার পরিচয় আছে। তাহার পর বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বপ্রেমের ধাক্কায় বাঙালীর পায়ের তলার মাটি সরিয়া গিয়া তাহাকে কতখানি পরমুখাপেক্ষী ও উচ্ছৃঙ্খল করিল সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে তাহারও পরিচয় মিলিবে। বহু বহু শতাব্দীর ভারতীয় ঐতিহ্য এবং উনবিংশ শতকের বনস্পতিতুল্য সাধকদের সুবিপুল সাধনার উপর বাঙালীর ভবিষ্যতের যে ভিত্তি রচিত হইতেছিল, আকস্মিক বিশ্বসঙ্কটে তাহা নড়িয়া গেল, এবং ঝড়ের ঝাপটায় বিদেশ হইতে উড়িয়া আসা কাঁটা গাছের উচ্চ ডালের উপরে বাঙালী-তারুণ্যের পুচ্ছ আন্দোলিত হইতে লাগিল। জীবনের অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার খুব স্পষ্ট প্রকট সাক্ষ্য নাই। সাহিত্যে ছাপাখানার দীর্ঘস্থায়ী কালিতে সেই সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে এবং ইহারই বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করিয়াছিলাম।

বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি; গৌরবময় ঐতিহ্য ও সাধনালব্ধ চরিত্রবলের সহিত যুক্ত হইয়া এই ভাবপ্রবণতা যে অঘটন ঘটাইতে পারে স্বদেশী আন্দোলন তাহার প্রমাণ। কিন্তু সর্বনাশা মহাযুদ্ধের ধাক্কায় ইউরোপে স্বভাবত-উদ্ভূত উচ্ছৃঙ্খলতার শৌখিন নকল করিতে গিয়া সমাজে ও সাহিত্যে আমাদের ভাব-প্রবণতা যে দুর্বলতার সঞ্চার করিল আমরা তাহা আজও সামলাইতে পারি নাই। এই প্রসঙ্গে আমি পরে লিখিয়াছিলাম :

মহাযুদ্ধের শেল-শক আর মারণ-বাষ্পে জন্ম লভিল যারা,
ধরার মাটির প্রথম-পরশ-কান্না যাদের ডুবেছে মেশিন-গানে,
এবং যাহারা ঘুমাইয়া ছিল সভাপর্বের বিলাস-ব্যসন মাঝে,
সে ঘুম যাদের ট্রেঞ্চ-শয্যায় তিমির রাত্রে ভেঙেছে আচম্বিতে,
এবং যাহারা গৃহে অনশনে প্রতিদিন পেল প্রিয়-বিয়োগের ব্যথা,
ছিন্নহস্ত ভগ্নচরণ জাগিল যাহারা হস্‌পিটালের বেডে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরায় শিরায় আজো বহে যারা মৃত্যুর যন্ত্রণা,—
উত্তেজনায় উন্মাদ হ'ল যারা,
মৃত্যু যাদের কাঁধে হাত দিয়া বলিয়া গিয়াছে, "হে বন্ধু, আমি আছি।"
মৃত্যুর ভয়ে জীবনে লইয়া ছিনিমিনি খেলা যারা খেলে সুতরাং—
আমরা তাহারা নহি—সেই কথা এ যুগের কবি স্মরণে কি রাখিয়াছে,
মোদেরে পিষিয়া চাহে না মারিতে ওদের ঘরের শত সমস্যাভারে!

আমরা তাহারা নহি।
তাহাদের ঢেউ আকাশ-সাগর ডিঙায়ে যদিও লেগেছে মোদের গায়ে,
ড্রইং-রুমের টেবিলে মোদের চা'র পেয়ালায় তরঙ্গ তুলিয়াছে :
চুমুকে চুমুকে কথায় কথায় মোরা কয়জন সে ঢেউ করেছি পান,
মোদের উদরে সে ঢেউ পেয়েছে লয় ;
পারে নি নড়াতে অনড় মোদের জগন্নাথের রথে—
বিপুল বিরাট ঘুমন্ত রথ চলে নাই এক তিল।
আমাদের যুগ আজো যে মধ্যযুগ—
সিনেমা-রেডিও-টেলিভিসনের কোটিং যদিও পড়েছে তাহার গায়ে—
কোটিং উঠিতে লাগে বা কতক্ষণ !
পোড়া-মাটি আর বালু-পাথরের জড়-রূপটাই মোদের সত্য রূপ।
অনড় মাটির কে গাহিবে জয়গান !
মোদের মুক্তি ? আধখানা তার পীরদরগার এখনো সিন্নি মাঝে,
পাদোদক আর তাবিজ-মাদুলি, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে ;
বাকি আধখানা গ্যানোর ফিজিক্স, চরকসংহিতায়,
বিজ্ঞান আর দৈবে মিলিয়া প্রায় মাঝামাঝি বিংশ শতাব্দীতে
ঘরে ও বাহিরে অদ্ভুত খেলা খেলিছে বঙ্গদেশে—
এ যুগে মোদের প্রত্যেক ঘরে অহরহ চলে সেই দড়ি-টানাটানি—
কভু বিজ্ঞান কভু দৈবের জয়।
অতি-বিচিত্র কোলাকুলি কভু আদিমে ও আধুনিকে—
জ্ঞানে-সংস্কারে মধুর সমন্বয় !

ভাবপ্রবণ বাঙালীর চরিত্রগত এই সাময়িক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দৈবের দোহাই পাড়িয়া একদল লোক ব্যবসায় আরম্ভ করিল ; ভুয়া গণৎকার ও ভুয়া ধর্মাশ্রমে দেশ ছাইয়া গেল। সাহিত্যে তথাকথিত তারুণ্য আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ও জীবনে আসিল কর্মশক্তি ও পুরুষকারের প্রতি বিমুখতা ও অনাস্থা, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া সস্তায় কিস্তি মারিবার অস্বাভাবিক আগ্রহ। গণৎকারের গণনা পয়সা দিয়া খরিদ করিয়া লোকে রেস খেলিতে যায়, ইহা বুঝি। এখানে দৈবের সহিত দৈবেরই কোলাকুলি হইয়া থাকে। কিন্তু জীবনের সর্বঘটে তথাকথিত গুরু ও গণৎকারের প্রাধান্যের মধ্যে যে সাধারণ মানুষের কতখানি অসহায়তা ও পলায়নী মনোভাব লুকাইয়া আছে, কতখানি দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা ঘটিলে এই ঠক-নির্ভরশীলতা জাতিকে পাইয়া

বসে তাহা প্রণিধান করিয়া আমি আতঙ্কিত হইয়াছিলাম। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস-সাহেব প্রভৃতি উচ্চ সরকারী পদস্থেরাও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আকর্ষণে এই দুর্বলতার কবলে পড়িয়াছিলেন। যেদিকে তাকাই সেদিকেই আশ্রম গজাইয়া উঠিতে দেখি। শিষ্যের পক্ষে ভক্তির আতিশয্য ঘটিলেই যে পরমার্থ লাভ হয় তাহা নহে, শিষ্যকে তাহার যাবতীয় আর্থিক উপার্জন, মায় স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত গুরুর চরণে নিবেদন করিয়া দিতে হয়, তবে মুক্তি। চোখের সামনে অনেক সংসারকে ভাঙিতে দেখিলাম, পিতার অবিমৃষ্যকারিতায় অনেক পুত্র পাগল হইল, অনেক সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচনা করিয়া দিলেন গুরু। আজ সিনেমা-ব্যবসায় সহজলভ্য অর্থসম্পদের লোভ দেখাইয়া গৃহস্থের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে যেরূপ প্রলুব্ধ করিতেছে সেদিন দেখিয়াছিলাম, এই ভুয়া আশ্রমগুলি সেইরূপ করিতেছে। এইরূপ দুই-চারিটি আশ্রমের গুরুদের এমনই প্রভাব-প্রতিপত্তি জন্মাইল যে, তাঁহাদের কয় স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলে সেক্রেটারির নিকট সে হিসাব লইতে বলিতেন। অনুযোগ করিলে বলিতেন, আমাকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ইঁহারা যদি মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া বসেন তো আমি কি করিব! বাংলা দেশে এই কালে "কাঁধে বাড়ি বলরাম"দের একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই এই নকল গুরুদের "তুমি রাধা আমি শ্যাম" কাল্টের (cult) ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল।

আমি এইরূপ একটি আশ্রমের টাইপ কল্পনা করিয়া "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" লিখিতে আরম্ভ করিলাম। গুরুর প্রতীক হইলেন নকুড় ঠাকুর এবং শিষ্য-শিষ্যাদের প্রতীক হইল সরমা। এই মোহগ্রস্ত মানুষদের কল্পনা করিয়া লিখিলাম:

> পতঙ্গভুক্ বৃক্ষ যেমন আপনার শিকারকে লালাসিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে জীর্ণ করিতে থাকে, প্রথমটা একটু হাত-পা ছোঁড়া, মূক-বধির অরণ্যভূমিতে কিঞ্চিৎ আর্তনাদ, কিছু ছটফটানি—তারপর সেই অসহায় প্রাণী যেমন বৃক্ষেরই অঙ্গীভূত হইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে এবং তাহার অপর স্বজাতীয়কে গ্রাস করিবার জন্য বৃক্ষের প্রাণ জীয়াইয়া রাখে এ যেন তেমনই। কিন্তু সরমা কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছে? প্রসারিত পত্রদল মাথার উপর ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে অতি ধীরে—কিন্তু সে-যে মৃত্যুপাশ, চৈতন্যহীন প্রাণীকে তাহা কে বলিয়া দিবে? দৃষ্টি আছে, চৈতন্য নাই। নিজের অপূর্ব রূপান্তর সে হয়তো দেখিতেছে, কিন্তু অনুভব করিবার শক্তি হারাইয়াছে।

ভাদ্র মাসে "নকুড় ঠাকুরের আশ্রমে"র সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমার এবং 'শনিবারের চিঠি'র জীবনে নানা বিপর্যয় আরম্ভ হইল। প্রথম বিপর্যয় সম্পাদক শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী পদত্যাগ করিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পর্ক ছাড়িলেও তিনি দলছাড়া হইলেন না, এই যা ভরসা। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিলেন। আমাকে পরবর্তী আশ্বিন মাস হইতে এই প্রথম 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক পদ গ্রহণ করিতে হইল। মুদ্রাকর প্রকাশক ও সম্পাদক—তিনই এক আধারে বর্তাইল।

মোহিতলাল মজুমদার ঠিক এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। সহায় তিনি রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত নিত্য পরামর্শের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম।

যাঁহাদের ব্যবসায়ে ঘা লাগিল তাঁহারা বন্ধু ও শত্রু দুই ভাবেই আসিয়া আমাকে বিব্রত করিতে লাগিলেন। উৎকোচ অস্বীকার করাতে বিপরীত ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইল। সন্ধ্যার পর পথে ঘাটে বাহির হওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ ছিল না; রাত্রে বাড়িতেও লোষ্ট্র-বৃষ্টি চলিতে লাগিল। কুৎসিত বেনামী পত্র আসিতে লাগিল।

নিরস্ত হওয়া দূরে থাকুক, আমি আরও উগ্র হইয়া উঠিলাম। আশ্বিন সংখ্যায় পতঙ্গভুক্ বৃক্ষের পতঙ্গজীর্ণকারী পদ্ধতির বাস্তব বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিলাম। এইটুকু বিশ্বাস এখনও আছে—জনসাধারণের নির্জীব জড়ত্বকে বিচলিত করিবার জন্য শান্ত-দান্ত-মধুর-ভদ্র রুচিকে লঙ্ঘন করিলেও আইন-বিগর্হিত বর্ণনা করি নাই। কিন্তু তখন নানা কারণে নানা দিকে নানা শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছি। প্রমথ চৌধুরীর প্রসঙ্গে প্রধানেরাও বিরূপ হইয়াছিলেন। সকলের সমবেত শক্তি অকস্মাৎ একদিন আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা হইতে পুলিসের বেশে প্রবাসী প্রেসে আসিয়া দর্শন দিল। আশ্বিন সংখ্যায় "নকুড় ঠাকুরের আশ্রমে"র কিস্তিতে শ্লীলতা-ভঙ্গের অপরাধে আমি ধৃত হইয়া ব্যক্তিগত মুচলেকায় জামিনে মুক্ত হইলাম। আমার বিরুদ্ধে শুধু তথাকথিত ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাবই কাজ করে নাই, আমাদের শরাহত সাহিত্য-সমাজের রুই-কাৎলা হইতে চুনো-পুঁটি পর্যন্ত অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে তৎপর হইয়াছিলেন। মনে পড়িতেছে, শ্রীবিষ্ণু দে এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি কৌতুককর ছেলেমানুষী পত্র লিখিয়াছিলেন, বস্তুত তিনি তখন লেখা ছাপিতে আরম্ভ করিলেও কাঁচা ছেলেমানুষই ছিলেন।

আমি কিন্তু ইহাতেও দমিলাম না। "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" ধারাবাহিক-

ভাবে চলিতে লাগিল। ১৯২৮ সনের অক্টোবরে অপরাধমূলক অংশটি বাহির হইয়াছিল। ১৯২৯ সনের গোড়ায় ধৃত হইয়াছিলাম। ইহার মধ্যেই আরও একটি মামলায় ধৃত হইয়া রাজদ্বারে নীত হইয়া দশ টাকা জরিমানা দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম।

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতার পার্ক সার্কাসে নিখিল-ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল, ইহা কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশন। ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে যে বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল আমি তাহাতে স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম। দীর্ঘ আট বৎসর পরে কলিকাতায় এই সাধারণ অধিবেশন। এমন বিপুল সমারোহের সহিত কংগ্রেসের অনুষ্ঠান ইহার পূর্বে আর হয় নাই। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতি, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জি. ও. সি. বা অধিনায়ক। তাঁহার প্রতি বিরূপতা বশতই এই বিপুল যজ্ঞে শুধু দর্শকই ছিলাম, কোনও অংশ গ্রহণ করি নাই। প্রবাসী অফিস হইতে একটি বইয়ের স্টল কংগ্রেস-সংলগ্ন প্রদর্শনীতে খোলা হইয়াছিল, নিয়মিত প্রত্যহ সেখানে গিয়া 'শনিবারের চিঠি'র হাসি ও ব্যঙ্গের খোরাক সংগ্রহ করিতাম। এই বিপরীত দর্শনের ফলেই আমার "অভিনয়" কবিতা ও G. O. C. বা "গক" ছবির জন্ম। পরবর্তী কালে "গক" সুভাষচন্দ্র সত্য সত্যই নেতাজী সুভাষচন্দ্র হইয়া আমাদের ব্যঙ্গকে বাতিল ও উপহাসাস্পদ করিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া আজ আমরা সকলেই গৌরবান্বিত, তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আমাদের পূর্ব লজ্জাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। কিন্তু আমার "অভিনয়" কবিতার ব্যঙ্গ ব্যর্থ হইলেও এখনও সতর্ক হইতে বাধা নাই। আটাশ বৎসর পূর্বেকার "অভিনয়" স্মরণ করিতেছি ঃ

হ'ল চল্লিশ পার।
বরষে বরষে একই অভিনয় হয়ে গেছে বার বার।
তিন দিন ধ'রে মারমুখো হয়ে মিলিবে বীরেরা মহা হৈ-চৈয়ে,
অ্যামেণ্ডমেন্ট ও প্রস্তাব লয়ে লেগে যাবে মহামার।
গম্ভীর মুখে বসিবে সকলে ভীষণ খাঁটি ও বেজায় নকলে,
কোন্ ভাষা কত আছয়ে দখলে হবে পরীক্ষা তার।
গোড়ায় হইবে কথা-কাটাকাটি, তাতে না শানালে হবে লাঠালাঠি,
লাল হবে চোখ, লাল হবে মাটি, মিলন চমৎকার!

অনুষ্ঠানের নাই কোনো ত্রুটি, কেহ খায় খানা কেহ ডালরুটি,
দশদিক হতে দশ জন জুটি বচন করিবে সার।
হ'ল চল্লিশ পার।

শেষ স্তবকটির দুইটি মাত্র শব্দ বদল করিলে যাহা দাঁড়ায়, তাহা আজিকার আক্ষেপোক্তিও হইতে পারে :

শীর্ণা ভারতমাতা,
উঠিছে শিহরি ভক্তেরা যত গাহিছে বিজয়গাথা।
চোখে অবিরাম ঝরে বারিধার পারে না বহিতে বুঝি দেহভার,
খ'সে খ'সে ওই পড়ে বার বার মলিন ছিন্ন কাঁথা।
আকাশ-কুসুম করিতে রচন রাম শ্যামে করে বাক্-বরিষণ,
থেকে থেকে ন'ড়ে ওঠে ঘনেঘন ক্যাপ-সুশোভিত মাথা ;
জননী নীরবে বসি একধারে শীর্ণ হস্ত ললাটে প্রহারে,
শরীর বিকল তবুও তাঁহারে পিষিতে হইবে জাঁতা।
দেশের অর্থে আপনার নাম করিছে জাহির শুধু রাম শ্যাম,
কংগ্রেস ক্রমে হতেছে সুঠাম বুকের রক্তে গাঁথা।
শীর্ণা ভারতমাতা !

জাতীয় কংগ্রেসের আসল অধিনায়ক জওহরলালকে এই পার্কসার্কাসী কংগ্রেসেই সর্বপ্রথম পিতার স্নেহচ্ছায়া ভেদ করিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে দেখি ; স্বাধীনতা-প্রস্তাব এখানেই প্রথম গৃহীত হয়। আমার রামদাদা-সিরিজের গল্প "আবার উটরাম সাহেবের টুপি"তে ব্যঙ্গচ্ছলে এই কংগ্রেসের একটা প্রায় নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছি। 'মধু ও হুলে' তাহা স্থান পাইয়াছে।

যাহা হউক, একদিন মধ্যরাত্রে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখিয়া সামরিক ভাবে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত মগজ লইয়া বাসে পার্ক সার্কাস হইতে ফিরিতে-ছিলাম, সঙ্গে বন্ধুবর গোপাল হালদার। বাসে মানুষের ঠাসাঠাসি, কোনও প্রকারে দাঁড়াইয়া ঝুলিয়া আসিতে আসিতে মেজাজ আরও চড়িয়াছিল। আপার সারকুলার রোডে মানিকতলা রোডের কাছে বাস থামাইবার জন্য ঘণ্টা দিলাম। বাস থামিল না। আরও গরম হইয়া চালককে গালি দিলাম। সেও পাল্টা একটা খারাপ গালি দিল। মানিকতলা বাজারের কাছে গাড়ি থামিতেই আমি ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান হারাইয়া ড্রাইভারের আসনে উঠিয়া তাহাকে দুই-এক ঘা দিতেই তাহার চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া দুই জন পুলিস দুই দিক হইতে আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। পিছনে চাহিয়া দেখি,

বাসটি জনমানবহীন, গোপাল শুধু বিপন্ন বন্ধুকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই—ডিসেম্বরের নিদারুণ শীতে একা দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। পুলিস বাসসহ আমাদের প্রথমে বড়তলা থানায় এবং পরে জুরিসডিকশন মানিয়া আমহার্স্ট স্ট্রীট থানায় লইয়া গেল। গোপাল জামিন হইল। পরদিন বেলা দশটায় বাঁকশাল কোর্টে গিয়া দশ টাকা জরিমানা দিয়া সগর্বে ফিরিয়া আসিলাম। ইহাও সাহিত্যের বিষয় হইয়াছিল বলিয়াই সাহস করিয়া এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি। পরের সপ্তাহেই শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালের 'বাতায়ন' সাপ্তাহিকে আমার একটি দীর্ঘ প্রশস্তি-কবিতা বাহির হইল। দুইটি পংক্তি মনে আছে—

বাস-কণ্ডাক্টারে মারিয়া যে দেয় ফাইন,
তাহার কালচার এবং শিক্ষা সুপারফাইন।

এই গেল দ্বিতীয়। তৃতীয় রাজদ্বার দর্শন অচিরাৎ ঘটিল। ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনও সম্পূর্ণ পুস্তকের প্রকাশ বিষয়ে আমার প্রকাশ্য সহ-যোগিতা ঘোষিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' (বিশ্বভারতী সংস্করণ) এবং পুলিনবিহারী দাসের 'লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা'র কথা বলিয়াছি। ১৯২৭ সনের জুলাই মাসে বীরভূমের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যরসিক শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমি তৎসঙ্কলিত 'বীরভূম বিবরণ' ৩য় খণ্ডের (শ্রাবণ ১৩৩৪) বোলপুর "শান্তিনিকেতন-কথা" অধ্যায়টি লিখিয়া দিই। তিনি সস্নেহে ইহা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমাকে সম্মানিত করেন। ১৯২৮ সনে স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সঙ্কলিত 'বনে জঙ্গলে' নামক বহুল-প্রচারিত পুস্তকের 'সন্দেশ' প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে গৃহীত রচনাগুলি বাদে যাবতীয় নামহীন প্রবন্ধ আমিই রচনা করি। তিনি সর্বপ্রথম শতাধিক টাকা দক্ষিণা দিয়া আমাকে সম্মানিত করেন, বই লিখিয়া রোজগার এই প্রথম। ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার মানবপ্রেমিক মনীষী বৃদ্ধ জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' পুস্তকের প্রকাশক হইবার গৌরব আমার ভাগ্যে ঘটে। প্রথম ভারতীয় সংস্করণ দেখিতে দেখিতে চার মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। পরবর্তী এপ্রিল (১৯২৯) মাসের শেষে দ্বিতীয় সংস্করণ হইবামাত্র গবর্মেণ্টের টনক নড়ে। তাহার পর কি ঘটে সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ'-এর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ

গত ২৪শে মে তারিখে কলিকাতা পুলিস প্রবাসী কার্যালয় ও প্রবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি খানা-

তল্লাশি করিয়া ডাঃ জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের প্রণীত 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' নামক পুস্তকের চুয়াল্লিশখানি কপি লইয়া যায় এবং রাজদ্রোহ অপরাধে উক্ত পুস্তকের মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসকে গ্রেপ্তার করে। গত ৪ঠা জুন এই মামলার শুনানী হইবার কথা ছিল; কিন্তু মোকদ্দমা তৈয়ারী হয় নাই বলিয়া সরকারের পক্ষ হইতে ১২ই জুন পর্যন্ত সময় লওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যেই পুলিস আবার ৬ই জুন তারিখে রাজদ্রোহ অপরাধে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই মামলা ও পূর্বেকার মামলার শুনানী এক তারিখেই ধার্য হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী এই গ্রেপ্তারের কথা জানিয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার অভিমত ৬ই জুন তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করেন। এই মামলা লইয়া কলিকাতা শহর তোলপাড় হইয়া যায়। সরকার পক্ষের তদানীন্তন অ্যাডভোকেট-জেনারেল সার্ এন. এন. সরকার ব্যতীত হাইকোর্টের প্রায় যাবতীয় প্রখ্যাতনামা উকিল-ব্যারিস্টার, বি. সি. চ্যাটার্জি, এন. সি. সেন, আই. বি. সেন, কেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে আমাদের পক্ষ সমর্থন করেন।

ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে ৮ই মে হইতে জোড়াবাগানে অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এন. আহমদের কোর্টে 'শনিবারের চিঠি'র মামলাও আরম্ভ হয়। সেখানেও সাহিত্যিক-অ্যাডভোকেট শ্রীকেশব গুপ্ত আমার পক্ষ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিক-উকিলেরা সহযোগিতা করেন।

দুইটি মামলা প্রায় চার মাসকাল চলে। বাঁকশাল ও জোড়াবাগান ছোটা-ছুটিতে আমার হয়রানির অন্ত ছিল না। জোড়াবাগানে শ্রীকেশব গুপ্ত সৎসাহিত্য হইতে হাজারো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া সর্বসমক্ষে একরূপ প্রমাণই করিয়া দিলেন যে, সদুদ্দেশ্যে পাঠকের জুগুপ্সা উৎপাদনের জন্য নৈষ্ঠিক শ্লীলতা লঙ্ঘন শেক্সপীয়র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সাহিত্যিককেই অল্পবিস্তর করিতে হইয়াছে। তারকনাথ সাধু সরকার পক্ষে এই যুক্তির বিরুদ্ধতা করিতে গিয়া বিশেষ জুৎ করিতে পারেন নাই। তথাপি আমাকে শাস্তিস্বরূপ শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ টাকা জরি-মানা দিতে হইয়াছিল। এই ব্যাপারে স্বর্গীয় সাধু মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। তখন আমি তাঁহাকে খোলাখুলি প্রশ্ন করি, এই মামলার পিছনে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্ররোচনা ছিল কি না! তিনি স্পষ্ট নাম করেন নাই, ইঙ্গিতে এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন, তোমাকে শাস্তি

দেওয়াইবার জন্য এমন লোক আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন যাঁহার ইঙ্গিতমাত্রই বাংলা দেশে সব কিছু হইতে পারিত। মোকদ্দমাশেষে জজ নসীরউদ্দীন সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, ইয়ং ম্যান, আমার হাত-পা বাঁধা, যেখানে তোমাকে পুরস্কৃত করা উচিত ছিল সেখানে তোমাকে শাস্তি দিতে হইল।

অন্য মামলায় বিচারপতি রক্সবার্গের হুকুমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ও আমার প্রত্যেকের এক হাজার টাকা করিয়া জরিমানা হইল। প্রবাসী অফিস দিবে হাজার টাকা এবং প্রেসকে দিতে হইবে হাজার টাকা। আমি এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলাম। চীফ জাস্টিস ও অন্য একজন জজ শেষ পর্যন্ত আপীল ডিসমিস করিয়া দিলেন। ফের মিটিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে। জরিমানা দিয়া মুক্ত হইলাম।

উপর্যুপরি রাজদ্বারে উপনীত হইয়া ১০৲ + ৫০৲ + ১০০০৲ মোট ১০৬০৲ টাকা সেলামী দিলাম। এখন পর্যন্ত রাজার ঋণ আমার নিকট ইহা অপেক্ষা বেশি আর জমে নাই। তবে পরবর্তী কালে আরও তেইশ বার ভারতে ইংরেজের স্বৈরাচারী শাসনের দৃষ্টান্ত সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা ও চিত্র প্রকাশ করিয়া খানাতল্লাশির হাঙ্গামায় পড়িয়াছিলাম, হাঙ্গামা জেল বা জরিমানা পর্যন্ত পৌঁছায় নাই।

ঠিক এই সময়ে ঢাকায় মোহিতলালের অধ্যাপক হিসাবে প্রতিষ্ঠা এবং মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে বন্ধুবর দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর অধ্যক্ষপদে স্থায়িত্ব লাভ আমাদের আনন্দের কারণ হইয়াছিল।

'শৃঙ্খলিত ভারত' বা 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলিলে কথা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। ইহা চিরকাল রামানন্দ-চরিত্রের সততা ও দৃঢ়তার একটি দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। পুলিস যেদিন প্রথম প্রবাসী আপিসে খানাতল্লাশি করে, সেদিন ৪৪ খানি বাঁধা পুস্তক লইয়া যায়। আবাঁধা পুস্তক সমস্তই দপ্তরীর বাড়ীতে ছিল। মামলা চলিবার কালে অতি দ্রুত বিক্রীত হইয়াও বাজেয়াপ্তির হুকুমের দিনে মোটামুটি ৪৫০ খানা বাঁধা-আবাঁধা বই থাকিয়া যায়। প্রতিখানির মূল্য পাঁচ টাকা, কিন্তু তখনই প্রায় ডবল দামে বাহিরে বইটি বিক্রয় হইতেছিল। জরিমানার দুই হাজার টাকা তো ডাহা লোকসান, এই অবশিষ্ট বইগুলি ন্যায্যমূল্যে বেচিলেও সে লোকসান উঠিয়া আসিত। একজন পুস্তক-বিক্রেতা মূল্য লইয়া উপস্থিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কড়া হুকুম দিলেন, এক কপি বইও বাহিরে যাইবে না। অফিস-ঘরের ঠিক মাঝখানে বইগুলিকে থাকে থাকে সাজাইয়া রাখা হইল পুলিস আসিয়া ভ্যানে করিয়া সেগুলি লইয়া গেল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

চোখের একটু ইঙ্গিত করিলেই নিমেষ মধ্যে বইগুলি নগদ টাকায় রূপান্তরিত হইয়া সিন্দুকে জমা হইতে পারিত।

এদিকে এত হাঙ্গামার মধ্যে "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" ধারাবাহিক ভাবে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত চলিয়া সমাপ্ত হইল। কোনও দিক দিয়া আমাদের সাহিত্য-হুল্লোড়ের কিছুমাত্র কম্‌তি পড়ে নাই। আমাদের যেন তখন খুন চাপিয়া গিয়াছে।—প্রমথ চৌধুরীর পর একে একে আরও মহারথীনিপাতের উদ্দেশ্যে অবিশ্রাম শরাঘাত করিয়া চলিয়াছি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ চন্দ্র সেন এবং শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—আমি একাই পর পর এই তিন জনকে লক্ষ্য করিয়া মারাত্মক মারাত্মক অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম; "অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ হনি, টাক," "দীনেশ-নামা" ও "নরেশ-নিকষ" আমারই রচনা। দা'ঠাকুর শরৎ পণ্ডিত মহাশয় আমার নাম দিলেন "নিপাতনে সিদ্ধ"। চারিদিকে কলরব উঠিল। চারুচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র আমাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন, কিন্তু নরেশচন্দ্র পারিলেন না। তিনি স্বয়ং ব্যবহারজীবী, আইনের ঘোঁৎঘাঁত তাঁহার নখাগ্রে, তিনি 'শনিবারের চিঠি'র মুদ্রাকর, প্রকাশক বা সম্পাদককে না ধরিয়া একেবারে প্রবাসী প্রেসের মালিককে ধরিয়া টান দিলেন। অর্থাৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উকিলের চিঠি দিলেন। তিনি যদি কৃপাপরবশ হইয়া একটু ঊর্ধ্বে লক্ষ্য স্থির না করিতেন, তাহা হইলে নির্ঘাত আমাকেই আবার রাজদ্বারে ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হইত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার লক্ষ্য একটু বেশি ঊর্ধ্বে হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ফসকাইয়া গিয়াছিল।

শুধু পরহিংসা-ব্যসনে ও রাজদ্বারেই যে এই কালটা কাটিয়াছিল তাহা নয়, কাব্যলক্ষ্মীর পূজা-উৎসবও কম করি নাই। মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যেই আমার 'অজয়', ও 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' সম্পূর্ণ এবং 'মনোদর্পণ' ও 'বঙ্গরণভূমে'র অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়। বাল্যকালে খুব মনোযোগ দিয়া ভূগোল পড়িয়াছিলাম, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিম বিচিত্র মানুষদের প্রকৃতিগত পরিচয় কিছু কিছু জানা ছিল। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সভ্যতাসম্পর্কহীন স্বাভাবিক ভালবাসার কাব্য রচনা করিলাম—'পথ চলতে ঘাসের ফুল'। আমি মনে মনে জানিতাম, আপাতত অসি-চর্ম ধারণ করিলেও এই আমার আসল কাজ। সমরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে নিভৃত নিরালায় নিজের সঙ্গে মুখামুখি হইয়া যখন বসিতাম তখন ভয় হইত। সাহিত্যের পথ বাছিয়া লইয়াছি; কিন্তু এই পথে যিনি আমার একমাত্র আরাধ্য সেই রবীন্দ্রনাথকে বিদ্রূপ করিয়াছি, তাঁহার বরাভয়-কর আর দেখিতে পাই না।

শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ, প্রমথ-দীনেশ-জলধর-চারুচন্দ্র সকল প্রধানেরাই মদান্ধের অস্ত্রাঘাতে লাঞ্ছিত। কিন্তু তখনও শনিগোষ্ঠীতে ভাঙন ধরে নাই বলিয়া নিজেও ভাঙিয়া পড়ি নাই। নকল মণিমুক্তার আহরণে ভালমন্দ মাসিক পত্রিকাগুলির উপর শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিশীথ শান্তিকে যখন বিঘ্নিত করিতাম, তখন অরণ্যপ্রান্তর-পথের ঘাসের ফুলেরা আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিত, আমার কবিমনের যিনি প্রেয়সী তখন তিনি সভয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিতেন; আমার সাময়িক মোহ ভঙ্গ হইত, ব্যাকুল কণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতাম :

তুমি এস বনপথে ছোঁয়াও সোনার কাঠি ঝুরু ঝুরু ব'য়ে যাক ঝরনা,
ডাকছে পাহাড় বন ডাকছে এ দেহ-মন ফেলে দিয়ে এস ঘর-করনা।
দুজনে বসব যেথা ফোটা ফুল বাস দেয় নিবিড় আঁধারে লতাকুঞ্জে,
দেখব মুখানি তব রহি-রহি চমকানো চঞ্চল খদ্যোৎ-পুঞ্জে।
ডুববে পাহাড় বন ডুবে যাবে জ্যোৎস্না ধরণীর উন্মাদ নৃত্যে,
অদূরে গুহার মুখে সিংহের গর্জন শিহর তুলিবে তব চিত্তে।
চুমায় চুমায় শুধু ছাইব অধর দুটি ভুল হবে চরাচর সৃষ্টি,
চকিতে হইবে মনে চাঁদ শুধু ঢালে সুধা, সে সুধা তরল আর মিষ্টি।
এস এস এস সখী, ডাকে ওই জ্যোৎস্না ঝরনার কুলু-কুলু ছন্দে
আবছা রূপার আলো আজকে পড়ল বাঁধা ঘন তিমিরের বাহুবন্ধে।
পূর্ণিমা চাঁদ ওই উঠল বনের চূড়ে ধবধবে পথ-ঘাট জ্যোছনায়।
আমার নয়নে সখী, আঁধার শ্রাবণ-রাতি, এস এস জ্বেলে দাও রোশনাই ॥

ষষ্ঠ তরঙ্গ

রঞ্জন প্রকাশালয়

"পথ চলতে ঘাসের ফুল" 'শনিবারের চিঠি'তে (আশ্বিন, ১৩৩৫) অপরূপ চিত্রসজ্জায় বাহির হইয়াছিল; শিল্পী শ্রীহরিপদ রায়। পুস্তকাকারে বাহির করিবার সময় চিত্রগুলি বাদ দেওয়াতে বইখানির আকর্ষণ ও মর্যাদা অনেকখানি খণ্ডিত হইয়াছে। মনে আছে, চিত্রসম্বলিত টুকরা কবিতাগুলি কলহ-বিবাদে বিরূপ বহু সাহিত্যরসিককে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীহিরণকুমার সান্যাল—হাবলদা, আমাকে তিন দিন সস্নেহে আইসক্রীম

খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথেরও কবিতাগুলি ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু আমার কবিজীবনের সর্বাধিক আনন্দ এই প্রসঙ্গে পাইয়াছিলাম নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে, ভবানীপুর বেলতলার এক গলিতে। এই অঞ্চলে শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের কোনও কাজ ছিল, তাঁহার গাড়িতে আমিও ছিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, গ্যাসের বাতি জ্বালা হইয়াছে। ক্ষুতুদা গাড়িতে আমাকে একলা রাখিয়া কাজে গিয়াছেন। সহসা লক্ষ্য করিলাম, গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়াইয়া দুই জন যুবক বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও অতিশয় নিবিষ্ট চিত্তে 'শনিবারের চিঠি' পড়িতেছে, উৎকর্ণ হইলাম এবং স্বেদপুলককম্পসহ শুনিতে লাগিলাম :

জাগো সখী জাগো রে, বল্‌টিক-সাগরে
উঠল সূর্য যেন গোল পাঁউরুটিটি—
জাগো সখী জাগো রে, হিমজল-সাগরে
গোলরুটি সূর্য সেঁকা তার দু পিঠই।
স্লেজ-টানা হরিণেরা দাঁড়িয়েছে বাইরে,
জাগো জাগো প্রিয় সখী, রাত আর নাই রে।
যেতে হবে বহু দূর ঝলকায় রোদ্দুর,
চোখ যেন ঝলসায় বাধা পেয়ে তুন্দ্রায়।
যেতে হবে বহু দূর বরফে হানিয়া খুর
হরিণেরা ডাকে, জাগো, থেকো নাকো তন্দ্রায়।...

কবিতা তাহার পর অনেক লিখিয়াছি, প্রশংসাও পাইয়াছি কিন্তু এমন ঘাসের ফুলের মত পথের প্রসন্ন হাসিতে আর সম্বর্ধিত হই নাই।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় আশ্বিনেই "প্রটেস্ট" জানাইয়াছিলেন :

সব দেশ ঘুরে এলে
বিবাহিতা পত্নীটিকে ফেলে,
কিন্তু গেলে নাকো চীনে,
জাপানী গেইশাগণও তব প্রেম বিনে
মরে খেয়ে খাবি।...

সুতরাং কার্তিকে চীন-জাপান যাইতে হইল। চীনা উপদেষ্টা মিলিল না, কিন্তু 'জাপান'-বিশেষজ্ঞ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সযত্নে সাহায্য করাতে জাপান অচিরাৎ অধিগত হইল। সমুদ্রতীর হইতে ফুজিশানকে প্রণাম জানাইয়া

কুরুমা-(রিক্‌শা)-য় চাপিয়া তোকিও এবং সেখান হইতে শহরের উপান্তে এক তাড়িখানায় উপস্থিত হইয়া মাতালদের সঙ্গে গান ধরিলাম :

জীসান সাকে নোন্দে য়োপ্পারাত্তেরে,*
সাকে † দে সাকে দে সাকে দে দে রে।
তোকোনোমায় †† আছে বোতল তোলা,
ভেঙে দে, ভেঙে দে, মিছে খোলা,
(কিছু) বেগ্‌নি কি ফুলুরি, ভাজা ছোলা
আনিয়ে নে এই বেলা আনিয়ে নে নে রে।
হোটেলে যাবে কে দর যা বেশি,
চুষবে রেস্ত সবি শেষাশেষি !

গেইশা দু-চারটাকে আন্ না ধ'রে
চুমুকে হবে কি ? টান্ না জোরে,
হাসছে কেন ওরা দাঁড়িয়ে দোরে—
(কিছু) আছে বাকি ? ওদের দে দে দে দে রে।

বলা বাহুল্য, জাপানী ভাষার বুকনি সুরেশচন্দ্রের দান। সেখান হইতে সাংঘাই, গৃহনির্মাণরত ছুতার-মিস্ত্রীর দলে :

কে যাবি রে সাংঘায়ে
আংরাখা নে রাঙ্গায়ে,
ঠক্‌ঠকাঠক ঠোক্ হাতুড়ি,
তোল্ কড়ি আর বর্গা তোল্,
হেঁইয়ো জোয়ান, হেঁইয়ো জোয়ান,
করিস মিছা গণ্ডগোল।···

বস্তুত, গুরুতর তপ্তগরম লড়াইয়ের মধ্যে এই হালকা নিছক কাব্যের প্রয়োজন ছিল—আমার চিত্তকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য ; ক্ষুদুদা এই সময়ে কবিতায় আমার সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়াছিলেন। 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' আমি প্রেয়সীকে এই নিবেদন জানাইয়া শেষ করিয়াছিলাম :

তোমার লাগিয়া সখী, গিয়েছিনু বহুদূর পার হয়ে নদী-গিরি-সিন্ধু,
আঁধার তিমির ভেদি' গহন বনের মাঝে আহরিতে ফুলমধুবিন্দু।

---

* মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বুড়ো গেল গড়িয়ে।

† মদ †† কুলুঙ্গি

বাঘের গুহার মুখে ক্ষুদ্র ঘাসেরা যেথা আপনিই ফুল হয়ে ফুটছে,
বনের মেয়ের পায়ে সবল বনের যুবা অসহায় যেথা মাথা কুটছে।
যেখানে সাপেরা চলে রেখে যায় ঘাসবনে মসৃণ বক্ষের চিহ্ন,
ক্বচিৎ আলোকরেখা ভয়ে-ভয়ে পশে যেথা তিমিরাবরণ করি ছিন্ন···
যেখানে ঘাসের বুকে ক্ষুদ্র শিশিরকণা ঝলমল করে ক্ষীণ রৌদ্রে,
আঁখিতে আঁখিতে প্রেম প্রকাশের ভাষা আজো পায় নাই পদ্যে কি গদ্যে।
সেই ফুল, সেই ভাষা, সেই শিশিরের কণা গাঁথিয়া এনেছি মোর ছন্দে,
কণ্ঠে পরহ মালা, কানে কানে কহ কথা ধরা দিয়ে দুটি বাহুবন্ধে।
এ শুধু তোমারি তরে তুমিই বুঝিবে সখী, ঘাসের ফুলের কিবা মূল্য,
সার্থক হবে ফুল নিমিষেরও তরে যদি তুমি হয়ে ওঠ উৎফুল্ল।

ক্ষুদুদা আমার এই প্রেয়সী-চর্চাকে নিদারুণ ব্যঙ্গ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লিখিলেন :

সখী রে, আকাশ কালো, আসে দেখ সন্ধ্যা,
ভয় কি লো, কাছে আয়, তুই যে গো বন্ধ্যা।
তোর সনে প্রেম সই, হয় বিনামূল্যে,
এমন দিনে কি চলে সে কথাটি ভুললে !
এসো সখী, কাছে এসো, চুমু দাও আস্তে,
সন্ধ্যায় বন্ধ্যারা জানে ভালবাসতে।

আমাদের ছয় বৎসরের পুরাতন বিবাহ তখন পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নাই, সুতরাং আঘাতটা বাজিয়াছিল। ক্ষুদুদার কবিতাটি লজ্জায় ছাপাইতে পারি নাই, কিন্তু রাখিয়া দিয়াছি। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রকৃতির দুর্বোধ্য লীলা যে এই কবিতা লিখিবার কালেই ক্ষুদুদাকে ব্যঙ্গ করিতেছিল তাহা কে জানিত !

ইহার পরেই ধরপাকড়ের মামলা-মকদ্দমার পালা চলিল কয়েক মাস। জুলাই মাসে (১৯২৯) শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের শব্দভেদী বাণ বৃথা গেল ; এক মাস যাইতে না যাইতে আগস্ট মাসের ২৮ তারিখে মিত্র অ্যাণ্ড মুখার্জি সলিসিটার্সের চিঠি পাইলাম, সরাসরি সম্পাদক 'শনিবারের চিঠি' অর্থাৎ আমার নামে প্রেরিত। অপরাধ, পুরাতন 'ভারতী' হইতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ছন্দ-সরস্বতী" পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলাম। মিত্র অ্যাণ্ড মুখার্জি "কলিকাতা, ৩৬নং মসজিদবাড়ী স্ট্রীটের মৃত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একমাত্র বিধবা শ্রীমতী কনকলতা দত্তে"র পক্ষে অনেক টাকার খেসারত দাবি করিয়াছিলেন। অপরাধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই, চক্ষে সরিষাফুল দেখিলাম।

পরম্পরায় খবর পাইলাম, এই হঠাৎ আক্রমণের পিছনেও দুই-চারিজন সাহিত্যিক মহতের প্ররোচনা আছে। সত্যেন্দ্রনাথের ভায়রা-ভাই অর্থাৎ কনকলতা দেবীর ভগিনীপতি ছিলেন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শেলীর "দি ক্লাউডে"র কাব্যানুবাদের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একদিন 'প্রবাসী' আপিসেই আমাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। সময় বুঝিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলাম। তিনি সানন্দে শরণাগতকে উদ্ধার করিলেন। সেই হইতে তাঁহার সহিত অত্যন্ত স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা" ছাপিয়া আবার তাঁহার স্নেহভাজন হইয়াছিলাম। তিনি নিজের মূল্যবান সংগ্রহ হইতে দুই-চারিখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও সরবরাহ করিয়াছিলেন।

'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে জড়াইয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নরেশচন্দ্র যে হুমকি-পত্র দিয়াছিলেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত তাহার জবাবটিতে তাঁহার দৃঢ় ও মহৎ চরিত্রের পরিচয় আছে। সেই কারণে আজ বাতিল কাগজের সামিল হইলেও তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :

Dear Dr. Sen Gupta,

* * *

I do not wish, nor am I competent, to discuss the legal aspect of what you say has appeared in Sanibarer Chithi about your books and yourself. I write this letter assuming that everything you state in your letter is correct. Even on that assumption I find it difficult to do what you suggest I should. My apology would mean that another party had done something for which he is criminally and civilly liable. It would not be honourable for me to save myself by implicating some one else, nor would it be in accord with business etiquette. Had I alone been accused by you of having done something wrong, it would have been comparatively easier for me to apologise on being satisfied that I was wrong.

* * *

I have not written anything about the legal aspect of the matter. But should you, in view of my inability to apologise, decide to proceed against me according to law, I would, on receiving invitation to that effect, ask some lawyer or other to advise me in the matter.

Yours Sincerely
Ramananda Chatterjee

কনকলতা দত্ত মহোদয়ার সলিসিটার্সে'র চিঠিতেও কিঞ্চিৎ শিক্ষণীয় আছে। লেখকের কপিরাইট বজায় থাকা কালে অর্থাৎ মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সাময়িক পত্র হইতে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত পুরাতন লেখা পুনর্মুদ্রিত করাও যে দোষের—এই জ্ঞান সকলের নাই। আজকালও এইরূপ বেওয়ারিশ উদ্ধৃতি প্রায়শই দেখিতে পাই। সকলের অবগতির জন্য উক্ত পত্রটির শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এই দাবিপত্রের সমস্ত দাবিই আইনসঙ্গত বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইত :

Calcutta, 28th August, 1929

*　　　*　　　*

We are accordingly instructed to call upon you which we hereby do, forthwith to stop the sale of the said issue of 'Sanibarer Chithi' and to give to our client an undertaking in writing not to repeat such infringement and to make over to our client all unsold copies of the said book and to render an account of the profits made by you by the sale thereof and to pay our client the sum of Rs. 500 as damages. Please note that in default of compliance with the above requisitions within three days from date our client will institute proceedings against you, civil, criminal or both, without any further reference or delay.

দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার পর ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, "ছন্দ-সরস্বতী" আজও পুস্তকাকারে বাহির হইল না; 'শনিবারের চিঠি' যে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরেজী ১৯২৯ সনকে আমি আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বলিয়া মনে করি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৎসরের প্রথমার্ধে আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত হন। তিনি কলেজ-জীবনে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর সহপাঠী ও মির্জাপুর স্ট্রীটের এক মেসে সহবাসী ছিলেন। তৎপূর্বে 'প্রবাসী'তে তাঁহার গল্প বাহির হইয়াছে এবং কয়েকটি ছোটগল্পের জন্য তাঁহার যথেষ্ট নামও হইয়াছে। 'বিচিত্রা'তেও কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'পথের পাঁচালী' নামক উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছে। বিভূতিভূষণের সহিত পরিচয় ১৯২৯ সনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা বৎসরের প্রথমার্ধেই শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা। মোহিতলাল পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন, শ্রীযোগানন্দ দাস ও শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় তখন কলিকাতায় থাকিলেও আমার পক্ষে না থাকারই মত, শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী 'শনিবারের চিঠি' অপেক্ষা 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ'-র দিকে বেশি ঝুঁকিয়াছেন, শ্রীগোপাল হালদার 'ওয়েলফেয়ার' লইয়া ব্যস্ত, ছিলাম সুহৃদা ও আমি। সেই সুহৃদাও দীর্ঘকালের জন্য বিদেশভ্রমণে যাত্রা করিলেন। জুলাই-আগস্ট মাসে আমি যখন সর্বাধিক বিপন্ন, তিনি তখন জেনিভায় বসিয়া সুইট্জারল্যাণ্ডের হ্রদ-পর্বতের সৌন্দর্যে মশগুল। সাত দিক হইতে সপ্তরথীর ধাক্কা আমাকে একা সামলাইতে হইতেছে।

এই বৎসরের মে মাসে "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" সংক্রান্ত মামলা এবং জুন মাসে 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজে'র মামলায় পড়ি; প্রথম মামলা আগস্ট মাসে গিয়া শেষ হয়, দ্বিতীয় মামলার জের ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পৌঁছায়। এই বৎসরেরই মাঝামাঝি কালে "নরেশ-নিকষ" ও "ছন্দ-সরস্বতী"র হাঙ্গামা ঘটে।

এই বৎসরেই 'শনিবারের চিঠি'কে বধ করিবার জন্য শত্রুপক্ষ সমবেত ভাবে দুইটি পাশুপত অস্ত্র নির্মাণ ও প্রয়োগ করেন—'মহাকাল' ও 'রবিবারের লাঠি'।

১৯২৯ এপ্রিল মাসে অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহযোগিতায় শেষ বৎসরের (১৩৩৫) জেলেপাড়ার সঙ রচনা করি। অমৃতলাল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের গোড়াতেই দেহরক্ষা করেন।

১৯২৯-এর জুন মাসে প্রবাসী প্রেস এবং প্রবাসী কার্যালয় হইতে 'শনিবারের চিঠি'র ছাপাখানা ও আপিস স্থানান্তরিত করার জরুরী নির্দেশ প্রাপ্ত হই এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করি। ১৩৩৬-এর আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত প্রবাসী প্রেসে ছাপা হইয়া শ্রাবণ (জুলাই ১৯২৯) হইতে ৪৪ নং

কৈলাস বোস স্ট্রীট. কান্তিক প্রেসে 'শনিবারের চিঠি' ছাপা হয় এবং ১লা আগস্ট হইতে আপিস ২০৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রীমানী বাজারের দ্বিতলে রুম নং ১৬/১-এ স্থানান্তরিত হয়।

নূতন ঠিকানাতেই ৯ই ভাদ্র (২৫ আগস্ট, রবিবার) আমার ২৯তম জন্মদিনে আনুষ্ঠানিক ভাবে রঞ্জন প্রকাশালয়ের পত্তন হয়। আমার প্রথম মুদ্রিত বই "অজয়ে'র মুদ্রণ অবশ্য আট দিন পূর্বে ১লা ভাদ্র (১৭.৮.২৯) সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

৭ই জুলাই (২৩ আষাঢ়, রবিবার) আমার প্রথম সন্তান রঞ্জনের জন্ম হয়।

১৯৩০-এর গোড়ায় মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। বহু বিলম্বে প্রকাশিত ১৩৩৬-এর কার্তিক পর্যন্ত পূরা দুই বৎসর তিন মাস কাল একটানা চলিয়া নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে 'শনিবারের চিঠি' আর অগ্রসর হইতে পারে না। অগ্রহায়ণ সংখ্যা কয়েক ফর্মা ছাপা হইয়াছিল, উহা বাহির হয় নাই।

এই বৎসরের সর্বশেষ উল্লখযোগ্য ঘটনা প্রবাসী প্রেস ও কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন, ৯১ নম্বর আপার সারকুলার রোড হইতে ওই রাস্তারই ১২০/২ নম্বরে। কার্তিকের 'প্রবাসী' পুরাতন ঠিকানা হইতেই ৩১ আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর) বাহির হয়। ১লা কার্তিক (১৮ই অক্টোবর) ঠিকানা বদল হয়।

মামলা প্রসঙ্গ পূর্বে বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে। বিভূতিভূষণের সহিত পরিচয় ও রঞ্জন প্রকাশালয় স্থাপন একই প্রসঙ্গের অন্তর্গত, কারণ বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াই আমি প্রকাশক হইয়া পড়ি। কোনও সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফলে আমি পুস্তক-প্রকাশের ব্যবসায়ে ব্রতী হই নাই; ঘটনাচক্রে, হৃদয়াবেগবশতও বলিতে পারি, আমাকে এই কার্য করিতে হইয়াছে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অন্যান্য ঘটনার বিবৃতি মুলতুবি রাখিয়া আমি এখন বিভূতিভূষণ ও রঞ্জন প্রকাশালয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে পল্লী-আশ্রিত কান্তমধুর ভাবের জন্য হঠাৎ চমকের সৃষ্টি করে নাই। তখন সবে ইউরোপ হইতে আমদানি কারি-পাউডারের উগ্র ঝাঁজে বঙ্গ-সাহিত্যের শাকশালা সরগরম; বেপরোয়া নগ্ন বীভৎসতার একটা মত্ত মাদকতা ইউরোপের ভদ্রসংস্কার-ঐতিহ্যনাশী সমরাঙ্গণ হইতে উড়িয়া আসিয়া বাংলার রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্র-বিমুগ্ধ নগর-পল্লী-সমাজে জুড়িয়া বসিতে চাহিতেছে। তরুণেরা মত্ত বিভ্রান্ত, প্রবীণেরা ভীত সন্ত্রস্ত বিচলিত।

'সবুজ পত্র' মৃতপ্রায় হইলেও "নবীন" ও "কাঁচা"রা 'সবুজ পত্রে'র ছায়ানিরপেক্ষ ভাবেই পুচ্ছ তুলিয়া নাচিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। ফ্রয়েড্-বার্গসঁ আসিয়া গিয়াছেন; ইউরোপের আত্মঘাতী আবহাওয়ায় এলিয়ট-লরেন্স-জয়েসের ন্যায্য বিদ্রোহ বাংলা দেশের সাহিত্য-সমাজকে অকারণে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। এই অবস্থায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের (১৯২২, ১৪ জানুয়ারি) 'প্রবাসী'তে গল্পলেখকরূপে বিভূতিভূষণের প্রথম আত্মপ্রকাশ লক্ষ্যের বিষয় হওয়ার কথা নহে। যদিও তাঁহার প্রথম গল্প "উপেক্ষিতা"য় তাঁহার বৈশিষ্ট্যের সকল পরিচয়ই ছিল, তথাপি তাহা উপেক্ষিত হইয়াছিল। পরবর্তী "উমারাণী" (শ্রাবণ ১৩২৯), "মৌরীফুল" (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), "অভিশপ্ত" (আষাঢ়, ১৩৩১), "নাস্তিক" (পৌষ, ১৩৩১) এবং "পুঁইমাচা" (মাঘ, ১৩৩১) 'প্রবাসী'র কয়েকজন পাঠককে আকৃষ্ট করিলেও বিভূতিভূষণকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। ইহার পরেই 'কল্লোল'-দলের পটল-ডাঙার পাঁচালী ভাবী 'পথের পাঁচালী'র কবি বিভূতি-ভূষণকে মিঠা গল্পের আসর জমাইতে দেয় নাই, তিনি উত্তর-ভাগলপুরে ইসমাইলপুরের কাছারিতে অরণ্যবাস বরণ করিয়াছেন। প্রবাসে এই মনুষ্য-সমাগমহীন নিবিড় আরণ্য নির্জনতায় তিনি সুদূর যশোহরের স্বগ্রাম নিশ্চিন্দি-পুরের (বারাকপুর) তাঁহার শৈশবস্মৃতিমণ্ডিত কাহিনী 'পথের পাঁচালী' রচনা শুরু করেন। সূত্রপাতের তারিখ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল—১৭ই বৈশাখ, ১৩৩২। ওই তারিখের দিনলিপিতে তিনি লিখিয়াছেন:

> জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে।···সাহিত্যিকদের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া; তারা ভগবানের প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দ-বার্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে···এই কাজ তাদের করতে হবেই,···তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা···

ভাগলপুরেই লেখা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ২০ নবেম্বর (১৯২৫) তিনি দিনলিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন:

> সন্ধ্যার সময় টেবিলে আলো জ্বলছে···লেখার ['পথের পাঁচালী'র] পাতাগুলো ছড়ানো আছে···ফুলদানটাতে ক্রিসেন্থিমাম, কলাফুল···এই সন্ধ্যা, এই লেখবার টেবিল অত্যন্ত রহস্যময়, অর্থযুক্ত—হয়তো ৫১ বৎসর পরে আমার কোনো চিহ্নও পৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা হয়তো থেকে যাবে।···হয়তো কত লোকের মনে আশা, সান্ত্বনা দেবে···হয়তো ৫০০ বছর পরে যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে তবে আমি—এই আমি—এই অত্যন্ত জীবন্ত, প্রত্যক্ষ আমি, অনেক প্রাচীন

কালের এক লেখক হয়ে যাব।...আমার বই-পত্তর বড় বিশেষ কেউ ছোঁবে না...তখনকার দিনের নতুন নতুন উদীয়মান লেখকদের বই সব খুব পড়া চলবে...অনাগত ভবিষ্যতের সে-সব বংশধরগণের জন্যে আমি আলো জেলে তেল খরচ ক'রে আমার যথাসাধ্য বুদ্ধির অর্ঘ্য, যতই সামান্য হোক, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, তবুও দেব, দিতেই হবে, মনের মধ্যে সে প্রেরণা যেন অনুভব করছি...তার পরে তা বাঁচুক আর না বাঁচুক...আমি আর দেখতে আসব না, আমার ফুলদানির এই অত্যন্ত বড় বড় ও সুন্দর ক্রিসেন্থিমাম ফুল আর বছর এ সময় কোথায় থাকবে? ৮০ বছর পরে আমি কোথায় থাকব?

দীর্ঘ তিন বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনার শেষে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল তারিখে (১২ বৈশাখ, ১৩৩৫) 'পথের পাঁচালী' সম্পূর্ণ হয়। ২৬. ৪. ২৮ তারিখের দিনলিপিতে পাইতেছি:

> আজ আমার সাহিত্য-সাধনার একটা সার্থক দিন—এই জন্যে যে আজ আমি আমার তিন বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে 'বিচিত্রা'তে পাঠিয়ে দিয়েছি।

পরবর্তী আষাঢ় (১৩৩৫) অর্থাৎ 'বিচিত্রা'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে 'পথের পাঁচালী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে শেষ হয়; মোট ১৫ সংখ্যায়; কোনও কারণে কার্তিক ১৩৩৫-এর 'বিচিত্রা'য় 'পথের পাঁচালী'র কিস্তি বাহির হয় নাই।

নীরদচন্দ্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণ যেদিন আমাদের আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেদিন তাঁহার সম্বন্ধে আমরা কেহই বিশেষ উৎসাহী ছিলাম না। 'পথের পাঁচালী' দুই-একটা খুচরা সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় মাত্র চোখ বুলাইয়া দেখিয়াছিলাম, নিবিষ্ট চিত্তে পড়িয়া উহার স্বাভাবিক মাধুর্যে আবিষ্ট হই নাই। তাহা ছাড়া উহা 'বিচিত্রা'য় তখনও চলিতেছিল, শেষ হয় নাই।

কথায় কথায় নীরদচন্দ্র বলিলেন, 'পথের পাঁচালী'র মত উপন্যাসের একজন ভদ্র প্রকাশক জুটিল না, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্যের কথা। নীরদচন্দ্রের কথার তাৎপর্য আমি সেদিন ঠিক উপলব্ধি করি নাই, কারণ 'পথের পাঁচালী'র বিশেষত্ব তখন পর্যন্ত আয়ত্ত হয় নাই। প্রথম দিনের আড্ডার শেষে বিভূতিভূষণ বিদায় লইলেন। আমি 'বিচিত্রা'র ফাইল সংগ্রহ করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশিত অংশ পাঠ করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়িলাম। বেশ বুঝিতে পারিলাম, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে অভিনবের আবির্ভাব হইয়াছে। শেষ রাত্রিটা

উত্তেজনায় প্রায় বিনিদ্র কাটিল। পরদিন ঠিক দশটার সময় আপিসে উপস্থিত হইয়া নীরদচন্দ্রকে প্রশ্ন করিলাম, 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশক পাওয়া যায় নাই —এই কথাটার অর্থ কি? তিনি তৎকালে প্রখ্যাত দুইজন প্রকাশকের নাম করিলেন, একজন মাত্র পঞ্চাশ টাকায় কপিরাইট কিনিতে চাহিয়াছেন, একজন বই ছাপিয়া বিক্রয় হইলে কিঞ্চিৎ রয়াল্‌টি দিতে পারেন বলিয়াছেন। আমি অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইয়া বলিয়া ফেলিলাম, যদি বিভূতিবাবু রাজী হন, আমিই 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশক হইব। নীরদচন্দ্র অবাক। আমার বেতন তখন মাত্র মাসিক দেড় শত টাকা, কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া সংসার পাতিয়াছি। কোথাও হইতে অকস্মাৎ অর্থপ্রাপ্তিরও কোনই সম্ভাবনা নাই। নীরদচন্দ্র এই সকলই জানিতেন। তিনি বলিলেন, যদি সকল দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন আমি মির্জাপুরের মেসে গিয়া বিভূতিবাবুকে লইয়া আসিতেছি। উঁহার সহিত কি ভাবে লেখাপড়া হইবে আপনি স্থির করিয়া রাখুন। নীরদচন্দ্র চলিয়া গেলেন, আমি বন্ধুবর গোপাল হালদারের সহিত পরামর্শ করিয়া লইলাম। গোপালের বাবা তখন নোয়াখালি লোন আপিসের প্রধান কর্মসচিব। গোপাল আশ্বাস দিলেন, তাঁহার নিকট হইতে প্রয়োজন মত অর্থ ধার পাওয়া যাইবে। গোপাল ও আমি উভয়ে মিলিয়া পুস্তক-প্রকাশের ব্যবসায় ফাঁদিব গোড়ায় তাহাই স্থির হইল। উভয়ের পরামর্শে নির্ধারিত হইল 'পথের পাঁচালী'র প্রথম সংস্করণের জন্য বিভূতিভূষণকে আমরা তিন শত টাকা সম্মান-দক্ষিণা দিব। ইহাও আজ বলিতে বাধা নাই যে, আরও মাত্র দুই শত টাকা দক্ষিণা বাড়াইয়া দিলে আমরা 'পথের পাঁচালী'র কপিরাইট খরিদ করিতে পারিতাম। কিন্তু গ্রন্থকারদের রক্ষা করিবার প্রেরণাই যাহাদের প্রকাশক হইবার মূলে, তাহারা এইরূপ প্রস্তাব সে যুগে সঙ্গত হইলেও করিতে পারে নাই।

বিভূতিভূষণ আসিলেন। আমাদের প্রস্তাব তাঁহার নিকট পেশ করিলাম। তাঁহার মধ্যে যে চিরন্তন শিশুটি বরাবর ছিল, সে বলিল, একটু দরাদরি না হইলে ব্যবসা হয় না। সুতরাং তিনি দরাদরি করিয়া 'পথের পাঁচালী' প্রথম সংস্করণ ১১০০ কপির জন্য তিন শত পঁচিশ টাকা দাবি করিলেন। আমরা সানন্দে স্বীকৃত হইলাম। বিভূতিভূষণ ও আমার মধ্যে লেখাপড়া হইবে, সাক্ষী থাকিবেন নীরদচন্দ্র ও গোপাল—এইরূপই স্থির হইল। কিন্তু প্রকাশালয়ের নাম একটা দরকার, নহিলে দলিল হয় না। গৃহিণী তখন আসন্নপ্রসবা। আমার বরাবরই ধারণা ছিল, প্রথমটি পুত্র-সন্তান হইবে। সেই দিন সেই মুহূর্তে দলিল প্রস্তুত করিবার পূর্বে তাহার নাম রঞ্জন রাখা স্থির করিলাম

এবং তাহার নামে আমাদের পুস্তক-প্রকাশ-প্রতিষ্ঠানটির নাম "রঞ্জন প্রকাশালয়" রাখা হইল এবং 'রঞ্জন প্রকাশালয়ে'র পক্ষে আমি দলিলে সহি করিলাম। গোপাল অন্তরালে রহিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অন্তরালেই রহিয়া গেলেন।

৯১ নং আপার সারকুলার রোডে প্রবাসী আপিসের অন্তর্গত 'শনিবারের চিঠি'র ক্ষুদ্র কক্ষে মতিবাবুর দোকানের ডিম মাংস পাউরুটি পুডিং এবং কয়েক প্যাকেট ট্যাট্লার সিগারেট ধ্বংস করিয়া সেদিন "রঞ্জন প্রকাশালয়ে"র গোড়াপত্তন হইল। গোপাল সেই রাত্রেই পিতার নিকট অর্থ সংগ্রহার্থে নোয়াখালি রওয়ানা হইলেন, বিভূতিভূষণকে পঁচিশ টাকা মাত্র বায়না দিলাম।

স্থির হইল পরদিন বৈকাল হইতে আমাদের আড্ডায় প্রত্যহ 'পথের পাঁচালী' পাঠ হইবে, বিভূতিভূষণ সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া যাইবেন। ইহার পরের কথা তাঁহার দিনলিপি হইতেই তুলিয়া দিতেছি। একটা কথা এখানে যোগ করা আবশ্যক, ৭ই জুলাই শ্রীমান রঞ্জন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাদের প্রকাশালয়ের নামটা কায়েম করিয়া দিল।

> ২৬শে জুলাই, ১৯২৯, শুক্রবার। আজ প্রবাসীতে গিয়ে বইটার প্রথম ফর্মাটা ছাপা হয়েছে দেখে এলুম। সে হিসাবে আমার সাহিত্য-জীবনের আজ একটা স্মরণীয় দিন। ওটা ওদের ওখানে কাল শনিবারে পড়া হবে।
>
> ২৮শে জুলাই, ১৯২৯, রবিবার। কাল প্রবাসীতে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি অধ্যায় পড়া হ'ল। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু উপস্থিত ছিলেন; আরও অনেকে ছিলেন। সকলেই ভারি উপভোগ করলেন। এইটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এ বইখানার আর্ট অনেকেই ঠিক বুঝতে না পেরে ভুল করেন। দেখে ভারি আনন্দ হ'ল, সজনীবাবু কাল কিন্তু ঠিক আর্টের ধারাটা আমার বুঝে ফেলেছে। আর্টকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে বোঝা যায় বেশি।
>
> ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯, শনিবার। আজ একটি স্মরণীয় দিন, এই হিসাবে যে আমার বইখানার আজ শেষ ফর্মাটি ছাপা হ'ল। আজ মাসখানেক ধরে বইখানা নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি, কত ভাবনা, কত রাত-জাগা, সংশোধনের ও পরিবর্তনের ও প্রুফ দেখার

যে ব্যগ্র আগ্রহ, সবারই আজ পরিসমাপ্তি। এইমাত্র প্রবাসী আপিসে বসে শেষ প্যারাটার প্রুফ দেখে দিয়ে এলুম। ঠিক দু মাস লাগল ছাপতে।

ঘন বর্ষার দিনটি আজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরে চেয়ে কত কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে সব কথা এখানে আর তুলব না।

শুধুই মনে হয় সেই ভাগলপুরে নিমগাছের দিকের ঘরটাতে ব'সে বনাত-মোড়া সেই টেবিলটাতে সেই সব লেখা, সেই কার্তিক, সাবোর স্টেশনে গাছের তলায় শীতকালে পাতা জ্বালিয়ে আগুন-পোহানো, গঙ্গার ধারের বাড়িটার ছাদে কত স্তব্ধ অন্ধকার রজনীর চিন্তাশ্রম, সেই কাশবনে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সে সব ছবি—সবারই আজ পরিসমাপ্তি ঘটল।

উঃ, গত ছ মাস কি খাটুনিটাই গিয়েছে! জীবনে কখনও বোধ হয় আমি এ-রকম পরিশ্রম করি নি—কখনও না। ভোর ছটা থেকে এক কলমে এক টেবিলে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত কাটিয়েছি, মাথা ঘুরে উঠেছে, তখন একটু ট্রামে হয়তো বেড়াতে বেরিয়েছি, ইডেন গার্ডেনে, কেয়াঝোপে ব'সে ও একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে লাল ফুল ফোটা ঝিলটার ধারে ব'সে কত সংশোধনের ভাবনাই ভেবেছি! তার ওপর কাল গিয়েছে সকলের চেয়ে খাটুনি। সকালে ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত বইয়ের শেষ ফর্মার প্রুফ ও কাটাকুটি, শেষে রাত্রে পাথুরেঘাটার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া ও তদারক ক'রে লোক খাইয়ে বেড়ানো। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, গা হাত পা যেন কামড়াচ্ছে।

যাক। বই বেরুবে বুধবারে। ভগবান বলতে পারবেন না যে ফাঁকি দিয়েছি, তা যে দিই নি, তিনি অন্তত সেটা জানেন। লোকের ভাল লাগবে কি না জানি না, আমার কাজ আমি করেছি। (ওপরের সব কথাগুলো লিখলুম আমার পুরনো কলমটা দিয়ে,—যেটা দিয়ে বইখানার শুরু হতে লেখা। শেষ দিকটাতে পার্কার ফাউন্টেন পেন কিনে নতুনের মোহে একে অনাদর করেছিলুম, ওর অভিমান আজ আর থাকতে দিলুম না।)

২রা অক্টোবর, ১৯২৯, ১৬ই আশ্বিন, ১৩৩৬, বুধবার, মহালয়া। আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে

লাভ করেছে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী আপিসে ব'সে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিন, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি করতে পারি। তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।

আজ এই নির্জন, নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হ'ল যে, তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।

আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হতে আমি আমার সে পাখী-ডাকা, তেলাকুচা-ফুল-ফোটা, ছায়া-ভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন ক'রে এই কথাটি শুধু জানাতে চাই—ভুলি নি। ভুলি নি। যেখানেই থাকি ভুলি নি···তোমারই কথা লিখে রেখে যাব—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুর-সংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

আরও অভিনন্দন পাঠাই সেই সব লোকদের—যাদের বেদনার রঙে আমার বই রঙিন হয়েছে—কত স্থানে, কত অবস্থার মধ্যে তাদের সঙ্গে পরিচয়! কেউ বেঁচে আছে, কেউ বা হয়তো আজ নেই—এদের সকলের দুঃখ, সকলের ব্যর্থতা বেদনা আমাকে প্রেরণা দিয়েছে—কারুর সঙ্গে দেখা দিনে, কারুর সঙ্গে রাত্রে—মাঠে বা নদীর ধারে, সুখে কিংবা দুঃখে। এরা আজ কোথায় আছে জানি নে। কোথায় পাব ঝালকাটির সেই ভিখারীকে, কোথায় পাব আজ হিরু কাকাকে, কোথায় পাব কামিনী বুড়ীকে—কিন্তু এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-ভরা শান্তির মধ্য দিয়ে আমি সকলকেই আমার অভিনন্দন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যারা হয়তো আমার ছাপা-বই দেখলে খুশী হ'ত তারাও অনেকে আজ বেঁচে নেই—তাতে দুঃখিত নই, কারণ গতিকে বন্ধ করার মূলে কোনো সার্থকতা নেই তা জানি—তাদের গমনপথ মঙ্গলময় হোক, তাদের কথাও আমার মন থেকে মুছে যায় নি আজ রাত্রে।

বিভূতিভূষণ আজ বাঁচিয়া থাকিলে রঞ্জন প্রকাশালয়ের উদ্বোধন-কাহিনী তাঁহারই লিখিবার কথা। তিনি অসময়ে বিদায় লইয়া সেইদিনকার সেই আনন্দ-কাহিনী আমাদিগকে অশ্রু-অভিষিক্ত করিয়া লিখিতে বাধ্য করিয়াছেন।

'পথের পাঁচালী' দিয়া সূত্রপাত হইলেও উহা রঞ্জন প্রকাশালয়ের সর্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক নয়। দ্বিতীয়ও নয়। তৃতীয় পুস্তক। প্রথম পুস্তক আমার 'অজয়'—আকারে ছোট বলিয়া উহার ছাপা পরে আরম্ভ হইলেও আগেই শেষ হইয়া যায়, ১লা ভাদ্র ১৩৩৬ (১৭ই আগস্ট ১৯২৯) উহা প্রকাশিত হয়। 'অজয়ে'র কিছু কাগজ বাঁচিয়াছিল—মাত্র চার ফর্মার 'পথ চলতে ঘাসের ফুল'ও ২৪ সেপ্টেম্বর (১৯২৯) তারিখে বাহির হয়। 'পথের পাঁচালী' বাহির হয় ২রা অক্টোবর, মহালয়ার দিন। আমি সেই দিন "অপুকে" 'অজয়' দিয়া নাম সহি করি "অজয়" এবং বিভূতিভূষণ "অজয়কে" 'পথের পাঁচালী' দিয়া নাম সহি করেন "অপু"। এই মহামূল্যবান গ্রন্থখানি আজও আমার ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিয়া আছে।

বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে সহস্র কথা আমার অন্তরে সঞ্চিত হইয়া আছে। যথা-সময়ে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব। এইখানে শুধু একটি কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া রাখি যাহা আমরা অর্থাৎ তাঁহার সমসাময়িকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি যেন মানসসরোবর হইতে শীতঋতু যাপনের জন্য আমাদের এই পঙ্ককর্দম ও শৈবাল-লাঞ্ছিত পুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এখানকার ঝাঁকে মিশিতে পারেন নাই। আমরা শুধু দেখিলাম, বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নব শুচিতা ও সহৃদয়তার আমদানি করিলেন। আমরা দীর্ঘ বিরোধ ও কঠিন প্রতিবাদের দ্বারা যে সহজ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই, বিভূতিভূষণ অবলীলাক্রমে শুধু দৃষ্টান্তের দ্বারা সাহিত্যের সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।

সপ্তম তরঙ্গ

"মদন ভস্মের পর"

১৩৩৬ বঙ্গাব্দেই তথাকথিত "অতি-আধুনিক" সাহিত্যিকদের প্রধান প্রধান আশ্রয়গুলির অধিকাংশই কাহিল হইতে হইতে একে একে মরিয়া গেল। কলিকাতায় 'কল্লোল' স্তব্ধ হইল, 'কালি-কলমে'র কালি ফুরাইল, সদ্যোজাত

'ধূপছায়া' অন্ধকারে মিলাইয়া গেল ; ঢাকায় 'প্রগতি' গতিহীন হইল, 'বীণা'র তার ছিঁড়িয়া গেল। 'হসন্তিকা'র বুড়া তরুণদের বাঁধানো দন্তবিকাশও মাত্র চার সংখ্যায় (বৈশাখ—শ্রাবণ ১৩৩৫) নিঃশেষ হইল, দৈনিক 'ফরওয়ার্ড'-আশ্রিত 'আত্মশক্তি' ভোল পালটাইল। যে দুই জন সত্যকার সৃষ্টিধর্মী শক্তিমান সাহিত্যিক 'কল্লোল'কে প্রতিষ্ঠিত ও নূতন সাহিত্যকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন, সেই শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র সর্বপ্রথম দল ভাঙিয়া চতুর্থ বৎসরে (১৩৩৩) 'শনিবারের চিঠি'র তৎকালীন "সংবাদ-সাহিত্যে"র ভাষায় "গড দি ফাদার ও গড দি সন রূপে গড দি হোলি গোস্ট্ শ্রীমুরলীধর বসু"র সহিত মিলিত হইয়া উৎসাহের সঙ্গে এক বৎসর 'কালি-কলম' চালনা করিয়াছিলেন, তাহারও দ্বিতীয় বৎসরে (১৩৩৪) গড দি সন এবং তৃতীয় বৎসরে (১৩৩৫) গড দি ফাদার সরিয়া পড়িয়াছিলেন। একা মুরলীধর আরও এক বৎসর 'কালি-কলম' লইয়া যুঝিয়াছিলেন, কিন্তু "বরদা" বিরূপ হওয়াতে তিনিও ক্ষান্ত হইলেন।

'কল্লোল' দলে অনেক আগেই ভাঙন ধরিয়াছিল, যাঁহারা নিয়মিত লিখিতেন ও আড্ডা দিতেন তাঁহাদিগকেই দল বলিতেছি। সে দল ভাঙিয়াছিল গঙ্গাধরবৎ 'কল্লোল'-ধর গোকুল নাগের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। আসলে তিনিই ছিলেন 'কল্লোলে'র প্রাণ। সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ মুখের মিষ্টতায় ধ্বনি যোগাইতেন, এইটুকুই তাঁহার বড় কৃতিত্ব। তিনিও আদর্শনিষ্ঠ ত্যাগী মানুষ ছিলেন, কিন্তু সকলকে ধরিয়া রাখিবার মত ধৃতি তাঁহার ছিল না, চাতুর্য ছিল কিন্তু তাহার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। তারাশঙ্কর তাঁহার 'আমার সাহিত্য-জীবন' প্রথম খণ্ডে (১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৮-৪১) 'কল্লোলে'র আড্ডার একটি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি :

> এই সময়েই আমি ঢুকলাম।
>
> শৈলজা দেখেই সানন্দে ব'লে উঠলেন—আরে, তারাশঙ্করবাবু—আসুন, আসুন! দীনেশ! তারাশঙ্করবাবু। ইনি দীনেশবাবু, উনি পবিত্র।
>
> পবিত্র তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, আমি উঠছি, আপনি এলেন। তা বেশ, হবে এর পর আলাপ। কেমন?
>
> চলে গেলেন। দীনেশবাবু বললেন, বসুন, বসুন।
>
> বসলাম। তার পর সব চুপ। আমিও চুপ। তাঁরাও চুপ। ভাবছি কেমন করে জমানো যায়! কি বলি! কড়িকাঠের দিকে চাইলাম, মেঝের দিকে চাইলাম, হঠাৎ একটা কথা খুঁজে পেলাম, ভাবলাম বলি,—

আমার ভাইয়ের বিয়ে, চলুন না আমাদের দেশে। কথাটা আমাদের গ্রাম্য সমাজ অনুযায়ী চমৎকার। এই সূত্র ধরে অনেক কথা বলা যেতে পারবে। অন্তত আমি বলবার সুযোগ পাব আমাদের গ্রামের অনেক কথা। মুখ তুললাম বলবার জন্য, তুলেই একটু অপ্রস্তুত হলাম, দেখলাম—দীনেশবাবু মুখ টিপে ও চতুর হাসি হেসে শৈলজানন্দের দিকে চেয়ে না-এর ইঙ্গিতে ঘাড় নাড়ছেন। মুখ আপনিই চকিতে ফিরল শৈলজার দিকে। দেখলাম—শৈলজা দীনেশবাবুর দিকে তাকিয়ে আছেন—দু হাতের দশটি আঙুল মেলে দেখাচ্ছেন। যে মুহূর্তে আমার চোখ পড়ল, সেই মুহূর্তে তিনি একটা হাত নামিয়ে পাঁচ আঙুল দেখালেন। তার পরই হাত জোড় করলেন।

দীনেশবাবুকে চতুর লোক মনে হ'ল। চতুর মানে ধূর্ত বলছি না আমি। আমি বলছি, নাগরিক যে হিসাবে গ্রামীণের কাছে চতুর, সেই হিসাবে চতুর তিনি। মুহূর্তে তিনি আমার দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। বললেন, তার পর তারাশঙ্করবাবু, আপনাদের ওখানে খুব বড় বড় মাছ আছে পুকুরে—না? ছিপে ধরা যায়?

সুতরাং মানী তারাশঙ্করের 'কল্লোল'-শ্রবণস্পৃহা এই প্রথম দিনেই নিবৃত্ত হয়, এবং অনুরূপ কারণে ধীরে ধীরে দল ভাঙিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত 'কল্লোল' স্তব্ধ হয়।

দগ্ধ হইবার পর ছাই উড়িবার পালা; উড়িতেও লাগিল। ছাইয়ের সঙ্গে প্রতিহিংসা-তুষের কিঞ্চিৎ আগুন মিশ্রিত ছিল, ছাই উড়িয়া নূতন যাহাদের উদ্ভব হইল 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষে তাহারা বেড়া আগুনের মূর্তি ধরিতে চাহিল, চারিদিক বেড়িয়া পুড়াইয়া মারাই লক্ষ্য। প্রথম উদ্ভব হইল 'মহা-কালে'র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। কালো মলাটের উপর লাল কালির আগুন-অক্ষরে জ্বলজ্বল করিতে লাগিল তিনটি শব্দ "শনিবারের চিঠির অশনি।" অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যুগে' এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

> এ সময়ে—'মহাকাল' নামে এক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। 'শনি-বারের চিঠি'র প্রত্যুক্তি। 'শনিবারের চিঠি' যেমন বাংলা সাহিত্যের শ্রদ্ধেয়দের গাল দিচ্ছে—যেমন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র—তেমনি আরো ক'জন শ্রদ্ধাভাজনদের—যাদের প্রতি 'শনিবারের চিঠি'র মমতা আছে—তাদেরকে অপদস্থ করা। 'মহা-কালে'র সঙ্গে আমি, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু সংশ্লিষ্ট ছিলাম। 'মহাকাল' অনন্তকাল ধরে রক্তের অক্ষরে মানুষের জীবনের ইতিহাস লেখে; কিন্তু এ

'মহাকাল' যে কিছুকাল পরেই নিজের ইতিহাসটুকু নিয়ে কালের কালিমায় বিলুপ্ত হয়ে গেল এ একটা মহাশাস্তি।—১ম সং, পৃ. ২৮৭-৮৮

অচিন্ত্যকুমার বলিতে ভুলিয়াছেন যে, তাঁহারা যে কারণেই হউক "নকুড় ঠাকুরের আশ্রমের"ও "ব্রিফ" লইয়াছিলেন, হইতে পারে তাহা শেক্সপীয়র-প্রোক্ত নিছক সঙ্কটের বন্ধুত্ব। ক্রোধের বশে অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-বিষ্ণুর মত রুচিবাগীশ "সৃষ্টিকর্তা" সাহিত্যিকেরা কতখানি বিচলিত হইয়াছিলেন প্রথম সংখ্যা (১৩৩৬ বৈশাখ) 'মহাকাল' হইতে তাহার কিছু নমুনা দিতেছি :

রামানন্দবাবুর দাড়ির বহরটা দেখেছেন চোখ মেলে? একটা গোটা কম্বল বোনা যেতে পারে—ইয়ারকি নয়!···রামানন্দবাবু পাইয়ে-দাইয়ে গোনা এক ডজন খেঁকি কুকুর পুষেছেন জানো? লেলিয়ে দিলে টেরটা পাবে বাছাধন। ঋষির সঙ্গে চালাকি নয়! নিরাকার ব্রহ্মের যদি হাত থাকত তা হ'লে প্রার্থনা করতুম—হে ভূমা, তুমি এদের মাথায় গুনে গুনে তিনশ পঁয়ষট্টিটি গাঁট্টা মেরো।—পৃ. ৩০-৩১

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র ব্রাহ্ম রাসবিহারী নাকি বাস্তবে বর্তমান। তিনি অবশ্য জমিদারির ম্যানেজার নন, তিনি ম্যানেজার সাহিত্যের। আমাদের কাছে খাস রাসবিহারীর ছবি আছে, 'দত্তা'র রাসবিহারীর কি দাড়ি ছিল?—পৃ. ৩৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মির্জাফর লুকিয়ে আছেন, আপনারা বোধ হয় জানেন না। এই লোকটির একটু পরিচয় নীচে দিলাম।

ইনি প্রথমে ৭৫৲ কি ১০০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর কলেজে চাকরি নেন। তার পর আশুবাবুর বাড়িতে বছর খানেক ধন্না দেবার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকরি পান। চতুর লোক।—রমাপ্রসাদ মুখুজ্যে এবং প্রমথ বাঁড়ুজ্যের হাতে-পায়ে ধরে একটু একটু করে আশুতোষের নেকনজরে পড়বার সুযোগ করে নেন। তার পর স্যার আশুতোষ, রমাপ্রসাদ ও প্রমথবাবুর চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা বৃত্তি আদায় করে বিলাত যাত্রা করেন, এবং সেখান থেকে ফিরে স্যার আশুতোষের কৃপায় এবং রমাপ্রসাদবাবু, প্রমথবাবু প্রভৃতির চেষ্টায় দিব্যি হোমরা-চোমরা একজন হয়ে ওঠেন। তখন আর পায় কে?···রমাপ্রসাদ বাবু এবং প্রমথবাবুর চাকরি খাবার জন্যে এই মহানুভবটি যে কি প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন তার ইতিহাস এত দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তা দিয়ে একটি মহাকাব্য রচনা হতে পারে। মহাকবি বাল্মীকি আজ বেঁচে থাকলে এই অপূর্ব জীবটিকেও বোধ হয় অমর করে রেখে দিয়ে

যেতেন। তবে ভরসা এইটুকু যে, রবীন্দ্রনাথ এখনও জীবিত এবং হয়তো বা শেষ বয়সে একটা মহাকাব্য রচনা করে দয়া করে এই বিনীত সুনীতিরত মহাত্মাটিকে অমর ক'রে রেখে দিয়ে যাবেন।—পৃ. ৩৭-৩৮

বশিষ্ঠ-প্রিয়া অরুন্ধতী কি আছেন ঘরে?
গালি দাও তবে মহিলাজনেরে তৃপ্তি ভরে!
সীতা নেই ঘরে! কমলাও নেই! দিতেছ গালি
অন্যের ঘরে!—Scandal তবু ঘুরিয়া মরে!
জীবনের আধা কাটিল! বাজারে পাত্র কি নেই?
কাটলই যদি বিয়ে হল নাক' কেন সুধীরেই?
চাল্‌শেই যদি আস্‌ল তবে এ আজি বা কালি
দাস হতে হবে? হ'লেই তা হ'ত তো শান্তিতেই।—পৃ. ১১

মহাকালের প্রবাহে 'মহাকাল' তিন মাসের অধিক চলে নাই। আষাঢ় বা শেষ সংখ্যায় পণ্ডিচেরী-ফেরত বোমারু বারীন্দ্রকুমার, অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-বিষ্ণুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া 'মহাকাল'কে চতুরানন করা সত্ত্বেও 'মহাকালে'র কাল হইল। বারীনদা আষাঢ় সংখ্যায় "রাহু-ভারত" নামক এক মহাকাব্য শুরু করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় তাহা আর শেষ হয় নাই। উপরের উদ্ধৃতিগুলি এবং "রাহু-ভারত" হইতে উদ্ধৃতি শুধু এই কারণেই "আত্মস্মৃতি"-ভুক্ত করিতেছি যে, 'মহাকালে'র এই সকল মহারত্ন এইভাবে ধরিয়া না রাখিলে বাংলা সাহিত্যের ভাবী উত্তরাধিকারীদের সেগুলি আর চোখে দেখারও সুযোগ মিলিবে না, সম্ভবত আমার কাছ ছাড়া 'মহাকাল'গুলি আর অন্য কুত্রাপি নাই। বারীনদার মহাকাব্যটি আমার, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের এবং 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকথা লইয়া রচিত হইতেছিল। পয়ারে রচিত প্রস্তাবনার মর্ম এই :

বঙ্গদেশে নারী-অভ্যুদয় দেখিয়া ইন্দ্র চন্দ্র আদি স্বর্গের দেবতারা একদা হতভম্ব, উর্বশী মেনকা রম্ভা প্রভৃতি রাগে হাঁড়িমুখ হইয়া আছেন, এমন সময় সিংহদ্বারে কোলাহল উঠিল, মুক্তকচ্ছ বৃদ্ধ নারদ কাহাদের যেন গালি পাড়িতে পাড়িতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। একপাল দেবশিশু ছেঁড়া জুতা লইয়া "নারদ নারদ" করিতে করিতে তাঁহাকে ক্ষ্যাপাইতেছিল :

মুক্তকচ্ছদশা মুনি মহাক্রোধ ভরে
শাপান্ত করেন যত দেব-বালকেরে,—
"যেমন করিলি মোরে হেথা মুখখিস্তি
মানুষ হইয়া পাও এই মত শাস্তি।

কবি হয়ে জন্মি সবে লেখ কামায়ন,
একগাছি কেশ মোর করি উৎপাটন
পাঠাব বাংলা দেশে মানুষ করিয়া
ঠেঙায়ে তোদের ভূত দিবে ছাড়াইয়া।
রাহু-মণ্ডলের সেই হবে সম্পাদক
আত্মা তারে দিবে এক লড়ায়ে মোরগ।
তীক্ষ্ণ দন্ত চার পাটি দিবে যত খেঁকী
গুঁতাবার বল দিবে সে ষণ্ড পিনাকী।
শত পদী-পিসী আর মেছনী ছানিয়া
গড়িব তাহাকে সেই জিহ্বামৃত নিয়া,
জগতে হইবে মহা রাহু-জয়-জয়
কুঁদুলে চণ্ডীর নাম বঙ্গেতে অক্ষয়।"

অশোক সজনী নাম তৃতীয় পর্ব

সেই উৎপাটিত কেশ মহা ভয়ঙ্কর
সূর্যলোক ভেদি চলে মর্ত্যলোক পর।···
হাঁ হাঁ করি দেবসভা আকুলিয়া ওঠে,
কাটিতে ভীষণ কেশ বিষ্ণুচক্র ছোটে
দ্বিখণ্ড করিয়া তারে চক্র ফিরি যায়,
কার সাধ্য তবু মুনি-শাপেরে খণ্ডায় ?···
হাসিয়া বিষ্ণুর প্রতি কহিলা নারদ,
"ভালই করিলে প্রভু কাটিয়া আপদ।···
বিষ্ণুচক্রে কাটি, দেব, করিয়াছ ভাল,
হুত তেজ হয়ে উভে জ্বালিবে যে আলো,—
সে জ্ঞানে ব্রহ্মের কুল হইবে উদ্ভাস,
উভে মিলি রাহু-পত্র করিবে প্রকাশ।
দুই জনে হবে অতি মেধাবী বালক
সজনী প্রবন্ধ আর লিখিবে শোলক,
তাড়নায় চলিবে সে অশোক-চট্টের,
লভিবে অমর যশ দুর্মুখ-ভট্টের।···
রাহু-ভারতের কথা অমৃত সমান
শাপান্তে হইবে ওরে কেশ-অন্তর্ধান।

হৃতশক্তি সে সজনী তবু তারোপর
বাহির করিয়া দন্ত রবে নিরুত্তর।

—'মহাকাল', আষাঢ় ১৩৩৬, পৃ. ৯০-৯৫

'শনিবারের চিঠি'র জন্মের গূঢ় কারণও অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবেরা এই সংখ্যার ৯৯-১০০ পৃষ্ঠায় জাহির করিলেন :

> কিছুকাল বাদে ঘেঁটুর পয়সায় এক পত্রিকা বাহির হইল—নাম হইল 'লড়ায়ে মোরগ'। বছর খানেক ধরিয়া, জনকয়েক ছোকরা সাহিত্যিক এমন ভ'ল লিখিতে শুরু করিয়াছিল যে, অবিলম্বে তাহারা পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের ভাত মারিয়া দিবে, এমন আশঙ্কাও হইল। কারণ, তাহাদের কারবার ফাঁকির নয়, ধাপ্পা মারিয়া তাহারা ব্যরসা বজায় রাখে না। মহা মুশকিল! এই সব ফচ্‌কে ছোঁড়াদের অকাল-পক্কতা অসহ্য!
>
> তাই 'লড়ায়ে মোরগে'র আবির্ভাব!
>
> সম্পাদক হইল সজিনা নামক 'বিদেশী'র বোকা ছাপাখানার ভূতটা।

'শনিবারের চিঠি' দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিন হইতে আজিও বাঁচিয়া আছে বলিয়া তাহার গায়ে নিন্দা-কটূক্তির যে ছাপ লাগিয়াছিল তাহা এখনও উঠে নাই; কিন্তু 'কল্লোল'-ওয়ালারা বার বার মরিয়া বার বার জন্ম পরিগ্রহ করাতে তাঁহাদের কলঙ্ক-কালিমা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে; এখন তাঁহারা অতীতের নিষ্কলুষ শুচিতারও বড়াই করিতে লজ্জা পাইতেছেন না। অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোল যুগে' এই মিথ্যা দম্ভের বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের প্রথম তিন মাসের ইতিহাস যদি অচিন্ত্যকুমার 'মহাকাল যুগ' নাম দিয়া বাহির করিতেন তাহা হইলে 'কল্লোল যুগে'র মর্যাদা আরও বাড়িত। কিন্তু 'মহাকাল'-যুগেই এই ইতিহাসের সমাপ্তি নয়। এই বৎসরের শেষ তিন মাস অর্থাৎ মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রকে 'রবিবারের লাঠি'র যুগ বলিতে হইবে এবং এইখানেই 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে জেহাদের শেষ। এই 'রবিবারের লাঠি' আরও নিকৃষ্ট, আরও কর্দমাক্ত রূপ লইয়া মাঘ মাসে (১৩৩৬) প্রকাশিত হয়। ইহার মলাটে ছিল ভূমণ্ডলের উপর উপবিষ্ট এক স-কঞ্চিবংশদণ্ড-ধৃত তরুণ, দণ্ডের প্রান্তভাগে একটি মোরগ গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝোলানো। 'শনিবারের চিঠি'র সহিত নাম-সামঞ্জস্যে এই বর্ণগন্ধস্বাদহীন কাগজটার নামই

লোকে মনে রাখিয়াছে। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী 'মহাকালে'র কথা আর কাহারও স্মরণে নাই। 'রবিবারের লাঠি'র কোন লেখাই উদ্ধারের যোগ্য নয়।

'কল্লোলে'র এই শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটিবার পূর্বেই খাস কল্লোলীরা এদিক ওদিক ছিটকাইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৩৩৫এর শেষে অচিন্ত্যকুমার 'বিচিত্রা'য় চাকুরি লইলেন—"আসলে প্রুফ দেখার কাজ, নামে সাব-এডিটর।" স্বয়ং দীনেশরঞ্জন দাশ চলচ্চিত্রের কারখানাতে দৃশ্য-সজ্জার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। পূর্বপলাতক শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্রের মধ্যে প্রেমেন্দ্র দৈনিক 'বাংলার কথা'র নিশি-সম্পাদকের দলে ভর্তি হইয়াছিলেন; পরম্পরায় শুনিতাম তিনি সেখানে সুখী ছিলেন না। কিছুকাল এদিক ওদিক ভ্রাম্যমান শৈলজানন্দ শেষ পর্যন্ত বিপরীতের আকর্ষণে আমাদের সমীপবর্তী হইলেন। পরে আসিলেন, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রেমেন্দ্র-প্রবোধও আসিলেন, কিন্তু অন্যভাবে।

শৈলজানন্দ আমার দেশের অর্থাৎ বীরভূমের লোক। তাঁহার প্রতি দেশোয়ালী প্রীতি আমার বরাবরই ছিল। তাহা ছাড়া আমরা প্রায় সমবয়সী হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আমার অনেক অগ্রজ—শ্রদ্ধেয় অগ্রজ। আমি যখন কলেজে পড়ি তখন 'প্রবাসী'তে তাঁহার কয়লা-কুঠীর গল্পগুলি বাহির হইতেছিল। সেই গল্পগুলি পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল, শরৎ-উত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে নূতনের অগ্রদূত যদি কাহাকেও বলিতে হয় সে এই শৈলজানন্দকেই বলা চলে। কয়লাখাদের কুলি, কামিন, অতি নগণ্য বাবু-চাকুরেদের লইয়া যে মর্মস্পর্শী কাহিনী রচনা করা যায় তাহা তিনিই প্রথম দেখাইলেন। শুরু হইতেই তাঁহার ভাষার অপরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল। ছোট ছোট বাক্য, ছোট ছোট বাক্যগুচ্ছ, সব কথা না বলিয়াও সকল কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিবার ভঙ্গি শৈলজানন্দের স্বভাবতই আয়ত্তে ছিল। অথচ তাঁহার মধ্যে কোথায়ও অস্পষ্টতা ছিল না। পরিচয় হইলে বিস্মিত হইয়া দেখিয়াছিলাম, ভাষার মত তাঁহার অক্ষর-গ্রন্থনও চমৎকার। শৈলজানন্দের এই লিখন-ভঙ্গি অনুকরণ করিতে গিয়া তরুণ প্রবোধকুমার নানা দিক দিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন, ইহা আমি জানি।

শৈলজানন্দ চাকুরির সন্ধানে 'প্রবাসী'তে আসিলেন। অবস্থা এমন যে-কোনও সামান্য চাকুরি হইলেই চলিবে। চাকুরি তিনি পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পদমর্যাদা ঠিক কি হইয়াছিল আজ স্মরণ নাই। সম্ভবত প্রুফ দেখার কাজেই তিনি বহাল হইয়াছিলেন, অর্থাৎ খাস আমারই ডিপার্টমেণ্টে। পূর্বরাগ

ছিলই, তিনি আসিবামাত্রই আমরা "একপ্রাণ, একটিকিট" হইয়া গেলাম। তুচ্ছ আর গম্ভীর গল্প বলিয়া এমন আসর জমাইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। ভূতের গল্প, সাপুড়ের গল্প, খুনের গল্প—তাঁহার অফুরন্ত স্টক ছিল; তিনি জীবনকে নাড়িয়া চাড়িয়া নানাভাবে দেখিয়াছিলেনও। 'প্রবাসী'র ছাপাখানার প্রুফ-রীডারের চেয়ারে অমন একটা মানুষ বেশিদিন টিকিতে পারেন না। শৈলজানন্দ অচিরাৎ সরিয়া পড়িলেন, কিন্তু সৌহার্দ্যের যে রেশটুকু আমার মনে রাখিয়া গেলেন তাহা আজও অম্লান হইয়া আছে। বলা বাহুল্য, উহার পরে নানাভাবে তাঁহার সম্পর্কে আমাকে আসিতে হইয়াছিল। সে সব কথা পরে বলিব। শৈলজানন্দ এই সময় হইতেই চলচ্চিত্র লইয়া মাথা ঘামাইতেন, ইহা স্মরণ আছে।

পলাতক শৈলজানন্দের পরিত্যক্ত আসনে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া বসিলেন। 'প্রবাসী'তে অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র আখড়ায় আসিতে শৈলজানন্দের সঙ্কোচ ছিল না, কিন্তু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভয় ছিল 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত 'কল্লোলে'র পবিত্রকে নিশ্চয়ই আমল দিবেন না। তাই তিনি কাহাকে যেন সুপারিশ স্বরূপ ধরিয়া আনিয়াছিলেন। আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, সাহিত্যিকেরা যখন কলম চালায় তখনই তাহাদের দল থাকে, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহারা বন্ধু ও সগোত্র। অপরিচয়ের আড় ভাঙিতে একদিন মাত্র লাগিয়াছিল। পরের দিন হইতেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পবিত্রদা হইলেন। সেই সম্পর্ক আজও বজায় আছে। তাঁহার চলমান জীবন তাঁহাকে ভিন্ন পথে লইয়া গেলেও তিনিই যে একদা অতি বিচিত্র অবস্থার মধ্যে নজরুল ইসলামকে আমার কাছে টানিয়া আনিয়াছিলেন এবং সেই প্রথম সন্দর্শন প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল—এ কথা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।

'কল্লোলে'র অন্তরঙ্গ দল বলিতে যাহা বুঝায় নজরুল ইসলাম ও প্রবোধকুমার সান্যাল কখনই তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহারা স্বভাব-যাযাবর, মানস-সরোবর-বিহারী হংসের মত ঋতুবিশেষে আসিয়া জুটিয়াছেন, আবার উড়িয়া গিয়াছেন। কলগুঞ্জনে নিকট পরিবেশকে মুগ্ধ-অভিভূত করিবার ভগবদ্দত্ত শক্তি ছিল নজরুলের—ঝাঁকে মিশিয়া আত্মহারা তিনি কখনই হন নাই। এই কারণে 'কল্লোলে'র দল ভাঙিয়া গেলেও এই দুই জনের অবস্থা-বিপর্যয় ঘটে নাই।

অষ্টম তরঙ্গ

দুর্দিন

প্রথম পর্যায় 'শনিবারের চিঠি'র সর্বাধিক গৌরবের যুগে শনি-মণ্ডলীর একটি গ্রুপ ফোটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল। নানা কারণে আমাদের পক্ষে ইহা একটি ঐতিহাসিক চিত্র। ৯১ নম্বর আপার সারকুলার রোড, প্রবাসী আপিস অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম আশ্রয়-স্থলকে পশ্চাতে রাখিয়া এই ছবি (গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য) গৃহীত হয় ১৯২৮ সনে মোহিতলালের ঢাকা গমনের পূর্বে। দুঃখের বিষয়, দলের রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, স্বয়ং আদি সম্পাদক যোগানন্দ দাস, সুধীরকুমার চৌধুরী ও সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ায় চিত্রটি অসম্পূর্ণ। বিভূতিভূষণ তখনই যে দলে আসিয়া ভিড়িয়াছেন, এই ছবিটিই তাহার প্রমাণ। সুশীল—সুনীতি—রঙীন—মোহিত—অশোক—সুরেশ—জীবনকালী—নীরদ—গোপাল—বিভূতি—হেমন্ত—সজনী—হরিপদ—গিরিধরের সঙ্গে দেখিতেছি কবি হেমচন্দ্র বাগচীকে; তিনি তখন তরুণ, সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পার হইবার চেষ্টায় ছিলেন। মোহিতলালের কাব্যে অকৃত্রিম প্রীতিবশত তিনি আসিয়া জুটিয়াছিলেন—তরুণ হইয়া বুড়াদের (?) দলে মিশিয়াছিলেন বলিয়া অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু-প্রমুখ "মহাকালী"রা তাঁহার কম লাঞ্ছনা করেন নাই। অথচ হেমচন্দ্র আমাদের আড্ডাভুক্ত হইলেও তখনও লেখকদলভুক্ত হইবার অধিকার পান নাই। তাঁহার সঙ্গে তরুণতর আর একজন কবি প্রায়ই আসিতেন, সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি শুধু অল্প বয়সে ভাল কবিতাই লিখিতেন না, তাঁহার সুকণ্ঠ আবৃত্তিতে আমাদের মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তিও ছিল অসাধারণ, বাংলা দেশের যাবতীয় কবির কাব্য তিনি আমাদের অনর্গল শুনাইয়া যাইতেন; মোহিতলাল ও তাঁহার মুখের আবৃত্তি শুনিয়াই রবীন্দ্রোত্তর বাঙালী কবিদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। শৈলজানন্দ যখন আসিলেন তখন তদ্ভক্ত সুবলচন্দ্রও পাকাপাকি রকমে আমাদের আড্ডাভুক্ত হইলেন। জীবনযুদ্ধে পরাজিত হইয়া কয়েক বৎসর পরে এই তরুণ কবি গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হন, তাঁহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কয়েকটি খণ্ড কবিতা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে এই মাত্র, বাংলা দেশ ও সাহিত্য হইতে তিনি প্রায় নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছেন।

তরুণ কবি সুবলচন্দ্রকে আমার স্মৃতিকথায় আজ স্মরণ করিতেছি। তিনিই

প্রথম বাঙালী কবি যাঁহার কণ্ঠে আমার আসল কবিসত্তার সাদর স্বীকৃতি ধ্বনিত হইয়াছিল একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতায়; জীবনের পাথেয়স্বরূপ কবিতাটি আমি এতকাল সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছি, আজ প্রকাশ করিয়া ধন্য হইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন :

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস বরণীয়েষু—

বৈরাগিণী মরুপথে চুমি' যায় উন্মনা শর্বরী।
ক্লান্তির পসরা শিরে ছুটে চলি ব্যথায় বিলীন
ধরিতে তারার লেখা। নেত্র হতে অশ্রুর তুহিন
ঝরি' যায় শুভ্র বালুতলে, তমসার বিলোল কবরী;
বনের মদির গন্ধে তৃষ্ণাবেগে উঠিছে শিহরি।
মরুচারী মুশাফের ভ্রমি একা দোসরবিহীন—
সহসা কাহারে হেরি', জাগি উঠে জীবন-বিপিন
মন্থর মঞ্জুল সুরে! শ্রান্ত হিয়া নিল তারে বরি।

তাহারে বরিয়া লহ ওরে ভীরু অমৃত-সন্তান—
সে আজি মুছাবে আঁখি, মুছি দিবে মরুর দাহন,
শ্যামলের স্নেহে ভরা প্রসারিবে দুটি করতল।
অধরে বিদ্যুৎ তার, বহি' আনে মেঘের স্বপন।
বাম কোলে অশ্রুবীণা, বামেতরে লীলা-শতদল—
বাঁধিল মায়ার ডোরে।—ধন্য মানে বিধুর পরাণ।

আমার যুযুধান দিকটিকে অবশ্য কবি মোহিতলাল কয়েক মাস পূর্বেই আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন একটি কবিতা-পত্রে, ১৩৩৪ পৌষ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে তাহা "'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্যে" এই নামে প্রকাশিত হয়।

পরিবারে নূতন অতিথির আগমন-সম্ভাবনায় সঙ্গতিহীন পিতা যখন অতিশয় ব্যাকুল ও বিব্রত, ঠিক এই সময়ে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একদিন আমাকে তাঁহার গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ দিলেন। আমার ডাইরিতে দেখিতেছি, যেদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, সেই দিন ২২শে আষাঢ়, ইংরেজী ৬ই জুলাই অর্থাৎ শ্রীমান রঞ্জনের জন্মের ঠিক পূর্বদিন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোনও কথা না বলিয়া একখানি পত্র আমার হাতে দিলেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা। প্রবাসী প্রেসে 'শনিবারের চিঠি' ছাপা হইতে থাকিলে তিনি আর কোনও প্রকারে 'প্রবাসী'র সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না—পত্রে সেই সাংঘাতিক বিজ্ঞপ্তি ছিল। আমি এমনই অভিভূত

হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, বেশী কথা বলিতে পারিলাম না। শুধু বলিলাম, বেশ তাহাই হইবে, 'শনিবারের চিঠি' অন্যত্র ছাপিব।

বলিলাম তো, কিন্তু যাই কোথায়? সহায়সম্বলহীন 'শনিবারের চিঠি' কি বন্ধ হইয়া যাইবে? অশোক চট্টোপাধ্যায় সুদূর ইউরোপে। সাহায্য করিতে পারেন এমন আর কেহই নাই। রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়া তাঁহার মত পরিবর্তন করাইব তাহার উপায় নাই, তিনি তখন অপূর্বকুমার চন্দের তদারকাধীন—দূর সাইগনে। আমার জেদ চাপিয়া গেল। ছুটাছুটি করিয়া শেষ পর্যন্ত সুকিয়া স্ট্রীটে অবস্থিত কান্তিক প্রেসের আশ্বাস মিলিল। কথা-সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় পূর্বে ইহার মালিক ছিলেন এবং এইখানেই 'ভারতী'র বিখ্যাত আড্ডা বসিত। মণিলাল মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই কান্তিক প্রেস বিক্রয় করিয়া দেন। পরিচালক হন বিখ্যাত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পৌত্র মহেন্দ্রনাথ বসু। তিনি যাহাকে বলে "মাই-ডিয়ার" লোক তাহাই ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তিনি 'শনিবারের চিঠি' মুদ্রণের যাবতীয় ঝক্কি মাথা পাতিয়া লইলেন। আমি বাঁচিয়া গেলাম। শ্রাবণ সংখ্যা কান্তিক প্রেসে ছাপা হইতে লাগিল।

আমি যে তখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খুবই বিচলিত ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম তাহার চিহ্ন শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'তেই প্রকাশিত "হেঁয়ালি" কবিতায় আছে। এমন বর্বর কবিতা আমিও খুব বেশী লিখি নাই :

স্বপ্নভাঙা নির্ঝর তোমার এই কি ছিল ললাটে?
মনের লেখা পড়লে না কো দেখলে শুধু মলাটে!
দেখলে তবক চকমকানি,
পোষা টিয়ার বকবকানি
শুনলে শুধু, সন্ধ্যা-ছায়ায় চক্ষু তোমার ঘোলাটে।
খাই নি ব'লে তুমিও খাও ঠাকুরঘরের কলাটে।

*   *   *

পরের মুখে ঝাল খেয়েছ, পরের কথা শুনিয়া,
স্তাবক-তুষ্ট হে মহারাজ, হঠাৎ হ'লে খুনিয়া!
লেলিয়ে পুলিস পালিয়ে গেলে
কেউটে কভু হয় না হেলে!
ভাবের বিশ্ব উঠল ভ'রে, নিঃস্ব মাটির দুনিয়া,
ধনুক-ছিলা ছিঁড়ল হঠাৎ স্বপন-তুলা ধুনিয়া।

*   *   *

শ্মশান-শিবে ধরল ছেঁকে পোষা শেয়াল-কুকুরে,
শিব দেখিছে আপন ছায়া তাদের চোখের মুকুরে !
তারাই শুধু বুঝল হা রে
তাঁর প্রতিভা-তপস্যারে !
কুকুর নিয়েই মত্ত মহেশ প্রভাত-সন্ধ্যা-দুকুরে,
সাগর-সেঁচা সূর্য—সে কি অস্ত যাবে পুকুরে ?

এই ভীষণ আঘাত রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিল। অরসিক রায় বেনামীতে 'নটরাজে'র সমালোচনার গ্লানি মনে সঞ্চিতই ছিল, এই কবিতার দরুন তাহা দ্বিগুণিত হইল। সে সংবাদও যথাসময়ে পাইলাম। সুনীতিকুমার ছিলেন মধ্যবর্তী সেতু। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অসীম, আমাদিগকেও তিনি কম ভালবাসেন না। আমাদের পক্ষে তিনি গেলেন ওকালতি করিতে। ফল তো ভাল হইলই না, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিও অপ্রসন্ন হইলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সুনীতিকুমারকে যে পত্রাঘাত করিলেন তাহা যেমন মর্মান্তিক, আমাদের পক্ষে তেমনই লজ্জাকর। রবীন্দ্রনাথের মনের গ্লানি পরবর্তী কালে নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল বলিয়া পত্রখানি প্রাচীন ঐতিহাসিক ডকুমেণ্ট-হিসাবে প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ক্ষমা না করিলে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। বাংলা দেশের লোকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ এই পত্রে এই ভাবে ভাষায় রূপ পাইয়াছে, অবশ্য আমি প্রধান উপলক্ষ্য :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মনে করেছিলুম তোমার খাতা থেকে আমার ছবিটাকে নির্বাসিত করব। তুমি রক্ষা করতে অনুরোধ করচ, রইল ওটা।

সেদিন তোমার সঙ্গে যে কথার আলোচনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা এইখানে বলে রাখি। তুমি বলেছিলে শনিবারের চিঠিতে যাঁরা আমার অবমাননা করেচেন তাঁরা আমার ভক্ত, কেবল বিশেষ কোনো ব্যক্তিগত কারণেই তাঁরা আমাকে আক্রমণ করে ক্ষোভ নিবৃত্তি করেচেন। কিছুকাল থেকেই এটা দেখেচি ব্যক্তিগত কারণ ঘটবার বহুকাল পূর্ব হতেই তাঁরা আমার নিন্দায় আনন্দ ভোগ করে

এসেচেন। এটা দেখেচি যাঁরা কোনো দিন আমার লেখার কোনো গুণ ব্যাখ্যা করবার জন্যে একছত্রও লেখেন নি তাঁরাই নিন্দা করবার বেলাতেই অজস্র ভাবে বহু পল্লবিত করে লিখেচেন। সকল লেখকের রচনাতেই ভালমন্দ দুইই থাকে কিন্তু ভালোটার সম্বন্ধে নীরব থেকে মন্দটাকেই দীর্ঘস্বরে ঘোষণা করার উৎসাহ শ্রদ্ধার লক্ষণ নয়। মোটের উপর যাকে আমরা নিন্দার্হ বলে জানি তার সম্বন্ধেই এরকম আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু তবু এরকম ব্যবহারকে নিন্দা করা যায় না। কেন না সকলেই আমার রচনা বা চরিত্রকে প্রশংসনীয় বলে মনে করবে এরকম প্রত্যাশা করাও লজ্জার কথা। বাংলা দেশে আমার সম্বন্ধে এমন প্রত্যাশা করার হেতুই ঘটে নি। এঁরাই কথায় কথায় খোঁটা দিয়ে থাকেন যে স্তাবকবৃন্দ আমাকে বেষ্টন করে সর্বদা যে স্তব-কোলাহল করে থাকেন তার দ্বারাই নিজের ত্রুটিবিচারে আমি অক্ষম। এঁরা নিজে আমাকে পরিবেষ্টন করে থাকেন না, যাঁরা থাকেন তাঁরা কী করেন সে সম্বন্ধে এঁদের অনভিজ্ঞ কল্পনা আমার প্রতি প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় দেয়। কিছুকাল ধরে তুমি নিরন্তর আমার কাছে ছিলে, নিজের স্তব শোনবার আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাস তোমার দ্বারা পরিতৃপ্ত করবার কোনো চেষ্টা করেচি কিনা তার সাক্ষ্য তুমিই দিতে পারো। আমার যতদূর মনে পড়ে যেখানে তোমার কোনো গুণ দেখেচি সেখানে তোমার গোচরে ও অগোচরে তোমার স্তব আমিই করেচি। আমার বক্তব্য এই যে অসঙ্কোচে যাঁরা আমার নিন্দা করতে আনন্দ পান তাঁদের সংখ্যা অনেক এবং আমি তাঁদের দোষ দেব না, কিন্তু তাঁরা আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান একথা বলা চলবে না।

সময় এসেচে যখন এসব ব্যাপারকে শান্তভাবে আমাকে গ্রহণ করতে হবে। দেশের লোকের কাছ থেকে আমি যা পাই তা আমার প্রাপ্য নয় এবং যা না পাই তাই আমার প্রাপ্য এই বলে হিসেব-নিকেশের নালিশ তুলে কিছু লাভও হয় না। মানরক্ষাও হয় না। কিন্তু অনাত্মভাবে সত্যটাকে জেনে রাখা দরকার। চিত্তরঞ্জন কিংবা মহাত্মাজিকে দেশের লোকে কদাচিৎ প্রতিবাদ করেচে, এমন কি নিন্দাও করেচে কিন্তু অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েও গর্হিত ভাষায় কুৎসিত ভাবে তাঁদের প্রতি অসম্মান করেন নি, করতে পারলে আনন্দ পেতেন না তাও নয় কিন্তু সাহস করেন নি—কারণ তাঁরা জানেন দেশের লোক তা সহ্য করবে না।

আমার সম্বন্ধে সে রকম সঙ্কোচের লেশমাত্র কারণ নেই—অনেকেই আমার নিন্দায় প্রীত হন এবং বাকি অধিকাংশই সম্পূর্ণ উদাসীন। আমার প্রকাশ্য অপমানে দেশের লোকের চিত্তে বেদনা লাগে না, সুতরাং আমার প্রতি যাঁরা কুৎসা প্রয়োগ করেন তাঁদের ক্ষতি বিপদ বা তিরস্কারের আশঙ্কা নেই। এক হিসাবে তাঁরা সমস্ত দেশের প্রতিনিধি-স্বরূপেই এ কাজ করে থাকেন। সুতরাং তাঁরা উপলক্ষ্য মাত্র। যাঁরা আমার অন্ধ স্তাবক বলে কল্পিত, যাঁরা আমার সুহৃদ বলে গণ্য তাঁরা আমার এই অবমাননার কোনো প্রকাশ্য প্রতিকার করে থাকেন তারও কোনো প্রমাণ নেই। বুঝতে পারি প্রকাশ্যে অপমান করতে অপর পক্ষের যত সাহস ও নৈপুণ্য এ পক্ষের তা নেই, তার প্রধান কারণ তাঁরা মনে মনে জানেন দেশের লোকের সহযোগিতার বল তাঁদের দিকে নয়। দেশের লোকের কাছে যে কোনো কারণে যাঁরা শ্রদ্ধাভাজন তাঁদের ভাগ্যে এরকম গ্লানি কোনো দেশে কখনোই ঘটে না—রাস্তার চৌমাথার মধ্যে এমন নির্যাতন নিঃসহায়ভাবে তাঁদের কখনোই ভোগ করতে হয় না। তাই বলচি এই ব্যাপারের মূল সত্যটাকে আমার চেনে নেওয়া এবং মেনে নেওয়া দরকার—আর তার পরে চিত্তকে অবিচলিত রাখা আরো দরকার। সত্তরের কাছে এসে পৌঁছেচি—আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেচে, এখন মনের সমস্ত শক্তি নিয়ে এই কামনা করচি যে এই হতভাগ্য আমি নামক বাহিরের পদার্থটার সমস্ত বোঝা এবং লাঞ্ছনা থেকে ভিতরের আমি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যেন ইহলোক থেকে বিদায় নিতে পারে।

এই উপলক্ষ্যে সংক্ষেপে আর একটা কথা বলে রাখি। প্রকাশ করাই আমার স্বধর্ম—প্রকাশের প্রেরণাকে অবরুদ্ধ করা আমার পক্ষে ধর্মবিরুদ্ধ। আমার প্রকৃতিতে এই প্রকাশের নানা ধারার উৎস আছে—তাদের যেটাকেই আমি অগ্রাহ্য করব সেটাতেই আমার খর্বতা ঘটবে। প্রকাশ আর ভোগ এক জিনিস নয়—প্রকাশের অভিমুখিতা বাইরের দিকে, বস্তুত সেটাতেই অন্তঃপ্রকৃতির মুক্তি, ভোগের অভিমুখিতা ভিতরের দিকে, সেইটেতে তার অবরোধ। আমার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে তোমার মনে আপত্তি উঠেচে। কিন্তু নাটক রচনার মধ্যে যে প্রকাশ-চেষ্টা, অভিনয়ের মধ্যেও তাই। রচনার মধ্যেই যদি কলুষ থাকে সেটা নিন্দনীয়, অভিনয়ের মধ্যে যদি থাকে সেও নিন্দনীয়—কিন্তু অভিনয় ব্যাপারের মধ্যেই আত্মলাঘবতা আছে এ কথা আমি মানি নে। আমার

মধ্যে সৃষ্টিমুখী যতগুলো উদ্যম আছে তার প্রত্যেকটাকেই স্বীকার করতে আমি বাধ্য। তোমাদের অভ্যাস ও সংস্কারের বাধায় তোমরা যে দোষ কল্পনা করচ তার দ্বারা আমার চেষ্টাকে প্রতিরুদ্ধ করলে নিজের প্রতি গুরুতর অন্যায় করা হবে। ইতি ১১ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল [২৬ ডিসেম্বর, ১৯২৯]

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"চিত্তকে অবিচলিত রাখা আরো দরকার" ভাবিয়াও রবীন্দ্রনাথ এতখানি বিচলিত হইয়াছিলেন যে, এই একান্ত ব্যক্তিগত পত্রের একটা নকল আমার নিকটেও পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য সুনীতিকুমারকে সম্বোধন করিয়া লেখা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত পূর্বপত্রের (পৃ. ১৯২) মত এ পত্রেরও উপলক্ষ্য আমরাই। এ-পক্ষের ন্যায় ও-পক্ষেরও যে অনেক অভিযোগ কল্পিত, তাহার প্রমাণ দাখিল করা কঠিন ছিল না; কিন্তু দাখিল করিবার পাত্র তখন ভাঙিয়া গিয়াছে, উপরে প্রবাহিত 'শনিবারের চিঠি'র ধারা তখন আকস্মিক বিপর্যয়ে পড়িয়া মরু-বালুতলে ফল্গুধারায় পর্যবসিত, কার্তিক পর্যন্ত বাহির হইয়া 'শনিবারের চিঠি'র প্রকাশ অবরুদ্ধ।

আমাদের কারণে সুনীতিকুমার মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন ইহাতে আমরা খুবই লজ্জিত হইয়াছিলাম; কিন্তু তিনি নৃত্যগীত সম্পর্কে নিজের মত পরিবর্তন করেন নাই। ফলে কবির সহিত তাঁহার সম্পর্কে অন্তরের গভীরে ছেদ পড়িয়াছিল। বিধাতার পরিহাস এই যে, দীর্ঘকাল পরে কবির একান্ত অনুরোধে আমিই তাঁহাকে সপরিবারে শান্তিনিকেতন লইয়া গিয়া পুনর্মিলন ঘটাইয়াছিলাম। আমার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি তখন অনেকেরই বিক্ষুব্ধ আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।

প্রেস পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়া কান্তিক প্রেসে আশ্রয় পাওয়ার কথা বলিয়াছি। আপিসের ঠিকানাও পরিবর্তন করিতে হইল। ৫৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে প্রথমে ঘর ভাড়া লওয়া হয়, কিন্তু স্থান পরিবর্তন করিবার পূর্বেই ঠিকানা পুনরায় পরিবর্তিত হইয়া ২০৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট—শ্রীমানী বাজারের দ্বিতলে রুম নং ১৬/১ স্থির হয়। ১লা আগস্ট (১৯২৯) সেখানেই আপিস উঠিয়া যায়।

এই পরিবর্তনই 'শনিবারের চিঠি'র কাল হইল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রবাসী প্রেসের তাল সামলাইয়া কান্তিক প্রেস এবং নূতন আপিস-বাড়িতে ছুটাছুটি করিয়া কাজ আদায় করিতে এবং আপিসের হিসাবপত্রাদি রাখিতে গলদঘর্ম হইতে লাগিলাম। শেষ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়-হিসাব-রক্ষণের ভার

সম্পূর্ণ ক্ষুদ্রদার ছোটমামা শ্রীগৌরীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ছাড়িয়া দিয়া আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ছাপাখানায় অর্থাৎ কাত্তিক প্রেসে হাজিরা দিতে আরম্ভ করিলাম।

কাত্তিক প্রেস মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তচ্যুত হইলেও 'ভারতী'র ভাঙা আড্ডা তখনও সেখানে বসিতেছে। "ক্ষুধিত পাষাণে"র পাগলা মেহের আলীর মত দুই-একজন মৌতাতী তখনও সন্ধ্যার পর সেখানে নিয়মিত পাক দিয়া যাইতেন। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ছিলেন ইঁহাদের একজন। আড্ডা ঘনিষ্ঠ হইলে তাহা জমাইবার অসাধারণ স্বাভাবিক দক্ষতা তাঁহার ছিল। একটু পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত-ভাষায়-অভ্যস্ত মানুষদের তাঁহার গল্পে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইবার উপায় ছিল না। তিনি তখনও সিনেমা-রাজ্যে পাকাপাকি রকম প্রবেশ করেন নাই, তাঁহাকে নিয়মিত পাওয়া দুর্ঘট ছিল না। আমরা দুইদিনেই তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিলাম। সেই 'ভারতী'র পুরাতন ভাঙা আসরেই 'শনিবারের চিঠি'র নূতন আড্ডা জমিয়া উঠিল। প্রথমে আসিলেন সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং হরিপদ রায়। কাগজ বাহির করিবার সময় হইলে তিন-চার রাত্রি এক নাগাড়ে হৈ-হৈ করিয়া জাগিতে হইত। তখন আমি একা লেখক বা গায়ক—বাকি সকলে দোহারকি করিয়া আমাকে সঞ্জীবিত রাখিতেন। আমি অনর্গল "কাপি" লিখিয়া যাইতাম, অন্যেরা আড্ডা জমাইয়া আসর সরগরম রাখিতেন, ঘন ঘন চা আসিত, বুদ্ধির গোড়ায় সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইতাম, সকলের সমবেত হল্লার মধ্যে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি মায়ামন্ত্রে দূর হইত, আমার একার পক্ষে যাহা একান্ত অসম্ভব ছিল তাহাই সম্ভব হইত।

কিন্তু এই ভাবে বেশীদিন চালানো যায় না। এই আড্ডায় আমার সমধর্মী সহায়কের একান্ত অভাব ছিল। সর্ববিষয়ে সহায়ক ও উৎসাহদাতা ডাহিনে-বামে-লেখনী-চালক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের অভাব অত্যন্ত বেশী করিয়া অনুভব করিতেছিলাম। যোগানন্দ দাসও নিরুদ্দেশ, হেমন্ত আসেন বটে কিন্তু নিরর্থক লেখায় তখন তাঁহার মতি নাই। মোহিতলাল ঢাকা হইতে পাল্লার এক দিক অর্থাৎ গুরুগম্ভীর দিকটা সামলাইতেন, বাকিটা আমাকেই সামলাইতে হইত। এইরূপ কিছুদিন ধরিয়াই চলিতেছিল। কাত্তিক প্রেস হইতে শ্রাবণ সংখ্যা বাহির করিয়াই পলাতক যোগানন্দ দাসের সন্ধানে বাহির হইলাম। এক মাসের জন্য অর্থাৎ ভাদ্র সংখ্যায় তাঁহাকে পাওয়াও গেল, কিন্তু তাহার পর তিনি আবার উধাও। সুশীলকুমার দে ঢাকা হইতে এই সময় নানা ধরনের লেখা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

'শনিবারের চিঠি'র এই ক্রমাবনতির যুগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ভাদ্র সংখ্যায় "নরকের কীট" প্রকাশ। লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু এই একটি গল্পের আঘাতে বাংলা-সাহিত্য-সরোবর তোলপাড় হইয়াছিল। শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় যদি আর কোন গল্পও না লিখিতেন—শুধু এই একটির জোরে অমর হইয়া থাকিতেন। দুঃখের বিষয় গল্পটি অধুনা-দুষ্প্রাপ্য 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার 'যোগভ্রষ্ট' ও 'দশচক্র' রঞ্জন প্রকাশালয় হইতে বাহির করিয়া তাঁহার "শিরাজীর পেয়ালা," "নরকের কীট" প্রভৃতি বিখ্যাত গল্প ও "একাল" নাটকটি পুস্তকাকারে ছাপিবার আয়োজন করিতেছিলাম; কিন্তু বনবিহারীবাবু আমাকে অগ্রসর হইতে দেন নাই। তিনি সর্ব বিষয়েই বিলুপ্তির প্রয়াসী, স্মৃতির জের টানা তাঁহার স্বভাব নহে।

"নরকের কীট" সে যুগের তরুণদের বিস্মিত বিমুগ্ধ করিয়াছিল। গল্পটির জনপ্রিয় হওয়ার বাধা ছিল—প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত ইংরেজী বুকনিগুলি; অনেকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। 'বেপরোয়া' মতবাদের জন্য প্রাচীনপন্থীরাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও "নরকের কীট" বাংলা সাহিত্যে "আগে বাড়া"র একটি মাইল-স্টোন; অবিশ্রাম ঘাত-প্রতিঘাতে তরুণ এবং তরুণ-বিরোধী উভয় দলই যখন ঘায়েল হইয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, "নরকের কীট" তখন একটা নাড়া দিয়াছিল। ইহার আরম্ভটুকু মাত্র উদ্ধৃত করিয়া বনবিহারী-বর্ণিত নরকের পরিচয় দিতেছি:

> নরক?—নরকেই ত আছি হে। Been there since 1876. একটা idea দিই। উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর,—হাঁ হাঁ তাই! I mean your—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং—অর্থাৎ কিনা যে দেশে আখ-খেজুরের চাষ হয়, এবং জাভা থেকে চিনি আমদানি করতে হয়, যে দেশে জলকষ্ট একটা দৈনন্দিন ব্যাপার; এবং যেখানকার মহামান্য চিকিৎসকগণ propaganda work করছেন খোলা বাতাসের বিরুদ্ধে।—নাঃ, তোমাদের দোষ কি? দোষ সব অশ্লেষা মঘার।—১২৯৯ সাল থেকে দাসত্ব করে আসছে,—অথচ জাতকে জাত সমুদ্রে ডুবে ম'ল না। আজও বাঁচতে চায়, অমর হতে চায়।—আজও বংশবৃদ্ধি করছে, আর রেখে যাচ্ছে কতকগুলো হ্যাংলা ক্যাংলা ছেলের পাল, যাদের পেট ভরবে শুধু পীলে আর লিভারে! A colony of maggots in a dungheap!
>
> ধানের ক্ষেতে লাঙল পড়ে না। তা হোক, ছেলের ক্ষেত পতিত থাকবার জো নেই, Consent Bill-এর নামে হাহাকার একেবারে!

আমার মানসিক নিঃসঙ্গতা ও অবসাদের পরিচয় এই সময়কার দুইটি কবিতায় আছে, ভাদ্রের "গড়ের মাঠে শুয়ে"—এবং আশ্বিনের "যুগান্তরে"। বুদ্ধিমান পাঠক এই দুইটি হইতে আমার তদানীন্তন হালচালও আঁচ করিতে পারিবেন :

চিত হয়ে শুয়ে আছি আকাশের কাছাকাছি,
ট্রাম বাস ফিটন কি চলছে?
যত মিটমিটে তারা জুড়িয়াছে হা-রা-রা-রা,
মনে হয় মনুমেণ্ট টলছে!
লজ্জায় হয়ে লাল চাঁদিমা আধেক গাল
ঢেকেছে টানিযা বুঝি ঘোমটা,
ছায়াপথ? না না, ও যে রোদ-লেগে বেশী "ডোজ"-এ
ফেটে গেছে আকাশের "ডোম"টা।
ফিরপোর দোতলায় লাল চোখে যারা খায়
ভাবে তারা কি রঙিন দুনিয়া,
শোনে না আকাশে গান ধ্বনিতেছে অবিরাম
খুশী রহে টুং-টাং শুনিয়া।
নরনারী পাশে ব'সে ভাবে ছুটিতেছে ক'ষে
সুখে ছোটে মদে আর ডিনারে।
লাল নীল দেখে আলো, ভাবে, ঘুচিতেছে কালো
জমিছে আঁধার নভ-মিনারে।
ধরায় এলায়ে দেহ লভি মাটি-মার স্নেহ
মানুষের প্রতি হয় করুণা,
ছুটিছে জীবনটাই মোটর অচল ভাই,
পাকে চুল, ধরা রয় তরুণা।··

এবং

আকাশ জুড়িয়া বাজিছে কাঁসর
থম্ থম্ করে বসুন্ধরা,
একা শঙ্কর জাগিছে বাসর,
মহাকালী হবে স্বয়ম্বরা!···

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের তৃতীয় এবং তীব্রতম ধাক্কায় সারা দেশ ঠিক এই সময়েই আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেশের জন্য কোনও কাজ যাহারা করিতেছে না তাহাদের কাহারও মনে স্বস্তি নাই। বিলাতী মদ

ছাড়িয়া খেনো, সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি এবং দুইদিন পরে নকল চীনা সিগারেট "চিমাই" টানিয়াও কাহারও বিবেক সুস্থ নহে। দলে দলে কর্মীরা জেলে যাইতেছেন, সরকারী অত্যাচারের বিবরণও "সেন্সরে"র দাপটে শুনিবার উপায় নাই। কানাঘুষায় তিল তাল হইতেছে। এই মহা মন্বন্তরের মুখে 'শনিবারের চিঠি' থাকিল বা গেল সে সম্বন্ধে আমার আর কোন চিন্তাই রহিল না। মানসিক অশান্তি ও অবসাদ বিবিধ বিকৃতির মধ্যে পরিতৃপ্তি খুঁজিল। সদ্যোজাত শিশু ও সংসারকে বাঁচাইতে হইবে—এই বোধটুকু মাত্র ছিল বলিয়া প্রবাসী প্রেসের ম্যানেজারি ছাড়ি নাই, কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'কে মাঝ-দরিয়ায় ডুবাইয়া দিলাম। বহু বিলম্বে আশ্বিন সংখ্যা বাহির হইল, ততোধিক বিলম্বে কার্তিক বাহির হইল, এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যা অর্ধেক ছাপা হইয়া ছাপাখানাতেই পড়িয়া রহিল। 'শনিবারের চিঠি' মরিয়া গেল। তখন রঞ্জন প্রকাশালয়ের সদ্য-প্রকাশিত তিনখানি বই 'অজয়,' 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' ও 'পথের পাঁচালী' হইতে বেশ কিছু আয় হইতেছে; সুতরাং শ্রীমানী বাজারের আপিস ও দোকানঘর রাখিয়া দিলাম। এই সময়ে শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'যোগভ্রষ্ট'ও রঞ্জন প্রকাশালয় হইতে বাহির হইল।

মরিতে মরিতেও শেষ সংখ্যায় (নামে কার্তিক, বাহির হইল ফাল্গুনে) রবীন্দ্রনাথকে খোঁচা দিলাম সুদীর্ঘ "ভ্রান্তি" কবিতায়—সুনীতিকুমারের নিকট লিখিত পত্রের জবাবেই সম্ভবত:

জ্বলিতেছে তবু ধাতব সূর্য দুঃখ এই!
মিথ্যা এ কথা—তাঁর প্রতি দেশে শ্রদ্ধা নেই।
আপন করিতে জানে যেই জনা
তারি পায়ে সবে বিকায় আপনা;
"হব না আপন" যাঁহার সাধনা, শুধু তাঁরেই
আপন করিতে পারে নাই কেহ—সত্য এই!…

এই দুর্দিনেই প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ছাড়াও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তদানীন্তন কর্মসচিব সাহিত্যবন্ধু রামকমল সিংহের মারফত পরবর্তী জীবনে অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণের সহিত পরিচয় ঘটে।

নবম তরঙ্গ

রক্ষাকবচ

'শনিবারের চিঠি'কে টুঁটি টিপিয়া দম বন্ধ করিয়া রাখিয়া একটা নিদারুণ শূন্যতার মধ্যে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করিলাম।

শূন্যতা তখন চারিদিকেই। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ব্যাপকতা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পায়ের তলার মাটি নড়াইয়া দিয়াছে। ২৬শে জানুয়ারির স্বাধীনতার শপথ লওয়া হইয়া গিয়াছে, ইহা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ। পূরা আড়াই শত বৎসরের পোর্তুগিস, ফরাসী ও ইংরেজ সংস্পর্শের ফলে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে ইমারৎ বাংলা দেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগে ও চেষ্টায় তাহাতে যে চিড় খাইয়াছিল, এইবারে তাহা ফাটলরূপে দেখা দিল। এই রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের ভূমিকম্প বাংলা সাহিত্যে বিজাতীয় ধারাকেও বিপর্যস্ত ও শুব্ধ করিয়া দিল, সাহিত্যে আত্মনিবেদনের পরে সেই সর্বপ্রথম আমার মনে হইল, আমাদের প্রয়োজন ফুরাইল।

বোকা মানুষ স্বপ্ন দেখে। আমিও স্বপ্ন দেখিতাম—সেই ছেলেবেলায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'বেহুলা'য় পড়া নেতা-ধোপানীর মৃত শিশুর পুনর্জীবনের স্বপ্ন। দুষ্ট বালক কাপড় কাচিবার সময় নেতাকে বিরক্ত করাতে সে গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া কাপড় কাচিবার পাটার পাশে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। বিস্মিত বেহুলা দেখিয়াছিল, সন্ধ্যায় নেতা তাহার গায়ে জলের ছিটা দিতেই "বালক নিদ্রোত্থিতের ন্যায় মুখে একরাশি হাসি লইয়া উঠিল।" আমিও যদি নেতা-ধোপানীর মত কলমের কালির ছিটায় 'শনিবারের চিঠি'কে বাঁচাইতে পারিতাম!

১২০।২ আপার সারকুলার রোডে সদ্য স্থানান্তরিত ছাপাখানার ম্যানেজারের ঘরে বসিয়া বাংলা সাহিত্যের শতাব্দীকালের ইতিহাস মনে মনে পর্যালোচনা করিতাম। একতলায় প্রায়ান্ধকার একটি স্নানের ঘর, মোজেইক-করা মেঝেতে ফাট ধরিয়াছিল। একটা ওয়াশ-বেসিনও ঘরের এক কোণে তখনও সংলগ্ন ছিল। ভাবিতে ভাবিতে মগজে রক্ত চড়িলে মাথা-মুখ ধুইয়া ফেলিতাম। ফাট-ধরা মেঝেতে নতমুখে পায়চারি করিতে করিতে দাগে দাগে একটা কল্পিত মানচিত্রও রচনা করিয়াছিলাম—বাংলা সাহিত্যে সাময়িক পত্রের স্থানের মানচিত্র। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকরে' যে ইতিহাসের আরম্ভ, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'শনিবারের চিঠি'তেই কি তাহার শেষ? মন চলিয়া যাইত সুদূরে,

অতীতে,—কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক ; অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া আছেন ; ভিড় করিয়া আসিয়াছেন সে যুগের কৃতী তরুণেরা—বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ অধিকারী। প্রাচীন কবিদের কীর্তি-কথা সংগ্রহ ও রক্ষণের আয়োজন করিয়া গুপ্তকবি শুধু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেরই গোড়াপত্তন করিতেছেন না—সেই সর্বপ্রথম সাহিত্যিকের পরিচালিত সাময়িক পত্রে নবযুগের বাংলা সাহিত্যেরও পত্তন হইতেছে। এই গোষ্ঠীতে নূতনের—পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির—প্রবেশাধিকার নাই ; পুরাতনই নব কলেবরে রূপায়িত হইতেছে। গদ্য নয়—বাংলা কবিতার পুনর্জন্ম হইতেছে।

কালের প্রবাহে ভাসিয়া চলিতে চলিতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় আসিয়া ঠেকিলাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক—অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদক ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আছেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আছেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু আছেন। এখানেও আদর্শ পুরাতন, কিন্তু তবু বাংলা গদ্যের নবজন্মলাভ হইতেছে। অক্ষয়কুমার শনৈঃ শনৈঃ পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের আমদানি করিতেছেন।

তাহার পর মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'। রাজেন্দ্রলাল একাই একশো, সহায়কের প্রয়োজন তাঁহার নাই। তিনি বিষয়কে বিজ্ঞানের উপর এবং ভাষাকে ব্যাকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন, চাহিলেন বাংলা সাহিত্যে শাস্ত্রসম্মত সমালোচনার প্রবর্তন করিতে। এখানেও আদর্শ ভারতীয়। নৃতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাণীবিজ্ঞান বিদেশ হইতে আসুক, সাহিত্যের ভিত্তিভূমি কিন্তু স্বদেশের মৃত্তিকা।

কিন্তু কোথায় কথাসাহিত্য, কোথায় গল্প-উপন্যাস ? চলিতে চলিতে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারের 'মাসিক পত্রিকা'র সাক্ষাৎ মিলিল ; টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' হাঁকিয়া বলিল, "এই তো আমি আসিয়াছি। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত আমি সেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই 'বাবুর উপাখ্যান' যদিও, তাঁহার 'নববাবুবিলাস' যদিও আমার সাক্ষাৎ অগ্রজ, তবুও আমার ঠক চাচাকে দেখ।" গল্প আছে কিন্তু সাহিত্যরস নাই, তাই বাঙালী এই হাঁকে ভুলিল না। ভূদেব এবং কৃষ্ণকমল সাময়িক-পত্রনিরপেক্ষ ব্যক্তিগতভাবে 'রোমান্স অব হিস্টরি'র অনুসরণে গল্প রচনা করিলেন, কিন্তু তাহা দেশের মর্মে পৌঁছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রও স্যর্ ওয়াল্টার স্কটকে পুরোভাগে রাখিয়া ব্যক্তিগত প্রয়াস করিলেন 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' এবং 'মৃণালিনী'তে। চমক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল বটে,

কিন্তু পরিবেশনের পাত্র সাময়িক পত্র ছিল না বলিয়া তেমন প্রসার হইল না।

কাজেই আবির্ভাব হইল 'বঙ্গদর্শনে'র—বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র এবং 'বঙ্গদর্শনে'র বঙ্কিমের। 'বিষবৃক্ষ' 'ইন্দিরা' 'চন্দ্রশেখর' 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—'বঙ্গদর্শনে'র দর্পণে বাঙালী নিজের মুখ দেখিয়া পুলকিত হইল। বঙ্কিম বিদেশের সোনাকে হজম করিয়া স্বদেশের শস্যক্ষেত্রে সোনা ফলাইলেন। আসিল ইউরোপের মনীষীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন দর্শন, মায় মার্ক্সবাদ পর্যন্ত—কিন্তু ভারতীয় মূর্তি লইয়া।

তাহার পর 'ভারতী'তে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সাধনা সমগ্র বঙ্গদেশের 'সাধনা'য় রূপান্তরিত হইল পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যভারে। রবির কিরণদীপ্ত সেই আমাদের তরুণ মধ্যদিন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় 'বঙ্গদর্শনে' "বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ" করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় সমুজ্জ্বল মধ্যাহ্নের বিকাশ করিলেন। 'জ্ঞানাঙ্কুরে' তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা', 'ভ্রমরে' সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠমালা' এবং 'বান্ধবে' রমেশচন্দ্র দত্তের 'জীবন-প্রভাত' বাংলা-কথাসাহিত্যে সাময়িক পত্রেরই কৃতিত্বের ইতিহাস; সেই ইতিহাস পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী' সাপ্তাহিকের প্রথম সাতটি সংখ্যায় সাতটি ছোটগল্প লিখিয়া। প্রমাণ করিলেন এডগার অ্যালেন পো, গী দ্য মোপাসাঁ বাংলা দেশের মাটিতেও অসম্ভব নয়—পরিপূর্ণ মাটির রসে সঞ্জীবিত ফুল—টবে আর্জানো মরশুমী ফুল নয়।

সদরে সাময়িক পত্রের এই প্রবহমান ধারা ধরিয়া বাংলা সাহিত্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। খিড়কির দরজাতেও আর একটি ধারা ছিল, যাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। আমরা কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি পরিচালিত 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' 'জন্মভূমি'র এই ধারাকে গোঁড়া, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি আখ্যা দিয়া উপেক্ষাই করিয়াছি; রেনল্ডসের আদর্শে অনুপ্রাণিত কথাসাহিত্যকে একটুও আমল দিই নাই। কিন্তু হৃদয়গ্রাহী গল্প বলিয়া ইঁহারা যে বাংলা দেশের পনেরো-আনাকে দীর্ঘদিন মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন সে কথাও আজ অস্বীকার করিতে পারি না।

সংস্কার ও গোঁড়ামি এই দুই ধারায় পা দিয়া 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকার মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। বিদেশী গল্পের গুচ্ছে তিনি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন ভরাইয়া দিলেন—ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, রুশ, জাপানী গল্পের বিচিত্র নমুনা-আস্বাদে গল্পপিপাসু বাঙালী পাঠক-সমাজ

মাতিয়া উঠিলেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে রেনল্ডস গেলেন—আসিলেন রাইডার হ্যাগার্ড, মারি করেলি, মিসেস হেনরি উড।

বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিয়া বাংলা সাহিত্যের বিপুল প্রসারে চমকিত হইলাম। 'ভারতী' ও 'সাহিত্যে'র সঙ্গে আসিয়া কাঁধ মিলাইলেন 'প্রবাসী' ও 'বঙ্গদর্শন' নবপর্যায়। চতুরঙ্গ-চালিত বঙ্গসাহিত্যের অভিযান দ্রুত চলিতে লাগিল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আসিয়া জুটিলেন; চারুচন্দ্র, সৌরীন্দ্রমোহন, মণিলাল, প্রেমাঙ্কুর, হেমেন্দ্রকুমার দেশী-বিদেশী গল্পে 'ভারতী'র আসর ভরিয়া তুলিলেন। বাংলা সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের মোহনায় আসিয়া দাঁড়াইল। 'ভারতবর্ষ' 'সবুজ পত্রে'র পিঠ পিঠ প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধও আসিয়া পড়িল; বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন শরৎচন্দ্রের এবং নূতনরূপে পুরাতন প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটিল।

বিশ্বমহাযুদ্ধের আলোড়ন শেষ হইলে দেখা গেল, ইউরোপীয় সাহিত্যের উদগ্র বস্তুবাদ উগ্র মূর্তি লইয়াই বাংলার অঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' "স্ত্রীর পত্র" লিখিতেছেন, প্রমথ চৌধুরী লিখিতেছেন 'চার-ইয়ারী কথা', অজিতকুমার চক্রবর্তী আমাদের কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের পাঠ দিতেছেন। ঠিক এই অবস্থায় বঙ্গভারতীর পূজামণ্ডপে অ্যাপ্রেন্টিসরূপে প্রবেশ-বাসনায় আমিও কন্টিনেণ্ট সাহিত্যে পাঠ লইতেছি। ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, স্ট্রিণ্ডবার্গ, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, ডস্টয়ভস্কি, লিনানস্কি, বোয়ার, ক্নুট হামসুন—বঙ্গবাণীর নিরামিষ অঙ্গনে তাজা রক্তের ছাপ পড়িতেছে। সে কি উত্তেজনা, কি উন্মাদনা! সেই ঢেউই চলিল 'কল্লোল' 'কালি-কলম' 'প্রগতি' 'উত্তরা' পর্যন্ত; শিং ভাঙিয়া নরেশচন্দ্র আসামী এবং উকিল দুইরূপে এবং রাধাকমল শুধু উকিলরূপে তরুণদের দলে ভিড়িয়া গেলেন। দেখিলাম, 'নারায়ণ' একদিকে উলঙ্গ যৌননৃত্য করিতেছেন এবং অন্যদিকে মেটারলিঙ্কের ভূত ঝাড়িয়া রবীন্দ্রনাথকে কাহিল করিতে চাহিতেছেন, 'মানসী'র সহিত 'মর্মবাণী' যুক্ত হইয়া রক্ষণশীল দলের মুখপত্র হইয়াছেন, 'বঙ্গবাণী'তে স্কুল-পালানো শরৎচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁধে চাপিয়াছেন।

মোজেইকের শেষ ফাটলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ১৯২৯-৩০-এর সন্ধিক্ষণে পৌঁছিলাম—'ভারতী' নাই, 'বঙ্গবাণী' 'মানসী ও মর্মবাণী' স্তব্ধ হইয়াছে, 'সবুজপত্র' শুষ্ক ও মৃত, 'কালি-কলম' 'কল্লোল' 'প্রগতি' কেহই নাই। আজ 'শনিবারের চিঠি'ও মরিল। শুধু বিচিত্র যাত্রীশ্রেণী লইয়া অম্নিবাস 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' 'বসুমতী' চলিতে থাকিবে, উত্তরাখণ্ডে 'উত্তরা' "আছি—আছি" বলিয়া উত্তর দিবে—'শনিবারের চিঠি' বাঁচিবে না, থাকিবে না?

ভূতপূর্ব স্নানঘরে ম্যানেজারের চিত্তের দাবদাহ প্রশমিত হয় না—সহস্র বিকারের বিভীষিকার মধ্যে তাহাকে কোন্ অদৃশ্য শক্তি টানিয়া লইয়া যায়; পরিণামে কি ঘটে তাহার পরিচয় আমার "রসাভাস" কবিতায় এই ভাবে আছে :

ঝঞ্ঝার মোহে অবোধ বিহঙ্গম
ডানা ঝাপটিয়া উঠিল ঊর্ধ্বাকাশে ;
নহে বিহঙ্গ, চপল চিত্ত মম,
ধূলি-বাত্যায় চমকি উঠিল ত্রাসে।
নীলিমা ধূসর, ঈশানের কালো মেঘ
বর্ষণাকুল ; বাড়িছে ঝড়ের বেগ,
চড়িছে মাত্রা—তিন চার ছয় পেগ—
ঝঞ্ঝার সাথী হাসিল অট্টহাসে ;
ভগ্নপক্ষ ঝড়ের কপোত সম
ব্যোমলোভী মন বন্দী ধূলির পাশে।

রাত্রি গভীর, বীভৎস কোলাহল !
ঝলকে অশনি মেঘের বক্ষ চিরে,
মদের পাত্র ঝঞ্ঝার সম্বল,
বজ্র হাঁকিছে আবরণহীন শিরে !
কাঁকড়ার খোলা, ঝাল মাংসের ঝোল,
নামিল বৃষ্টি, মুখে কুৎসিত বোল
কোথায় চুমিছে কাহারে দিতেছে কোল,
ধূলির সঙ্গী ঝড়ের সঙ্গিনীরে—
বক্ষেতে জ্বালা, মুখে হাসি খলখল,
স্খলিত বচন গোঙানি হইল ধীরে !

বহে ঝড়, তবু আকাশবিলাসী মন,
পঙ্কজ তবু পঙ্কে গজাতে চায়,
ক্ষণে খুঁজে ফেরে বাসনার আয়োজন,
ক্ষণে ক্ষণে মন অসীমের পানে ধায় !···

কিন্তু অসীমে ধাওয়া করিতে গেলে ছোট হইলেও একটা বিমান চাই। বিমানের পাখা পুড়িয়া গিয়াছে, ছিন্নপক্ষ পাখীর মত ভূতলে পড়িয়া শুধু আর্তনাদই করি। হাতে কাজ বিশেষ নাই। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃপা করিয়া আমার সেই স্নানঘরে আসিয়াই বসেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজীতে লেখা 'উড়িষ্যার ইতিহাস' ময়ূরভঞ্জের রাজবদান্যতায় প্রবাসী প্রেসে ছাপা হইতেছিল—অনেক ছবি, বিরাট কাজ। আমার একান্ত অধিকারে গডরেজের একটি লৌহ-ড্রয়ার ছিল। ব্লকগুলি তাহাতেই তুলিয়া রাখিতাম। কেদারনাথ আসিলেই সেগুলি বাহির করিয়া সযত্নে টেবিলের উপর সাজাইয়া দিতাম; তিনি নাড়িতেন চাড়িতেন, দেখিতেন; স্কেল হাতে লইয়া মাপজোক করিতেন; প্রেসের বেয়ারা কানা নিঝঝু যে কাজ স্বচ্ছন্দে করিতে পারিত, আমি প্রত্যহ সেই কাজ করিতে করিতে হাঁপাইয়া উঠিতাম। দুইজনে সামনাসামনি বসিয়া ব্লকগুলিকে নিরীক্ষণ-অবলোকনপর্ব শেষ হইলে কেদারনাথ সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া যাইতেন, আমিও লৌহপেটিকায় ব্লকগুলিকে পুনরায় তুলিয়া চাবিবন্ধ করিয়া মধ্যাহ্ন-আহার ও বিশ্রামের জন্য বাড়ি যাইতাম। যেদিন যত বিরক্তি ও অবসাদ বোধ হইত সেই রাত্রি তত বিকারের ঘোরে কাটিত; সদ্য-পরিচিত কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রাওযের সহিত কাব্যচর্চার সুযোগ মিলিলে রাত্রিটা আনন্দোজ্জ্বল হইত। তিনি আমারই 'পথ চলতে ঘাসের ফুলে'র কবিতা অনর্গল আওড়াইয়া আমার মৃতপ্রায় কবিমনকে সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতার ভবানীপুরে উনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন বসিল। রবীন্দ্রনাথ মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মানসিক অবস্থা তখন যে সম্মেলনে যোগ দিবার অনুকূলে ছিল না সুনীতিকুমারের নিকট 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কিত পত্রই তাহার প্রমাণ। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি 'নারায়ণে'র বিপিনচন্দ্র পাল এই অনুপস্থিতির কারণে কবিকে আর একবার আর এক হাত লইলেন। সাহিত্য-জগতে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাস হইতে সম্মেলনে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। সরস্বতীপূজার দিন ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৩০, ৭ই মাঘ ১৩৩৬ সম্মেলনের আরম্ভ-দিবস। আমার পূর্বপরিচিত 'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সমভিব্যাহারে কেদারনাথ সম্মেলন-মণ্ডপে চলিতেছিলেন। হেদুয়ার সন্নিকটে তাঁহাদের সহিত আমার দেখা। সুরেশচন্দ্র পরিচয় করাইয়া দিলেন, সসম্ভ্রমে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। স্মরণীয় দিন এবং স্মরণীয় মুহূর্ত—অত্যন্ত

অব্যবস্থিতচিত্ততা ও অশান্তির মধ্যে স্নেহশীল দাদামহাশয়ের সর্বগ্লানিহর স্পর্শ ও আশীর্বাদ লাভ করিলাম। দাদামশাই-নাতি সম্বন্ধ পাকা হইল। সে সম্বন্ধ দাদামশাইয়ের মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

সম্পূর্ণ আত্মস্থ ও আদর্শে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন আমার মা। দাদা তখন বাঁকুড়ায় ওকালতি করেন, বাবা-মা সেখানেই থাকেন। অকস্মাৎ মায়ের নিদারুণ পীড়ার সংবাদ আসিল। যে পুষ্প আপনাকে বৃন্তহীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবিয়াছিল, মাটির অন্ধকারে মূলে টান পড়াতে সে বেদনাহত ও বিহ্বল হইয়া উঠিল; উচ্ছৃঙ্খল মন উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে ভরিয়া গেল। ১৫ই জুলাই একাকী বাঁকুড়া পৌঁছিলাম, মা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মাঝখানে দোল খাইতেছিলেন। ১৭ই জুলাই বেলা দশটা নাগাদ তিনি চির-বিদায় লইলেন—১লা শ্রাবণের ক্ষান্তবর্ষণ দ্বিপ্রহরে শ্মশানযাত্রা করিলাম। গন্ধেশ্বরী নদীর কূলে চিতা জ্বলিল, আমি শ্মশানস্থিত ইঁদারার ধারে বসিয়া আমার সাহিত্য-জীবনের গোড়ার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম; এই মা-ই আমার কানে ছন্দের মন্ত্র দিয়াছিলেন নিতান্ত শৈশবে—প্রত্যূষের অন্ধকারে নিদ্রাজাগরণের বিচিত্র সন্ধিক্ষণে সেদিন প্রথম তাঁহার মুখে সুর-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের আবৃত্তি শুনিয়াছিলাম—পয়ারের সেই প্রভাব আজও আমার মনকে আন্দোলিত করে, যখনই আমি স্মৃতি হইতে স্মরণ করি :

> দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
> না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে॥
> কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
> মিছে মায়াবদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হৈনু॥
> ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙি পড়ে।
> কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে॥

মায়ের সেই সুগভীর ধর্মবিশ্বাস আমার ছন্নছাড়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সেই দিন সেই মহাগুরুনিপাত-বৎসরের সূত্রপাতে মাকে মনে মনে বলিলাম, তুমি বাঁচিয়া থাকিতে যে অর্ঘ্য দিতে পারি নাই, আশীর্বাদ কর এইবার যেন তাহা রচনা ও নিবেদন করিতে পারি। ছয় বৎসরের মধ্যেই এই সঙ্কল্প মায়ের আশীর্বাদে পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলাম, ১৯৩৬-এর মার্চ মাসে আমার 'রাজহংস'-কাব্য মাকে নিবেদন করিয়া বলিতে পারিয়াছিলাম ;

> জননী, তোমারে স্মরিয়া আমার কাব্যের দীপশিখা
> জ্বালাইয়া রাখি অবোধ অন্ধকারে,

দেখিতে না পাই, বুঝি অনুভবে তুমি আছ কাছে কাছে;
নিজে এসে মাতা, লহ মোর দীপারতি।

কিন্তু এ-সব অনেক পরের কথা। মাঝখানে আরও কথা আছে—মৎ-পরিচালিত সাপ্তাহিক 'চিত্রলেখা' ও 'যুগবাণী'র কথা।

আর কেহ না জানুক, আমার মন সেই নেতা-ধোপানীর মতই জানিত, 'শনিবারের চিঠি' ঘুমাইয়া আছে, সময় হইলেই জাগিবে। কিন্তু ততক্ষণ কি করিব ইহাই ছিল আমার চিন্তা। করিবার অনেক কিছু ছিল। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ভারতের প্রধান প্রধান নেতারা লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়া আইনভঙ্গ অপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছেন, ঢাকা মুন্সীগঞ্জে মুসলমান-দের ব্যাপক হিন্দু-নিগ্রহ সমগ্র দেশকে স্তব্ধ স্তম্ভিত ও আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে, বৃটিশ শাসন-কর্তারা এবং অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্র এ বিষয়ে সমবেত-ভাবে এমন আশ্চর্য রকম মূক যে সদ্য ইউরোপ-প্রবাসী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিমূঢ়-বিস্ময়ে স্বদেশে এই প্রসঙ্গে পত্র লিখিতেছেন, ডিসেম্বর (১৯২৯) জওহরলালের সভাপতিত্বে লাহোর কংগ্রেসে স্থির হইয়াছে—দেড় বৎসরকাল অধিবেশন বসিবে না, ৪৩তম অধিবেশন ১৯৩১ সনের মার্চ-এপ্রিল মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত হইবে সুতরাং দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সর্ব-ভারতীয় আলোচনা মুলতুবি আছে, গবর্মেণ্ট প্রেস-আইনের আরও কড়াকড়ি করিয়াছেন—সাহিত্যিক সমাজের কিছু করিবার এই ছিল সুযোগ। কিন্তু কেন জানি না, এত বড় আন্দোলন ও প্রজা-নিগ্রহের মহাকাব্যিক মহিমা বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের চিত্তকে স্পর্শ করে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিককার চারণ-কবি "হিজ মাস্টারস ভয়েস" কোম্পানিতে চটুল প্রেমের গান-রচনায় ও শিক্ষাদানে মশগুল, আমরা রাজনীতি-নিরপেক্ষ সাহিত্যিক কয়েকজন প্রত্যহ প্রবাসী প্রেসের ছাপাখানার ম্যানেজারের ঘরে সন্ধ্যায় সমবেত হইয়া চা-ধূমপানের অবকাশে 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিভূতিভূষণের 'অপরা-জিতে'র পাণ্ডুলিপি শুনিয়া তৃপ্ত; এই তৃপ্তির মাঝখানে ঢাকা হইতে প্রেরিত মোহিতলালের দাঙ্গার নৃশংসতা-বিষয়ক চিঠির আর্তনাদ আমাদিগকে ব্যথিত পীড়িত উত্তেজিত করিত বটে, কিন্তু আমাদের কিছু করিবার ছিল না। আজ মনে মনে সেদিনের হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখিতেছি, কবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লবণ-সত্যাগ্রহ ও তজ্জনিত কারাবরণের কবিতাগুলি ছাড়া এই বিরাট আন্দোলনকে লইয়া আর সাহিত্যই সৃষ্ট হয় নাই। শিল্পে একমাত্র নন্দলাল বসু মহাশয়ের ডাণ্ডি-লবণ-অভিযানে যষ্টিধৃত গান্ধীজীর ছবিখানি স্থায়ী

গৌরব অর্জন করিয়াছে। সারাদেশে শিল্প-সাহিত্যের আর কোনও সাড়া কেন জাগে নাই তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত। প্রভাতমোহনের কয়েকটি কবিতা 'প্রবাসী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তখনই প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে আমি সকলগুলি একত্র করিয়া 'মুক্তিপথে' নামে (প্রচ্ছদপটে নন্দলালের গান্ধীজীর চিত্র দিয়া) পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু সতর্ক পুলিস অচিরাৎ তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "মাতৃভূমির সেবা" কবিতাটি আজও অনেকের স্মরণে আছে, বিশেষ করিয়া এই কয়েকটি পংক্তি :

অনেক ঘুমায়েছি জাগিতে হবে,
অনেক সহিয়াছি আর না সহে,
যে পাপে যে গরলে জ্বলিছে দেশ
তাহার শেষ আজ না হ'লে নহে।
আজিকে সব ভুলে অকুতোভয়ে
মরণে যেতে হবে অথবা জয়ে,
বসিয়া ভাবিবার সময় নাহি আর
যুগ যে কেটে গেল,—বেলা যে বহে।
রুধিতে হবে আজ পাপের পথ
আপন বুক দিয়া জীবন দিয়া ;
শুধিতে হবে ধার জীবন-দেবতার
অযুত নরমেধ অনুষ্ঠিয়া।

... ...

আজি এ শুভদিনে সবাই এস,
জ্বলেছে হোমানল ডাকিছে হোতা,
মায়ের তরে প্রাণ কে দিবে বলিদান,
পূজার ফুল কই, আহুতি কোথা ?

প্রভাতমোহন কলিকাতার সন্নিকটে মহিষবাথানে লবণ-সত্যাগ্রহ করিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

বাংলা দেশে আর কিছু যে হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ বাংলা দেশে তখন স্বরাজ্যদল প্রধান। তাঁহারা দুই বিবদমান ভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের কুৎসা করিতেছেন। এই ব্যাপার অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। চিন্তাশীল

বাঙালীমাত্রেই তিতবিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সম্ভবত সেই কারণেই আর মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই।

ঠিক এই সময়ে শ্যামবাজারে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপর "চিত্রা" চলচ্চিত্র-গৃহের প্রতিষ্ঠা হইল; মালিক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার। তখনও চিত্রনির্মাণ-প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের পত্তন হয় নাই, তবে তোড়জোড় চলিতেছে। সরকার মহাশয় শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট একটি চলচ্চিত্র-সাপ্তাহিক প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন—সম্ভবত উভয়েরই মালিকানা স্বত্বে। কেদারনাথ তাঁহার ইচ্ছা আমাকে জ্ঞাপন করিয়া যথাবিহিত করিতে আদেশ করিলেন। চড়ুকের পিঠ ঢাকের বাদ্য শুনিয়াই সড়সড় করে, আমি হাতে স্বর্গ পাইলাম। হুকুম হইল প্রবাসী প্রেস সংক্রান্ত কাহারও সম্পাদক হওয়া চলিবে না। আর একজনের নাম চাই। হাতের কাছেই ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহাকে মাসিক দশ টাকা সেলামী কবলাইয়া সম্পাদক-পদের নাম ধার দিতে রাজী করাইলাম, লেখার দক্ষিণা স্বতন্ত্র। আসলে সম্পাদনা পরিচালনা মুদ্রণের যাবতীয় ভার আমার উপরেই পড়িল। ১৯৩০ সনে ১৫ই নবেম্বর চলচ্চিত্র-বিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'চিত্রলেখা' বাহির হইল। যতদূর স্মরণ হয় বাংলায় সিনেমা-বিষয়ক ইহাই প্রথম সার্থক পত্রিকা। ১৮ সংখ্যা বাহির হইয়া অর্থনৈতিক কারণে ইহার প্রচার বন্ধ হয়। পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল বলিয়াই আমার ধারণা।

ইহার পর 'যুগবাণী', সেটিও সাপ্তাহিক—রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক। প্রকাশের ইতিহাস একটু বিচিত্র।

একদা সন্ধ্যায় প্রবাসী প্রেসের অফিস-ঘরে বসিয়া আছি, দুইটি তরুণ যুবকের আবির্ভাব হইল। তখনও কলেজে পড়া তাঁহাদের সাঙ্গ হয় নাই, কিন্তু অভিলাষ উচ্চ; উদ্যমও প্রচুর। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বিজলী' সাপ্তাহিক দীর্ঘকাল বন্ধ আছে, তাঁহারা তাহা পুনঃপ্রকাশ করিতে চান। 'বিজলী'র ইতিহাস আমি জানিতাম। অনেক হাত ঘুরিয়া অনেক কাণ্ড করিয়া উহা বারীনদার কবলে আসিয়াছিল। যুবক দুইটি সম্পূর্ণ মৃতকে সঞ্জীবিত করিতে চাহেন। আমার নিকট কেন—এই প্রশ্নের জবাবে জানিতে পারিলাম, 'শনিবারের চিঠি' যখন বন্ধই হইয়াছে, 'শনিবারের চিঠি'র "সংবাদ-সাহিত্যে"র লেখককে তাঁহারা চান, 'বিজলী'তে সপ্তাহে সপ্তাহে সাহিত্যিক টিপ্পনী কাটিবার জন্য। হাত চুলকাইতেছিল, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে রাজী হইয়া গেলাম। কাজটা শখের, তবু উৎসাহও কম বোধ করিলাম না। পরের সপ্তাহ হইতে 'বিজলী'তে আমার "চলন্তিকা"—সাহিত্যিক টিপ্পনী নিয়মিত

বাহির হইতে লাগিল, অবশ্য বেনামীতে। ইহা ছাড়া কবিতা, প্রবন্ধ ও পুস্তক-সমালোচনারও বান ডাকাইয়া দিলাম।

পাঁচ-সাত সপ্তাহ পরে যুবকেরা আবার আবির্ভূত হইলেন, এবার একটি পত্র হস্তে—বারীনদার পত্র। তিনি 'বিজলী'র গুড উইল বাবদ মাত্র হাজার টাকা দাবী করিয়াছেন, নতুবা উহা চালাইতে দিবেন না। যুবকেরা তো স্বভাবতই সঙ্গতিহীন, আমাকে বেচিলেও তখন হাজার টাকা হইত না। মাথায় একটা বুদ্ধি জাগিল। যুবকেরা কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের কাছাকাছি সুকিয়া স্ট্রীটের (অধুনা কৈলাস বসু স্ট্রীট) উপর একটা ঘর ভাড়া করিয়া বইয়ের দোকান খুলিয়াছিলেন, নাম দিয়াছিলেন "যুগবাণী সাহিত্য-চক্র"। পরে বুঝিয়াছিলাম দোকানঘর ও পত্রিকাপ্রকাশ তাঁহাদের বাহিরের মুখোশ মাত্র। তাঁহারা ভিতরে ভিতরে সম্রাটকে উৎখাত করিবার বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। যাহা হউক, চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, 'বিজলী'র আবার গুড উইল! নূতন কাগজ বাহির করুন, নাম দিন 'যুগবাণী'। যুবকেরা রাজী হইলেন। কিছু টাকা চাই, আমার কাছে শ দুয়েক টাকা ছিল, দিলাম। এই টাকা পরে তাঁহারা আমার 'অঙ্গুষ্ঠ' কবিতা-পুস্তক ছাপিয়া দিয়া পরিশোধ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, নূতন সাপ্তাহিক 'যুগবাণী' বাহির হইল—সম্পাদক যুবকদের অন্যতম শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ। সেই 'যুগবাণী'কে জীয়াইয়া রাখিয়া আজ তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহার মত উদ্যমশীল যুবক আমি বাংলা দেশে দেখি নাই। 'যুগবাণী'র প্রথম সংখ্যার গোড়াতেই আমার "যুগবাণী" নামক একটি কবিতা বাহির হইল। "বাংলা দেশের স্বরাজ্যদলের আত্মকলহ" স্মরণ করিয়া তাহাতে লিখিলাম :

বিবাদের বাণী নহে, জাতি-মুক্তি-বাণী আজ চাহি,
বিকৃত জীবন নহে, চাহি সত্য মৃত্যুর সাধনা,
ছুটেছে নিখিল-বিশ্ব নূতন আলোকে অবগাহি'
কারাগারে রুদ্ধ হয়ে করিব কি আত্ম-আরাধনা ?
ভাঙিয়া ফেলিতে হবে এ পাষাণ-কারার প্রাচীর—
বাহিরে খুঁড়িছে মাথা মুক্তির আলোক সুবিপুল,
কাঁদিতেছে অন্ধকারে ভারতের বাণী সুগভীর—
কারাগারে ব্যবধান, মিলাইতে হবে দুই কূল।
এ মিলন-সাধনায় প্রচারিতে নব-যুগবাণী
আমাদের যাত্রা শুরু, যাত্রা শেষ কবে নাহি জানি।

পরে পরে আরও অনেক লেখা লিখিলাম। 'যুগবাণী' জাঁকিয়া উঠিল। সপ্তাহ দশেক পরে একদিন 'যুগবাণী' অফিসে গিয়া দেখি, দ্বার তালাবদ্ধ, পুলিসের স্থূল হস্তাবলেপের কিছু চিহ্ন পথের উপর বর্তমান। সন্ধান লইয়া জানিলাম, রাজদ্রোহের অপরাধে যুবক দুইজন এবং তৎসহ আরও কেহ কেহ ধৃত হইয়াছেন, কারবার বন্ধ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ফিরিয়া আসিলাম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, দ্বিতীয় যুবকটি হইতেছেন—কবি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

দশম তরঙ্গ

যবনিকা পতনের পূর্বে ও পরে

সাধ করিয়া গাঙে ঝাঁপ দিয়াছি। তলার মাটি পায়ের সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, নাকের প্রান্তসীমা অতিক্রম করিয়া জল ললাট ছুঁই-ছুঁই করিতেছে, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মরিতে আর বিলম্ব নাই। এমন সময় ঠিক হাতের নাগালের বাহিরে পর পর দুইটি শক্ত নির্ভরশীল ভেলা ভাসিয়া যাইতে দেখিলে মনের যে অবস্থা হয়, 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম পর্যায় মাসিক-জীবন শেষ হইবার পূর্বে আমাদের মনের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইল। যে উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া পাঁচ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে 'শনিবারের চিঠি'র যাত্রা শুরু হইয়াছিল, মরিবার ঠিক প্রাক্কালে দেখ গেল, বঙ্গ-সাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ মহারথী দ্বিধাহীন অকুণ্ঠ ভাষায় সেই উদ্দেশ্যেরই পোষকতা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের মনের মাঝখানে যে মালিন্য মেঘরূপে ঘনাইয়া উঠিয়াছিল এক পশলা বর্ষণের দ্বারা তাহা অপসারণের সুযোগ খুঁজিতেছিলাম, কিন্তু ১৯২৯ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে কবি অকস্মাৎ কানাডা যাত্রা করায় সে সুযোগ মিলে নাই। জাপান হইয়া জুলাইয়ের গোড়ায় তিনি ফিরিয়া আসা মাত্রই আষাঢ়ের (১৩৩৬) 'শনিবারের চিঠি'তে "শ্রীচরণেষু" কবিতায় লিখিলাম—

> 'অপরাধ করিতেছি,' কহিতেছে জনে জনে
> 'হব গুরুহত্যা-পাপভাগী'।
> হে গুরু, আমরা জানি, তুমি জান মনে মনে,
> কেবা কত গুরু-অনুরাগী!

অর্ধেক শতাব্দীব্যাপী করালে অমৃতপান,
সে অমৃতে বাখানি গরল,
সত্য বটে। নহে গুরু, সে তোমার অপমান,
মোরা ক্লীব, মোরা হীনবল,
দেবভোগ্য সে অমৃত পারি না করিতে আত্মসাৎ ;
স্বর্গের পীযুষধারা বিষ হয়ে ওঠে অকস্মাৎ।
ধরার অক্ষম জীব, ধরায় করি না পদপাত ;
শূন্যে ছুঁড়ি চরণ চঞ্চল।
জানিতে পার না তুমি, ধ্যানাসনে বসি দিনরাত
সুধা কবে হয়েছে গরল !

আপনার কল্পনায় আপনি বিভোর রহি
মহাবিশ্বে করিছ ভ্রমণ—
পিছু ফিরে দেখ নাই, সঙ্গী তব কেহ নহি,
তুমি একা, পথ সুবিজন।
অনন্ত-যাত্রার মন্ত্র মহোল্লাসে আপনি উচ্চারি'
ভাবিছ, তোমার পিছে মোরাও দিতেছি বুঝি পাড়ি।
যদি কভু মোহ টুটে দেখিবে দু'নয়ন বিস্ফারি'
নিজেরই ছায়ার সঞ্চরণ,
দূরে কাছে কেহ নাই, দীর্ঘ পথ দিগন্ত-প্রসারী—
তুমি একা করিছ ভ্রমণ।

আপনি দেখিছ স্বপ্ন, ভাবে স্বপ্নাচ্ছন্ন মন,
স্বপ্নে স্বপ্নে চলিছে ধরণী।
জ্ঞানে কর্মে ব্যর্থ মোরা, রিক্ত মোরা, অকিঞ্চন,
ঘাটে বাঁধা মোদের তরণী।
তুমি ভাব, সে তরণী পাড়ি দেয় বিশ্বপারাবার—
শোন নাই কোলাহল, শোন না ক্রন্দন-হাহাকার,
কুটির-প্রাঙ্গণে মোরা দ্বন্দ্ব করি আজো ক্ষুদ্রতার ;
বহু দূরে স্বপন-সরণী—
তুমি একা যাত্রী সেথা, শিরে স্বপ্ন-কল্পনার ভার—
ধূলি-পঙ্কে মলিন ধরণী।

... ...

তুমি নামিও না নীচে, ক'রো না মাটির স্তুতি,
সে তোমার মহা মিথ্যাচার।
আসিয়াছ এ ধরায়—ললাটে স্বর্গের দ্যুতি,
তুমি কেহ নহ মৃত্তিকার।
ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বলোকে আপনার সঙ্গীতে বিহ্বল
একেলা ছুটিয়া চল, ধূলি-পঙ্ক-ম্লান ধরাতল।
ঝরিয়া পড়ুক নিত্য সুধা তব সঙ্গীত তরল,
দীপ্ত হোক মৃত্তিকা-আঁধার—
কবি নহে মন্ত্রদাতা, ওষধি নহেক শতদল—
দূর কর এই মিথ্যাচার।

কিন্তু এই প্রণতি-বাণ কবির চরণ পর্যন্ত পৌঁছিল না; আষাঢ়-শ্রাবণের ঘনায়মান মেঘপুঞ্জ ও ধারাবর্ষণের পরিবেশে বর্ষামঙ্গল গানে এবং 'রাজা ও রাণী'কে ভাঙিয়া 'তপতী' রচনায় ও তাহার অভিনয়ে তিনি এমনই মশগুল হইয়া রহিলেন যে, আমাদের পুনর্মিলন-ব্যাকুলতা ব্যর্থ হইল। আমাদের প্রণতি-বাণ সুনীতিকুমারের নিকট প্রেরিত পত্র-রূপ ব্রহ্মাস্ত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রেরিত মৃত্যুবাণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। অবস্থা আমাদের পক্ষে ক্রমশ সঙ্গীন হইয়াই উঠিতে লাগিল। ১৯৩০ সনের গোড়ায়—জানুয়ারিতে বরোদা এবং মার্চে (২রা) রবীন্দ্রনাথ বিলাত চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলেন ১৯৩১ সনের ৩১ জানুয়ারি তারিখে—প্রায় বৎসর খানেক পরে। ততদিনে ফল-পুষ্প-পত্র-শাখা-কাণ্ডহীন 'শনিবারের চিঠি'র মূল মাটির অন্ধকার গহনে অন্তর্ধান করিয়াছে।

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম। মরিবার ঠিক প্রাক্কালে দুই প্রধান মহারথীর সমর্থনরূপ ভেলা দেখিতে দেখিতে মরিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের "রবীন্দ্র-পরিষৎ" সভায় ৫ ভাদ্র (১৩৩৬) রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহারই রবীন্দ্রনাথ-লিখিত রূপ কার্তিকের 'প্রবাসী'তে বাহির হইল—"সাহিত্য-বিচার"। তাহাতে লিখিলেন :

সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো-এনালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে। সৃষ্টিতে অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার গৌরব খর্ব করবার মনোভাব জেগে উঠেছে। মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে, কাম ক্রোধ অহঙ্কার ইত্যাদি। ছিন্ন করে দেখলে যে বস্তু-পরিচয় পাওয়া যায় সম্মিলিত

আকারে তা পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তিগুলির গূঢ় অস্তিত্ব দ্বারা নয়, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অভাবনীয় যোগসাধনের দ্বারাই চরিত্রের বিকাশ। সেই যোগের রহস্যকে আজকাল অংশের বিশ্লেষণ, লঙ্ঘন করবার উপক্রম করছে। বুদ্ধদেবের চরিত্রের বিচিত্র উপাদানের মধ্যে কাম প্রবৃত্তিও ছিল, তাঁর যৌবনের ইতিহাস থেকে সেটা প্রমাণ করা সহজ।—যেটা থাকে সেটা যায় না, গেলে তাতে স্বভাবের অসম্পূর্ণতা ঘটে। চরিত্রের পরিবর্তন বা উৎকর্ষ ঘটে বর্জনের দ্বারা নয়, যোগের দ্বারা। সেই যোগের দ্বারা যে পরিচয় সমগ্রভাবে প্রকাশমান সেইটেই হল বুদ্ধদেবের চরিত্রগত সত্য। প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে তাঁর সত্য পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক সাহিত্যের যৌন-প্রবণতা ও প্রবলতা এবং রূঢ় বীভৎসতা সম্পর্কে সংক্ষেপে যাহা এখানে বলিলেন, আমরা নানা দৃষ্টান্ত চয়ন করিয়া নানা ভঙ্গিতে লিখিয়া পূর্বাপর সেই কথাটাই বলিয়া আসিতেছিলাম। আমাদের মৃত্যুর রায় দিয়াও আমাদের উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত করাতে আমরা মরিতে মরিতেও পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

রবীন্দ্রনাথ যাহা করিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু শরৎচন্দ্র আমাদিগকে একেবারে বিমূঢ় বিমুগ্ধ করিয়া দিলেন। ওই প্রেসিডেন্সি কলেজেই বঙ্কিম-শরৎ-সমিতির সভায় ৩১ ভাদ্র (১৩৩৬) তাঁহার চতুঃপঞ্চাশত্তম জন্মদিনে শরৎচন্দ্র যে ভাষণ দিলেন তাহাকে প্রায়শ্চিত্তিক ভাষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "সাহিত্য-ধর্মে"র বিবাদে যিনি অকস্মাৎ একরকম গায়ে পড়িয়াই অবতীর্ণ হইয়া বিকৃতরুচিদের আরও রুচিবিকারের কারণ হইয়াছিলেন, অকারণে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাল ঠুকিয়া দ্বন্দ্বে নামিয়াছিলেন, ঠিক দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তিনিই "সবিনয়ে" ও সবেদনায় নিবেদন করিলেন :

> অনেক দিন পূর্বে, বোধ হয়, আপনাদের মনে আছে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। একটু কঠোরভাবে তিনি তা করেছিলেন। ঠিক তার প্রতিবাদে নয়, কিন্তু সবিনয়ে আমি 'বঙ্গবাণী'তে তাঁকে জানিয়েছি, যতটা রাগ ক'রে তিনি বলেছেন, ততটাই সত্য কিনা। তারপর থেকে দু-একজনের মুখে যখন শুনলাম, ওটা বলা আমার ঠিক হয় নাই, তখন নবীন সাহিত্য, যা আজকাল খবরের কাগজে, মাসিক-পত্রে ও নানাভাবে অনবরত বেরুচ্ছে—গত এক বৎসর আমি সে সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েছি।

আজ আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—জিনিসটা সত্যই বিশ্রী হয়ে উঠেছে। আমি বরাবর চেয়েছিলাম, কবিরা যাকে রসবস্তু বলেন, এইটিই যেন তাঁরা তাঁদের যৌবনের শক্তি, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি নিয়ে সাহিত্য গ'ড়ে তুলতে পারেন। আমি তাঁদের ভালবাসি এবং এই দিক থেকেই তাঁদের উৎসাহ বরাবর দিয়ে এসেছি। যাঁদের বয়স হয়েছে, তাঁদের মন অন্য রকম হয়ে গেছে। যৌবন জিনিসটা আমরা নিজেরা পেরিয়ে গেছি। তাই যৌবনের অনেক রচনা হয়তো আজ পড়তেও ভাল লাগে না, লিখতেও পারি না। এই জন্য মনে করি বয়স যাঁদের কম, তাঁদের নূতন আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও তার সঙ্গে একটা শুদ্ধ মন নিয়ে সত্য সত্য সাহিত্য তাঁরা রচনা করবেন। সাহিত্যের উন্নতি করবেন। বাঙ্গালা ভাষায় বড় জিনিস লিখে যাবেন, আন্তরিক চেষ্টা নিয়ে সাহিত্য রচনা করবেন। কিন্তু এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমার মন ঠিক অন্য রকম হয়ে গেছে। আমি দেখছি, আমি যাকে রস ব'লে বুঝি, তাঁদের ভিতর তার বড্ড অভাব। চোখ মেলে চাইলে অভাবই দেখতে পাওয়া যায়। একটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত ভাগ আছে, তার একটা ভাগ যেন তাঁরা অনবরত পুনরাবৃত্তি ক'রে যাচ্ছেন, সে যেন আর থামে না।

যারা পড়ছে, সাহিত্য-চর্চা করছে, তাদের কাছে মুক্তকণ্ঠে বলব, তাদের হাত দিয়ে সাহিত্য যে খুব একটা উঁচু পর্দায় বা ধাপে উঠছে তা নয়। রবীন্দ্রনাথ যত কড়া ক'রে বলেছেন, তেমন ক'রে বলবার শক্তি আমার নাই, থাকলে হয়তো তেমন ক'রে বলতাম। সত্যই খারাপ হচ্ছে। এখন তাদের সংযত হওয়া দরকার। আর রসবস্তু যে কি, বাস্তবিক কি হ'লে মানুষ আনন্দ বোধ করে, মানুষ বড় হয়, তার হৃদয়ের প্রসার বাড়ে—এসব চিন্তা করা দরকার। ভাবা দরকার। আমি গল্প লেখার দিক থেকে বলছি, কবিতার দিক থেকে নয়। এক দিকে চলেছে। সংবাদপত্র—মাসিক—যখন পড়ি, কেবলই যেন মনে হয়, একই কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এক বন্ধুর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকগুলি তরুণী, বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশজন হবে, উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বললেন, দুঃখের ব্যাপার এই—আমরা লিখতে জানি না, সেই-জন্য আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি না। আজকাল যা হচ্ছে, তাতে আমরা লজ্জায় ম'রে যাই। কম বয়সের ছেলেরা হয়তো মনে করে, এসব জিনিস আমরা বুঝি ভালবাসি। আপনি যদি সুবিধা সুযোগ পান,

আমাদের তরফ থেকে বলবেন—এসব জিনিস আমরা বাস্তবিক ভালবাসি না। পড়তে এমন লজ্জা হয়—তা প্রকাশ করতে পারি না। প্রতিবাদ ক'রে কিছু লিখলে তারা গালিগালাজ আরম্ভ করবে, কটূক্তি বর্ষণ করবে—সে সব আমরা সহ্য করতে পারব না। সেইজন্য সব সহ্য ক'রে যাচ্ছি। বহু ছেলে আপনার কাছে যায়। আমাদের হয়ে একথা তাদের জানাবেন।

…গত এক বৎসর তাঁদের বহু রচনা প'ড়ে তাঁদের কিছু বলবার সুযোগটাই খুঁজছিলাম। সেই সুযোগ আজ পেয়েছি। আমি বলি—তাঁরা সংযত হউন। সত্যিকার রসবস্তু কি, কিসে মানুষের হৃদয়কে বড় করে, সাহিত্য কি,—এসব তাঁরা ভেবে দেখুন।…যথার্থ বন্ধুভাবে আমি তাঁদের বলছি—তাঁরা সংযমের সীমা অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারম্বার মনে পড়ে। সেদিন অনেকেই মনে করলেন, যেন আমি তাঁর কথার পাল্টা উত্তর দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা করি নি, কোনদিন করব ব'লে মনেও করি না। সেদিন তাঁর কথা আমার অতটা না বললেও হয়তো হ'ত। কারণ, অতখানি [রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্মে"র বিরুদ্ধে] বোধ করি অত্যন্ত কঠোর ঠেকেছিল, মনে হয়েছিল, সত্য ছিল না। কিন্তু এক বৎসর [? দুই] পরে এ আর আমি বলতে পারি নে।

আজ মনে হয়, যতই এঁদের বিরুদ্ধে কথা উঠছে, ততই যেন এঁদের আক্রোশ বেড়ে চলেছে। অন্ততঃ আক্রোশের থেকে করছেন ব'লেই সন্দেহ হয়। মনে হয় যেন তাঁরা বলছেন—বেশ করেছি, আরও করব। তোমরা বলছ, সেজন্য আরও বেশী ক'রে করব। একে কিন্তু সাহস বলে না। এটাকে সাহস ব'লে মনে করি না।…এ যেন 'বে-পরোয়া হয়ে কতটা যেতে পারি দেখিয়ে দিচ্ছি' জানানো। এসব কথা আমি ভারি দুঃখের সঙ্গেই বলছি। বহুদিন সাহিত্যচর্চা ক'রে যা ভাল বুঝেছি, তার থেকেই বলছি,—সংযত হওয়া দরকার। তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ—একটু আধটু করেছ তা নয়, অনেকখানি করেছ। একটু আধটু জায়গায় কোথাও কিছু হ'লে কিছু হ'ত না। এ ক্ষেত্রে তা একেবারে নয়। এ কথার উত্তরে যদি তোমরা কেউ বল—আমিও তো এটা লিখেছি, রবীন্দ্রনাথও অমনি লিখেছেন—হতে পারে আমরা লিখেছি। তাতে কিন্তু এ প্রমাণ হয় না যে, তোমরা ভাল কাজ করেছ। স্নেহের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালবাসার সঙ্গে এবং তরুণ সাহিত্যিকদের মঙ্গল ইচ্ছা ক'রে এ কথাগুলি

বললাম। এ রকম সুবিধা ও অবসর কমই পাওয়া যায়। অনেক দিন ধ'রে বলব ব'লে মনে করেছিলাম। ভাল না লাগলেও কথা কয়টি ব'লে দিলাম।—'দৈনিক বঙ্গবাণী', ৮ আশ্বিন ১৩৩৬।

কিন্তু যাঁহাদের বলিলেন তাঁহারা তখন ভস্মীভূত হইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, কোনও একটা নির্দিষ্ট আধারে তাঁহারা আর ছিলেন না। তথাপি শরৎচন্দ্রের সরল স্বীকারোক্তিতে মুমূর্ষু আমরাও এই আশ্বাস পাইলাম যে, আমাদের সঙ্কল্প ও সাধনা মহত্তর ব্যক্তিদের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আর ভয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন তো অতিশয় বেদনাকাতর ছিলই, ইহার পর শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও অনুতাপ-কাতর হইয়া উঠিলাম। প্রায় বৎসর খানেক পরে পরবর্তী শ্রাবণ (১৩৩৭) মাসের শেষে মাতৃশ্রাদ্ধে বাঁকুড়া যাইবার সময় হাওড়া হইতে দেউলটি স্টেশন পর্যন্ত তাঁহার স্নেহসান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলাম। সে ঘটনা পূর্বে বলিয়াছি।

দুই শ্রেষ্ঠের প্রশ্রয় পাইয়া আবার সমিধ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলাম। 'শনিবারের চিঠি' ঘুমাইয়া থাক্। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া শক্তিসঞ্চয় করুক। প্রয়োজন হইলেই আমাদের ডাকে সে যেন আবার সাড়া দিতে পারে, সে ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখিতে হইবে। ডি. এম. লাইব্রেরি এবং শ্রীগুরু লাইব্রেরির কৃপায় রঞ্জন প্রকাশালয়ের চারিখানি পুস্তকই ('পথের পাঁচালী', 'অজয়', 'যোগভ্রষ্ট' ও 'পথ চলতে ঘাসের ফুল') স্বর্ণপ্রসূ হইয়া উঠিয়াছিল, আমার আশাতিরিক্ত। বাজারে নামডাকও খুব হইয়াছে। অপব্যয়ের পথও সদ্য আবিষ্কার করিয়া সাহিত্যিক-সমাজে খ্যাত হইয়া উঠিয়াছি। ধীরে ধীরে একে একে ওপারের পাখীরাও এপারে আসিয়া জুটিতেছেন। সাহিত্যভ্রষ্ট সাহিত্যিক-দের নৈশ আসর জাঁকিয়া উঠিতেছে।

'প্রবাসী'ত্যাগী শৈলজানন্দ প্রথম আসিলেন 'যুগবাণী'র আকর্ষণে। তাঁহার 'বধূবরণ' ও 'নারীমেধ' প্রশস্তি খুবই হৃদয়াবেগ দিয়া লিখিয়াছিলাম। সে উচাটনমন্ত্র তান্ত্রিক শৈলজানন্দ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ধরা দিলেন। রঞ্জন প্রকাশালয়েও ধরা দিতে চাহিলেন। চুক্তি হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র—'বেনামী বন্দরে'র পাসপোর্ট লইয়া রঞ্জন প্রকাশালয়ে ঢুকিবেন। সে চুক্তিও হইয়া গেল।

অব্যবহিত পরেই প্রবোধকুমার সান্যাল, তাঁহার হাতে 'নিশিপদ্মে'র পাণ্ডুলিপি। তিনিও চুক্তিবদ্ধ হইলেন।

কিন্তু তিন চুক্তিই কাজে নিষ্পন্ন হইবার পূর্বেই একটা সর্বনাশা ঝড়ো

হাওয়া আসিয়া রঞ্জন প্রকাশালয়কে মথিত বিপর্যস্ত করিয়া দিল। প্রেমেন্দ্রকে ডি. এম. লাইব্রেরির সঙ্গে জুতিয়া দিলাম, মুক্তি দিলাম শৈলজানন্দ-প্রবোধ-কুমারকে। ফলে ব্যবসায়ের যাহাই হউক, বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল।

ঝড়ো হাওয়া আমার নিজের মধ্যেই স্তম্ভিত হইয়া ছিল। তাহাকেই বাহিরে উদ্দাম হইবার অবকাশ দিয়া যখন প্রায় দেউলিয়া হইবার উপক্রম করিতেছি, তখন পর পর দুই মাস এগারো দিনের ব্যবধানে মাতার তিরোভাব (১লা শ্রাবণ) এবং প্রথমা কন্যা উমার আবির্ভাব (১১ই আশ্বিন) নিরালম্ব শূন্যে পায়ের তলায় কিছু মাটির যোগান দিল। আত্মীয়বান্ধবহীন অতিশয় দরিদ্র সংসারে চলচ্ছক্তিহীন গৃহিণীর কোল আলো করিয়া যখন কন্যারত্ন অবতীর্ণ হইলেন তখন এক বছর চার মাসের শিশুপুত্রের দাপটে আলনাস্কারের ভুয়া বাদশাহি কাচের বাসনের মত টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া গেল। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার প্রতিবিধান-কামনায় তটস্থ হইয়া উঠিলাম। প্রবাসী প্রেসের ম্যানেজার হিসাবে তখন মাসিক ১৭০৲ টাকা বেতন পাই। হঠাৎ নবাবির চোটে রঞ্জন প্রকাশালয়ের আগাম আয়ও বাঁধা পড়িয়াছে। নূতন পুস্তক প্রকাশের অথবা ‘পথের পাঁচালী’ দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার বিন্দুমাত্র সঙ্গতি নাই। অথচ পুস্তক দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। চাকুরির অসহায় বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রমিথিউসের আত্মঘাতী বেদনা অনুভব করিতেছি। এই অবস্থায় সম্পাদকীয় বিভাগ ও ছাপাখানা বিভাগের কলহ ধিকিধিকি তুষানল হইতে প্রজ্বলিত হুতাশনের লোলজিহ্বা বিস্তার করিতে লাগিল। আমি তখন বিলাত-প্রবাসী অশোক চট্টোপাধ্যায়ের “লোক” বলিয়া চিহ্নিত, সম্পাদকীয় বিভাগে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেদার চট্টো-পাধ্যায়ের “লোক”। একত্র পাশাপাশি চেয়ারে অবস্থানজনিতই সম্ভবত নীরদচন্দ্র চৌধুরীও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল পুষ্ট করিয়াছেন। এ-পক্ষে ও-পক্ষে নালিশ চলে; ছাপাখানা পক্ষ বলে—যথাসময়ে প্রুফ পাওয়া যাইতেছে না, সময়ে কাগজ প্রকাশ করিতে ছাপাখানার হয়রানি ও খরচান্ত হইতেছে; সম্পাদকীয় পক্ষ বলে,—বাহিরের অর্থকরী কাজ লইয়া ছাপাখানা এত ব্যস্ত যে ঘরের কাজ অবহেলিত হইতেছে। অসহায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কখনও এ-পক্ষকে কখনও ও-পক্ষকে অনুযোগ ও উপদেশ-মূলক চিরকুট প্রেরণ করিয়া কর্তব্য পালন করেন। উত্ত্যক্ত হইয়া একদিন হঠাৎ একটা মারাত্মক অন্যায় করিয়া ফেলিলাম। হাতে ‘যুগবাণী’ ছিল, তাহার “চলন্তিকা”য় ব্রজেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক গবেষণাকে কঠোর ব্যঙ্গ করিয়া কয়েক পংক্তি লিখিয়া দিলাম। পার্শিবাগান-আড্ডাবিরোধী বন্ধুদের কথাবার্তায় বিশ্বাস হইয়াছিল—ব্রজেন্দ্রনাথ

স্বয়ং কিছুই নহেন, পরের কৃতিত্ব আত্মসাৎ করিয়াই তাঁহার খ্যাতি। তিনি ইংরেজী বাংলা মোটেই লিখিতে জানেন না, বন্ধুরা লিখিয়া দেন, তিনি যশের উপস্বত্ব ভোগ করেন। আমার টিপ্পনীতে এই মর্মের ইঙ্গিত ছিল। আর যায় কোথায়? ব্রজেন্দ্রনাথ খোলাখুলি ভাবে শত্রুতা ঘোষণা করিলেন, এবং শত্রু-হিসাবে তিনি যে কত শক্তিশালী হইতে পারিতেন ভুক্তভোগীরা তাহা জানেন। তাঁহার বন্ধুত্বও অকৃত্রিম, মৌখিক সম্ভাষণেই তাহা শেষ হইত না। শত্রুতার মধ্য দিয়া তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করিবার সৌভাগ্য আমি অর্জন করিয়াছিলাম। সে কাহিনী পরে বলিব। গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথের অসাধারণ কৃতিত্বের কথাও যথাসময়ে প্রকাশ করিব।

আপাততঃ তখন বড় বেকায়দায় পড়িলাম। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাথায় থাকিলেও কার্যত রাজত্ব কেদারনাথের। সুতরাং আমার মনে সুখ ছিল না। চাকুরি ছাড়িয়া অন্য কিছু করার কথা এই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই মনে মনে স্থির করিয়া লইলাম। কি করিব? কলেজ-জীবনের পাকা বন্দর হইতে সামান্য ভেলা জানিয়াও 'শনিবারের চিঠি'কেই আশ্রয় করিয়াছিলাম। পয়সার দিক দিয়া না হইলেও খ্যাতির দিক দিয়া তাহা আমাকে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি'কেই আর্থিক অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিলে কি হয়? কিন্তু তখনও মালিক অশোক চট্টোপাধ্যায় বহুদূর সাগরপারে। মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। রীতিমত অনুশীলনের অভাবে কলম ভোঁতা হইয়া আসিয়াছিল, সেই কলমেই শান দেওয়ার সাধনায় লাগিলাম। নূতন সাহিত্য-জীবন—সাহিত্যের ভিত্তির উপর আত্মনির্ভরশীল জীবন আরম্ভ করিব। সূত্রপাতেই নিজের মনকে দৃঢ় করিবার জন্য মনে মনে ভুল-ভাঙার কবিতা "ভুল" লিখিয়া ফেলিলাম—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর তারিখে:

ভেবেছিলাম অজগরের মাথার মণি গেছে খ'সে,
তরঙ্গিণী হারিয়েছে তার বেগ;
ভেবেছিলাম চপল মন কঠিন হ'ল আপন দোষে,
পাষাণ সম হ'ল নিরুদ্বেগ!
যে ক্ষুরধার অস্ত্রখানি আঘাত 'পরে আঘাত হানি'
আমার হাতে ধরিয়াছিল শোভা,
সহসা কবে কাহার শাপে অসিবিহীন হস্ত কাঁপে
বাচাল যেন চকিতে হ'ল বোবা।

আকাশ ভুবন করিয়া কালো মুহুর্মুহু গর্জি রোষে
নিমেষে যেন উড়িল কালো মেঘ।
ভেবেছিলাম অজগরের মাথার মণি গেছে খ'সে
তরঙ্গিণী হারিয়েছে তার বেগ।

*　　　*　　　*

আবার কেন নূতন ক'রে প্রবল হাওয়া লাগিল পালে,
তরণী মোর হয়েছে বানচাল।
আবার কেন আশার ভাতি দিতেছে দেখা শুষ্ক ভালে
পড়ে না মনে হ'ল অনেক কাল।
তখন ছিল অনেক আশা—মনের মতই ছিল ভাষা,
ছিল অনেক খ্যাতি-যশের লোভ;
ঘনায়ে পুন আসিল মেঘ, হারিয়েছিল যে স্রোতোবেগ—
ফিরিয়া পেনু তবুও জাগে ক্ষোভ!
বিবাগী মন তবুও বলে, কাটিয়া এলে যে মায়াজালে
তারে ল'য়ে না বাড়ায়ো জঞ্জাল।
আবার কেন নূতন ক'রে প্রবল হাওয়া লাগিল পালে,
তরণী মোর হয়েছে বানচাল।

মধ্যদিনের প্রখর রবি অস্তাচলে পড়িছে ঢলি'
রৌদ্র মিলায় বেলা বহিয়া যায়—
যে পথ দিয়া একেলা আমি সঙ্গিহীন আসিনু চলি'
সে পথখানি ভরিল ইশারায়।
পুরানো মালা শুকায়ে গলে নবীন হ'ল চোখের জলে,
হারায়ে বাস সুবাস দেয় ফুল—
লেখনী পুন লইনু তুলি, ধূলিরে আর মানি না ধূলি,
থাক্ যতদিন থাকে মনের ভুল।
ঝরিয়া-পড়া ফুলের মনে ভাবনা, কবে আসিবে অলি,
শবের ছাতি ফাটিছে পিপাসায়—
মধ্যদিনের প্রখর রবি অস্তাচলে পড়িছে ঢলি'
রৌদ্র মিলায় বেলা বহিয়া যায়।

লেখনীর অব্যাহত শক্তিতে অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎঝলক খেলিয়া গেল, মনে আশার সঞ্চার হইল। ব্যাকুল-আগ্রহে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পথ

চাহিয়া রহিলাম। আমার মনে উৎসাহের সঞ্চার করিতে লাগিলেন কথায়—আমার সহকর্মী শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং কাজে বন্ধুবর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রেশম-পোকা গুটি কাটিতে কাটিতে সম্পূর্ণ নূতন আকাশ-বাতাসের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

একাদশ তরঙ্গ

মোক্ষারম্ভ

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অশোক চট্টোপাধ্যায় বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিলেন পুরা দেড় বৎসরেরও অধিক কাল পরে—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। 'প্রবাসী'র রাজত্ব তখন সম্পূর্ণ জ্যেষ্ঠের করায়ত্ত, কনিষ্ঠ আর আসর জমাইতে পারিলেন না। সুতরাং অবস্থা-পরিবর্তনের যে আশাজড়িত প্রতীক্ষায় ছিলাম তাহা সফল হইল না, কিঞ্চিদূর্ধ্ব ছয় বৎসরের আশ্রয় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কলেজ-জীবন অকালে খণ্ডিত হওয়া অবধি এতাবৎকাল 'প্রবাসী'-'শনিবারের চিঠি'র সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলাম, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁহার সরস মধুর সর্বগ্রাসী প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া বাংলা-সাহিত্যাকাশের বৃহত্তর বিস্তারে পক্ষ মেলিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সার্ আশুতোষ-পরিবারের "বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য"র লেখকরূপে, 'আত্মশক্তি'র বেনামী সমালোচকরূপে, 'বনে-জঙ্গলে'র গুপ্ত লেখকরূপে এবং 'যুগবাণী'র কর্ণধাররূপে তখন যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় অর্জন করিয়াছি; 'ভারতী'র ভাঙা দল ও 'কল্লোল'-'কালি-কলমে'র দলেরও কাহারও কাহারও সঙ্গে হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে পূর্বের দলীয়তার গণ্ডীও ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে, অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত-নিরপেক্ষভাবেও যে 'শনিবারের চিঠি' পুনঃপ্রকাশ করিতে পারি—এ বিশ্বাসও মনে জন্মিয়াছে।

বলি-বলি করিয়াও ক্ষুদ্রদাকে নানা কারণে মনের কথা খুলিয়া বলিতে দেরি হইতে লাগিল। অপ্রীতিকর আবহাওয়ার মধ্যে তিনি নিজেই তখন স্বস্তি পাইতেছিলেন না। অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণের জন্য তিনিও যে ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতেছিলেন, সে আভাসও পাইতেছিলাম। সুতরাং তাঁহার পরামর্শ চাহিয়া তাঁহাকে বিপন্ন ও ব্যথিত করা নিরর্থক বোধ করিলাম। মোহিতলাল দূরে থাকিলেও বরাবরই আমার শুভানুধ্যায়ী, মুরুব্বি বলিলেও চলে। সমস্ত

খুলিয়া লিখিয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিলাম। তিনি অত্যন্ত সাবধানী লোক, অনেক বুঝাইয়া, যুক্তি দিয়া আরও কিছুকাল ধৈর্য ধরিতে বলিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র লেখক ও শুভানুধ্যায়ী আরও যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকেই স্বাধীন হইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। মাহিগঞ্জ, রংপুর হইতে বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথ মৈত্র একটা শক্ত সমস্যার কথা তুলিলেন :

> শেষে একটা problem-[সমস্যা]-এর কথা বলি—হয় 'শনিবারের চিঠি'র সব্যসাচী সজনী দাস সত্য—অথবা 'অজয়'র গ্রন্থকার সজনী দাস সত্য। একটা সত্য হ'লে আর একটা অভিনয়। কোন্‌টা সত্য জানি নে। ভিতরে যদি আগুন থাকে তবে শুকনো পাতা চেপে তাকে নেবাতে যাওয়া বৃথা।

এই ইঙ্গিতমাত্র করিয়া রবি প্রশ্ন করিলেন, এইবার তুমি কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে চাও? আমি সহসা এই কঠিন প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতে পারিলাম না, কারণ আমার নিজের মনের মধ্যেও নিজের সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। 'অজয়' রচনা করিবার কালে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, কয়েক বৎসর পরে 'রাজহংসে'র কবিতাগুলি লিখিতে লিখিতে তাহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে; কিন্তু মধ্যবর্তী কালে প্রচুর দ্বিধা ও সংশয় ছিল যাহার পরিচয় আমার এইকালে রচিত "ব্যর্থতা" কবিতার মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। 'অজয়' যে-কবির জীবন-কাব্য, এই কবিতা তাহারই রচিত। কলহ-কোলাহল নিন্দা-প্রশংসা ব্যঙ্গ-পরিহাস কোন কিছুরই ভক্ত বা দাস সে নয়, তাহার সাধনা যেমন সহজ তেমনই কঠিন। তাহার প্রশ্ন শুধু :

> বাধা কখন ঘুচবে সখী, আঁধার কবে হইবে আলো—
> প্রদীপ-আলোয় দেখব কবে, কে তুমি এই প্রদীপ জ্বালো!

রবির সন্দেহ খুবই সমীচীন ছিল, এই কবির সহিত 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্তের যোগাযোগ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ ছিল না। তাই ছন্দোবদ্ধ পত্রে রবিকে ইঙ্গিতেই জবাব দিলাম :

> জীবন-প্রভাতে দীপ্ত অরুণালোকে
> অনেক আশায় তরণী ভাসানু জলে,—
> উচ্ছ্বাস ছিল অধীরতা ছিল মনে,
> শুনেছিনু সুর নদীজল-কলকলে।

কে অজানা দূর পার হতে দিল ডাক,
ভাবিনু 'মিথ্যা' পিছনে পড়িয়া থাক্,
চলার আবেগে তরণী দিলাম খুলি'
দৃপ্ত প্রভাতে নবযৌবন-বলে ;
পার হব—কোথা পার নাহি থাক্ জানা,
না হয় জুটিব দিক্‌হারাদের দলে।

নদীতে তখন ছিল না তো খরবেগ,
মনের কোণেতে ছিল না শঙ্কা-ভয় ;
গগনের বুকে ছিল না মেঘের রেখা,—
পূর্ব আকাশে সূর্য জ্যোতির্ময়।
অনুকূল বায়ে দিলাম তুলিয়া পাল,
অনেক আশায় ধরিয়া বসিনু হাল,
ছুটিল তরণী উচ্ছল কলরবে—
কূল মিলিবার না রহিল সংশয় ;
পৌঁছিনু কত নিত্য নূতন দেশে,
কত অজানার লভিলাম পরিচয়।

স্রোতের আঘাতে চলিতেছিলাম সুখে,
পথ-সম্ভারে ভরিল তরণীখান,
সুদূর হইতে তখনো শুনিনু কানে
সাগর-পারের আশা-ভরা আহ্বান—
"এস হে যাত্রী, এখানে পথের শেষ,
সকল খোঁজার হেথা পাবে উদ্দেশ,
এস এস এই চির আলোকের দেশে"—
হৃদয়ে জাগিল আলোকের জয়গান ;
তরতর করি চলিল তরণী মোর,
মধ্যগগনে সূর্য জ্যোতিষ্মান।

জানি না কখন গগনে উদিল মেঘ,
উত্তাল নদী বহে বেগে ক্ষুর-ধার,
প্রবল ঝঞ্ঝা গর্জি' আসিল ছুটি'—
নদী আর কূল আঁধারেতে একাকার।

ব্যাকুল হইয়া তুফানের আগে লড়ি,
ছিঁড়ে গেল পাল ছিঁড়ে গেল দড়াদড়ি,
অন্ধকারেতে না পাই পথের দিশা—
দূর আহ্বান পশে না শ্রবণে আর—
কোথায় চলেছি কিছু নাহি মোর জানা,
ব্যাকুল বক্ষে উঠিতেছে হাহাকার।

পথ-সঞ্চয় ফেলিলাম নদীবুকে—
ব্যর্থ ভারেতে তরণী ডুবিবে কি রে ?
কখনো অগাধ জলে করে টলমল,
কখনো সবেগে আঘাত হানিছে তীরে।
বেলা কত হ'ল—শেষ কিবা দিনমান,
কোন্ পথে যাই মিলে না সে সন্ধান,
ব'সে আছি শুধু ভাঙা হালখানি ধরি'
গভীর নিরাশা বক্ষ ফেলেছে ঘিরে ;
বিদ্যুৎ শুধু রহি রহি চমকায়
দীপ্ত কুঠারে তিমির-বক্ষ চিরে।

ভাঙিল কি তরী, ডুবিবে কি তরীখান,
আরো কত দূরে যাত্রা-পথের শেষ ?
কিছু নাহি জানি, পথ-হারানোর দুখে
ভুলিব কি আমি বৃথা-যাত্রার ক্লেশ !
প্রভাত-স্বপন মনে নাহি আর লিখা,
শুধু চোখে জাগে ব্যর্থতা-বিভীষিকা,
কোন্ পথে মোর মিলিবে সাগর-কূল—
আজি কোথা হায় মিলিবে সে উদ্দেশ ;
নাহি আর মনে যৌবন-অধীরতা,
পথ চলিবার নাহি আর সে আবেশ।

যাত্রা আমার ব্যর্থ হয়েছে ওরে,
হতাশা আমার চিত্ত ভরেছে হায় ;
কেটেছে তুফান অসীম সাগর-মাঝে—
আলো নাহি হেরি কোনো দূর কিনারায় ;

স্তব্ধ সাগরে ক্ষীণ তরঙ্গ জাগে,
দূরের রাগিণী কানে আর নাহি লাগে,
ডুবিব কখন তাহার আশায় আছি—
ভাঙা হালে তরী বহা যে বিষম দায় ;
কূলে ভিড়িবার নাহি আর মোর আশা,
তল মিলিবার রয়েছি অপেক্ষায়।

"ব্যর্থতা" নাম লইয়া এই পত্রই আমার 'আলো-আঁধারি'তে স্থান পাইয়াছে। রবি স্বভাবসুলভ সরস ভঙ্গীতে জবাব দিলেন, কুছ পরোয়া নেহি, আগে বাঢ়্হ।

সুতরাং আগে বাড়াই স্থির করিলাম।

ইতিমধ্যে আরও একটা বিভ্রাটের সম্মুখীন হইতে হইল। ঘোষ লেনের বাস আর না উঠাইলেই নয়, পরিবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেখানে আর কিছুতেই কুলাইতেছে না। প্রবাসী প্রেসের হেড কম্পোজিটর মানিকচন্দ্র দাস গোড়া হইতেই অর্থাৎ আমার একক ঘোষ লেনে বাসের সময় হইতেই সপরিবারে আমাদের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন, সরস্বতী নামা এক বৃদ্ধা একচক্ষু দাসী আমাদেরই উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া আসিয়া জুটিয়াছিল। 'মহাকালে' "রাহু-ভারত" মহাকাব্যের প্রথম কিস্তি প্রকাশ করিয়া সদ্য-পণ্ডিচেরী-ফেরত বারীনদা একদিন উপযাচক ভাবে আমার ঘোষ লেনের বাড়িতে মধ্যাহ্ন-ভোজনে আপ্যায়িত হইয়া শ্রীমান রঞ্জনকে "প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্" আখ্যা দিয়া-ছিলেন ; প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের আর কোনও দাবি না থাকুক, একসঙ্গে মানিক-বাবুর ও সরস্বতীর পূর্ণ সেবা গ্রহণের প্রবল দাবি ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই দুইজনই তাহাকে মানুষ করিতেছিলেন, কাজেই স্থানাভাবের অজুহাতে কাহাকেও ত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। বাড়ি ও বাসস্থান বিষয়ে যোগানন্দদা আমার চিরদিনের মুরুব্বি। অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া ৫সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের চারতলা বাড়িখানি তিনিই সন্ধান এবং সংগ্রহ করিয়া দিলেন, মাসিক ভাড়া আশি টাকা। একতলায় আমার বৈঠকখানা ও মানিক-বাবুদের বাস নির্ধারিত হইল, দ্বিতলে আমার লাইব্রেরি (আমার সঞ্চয় ও সংগ্রহ-দক্ষতায় তখনই বিপুলায়তন), শয়নঘর ও রান্নাঘর, ত্রিতলে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রাচী' মাসিক পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক মনোরঞ্জন চৌধুরী সপরিবারে (তাঁহার গৃহিণী ইন্দু

দেবীও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী) অধিষ্ঠিত হইলেন, বিখ্যাত "কাজল-কালি"র শ্রীহিতেন্দ্র নন্দী হইলেন তাঁহাদেরই স্বয়ং-ব্যয়বাহী অতিথি; চারতলার একখানি ঘর কিছুদিন খালি ছিল, পরে "বিশাল ভারত হিন্দী পুস্তকালয়ে"র মালিক শ্রীঅযোধ্যা সিং সপরিবারে তাহা অধিকার করিলেন। শহরের প্রায় উপান্তে বহু বিচিত্রের সম্মিলনে আমরা প্রায় এক-পরিবারভুক্ত হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে লাগিলাম।

অদলবদলের হাঙ্গামাকে বিভ্রাট বলিলাম বটে, কিন্তু আসলে এই বাড়িতেই কল্যাণ নানা মূর্তিতে আমাকে দেখা দিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ণ ঘোষ লেনের বদ্ধ ঘিঞ্জি আবহাওয়া হইতে সহসা উদার উন্মুক্ততার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেন বাঁচিয়া গেলাম। বাড়ির পূর্বভাগেই বৃহৎ বৃহৎ কাঠের গোলা, তাহার পরেই খাল। সকাল-সন্ধ্যা সুন্দরবন হইতে সুঁদরিকাঠ-বোঝাই নৌকা আসিয়া আমাদের খালঘাটে লাগে, একটা তীব্র অথচ মিষ্ট গন্ধ পাই, অজ্ঞাত অপরিচিত হিংস্র-শার্দুল-সর্প-সমাকুল অরণ্যের আভাস মনের পটে ভাসিয়া উঠে। সুঁদরি-কাঠ-ধোওয়া রাঙা জলে মনও রঙিন হইয়া উঠে, শহরের মধ্যে থাকিয়া শহরের ক্ষুদ্রতা-সঙ্কীর্ণতাকে ফাঁকি দেওয়ার উল্লাস মনে জাগে। কলিকাতার পাষাণ-কারাগারে বন্দী হইয়া প্রায় এক যুগ পরে বিস্মৃত পল্লীপ্রকৃতির মধুর স্পর্শ গায়ে আসিয়া লাগে।

প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও দক্ষিণ হস্তের স্পর্শ পাই। কন্যা উমা তখন সবে হামাগুড়ি ছাড়িয়া হাঁটি-হাঁটি পা-পা শুরু করিয়াছে, মানিক-বাবু-সরস্বতীর স্নেহসম্বর্ধনা-লালিত খোকনের তুলনায় উমার অবস্থা ছিল প্রায় ঘুঁটেকুড়ানীর কন্যার সামিল, অবহেলার মধ্যেই সে মানুষ হইতেছিল; গুট্‌গুট্ করিয়া কোনরকমে সকলের অজ্ঞাতসারে চৌকাঠ ডিঙাইয়া অন্ধগলিতে গিয়া পড়ে, খানিকক্ষণ পরে খোঁজ্ খোঁজ্ সাড়া পড়িয়া যায়। কল্যাণের দক্ষিণহস্ত প্রথম তাহারই দিকে প্রসারিত হয়।

আমাদের লাইনে গলিতে তিনখানি মাত্র বাড়ি—৫এ, ৫বি ও আমাদের ৫সি। ৫বি একটি স্কুলবাড়ি। ৫এতে থাকিতেন নাটোরের ভাগিনেয় ও ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের জামাতা ব্রজেন্দ্রবাবু—বাংলা দেশের ডবল আভিজাত্যের অনুগ্রহপুষ্ট হালি নবাবির শেষ নিদর্শন সম্ভবত। দিনের আলোর সঙ্গে চিরন্তন বিবাদ বংশপরম্পরায় তিনিও বজায় রাখিয়া চলিতেন, সুতরাং তাঁহাকে কখনও দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। বহু বৎসর পরে তাঁহার পুত্র বিমলাকান্তের বিবাহে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহারই গৃহিণী শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কন্যা হেমন্তবালা দেবীই আমার নবভাগ্যোদয়ের শুকতারা।

উমা প্রথম পদক্ষেপের নেশায় টলিতে টলিতে গলির শেষ প্রান্ত অর্থাৎ বড়রাস্তার ধার অবধি চলিয়া যায়, তিনি বারান্দা হইতে তাহাকে লক্ষ্য করেন এবং পরিচারিকা পাঠাইয়া উপরে ধরিয়া লইয়া যান—ইহাই হইল দুই পরিবারের আলাপের সূত্রপাত। অনিচ্ছুক সরস্বতী সুধারাণীর সকাতর অনুরোধে গজগজ করিতে করিতে দুষ্ট মেয়েটাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া সন্ধান লইয়া আসে, মেয়ে জমিদার-গৃহিণীর সহিত বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত, এখন আসিবে না, পরে তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। পরে সে সত্যই আসে একেবারে পুতুল-খেলনার ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই ঘটিতে লাগিল। সুতরাং জমিদার-গৃহিণীর সহিত মধ্যবর্তিনীর মাতার অর্থাৎ আমার গৃহিণীর পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না। এ-পক্ষের মত ও-পক্ষেরও এক পুত্র এক কন্যা, তবে তাহারা বয়সে বড়। ও-পক্ষের কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী অচিরাৎ সুধারাণীর ভগ্নী ও সখী-পর্যায়ভুক্ত হইলেন। সেই সুবাদে হেমন্তবালা দেবী হইলেন আমাদের মাসীমা। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইলে আমি তাঁহাকে মা বলিলাম, তিনিও আমাকে চিঠিপত্রে ছেলে সম্বোধন করিলেন। আজ শতাব্দীপাদ ধরিয়া সেই সম্পর্ক বজায় আছে।

গোড়ায় তাঁহাকে একজন স্নেহশীলা প্রতিবেশিনীমাত্র জ্ঞান করিয়াছিলাম; কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতে বুঝিতে পারিলাম, সহজ মধুর সম্পর্কও কঠিন বিপদের কারণ হইতে পারে। মাতা হেমন্তবালা ও কন্যা বাসন্তী পরিচারিকাবাহিত চিরকুট মারফত আমার জবাব দাবি করিয়া গৃহিণীকে সাহিত্য-বিষয়ক এমন সব প্রশ্ন যখন-তখন করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন যে, আবার বাড়ি বদল করিব কি না সে ভাবনায়ও পড়িতে হইয়াছিল। ক্রমশ বুঝিতে পারিলাম, মাতা সাহিত্যের তথা চিন্তারাজ্যের গভীরতম প্রদেশের অধিবাসী, কন্যা বাসন্তী বাহিরের টুকিটাকি সংবাদ-আহরণে ব্যগ্র। কন্যার প্রশ্নের জবাব দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু মাতার সাহিত্যিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

অল্পদিনের মধ্যেই জানিতে পারিলাম, তিনি প্রশ্নে প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথকেও নিত্যনিয়মিত জর্জরিত করিয়া থাকেন। একান্ত রবীন্দ্র-পরিবেশের বাহিরে রবীন্দ্রনাথের যত ভক্ত দেখিয়াছি, হেমন্তবালা দেবীর সহিত কাহারও তুলনা হয় না। সাহিত্যে তাঁহার শিক্ষা স্বয়ংলব্ধ, রবীন্দ্রনাথের তিনি একলব্য-উপাসিকা। তিনি গোঁড়া অভিজাত ব্রাহ্মণ-পরিবারের নানা দুর্নিবার সংস্কারের অধীন হইয়াও রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ও সংস্কারমুক্তির শিক্ষাপ্রভাবে দোটানায় পড়িয়া বিবিধ সংশয়-নিরসনে রবীন্দ্রনাথকে বিব্রত করিয়া তোলেন। বিপন্ন

রবীন্দ্রনাথের সংশয়-ছেদন-প্রয়াস ১৩৩৮-৩৯ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'তে "পত্রধারা" শিরোনামায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, মূল-প্রশ্নকারিণীর পত্রগুলি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। হইলে রবীন্দ্রনাথের জবাবের সহিত মিলাইয়া পড়িবার সুযোগ সকলের হইত এবং এই সংশয়লাঞ্ছিত মহিয়সী মহিলার দুরূহ চিন্তাশক্তি এবং তাঁহার সাবলীল প্রকাশক্ষমতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইতেন। তাঁহার অনেক রচনা পরে 'শনিবারের চিঠি'তে নামে ও বেনামে প্রকাশিত হইয়াছে।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাতা অচিরকাল মধ্যে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার উপাস্য রবীন্দ্রনাথ ও নবলব্ধ পুত্রের মনান্তর দুস্তর হইলেও দুরতিক্রম্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার অপরিসীম ভক্তির কথাও তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। এই ব্যবধান তাঁহাকে পীড়িত করিত এবং গোপনে গোপনে দেবতার ও ভক্তের পুনঃসংযোগ স্থাপনে তিনিই যে পুরোহিতের ভূমিকা লইয়াছিলেন তাহা পরে জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি যখন আঘাতে আঘাতে বীতরাগ রবীন্দ্রনাথকে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত মনে করিতেছিলাম, তখনই যে হেমন্তবালা দেবী সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পত্রে আমারই দৈনন্দিন কৃতকর্মের ও পারিবারিক খুঁটিনাটির খবর দিয়া তাঁহাকে আমার প্রতি ক্ষমাশীল ও স্নেহশীল করিবার প্রবল চেষ্টা করিতে-ছিলেন তাহা যখন জানিতে পারিলাম, তখন কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরিয়া গেল। তাঁহার সহৃদয় চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, এবং সফলতার দ্বারাই ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে।

নূতন বাড়ির সর্বাধিক কল্যাণ-প্রসূতা প্রকাশ পাইল 'শনিবারের চিঠি'র পুনরাবির্ভাবে। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র (২৬ আগস্ট ১৯৩১, বুধবার) আমার ৩১তম জন্মদিনে বন্ধুবান্ধবদের হৈ-হল্লার মধ্যে সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। আমার ডায়ারিতে দেখিতেছি, প্রবাসী প্রেসের ম্যানেজারের ঘরে সেদিন প্রায় সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন—অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন দে, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমাপ্রসাদ দাস। ছাপাখানার ছুটির পর ব্রিজখেলার আড্ডা চলিতেছিল। খেলিতে খেলিতেই স্থির হইয়া গেল, 'শনিবারের চিঠি' পুনঃ-প্রকাশিত হইবে এবং এবার নিজস্ব ছাপাখানা হইতে। টাইপ-কেস-র‍্যাক ইত্যাদি খরিদ করিবার জন্য বন্ধুবর রমাপ্রসাদ নয় শত টাকা ঋণ দিবেন ঘোষণা করিলেন।

পরদিন হইতেই তৎপর হইলাম। গৌরীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শিতায় তখনও পুরাতন আপিসের অর্থাৎ রঞ্জন প্রকাশালয়ের ঠাটটা বজায় ছিল; কিন্তু

ছাপাখানা বসাইতে হইলে উপযুক্ত ঘরের প্রয়োজন—তা হউক না আপাতত যন্ত্রহীন ছাপাখানা। কারবালা পুষ্করিণীর ঠিক দক্ষিণে বিডন স্ট্রীটের উপরেই একতলা কতকগুলি দোকানঘর সদ্য নির্মিত হইয়াছিল। সন্ধান লইয়া জানা গেল, সুকিয়া স্ট্রীটের মহেন্দ্র শ্রীমাণি বাড়ির মালিক। তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। পুরাতনপন্থী নিষ্ঠাবান রাসভারী ভদ্রলোক, তাঁহার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে একটা আভিজাত্যের প্রকাশ ছিল। তিনি আমাকে নামে চিনিতেন। ব্যবসায় সম্পর্কে বিস্তর সদুপদেশ দিয়া বিডন স্ট্রীটের পাশাপাশি দুইখানি ঘর তিনি আমাকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পহারে ভাড়া দিলেন। অর্থাৎ ছাপাখানার একটা ঠিকানা হইল—৩২।৫।১ বিডন স্ট্রীট। ইহারই একান্ত সংলগ্ন ডাফ হস্টেলেই আমার কলিকাতা-বাসের গোড়াপত্তন। সুতরাং গোড়া হইতেই ছাপাখানা বাড়ির প্রতি একটা মমতা জন্মিল। রক্ষিত কোম্পানিকে হরফ ইত্যাদি এবং সামন্ত কোম্পানিকে কেস র‍্যাক ইত্যাদির অর্ডার দিয়া লেখা-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলাম। দূরে যাঁহারা ছিলেন অর্থাৎ মোহিতলাল, সুশীলকুমার, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বনবিহারী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সকলকেই আমাদের সঙ্কল্প বিজ্ঞাপিত করিয়া দীর্ঘ পত্রে, লেখার জন্য আবেদন জানাইলাম। আমাদের সৌভাগ্য, প্রায় সকলেই অচিরাৎ সাড়া দিলেন। কলিকাতা-সফরও নিষ্ফল হইল না, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী "মহাত্মা" নামে একটি চমৎকার কবিতা দিলেন। শত্রুপক্ষীয় ব্রজেন্দ্রনাথও নিরাশ করিলেন না, তিনি পুরাতন 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলেন। কবি কৃষ্ণধন দে একটি কবিতা ও একটি গল্প দিয়া শনিমণ্ডলীভুক্ত হইলেন। সর্বাপেক্ষা অভিভূত করিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত "হিঙ্গুলী-দর্শন" নামে একটি অপরূপ অশ্রুসিক্ত ব্যঙ্গরচনা দিয়া—ঠিক এই ধরনের "স্যাটায়ার" বাংলা-ভাষায় সামান্যই রচিত হইয়াছে। মোহিতলাল, সুশীলকুমার ও রবীন্দ্র মৈত্র তো কোমর বাঁধিয়াই আমার মোক্ষসাধনায় সাহায্যার্থ আগাইয়া আসিলেন, হরিপদ রায় ছবির পর ছবি আঁকিতে লাগিলেন, এমন কি উদাসীন যোগানন্দও যোগ দিলেন; গীতাপন্থী "মা ফলেষু কদাচন" অশোক চট্টোপাধ্যায় কবিতার বান ডাকাইয়া দিলেন। মোটের উপর অল্প কয়েক দিনের চেষ্টায় লেখার আয়োজন যাহা হইল, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। আমার স্বাধীনতা-সঙ্কল্পে সর্বাধিক সমর্থক রবীন্দ্রনাথ মৈত্র শুধু "হরিকুমারের বাণী" পাঠাইয়াই নিরস্ত হইলেন না, তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি "ত্রিলোচন কবিরাজ"কেও পাঠাইলেন। বস্তুত, এই নবপর্যায় 'শনিবারের চিঠি'কে আত্মনির্ভরশীল ও প্রতিষ্ঠাপন্ন করিবার জন্য তিনিই সর্বাধিক সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার পর

তিনি কিঞ্চিদধিক এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই এক বৎসরেই অপরিমেয় সাহিত্যিক দানে নবজন্মান্তরিত 'শনিবারের চিঠি'কে পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন।

লেখা কম্পোজ ও গেলিবদ্ধ হইয়া মানিকতলা স্ট্রীটের একটি যন্ত্রে ফর্মায় ফর্মায় মুদ্রিত হইতে লাগিল এবং আশ্বিন মাসের পয়লা তারিখেই (২৭ সেপ্টেম্বর) প্রায় দুই বৎসর পরে 'শনিবারের চিঠি' পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল নিজস্ব শনিরঞ্জন প্রেস হইতে। আমার জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন। সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত ইহা যথারীতি প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে এবং অন্যান্য বহু ব্যাপারে মাথা গলাইতে হইলেও ইহাই এখন পর্যন্ত আমার স্বাধীনতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নিজস্ব ছাপার যন্ত্রও হইয়াছে।

দীর্ঘ দুই-যুগ-কালের কৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়া আমাদের সেদিনের অবস্থার কথা ভাবিবার চেষ্টা করিতেছি। নূতন পরিবেশের একটা খণ্ডিত পরিচয় 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে। এ যুগের পাঠককে তদানীন্তন স্থান-কাল-পাত্রের কিঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্য তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—'শনিবারের চিঠি'র ইতিহাসে এই নূতন করিয়া পথ চলার মুহূর্তে সম্পাদকের মনের সংশয়-সন্দেহ সাময়িক হইলেও স্থান পাইবার যোগ্য। "সংবাদ-সাহিত্যে"র গোড়াতেই যদিও এই বলিয়া মনকে চোখ ঠারিয়াছিলাম :

> শাস্ত্রমতে ভগবান নিরন্তর ধরাধামে বসবাস করেন না, বা 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষে'র মত বরাবর নির্দিষ্ট তারিখে আবির্ভূত হন না; তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। যুগের সঞ্চিত পাপভারে মেদিনী যখন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, মানুষের ন্যায়-অন্যায়-বিচারবোধ রহিত হয়, দুষ্টের অত্যাচারে শিষ্টেরা লাঞ্ছিত হয়, তখনই অবতাররূপে ভগবানের আবির্ভাব হয়।
>
> পুরা দুই বৎসর পর 'শনিবারের চিঠি'র পুনরাবির্ভাব হইতেছে যুগের প্রয়োজন ঘটিয়াছে বলিয়াই; 'শনিবারের চিঠি' ভগবান নহে, অবতারও নহে; তবে সে বলে, 'সম্ভবামি যুগে যুগে।'

কিন্তু এই বড়াই সত্ত্বেও যুগের আসল প্রয়োজন যে কি, তাহা লইয়াই ছিল তাহার সংশয় দ্বিধা এবং বেদনা, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত রচনায় :

> সমস্ত দ্বিপ্রহর অফিসের খোলা দরজার পথে ঊর্ধ্বে ধূম্রকলঙ্কিত লঘু খণ্ডমেঘাচ্ছাদিত আকাশ এবং নিম্নে ইটকাঠরাবিশ ও পুরাতন লোহে ভরাট অতীতের কারবালা পুষ্করিণীর বর্তমান অসমতল বীভৎস রূপ ও তাহারই আশেপাশের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অট্টালিকা এবং নোংরা বস্তির ছাদ দেখিতে

দেখিতে মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বস্তুর ভূমিখণ্ডের মাঝখানটায় পূর্বসমৃদ্ধ জলাশয়ের ভারাক্রান্ত জলাবশেষ যেখানে পঙ্কশয্যায় বাষ্পবুদ্বুদের দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল—রৌদ্রক্লান্ত মোটবাহী গাড়ির মহিষগুলি দ্বিপ্রহরে আজিও বপ্রক্রীড়ায় যে পঙ্কিল জলভাগকে আলোড়িত করিতে দ্বিধা করে নাই—তাহাও এখন আর দেখা যায় না, জমির মালিক সম্মুখে ঘর তুলিয়া সে আরামটুকুকেও অন্তরাল করিয়া দিয়াছে। সম্মুখের বস্তির মেথরদের অপোগণ্ড শিশুরা বহু কষ্টে সংগৃহীত অর্থে ক্রীত বিয়ারের বোতল লইয়া ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে এখন আর প্রত্যেকে এক-একটি ছোট্ট মাটির খুরি ও ঘুগনির চাট লইয়া মৌতাত করিতে বসে না, চারিদিকে প্রাচীর উঠিয়াছে, তাহারা হয়তো দেওয়ালের ওপারেই রোজকার মত মৌজ সারিয়া লইয়াছে। বিশ্বকর্মাপূজা কবে শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ ঘুড়ি উড়াইয়াও কেহ চোখের অবকাশ সৃষ্টি করে নাই। একটা এরোপ্লেন ও একটা দিক্‌ভ্রষ্ট মাতাল ফানুষ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য মনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। আজিকার খোরাক সেইটুকুই।

পাশের কামরার দপ্তরীরা আমার অফিসঘরের সম্মুখের খোলা মেটে বারান্দায় তাহাদের উদ্বৃত্ত দুইখানি চৌকি ফেলিয়া রাখিয়াছিল তাহারই একটাতে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম, ধোঁয়াটে নীল আকাশে কেমন করিয়া আসন্ন শীতের কুয়াশায় ম্লান কালো অন্ধকার নামিয়া আসে। মাথাটা একটু ধরিয়াছিল। পূর্বদিগন্তের পটভূমিতে টালিছাদওয়ালা তেতলা বাড়ি এবং আমার অতি প্রিয় নিষ্পত্র অষ্টাবক্র বৃক্ষপঞ্জরটিও যখন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন পশ্চিমদিগন্তে মুখ ফিরাইলাম। ধোঁয়া আর অন্ধকারের পীড়নে পশ্চিমাকাশের রঙের শেষ আমেজটুকুও মিলাইয়া আসিতেছিল; ভূতপূর্ব ডাফ হোস্টেলের বিপুলায়তন কোণাটা খাড়া পাহাড়ের মত চোখের সামনে ধীরে ধীরে কালো হইয়া রেখামাত্রে পর্যবসিত হইয়া গেল। বসিয়া বসিয়া দেশের বর্তমান দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা মাথায় ভিড় করিয়া চোখের পাতাকেও ভারী করিয়া তুলিতে লাগিল—ভাগ্যে বিদেশী [বেয়ারা] তখন তোলা উনুনটায় কয়লা দিয়া আগুন ধরাইয়াছে—ধোঁয়ার বন্যাস্রোত আমার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে আমার মাথাটা একটু হালকা হইল। ভাবনার তবু বিরাম নাই। ভাবিতে লাগিলাম—রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স তো ফাঁসিয়া গেল, মহাত্মা গান্ধী দেশে ফিরিতেছেন।

আবার আইন অমান্য শুরু হইবে; খবরের কাগজগুলা পড়িয়া মনে হয়—নেতারা জনসাধারণকে উপদেশ দিবার জন্য কেহই বাহিরে থাকিবেন না! যিনি দোর্দণ্ড প্রতাপে বিদ্রোহী আয়র্লণ্ডকে শাসন করিয়াছেন* বাংলা দেশের ভাগ্যে তিনিই আসিলেন গবর্নর হইয়া! এমনিতেই তো বেকার বাঙালী যুবকের ভাবনার অন্ত নাই—অর্ডিনান্স-প্রপীড়িত দেশে তাহারা কি নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে? ভাবিতে ভাবিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দুর্গতির কথা, সাহিত্য বেচিয়া এই দুর্দিনে অন্নসংস্থানের কথাও মনে হইল। হাসিয়া, দাঁত দেখাইয়া, মুখ ভ্যাংচাইয়া, সমালোচকের চাবুক হাতে রসসৃষ্টি ও রসভঙ্গ করিবার সময় আর থাকিবে না—'শনিবারের চিঠি'কে হয়তো ভিন্ন মূর্তি ধরিতে হইবে—তা ছাড়া কাগজ কিনিয়া পড়িবে কে? ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনা-সমুদ্রে কোনই কূল-কিনারা দেখিলাম না।

এই সংশয়-তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথে নূতন যাত্রারম্ভ, অধীনতাপাশ তখনও ছিন্ন হয় নাই; কিন্তু শৃঙ্খলভঙ্গ-প্রয়াসের বেদনায় আমার সমস্ত সত্তা কম্পিত মথিত হইতেছিল, 'শনিবারের চিঠি'র মলাটে মুরগির বদলে আমি রক্তজবার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আমার সে স্বপ্ন সফল হয় নাই—অনেক পরিবর্তন, অনেক বিপর্যয় সত্ত্বেও মুরগি মুরগিই রহিয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ তরঙ্গ

৭ই অক্টোবর

নবপর্যায় 'শনিবারের চিঠি' প্রথম সংখ্যা এক হাজার কপি ছাপা হইয়াছিল। দুই বৎসর পূর্বে হঠাৎ বন্ধ হইবার কালে যে সকল গ্রাহকের চাঁদা সম্পূর্ণ শোধ হয় নাই, সর্বাগ্রে পুরাতন ঠিকানাতেই তাঁহাদের কাগজ পাঠাইলাম, সংখ্যায় অবশ্য তাঁহারা মুষ্টিমেয় ছিলেন। বাকি কপি সপ্তাহকাল মধ্যে নিঃশেষে নগদ দামে (প্রতি সংখ্যা ।০) বিকাইয়া গেল। এই অভূতপূর্ব চাহিদার দুইটি মাত্র প্রত্যক্ষ কারণ ছিল—কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "হিজলী-দর্শন" এবং রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের "ত্রিলোচন কবিরাজ"। অনুমান করি, "হিজলী-দর্শনে"র গৌরবভাগই অধিক। সরকারী দমননীতি তখন প্রবলতম

* সার্ জন অ্যাণ্ডারসন

আকার ধারণ করিয়াছিল, কাহারও বেফাঁস কিছু বলিবার বা লিখিবার উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর (১৯৩১) রাত্রে হিজলী-বন্দীনিবাসে কয়েকজন "অশান্ত" রাজনৈতিক কয়েদীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য গুলি পর্যন্ত চলিয়া গেল। অসহায় বন্দীরা তদানীন্তন লাটসাহেবের নিকট প্রতিকারের আবেদন মাত্র এই ভাবে করিতে পাইলেন—"বন্দীদের ব্যারাকের মধ্যে শোবার ঘরে, খাবার ঘরে ও হাসপাতালে গুলিবর্ষণ করা হইয়াছিল। তাহার ফলে দুইজন বন্দীর মৃত্যু হয় এবং বিশজন আহত হয়। বিনা কারণে পূর্ব হইতে পরামর্শ করিয়া এবং অন্যায়রূপে এই গুলিবর্ষণ হইয়াছে। এই সম্বন্ধে গভর্মেণ্ট যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিদ্বেষমূলক এবং কল্পিত কথায় পরিপূর্ণ। এই ঘটনার তদন্তের জন্য বে-সরকারী কমিটী নিযুক্ত হইলে বন্দীরা তাহার সম্মুখে উক্ত বিবরণ যে মিথ্যা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে পারিবে।" মহাত্মা গান্ধী তখন রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স উপলক্ষে বিলাতে। এত বড় সরকারী অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলিবার উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতা কেহ ছিলেন না। দীর্ঘ বারো বৎসর (১৯১৯-৩১) অর্থাৎ জালিয়ান-ওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডের পরে পুনরায় ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় দেশ, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মুখাপেক্ষী হইল হৃদয়-জ্বালা প্রশমনের আশায়। রবীন্দ্রনাথ সেই ২৫ বৈশাখে সত্তর অতিক্রম করিয়াছেন। ৩০ ভাদ্র হিজলীতে ওই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিল। নিরুপায় দেশবাসী অসুস্থ ও অক্ষম কবিকেই কলিকাতার গড়ের মাঠে* উপস্থিত করিলে তিনি বলিলেন, "এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক; কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে।" আরও অনেক মর্মান্তিক কথা রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলিয়াছিলেন, এবং প্রকৃতপক্ষে সেই দিনই ভারতে ব্রিটিশ-শাসন-অবসানের ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছিলেন; কিন্তু এই ঘটনার স্মৃতিকে বাংলা-সাহিত্যে তিনি অক্ষয় করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সুবিখ্যাত "প্রশ্ন" কবিতার মধ্যে; রাজনীতি এইখানে সাহিত্যের নিকট চিরঋণী হইয়া আছে। কবির এই চিরন্তন প্রশ্নের শেষ জবাব ভগবান কখনও দিবেন কি না জানি না, কিন্তু রাজনীতি এখনও দিতে পারে নাই।

---

* ২৬ সেপ্টেম্বর মনুমেণ্টের পাদদেশে লক্ষাধিক লোকের সভায় কবি সভাপতিত্ব করেন।

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।

—হিজলী-বন্দীশালার বীভৎস নিশীথ অত্যাচার-কাহিনীর ইহাই সাহিত্যিক রূপ, চিরন্তন এবং শাশ্বত—করুণা ও বেদনা-মণ্ডিত রূপ। কিন্তু এই ঘটনারই যে ব্যঙ্গমণ্ডিত দ্বিতীয় রূপ হইতে পারে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে কবি যতীন্দ্র-নাথের "হিজলী-দর্শনে"। ইহাও রাজনীতিক্ষেত্রে সাহিত্যিকের চিরন্তন দান। এই দানের আরম্ভটা এইরূপ :

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩১) রাত্রিকালে মেদিনীপুর জেলার হিজলীক্ষেত্রে তত্রত্য বন্দীফৌজের সহিত আমাদের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের গবর্নমেণ্টই জয়লাভ করিয়াছেন। বিপক্ষ পক্ষে ২ জন হত ও ২০ জন আহত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের গবর্নমেণ্ট পক্ষে কোন ক্ষতি হয় নাই, কেবল যুদ্ধের পূর্বে ভারপ্রাপ্ত সহকারী সেনাপতি কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিপক্ষ বন্দীফৌজের সকলেই armed অর্থাৎ হস্তযুক্ত ছিল। তদুপরি তাহাদের মধ্যে অনেকে মশারি টাঙাইবার ভীষণ কাষ্ঠ-শলাকা, ইষ্টকখণ্ড, সোডার বোতল ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণ-কৌশলও অতি চাতুর্যের সহিত আরব্ধ হইয়াছিল, কারণ তাহারা প্রথমে কোথায় আক্রমণ করিতে যাইতেছিল তাহা আজ পর্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। গবর্নমেণ্ট-সৈন্যবাহিনীর হস্তে বন্দুক ও সঙ্গীন ছাড়া কিছুই ছিল না। তথাপি বিপক্ষ দল যে অল্প সময়ের মধ্যে পরাভূত হইয়াছিল ইহাতে আমাদের গবর্নমেণ্ট-বাহিনীর অদ্ভুত বীরত্ব ও রণচাতুর্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় হইতে বড়লাটের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শেষ এইরূপ :

রাজা কহিলেন, হে অমাত্য! অমাত্য কহিলেন, হে সামন্ত! সামন্ত কহিলেন, হে নগরপাল! নগরপাল কহিলেন, হে কনিষ্ঠবল! অর্থাৎ রাজা কহিলেন, হে কনিষ্ঠবল, রাজধর্মের পরমপারদর্শী তুমিই আমার চরমবন্ধু, অতএব তুমি শিষ্ট। আমি তোমায় শেষ পর্যন্ত পালন করিব। দুষ্টের দমনে তুমি আমার চিরসহায় থাকিও, দেখিও, পরমপবিত্র রাজধর্ম পালন হইতে আমি যেন ভ্রষ্ট না হই।

রবীন্দ্রনাথের "প্রশ্ন" বিলম্বে মাঘ (১৩৩৮) মাসের 'প্রবাসী'তে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু সদ্য সদ্য অর্থাৎ ঘটনার দেড় সপ্তাহের মধ্যেই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত এই প্রতিবাদের দুঃসাহসিকতায় দেশের লোক যে আশ্বস্ত ও প্রীত হইয়াছিল, তাহারই প্রমাণ সপ্তাহকালের মধ্যে 'শনিবারের চিঠি'র নিঃশেষ বিক্রয়ের মধ্যে আছে।

সপ্তাহকালের মধ্যেই নামডাক হইল, প্রত্যহ মনি-অর্ডার-যোগে নূতন গ্রাহকদের চাঁদা আসিতে লাগিল। তখন প্রোপ্রাইটার এবং কুক আমি একা, সুতরাং মনি-অর্ডার কুড়াইতে বেলা দশটা হইতে এগারোটা পর্যন্ত আমাকে বিডন স্ট্রীটের আপিসে হাজিরা দিতে হইত। বেলা এগারোটা নাগাদ প্রবাসী প্রেসে গিয়া ম্যানেজারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতাম, অবশ্য প্রাতে অন্তত তিন ঘণ্টা সেখানে থাকিয়া তবে বিডন স্ট্রীটে যাইতাম। 'শনিবারের চিঠি' পুনঃপ্রকাশিত না হইলে এই ঘণ্টাখানেকের অনুপস্থিতি কর্তৃপক্ষ সহজেই বরদাস্ত করিতেন, অবশ্য আমার কাছে সরাসরি অনুযোগ তাঁহারা কখনও করেনও নাই। কিন্তু ৭ই অক্টোবর তারিখে অনেকগুলি মনি-অর্ডারের ভার পকেটে লইয়া সেই প্রসন্ন শারদ প্রাতে শরতের মেঘের মত হাল্‌কা মন লইয়া বিডন স্ট্রীট হইতে সারকুলার রোড ধরিয়া আসিতেছি, বিপরীতগামী পবিত্রদার (গঙ্গোপাধ্যায়) সঙ্গে মুখামুখি হইল। তিনি বিষণ্ণ ম্লান মুখে অনুরোধ করিলেন, আপনি এই সময় বিডন স্ট্রীটে যাইবেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, অ্যাক্‌টিং জেনারেল ম্যানেজার ইহাতে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। ক্লান্ত উটের কোমর ভাঙিবার পক্ষে এই সামান্য সংবাদই শেষ খড়-গাছার কাজ করিল। ম্যানেজারের গৌরবময় আসনে বসিয়াই একটি সংক্ষিপ্ত পদত্যাগপত্র রচনা করিয়া অশোক চট্টোপাধ্যায়ের (তিনি তখনও জেনারেল ম্যানেজার) প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তাঁহার গাড়ির আওয়াজ পাইয়াই বাহিরে গেলাম এবং গাড়ির দরজা খুলিয়া পাদানে দাঁড়াইয়াই তাঁহার হাতে পত্রটি সমর্পণ করিলাম। তিনি এক নজর দেখিয়াই বলিলেন, পাগলামি ক'রো না। চল, ভেতরে চল। শেষ পর্যন্ত তাঁহার নির্বন্ধাতিশয্যে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়া বিনা বেতনে ছয় মাসের ছুটির দরখাস্ত পেশ করিতে হইল এবং তাহা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুরও হইল। খুদুদা একটু ধরা গলায় শেষ এই কথা বলিলেন, যদি সামলাতে না পার এইখানেই ফিরে এসো, আমি থাকলে তোমার জায়গাও থাকবে। আমার শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা তখন তাঁহার কিছুই অবিদিত ছিল না; আমি যে ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতেছি, এই আশঙ্কা তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছিল। কিন্তু আমি তখনই

এই বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলাম যে, মরিয়া গেলেও আর ফিরিয়া আসিব না।

বেলা তখন একটা। উপরে সম্পাদকীয় বিভাগে মহাশত্রু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এত বড় গৌরবের সংবাদটা দিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন। বিদায় লইবার অছিলায় তাঁহার নিকট গিয়া হাসিমুখেই বলিলাম, আপনাদের নিষ্কণ্টক করিয়া আমি বিদায় লইলাম ব্রজেনবাবু। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। হয়তো ভাবিলেন, শত্রুর এ এক নূতন চাল। বিস্মিতও তিনি কম হন নাই। কিন্তু তাঁহাকে অধিকতর গবেষণার অবকাশ না দিয়া যেন বিশ্বজয় করিয়াছি এইভাবে গর্বিত পদক্ষেপে নীচে আসিলাম। বিপদে-আপদে দেখিতাম ও সাহায্য করিতাম বলিয়া ছাপাখানার কর্মচারীরা আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহারা সকলে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, অনেকের চোখে স্বতঃ-উৎসারিত জল। আমার চোখও ভারী হইয়া আসিল। কোনও রকমে বিদায় লইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত-চিত্তে বিডন স্ট্রীটের আপিসে আসিয়া বসিলাম। বাড়িতে খাইতে যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। গৃহিণী পুত্র কন্যা ও সরস্বতী সহ সংসার তখন পাঁচজনের, অথচ পনেরো দিনের সংস্থান সঞ্চিত নাই। ঋণ আছে প্রচুর। কোনও দিকে কোনও আশার দীপভাতি দেখিতেছিলাম না। মানিকবাবুকে দিয়া বাড়িতে সংবাদ পাঠাইয়া পাশের চা-খানা হইতে চা আনাইয়া আপিসের চেয়ারে বসিয়া ভবিষ্যৎ-নির্ধারণের জন্য ভাবিতে লাগিলাম। দ্বিতীয় বা কার্তিক সংখ্যার কপি প্রেসে দিয়াছি, কিন্তু আশ্বিন সংখ্যার পুনর্মুদ্রণ না হইলে বৎসরের গ্রাহক আর একটিও করা যাইবে না। সুতরাং প্রথমেই কার্তিকের কাজ বন্ধ করিয়া আশ্বিন সংখ্যা পুনর্মুদ্রণের আদেশ দিলাম। সেই হইল আমার সদ্য-বেকার-জীবনের প্রথম কাজ।

ভাবনা অগ্রসর হইল না। শূন্য উদর এবং পীড়িত মনের সুযোগ লইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে ভর করিলেন। আমার পঙ্কপল্বলশায়ী চিত্ত রাজহংস কেন যে অকস্মাৎ তখনই মানসযাত্রায় উড্ডীন হইল সে রহস্য আজিও ভেদ করিতে পারি নাই; তবে এ কথাও ঠিক যে 'শনিবারের চিঠি'র নবপর্যায়ের মত আমারও কাব্যজীবনের নবপর্যায় আরম্ভ হইল। প্রথমেই লিখিলাম একটি নিছক হাসি ও নির্দোষ ব্যঙ্গের কবিতা "বিবাহের চেয়ে বড়"—একটি ছোট গল্প-কাব্য, যাহার আরম্ভটা এইরূপ :

বাঁধের উপরে আধখানা চাঁদ বিরহীজনের তরে পাতে ফাঁদ
আকাশের নীলে রূপা যে ছোঁয়াল সে জন বুঝিবে ঠিক,

একা ব'সে জলভরা নদীতীরে কেন ভাসি আমি নয়নের নীরে,
কেন এ অভাগা সন্ধ্যা গোঙাল চেয়ে চেয়ে অনিমিথ
আধ-পর্দায় ঘেরা বাতায়নে যেথা ব'সে পুঁটী কড়াকিয়া গনে,
তারি অবসরে ডাঁশা পেয়ারায় কষিয়া বসায় দাঁত।
পুঁটী কে, জান না? বোসেদের খুকী, মাখম-কোমল, প্রস্তর-বুকী—
ভিতরে তাহার শয়তান হায় আমারই ভেঙেছে আঁত।
বয়সেতে কচি তবুও বালিকা নয়নে ছড়ায় বিদ্যুৎ-শিখা,
লাল ফিতা বাঁধা বেণীতে দোদুল কেউটে বেঁধেছে বাসা।
আমি ব'সে থাকি তারি পথ চেয়ে ভাল ক'রে জানে শয়তান মেয়ে
প্রতিদিন মোর ভাঙে যত ভুল বাড়ে তত ভালবাসা।
আমারে দেখিলে হয়ে চঞ্চলা পুঁটী হেঁকে পড়ে "প-এতে র-ফলা,
এ-কার তাহাতে, পিছনে ম-যোগ করিলে কি হয় কহ।"
শুনিয়া যদিবা প্রেম-ইশারায় জানাইতে তারে কিছু প্রাণ চায়,
পুঁটী না তাকায়; হেন দূর-ভোগ ক্রমে হয় দুঃসহ।
ভিজা বরষায় খড়খড়ি-ফাঁকে আঙুলের ডগা দেখায় কাহাকে!
আমি ঠিক জানি কি চাহিয়া পুটী ঝুঁকিয়া জানালা-পথে,
"পাল্খা-বরফ, এ দিকে এসো না!" মধু ঢালে তার চপল রসনা।
আমিও বরফে ভরি দুই মুঠি লেপি হৃদয়ের ক্ষতে।…
—'কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল'

আরও একটি রহস্য আমার জীবনে বার বার বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে, অত্যন্ত দুঃসময়ে প্রায় আত্মঘাতী মুহূর্তে ব্যঙ্গ-খাতেই আমার চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয়। মায়ের প্রায় মৃত্যুশয্যায় বসিয়া "হসন্ত তরফদারে"র প্রথম খসড়া ফাঁদিয়াছিলাম, আজ ৭ই অক্টোবরে "অন্ন চিন্তার চেয়ে বড়" যখন কিছুই নহে, তখন "বিবাহের চেয়ে বড়" লিখিলাম। কিন্তু হাসি দীর্ঘস্থায়ী হইল না, অপরূপ "মৃত্যু-মাধুরী" সঙ্গে সঙ্গে আমার চিত্ত অধিকার করিল। প্রায় একটানাই লিখিয়া গেলাম:

উঠ হিমাদ্রি-প্রায়,
দুঃখসিন্ধু হের গরজিছে ব্যথাবেদনার লোনাজল উথলায়।
ক্রূর নিপীড়নে কম্পিত আজি ক্ষুব্ধ সাগর-তল,
ধাতব পৃথ্বী বাষ্প-বিকারে মথিছে সিন্ধু-জল।
ওরে লাঞ্ছিত, ভূকম্প-বেগে উৎসারো আপনায়,

অদ্রি সমান লেহিয়া অভ্র উঠ নিজ মহিমায়।
জাগ হিমাচল-প্রায়।

জাগিয়াছে ভূতনাথ।
আগ্নেয়গিরি উন্মাদ যেন দিকে দিগন্তে করে অগ্ন্যুৎপাত ॥
বিষ্ণুচক্রে হের বরাভয়, বিদরে অন্ধকার,
মৃত্যুর মাঝে অমৃত-মাধুরী নেহারো চমৎকার!
বক্ষে বক্ষে দেবী-পাদপীঠ এ নহে অকস্মাৎ,
সতী-শব কাঁধে নটরাজ করে উন্মাদ পদপাত!
ক্ষিপ্ত প্রমথনাথ।

জাগ্ রে মানুষ জাগ্,
দেবী-মন্দিরে শিবা-সারমেয় লেহন করিছে পুণ্য যজ্ঞভাগ!
শকুনি গৃধিনী মন্দিরদ্বারে প্রহরী সেজেছে আজ,
ভক্ত বাহিরে ক্রন্দন করে, ভুলিয়াছে ঘৃণা লাজ;
দেবীর চরণে মন নাই তার, আপনাতে অনুরাগ,
ভক্ত কি দেহে রক্ত থাকিতে নাশিবারে দেয় যাগ!
ওরে অমানুষ জাগ্।

কর, কর সংগ্রাম।
মৃত্যু ক্ষণিক, শাশ্বত জানি মহাকাল-ভালে অগ্নি-আখরে নাম!
কীটপতঙ্গ বাঁচে তারা, আছে বাঁচিবার যত দিন,
মানুষই করিতে পারে জীবনেরে মহৎ অথবা দীন।
জননীর ক্রোড়ে জনমে মানুষ, ধরা তার বিশ্রাম
সেই বীর তারে প্রণমি যাহার মৃত্যুও অভিরাম!
কর, কর, সংগ্রাম।

আলোড়িয়া তোল ঝড়,
যুগে যুগে যত সঞ্চিত মেঘ নিবিড় করিয়া ঢেকেছে নীলাম্বর।
ঝঞ্ঝার বেগে পড় যদি, পড় ধূলায় ভগ্নপাখা,
বীরের ললাটে পঙ্ক-শোণিতে তিলক রহিবে আঁকা।
মৃত্যু-আঁধার আসিবে নামিয়া হয়তো নয়ন 'পর,
তবুও পুলকে দেখিবে হাসিছে নীলাকাশ সুন্দর—
কখন থেমেছে ঝড়।

সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব হইল, অন্তকার আকস্মিক ঘটনা-জালে জড়াইয়া ডুবিয়া আমি নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলিতেছি। মনকে প্রণিধান করিতে বলিতেছি:

সেই বীর তারে প্রণমি যাগার মৃত্যুও অভিরাম!
কর, কর সংগ্রাম।...
ঝঞ্ঝার বেগে পড় যদি, পড় ধূলায় ভগ্নপাখা,
বীরের ললাটে পঙ্কে-শোণিতে তিলক রহিবে আঁকা।

লিখিতে লিখিতে ক্লান্ত হইয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া আছি, সদর রাস্তা হইতে বারান্দায় উঠিবার সিঁড়িতে ভারী পদক্ষেপের শব্দ পাইলাম। চকিত হইয়া দেখিলাম, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রবেশ করিতেছেন। ডান হাতে গবেষণা-ভারে স্ফীতোদর পোর্টফোলিও ব্যাগ। আসন্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে ঠাহর হইল না তাঁহার ওষ্ঠে বা চক্ষে সদ্য শত্রুবিজয়ের গর্বিত হাসির স্পর্শ ছিল কি না! কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া উঠিলাম, বলিলেন, ছাপোষা মানুষ আপনি, এ কি ক'রে বসলেন? অমন চাকরিটা হঠাৎ ছেড়ে দিলেন? আমি তাঁহার প্রশ্নের জবাব না দিয়া সামনের চেয়ারে তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। আসন গ্রহণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, এমন যে মানুষ করতে পারে, আমার কিন্তু মশায় বিশ্বাস হয় নি। চিরকাল কেরানীগিরি ক'রে এসেছি, এক চাকরি বজায় রেখে অন্য ভাল চাকরির জন্যে এখানে ওখানে দরখাস্তের পর দরখাস্ত পাঠিয়েছি, চাকরি একটা না পেয়ে কেউ চাকরি ছাড়তে পারে—সে ধারণাই করতে পারি না। তা এখন কি করবেন ঠিক করলেন? আমি মুখে জবাব না দিয়া ললাটে করস্পর্শ করিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ম্যাটার অব ফ্যাক্ট কাঠখোট্টা ব্রজেন্দ্রনাথের অপ্রত্যাশিত আচরণে বিমূঢ় হইলাম। আমার উত্তোলিত হাতখানা সহসা ধরিয়া ফেলিয়া তিনি গাঢ়স্বরে বলিলেন, আমার এমন সঙ্গতি নেই যে, এই বিপদে আপনাকে আর্থিক সাহায্য করি। কিন্তু একটা কাজ আমি পারি সজনীবাবু, আপনাকে আমার সাধ্য ও জ্ঞানবুদ্ধি-মত মাসে মাসে লেখা যোগাতে পারি, বরাবর আমি সেটা ক'রে যাব, আপনি না থামালে আমি থামব না। আপনার এই দুর্দিনে আমার এই কথায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

এতক্ষণে আমার চোখ দিয়া সত্য সত্যই জল বাহির হইল, ভারাক্রান্ত মনের সেইটুকু বস্তুগত মুক্তি পাইয়া আমি অনেকটা হালকা হইয়া বাঁচিয়া গেলাম। আমাকে বিস্মিত বিমুগ্ধ করিয়া ভারী ভারী পা ফেলিয়া কাজের লোক ব্রজেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

> পরিশীলন-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। এই পরিশীলন-পরিচয়ই জাতিগত দ্বেষ-হিংসা ও অবজ্ঞাকে, সংকীর্ণ-চিত্ততার রন্ধ্রগত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ।

সম্পাদকের এই বিজাতীয় উপমাকণ্টকিত দম্ভ আমাদের ভাল লাগে নাই। "সঙ্কীর্ণ-চিত্ত" বলিয়া "শনি"র উল্লেখও রাগের কারণ হইতে পারে। হাত নিশপিশ করিতেছিল; কিন্তু উপায় ছিল না, নবপর্যায় 'চিঠি' তখনও জল্পনা-মাত্র। পুনর্জীবনপ্রাপ্ত 'চিঠি'র প্রথম সংখ্যাতেই (আশ্বিন) কাজেই ডক্টর সুশীলকুমার দের 'পরিচয়'-মারী "পরিচিতি" বাহির হইল। রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর আশীর্বাদপূত 'পরিচয়'—রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপর আরও চটিলেন। তাহার প্রকাশ হইল কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় "নবীন কবি" প্রবন্ধে। 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি ইঙ্গিত করিয়া "সাহিত্যিক মোরগের লড়াই" কথাটা তিনি ব্যবহার করিলেন এবং সেই সঙ্গে লিখিলেন, "এই লড়াইয়ে কোনোদিন আমি যোগ দিই নি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েছি।"

ইঙ্গিত যে আমরাই গায়ে পাতিয়া লইলাম তাহা নয়, 'মাসিক বসুমতী'তে (ফাল্গুন, ১৩৩৮) শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের "এই লড়াইয়ে কোনো-দিন আমি যোগ দিই নি" উক্তিটির প্রতিবাদে "সাহিত্যিক মোরগের লড়াই" নামে এক বেনামী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন এবং উক্ত প্রবন্ধের সঙ্গে "জয়ন্তী-সংখ্যা" 'শনিবারের চিঠি'র মোরগলাঞ্ছিত মলাটটি ছাপিয়া দিয়া রবীন্দ্র-নিন্দিত মোরগ যে কে তাহা স্পষ্টভাবে সনাক্ত করিয়া দিলেন। এড়াইবার আর পথ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের এই বিদ্রূপতায় তরুণেরাও নানাভাবে উল্লাস প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইহা একান্ত শত্রুর লাঞ্ছনায় সামান্য-জনোচিত উল্লাস মাত্র, রবীন্দ্রনাথ এক পক্ষকে গালি দিয়া অন্য পক্ষকে তখনও সমর্থন করিলেন না। কার্তিকের 'পরিচয়ে' "পত্রিকা" নামীয় প্রথম প্রবন্ধে লিখিলেন:

> শুনেছি তরুণেরা বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি অনেক নূতন কীর্তি করেছেন ব'লে গৌরব করেন, কিন্তু ভাষায় নূতন পথকে বাধামুক্ত করবার যে-উদ্যোগ প্রমথ করেচেন তার চেয়ে ইদানীং আর কী উদ্ভাবিত আমি জানি নে। এটা জানা আছে প্রমথকে বয়স খতিয়ে তরুণ বলবার জো নেই।

স্বয়ং প্রমথনাথও সে যুগের তরুণ-পত্রগুলিকে এক কঠিন মার দিলেন এই 'পরিচয়ে'ই। তিনি লিখিলেন:

> আমি পুরোনো লেখক। আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে নতুন'

কাগজ মানে হচ্ছে—সেই কাগজ যার লেখক সব পুরোনো। সুতরাং পুরোনো লেখকেরা যদি না লেখেন, তা হ'লে নতুন কাগজ আর চলে না। এর কারণ তরুণপত্রের প্রধান লক্ষণই এই যে তার অন্তরে প্রেরণা নেই।

আমাদেরও বয়স ছিল কম, রক্ত ছিল গরম। পূর্বের "সজনে ফুল" ও "মুরগী"র ঘা মনে ছিল, নূতন করিয়া "সাহিত্যিক মোরগে"র উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল। ইহারই লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল ১১ই পৌষে (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩১) অনুষ্ঠিত "রবীন্দ্র-জয়ন্তী"কে কেন্দ্র করিয়া। যখন কবির সত্তর বৎসর পূর্তি-উৎসবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কলিকাতা নাগরিকদের পক্ষে মেয়র ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষে কবি কামিনী রায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু-নামাঙ্কিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রচিত অভিনন্দন পাঠ করিলেন, যাবতীয় সাময়িক পত্র বিশেষ-সংখ্যায় কবিকে সম্মানিত করিলেন, তখনই আমরা "জয়ন্তী-সংখ্যা" (মাঘ ১৩৩৮) প্রকাশ করিয়া ব্যজস্তুতিচ্ছলে কঠোর রবীন্দ্র-বিদূষণ করিয়া বসিলাম। শ্রীঅমল হোম প্রমুখ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোক্তারা লক্ষ্য হইলেও সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম করিলাম না, বিশেষ করিয়া তাঁহার ছবিকে "ছবিতা" আখ্যা দিয়া যে সচিত্র ব্যঙ্গরচনাটি (আমার রচিত, হেমন্ত-চিত্রিত) আমাদের জয়ন্তী-সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, রবীন্দ্রনাথকে উত্ত্যক্ত ও মর্মাহত করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল। তদ্ব্যতীত কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্রেও কম লঘুতা প্রকাশ পাইল না। মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসাপরবশতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল। আমাদের আহত ভক্তি ও অভিমানই যে ব্যঙ্গ-বক্রোক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল, এই সহজ কথাটা সাধারণ পাঠক তো বুঝিলই না, রবীন্দ্রনাথও বুঝিয়াও বুঝিলেন না। ব্যবধান দুস্তরতর হইয়া উঠিল। এই ব্যাপারে নিতান্ত বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করিলাম যে, তখন পর্যন্ত রবীন্দ্র-লাঞ্ছনায় উল্লসিত হয় এমন লোকের সংখ্যা বড় কম নয়।

"সজনে ফুল" ও "মুরগী"র উপমা রবীন্দ্রনাথ ঠিক আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই প্রয়োগ করিয়াছিলেন কি না, আজ আর তাহা হলফ করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে আমাদের মত আরও অনেকের ধারণা হইয়াছিল, আমরাই তাঁহার লক্ষ্য। সুতরাং আমরা মনের সাধেই মনের ঝাল মিটাইয়াছিলাম, গদা ছুঁড়িয়াছিলাম অনেককেই লক্ষ্য করিয়া; কিন্তু কেন্দ্রস্থলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, আঘাতটা তাঁহাকেই বাজিয়াছিল সর্বাধিক। আমরাও তখন বেপরোয়া। প্রেস এবং আপিস—উভয় দিক দিয়াই 'প্রবাসী'র সহিত সম্পূর্ণ

সম্পর্কহীন আমি, একেবারে 'আউট' বলিলেই চলে। কোনও দিক দিয়া ভয়-ডরের কোনও বালাই নাই, খাপখোলা তলোয়ারের মতই তখন আমি উলঙ্গ, কটু উপমা ও শ্রদ্ধাহীন উক্তি কিছুতেই বাধে নাই। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারা কারারুদ্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরে দেশের অতিশয় রাষ্ট্রনৈতিক দুদিনে রবীন্দ্রজয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সুতরাং আমাদের বিরোধিতায় সমর্থকের অভাব হয় নাই। দেশের দুর্দিন এবং দেশের জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ছবির সুযোগ আমরা পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সকল মন্দেরই একটা ভাল দিক থাকে; রবীন্দ্র-জয়ন্তী লইয়া আমাদের ব্যঙ্গও অন্তত একটি সুফল প্রসব করিয়াছিল। সে সুফল একান্ত আমারই ব্যক্তিগত প্রাপ্তি। ব্যঙ্গের পাল্লার পাষাণ ভাঙিবার জন্য জয়ন্তী-সংখ্যার গোড়ায় এবং শেষে দুইটি প্রশস্তি-কবিতা যোজিত হইয়াছিল—গোড়ায় মোহিতলালের "কবি-বরণ" এবং সমাপ্তিতে আমার "রবীন্দ্রনাথ"। সুফল আমার সেই একটি-মাত্র কবিতার পরিধিতেই আবদ্ধ থাকে নাই, আমার সমগ্র কাব্যজীবনে তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাঁকুড়া কলেজ হস্টেলে এক পূর্ণিমা রাত্রে যে ছন্দ আয়ত্ত করিবার ব্যাকুল প্রয়াস করিয়াছিলাম এবং যাহা তাহার পর দীর্ঘ বারো বৎসরের অবিশ্রান্ত সাধনাতেও ধরা দেয় নাই, অকস্মাৎ অত্যন্ত অসতর্ক মুহূর্তে তাহাই আমার লেখনীমুখে ধরা দিল। নূতন অস্ত্র হাতে পাইয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম। স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করিবারই গোপন বাসনা ছিল। কিন্তু সত্যকার কাব্য হৃদয়াবেগকেই মানে, বুদ্ধিকে নয়। আমার যুক্তিবাদী প্রখর বুদ্ধি হার মানিল। হৃদয়াবেগ-স্পন্দিত ছন্দ নিজেই নিজের পথ করিয়া লইয়া লিখিয়া চলিল :

হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত,
আপনি বিরাট, আপনি সমুজ্জ্বল,
শিখর, গুহা ও অরণ্য-সমাকুল,
যুগ যুগ ধরি সঞ্চিত কত তমিস্রা অনাহত,
পুষ্পস্তবকে বিনম্র তরু, বিচিত্র কত ওষধি গন্ধময়,
ব্যাঘ্র, হস্তী, বরাহ বন্য, ভীষণ সরীসৃপ,
পুঞ্জিত কত মেঘলোক তার শিখরবিলম্বিত।
হিমালয় তবু হিমে ঢাকা, হায়, তুষারে অসাড় শির।
ভয় করি তায়, বিস্ময় মনে জাগে—

মহিমা বিরাট, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত—
ভালবাসিবারে যত যাই, তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

এই বিচিত্র ছন্দের নির্মল ধারায় স্নান করিয়া যেন আমি পূত-পবিত্র নবজন্মান্তর লাভ করিলাম; সকল ক্ষোভ, সকল অভিমান, সকল বিদ্বেষ ভাসিয়া গেল, শেষ দুই স্তবক আপনা হইতেই সেই অবগাহনপুণ্যে মধুর হইয়া উঠিল:

হিমালয়—
চিনিতে চেয়েছি, বুকেতে চেয়েছি, ধরিতে চেয়েছি তারে,
আজিও তাহার পাই নাই পরিচয়।
হতাশ হইয়া বসেছি আমার গৃহ-অঙ্গন-ছায়ে—
সমুখে আমার সবজির ক্ষেত, তাহারি আড়াল দিয়া
হিমালয় হতে ঝরনা নামিয়া উপল-চপল পায়ে
ঝিরিঝিরি আর কুলুকুলু রবে ছুটেছে গাঁয়ের মেয়ে।
কোথা হিমালয় হিমেতে রয়েছে ঢাকা,
পাহাড় গলিয়া নৃত্যচপল এসছে গাঁয়ের মেয়ে,
বিস্ময় মানি তারি পানে চেয়ে চেয়ে
ঢেউ গানি আর শুনি কুলুকুলু রব
ভুলি হিমালয়, ভালবাসি নদীটিরে—
তত ভালবাসি যত কাছে যাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
তুমি হিমে ঢাকা থাকো, নদীরে ক'রো না হিম।
আমার কুটীর-আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে যুগে মোর ছোট সে সবজি-ক্ষেত
ব'হিয়া চলুক, তুমি থাকো নাহি থাকো—
হিসাব তাহার আমি তো রাখিব নাকো,
আমি ছুটিব না বিস্ময়ে ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও-নদীজলে—
কোথায় উৎস, কোন্ সমুদ্রে লীন,
ইতিকথা তার যে পারে রাখুক লিখে।
নদীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালবাসি তত কাছে পাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

শুভমুহূর্ত মানুষের জীবনে কখন কোন্ দিক দিয়া আসে কেহ বলিতে পারে না। বঙ্গভারতীর বরপুত্রকে নির্মম আঘাত হানিবার জন্য যে ক্ষুরধার অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিলাম, স্বয়ং বীণাপাণি সকৌতুকে তাহাতেই তন্ত্রী যোজনা করিয়া বিদ্রোহীকেই সুরের ঝঙ্কার তুলিবার আদেশ ও অবকাশ দিলেন, আমার কাব্য-জীবনের ইহাই বিচিত্রতম ইতিহাস। এই "রবীন্দ্রনাথ" কবিতাতেই আমার পরবর্তী কাব্য 'রাজহংসে'র গোড়াপত্তন।

নবপর্যায়ে যাঁহারা নূতন আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রবন্ধকার ব্রজেন্দ্রনাথ এবং কবি ও কথাশিল্পী কৃষ্ণধন দের উল্লেখ করিয়াছি। বৈষ্ণব-সাহিত্যের ঘুণ, তিন খণ্ডে প্রকাশিত সুবৃহৎ 'বীরভূম-বিবরণে'র সম্পাদক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও প্রথম সংখ্যা হইতেই বৈষ্ণব সাহিত্যে রায়বাহাদুরী (খগেন্দ্রনাথ মিত্র) মহিমা ফাঁস করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নূতনেরা সকলেই সশরীরে হাজির হইয়াছিলেন। ডাকযোগে অচিরকাল মধ্যে আরও দুইজন বিচিত্র শিল্পীর সমাগম হইল—সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ মনে হইল চিরপরিচিত। মুঙ্গের হইতে কবি ও কথাশিল্পী শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গলা-খাঁকারি দিয়া জানান দিলেন, আমিও আছি হে। পর পর তিনটি উৎকৃষ্ট স্যাটায়ার কবিতা তিনি পাঠাইলেন—কার্তিকের জন্য "বাঙ্গালী চিত্রকরের প্রতি," পৌষের জন্য "বিরহিণীর পত্র" এবং মাঘের জন্য "নৃত্যময়ী"। কোনটিতেই লেখকের নাম ছিল না। পরে তিনি "চন্দ্রহাস" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কবিতাগুলি 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিষ্ঠা প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়াছিল। লেখক কে তাহা না জানিয়াও অনেককে কবিতাগুলির পংক্তিবিশেষ আওড়াইতে শুনিতাম, যেমন :

> কত রকমের তনু!
> দেখিলে আকুলি মূর্ছা যাইত
> মহাসংযমী হনু।
> পীন উন্নত আয়ত নিটোল
> কম্পাসে আঁকা স্তন গোল গোল,
> কাঠির মতন ক্ষীণ কটি যেন
> বাঁকা মন্মথ-ধনু!

অথবা "বিরহিণীর পত্রে" :

> বিরহে আর কত যুগ রহিবে এ বুক
> তোমার তরে দিল খুলিয়া?

শেষে কি পাড়ার লোকে প্রেমের ঝোঁকে
পড়বে ঢুকে পথ ভুলিয়া ?
যদি না এসো ত্বরিত
ঝরিবে চোখের সরিৎ !
এ পাড়ার তরুণগুলো ঝাঁকড়া-চুলো
গাইছে গজল নজরুলিয়া।

এবং "নৃত্যময়ী"র :

বাংলা ভাসিল নৃত্যফেনিল বন্যাতে
নাচে এক সাথে পিসী-মাসী-মাতা-কন্যাতে
—আমি চেয়ে থাকি বোকার মতন শঙ্কিত।

বন্ধুবর শরদিন্দুর কোনও কাব্যগ্রন্থ এতাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। একালের বাঙালী পাঠক-সমাজ তাঁহার বহু উৎকৃষ্ট কবিতার রসাস্বাদনে বঞ্চিত আছেন।

নোয়াখালি জেলার ফেণী শহর হইতে শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'-সংক্রান্ত কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র ডাকযোগে পাঠাইয়া সাড়া দিলেন দ্বিতীয় জন—চিত্রশিল্পী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, অধুনা বিখ্যাত পি. সি. এল. বা কাফী খাঁ।

প্রফুল্লচন্দ্র তখন ফেণী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। বন্ধুবর গোপাল হালদারও ফেণীর লোক; তিনিই সর্বপ্রথমে এই অধ্যাপকের কার্টুন-পারদর্শিতার কথা বলিয়াছিলেন। 'শেষ প্রশ্নে'র ছবি চারখানি দেখিয়া এই শিল্পীর ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা ভাবিয়া হৃষ্ট হইলাম। হরিপদ রায়ের মত তখনও তাঁহার রেখাগুলি দৃঢ়তাব্যঞ্জক হইয়া উঠে নাই; কিন্তু দেখিলাম সূক্ষ্ম খুঁটিনাটির দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি; উচ্চশিক্ষিত তিনি, বংশগৌরবও যথেষ্ট—ঢাকার সুবিখ্যাত আনন্দচন্দ্র রায়ের সাক্ষাৎ দৌহিত্র, সুতরাং ভাব ও বিষয়-বস্তুও তাঁহার যথেষ্ট অধিগত হইবার কথা। আমি ফেরত ডাকে তাঁহাকে প্রচুর প্রশংসা করিয়া অধ্যাপকপদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে আহ্বান করিলাম; জোরের সঙ্গেই ভরসা দিলাম, কার্টুন-শিল্পকে তিনি ত্যাগ না করিলে উহা তাঁহাকে কখনই বিপদে ফেলিবে না। সাহসী বীরপুরুষ তিনি, আমার ডাকে অবিলম্বে সাড়া দিলেন। কলিকাতার কার্টুন-শিল্পের রঙ্গমঞ্চে ভাগ্যপরীক্ষায় জয়ী হইয়া তিনি আমার মান বাঁচাইয়াছেন এবং পরবর্তী দীর্ঘকাল বিনা মাহিনায় আপ্‌খোরাকিতে 'শনিবারের চিঠি'র কার্টুন সরবরাহ করিয়া বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্বের জন্য আমি আজিও মনে মনে গৌরব বোধ করি।

নবপর্যায়ে প্রথম ছয় মাসের মধ্যে বন্ধুবৎসল সহৃদয় নলিনীকান্ত সরকার লেখকরূপে চিঠির রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। কাজী নজরুল ও দিলীপ-কুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি, আবার এই দুই জনই 'চিঠি'র বড় টার্গেট, কাজেই 'শনিবারের চিঠি'র ধর্ম এই হাস্য-ব্যঙ্গরসিকের স্বধর্ম হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্কোচ ছিল। জয়ন্তী-সংখ্যা উপলক্ষে তিনি আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, একেবারে "জয়-জয়ন্তী" গাহিতে গাহিতে আসরে অবতীর্ণ হইলেন :

যাত্রী মাতিল শুধি প্রাক্তন ঋণ ঘৃত ছুঁড়ি হোমজ ভস্মে,
গাহে সুরঙ্গম-সুরঙ্গমা কত বিচিত্র দীর্ঘে হ্রস্বে।
কত তরুণারুণ-রাগে কলিকাস্ফুট-বর মাগে
লিপ্টিত কাগজ তা তা।
জয় জয় জয় হে বগলে-ধৃত-রবি, জয়ন্তি-ভাগ্যবিধাতা।

কিন্তু এত তোড়জোড়, এত সমাগম-সমারোহ, এত হৈ-চৈ-কোলাহল কিছুই আমার অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যকে রোধ করিতে পারিল না। রঞ্জন প্রকাশালয়ে বইয়ের সংখ্যা চার হইতে দশ (আমার 'মনোদর্পণ', 'অঙ্গুষ্ঠ', 'বঙ্গরণভূমে' ও 'মধু ও হুল'; বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' ও অরবিন্দ দত্তের 'রক্তের টান' এই ছয়খানি নূতন মুদ্রিত) হইল; তথাপি ইংরেজী ভাষানুযায়ী দুই প্রান্তের সংযোগ বিধানে অপারগ হইলাম। অভিমান তখনও প্রবল, প্রবাসী আপিসের লোকেরা আমার পতনে হা-হুতাশছলেও বক্রোক্তি করিবে—এই, আশঙ্কায় পূর্বের চাল এক চুল কমাইতে পারিলাম না। প্রবাসী প্রেসের ফোরম্যান ও মুদ্রাকর মানিকচন্দ্র দাস তখনও আমার বাড়ির নিম্নতলার ভাড়াটিয়া; তিনি আমার বিশেষ ভক্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার কাছেও মুখোশ পরিয়া থাকিতে লাগিলাম। বিডন স্ট্রীটের ছাপাখানা ও আপিস-বাড়ির ভাড়া মাসে মাসে দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত ফাল্গুনের গোড়াতেই (১৯৩২, ফেব্রুয়ারির শেষ) আপিস ও ছাপাখানা ৫সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটেই স্থানান্তরিত করিতে হইল। লক্ষ্মী যখন বিরূপ হন অলক্ষ্মী তখন নানা ব্যসনের আকারে দেখা দেন, অত্যন্ত সঙ্কটের মুহূর্তে গুরুতর ভ্রান্তির আকারেও তিনি দেখা দিয়া থাকেন। আমারও তাহাই ঘটিল, পদে পদে ভুল করিতে লাগিলাম। 'শনিবারের চিঠি'র আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি, ডি. এম. লাইব্রেরি ও শ্রীগুরু লাইব্রেরিকে অত্যধিক কমিশনে রঞ্জন প্রকাশালয়ের বই বেচিয়া যাহা পাইতাম তাহাও চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে ফুঁকিয়া যাইত।

সংসারের দৈনন্দিন খরচ ছাড়া, 'শনিবারের চিঠি'র কাগজের দাম ও ফর্মা ছাপার খরচ নগদা-নগদি দিতে হইত। এমন দিন আসিল যখন আর কিছুতে চলে না, শতচ্ছিদ্র তরণী ডোবে ডোবে—কাহাকেও কিছু বলিতে বাধে, এমন কি গৃহিণীকেও। মরিব তবু প্রবাসীওয়ালাদের কাছে প্রেস্টিজ হারাইব না—নির্বোধের ইহাই হইল পণ।

রাজা (তখন কুমার) ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহিত সে সময়ে গাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক; তঁাহার অহেতুক ভালবাসায় আমি সেদিন হইতে আজও পর্যন্ত ধন্য হইয়া আছি। তাঁহার কাছে শুধু মুখের কথা খসাইলেই মায়ামন্ত্রে আমার সকল সমস্যার নিরসন হইবে, ইহা জানিয়াও আমি নীরব থাকিতাম; অথচ কাব্য-সাহিত্যচর্চার ছলে তাঁহার গ্রেট ইণ্ডিয়ান ও পরে ক্যালকাটা হোটেলের আড্ডায় সদলবলে নিয়মিত হাজিরা দিতাম। অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বশে তিনি প্রায়ই আমার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হইয়া নানা প্রশ্ন করিতেন, আমি কৌশলে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতাম। আমার মনের অবস্থা তখন সত্য-সত্যই রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কারে"র কবির মতন :

> কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
> বিদায়ের আগে দু-চারিটি কথা
> রেখে যাব সুমধুর।
> থাকো হৃদাসনে জননী ভারতী,
> তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
> চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি,
> রাখি না কাহারো আশা।

বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ধীরেন্দ্রনারায়ণ আমাকে একটি সুবৃহৎ রূপার গড়গড়া উপহার দিয়াছিলেন, উপযুক্ত নল লাগাইবার সামর্থ্য ছিল না, একটা সস্তা রবারের নল কোনও রকমে সংগ্রহ করিয়া প্রহরে প্রহরে নিজেই তামাক সাজিয়া চক্ষু বুজিয়া টানিতে টানিতে আর্থিক গোলোক-ধাঁধা হইতে বাহির হইবার উপায় খুঁজিতাম। ঠিক এই সময়ে এই অবস্থায় তারাশঙ্করের কাছে ধরা পড়িয়াছিলাম। 'আমার সাহিত্য-জীবনে' তিনি সে কাহিনী এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

> "এই সময় 'শনিবারের চিঠি'র দুরন্ত প্রতাপ। সাহিত্যিক মজলিশ বসলেই 'শনিবারের চিঠি'র কথা ওঠে। গালাগালির অন্ত থাকে না;

যাঁরা গাল খেয়েছেন তাঁরা জ্বলেন। যাঁরা খান নি তাঁরা নিজেদের দুর্ভাগা মনে করেন। আমি অবশ্য একবার গাল তখন খেয়েছি। কিন্তু তবুও দুর্ভাগার দলেই আছি। একদা ইচ্ছা হ'ল 'শনিবারের চিঠি'র দুর্দান্ত সজনীকান্তকে দেখে আসি। কেমন সে লোকটা! রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে 'শনিবারের চিঠি'র আপিস। সাবিত্রী এবং কিরণকে কিছু না ব'লেই একদিন বেরিয়ে গেলাম। মানিকতলা খালের কাছাকাছি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে সভয়ে প্রবেশ ক'রে দাঁড়ালাম। চক-মেলানো বাড়ি, উদ্যানের চারি পাশে ঢাকা রোয়াক বা বারান্দা। সেই বারান্দায় বেশ জবরদস্ত কাঠামো—মোটা নাক, বড় উগ্র-দৃষ্টি চোখ, ফরসা রঙ, চেয়ারে ব'সে গড়গড়ায় রবারের নল লাগিয়ে তামাক টানছে। মনে হ'ল এই সজনীকান্ত, 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের মত জবরদস্ত চেহারাটা বেশ মিলে যাচ্ছে। তবে রবারের নলে গড়গড়া টানতে দেখে অশ্রদ্ধা হ'ল। এ কি গুরুচণ্ডালী ব্যাপার!"—১ম সং, পৃ. ৫৫-৫৬

সুন্দরবনের দুর্দান্ত কেঁদো বাঘ যে তখন অবস্থাবিপর্যয়ে তৃণভোজী হইয়াছে, তারাশঙ্করের তাহা জানিবার কথা নয়। বস্তুত, আমি তখন নিমীলিত নেত্রে উক্ত রৌপ্য-গড়গড়াটিকেই ঝাড়িয়া ফেলিবার ফন্দি আঁটিতেছিলাম ; সুতরাং গুরুচণ্ডালী দোষ দেখিবার দৃষ্টিই আমার ছিল না।

এই নিদারুণ ত্রিশঙ্কু অবস্থায় বাঁচিবার আপাতসহজ এবং পরিণামে ভয়াবহ পথের সন্ধান দিলেন তখন 'শনিবারের চিঠি'র বিজ্ঞাপন-সংগ্রাহক বন্ধুবর সুবলচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান রাসবিহারী। নিমজ্জমান ব্যক্তিকে সাময়িক-ভাবে বাঁচাইবার নানা হদিস তাঁহার জানা ছিল। তাহার একটির নাম চোটাসুদে টাকা ধার করা। একদিন অতি প্রত্যুষে শ্রীমান আমাকে গরান-হাটার একটি সুবৃহৎ প্রাসাদোপম ভাঙা বাড়িতে লইয়া গেলেন। সেখানে ভোর হইতেই দলে দলে আসামীরা হাজির হইতেছে। একটি খেরো-বাঁধানো খাতায় সহি ও টিপসহি দিয়া মনিমজীকে বাড়ির ঠিকানা লিখাইয়া আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রাসবিহারী জামিন হইলেন। একজন ভোজপুরী দরোয়ান সরেজমিনে তদন্ত করিতে গেল, ঠিকানা সাচ্চা কি না! সে ফিরিয়া আসিয়া অনুকূলে সাক্ষ্য দিলে প্রথম দিনের দেয় তিন শত পয়সা ও লিখাই-খরচ ইত্যাদি বাবদ দশ টাকা কাটিয়া লইয়া আমাকে লিখিতমত তিন শত টাকা ধার দেওয়া হইল। মোট বাহাত্তর দিন ধরিয়া প্রত্যহ তিন শত করিয়া পয়সা আদায়কারী দরোয়ানের নিকট দিলে তবেই সুদে আসলে সম্পূর্ণ ঋণ

পত্নী সুধারাণী ও পৌত্র জয় সহ সজনীকান্ত

পরিশোধ হইবে। ইহারই নাম চোটাসুদে ঋণগ্রহণ। আমি আসামী হইয়া হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া অত্যন্ত জরুরী তাগাদাগুলির সুরাহা করিলাম। যতদিন তিনশত টাকার ভগ্নাংশ হাতে ছিল পরোয়া ছিল না, ভোরে দরোয়ান আসিলেই তাহাকে বিদায় করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার পর 'শনিবারের চিঠি'র নগদ বিক্রয় ও সামান্য বিজ্ঞাপন এবং রঞ্জন প্রকাশালয়ের বই বিক্রয়ের টাকা হইতে দেয় পয়সা দিতে গলদঘর্ম হইতে লাগিলাম। প্রাণ যায় আর কি! কিন্তু এই কথা স্বীকার না করিলে আজ অন্যায় হইবে যে, এই কারবারীরা আসামীর মানে কদাচিৎ আঘাত করিত। দরোয়ান অতি প্রত্যুষে নিঃশব্দে আসিত এবং নিঃশব্দে চলিয়া যাইত। একদিন আধদিন অপারগ হইলে কথাটিমাত্র বলিত না। আসামীকে যথোপযুক্ত সম্ভ্রম দেখানোই যেন এই ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু যত ভদ্রতাই ইহারা করুক, বাহাত্তর দিনে পরিশোধের দায়িত্ব ছিল আসামীর। নাগপাশ প্রত্যহ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছিল, কখনও যে উদ্ধার পাইব সে ভরসাও ছিল না।

কিন্তু উদ্ধার পাইলাম। মুক্তি নানা মূর্তি ধরিয়া মানুষকে দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মনোহারী মূর্তি তো আছেই। আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে ততখানি অগ্রসর হইতে দিলেন না। একদিন ভোরে সদর বহির্দ্বার ঘেঁষিয়া লেন-দেন হইতেছে, বন্ধু ডাক্তার বিরিঞ্চিবিলাস রায়ের কাছে ধরা পড়িয়া গেলাম। তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া ত্রিতলের হিতেন নন্দী এবং দ্বিতলের সজনীকান্তের সহিত একটু আড্ডা দিতে আসিয়াছিলেন। চোটাঋণের পরিমাণ তখন ছয় শত টাকায় উঠিয়াছে, 'শনিবারের চিঠি'র কাগজের দাম ছয় শত টাকা না দিলেই কাগজও উঠিয়া যায়। বিরিঞ্চিবিলাস সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত কটু ভাষায় ভৎর্সনা করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি স্বভাবত বদরাগী লোক। আমি লজ্জায় ও ঘৃণায় মুহ্যমান হইয়া কম্পোজিং ঘরের টুলেই বসিয়া রহিলাম, বাড়ির আর কেহই কিছু জানিল না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বিরিঞ্চিবিলাসের পুনরাবির্ভাবে একটু যে বিরক্ত হই নাই, তাহা বলিতে পারি না। তিনি আমাকে কোনও কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া প্রায় অভিভাবকের ভঙ্গিতে কঠোর আদেশ করিলেন, জামা গায়ে দিয়ে আয়, গরানহাটা যেতে হবে।

ঝাপসা চোখ কিছুক্ষণ অন্য দিকে ফিরাইয়া রাখিতে হইল। যাহা হউক, বিরিঞ্চিবিলাস আমার সঙ্গে গিয়া চোটাঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া বিচিত্র টিপসই-সম্বলিত খেরো-বাঁধানো বালি-কাগজের খাতাটি উদ্ধার করিলেন এবং প্রত্যাবর্তনান্তে আরও ছয় শত টাকা নগদ আমার হাতে এবং ভবিষ্যতে

সাবধান হইবার উপদেশ আমার মগজে গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সত্যকার মুক্তিরূপে এই সঙ্কটকালে তিনিই প্রথম দর্শন দিলেন।

কিন্তু সাবধান হইব কেমন করিয়া, আয়ের পথ কোথায়? দুর্ভাবনার অন্ত নাই। ঠিক এই সময়ে প্রায় একসঙ্গে আরও চারিজন মুক্তিদাতার আবির্ভাব ঘটিল, যাঁহারা শেষ পর্যন্ত আমাকে বিরিঞ্চিবিলাসের নিকট প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে দিলেন না। বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ ও যাদুকর প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত, সাহিত্যিক-বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, সাহিত্য-বন্ধু 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ইঁহারা যেন ষড়যন্ত্র করিয়াই একসঙ্গে আসিয়াছিলেন। আমার আয়ের থার্মোমিটারের পারা প্রায় তলায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল, ইঁহাদের সহৃদয়তার তাপে তাহা ধীরে ধীরে চড়িতে লাগিল। কিন্তু ইঁহাদের কথা বিস্তারিতভাবে বলিবার পূর্বে কাজী নজরুল ইসলামের সহিত আমার সাক্ষাৎ আলাপ ও ঘনিষ্ঠতার কাহিনী বলা প্রয়োজন।

নজরুলকে 'শনিবারের চিঠি' কম গালি দেয় নাই, সত্য কথা বলিতে গেলে 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকাল হইতেই সাহিত্যের ব্যাপারে একমাত্র নজরুলকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম উদ্যোক্তারা তাক করিতেন। তখন আমি আসিয়া জুটি নাই। অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত এলাইয়া পড়িলে ওই নজরুলী রন্ধ্র-পথেই আমি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মোহিতলালও ওই নজরুলের কারণেই আসিয়া জুটিয়াছিলেন,—তবে আমাদের ছিল স্রেফ খেলা, মোহিতলালের ছিল জীবনমরণ-সমস্যা। মনে আছে, নজরুলের ভাষায় 'খুন-খারাপি'র আতিশয্য-দৃষ্টে পীড়িত হইয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় একটু কঠোর অনুযোগ করিলে কাজী নজরুল সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র পৃষ্ঠায় সেই অনুযোগ উপেক্ষা করিয়া সদম্ভে বলিয়াছিলেন, "'শনিবারের চিঠি'র কৃপায় আমি তো গালির গালিচায় বাদশাহ।" সেই নজরুলের সহিত আমার ভাব হওয়া একটু বিচিত্র বটে! অচিন্ত্যকুমার তাঁহার 'কল্লোল যুগে' এই প্রসঙ্গে আমার তারিফ করিয়াছেন।

এই অঘটন ঘটাইয়াছিলেন অঘটন-ঘটন-পটীয়ান পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় —আমাদের পবিত্রদা। মিলনের স্থানটা ধর্মস্থান ছিল না, মিলনেচ্ছুরাও ছিল না শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্। এক মজলিসে গান-বাজনার মধ্যে রাত্রি গভীর হইতেছিল। হঠাৎ পবিত্রদা প্রত্যাদিষ্টের মত অনুভব করিলেন, এমন একটা রাত্রে "In such a night as this" নজরুল এবং সজনীকান্ত পৃথক থাকিবেন, ইহা হইতেই পারে না। সেই গভীর রাত্রেই তিনি পড়ি-কি-মরি করিয়া ছুটিলেন

এবং ব্যাপারটার তাৎপর্য আমাদের ঠাহর হইতে না হইতেই মজলিস-ভবনের দ্বারে কাজীর চকচকে চকলেট রঙের ক্রাইসলার গাড়ির দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। মাটিতে চাদর লুটাইতে লুটাইতে তাম্বুলরাগ-রক্তাধরোষ্ঠবক্ষ নজরুল আসিয়া ঘরের মেঝেতে দাঁড়াইতেই আসরে উপবিষ্ট আমাকে পাঁচজনে মিলিয়া জোর করিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। তারপর হুমদো হুমদো দুই পুরুষের নারীসুলভ কোমলললিতলবঙ্গলতা পদ্ধতিতে প্রথম মিলন সংঘটিত হইল। সদ্য-পরিচর্যের "আপনি-আজ্ঞা" সম্বোধন অর্ধঘণ্টায় "তুমি" এবং পরবর্তী আধ ঘণ্টায় চড়্‌চড়্‌ করিয়া "তুই-তোকারি"র অধো-ভূমিতে নামিয়া আসিল। সেদিন যাঁহাদের এই মহামিলনের মহানাটক অবলোকন করিবার সুযোগ হইয়াছিল তাঁহারা ভাগ্যবান। শ্রীপবিত্র গঙ্গো-পাধ্যায় সেই ভাগ্যবানদের দলে ছিলেন, এইটুকুমাত্র আমার মনে আছে।

বিমল, নলিনীকান্ত, সতীশচন্দ্র এবং নজরুল—আমি যখন অসীম শূন্যপথে নিশ্চিত সংঘাত-মৃত্যুর দিকে দ্রুত অবতরণ করিতেছিলাম, ঠিক তখনই ইঁহারা বিশ্বামিত্রের মত "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিলেন। আমি তিষ্ঠিয়া গেলাম।

চতুর্দশ তরঙ্গ

কুয়াশা ও আশা

বহু বৎসর পূর্বে একবার ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলাম। শীতকাল। বেলা দেড়টায় স্টীমার নারায়ণগঞ্জ ছাড়িল। আকাশ প্রশান্ত নির্মেঘ নীল। মৃদুতরঙ্গস্পন্দিত নদীজলের উপর নির্মল প্রসন্ন রৌদ্র মার্জিত রৌপ্যপাতের ন্যায় ঝলমল করিতেছিল। সেই তরল ভাস্বরতার দিকে একটানা চাহিয়া চাহিয়া চোখ অবসাদগ্রস্ত হইতেই কেবিনে গিয়া গা এলাইয়া দিলাম। ইচ্ছা ছিল তারপাশায় উঠিয়া ক্ষীর ও গরম রসগোল্লা খাইব। কখন তারপাশা পার হইয়া গেল, রৌপ্য কখন বিগলিত স্বর্ণের রূপ লইয়া শেষ পর্যন্ত নিকষ কালোয় পরিণত হইল, কিছুই জানিতে পারিলাম না; হঠাৎ একটা রূঢ় ধাক্কায় চকিত হইয়া জাগিতেই অনুভব করিলাম, চারিদিকে ক্রন্দন-কোলাহল শুরু হইয়াছে। সভয়ে বাহিরে আসিয়াই দেখি দূরে কাছে কোনদিকে দেখিবার কিছু নাই, আমরা নিবিড় কুয়াশার আঁধির মধ্যে পড়িয়াছি। স্টীমারের অত্যুজ্জ্বল হেডলাইট গাঢ় শ্বেত

যবনিকার সম্মুখভাগ মাত্র আলোকিত করিতেছে, পশ্চাদ্ভাগ মৃত্যুর মত রহস্যাবৃত অন্ধকারে বিলীন। অসহায় যাত্রীদের অধিকাংশ ইষ্টনাম ভুলিয়া আর্তনাদ করিতেছে। প্রবীণ-প্রবীণা দুই-চারিজনের ইষ্টনামও কানে আসিল। কোথায় আসিয়াছি, কি হইয়াছে—কিছুই ঠাহর হইল না; এইটুকু মাত্র বুঝিলাম, দিশাহীন কুয়াশায় দিগ্‌ভ্রষ্ট স্টীমার চড়ায় ঠেকিয়াছে। হাতঘড়িতে সময় দেখিলাম, রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে, এতক্ষণে প্রায় গোয়ালন্দ পৌঁছিবার কথা। কিন্তু সূচীভেদ্য কুয়াশায় বিপথে পরিচালিত হইয়া বন্দর হইতে কত দূরে অবস্থান করিতেছি জানিবার উপায় নাই। যাত্রীদের বিশৃঙ্খলা এবং সারেঙের চট্টগ্রামী ভাষা ভেদ করিয়া যাহা জানিলাম, তাহা আশাপ্রদ নহে। বাতাস স্তব্ধ; ভিতরের ভয় এবং বাহিরের গুমটে প্রাণ যখন কণ্ঠাগত, সহসা বায়ুমণ্ডলে আলোড়ন আরম্ভ হইল; তীব্র ক্ষুরধার হিমেল হাওয়া দেখিতে দেখিতে ঝড়ের মূর্তি ধরিতে লাগিল। কুয়াশা নিমেষমধ্যে অপসারিত হইতেই বিস্মিত-পুলকে বুঝিতে পারিলাম, বন্দর অতি নিকটেই। গোয়ালন্দের আলোকমালা ছিন্নবিচ্ছিন্ন কুয়াশার অন্তরাল হইতে যেন হাসিয়া উঠিল। যাত্রীরা সমবেতভাবে জয়ধ্বনি করিল। মুহুর্মুহু বিপদসূচক বংশীধ্বনিতে বায়ুমণ্ডল স্পন্দিত হইতে না হইতেই ছোট-বড় দুই-তিনখানা স্টীমার আমাদের উদ্ধারসাধনে ছুটিয়া আসিতেছে দেখা গেল। শীতের বাতাস উপেক্ষা করিয়া যাত্রীরা পাটাতনে দাঁড়াইয়া আনন্দ-কোলাহলে মত্ত হইল। নিরাপদ বন্দরে পৌঁছিতেও দেরি হইল না।

'প্রবাসী'-বন্দর ছাড়িয়া 'বঙ্গশ্রী'-বন্দরে পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্বেই আমাকেও কুয়াশার আঁধিতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি নাই, বন্দর নিকটেই। দিশাহীন তমসার মাঝখানে যখন ছটফট করিতেছি, প্রথম বরাভয়-হস্ত প্রসারণ করিলেন দুই দিক হইতে দুইজন —সঙ্গীত-যাদু-প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত ও সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকার। বন্ধুবর সুবলচন্দ্রের মারফত বিমলের সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছিল এবং আমাদের পরস্পরের নিজগুণে ঘনিষ্ঠতা হইতেও বিলম্ব হয় নাই। এমন প্রত্যুৎপন্নমতি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন, চৌকস মানুষ আমি দেখি নাই; এমন সহৃদয় বন্ধুও নয়। বন্ধু বিপদে পড়িয়াছে শুনিলেই হইল, তাহার নিজের ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক, নানা যোগাযোগ ঘটাইয়া সে বন্ধুকে উদ্ধার করিবেই। স্নেহ অসঙ্কোচে যেমন লইতে পারিত, অকুণ্ঠচিত্তে তেমনই দিতেও জানিত। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর অনেকগুলি অপোগণ্ড

ভাইবোনকে সে যেভাবে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, ঠিকমত লিখিতে পারিলে তাহা একটা মহাকাব্য হইবে। ভাই-বোনেদের জন্য খাটিতে খাটিতে জোয়ালে-জোতা অবস্থাতেই অর্থাৎ উড়িষ্যার এক স্টেটে ম্যাজিক দেখাইতে দেখাইতে আমাদের এই উদারহৃদয় বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যু হয়।

আমার আর্থিক বিপদ প্রণিধান করা মাত্র বিমল বলিল, তুই তো গান বাঁধতে পারিস, হাসির গান বা সুর দিয়ে গাইবার মত কবিতাও তোর অনেক লেখা আছে। নতুন গান লেখ, আর পুরনোগুলো নিয়ে আয়। মুদ্রিত-অমুদ্রিত বই-খাতা, সাময়িক পত্রের ছেঁড়া পাতা ও টুকরা কাগজ এক গাদা তাহার নিকট দাখিল করিলাম। সে বিশল্যকরণী বাছার মত বহু কষ্টে কয়েকটা গান বাছিয়া লইয়া সুর দিতে বসিল এবং অচিরাৎ একদা দ্বিপ্রহরে আপার চিৎপুর রোডের উপর অবস্থিত "হিজ মাস্টার্স ভয়েস" কোম্পানির মহড়াগারে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা একজন ভট্টাচার্য মহাশয়ের দরবারে আমাকে সুদ্ধ হাজির করিল—আয়নার মত ঝকঝকে টাক এবং তীক্ষ্ণখড়্গনাসা মুখ, বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। শুনুন ভট্চায মশাই।—বলিয়াই হারমোনিয়াম টানিয়া লইয়া গান আরম্ভ করিয়া দিল। এমন দরদ দিয়া বিমল গাহিল যে, ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'না' বলিবার উপায় রহিল না। আমি পরীক্ষায় পাস করিয়া গ্রামোফোন কোম্পানির গানের কথার জোগানদার-শ্রেণীভুক্ত হইলাম। দর—মৃত্যু-বিরহ-দীর্ঘশ্বাস-ভক্তি-ভালবাসা ও স্বদেশপ্রেম বিষয়ক গান-পিছু পাঁচ টাকা, হাসি-কৌতুকের গান ও মজাদার কেচ্ছা-পিছু দশ টাকা। প্রথম দিনের নির্বাচনেই পঁয়ত্রিশ টাকা রোজগার হইল।

কাজী নজরুল তখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে হেড কম্পোজার ও ট্রেনার। স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংস বলিয়া তখন কোম্পানিতে তাহার অসম্ভব খাতির। সে পানের পিক ফেলিবে জানিলে স্বয়ং ভট্চায মশাই পিকদান হাতের কাছে না পাইলে নিজের টাকটাই পাতিয়া দিতে পারেন। কাঁচা পরিচয়ের প্রেমে সেও সর্বতোভাবে আমার সহায় হইল। স্বয়ং আমার কয়েকটি গানে সুর দিয়া আমার প্রতিষ্ঠাও বাড়াইয়া দিল। ফলে আমার একটা ভাল আয় দাঁড়াইয়া গেল। অব্যবহিত পরে বিমল গ্রামোফোন কোম্পানির "টুইন" বিভাগের সেরা ওস্তাদ নিযুক্ত হইলে আয়ের অঙ্ক আরও একটু বাড়িল। প্রায় এই সময়েই কলের-গান-সংক্রান্ত সামগ্রীর প্রখ্যাত ব্যবসায়ী জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "মেগাফোন কোম্পানী" স্থাপন করিয়া রেকর্ড প্রস্তুত ও বিক্রয়ের কাজে অবতীর্ণ হইলেন। বিমল সেখানেও ট্রেনার বা ওস্তাদের কাজ পাইল। মেগাফোন-ছাপে আমারও গান বাহির হইতে লাগিল।

আয় তো বাড়িলই, নিরবচ্ছিন্ন অবসর যাপনের অবকাশ, সোজা বাংলায়—ঢালাও আড্ডা দিবার সুযোগ পাইয়া সেই ভয়াবহ বেকার অবস্থায় যেন বাঁচিয়া গেলাম। দ্বিপ্রহরে চিৎপুর রোডের গ্রামোফোন কোম্পানির এবং সন্ধ্যায় হ্যারিসন রোডের মেগাফোন কোম্পানির শিক্ষাকেন্দ্রের বিস্তৃত ফরাসে দেহ এলাইয়া আড্ডা ও বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে চোখ ও কানের বিবিধ উপরি-খোরাক জুটিত। কখনও কখনও এই সকল স্থানেই রেকর্ডের জন্য ফরমায়েসী গান অথবা 'শনিবারের চিঠি'র জন্য প্রবন্ধ কবিতা গল্প লিখিতাম। কাজী নজরুল এই সময়ে একদিন মেগাফোনের আড্ডায় তাহারই "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার"কে ব্যঙ্গ করিয়া লেখা আমার "ভাণ্ডারী হুঁশিয়ারে" সুর দিয়া গাহিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। গানটি বিমল দাশগুপ্তের কণ্ঠে মেগাফোন রেকর্ডে বিধৃত হইয়াছিল। প্রথম দুই লাইন এই :

চোর ও ছ্যাচড় ছিঁচকে সিঁধেলে দুনিয়া চমৎকার,
তল্‌পিতল্‌পা-তহবিল নিয়ে ভাণ্ডারী হুঁশিয়ার!

বিমল তৎকালীন প্রধান সমস্যা—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়া লিখিত আমার "আলু ও পেঁয়াজ" কবিতাটির প্রথমাংশে কীর্তন ও শেষাংশে গজলের সুর যোজনা করিয়া ও স্বয়ং গাহিয়া বহু আসর মাত করিয়াছিল। ভট্টচায মহাশয়ের আগ্রহে গানটি একটি গ্রামোফোন রেকর্ডের দুই পিঠে স্থায়িত্বলাভ করিয়াছিল। গানটির বিষয়বস্তু আজিও পুরাতন ইতিহাস হইয়া যায় নাই, জীবন্ত বর্তমানেরই সামিল হইয়া আছে বলিয়া উদ্ধৃত করিতেছি :

আলু— মিনতি করি, শোন কালু মিয়া,
ভিন্দালু রাঁধ যদি আমারে নিয়া,
শোন দোহাই তব
বেশি কি আর কব,
আহা ফুটিফাটা বেদনায় বিদরে হিয়া।
মোরে যা খুশি রাঁধ
গাঢ় বাঁধনে বাঁধ—
শুধু জাতটি মেরো না পল-অণ্ডু দিয়া।
দেখ হদিসে যদি সে তব হদিস থাকে,
মোরে কল্‌মা পড়ায়ে দিও কল্‌মি-শাকে।
দিও টম্যাটো-ওলে
ফুল- কপির ঝোলে,

দিও কচুর সাথেতে মোর নেকাহ্-বিয়া।
ফেলে পেঁয়াজে মোরে
মেরো নাকো বেঘোরে,
ওগো যা হও তা হও তুমি সুন্নি-শিয়া।
খাসী- মাংসে ফেলিয়া মোরে বানিও কাবাব,
দিও চপ-কাটলেটে তাতে ক্ষতি নাহি সাব,
হীন বেসনে ফেলে
তুলো ভাজিয়া তেলে,
রব ফাউলে বাউল হয়ে কারি বনিয়া।
নীচ পিঁয়াজের সাথ
মোরে ক'রো না বেজাত,
মোরে প্রাণে মোরে, মেরো নাকো জাত মারিয়া।
পিঁয়াজ— হরি ঠাকুর শোন, তেরা টিকির কিরে,
মোরে অম্বলে দিও দিয়ে ফোড়ন জিরে,
লাগে খোদার কসম
যদি রাঁধ আলু-দম,
মোরে দিও না তাহাতে ফেলে দু ভাগে চিরে।
মোর করিও ভাজি,
তাতে নহি নারাজী,
শুধু ফেলো না কাফেরী-ফেরে কলিজা ছিঁড়ে।
তব শাস্ত্রে যদিবা কিছু আস্থা থাকে,
মোরে শুদ্ধি করিয়া দিও মুলোর শাকে।
শোন তোমায় বলি,
দিয়ে কাঁচা কদলী
রেঁধো শুক্তো অথবা ফেলো ঘণ্ট-ভিড়ে।
গোল আলু-ভাগাড়ে
ফেলে মেরো না হারে—
দিও থেঁৎলে বরং মেরে মুগুর শিরে।
ফেলে মাংসে পাঁঠার রেঁধো ঘুগ্‌নি-দানা,
দিও কুমড়ো-ছোকায় আমি করি না মানা;
তব দোহাই ঠাকুর,
মোরে ভেজো চানাচুর—

শুধু মেরো না আমার জাতি-ধরমটিরে।
সব সহিতে পারি
পারি ছাঁটিতে দাড়ি
শুধু আলু-ছুঁৎ হ'লে ভাসি নয়ন-নীরে॥
শ্রীহরি ঠাকুর আর কাল্লু মিয়া।
একই দেহ দুই রূপ দেখ বুঝিয়া॥

এই গানটির জন্য আমি ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলাম। সে যুগে সে এক মস্ত সম্মান। যাহা হউক, গান ও "অভিজ্ঞতা"র সঞ্চয় প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিল, অর্থ তো পাইলামই; বহু প্রখ্যাত গায়ক-গায়িকা ও বাজিয়েদের সহিত বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকারও আমার আয়ের পথ সুগম করিবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। তখন কলিকাতার বেতার-প্রতিষ্ঠান বেসরকারী অথবা আধা-সরকারী, নাম ছিল মার্কনি ওয়ারলেস অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং বা এই ধরনের একটা কিছু। তখন কর্তা ছিলেন একজন স্টেপলটন সাহেব, ছোট কর্তা—নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, খ্যাতনামা ক্ল্যারিওনেট-বাদক। নলিনীকান্ত নৃপেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কাজেই তাঁহার প্রয়াসে কাজ হইল। বেতারে মাসে অন্তত একবার শনিমণ্ডলের আসর বসিতে লাগিল। এক ঘণ্টার প্রোগ্রাম বাবদ পরিচালক-হিসাবে আমি পঁচাত্তর টাকা করিয়া পাইতে লাগিলাম। নলিনীকান্ত আমার গৃহরঞ্জন করিবার জন্য মাসিক সামান্য ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে একটি বেতার-যন্ত্রেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—আমার দুই প্রিয় সোদরোপম ঘনিষ্ঠ সাহিত্যবন্ধু—এই আসরের দৌলতেই তাঁহাদিগকে পাইয়াছিলাম। এখানেও কাজী নজরুল আমার সহায় হইয়াছিল। শনিমণ্ডলের আসর অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। তখন সুবিধা ছিল, স্ক্রিপ্ট বা লেখা আগাম দাখিল করিতে হইত না, মাইকের মুখামুখি দাঁড়াইয়া বক্তব্য প্রস্তুত করা চলিত। 'শনিবারের চিঠি' হইতে পাঠ-আবৃত্তি-গানই হইত বেশি। রেডিওর এমনই একটি আসরে কাজী আমার 'পথ চলতে ঘাসের ফুলে'র কয়েকটি গান গাহিয়াছিল।

এই সময়কার 'শনিবারের চিঠি'র আপিসের একটি চিত্র "পুরাতনী" নাম দিয়া ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-

ডিসেম্বর, 'শনিবারের চিঠি' বৎসর-কালের অজ্ঞাতবাসের শেষে সদ্য-স্থাপিত নিজস্ব ছাপাখানা "শনিরঞ্জন প্রেস" হইতে আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র রংপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় পাকাপাকি রকম ডেরা বাঁধিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি' আপিসে প্রত্যহ নিয়মিত আড্ডা জমিতেছে—প্রায়-নন্-স্টপ, তবে তেজটা সন্ধ্যার ঝোঁকেই বেশি। দীর্ঘ বিরোধের পর কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন হইয়াছে। তিনি প্রায় আসিতেছেন এবং হাসি গান ও পানের পিকে আসর সরগরম করিয়া তুলিতেছেন; পাশেই অবস্থিত চায়ের দোকানটি কাজেই দ্রুত ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তখন আমাদের ফ্রেঞ্চ ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইডের কাজ করিতেছেন। মনিটার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' আপিসের চাকুরি-অন্তে বৈকালে গৃহ-প্রত্যাবর্তনের মুখে দৈনিক রোঁদ সারিয়া চলিয়া গেলে আমাদের নিশীথ মজলিস বসিত, শত্রুরা অন্যায় করিয়া বলিত—ভৈরবী-চক্র। নলিনীকান্ত সরকার প্রায়শই প্রথমার্ধের উৎসাহ বর্ধন করিয়া দ্বিতীয়ার্ধে কাটিয়া পড়িতেন, রাত্রির গভীরতার সঙ্গে আমাদের সাহিত্য-সাধনা নিবিড়তর হইত, পাশেই যন্ত্রহীন ছাপাখানায় দুই হাতের কম্পোজের কাজ চলিতে থাকিত।

একদিনের বৈকালিক সভা, তারিখ ঠিক মনে নাই; এইটুকু স্মরণ আছে—অসহযোগ আন্দোলন প্রশমনের জন্য সরকার কি একটা কঠিন আইন জারি করিয়াছেন, সেই দিন প্রাতেই দুঃসংবাদ দৈনিকপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্র মৈত্র খালি গায়ে একটি মোটা কম্বল চাদরের মত জড়াইয়া খবরের কাগজ বগলে প্রবেশ করিলেন, হাতে কলেজ স্ট্রীট প্রাঙ্গণ হইতে সদ্য-কেনা একটি বই—রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবনী ও অনেকগুলি কৌতুকাবহ পাদপূরণ-কবিতার সংগ্রহ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নূতন মেরুন-রঙের ক্রাইসলার গাড়ি হইতে তাম্বুলরাগ-রঞ্জিতবক্ষ কাজী নজরুলের প্রবেশ এবং হুঙ্কার, "দে গরুর গা ধুইয়ে"—এটি তাঁহার সন্ধ্যা ভাষায় চায়ের হুকুম। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পাশের দোকান অভিমুখে ছুটিলেন। রবি তখনও কম্বলের খোলস ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার মুখখানা বজ্রবর্ষী মেঘের মত থমথম করিতেছিল। চা আসিতেই সর্বাগ্রে একটি বাটি টানিয়া লইয়াই তিনি বোমার মত ফাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, আবার এই নতুন নাগপাশের জ্বালায় ছেলেরা আর কেউ বাঁচবে না। আমরা চায়ের বাটিতে হাত রাখিয়া প্রশ্নাতুর দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতেই তিনি বজ্রনির্ঘোষে নূতন আইনের সংবাদ ঘোষণা করিয়া টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত

করিয়া বলিলেন, প্রতিবিধান চাই। নিশ্চেষ্ট ব'সে থাকবে তোমরা? নজরুল এই অবসরে রবির সংগৃহীত বইখানির পাতা উল্টাইয়া দেখিতে-ছিলেন, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, বেশ, কাজে লেগে পড়া যাক। রসসাগরের পাদপূরণ পদ্ধতিতে আমরা এর প্রতিবাদ করি এস। বলিয়াই তিনি শুরু করিলেন :

পুকুরে পড়েছে বেড়াজাল আজ
ভাগো ভাগো, মীন-বৎস!

আমি জুড়িয়া দিলাম—

আসিয়াছে যত জাঁদরেল জেলে
সাবাড় করিতে মৎস্য।

উভয়ের সমবেত চেষ্টায় শেষটা এইরূপ দাঁড়াইল :

কাজী— ফেলিয়া খ্যাপলা জাল জেলে-দল
ধরিয়াছে রুই-কাৎলা,
আমি— চুনোপুঁটি সব মারিবে এবার
পুকুর করিবে পাতলা।
কাজী— পুকুরের জল ঘোলা ক'রে তোরা
ভরালি আঁশটে গন্ধে,
আমি— এইবার এসে ঢোকো একে একে
জেলের গিঁঠানো রন্ধ্রে।
কাজী— লাফাইতে গেলে কোপাইয়া দেবে
হয়তো বা আঁশ-বঁটিতে,
আমি— অথবা ধরিয়া ঘাড় মুচড়িয়ে
ভরিবে কোঁচড়ে কটিতে।
কাজী— কাদা খেয়ে আর খাবি খেয়ে ছিলি
বাঁচার অধিক মরিয়াই,
আমি— জেলের খাঁচাতে তড়কা ধরিয়া
মরিয়া যাইবি তরিয়াই।...

এই পাদপূরণ খেলায় রবির ক্রোধ অনেকখানি প্রশমিত হইল।...

এই আড্ডায় শ্রদ্ধেয় শরৎ পণ্ডিত—দাঠাকুর—মহাশয় প্রায়ই আসিতেন। কাজী নজরুল ও আমার মাখামাখি বন্ধুত্ব লইয়া তিনি একটি অতি সরস, আমাদের পক্ষে ড্যামেজিং, ছড়া বাঁধিয়া তখন সকলকে শুনাইতেন।

'বসুমতী'র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার একেবারেই পরিচয় ছিল না। 'প্রবাসী' ছাড়ার পর দুই-তিন মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে, অবস্থা সঙিন। বারান্দায় শীতের রোদে পিঠ দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, সদর রাস্তায় মোটর কার থামিবার শব্দ এবং পরক্ষণেই আমাদের গলিতে ক্রমাগ্রসরমাণ এক জোড়া পদশব্দ শুনিলাম। কেহ আমারই সন্ধান করিতেছেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং গাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে না কাটিতেই 'দৈনিক বসুমতী'র "সাময়িক প্রসঙ্গ" নামক সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখকরূপে মাসিক এক শত টাকা বেতনে বাহাল হইয়া গেলাম। আমাকে কোথায়ও যাইতে হইবে না, প্রত্যূষে দৈনিক পত্রগুলি আসিবে, সেগুলিরই সংবাদ বা মন্তব্যের উপর প্যারার মত করিয়া মন্তব্য লিখিয়া দিতে হইবে, বেলা দশটা নাগাদ সাইকেল-পিয়ন আসিয়া লইয়া যাইবে। বেতনও লোক-মারফত আসিবে। গ্রামোফোন-রেডিওর অনিশ্চিত আয়ের বিষম ধকলের মধ্যে খানিকটা শক্ত মাটির আশ্রয় মিলিল। সতীশচন্দ্র আমার নিদারুণ দুরবস্থার কথা কাহারও মুখে শুনিয়াছিলেন কি না জানি না, তাঁহার অপ্রত্যাশিত সাহায্য দেবতার কৃপারূপেই গ্রহণ করিলাম।

কুয়াশার আঁধি ছিন্নভিন্ন করিবার সুবাতাস সতীশচন্দ্রই সঙ্গে আনিলেন—আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। নিয়মিতই লেখা জোগাইয়া চলিলাম, কখনও গাফিলতি হয় নাই। বাংলা ২৬এ চৈত্র, ১৯৩২এর এপ্রিল মাসের কোনও একটি দিন বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান উপলক্ষে তাঁহারই সম্বন্ধে "সাময়িক প্রসঙ্গ" লিখিলাম। সুবাতাস তাহা বহন করিয়া বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের সুদক্ষ পরিচালক, মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের প্রতিষ্ঠাতা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের দৃষ্টিপথে লইয়া গেল। আমি তখন কিছুই জানিতে পারিলাম না, কুয়াশার মধ্যেই হাঁপাইতে লাগিলাম।

হাঁপাইতে লাগিলাম, কারণ হঠাৎ 'বসুমতী'-লব্ধ দম ফুরাইল। "সাময়িক প্রসঙ্গে"র এক কিস্তিতে বাংলা দেশে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুনারীহরণের উপর একটি কঠিন গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বসিয়াছিলাম। তাহাতে দণ্ডবিধি-আইন ও দৃষ্টান্ত প্রয়োগে প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, ধর্ষণকারী বা ধর্ষণেচ্ছু ব্যক্তিকে হত্যা করিলে কোনও অপরাধ হয় না এবং তাহাই করা উচিত। বাংলা দেশে মুসলমানী শাসন তখনও একচ্ছত্র না হইলেও তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কাজেই 'দৈনিক বসুমতী' আইনের কবলে পড়িল। বিচারে জমার টাকার (তখন বিদ্রোহী পত্রিকাগুলিকে রাজদ্বারে দুই-দশ হাজার টাকা

জমা রাখিতে হইত) মধ্যে এক হাজার জব্দ হইবার হুকুম হইল। সতীশচন্দ্র ভয় পাইলেন এবং আমিও তাঁহার স্নেহাশ্রয়চ্যুত হইলাম। আমার অত্যন্ত দুঃসময়ে সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবে তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সর্বদা সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

কুয়াশার মধ্যে আরও দুই দিক হইতে সুবাতাস বহিয়াছিল। হেমন্তবালা দেবীর কথা বলিয়াছি। তিনি আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে বিরূপ রবীন্দ্রনাথকে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিতেছিলেন। নিতান্ত অবসর-বিনোদনের খেলা—চিঠি লেখার খেলায় তিনি তখন রবীন্দ্রনাথকে অবিরত যোগ দিতে আহ্বান করিতেন। তাঁহার আশেপাশে প্রত্যহ দুঃখকর বা কৌতুককর যাহা কিছু ঘটিতেছে, বিশেষ করিয়া আমার গলিপথ দিয়া কখন কি ধরনের সাহিত্যিক আমার সহিত সমাগত হইবার জন্য আসিতেছেন, তাঁহাদের চলন বলন চেহারা ধরন প্রভৃতি খুঁটিনাটির নিখুঁত বর্ণনা মাসীমা নিয়মিত পাঠাইতেন, এবং রবীন্দ্রনাথকে তাহা হজম করিতে হইত। আমার অনেক পারিবারিক—যায় চাল-ডাল-নুন-তেলের খবরও রবীন্দ্রনাথকে শুনিতে হইত। মাসীমার ছেলেমানুষিও অনেক ছিল। যেমন, এত সব সাহিত্যিক সজনীকান্তের কাছে আসেন, আপনি কেন আসিবেন না? এই সকল চিঠির নকল ও রবীন্দ্রনাথের জবাব আমি পরে দেখিয়া কৌতুক ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। উপরের প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, কেন আসিব না, সজনীকান্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেই যাইব। মাসীমা রবীন্দ্রনাথের কাছে কাজীর টাকের এবং পানখাওয়ার ধরনের একটি অপরূপ বর্ণনা দাখিল করিয়াছিলেন। বারম্বার আঘাতে রবীন্দ্রনাথের শক্ত বিরাগের ভিত্তিমূল মাসীমা নিশ্চয়ই শিথিল করিয়া আনিয়াছিলেন, নতুবা কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথের স্নেহ আবার লাভ করিলাম কেমন করিয়া?

ঠিক এই রবীন্দ্র-বিরাগ-কালে দাদামহাশয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহও কম আশা যোগায় নাই। এই সময়েই তাঁহার সহিত নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ঘটে। তিনি কি চোখে আমাদের প্রথম দেখিয়াছিলেন তাঁহার "স্মৃতিকথা" (১৩৫০) হইতেই তাহা উদ্ধার করিয়া শুনাইতেছি:

> স্বামীহারা ভাগ্যহীনা অকালবিধবা যেমন তার একমাত্র শিশু-পুত্রটিকে নাড়াচাড়া ক'রে আশার আলোক সৃষ্টি ক'রে দুঃখের পথ অতিক্রম করে, আমরাও জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক, বুঝে হোক না-বুঝে হোক, সাহিত্যকেই দুঃখের দিন কাটাবার উপায়ের মত গ্রহণ করেছিলুম।

তাতে কোন্ সুখ আছে, সে আমাকে কি দেবে—কেউ আমাদের ব'লে দেন নি। সাহিত্য তাকে নিজেই টেনেছিল।

দেখি বালকেরাও পল্লীতে পল্লীতে হাতে লিখে পত্রিকা বার করছে। বিদেশেও যেখানে বিশ ঘর বাঙালী আছেন, সেখানেও এই হাওয়া বইছে। যুবকদের মধ্যে তো থাকবেই—থাকবার কথাই। সে সব ছাপার অক্ষরে পাকা দলিল হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেবার ইচ্ছা-আগ্রহের ত্রুটি নাই। কিন্তু একটি অভাব লোকের নজরে পড়ে—সেবা যেন দায়িত্ব-ভোলা। এতে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে, সাহিত্যনিষ্ঠ চিন্তাশীলেরা বিচলিত হন।

তরুণেরাই যে ভবিষ্যতের ভরসা, উত্তরাধিকার—child is the father —সাহিত্য যে নিজত্ব খোয়াবে, জাতীয় বিশেষত্ব হারাবে! কিন্তু এই আকস্মিক noveltyর স্রোতকে বাধা দেওয়াও সহজ নয়, তারও মোহ আছে, সে নূতন যে! এবং যথাসময়ে মোড় ফেরাবার প্রয়াস ও যত্ন পাওয়াই সমীচীন। তখন সেটা বিবেচনা ব'লে বিজ্ঞতার বাধার মধ্যে ঠেকে থাকে, অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বাইরের বিরোধ মাথা পেতে নেবে কে! মানুষ অনেক কিছু পারে, কিন্তু যেচে নিন্দাভাজন হতে চায় না।

এই অবস্থায় সহসা তাঁরা অযাচিতভাবে যাঁকে পান, তিনিই আমাদের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। ১৬৷১৭ বৎসর পূর্বে বীরভূমের এই বীর যুবকটি ছিলেন আমাদের অপরিচিত। ক্রমে আত্মপ্রকাশে তাঁকে পেলুম প্রবল aggressive সাহিত্যপ্রেমিকরূপে, যৌবন-ধর্মসুলভ উগ্র ও ব্যগ্র কর্মী।

তাতে বিবেচকরাই বেশি চমকে যান, কিন্তু মনে মনে অনুচ্চারিত স্বাগতম্‌ও জানান।

আমাদের রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী-উৎসবে [১১ই পৌষ, ১৩৩৮] কলিকাতা যাই ও স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার অধুনা ৺অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য স্বীকার করি। দয়া ক'রে অনেকেই দেখা করতে আসতেন। সেই ভাগ্যলব্ধ প্রবাহের সুমধুর দানের মত একদিন দুই বন্ধুর আগমন হয়। তাঁরা সরাসরি সাহিত্যের কথা আরম্ভ ও প্রায় দেড় ঘণ্টায় শেষ করেন। এমন সাহিত্যরসপুষ্ট উচ্ছ্বসিত সাহিত্য-কথা পূর্বে শুনি নাই। মগ্ন প্রেমিক, সাহিত্যই ধ্যানজ্ঞান। পরিচয়ের আদানপ্রদান বা অন্য কথা—অবান্তর।

অবাক হয়ে উপভোগ করছিলাম, অপরেশবাবুও উপস্থিত ছিলেন। আগের কথাটা শেষে পেলুম, একজন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, দ্বিতীয় আমার প্রিয় প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। তাঁরা আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক'রে গেলেন।

অপরেশবাবু বহুদর্শী লোক ছিলেন, বললেন, 'এঁরাই একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধক,—দেশকে অনেক কিছু দিতে এসেছেন, দিয়ে যাবেন।' তিনি আজ এ রঙ্গভূমে নাই, কিন্তু সেই অভিজ্ঞ প্রবীণের কথা সার্থক হয়েছে। থাকলে কত আনন্দই পেতেন।

সুনিবিড় কুয়াশার মধ্যে চড়ায় ঠেকা অবস্থায় আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব ছিল না যে, 'বসুমতী'র "সাময়িক প্রসঙ্গে" বঙ্কিমচন্দ্রের তমোনাশী প্রভাব তখনই আমার উদ্ধারসাধনে কার্যকরী হইয়াছিল, বন্দরাগত সমধর্মী বন্ধুদের প্রসারিত কর শিথিল হইবার পূর্বেই স্থায়ী চাকরির আকারে তাহা দেখা দিল। কিন্তু মজার কথা এই যে, যোগাযোগ ঘটিল একটু তির্যকভাবেই। ভট্টাচার্য চৌধুরী কোম্পানী তখন মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের ম্যানেজিং এজেণ্ট হিসাবে 'উপাসনা' প্রেস খরিদ করিয়াছেন এবং শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বন্দোবস্তে তাঁহার 'উপাসনা' পত্রিকাটিকে ঢালিয়া সাজিতেছেন। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত 'উপাসনা'র সাড়ম্বর ঢক্কা-নিনাদী বিজ্ঞাপনকে কঠিন ব্যঙ্গ করিয়া আমি 'শনিবারের চিঠি'র "সংবাদ-সাহিত্যে" কিছু মন্তব্য লিখিয়াছিলাম। একনায়কত্বে অভ্যস্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়কে উত্তেজিত কবিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল। আজ বুঝিতে পারি, তিনি আমার ধৃষ্টতায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, জীবিত বা মৃত আমাকে ধরিয়া আনা চাইই। হয় শির লইবেন, নয় শিরোপা দিবেন। আমার ভাগ্য সবে সুপ্রসন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই শিরোপাই আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে লইবার জন্য রথ আসিতেছিল। চীনাংশুক-কেতনের মত পুরোগামী হইয়া সাহিত্যিক শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীকিরণকুমার রায় একদা আমার আবাসে দর্শন দিলেন।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

"কি ছিল বিধাতার মনে"

ব্যাপারটা একটু খোলসা করিয়া বলাই দরকার।

'প্রবাসী'র চাকরি ছাড়া ও 'বঙ্গশ্রী'র চাকরি ধরা অর্থাৎ ১৩৩৮ সালের কার্তিক হইতে ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত চৌদ্দ মাস 'শনিবারের চিঠি'তে অবিশ্রান্ত বেপরোয়া ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার আক্রমণ চালাইয়া আমি বস্তুত নিজের ভাগ্যের সঙ্গেই পাঞ্জা লড়িতেছিলাম। নিজের প্রতি নিষ্ঠুর হইবার সাধনায় অন্যের সুখ-দুঃখ মান-অপমান গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতাম না; নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিতে গিয়া খাপ-খোলা তলোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাহাকে সম্মুখে পাইতাম তাহাকেই আঘাত করিয়া বসিতাম। 'শনিবারের চিঠি'র সেই পুরাতন সংখ্যাগুলির পাতা উল্টাইয়া উপলব্ধি করিতেছি যে, আমার ব্যক্তিগত সঙ্কটজনিত অস্থিরচিত্ততা সেখানে আত্মঘাতী শ্মশান-বৈরাগ্যরূপেই প্রকট হইয়াছিল। বিড়াল কোণা লইলে যেমন রুখিয়া দাঁড়ায়, আমিও সেইরূপ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ভয়ে ও আশঙ্কায় মুহ্যমান অবস্থায় ভূতভয়গ্রস্তের রামনাম জপার মত কেবলই জপিতেছিলাম—আমি, আমি, আমি। বলিতেছিলাম :

ঈর্ষাক্ষুব্ধ নদীনীর তরণী দুলিছে অবিশ্রাম,
আকাশে মেঘের মায়া, রহি রহি বিদ্যুৎ-ভ্রূকুটি ;
বজ্রের গর্জনমাঝে উচ্চে তুলি আপনার নাম,
দৃঢ়হস্তে ধরি হাল, ক্ষুব্ধ ঝড় মরে মাথা কুটি।

সুমুখে রচিছে পথ পিছে মানুষের ইতিহাস,
বিপুল আমার দম্ভে যুগে যুগে স্তম্ভিত পৃথিবী ;
পিছনে গর্জিয়া আসে সময়ের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস,
ততবার উঠি জ্বলি যতবার যাই নিবি নিবি।

প্রশস্ত ললাটে মোর নিজহস্তে রচি জয়টীকা,
বিক্ষুব্ধ-তরঙ্গাহত তরণীর আমি কর্ণধার ;

অধোমুখী কভু নহে তিমিরে প্রদীপ্ত দীপশিখা,
নিজেরে যে করে নতি সে লভে সবার নমস্কার।

আমি ধরিয়াছি হাল, এ দুর্যোগে নাহি করি ভয়,
আপনি গাহিয়া চলি উচ্চকণ্ঠে আপনার জয়।

শির, তামেচা, বাহেরা—যথাযথ বজায় রাখিয়া 'শনিবারের চিঠি' এই কালে অদ্ভুত মারের কৌশল দেখাইয়াছিল। লক্ষ্য ছিল সর্বগ্রাসী—রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ, প্রমথ প্রভৃতি প্রবীণ হইতে প্রায়-সদ্যোজাত তরুণ পর্যন্ত কেহই বাদ যান নাই। মোহিতলালের গুরুগম্ভীর ভারী ভারী প্রবন্ধ, ব্রজেন্দ্রনাথের বহু বিচিত্রতথ্যপূর্ণ পুরাতনী গবেষণা সমবেতভাবেও আমাদের পৌরাণিক ও আধুনিক সুতীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত শস্ত্রপ্রয়োগের সঙ্গে তাল রাখিতে পারে নাই। রবি মৈত্র এবং আমি—মাত্র এই দুইজনেই তুলক্লাম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছিলাম। আমাদের দুইজনেরই তখন উদ্‌ভ্রান্তিযোগ; এই ভয়াবহ ভাঙনের মধ্যে স্থায়ী কিছু সৃষ্টির আবেগে আমরা যাহাকে বলে—থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলাম। এই উদ্দাম চাঞ্চল্য যে বৃথা যায় নাই, রবির ক্ষেত্রে তাহা অচিরাৎ প্রকাশ পাইল; তিনি পরে পরে অত্যল্পকালমধ্যে 'ঘৃতকুম্ভ' ও 'মানময়ী গার্লস স্কুল' রচনা করিতে বসিলেন। আমি অতি নগণ্য "টুকরি" দিয়া শুরু করিয়া 'রাজহংসে'র "কে জাগে" কবিতায় আসিয়া স্থির হইলাম।

আমাদের এই দক্ষযজ্ঞের যুগে শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "উপাসনা প্রেসে"র হস্তান্তর এবং 'উপাসনা' পত্রিকার নবকলেবরধারণ-বিজ্ঞপ্তি লইয়াই কাণ্ডটা ঘটিল। অপরাধ তেমন মারাত্মক কিছু নহে, বিজ্ঞাপন দিবার কালে সকলেই রাজা-উজিরমারী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, 'উপাসনা'র নূতন কর্মকর্তা "ভট্টাচার্য চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং" তাহাই করিয়াছিলেন। অকারণেই আমরা ক্ষেপিয়া উঠিলাম। চৈত্রের (১৩৩৮) 'উপাসনা'র বিজ্ঞাপন লইয়া জ্যৈষ্ঠের (১৩৩৯) 'চিঠি'তে সোরগোল তুলিয়া বলিলাম:

> 'উপাসনা'র ভাগ্য ভাল, মকরধ্বজ ও ধুতুরা পাতার ব্যবস্থার পরিবর্তে ভট্টাচার্য চৌধুরী কোং অবধৌতিক মতে ইহার চিকিৎসা শুরু করিয়াছেন।…দুধটি মারিয়া যেমন ক্ষীর, ক্ষীরটি মারিয়া যেমন চাঁচি—তেমনি ব্যাসদেবের মহাভারতের পর যথাক্রমে বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং তৎপরেই 'উপাসনা'…সাহিত্যে ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রবেশ করিলে চক্ষুলজ্জা কি এতখানিই ত্যাগ করিতে হয়?

এইটুকু নিরাপদ গালি, কিন্তু এই সঙ্গে ভট্টাচার্য চৌধুরী কোং-পরিচালিত মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোং সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনর্থক খোঁচা ছিল। তাহা বরদাস্ত করিবার মত অহিংস ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন না। তিনি যখন আমার শাস্তিবিধানের জন্য আইনজ্ঞের পরামর্শ লইতেছেন, ঠিক সেই সময়ে মাসাধিককাল পূর্বে 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রকাশিত আমার বঙ্কিম-প্রশস্তি তাঁহার নজরে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আইনের বাঁধনের পরিবর্তে চাঁদির বাঁধনের কথা তাঁহার মনে হইল। সাবিত্রীপ্রসন্নকে সরাইয়া অপরাধী আমাকেই সম্পাদকীয় সিংহাসনে বসাইবার বাদশাহী সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হইল। এই সকল মনস্তাত্ত্বিক সংবাদ তখন আমি কিছুই জানিতাম না, স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ধরা দিলাম। পূর্ব-ইতিহাস পরে স্বয়ং ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখেই শুনিয়াছিলাম।

আমি না জানিলেও আমাকে মনোনয়ন সংবাদটা 'উপাসনা' আপিসে চাউর হইয়াছিল। সাবিত্রীপ্রসন্নের সহকারী তখন শ্রীকিরণকুমার রায়। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সৌখিন সাহিত্যিক, কিন্তু চাকুরী-জীবনে তাঁহার তুল্য দক্ষ নিষ্ঠাবান সহকারী সম্পাদক আমি আর দেখি নাই। তিনি পরিহাস করিয়া নিজেকে বলিতেন—শাশ্বত সহকারী সম্পাদক, বোঁটারূপে তাঁহার অবস্থান চিরস্থায়ী, ফুলের অর্থাৎ সম্পাদকের পরিবর্তন বার বার ঘটিতে পারে। ঘটিয়াছিলও তাহাই, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের পরে সজনীকান্ত দাস এবং তাহারও পরে বিজয়রত্ন মজুমদার 'উপাসনা'-'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক হইয়াছিলেন ; কিন্তু ধ্রুবতারার মত কিরণকুমার রায়—কি.কু.রা. অটুট ও অটল ছিলেন। কিরণকুমার অসামান্য সাহিত্যরসবোধের অধিকারী ছিলেন। তারাশঙ্কর তাঁহার 'আমার সাহিত্য-জীবনে' তাহার বহু নিদর্শন দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারই মধ্যস্থতায় আমি তারাশঙ্কর, শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীপরিমল গোস্বামী প্রভৃতি সাহিত্যিকের ও শিল্পী শ্রীঅরবিন্দ দত্তের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম।

উপাসনার আপিস ও ছাপাখানা ভট্টাচার্য চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং-পরিচালিত বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ঠিক দক্ষিণে ৫৬ ধর্মতলা স্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। হেডআপিস ছিল ২৮নং পোলক স্ট্রীটে। হেড আপিসে কানাঘুষা উঠিতেই বোঁটা কিরণকুমার সরোজকুমার-সমভিব্যাহারে ফুলের পরীক্ষা লইতে আসিলেন। নিছক সাহিত্যপ্রসঙ্গে আলাপ হইল; সরোজকুমারের মিঠা হাতের গল্পের আমি ভক্ত ছিলাম। কথায় কথায় জানা গেল, তিনিও বনফুল ও আমার

মত ১৯২৮ সনের ম্যাট্রিকুলেট। অল্প আলাপেই বন্ধুত্বে পাক ধরিয়া দানা বাঁধিতে লাগিল। আলাপচারী করিয়া তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন, কি বুঝিলেন জানি না; আমি কিন্তু আসল রহস্যের বাহিরেই রহিয়া গেলাম।

এই কাহিনী আপাতত এখানেই স্থগিত রাখিয়া 'শনিবারের চিঠি'র প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। ১৩৩৮ সাল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি' একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল। কেন চাহিল, আজ তাহার সঠিক জবাব দিতে পারিব না। হয়তো তাহার মনের আকাশে চকিতবিদ্যুৎরেখাবৎ পরিবর্তিত ভবিষ্যতের একটা আভাস উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিংবা হয়তো ক্লান্ত চরণে আরও পথ অতিক্রম করিবার দুঃসাধ্য সাধনায় একবার নিজের মনেই বোঝাপড়া করিয়া লইতেছিল। সেই আত্মগত চিন্তার স্বরূপ ছিল এই :

১৩৩৮ সাল শেষ হইল।

মহাত্মা গান্ধী জেলে বদ্ধ আছেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তীব্র দৃষ্টি আজ কারাগারের কঙ্করাস্তীর্ণ পথে পরিত্যক্ত পরশমণি খুঁজিতে ব্যস্ত। ভারতবর্ষে যাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ও সম্মানার্হ বলিয়া জানিতাম, বিধানচন্দ্র রায় ও নলিনীরঞ্জন সরকার ব্যতীত তাঁহাদের আর সকলে লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কি? রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত এই সত্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা প্রাতে চায়ের পেয়ালা এবং চুরুটের টিন লইয়া অত্যন্ত কাতরভাবে পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতেছি এবং কিছুক্ষণ এইভাবে দৃষ্টিবিনিময় করিতে করিতে হঠাৎ কেন জানি না উত্তেজিত হইয়া বলিতেছি—"দাদা গো, যাহা হইবার হইয়াছে, ভাবিয়া লাভ কি? তাহার চাইতে আইস একপাত্র খাওয়া যাক, অথবা চল 'নটীর পূজা' দেখিয়া আসি।" দৃষ্টি-বিনিময় বেশি হইলে মন আরও একটু উদার হয়। ফলে, মদের দোকান ও সিনেমা-হাউসগুলি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বালাই লইয়া জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

মহাত্মা গান্ধী জেলে, গতকল্য রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার বাংলা'র রবীন্দ্রনাথ, 'দেশ দেশ নন্দিত-করা' রবীন্দ্রনাথ, 'জনগণমন-অধিনায়ক' রবীন্দ্রনাথ এরোপ্লেনে চড়িয়া ভারতের বাণী শুনাইতে পারস্য যাত্রা করিলেন। অর্ধবস্ত্রপরিহিতা ভৈমী পথভ্রান্ত হইয়া একাকী অসহায় অবস্থায় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যপ্রদেশে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে আর নিষাদপতি নল ঋতুপর্ণ রাজার সহিত বিমানচারী রথে চাপিয়া গান্ধার-রাজদুহিতার স্বয়ম্বর-সভায় বরমাল্যের লোভে যাত্রা করিয়াছেন

—এরূপ ঘটনা যে মহাকাব্যের বিষয় হইত, রবীন্দ্রনাথের পারস্য-যাত্রার মধ্যে আমরা সেই মহাকাব্যিক মহিমা দেখিতে পাইলাম।

আর অকালবৃদ্ধ শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তে'র জাবর কাটিতেছেন। শ্রীকান্তের সৌভাগ্য যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য ইন্দ্রনাথ আজ জীবিত নাই। দেখিতেছি, দরজিপাড়ার আমাদের সেই 'ঠুন ঠুন পেয়ালা' দাদাটি আজিও অধীর আগ্রহে মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করিতেছে বলিয়া শরৎচন্দ্র থামিতে পারিতেছেন না।

প্রবীণ প্রভাতকুমার লজ্জায় দেহরক্ষা করিয়াছেন; বাঁচিয়া আছেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। তবু আছেন বলিয়া এখনও শুনিতে পাই—"বহু বাক্যব্যয় করা নিষ্ফল হতে পারে। কিন্তু বোবা হবার যে কোনও মাহাত্ম্য আছে, এ যুগে আমরা তা মানি নে। আর এ প্রবৃত্তি যে অমর, অন্তত বাংলা দেশে তার প্রমাণ বাংলায় নিত্য নতুন লেখক আবির্ভূত হচ্ছে।" অর্থাৎ যুগন্ধর প্রমথবাবু বলিতেছেন, বাংলা দেশে এটা 'টকি'র যুগ। 'সাইলেণ্ট' যাঁহারা, তাঁহারা সরিয়া পড়িতেছেন।

সুতরাং বৎসরের শেষে আমরাও নিজেদের কথা কিছু বলিতেছি, যুগধর্মের কথা ভাবিয়া সহৃদয় পাঠক ক্ষমা করিবেন।

ইহাই ছিল তৎকালীন পরিবেশ। 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্যের কথাও এইভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে:

সাহিত্যের নামে কিছুকাল যাবৎ যাহা শুরু হইয়াছে তাহাকে সাহিত্য বলিয়া গণ্য না করিলেই চলিত কিংবা ঠাট্টা তামাসা করিয়া উড়াইয়া দিলেই যথেষ্ট হইত—'শনিবারের চিঠি'র প্রথম প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল তাহাই। কেবল সাহিত্য নয়, আধুনিক সমাজে যাহা কিছু মেকী ও মিথ্যা বলিয়া মনে হইয়াছে তাহাই লইয়া রঙ্গ করা তাহার অভিপ্রায় ছিল, এবং এই রকমের আমোদে নিজেদের খোশখেয়াল চরিতার্থ করিবার সুযোগ আমরা প্রথমে লইয়াছিলাম। কিন্তু সহসা সেই সময় সাহিত্যের আদর্শ লইয়া একটা বিতর্ক আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে দেখা গেল—যাহাকে সাহিত্যের ধূলাখেলা বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং সেই খেলায় ধূলামাটি কোনও রূপে গায়ে না লাগিলেই যথেষ্ট বলিয়া কোনও আশঙ্কার কারণ ঘটে নাই, সেই ধূলাখেলায় প্রবীণ ব্যক্তিগণের যোগ আছে এবং তাহাকে তাঁহারা বর্তমান যুগের সাহিত্য-সাধনার নূতন ধারা বলিয়া তাহার জয় ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাঁহাদের সৃষ্টিশক্তি দূরের কথা, রসবোধের পরিচয়ও কখনও পাই নাই, অথচ যাঁহারা সাহিত্যস্রষ্টা বা

সাহিত্যসমজদার বলিয়া পরিচিত হইতে চান, তাঁহারাই আপন আপন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা আবেগ চরিতার্থ করিবার জন্য এই অপোগণ্ড সাহিত্যের ওকালতনামা গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্ম" লইয়া যে ব্যক্তিগত অভিমান ও ঈর্ষার স্রোত প্রবাহিত হইল, এবং তাহার ফলে যে পাঠক-সম্প্রদায় অতি অপথ্য গল্প ও উপন্যাস এতদিন গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করিতেছিল তাহাদের রুচিহীন ক্ষুধায় অতঃপর যে রুচিজ্ঞান সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা হইল, তাহাতে সাহিত্যের জন্য কোন চিন্তার কারণ না থাকিলেও, পারিবারিক ও সামাজিক নীতির জন্য চিন্তিত হইবার কারণ ছিল। তথাপি এই রুচির সংশোধন 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্য ছিল না। যে যুগে যাহা অনিবার্য তাহা ঘটিবেই—যে সকল কারণে সমাজে ও সাহিত্যে এই অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহার নিরাকরণ কোনও পত্রিকার সাধ্যায়ত্ত নয়। ক্রমাগত কুপথ্য সেবন করিলে স্বাভাবিক নিয়মেই তাহার প্রতিক্রিয়া আসিবে। এজন্য 'শনিবারের চিঠি' কোনও প্রকার সংস্কার-কর্মে ব্রতী হয় নাই। কিন্তু যে মিথ্যা নীতির প্রচার এই সকল তথাকথিত সাহিত্য-পণ্ডিতেরা সদম্ভে করিয়া চলিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ—কোনও নীতির পক্ষ হইতে নয়—স্বভাবের নিয়মেই অপরিহার্য। 'শনিবারের চিঠি' সেই স্বভাবধর্মেরই অভিব্যক্তি। যাহা মিথ্যা বলিয়া জানি তাহাকে অচেতন জড়বৎ যাহারা সহ্য করিয়া থাকিতে প্রস্তুত নয়—তাহারাই 'শনিবারের চিঠি'র লেখক ও পরিচালক। সংস্কারমূলক গঠনকার্য নয়, একটা বলিষ্ঠ ও প্রাণপূর্ণ প্রতিবাদই এই আশাহীন কর্মের উদ্যমস্বরূপ তাহাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

আশ্চর্য এই যে, এই সুগভীর আত্মচিন্তাজনিত স্বগতোক্তির অব্যবহিত পরেই উদ্দেশ্য-বদলের আভাস দেখা যাইতে লাগিল, প্রাণপূর্ণ প্রতিবাদেই আর সে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিল না। সংস্কার-মূলক গঠনকার্য না হউক, সৃষ্টিধর্মী গঠনকার্যের দিকে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। যাঁহারা কোদালকুড়ুলধারী ভাঙনের মজুর ছিলেন, তাঁহারা হাঁকডাক পাড়িয়া গড়নের মজুরদের আহ্বান জানাইলেন। কুরুক্ষেত্রের শ্মশানভূমির উপরেই নূতন ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল। কারবালার মরুভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ৩২।৫।১ বিডন স্ট্রীটের বিশুষ্ক আবহাওয়া রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের সমান্তরাল ভাবে নিত্য-প্রবহমান খালের শ্রীকরকণাস্পর্শে সরস হইতে বিলম্ব হইল না। অন্তরালবর্তিনী মা গুরু-শিষ্যের মধ্যবর্তিনী হইয়া আগাইয়া আসিলেন। দুস্তর ব্যবধানের উপর ক্ষীণ হইলেও মিলনের সেতু রচিত হইল।

পারস্যভ্রমণ শেষে ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ (৩ জুন, ১৯৩২) কবি দেশে ফিরিলেন। কলিকাতার অনতিদূরে বৈষ্ণবতীর্থভূমি শ্রীপাট খড়দহে গঙ্গার ঠিক গা-ঘেঁষিয়া নির্মিত একটি প্রাসাদে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। ছেলের উপর মায়ের হুকুম হইল, কবিকে লেখা একটি জরুরী চিঠি লইয়া খড়দহ যাইতে হইবে।

মুশকিলে পড়িলাম। জয়ন্তীর পর হইতে কয়েক সংখ্যা ধরিয়া কবিগুরুর মুণ্ডপাত করিয়া হাতের সুখ করিতেছিলাম, হঠাৎ এ কী নিদারুণ আদেশ! 'না' বলিবার উপায় ছিল না, মা পুত্রবধূ মারফত হুকুম জারি করেন; সুধারাণীর নিকট প্রেরিত তাঁহার চিরকুটগুলির মর্যাদা প্রায় বাদশাহী পাঞ্জার সমান। সুতরাং যাইতে হইল। খড়দহে তখন মোহিতলালের এক সাহিত্যরসিক বন্ধু থাকিতেন, মোহিতবাবুর দৌলতে তাঁহার সহিত আলাপও হইয়াছিল। তিনি বাঙালীর 'বেঙ্গলিটি'র বড় পাণ্ডা ছিলেন। ভোরে রওয়ানা হইয়া প্রথমে তাঁহার গৃহেই দর্শন দিলাম। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা পাকা করিয়া গৃহস্বামীর এক বিদুষী কন্যা সমভিব্যাহারে কবি-সন্দর্শনে যাত্রা করিলাম, ইচ্ছা ছিল সঙ্গিনীকে অগ্রবর্তিনী করিয়া দিয়া কোনও প্রকারে সঙ্কোচ ও লজ্জার দায় এড়াইব। সংবাদ মিলিল, কবি দ্বিতলে আছেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ভূ-তলে দ্বার রক্ষা করিতেছেন; তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া যাইবার উপায় নাই। রথীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মনোনিবেশসহকারে এক খণ্ড মসৃণ চামড়ার উপরে একটি লৌহশলাকার সাহায্যে ফুল তুলিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিলাম, সেই চাহনিতেই ভড়কাইয়া গিয়া আমার সঙ্গিনী অন্তর্ধান হইতেছেন। তখন আর উপায় নাই। বসিয়াই রহিলাম। রথীন্দ্রনাথ খুব ধীর ও শান্ত কণ্ঠে ছোট্ট একটি প্রশ্নের চিমটি কাটিলেন—কি, খবর সংগ্রহ করতে এসেছেন? আমার 'শনিবারের চিঠি'র মেজাজ সঙ্গে সঙ্গেই চাড়া দিয়া উঠিল; বলিয়া ফেলিলাম, আজ্ঞে, তার জন্য এত কষ্ট ক'রে এতখানি পথ আসবার দরকার ছিল না, আপনাদের সব খবর বাজারেই পাওয়া যায়। শর-নিক্ষেপ করিয়াই লজ্জা হইল, শান্ত কণ্ঠেই বলিলাম, দেখুন, আমি দূত, সুতরাং অবধ্য। রথীন্দ্রনাথের মুখে মৃদু প্রসন্ন হাসি দেখা দিল, বলিলেন, উপরে খবর গেছে, আপনি বসুন। অনতিবিলম্বে সংবাদবাহী ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া কবি-সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। প্রণাম সারিয়া তাঁহার হাতে হেমন্তবালা দেবীর পত্রখানি দিলাম। নতমুখ নীরব রবীন্দ্রনাথ যেন একটা অবলম্বন পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন।

হঠাৎ-অপ্রসন্নতার ধাক্কা কাটাইয়া কবি যখন কথা আরম্ভ করিলেন,

প্রথমে মনে হইল—তিনি একা বসিয়া স্বগতোক্তি করিতেছেন। তিনি যেখানে পূর্বমুখী হইয়া বসিয়া ছিলেন তাহার পিছনেই একটি জানালা, সেই জানালা-পথে গঙ্গার আবিল গৈরিক জলধারা চোখে পড়িতেছিল। শীর্ণকায়া নদীর ভীমামূর্তি দেখিয়া আমার মুখে-চোখে বিস্ময় ফুটিয়া থাকিবে। তিনি বলিলেন, এই নদীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ-নাড়ীর যোগ, আমি গঙ্গার সন্তান। এই গঙ্গা যেখানে পদ্মা হয়েছে, সেখান থেকে দক্ষিণে পাবনা পর্যন্ত এক সময় আমার বিচরণক্ষেত্র ছিল। একটু এগিয়ে এসে নীচে চেয়ে দেখ আমার সে যুগের বিশ্বস্ত বাহন 'পদ্মা'র সংস্কার হচ্ছে। ওই 'পদ্মা'য় আমি দীর্ঘকাল বাস করেছি, ওকে আমি ভালবাসি, তাই ছাড়তে পারি নে। ও জীবনভোর অনেক খেটেছে, ওকে ছুটি দেওয়াই উচিত ছিল।

পরে শ্রীহরিহর শেঠের যত্নে ও আহ্বানে চন্দননগরে যেবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাঁহাকে ওই পুনঃসংস্কৃত 'পদ্মা'-বোটেই অধিষ্ঠান দেখিয়াছিলাম। খড়দহের সেই 'গঙ্গার সন্তান' কথাটি স্মরণ করিয়াই তখন আমি আমার 'পঁচিশে বৈশাখে'র "গাঙ্গেয়" কবিতাটি লিখিয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়া চলিলেন, আমি সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসতুম। মাঝ-পদ্মায় কখন যে বোট থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব তা নিজেও জানতুম না। পুরোনো মাঝি-মাল্লারা আমার মুখচোখের চেহারা দেখে টের পেত, ডিঙি নিয়ে তৈরী থাকত তারা। যতক্ষণ দম থাকত মাথা তুলতুম না, শরীর অবশ হয়ে এলিয়ে এলে একটা হাত বাড়িয়ে দিতুম জলের উপরে, মাঝিরা তৎপরতার সঙ্গে এসে আমাকে ডিঙিতে তুলে নিত। এই ছিল আমার দৈনন্দিন খেলা, সর্বনেশে খেলা, কি বল? ডুবে যে কেন যাই নি আজও তাই ভাবি, ওই মাঝি-মাল্লাদের দয়াতেই।

পর পর এমনি অনেক গল্প। প্রায় দুই ঘণ্টা মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছিলাম; সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গে একটিও কথা হয় নাই। ওই দিনই বলিয়াছিলেন, আমি খুব ভোগী—লোকের এমন একটা ধারণা আছে। কথাটা সত্যি নয়। ছেলেবেলা থেকে যে ভাবে আমরা মানুষ হয়েছিলুম তাতে ভোগের স্থান ছিল না। আমার মতন কৃচ্ছ্রসাধনও বুঝি কেউ করে নি। দিনের পর দিন শুধু মুগের ডালের সুরুয়া খেয়ে কাটিয়েছি। সে সময় ছোটগল্প আর কবিতার বান ডেকেছিল আমার মনে।

রথীন্দ্রনাথ নীচে হইতে খবর পাঠাইলেন, কবির স্নানাহারের সময় হইয়াছে। আমি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সম্ভবত তিনি সেই দিন প্রথম আমার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, হেমন্তবালার লেখার শক্তি

অসাধারণ, ভাষা সাবলীল, আর্টিস্টের ডিট্যাচমেণ্ট (নির্লিপ্ততা) যদি ও লেখায় আনতে পারে স্থায়ী নাম রাখতে পারবে।

শরতের মেঘের মত হালকা মনে প্রসন্ন চিত্তে ঘরে ফিরিলাম। এই সাক্ষাতের মধ্যে অপূর্ব বা অসাধারণ কিছুই ছিল না, অথচ আমি দূরবিসর্পিত নূতন পথের সন্ধান পাইলাম।

মোহিতলাল তখন প্রত্যেক মাসের প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপর নির্মমভাবে ছুরি চালাইতেছিলেন। আমারও তাহাতে সায় ছিল, কিন্তু আমার মতির পরিবর্তন হইতে লাগিল। রবীন্দ্র-প্রশংসিত হেমন্তবালা দেবীর লেখা সংগ্রহ করিয়া যে মাসে ছাপিতে আরম্ভ করিলাম (অগ্রহায়ণ ১৩৩৯), সেই মাসেই অকস্মাৎ ভট্টাচার্য চৌধুরী কোম্পানির ডাক আসিল। সত্যবাণী দেবী এই বেনামে মাসীমার লেখা পর পর ছাপা হইতে লাগিল—'শনিবারের চিঠি'তে সমাজ ও ধর্ম-বিষয়ক নূতন সুর যোজিত হইল।

পূর্বেই বলিয়াছি, আসল পরিবর্তন দেখা দিতে লাগিল রবি মৈত্রের ও আমার লেখায়। রবি তাঁহার সমস্যামূলক সামাজিক উপন্যাস 'ঘৃতকুম্ভ' রচনায় হাত দিলেন, জ্যৈষ্ঠ হইতেই তাহা ধারাবাহিক ভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে বাহির হইতে লাগিল। আমিও ওই মাসে "টুকরি"তে ভরিয়া গালাগালিনিরপেক্ষ সম্পূর্ণ নূতন ধরনের পাঁচমিশালী মাল সরবরাহ করিলাম। বৈশাখের "টুকরি"র ধরন জ্যৈষ্ঠেই আমূল বদলাইয়া গেল। এইখানেই আমার কাব্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত। কৈফিয়ত ছিল এই :

গোবর নহেক, হে সখি, আমার
কাব্য-বাঁশের টুকুরিটায়,
ছন্দ আমার আজিও কেন যে
চলিতে মিলের হুমড়ি খায়।
অনেক কষ্টে রাশটা আলগা করি,
চোখে দেখি নাকো কি যে টুকরিতে ভরি—
মনের নদীতে চলিছে ডুবিছে তরী,
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়িছে বসিছে
ঘুঘু চরিতেছে মন-ভিটায়।
তারি দু-একটা টুকরি-ছন্দে
ভরিতেছি সখি, টুকরিটায়।

জ্যৈষ্ঠের (১৩৩৯) 'শনিবারের চিঠি' হইতেই আমার এই মনের যাত্রাবদলের

কয়েকটি নমুনা দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। এই টুকরা-কবিতাগুলি আজও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। 'আত্মস্মৃতি'তে মোড় ফিরিবার প্রমাণ হিসাবে দাখিল করিলে খুব অন্যায় হইবে না :

উমা

মামার বাড়িতে গিয়াছিল উমা, ফিরিয়া আসিয়া কহে,
সবাই সেখানে রয়িয়াছে বাবা, তুমি কেন সেথা নাই ?
কথা যাই হোক, ভাবটা তাহার এই—
দুই বৎসর পূর্ণ হয় নি আজো।
কি জবাব দেব, ভাবিয়া হইনু সারা।
চুপ ক'রে থেকে কহিলাম আমি শেষে—
সেথা যদি থাকি, উমারে আমার আনিতে যাইবে কেবা ?

খোকন

পাশের মাঠেতে ডন-বৈঠক করে
পাড়ার যতেক মাসেল-লোলুপ ছেলে।
প্রাচীরের গায়ে পাহাড়প্রমাণ কাঠ
তারি ধোয়াজল বর্ষার ভরে মাঠ,
জল নহে যেন লাল রক্তের ধারা।
খোকা কহে, আজ ডন নয় বাবা, রক্তে করিব স্নান—
আকাশে চাহিয়া বলি তারে চুপি চুপি—
এখনো সময় হয় নি খোকন, ঘোচে নি সর্দি-ভয়।

বড় হ'লে

আমি বড় হ'লে, তুমি মোরে বাবা কেমনে লইবে কোলে ?
—কঠিন প্রশ্ন, সহজ জবাব তার,
কোলে তুলে নিয়ে, চুমু খেয়ে মুখে, কহিলাম খোকনেরে—
তুমি বড় হ'লে আমিও যে বড় হব।
যাঃ !—বলিয়া খোকা কোল হতে নেমে গিয়ে
দ্বিধা-বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, তাই যদি হবে বাবা,
ঠাকুরদা কেন নেয় না তোমায় কোলে ?
মনে মনে নেয় হয়তো—খোকাকে কহিলাম মনে মনে,
মন হতে তবু গেল নাকো সংশয়।

পুতুল

উমার বিষম ভাবনা হয়েছে মনে,
কাঠের ছেলেটি দু দিন খায় নি মাই—
বুকে নিয়ে তারে, ঘোরে পাগলের মত,
যারে দেখে তারে বলে, এরে মাই দাও।
এগারোটা যেই বাজে—
কাঠের পুতুল উঠানে ফেলিয়া উমা মার কাছে গিয়ে—
দু বাহু বাড়ায়ে, 'মা' ব'লে কাঁদিয়া উঠে
বুকের বসন টানিয়া মুখটি বুকেতে লুকাতে চাহে।
আমি ভাবি শুধু উমার মায়ের কথা,
উমারে ফেলিয়া সেও কি কখনো খুঁজিবে মায়েরে তার!

অপু

অপু ও অপর্ণায়—
একের সৃষ্টি যেন অপরের লাগি।
কোথা লীলা তবু তাই ভেবে কাঁদে কেন যে অপুর মন,
রাণুদিদি গাঁয়ে ঘাটে জল নিতে চলে।
মামার বাড়িতে অনাদরে তার কাজলের চোখে জল—
এ দুর্ভাবনা নহে তো অপর্ণার।
সে আজো কোথায় ব'সে আছে পথ চেয়ে,
অপু চ'লে গেছে অকারণ রাগ করি।
কাঁদিবার লাগি থাকে নাকো সংসারে,
বাঁচিবার লাগি আসে না অপর্ণারা।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরেতে ঢুকেই রাসমোহনেরে* ডাকে,
—ধোঁয়ানো গরম একটি পেয়ালা চা—
সিগারেট তার পরে হয় ভাল, না হ'লে বিড়িই সই।
তারো পরে নহে কলিকাতা দমদম।
বারাকপুরের বনে,
ঘেঁটুর গন্ধে বায়ু হ'ল মন্থর;

* 'শনিবারের চিঠি' আপিসের বেয়ারা।

থরে-থরে-ফোটা ওড়্‌কলমির ফুল,
ঝাঁকে-ঝাঁকে-ওড়া নামহীন কত পাখী ;
মাছরাঙা-বসা রেল-লাইনের তার—
তারো পরে ফিজি, দিয়াছেন কথা পণ্ডিতজী† তো কবে,
হিন্দী একটু শিখিয়া নিলেই হবে—
জেনেছে সেথায় গাছেদের কিবা নাম।

বাস্তব

থরে থরে মেঘ জমেছে আকাশ-কোলে,
রহিয়া রহিয়া গুরু গরজায় বাজ,
বিদ্যুৎ-অসি চকিতে ঝলসি উঠে,
দূর বনচূড়া সাজে অপরূপ সাজে।
বস্তি-মালিক কবিতা-লিখন-রত,
উড়ো উড়ো চুলে লাগিছে জলের গুঁড়া—
তেতলার ঘরে বউ শুয়ে এক পাশে,
'আহা' 'উহু' করে, আর পড়ে 'গৃহদাহ'।
নীচে বস্তির চালে চালে খোলা কখন সরিয়া গেছে,
মেঝে ছাপাইয়া ছুটিছে জলের ধারা।
কোনো ঘরে কারো তিন বছরের শিশু
ধুঁকিছে, হয়েছে ডবল নিউমোনিয়া।
বুকে নিয়ে শিশু, চাল-ফুটো জল হইতে বাঁচাতে তায়
জননী এখানে ওখানে সরিয়া বসে—
রেডিওতে চলে গান—
রবি ঠাকুরের 'বর্ষারাতের শেষে'।

অন্য পদ্ধতিতে চিকিৎসিত রোগীকে হাতে লইয়া হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যেমন সর্বাগ্রে গন্ধক-প্রয়োগে পূর্ব পদ্ধতির ঔষধের বিষক্রিয়া দূর করেন আমার তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-কবিতার প্রতিষেধক হিসাবে এই "টুকরি"-কবিতাগুলি ঠিক

† পণ্ডিত বাণারসী দাস চতুর্বেদী বিভূতিভূষণকে কথা দিয়াছিলেন, ফিজি লইয়া যাইবেন।

সেইরূপ কাজ করিল। দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের বিষাক্ত আবেষ্টনী হইতে মনের এই ছন্দোবদ্ধ সহজ সরল প্রকাশ আমাকে মুক্তির পথ দেখাইল।

ষোড়শ তরঙ্গ

"কে জাগে?"

আমার স্মৃতিকথায় বন্ধুবর ডাক্তার বিরিঞ্চিবিলাস রায়ের প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ১৯এ পৌষ ১৩৬১ (৪. ১. ৫৫) তাঁহার ইহলৌকিক জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। যে বয়সে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এখন এইরূপ দুর্ঘটনা অনিবার্য; জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গীরা একত্রে পথ চলিতে চলিতে একে একে বিদায় লইবেন, হতভাগ্যতম যাত্রীকে একেলা মহাপ্রস্থানের পথে চলিতে হইবে—ইহাই ভবিতব্য। যাঁহাদের সহিত সাহিত্য-যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পথেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনা এই যে, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রত্যেকেই কীর্তিমান হইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন, আমার ব্যক্তিগত শোক সমগ্র বাঙালী জাতির শোকের দ্বারা লঘু হইয়াছে। কিন্তু বিরিঞ্চিবিলাসের ক্ষেত্রে সে সান্ত্বনা নাই, তিনি আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য সহযাত্রী হইলেও সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই, তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ একা আমাকেই বহন করিতে হইতেছে। বিমল দাশগুপ্তের বেলাতেও প্রায় তাহাই ঘটিয়াছে।

দুরূহ দুর্গম পথে চলিতে চলিতে মানুষ স্বতঃই আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে। সহযাত্রীরা স্ব স্ব পথ রচনার তাগিদে তৎপর হয়। মানুষ তখন নিজের পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতেই চলে। আমিও তাই চলিতেছিলাম। যাত্রার প্রারম্ভে ক্ষুধিত মন চারিদিক হইতে রসদ সংগ্রহ করিতেছিল; যে সকল মহাজনের চিন্তা ও সাহিত্য-রসে পুষ্ট হইতেছিলাম, আমার লক্ষ্যপথে তাঁহারাই খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছিলেন। বেড়াটাই মুখ্য ছিল, গাছটা গৌণ। তাহার পর গাছ কখন বড় হইয়াছে, চরম পরিণতির দিকে শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারণ করিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে নিজেই তাহা জানিতে পারে নাই; সংরক্ষণী বেড়ার কথা আর তাহার মনেও নাই। অবোধ গাছ আপন মহিমাতেই মুগ্ধ। নানা দিগ্‌দেশ হইতে পক্ষিকুলকে আহ্বান জানাইতেই সে ব্যগ্র। আত্মপরিণতির চিন্তা-

লেশহীন ঔদ্ধত্য হয়তো তাহার শালীনতা ও বিবেচনা-বুদ্ধি খণ্ডিত করিয়া তাহাকে আত্মসর্বস্ব করিয়া তুলিয়াছে।

১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠের "টুকরি"ই আষাঢ়ে "পান্থ-পাদপ" হইয়া দেখা দিল। রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে হিমালয় কল্পনা করিয়া যে কবিতা লিখিয়াছিলাম, তাহার পরে ইহা আমার নবকাব্য-অভিযানের দ্বিতীয় ফসল, 'রাজহংসে'র অন্তর্ভুক্ত। আমার একমেবাদ্বিতীয়ম্ মুদ্রিত উপন্যাস 'অজয়ে'র নায়ক যে কয়জন নারীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, পান্থপাদপ তাঁহারাই; তাঁহাদের সহিত আরও কয়েকজন যুক্ত হইয়াছেন, সকলেই নিষিদ্ধ নাটকের অভিনেত্রী, শুধু একজন ছাড়া, যাঁহার সম্পর্কে মন্ত্রের সমর্থন আছে। নায়ক বলিতেছেন :

ফেল ক'রে ক'রে করিলাম বি. এ. পাস,
তারি কল্যাণে জীবন-যাত্রা আজো করি নির্বাহ,
আপনার ভুলে বাহিরের বিষে জর্জর হয়ে ফিরি,
স্নেহ-সুধারসে নূতন জীবন লভি।
আকাশের মেঘ নহে এ তো, নহে মেঘেতে বিজলি-রেখা,
পদ্মাও নহে, নহে কাঞ্চননদী,
হিমালয় নহে, সাগরের তটে ওঠে আর ভাঙে ঢেউ,
নহে ঝড়, নহে অবিরল জলধার।
ঘন অরণ্য নহে এর পটভূমি,
এ নহেকো ধু-ধু মরুময় প্রান্তর—
চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎ-দীপ নহে।
যে গাঁয়ে আমার বহু পুরুষের ভিটা,
যেথায় একদা হঠাৎ আসিয়া বিস্ময়ে আঁখি মেলি
বিচিত্র এই ধরণীর পেনু অপরূপ পরিচয়,
সে গাঁয়ের সে যে অতি-পরিচিত ছায়া-সুশীতল দীঘি,
কূলে কূলে ভরা কাকের চক্ষু জল।
তীরের বাতাস বনফুলে মধুময়,
অসীম-যাত্রী পথিক-পাখীর পাতা-ছাওয়া নীড়খানি।
বাহির-বিশ্বে ঝড়ে আর জলধারে—
হিমালয়-চূড়ে, উত্তাল-ঢেউ অসীম সাগর-বুকে,
মেঘ-বিদ্যুতে বিচিত্র ওই অগাধ শূন্য মাঝে—

বহুবল্লভী পতঙ্গ মন, খুঁজে ফিরে বিস্ময় ;
বিস্ময় যবে টুটে, মনখানি ভ'রে যায় অবসাদে—
আতপতপ্ত ধূলিধূসরিত ঘামে ভিজে ওঠে মন,
শীতল দীঘিতে ডুবিয়া শীতল হই,
পাতা-ছাওয়া নীড়ে যাপি কালো নিশীথিনী।
গ্রামের কুটীরে স্তিমিত প্রদীপখানি—
সন্ধ্যা জ্বালায়, স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত করে মন।
কিছু নাই বিস্ময় ?
কে জানিত এই গাঁয়ের দীঘিতে এতখানি বিস্ময় !
বহু বিচিত্র পসরা লইয়া নিথর সরসী-বুকে
একটি একটি করিয়া নয়ন মেলে শিশু-শতদল,
পাতা-ছাওয়া নীড়ে শাবক-কাকলি শুনি,
স্তিমিত প্রদীপে স্নেহরস তারা ঢালে।
অবাক হইয়া রহি—
নিরুদ্দেশের যাত্রী পথিক, যাত্রা ভুলিল তার।

কিন্তু যাত্রা-ভোলা পথিকের কাহিনীর শেষ এখানেই নয়। আরও আছে এবং সেই আরোর মধ্যেই তাঁহার কবি-জীবনের আসল রহস্য নিহিত আছে। তিনি উপসংহারে বলিতেছেন :

তোমরা সবাই সত্য আমার অঙ্কের ইতিহাসে,
সবাই মিথ্যা ছায়াছবি পরদায়—
অনাদি অসীম যাত্রা আমার তার ইতিহাস নাই।
মরুপথে যেবা চলিতেছে সখী, মরীচিকা গুনে গুনে
প্রহর গনিয়া চলা কি তাহার সাজে ?
আঁধি আসে আর আঁধি স'রে স'রে যায়—
ধু-ধু মরুভূমি প'ড়ে থাকে সীমাহীন।
তোমরা এসেছ, তোমরা গিয়েছ স'রে,
একে একে সখী, সব ছায়া রোদ হবে,
সব আঁধি পিছে পথের মতন পিছনে রহিবে প'ড়ে।
জননীর কোল হতে যে নেমেছে ভূঁয়ে,
প্রিয়ার আঁচল বাঁধে তারে কত দিন !
চির-পথিকের অজানা যাত্রাপথে

তোমরা, হে সখী, ছায়া-সুশীতল পাদপ হইতে পার,
আঁধার মাটিতে শিকড় গাড়িয়া আছ।
আমার জীবনে শুধু
তোমা সবাকার খণ্ড খণ্ড ছায়াময় ইতিহাস।
এর বেশি কিছু নহে,
আমি তোমাদের নহি—
চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি।

এইবার আসল কাহিনীতে আসা যাক। পোলক স্ট্রীটের মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেডের হেড আপিসে আমার সম্পূর্ণ অগোচরে আমাকে হত্যা অথবা হজম করিবার যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, কিরণ-কুমার এবং সরোজকুমারের আগমন যে তাহারই ফাতনা-আন্দোলন তাহা বুঝিতে পারিলাম আসল ছিপটি যখন দৃষ্টিগোচর হইল। নানা বৈষয়িক বৈগুণ্যের ফলে ভারাক্রান্ত চিত্ত লইয়া সদ্য-সমাগত শীত-শিহরিত অগ্রহায়ণের (১৩৩৯) এক প্রভাতে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের কম্পোজ-ঘরের টুলে একা বসিয়া প্রাতরাশ হিসাবে মুড়ি ভক্ষণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের হাঁকডাক শুনিলাম।—চির-হৈহৈ-বিলাসী শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয়ের পুরুষোচিত উচ্চকণ্ঠে "সজনী" আহ্বান শুনিয়া একটু চমকিত হইলাম বইকি! নলিনাক্ষ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু, প্রবাসী আপিসেই তাঁহার সহিত আলাপ সম্বোধনের মধ্যপর্যায়ে নামিয়াছিল। আমার আহ্বানে ঘরে ঢুকিয়াই তিনি হরফ-কেসের উপর রক্ষিত সান্‌কি হইতে এক খাবলা মুড়ি লইয়া মুখে দিতে দিতে প্রায় হুকুমের ভঙ্গিতে বলিলেন, জামা গায়ে দিয়ে এস, আমার সঙ্গে যেতে হবে। কোথায় এবং কেন, প্রশ্ন করিবার দিন আমার তখনও আসে নাই। যে ভাবে কিছুদিন পূর্বে বিরিঞ্চিবিলাসের অনুগমন করিয়াছিলাম, ঠিক সেইভাবেই নলিনাক্ষের অনুগমন করিয়া সদর রাস্তায় আসিলাম। একখানি সুবৃহৎ মোটরকার অপেক্ষা করিতেছিল, নলিনাক্ষের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া যেখানে নীত হইলাম সেটা পোলক স্ট্রীট—এবং পোলক স্ট্রীটের ২৮ নম্বর বাড়ি। বহু খণ্ডপ্রতিষ্ঠান-নদীর মিলন-সমুদ্ররূপ সেই আটাশ নম্বরের এক সুবৃহৎ এবং সুসজ্জিত কক্ষে অনন্তনাগ-শয্যায় নারায়ণের মত সকল শাখা-প্রতিষ্ঠানের প্রায় সর্বময় কর্তা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় সগৌরবে আসীন ছিলেন, বঙ্গলক্ষ্মী যে অলক্ষ্যে তখন তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন তাহাও অনুভব করিলাম। তখন মহামতি হিটলারের

সম্যক প্রাদুর্ভাব ঘটে নাই, ঘটিলে হিটলারের কথাই মনে হইত। কদমছাঁটে মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করিয়া কাটা, মুখের মধ্যে শঙ্করাচার্যের এবং নীরোর মুখভাবের একটা সমন্বয় যেন চকিতে নজরে পড়িল। আমাকে দেখিয়াই ঘূর্ণ্যমান চেয়ারে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া একটা সিগারেট-কেস খুলিলেন। লক্ষ্য করিলাম সিগারেটগুলি দুই ভাগে কর্তিত হইয়া কেসে অবস্থান করিতেছে। তাহারই একটি তুলিয়া মুখে লইয়া অগ্নিসংযোগ করিতে করিতে প্রশ্ন করিলেন, 'দৈনিক বসুমতী'র "সাময়িক প্রসঙ্গ" আমি লিখি কি না! সংক্ষেপে জবাব দিলাম, আগে লিখিতাম, এখন লিখি না। গত ২৬এ চৈত্রের কাগজের কথা তোলাতে বলিলাম, "বঙ্কিমপ্রসঙ্গ" আমারই লেখা। ব্যবসায়ী সচ্চিদানন্দ একেবারে সরাসরি কাজের কথা পাড়িলেন। 'উপাসনা' পত্রিকাকে তিনি ঢালিয়া সাজিতে চান, আমি সম্পাদক হইতে রাজী আছি কি না। ইতস্তত না করিয়া বলিলাম, রাজী আছি। তবে সঙ্কোচের সঙ্গে সাবিত্রীবাবুর চাকরির কথাও উল্লেখ করিলাম। ভট্টাচার্য মহাশয় আশ্বাস দিলেন, সে বিষয়ে চিন্তার কারণ নাই। আমাকে 'উপাসনা' সম্পাদনা ও পরিচালনার আনুমানিক ব্যয়সহ একটি খসড়া প্রস্তুত করিতে বলা হইল, এবং আরও বলা হইল যে, পত্রিকার নাম, সহকারী নিয়োগ, লেখক ও চিত্রশিল্পীদের দক্ষিণা ইত্যাদি ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা আমার থাকিবে। সেদিন ছিল পয়লা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার। আমি সাত দিনের সময় প্রার্থনা করিলাম।

একটি দুই পয়সার একসারসাইজ বুকে প্রায় খেলাচ্ছলে কবি-জনোচিত একটি পরিকল্পনা রচনা করিলাম ;—খেলাচ্ছলে, কারণ তাহা যে গৃহীত হইবে সে বিশ্বাস আমার ছিল না। মুমূর্ষু রোগীও শয়ন উপবেশন ঔষধপথ্যসেবন ব্যাপারে স্বাধীনতা চায় ; মৃত্যু-পথযাত্রী আমারও অবাধ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে দ্বিধা হইতেছিল। চাকরিটা যাহাতে না হয় পরিকল্পনায় তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। 'উপাসনা' নাম বদলাইয়া খসড়ায় নাম দিলাম 'বঙ্গশ্রী', নিজের বেতন ধরিলাম মাসিক তিন শত টাকা। লেখকদের দক্ষিণা ধরিলাম 'প্রবাসী'র আকারের কলম-পিছু দুই টাকা, বড় ও ছোট-ভেদে কবিতা পাঁচ টাকা ও দুই টাকা ; ত্রিবর্ণ চিত্রের দশ, একবর্ণ চিত্রের পাঁচ এবং কার্টুন ছবির জন্য দুই টাকা করিয়া ধার্য করিলাম। 'প্রবাসী'র অভিজ্ঞতা যথাসম্ভব কাজে লাগাইলাম।

সাত দিনের দিন অর্থাৎ ৭ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নবেম্বর, ১৯৩২) বথাটে ছোকরার কলেজ যাওয়ার ভঙ্গিতে একসারসাইজ বুক হাতে প্রায় শিস দিতে দিতে ২৮নং পোলক স্ট্রীটে প্রবেশ করিলাম। যাওয়া মাত্র ডাক পড়িল।

আমি খাতাখানি ভট্টাচার্য মহাশয়ের হাতে গছাইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলাম, একটা সিগারেট ধরাইব কি না! নলিনাক্ষ সান্ন্যালের উপস্থিতি বাধা দিল। চুপ করিয়া বসিয়া সামান্য শীত সত্ত্বেও ঘামিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ভট্টাচার্য মহাশয় মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, শুনেছি আপনার খরচের হাতটা একটু বড়, অনেক দেনাও আছে। চমকাইয়া উঠিলাম, ভয় হইল, চর লাগান নাই তো? আমার ভয় যে মিথ্যা নয়, পরে প্রমাণিত হইয়াছিল। ভট্টাচার্য মহাশয়ের সিক্রেট সার্ভিস বিভাগ খুব দক্ষ ছিল। ভোলানাথ দত্ত অ্যাণ্ড সন্স, প্রবাসী আপিস ও স্বয়ং কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত তাঁহারা ধাওয়া করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমাকে চমকাইতে দেখিয়া ভট্টাচার্য মহাশয়ের চাঁচাছোলা মুখে একটু হাসি দেখা দিল, বলিলেন, আপনার মাইনে যদিও মাসে তিন শো টাকাই গ্রাহ্য হ'ল, আপনাকে এখন দু শো টাকার বেশি দেওয়া হবে না। এক শো টাকা ক'রে জমা থাকবে। আপনারই কাজে লাগবে। আপনার খসড়ার অন্যান্য বিষয়ে আমি রাজী। আপনি একটু ব'সে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার নিয়ে যান।

আমার কিছু বলিবার বা করিবার শক্তি ছিল না। এ কি হইল? ঘুঁটি কাঁচাইবার সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থ হইল! প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ভট্টাচার্য মহাশয়ের ব্যক্তিগত সচিব প্রবোধবাবু দুইখানি টাইপ-করা কাগজ আমার সামনে ধরিলেন। দেখিলাম, পরদিন ২৪এ নবেম্বর হইতে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে শ্রীসজনীকান্ত দাস 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক ও মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন; ৫৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটে তাঁহাকে বসিতে হইবে। বাড়তি এক শত টাকার উল্লেখ কাগজে কলমে কোথাও ছিল না। সেটা মুখের কথাই থাকিল।

একটা অত্যাশ্চর্য যোগাযোগের কথা বলি। আমার ডায়েরিতে দেখিতেছি, নিয়োগপত্র হাতে পাইয়া আমি কিঞ্চিৎ অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, আমার সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতাকে আমি টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিলাম। সরাসরি বাড়ি ফিরিতে পারি নাই, কোনও বন্ধুর সঙ্গও কামনা করি নাই। পকেটে কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল, সন্নিকটবর্তী ব্ল্যাকবার্ন লেনের চীনা হোটেল ন্যানকিংয়ে তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে রাত্রি দশটা নাগাদ উটরাম-ঘাটের জেটিতে গিয়া বসিলাম। কৃষ্ণপক্ষের নবমী সেদিন।

সে কি রাত্রি! সে কি অন্ধকার!

মনে হয়েছিল এ রাত্রি কোন কালে শেষ হবে না। অনন্ত এক রাত্রির অস্তিত্ব যেন অনুভব করেছিলাম। আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে ছিলাম,

সীমাহীন অনন্ত আকাশ যেন রাত্রির সঙ্গে নেমে এসেছিল আমার চারিদিকে। মনে হয়েছিল, এ পৃথিবীতে এক শোকাহত আমি ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই ; অসীম অনন্ত অন্ধকার অকূলের মধ্যে আমি হারিয়ে গিয়েছি।

আমার ডায়েরি হইতে এ উদ্ধৃতি নয়, যদিও সেই রাত্রে ঠিক ইহাই আমার মনের কথা ছিল। উপরের উদ্ধৃতি তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্য-জীবন' হইতে; ওই একই দিনে একই সময়ে আরও মর্মান্তিক, আরও গভীরতর কারণে তিনি দিশাহারা হইয়াছিলেন—প্রিয় কন্যা বুলুর আকস্মিক বিয়োগে। তিনি লিখিয়াছিলেন :

বুলু মারা গেল ৭ই অগ্রহায়ণ রাত্রে। রাত্রি দশটায়। পরের দিন সূর্য উঠল। আলো হ'ল। কিন্তু আমার তখন অধীর অস্থির অবস্থা। মনে হচ্ছে পালিয়ে যাই। কোথায় যাই! দ্বিতীয় দিন সকালে উঠেই কাজ আছে ব'লে কলকাতা চ'লে এলাম। হাওড়ায় যখন পৌঁছুলাম তখন যেন জ্বর আসছে মনে হ'ল। স্টেশন থেকে এসে উঠলাম 'উপাসনা' আপিসে ধর্মতলা স্ট্রীটে। এসে দেখি, অভাবনীয় ব্যাপার। 'উপাসনা' উঠে যাচ্ছে। সাবিত্রীপ্রসন্ন বিদায় নিচ্ছেন। 'উপাসনা'র স্থানে 'বঙ্গশ্রী' প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সজনীকান্ত দাস আসর জাঁকিয়ে বসেছেন।

২৪এ নবেম্বর অর্থাৎ ৮ই অগ্রহায়ণ আমি নূতন চাকরিতে যোগ দিই। উপরের ঘটনা ২৫এ নবেম্বরের। আমার তখন সেখানে সসেমিরা অবস্থা, মোটেই আসর জাঁকাইয়া বসি নাই। স্বাধীনতার বিয়োগে আমিও মুহ্যমান, পালাই-পালাই করিতেছিলাম। অথচ পলায়নের পথ যে রুদ্ধ, মোটেই তাহা নহে। আমার নিজের দোষে সাময়িকভাবে আর্থিক বিপর্যয় ঘটিলেও সহৃদয় বন্ধুদের সহায়তায় তাল প্রায় সামলাইয়া লইয়াছি। 'শনিবারের চিঠি'র যশ ও আয় উত্তরোত্তর উন্নতির পথে। একটু চেষ্টা করিলেই তাহাকে তরণী করিয়া জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া কঠিন হইত না। সাবিত্রীপ্রসন্নও 'উপাসনা'তে "শনি-মণ্ডল" সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন :

'শনিবারের চিঠি'র যাঁহারা লেখক এবং উৎসাহদাতা তাঁহাদের লইয়া রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। শ্রীসজনীকান্ত দাস ইহার মধুচক্র, তাঁহাকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিয়া ফেরেন শ্রীযোগানন্দ দাস, শ্রীপ্রমথনাথ রায়, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, ডাঃ সুশীল দে, ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ইহার পৃষ্ঠপোষক। বেতারে ইঁহাদের কার্যাবলী মাঝে মাঝে শোনা যায় ইহা সকলেই জানেন।

ইহা ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয়। যোগানন্দ-অশোক-হেমন্ত তখন অন্তর্ধান হইয়াছেন; সুনীতিবাবু পৃষ্ঠপোষক আছেন, কিন্তু বড় একটা আসেন না। মোহিতলাল, সুশীলকুমার ঢাকা হইতে নিয়মিত লিখিতেছেন, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী কলিকাতা হইতে। গবেষণাব্যাপারে ব্রজেন্দ্রনাথ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং কার্টুন ছবিতে বনবিহারী ও ও প্রফুল্লচন্দ্র (পি. সি. এল.) অবিশ্রান্ত সহায়তা করিয়া চলিয়াছেন। ইতালীয় ভাষাবিদ্ প্রমথনাথ রায় তখন অসুস্থ হইয়া রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে আমার হেপাজতে ছিলেন বটে। কিন্তু আসলে তখন 'শনিবারের চিঠি' আসর মাৎ করিতেছিল রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' ও 'স্বতকুম্ভ', প্রমথনাথ বিশীর 'মন-জুয়ান' ও 'বিদ্যা-সুন্দর', সদ্য-সমাগত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'জামাইষষ্ঠী' এবং আমার অজস্র অফুরন্ত ব্যঙ্গ ও গম্ভীর গদ্য-পদ্য রচনার দ্বারা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে রবীন্দ্রনাথের নিয়োগ এবং সাতান্ন বর্ষ বয়সে শরৎ-জয়ন্তী প্রধানত আমাদের লেখনী-কণ্ডূয়নের উদ্দীপনা যোগাইয়াছিল। তথাকথিত অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা তখন ছত্রভঙ্গ। আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলির দিকেই আমরা নজর দিয়াছিলাম বেশি; অস্পৃশ্যতা ও অশিক্ষা দূরীকরণই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ফলে 'শনিবারের চিঠি' শুধু সাহিত্যিক সমাজের কৌতূহলোদ্দীপক পত্রিকা হইতে ধীরে ধীরে একটা সর্বজনীন রূপ লইতেছিল।

ঠিক এই অবস্থায় 'বঙ্গশ্রী'র শ্রীসম্পাদনে আমার অন্তরের সায় ছিল না। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক আমি থাকিতে পাইব না—চাকরির এই শর্ত আমার মারাত্মক মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছিল। চাকরিতে যোগ দিয়া যথারীতি কর্মাধ্যক্ষের আসনে বসিতেছিলাম, সহায়ক সাহিত্যিক মণ্ডলী অনুগ্রহ করিয়া ভিড়ও করিতেছিলেন, কিন্তু আমি দিনের চাকরির শেষে এক রকম উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছিলাম। সেই নিদারুণ বিষাদ-যোগে রবীন্দ্র মৈত্র ও ব্রজেন্দ্রনাথ আমাকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার অবকাশ আমি পাইয়াছিলাম, কর্মাধ্যক্ষরূপে প্রথম কয়েক দিন কাগজপত্রে কয়েকটা সহিমাত্র করিতে হইয়াছিল, পৌষের অর্থাৎ শেষ সংখ্যা 'উপাসনা' বাহির করিবার দায়িত্ব ছিল সাবিত্রীপ্রসন্নের। তিনি আমাকে লেখার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমি একটি কবিতা দিয়া ছুটি পাইয়াছিলাম। আমার মনের অব্যবস্থার কথা ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ জানিতেন না; আপিস ছুটি হইবার মুখেই দেখিতাম, তাঁহাদের দুইজনের একজন হাজির হইয়াছেন, কোনও কোনও

দিন দুইজনই। ব্রজেন্দ্রনাথ ঘরমুখো মানুষ, কিঞ্চিৎ কর্মযোগ আওড়াইয়া বিদায় লইতেন, রবি আমাকে ধরিয়া লইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসিত, সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে তাহার নানা পরিকল্পনার কথা বলিয়া আমাকে উৎসাহিত করিত। 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র অভিনয়-সাফল্য সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ ছিল এবং ইহা দ্বারা শুরু করিয়া বাংলা রঙ্গমঞ্চে সে নূতন প্রাণ-সঞ্চার করিবে—এ কথাও জোরের সঙ্গে বলিত। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় আর্ট থিয়েটারে (স্টার) তখন 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র মহড়া চলিতেছিল। আমি 'বঙ্গশ্রী'র ভার গ্রহণ করিলে 'শনিবারের চিঠি' চালাইবার সমস্ত দায়িত্ব সে লইবে—এই আশ্বাস দিয়াছিল, যদিও আমার নূতন চাকরির দ্বিতীয় দিনেই শ্রীপরিমল গোস্বামী উক্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, রবির উৎসাহ ও আশ্বাসে আমি বাহিরে ধীরে ধীরে স্থৈর্য লাভ করিতে লাগিলাম, কিন্তু মনের গহনে আমার কবিসত্তা অশান্ত হইয়াই রহিল। তারাশঙ্করের দেওয়া বাহিরের এই বর্ণনা নিখুঁত—"'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্তকে ঘিরে নতুন কালের সাহিত্যরথীর সমাবেশ হয় নিত্য নিয়মিত। গল্পগুজবে, হাস্য-কৌতুকে, আলাপে আলোচনায়, চায়ে পানে, সিগারেটে বিড়িতে মধ্যে মধ্যে মুড়ি-বোঁদেতে, ভাজা চিনাবাদাম ছোলাতে মিশিয়ে সরগরম মজলিস।" কিন্তু যাহাকে কেন্দ্র করিয়া মজলিস, তাহার বুকে আদর্শচ্যুতির হাহাকার, বন্দী খাঁচার পাখীর অসহায় অন্তর্দাহ। মনে হইত, চাকরির শর্তপত্রে সর্ববিধ স্বাধীনতার উল্লেখ কথার কথামাত্র, আসলে 'বঙ্গশ্রী'র পায়ে বঙ্গবাণীকে আত্মনিবেদন করিতেই হইবে। 'উপাসনা'র শেষ সংখ্যার জন্য (পৌষ ১৩৩৯) সাবিত্রীপ্রসন্নকে যে কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে অজ্ঞাতসারে অন্নপূর্ণাকে জাগাইবার জন্য কাতর আহ্বান ছিল। শিব ক্ষুধায় কাতর। অন্নপূর্ণা জাগো—অন্নপূর্ণা না জাগিলে কি ঘটিবে সে ইঙ্গিতও ছিল :

> জানি একদিন সতীহারা শঙ্কর
> চমকি জাগিবে প্রলয়ঙ্কররূপে,
> ফেলে বাঘছাল নাচিবে দিগম্বর,
> কাঁপন লাগিবে মৃত-কঙ্কাল-স্তূপে।
> আজো আসে নাই সেই ঘোর দুর্দিন,
> শিবের ঘরণী গাঢ় নিদ্রায় লীন,
> জাগে মহাকাল শঙ্কিত দীনহীন—

'জাগো প্রিয়া জাগো' ডাকিতেছে চুপে চুপে।
সে ডাকে বিশ্ব কাঁপিয়া উঠেছে মা গো—
জাগো শঙ্করী, অন্নপূর্ণা জাগো।

শিল্পীবন্ধু শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় একটি রঙিন ছবিতে এই ভাবকে রূপ দিয়াছিলেন, ফাল্গুনের 'বঙ্গশ্রী'র মুখপাত হিসাবে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

মনের এই অবস্থায় নূতন আপিসে সাহিত্যিক হৈ-হৈ হট্টগোলের মজলিসের পর এক-একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে একা পথে বাহির হইয়া পড়িতাম, পায়ে হাঁটিয়া কখনও গঙ্গার ধার, কখনও বালিগঞ্জের লেক পর্যন্ত চলিয়া যাইতাম, অনেক রাত্রে শ্রান্তক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে ফিরিয়া আসিতাম। ফিরিবার পথে মনে হইত, এই কর্মব্যস্ত নগরী, এমন কি নিখিল চরাচর নিদ্রামগ্ন, আমিই একা জাগিয়া আছি। রসা রোড ও রাসবিহারী অ্যাভেনিউ জংশনের কাছে একদিন দেখিলাম, পৌষের নিদারুণ শীতের মধ্যে চারিজন শববাহক কাঁধের বোঝা লইয়া ক্লান্ত চরণে চলিয়াছে, বিবিধ জড়তার মধ্যে তাহাদের "বল হরি হরিবোল" অতি ক্ষীণ ও করুণ শুনাইতেছিল। আমার মন এমনিতেই চড়া সুরে বাঁধা ছিল। আমি তাহারই মধ্যে সমস্ত জীবন ও জগৎকে ব্যঙ্গ করিয়া মহাকালের অট্টহাসি শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, ইহাই শেষ, ইহাই সমাপ্তি; ইহার পরে আর কিছু নাই; নিঃশেষ মৃত্যুই মানুষের অনিবার্য পরিণতি। অকস্মাৎ নিকটের কোনও দোতলা হইতে সদ্যোজাত শিশুর তীব্রতীক্ষ্ণ ক্রন্দন উত্থিত হইয়া নগরীর ধূম্রধূলিকুয়াশা-লাঞ্ছিত আকাশমণ্ডলকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিমূঢ় জড়তাগ্রস্ত আমার চিত্তে বিদ্যুদ্দীপ্তিবৎ নূতন চেতনার সঞ্চার হইল, আমার দেবতা যেন এক নিমেষে আমাকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন—মাভৈঃ, এই অনন্ত অখণ্ড প্রবাহের শেষ নাই। প্রতিমুহূর্তেই ধ্বংস ও মৃত্যুকে উপহাস করিয়া নবজাতকের নূতন জন্ম হইতেছে, নবীন কিশলয় শুষ্ক গলিত পত্রের স্থান লইতেছে। সেই এক মুহূর্তে আমার ব্যর্থ ব্যথিত হতাশ জীবনের নবজন্মান্তর ঘটিল, আমি মরিতে মরিতে আবার বাঁচিয়া গেলাম।

সেই রাত্রেই লিখিলাম "কে জাগে?" লিখিলাম:

শহরে সবাই ঘুমে অচেতন, জেগে আছে পেট্রোল,
বি-ও-সি এবং সোকোনি এবং শেল—
কারো আঁখি লাল, কারো চোখ দুধ-সাদা।

আর জেগে রয় রাস্তার মোড়ে বীটের পুলিস যত ।—
পৌষের শীত রাত্রি দুপুর বাজে ।

*   *   *   *

জাগিয়া রয়েছে কবি,
গগনে গগনে অনাহত ধ্বনি, ধ্বনি মঙ্গলময়,
মলিন যা কিছু, যা কিছু অকল্যাণ—
সবারে ঢাকিয়া সেই স্বর যেন নিখিল ছাপিয়া উঠে,
নয়ন ভাসিয়া যায় ।

আর জাগে ভগবান—
জাগে নির্গুণ পরমব্রহ্ম, জাগেন নির্বিকার ;
ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর,
অঙ্কুর মেলে পাতা, সেই পাতা শুকায়ে ঝরিয়া পড়ে—
তারে তিনি দেন কোল ।
জাগে অশক্ত সর্বশক্তিমান—
জাগ্রত ভগবান !

শুধু হাসে মহাকাল—
হা-হা সেই হাসি শুনিলাম যেন রজনী-দ্বিপ্রহরে,
শীতের রাত্রি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াশা গলিয়া পড়ে—
জনহীন রসা রোড—
চলে চারিজন ক্লান্ত চরণে ক্ষণে বদলিয়া কাঁধ,
মুখে অতি ক্ষীণ—বল-হরি-হরিবোল ।
মহাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে !
সে ক্রূর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত দোতলায়
নবজাত শিশু ককিয়ে কাঁদিয়া উঠে—
সেই জাগে চিরকাল ।

এই কবিতার আকারে অভয় আসিয়া আমার সকল ভয় হরণ করিল, আমার মনের 'রাজহংস' ডানা মেলিয়া আকাশে উড্ডীন হইল, নূতন চাকরি যে জগদ্দল পাথরের বোঝা আমার বুকে চাপাইয়াছিল, শরতের মেঘের মত

তাহা লঘু হইয়া গেল, নিঃশঙ্ক দৃঢ় চিত্তে নূতন কর্মভার গ্রহণের জন্য আমি প্রস্তুত হইলাম। সাবিত্রীপ্রসন্ন 'উপাসনা'র শেষ সংখ্যা বাহির করিয়া তখন বিদায় লইয়াছেন, পৌষের মাঝামাঝিকালে অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি' "কে জাগে"-বক্ষে বাহির হইয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছে, পরিমল গোস্বামী সকল দায়িত্ব লইয়া সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, ১৫ই পৌষ সন্ধ্যায় 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র প্রথম অভিনয়ের অভাবনীয় সাফল্য রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শনি-মণ্ডলকে জয়যুক্ত করিয়াছে, নূতনের অর্থাৎ 'বঙ্গশ্রী'র জন্মের সকল আয়োজন এ দিকে সম্পূর্ণপ্রায়। মায়ামন্ত্রবলে আমার জীবনের হতাশা ও অবসাদ নূতন সম্ভাবনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমার দ্বিতীয় পর্যায় কবিজীবনের ভিত্তি 'রাজহংসে'র নাম-কবিতায় এই সময়েই আমার মুক্ত মনের অবাধ আনন্দ-বিহারের প্রকাশ এইভাবে হইয়াছে :

উড়িয়াছে রাজহংস মেঘাস্তৃত সুনীল আকাশে
দুই পক্ষ বিস্তারিয়া শূন্যে করি স্থিতির নির্ভর—
গতির নির্ভর করি আকাশের লঘু বায়ুস্তরে,
কবে সে করেছে যাত্রা, ছাড়িয়াছে মাটির আশ্রয়,
কবে উত্তরিবে গিয়া তারো নাহি জানে সে ঠিকানা
টলমল গাঢ়নীল হিমবক্ষ মানসের তীরে।
উপলমুখর সেই মেঘচুম্বী পাহাড়ের কোলে
নীড়ের আশ্রয় তার।
সে আশ্রয়ে নীড় আর শাবকের মাঝে
দিশাহীন নভোযাত্রী ক্ষণকাল রহে তার স্থির .
বাহিরের স্থূল ডানা হয়তো ধূলায় মিশে যায়,
অন্তরের সূক্ষ্ম পক্ষ যুগে যুগে চলে ঝাপটিয়া।
শত শত জন্ম-বিবর্তনে—
সেথা তার নাহিক বিশ্রাম,
ক্লান্তি নাই, ক্ষোভ নাই তার।
ধরণীর রাজহংস জীবনের অনন্ত প্রতীক—
উড়িছে অনন্তকাল মহাকাল-আকাশ-সাগরে;
নিয়ে কাল-কালিন্দীর তম-শীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ
ডাকিতেছে যুগে যুগে ঝাঁপ দিতে সে তিমিরনীরে॥
ধরিতে পারে না তারে, ঊর্ধ্বে তার বিরাট প্রয়াণ॥

উচ্চে নীচে চলে দুই গতির প্রবাহ,
চলিবে অনন্তকাল, মিশিবে না কভু একেবারে।
কোটি কোটি গ্রহ-চন্দ্র কোটি তারা পাইবে বিলয়,
লক্ষ সৃষ্টি ধ্বংস হবে, জন্ম লবে সৃষ্টি নবতন।

সেই দিন সেই অতিশয় দুঃসময়ে আমার মানস-সরস্বতী আমাকে যে মহাজীবন-পথের ইঙ্গিত দিলেন, সুখে দুঃখে সেই পথকেই আমি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি। আমার সান্ত্বনা এই যে, সেই পথ ভূমার পথ, ক্ষুদ্রের নয়।

সপ্তদশ তরঙ্গ

'বঙ্গশ্রী' ও রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

১৩৩৯ পৌষেই প্রকৃতপক্ষে আমি গদিতে বসিলাম। ১লা মাঘ প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' বাহির হইবে ; তোড়জোড় শুরু হইয়া গেল। তোড়জোড় অর্থে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের প্রত্যহ আকর্ষণ করিয়া আনিবার মত আড্ডা জমানো। 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি'র কল্যাণে আর কোনও কাজে না হউক, ওই কার্যটিতে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলাম। মূলধন ছিল অসীম ধৈর্য। বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত কুরূপ-প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী-কটুভাষী বেকুব-বুদ্ধিমান ভাবুক-কর্মী সৎ-বদমাস বহুবিধ বিচিত্র মানুষকে লইয়া যিনি দুনিয়ায় আসর জমাইতে পারেন, তিনিই অবতাররূপে পূজিত হন। এরূপ একটি ছোটখাট অবতার না হইলে মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে কাগজ চালানো সম্ভব নয়। আমার ত্রিশ বৎসরের কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতায় এই প্রত্যয় দৃঢ়তর হইয়াছে। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা অধিক ভাবপ্রবণ, কাজেই সম্পাদকত্বে প্রতিষ্ঠা অবতারত্বে প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা দুরূহতর সাধনা। আমি স্বভাবসুলভ ধৈর্য ও দীর্ঘদিনের অভ্যাসের দ্বারা এই সাধনায় প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম। ধৈর্যের দিক দিয়া আমার আদর্শ ছিলেন একমাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আমি যখন তাঁহার সংস্পর্শে আসি তখন আড্ডা জমাইবার বয়স তাঁহার ছিল না, তবে যৌবনে 'দাসী' 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী'র প্রারম্ভযুগে তিনি যে সাহিত্য-মজলিসী ছিলেন তাহার প্রমাণ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের "বাঙাল বাঁকুড়াবাসী দুষ্ট রামানন্দ" প্রভৃতি কবিতার পংক্তিতে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘজীবনের কয়েকটি খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন বৎসর 'সাধনা' 'ভারতী' 'বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)' 'ভাণ্ডার' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রভৃতির সম্পাদকত্ব

করিতে গিয়া এমনই বিপর্যস্ত হইয়াছিলেন যে, পত্রিকা-সম্পাদকের কাজের কথা মনে হইলেই বিভীষিকা দেখিতেন; কাহারও নিষ্ঠুরতম পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিলে তিনি বলিতেন, লোকটা মরিয়া মাসিকের সম্পাদক হইবে। সাহিত্যিকের জীবনে ইহা অপেক্ষা কঠিন শাস্তি তিনি কল্পনা করিতে পারিতেন না। অনেক দিনের তালিমী সত্ত্বেও 'বঙ্গশ্রী'র আমলে বিবিধ জন-সমাগমের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আমিও মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতাম —'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র নকল গুরু শিয়ালমারার মত বিদ্রোহ করিতে ইচ্ছা হইত। বহু কষ্টে সামলাইয়া লইয়া আসর জাঁকাইয়া বসিয়া থাকিতাম। গুণী ও সুধী ব্যক্তিরা আসিতেন, অবসর ও মর্জি-মত আড্ডা দিয়া চলিয়া যাইতেন। আমি একা স্থাণুবৎ সম্পাদকীয় চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়া তিতিক্ষার পরীক্ষা দিতাম। পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, মৎ-সম্পাদিত দুই বৎসরের 'বঙ্গশ্রী'ই তাহার প্রমাণ।

এ যুগের সাময়িকপত্র-পরিচালকদের আমার এই কাহিনী হইতে কিছু শিখিবার আছে। পত্রিকা-আপিসে ঢালাও আড্ডা অর্থাৎ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতি যথোপযুক্ত সমাদরের অভাবে আমাদের কালেই বহু জমজমাট পত্রিকার পতন হইয়াছে, অনেকগুলি বিলকুল মরিয়া গিয়াছে। সাহিত্যিকের আড্ডাই সাহিত্য-পত্রিকার প্রাণ; ঢিলাঢালা স্বাচ্ছন্দ্য, তক্তপোশ তাকিয়া তামাক তাম্বুল অবাধ রাজা-উজিরমারী গল্প অথবা তীক্ষ্ণ কথার তরবারিক্রীড়ার মধ্যেই সাহিত্যের আড্ডা স্ফূর্তি লাভ করে। আজকালকার টেবিল-চেয়ার-টেলিফোন-সমন্বিত সাময়িক পত্রিকার আপিসগুলি পাশ্চাত্ত্য আদর্শে নিছক কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি-ধরা ভাবে চালাইতে গিয়া কর্তৃপক্ষ হয়তো ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করিতেছেন, কিন্তু ফালতু স্বর্ণখণ্ডরূপ (ক্যাটালিটিক এজেন্ট) আড্ডার অভাবে সাহিত্য-মকরধ্বজে দানা বাঁধিতেছে না, স্বর্ণ-সিন্দুরেই ব্যর্থ হইতেছে। সাহিত্যের বিকাশ ও প্রকাশের পক্ষে মা-লক্ষ্মীর চেক-দাক্ষিণ্যই যথেষ্ট নয়, চক্রে বসিয়া চা ও চুরুট-সহযোগে বাক্ ও বাৎ-এর অবাধ সাধনাও প্রয়োজন। শুধু সাহিত্য-পত্রিকার আপিসগুলিই নয়, শিল্পীদের স্বর্গধাম অল-ইণ্ডিয়া-রেডিওর কলিকাতা শাখারও ফরাসি-ফরাস ছাড়িয়া বিলাতীকেতাদুরস্ত হইতে গিয়া সাহিত্যিক-শিল্পীদের কাছে আর সে আকর্ষণ নাই। তাহার ফল ভাল হয় নাই।

সম্পাদক-কাম-জেনারেলম্যানেজাররূপে ৫৬নং ধর্মতলা স্ট্রীট ভবনের দখল পাইয়াই আমি সর্বাগ্রে আড্ডার সুব্যবস্থা করিলাম। তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্য-জীবনে' লিখিয়াছেন:

> 'বঙ্গশ্রী'র আসরে সজনীকান্তের মহল ছিল তিনটে। প্রথম মহলে থাকতেন কিরণ রায়, তিনি আপ্যায়িত করতেন নূতন আগন্তুকদের; তার পরের মহল ছিল সজনীকান্তের সম্পাদকীয় দপ্তর; এখানেই বসত এই বিখ্যাত মজলিস। এর পর ছিল তাঁর খাসমহল, এখানে চারিদিকে ঠাসা ছিল হাজার পাঁচেক বই, এরই মধ্যে তিনি লেখাপড়ার কাজ করতেন এবং গভীর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

তারাশঙ্কর আর একটা মহলের খবর দিতে ভুলিয়াছেন। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেডের শাস্ত্র-প্রকাশ-বিভাগের সদাচার-সম্পন্ন পণ্ডিতেরা ফরাস-তাকিয়া-সজ্জিত একটা প্রকাণ্ড হলঘরে পুথিপত্র খুলিয়া কাজ করিতেন। তাঁহারা বিদায় হইলে মাঝে মাঝে সেটি হইত আমাদের সঙ্গীত-জলসা-মহল। প্রধানত নলিনীদা—নলিনীকান্ত সরকার এই আসরে একসঙ্গে আদি ও অনাদি রসের জোগান দিতেন, আমরা চিৎ অথবা কাৎ হইয়া সুরতানময় রসের সাগরে ভাসিতে থাকিতাম। সেটিকে নিষিদ্ধ মহলও বলা চলে।

এই চার মহলের চার ফেলিয়া শাশ্বত সহকারী কিরণকুমারকে পুরোভাগে রাখিয়া আমি ধৈর্যসহকারে বসিয়া থাকিতাম। সৌভাগ্যক্রমে শুরু হইতেই রুই-কাতলা-চুনো-পুঁটির সমাগম হইতে থাকিত। রাঘববোয়াল-হাঙ্গর, তিমি-তিমিঙ্গিল জাতীয় দুই-একজন যে না আসিতেন তাহা নহে। তারাশঙ্কর তালিকা দিয়াছেন:

> অধ্যাপক সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমূল্য সেন, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ, স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত সরোজ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, চিত্রকর শ্রীযুক্ত চৈতন্য চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, কবি সুবল মুখোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী অরবিন্দ দত্ত, স্বর্গীয় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়,…মধ্যে মধ্যে আসতেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, কবি অজিত দত্ত, বিখ্যাত চিকিৎসক উদার আত্মভোলা শ্রীরাম অধিকারী; কখনও কখনও আসতেন শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়, শিল্পী শ্রীঅতুল বসু, শ্রীব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে আসতেন এবং আসর জমিয়ে তুলতেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

কয়েকজন আড্ডাধারীর নাম এই তালিকায় বাদ পড়িয়াছে, যথা—ঢাকা-প্রবাসী মোহিতলাল মজুমদার, ডঃ সুশীলকুমার দে ও ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ

(কলিকাতায় আসিলে), নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ডঃ মনোমোহন ঘোষ; কবি কৃষ্ণধন দে, মনোজ বসু, মহাজনপদাবলী-বিশারদ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডঃ প্রমথনাথ রায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, স্ট্যাটিস্টিশিয়ান যতীন্দ্রমোহন দত্ত, রূপদক্ষ যামিনীকান্ত সেন, "বৃদ্ধের বচন"খ্যাত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, সটীক শশাঙ্কমোহন চৌধুরী, পক্ষীতত্ত্ববিদ্ সুধীন্দ্রলাল রায়, কবি হেমচন্দ্র বাগচী, কবি সুধীরকুমার চৌধুরী, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও "কালো রবি" নামে খ্যাত 'নারায়ণে'র বহুনিন্দিত লেখক সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। আসর রীতিমত জমিয়া উঠিতে সপ্তাহ খানেকের বেশী সময় লাগে নাই। কাজী নজরুল ইসলাম রাত্রি গভীর হইলে কোন কোন দিন ধূমকেতুর মতন উদয় হইয়া চাদরের পুচ্ছতাড়নায় ও গানে পবিত্র শাস্ত্রপ্রকাশ-বিভাগকে পবিত্রতর করিতেন, সঙ্গে থাকিতেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—আমাদের পবিত্রদা। বন্ধুবর গোপাল হালদার তখন আলিপুরদুয়ারের বক্সা-ফোর্টে আটক ছিলেন, সুনীতি-কুমার-মারফত তাঁহার দীর্ঘ দীর্ঘ চিঠি আসিলে সকলে মিলিয়া পড়া হইত; মাদ্রাজ প্রবাস হইতে শিল্পী দেবীপ্রসাদ আসিলে হৈচৈ-এর অন্ত থাকিত না।

মোটের উপর, বাংলা-সাহিত্যে উদিত ও উদীয়মান প্রায় সকলেই আসিয়া ধরা দিয়াছিলেন ; দীনেশরঞ্জন দাস, মুরলীধর বসু ও যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক) সহ গোটা 'কল্লোল'-'কালি-কলম' দলটাই আসিয়া জুটিয়াছিলেন, আসেন নাই কেবল অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব। অনেক পরে রামকৃষ্ণরসায়িত অচিন্ত্য-কুমারের উদার স্পর্শলাভের সুযোগ ঘটিয়াছে, কিন্তু ধ্যানী-মৌনী বুদ্ধদেবকে টলাইতে পারি নাই।

'বঙ্গশ্রী'র বিভাগীয় বৈশিষ্ট্য কি কি হইবে এবং ধারাবাহিক কোন্ কোন্ রচনা ইহাতে স্থান পাইবে অচিরাৎ স্থির হইয়া গেল। বিভাগগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—প্রচলিত পত্রিকাসমূহ অপেক্ষা কিছু বৈচিত্র্য এইগুলিতে ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন' প্রভৃতি বিদেশী পত্রিকা হইতে সঙ্কলন করিয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব মনোরম ভঙ্গিতে সচিত্র "বিচিত্র জগৎ" লিখিতে লাগিলেন। বিষ্ণুশর্মা (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) আমাদের "অন্তঃপুরে"র অতি প্রয়োজনীয় কথা সরসভাবে লিখিয়া একটা নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিলেন, বাংলার আর্থার মী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অচিরাৎ আসিয়া বাংলা দেশের বিদ্যার্থীদের জন্য "চতুষ্পাঠী" খুলিয়া বসিলেন, কিরণকুমার ও শশাঙ্কমোহন চৌধুরী "সন্ধানী" বিভাগে পৃথিবীর নবতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মকথা শুনাইতে লাগিলেন। প্রথম কিছুকাল জীবতত্ত্ববিদ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার সুবিখ্যাত "বিজ্ঞান-জগৎ" লইয়া উপস্থিত হন নাই বলিয়া

একদা-বিজ্ঞানের-ছাত্র আমি "সৃষ্টি-রহস্য" নাম দিয়া বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ লিখিতে লাগিলাম। পুস্তক ও পত্রিকা-পরিচয়ের ভারও নিজের হাতেই রাখিলাম। 'বঙ্গশ্রী'র সেই 'বিচিত্র জগৎ' ও 'বিজ্ঞান-জগৎ' আজ পুস্তকাকারে বিধৃত হইয়া বাংলা-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে গণ্য হইয়াছে। "অন্তঃপুর" ও "চতুষ্পাঠী" পুস্তকের স্থায়ীরূপ লয় নাই বলিয়া মনে মনে আমার ক্ষোভ আছে। প্রমাণ-সাইজের নূতন সাময়িক পত্রিকা যাঁহারা বাহির করিবেন, তাঁহারা 'বঙ্গশ্রী'র এই বিভাগগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলে উপকৃত হইবেন।

শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র এক-একখানি উপন্যাস লইয়া উপস্থিত হইলেন, আমি নিজে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুবাদের মধ্য দিয়া ('রাজমোহনের স্ত্রী') আসরে নামাইলাম। ধারাবাহিক উপন্যাসের দিক দিয়া 'বঙ্গশ্রী' একরূপ নিশ্চিন্ত হইল।

সৃষ্টিধর্মী গল্প ও কবিতার নির্বাচনে আমার বিচারবুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও সজাগ রাখিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, বঙ্গ-বীণাপাণির বীণার ওই দুইটি তারই প্রধান। গল্পে যাঁহাদের বাছাই করিয়াছিলাম তন্মধ্যে সীতা দেবী, সরোজকুমার, মনোজ, রবীন্দ্র মৈত্র ও সুধীরকুমার চৌধুরী তখনই খ্যাতনামা, প্রথম ছয় মাসে ইঁহাদের প্রত্যেকের মাত্র একটি করিয়া গল্প নির্বাচিত হইয়াছিল। সর্বাধিক সম্মান পাইয়াছিলেন প্রায়-নবাগত তারাশঙ্কর; তাঁহার দুইটি গল্প প্রথম ছয় মাসে 'বঙ্গশ্রী'কে অধিকতর শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিল। বস্তুত, এই গল্প দুইটি হইতেই বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার জয়যাত্রা শুরু। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "এইখানে যাত্রা শুরু হ'ল 'বঙ্গশ্রী'তে।" 'বঙ্গশ্রী'র কবির সংখ্যা খুবই কম—মোহিতলাল, সুশীলকুমার, প্রমথনাথ বিশী, কৃষ্ণধন দে ও হেমচন্দ্র বাগচী। তৎকালীন প্রমথনাথের "পৃথ্বীরাজে"র "অযুত কণ্ঠে ওঠে বন্দনা, অযুত কণ্ঠে 'পৃথ্বীরাজ' " অথবা "শকুন্তলা"র "গাহিবে সে সুর, আঁখি ভরপুর, আজি কতদূর—শকুন্তলা" এবং কৃষ্ণধন দের "নিশির ডাকে"র "চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল—খোল বধূ দ্বার খোল"—আজিও আমার মনে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরে।

বঙ্গ-সাহিত্যে 'বঙ্গশ্রী'র সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দান ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেনের "বুদ্ধকথা," তৎপরেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়" এবং সুকুমার সেনের (অধুনা ডক্টর) "বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য" ও "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"। আমার স্বল্প দুই বৎসরের কার্যকালের মধ্যেই 'বঙ্গশ্রী'র এইগুলি কীর্তি। এই চারখানিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য-পিপাসুদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছে।

অমূল্যচন্দ্রের সঙ্গে আমার পুরাতন পরিচয়; খ্রীষ্টধর্ম-প্রভাবিত ডাফ হস্টেলে

যে দুই-একজন কালাপাহাড়ী হিন্দু সাহস করিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম ১৯২০ সনে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি কোথায় কি ভাবে ছিলেন আমার জানা ছিল না। দেখিলাম, তিনি বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম বিষয়ে বিশেষ গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। তিনি "বুদ্ধকথা"র সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সহই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন—দুই-চার পাতা উল্টাইয়াই অনুভব করিলাম, অমূল্যচন্দ্রের কৃপায় একটি অমূল্য রত্ন হাতে পাইয়াছি। বাংলা ভাষায় বুদ্ধকথা এরূপ চমৎকারভাবে আর কখনও লেখা হয় নাই, এমন বিস্তারিতভাবেও নয়। রত্নটি সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না। 'বঙ্গশ্রী'তে ইহার ধারাবাহিক প্রকাশ বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যথেষ্ট আনন্দ বিধান করিয়াছিল। অমূল্যচন্দ্র তাঁহার গবেষণা সমাপ্ত করিবার জন্য এই ঘটনার অব্যবহিত পরে জার্মানি গিয়া ডক্টরেট-ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। বিষয়ান্তরে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার 'বুদ্ধকথা'ও দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

সুকুমার সেন মহাশয়কে বাংলা গদ্য ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করিবার কৃতিত্ব আমার। তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' পুস্তকাকারে আমিই প্রকাশ করি। তিনি আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে অন্যতম প্রধান গবেষক। তারাশঙ্কর যেমন মৌলিক সৃষ্টি ব্যাপারে 'বঙ্গশ্রী'র অক্ষয় কীর্তি, ডক্টর সেন তেমনই গবেষণার ব্যাপারে।

সপ্তাহকালের মধ্যেই প্রথম দুই সংখ্যার জন্য প্রায় তৈয়ারী হইলাম, গোল বাধিল প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের গৌরব কাহাকে দিব তাহা লইয়া। জীবিতকে এই সম্মান দিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হইতে হয়। হেমন্তবালা দেবীর দৌত্য সত্ত্বেও আমার প্রতি তাঁহার বিরূপতা সম্পূর্ণ কাটে নাই। তাঁহার নামে প্রেরিত 'বঙ্গশ্রী' 'শনিবারের চিঠি'র মতই ফেরত আসাতে এই মর্মান্তিক সত্য আরও প্রকট হইয়াছিল। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইতে সাহসী না হইয়া মৃতের দরবারে হাত পাতিতে হইল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-ভবনীয় দীর্ঘকাল-বৈঠাবাহী রামকমল সিংহের কৃপায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা "ভারত-বর্ষের ধর্মের ইতিহাস" দিয়া গোড়াপত্তন হইল।

ঠিক ১লা মাঘ তারিখে (১৩৩৯) "শ্মশান-ঘাট" (তারাশঙ্কর) ও "ম্যালেরিয়া" (সরোজকুমার)-সমৃদ্ধ 'বঙ্গশ্রী' আত্মপ্রকাশ করিল। শিল্পী হরিপদ রায়ের হংস-লাঞ্ছন-প্রচ্ছদ-শোভিত 'বঙ্গশ্রী' সর্বত্র সমাদৃত হইল, আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। চাকরি-সংশ্লিষ্ট লোক ছাড়া সর্বাধিক হৈ-চৈ

করিলেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবির একটি গল্প প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি অসাহিত্যিকসুলভ উদারতায় তারাশঙ্করের "শ্মশান-ঘাট"কে স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তারাশঙ্কর তাঁহার 'সাহিত্য-জীবনে' এই কারণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছেন।

সুনীতিকুমার আয়র্ল্যাণ্ড জার্মানি প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সচিত্র কাহিনী দিয়া গোড়া হইতেই 'বঙ্গশ্রী'র আসর জমাইয়া ফেলিলেন। পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশের "সাগা" বা বীর-কাহিনীগুলি বাঙালীকে শুনাইবার ঝোঁক তাঁহার বরাবরই আছে। 'বঙ্গশ্রী'তে দুই-একটি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে তাঁহার বিবিধ কাজের প্রচণ্ড চাপ সরাইয়া তিনি যদি অন্তত এই কাজটি সম্পূর্ণ করিতে পারেন, বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী কীর্তি অর্জন করিবেন। সুনীতিবাবুর সঙ্গে সঙ্গে সত্যসুন্দর দাস (মোহিতলাল), হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বৃটকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতির কল্যাণে 'বঙ্গশ্রী'তে সাহিত্য-প্রবন্ধের যেন বান ডাকিল। একটু মাথা ঘামাইতে হয় প্রথম মুখপাতের প্রবন্ধের জন্য। দ্বিতীয় সংখ্যায় পুনরায় রামকমলদার কৃপায় প্রখ্যাত 'সাধারণী'-সম্পাদক বঙ্কিমবন্ধু অক্ষয়চন্দ্র সরকার "সেকালের টোলে"র কথা শুনাইতে আসিলেন। পুরাতনপন্থী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রবন্ধটি আমার মান বাড়াইল।

সুখ-সমৃদ্ধির কথা বলিলাম, এইবারে দুঃখের কথা বলি। ১লা ফাল্গুন 'বঙ্গশ্রী'র দ্বিতীয় সংখ্যা বাহির হইল, সেই দিন সায়াহ্নে পোলক স্ট্রীটের হেড আপিসে কর্তার কাছে হাজিরা দিতে হইল। পরের দিন ১৪ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ধর্মতলার আপিসে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের উৎসব। এই দিনটির কথা বিশেষভাবে আমাব স্মরণ আছে, কারণ এই দিনই আমার সাহিত্যপথের ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী বন্ধু রবি মৈত্রের সহিত শেষ দেখা। আসরে প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। রবির উপস্থিতিতে স্বভাবতই আলোচনা 'বঙ্গশ্রী' হইতে 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র বিপুল অভিনয়-সাফল্যের দিকে ধাবিত হইল। রবি স্বয়ং তখন সেকেন্দার বাদশাহের ন্যায় দিগ্বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর। তাহাকে প্রশ্রয় দিবার মত সহানুভূতি সকলের থাকিবার কথা নয়। রবি সেটা অনুভব করিয়া শেষ পর্যন্ত আমার হাত ধরিয়া আমাকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে টানিয়া লইয়া গেল। ভূম্যাসনে বসিয়া শুইয়া সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিশ্রম্ভালাপ চলিল। রংপুর হইতে রবির মায়ের অসুখের খবর সেই দিনই তারযোগে আসিয়াছে, পরদিন দ্বিপ্রহরের পরই শিলং মেলে সে রংপুর রওয়ানা হইবে। ঢাকা হইতে মোহিতলালও 'বঙ্গশ্রী' ও 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে উপদেশ

দিবার জন্য আমাকে মুহুর্মুহু ডাকিয়া পাঠাইতেছিলেন। পূর্বদিন ছুটি লইয়া আসিয়াছি, পরের দিন ঢাকা মেলে আমিও ঢাকা রওনা হইব। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া দুই বন্ধু পরস্পর বিদায় লইলাম। রবি তাহার 'মানময়ী'র প্রথম মুদ্রিত কপিখানি আমাকে ও আমার গৃহিণীকে নিবেদন করিয়াছিল। কারণ এই যে, আমারই রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের বাড়ির একটি কক্ষে তাহাকে বদ্ধ করিয়া বাহিরে শিকল তুলিয়া দিয়া আমি তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই 'মানময়ী' রচনা শেষ করিতে বাধ্য করিয়াছিলাম। একটা পূরা দিন লাগিয়াছিল। গৃহিণী জানালা-পথে এই সময়ে তাহাকে ঘন ঘন চা সরবরাহ করিয়াছিলেন। রবি সব শেষে সেদিন কৌতুক করিয়া বলিল, যদি আর না ফিরি এই বইখানা যত্ন ক'রে রেখে দিও, ওর মধ্যেই আমাকে পাবে। সেদিন মনে হইয়াছিল কৌতুক, সপ্তাহকাল মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম—কৌতুক নয়, রবি মর্মান্তিক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আমার নিকট চিরবিদায় লইয়া গিয়াছে।

পরদিন শিলং মেলে রবি এবং ঢাকা মেলে আমি যথাক্রমে উত্তর ও পূর্ববঙ্গ যাত্রা করিলাম। মোহিতলালের সহিত পরামর্শ-শেষে কলিকাতায় ফিরিলাম ৭ই ফাল্গুন সকালের ঢাকা মেলে। পৌষ হইতে নিযুক্ত 'শনিবারের চিঠি'র নূতন সম্পাদক শ্রীপরিমল গোস্বামী আমার রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের বাসাতেই তখন বাস করিতেছিলেন, তিনি দূর-সম্পর্কে রবির ভাগিনেয়। তাঁহার মুখেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত রংপুরে রবির আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম। রবি ৩রা ফাল্গুন রাত্রে পীড়িতা মাতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়, ৪ঠা ফাল্গুন রাত্রি দশটায় হঠাৎ তাহার কম্প দিয়া জ্বর আসে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে। চারিদিক হইত ডাক্তার বৈদ্য কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হন বটে ; কিন্তু ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া, না, সাপ্রেস্‌ড্ স্মলপক্স এই সংশয়ের মধ্যে চিকিৎসার বিলম্ব হয়। সকালে রংপুরের জনৈক ডাক্তার কুইনিন ইনজেকশন দিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রবির প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ৫ ফাল্গুন ১৩৩৯ (১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩) সকাল দশটায় বাংলা-সাহিত্যের একটি অত্যুজ্জ্বল সম্ভাবনাময় প্রাণ, হিন্দুসমাজের একজন নিষ্ঠাবান সেবকের জীবন মধ্যপথেই খণ্ডিত হয়।

রূঢ় ধাক্কা খাইয়া প্রথমটা ঠিক ঠাহর করিতে পারি নাই, বিশ্বাস করিতে বাধিয়াছিল। যখন বিশ্বাস হইল, আমি বিমূঢ় ও মুহ্যমান হইয়া গেলাম। সেই অবস্থায় দ্বিতলে শোবার ঘরে গিয়া আমি বালিশে মাথা গুঁজিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিছু খাইতে বা কাহারও সহিত কথাবার্তা বলিতে

পারিলাম না। আমার সাহিত্য-জীবনের সেই প্রথম শোক—নিদারুণ শোক; শনিমণ্ডলেও সেই প্রথম ভাঙন ধরিল। অনেক রাত্রে উঠিয়া বসিলাম। রবির চেহারা স্পষ্ট হইয়া আমার চোখে ভাসিতেছিল—তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রায় স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি তখনই লিখিলাম:

অপরূপ রূপ, রূপ অপরূপ, বুঝি না ছায়ার মায়া—
তরল আঁধারে অর্ধোত্থিত তব দক্ষিণ বাহু—
তোমার রোমশ বাহু,
ঝুলে পড়িয়াছে খদ্দরী আস্তিন,
শীর্ণ করাঙ্গুলি—
নখাগ্রে তার জাতির মুক্তি-বারতার স্পন্দন—
এ অভিশপ্ত এই লাঞ্ছিত জাতি।

বন্ধু, বন্ধু মোর—
কোথা তব মুখ, কোথা বাণী তব—বজ্রকঠিন বাণী,
থাকিয়া থাকিয়া রুদ্ধ আবেগে ভাবগদগদ ভাষা,
অশ্রুজড়িত চাপা কণ্ঠের স্বর?
তোমার আঁখির নীল,
আয়ত চক্ষে বুকের নীলাভ জ্বালা,
কোথায় বন্ধু, অবিন্যস্ত মাথার বিরল কেশ
দেখিতে যে নাহি পাই—
মৃত্যুর কালো ছায়া—
এত কি নিরেট নিবিড় অন্ধকার!
মৃত্যুর নীরবতা—
এমনই বধির কঠোর বাক্যহীন!

তব দক্ষিণ বাহু
আঁধার মৃত্যু পারিল না গ্রাসিবারে;
আমি দেখিতেছি—বাক্যমুখর ক্ষীণ স্পন্দন তার
বলিতেছে, আমি আছি।
তব অনাবৃত বক্ষের উপবীতে
লেগেছে আগুন-ছোঁয়া—

বলিতেছে, জাগো জাগো,
জাগো চণ্ডাল, জাগো কঙ্কাল, জাগো,
জাগো জাগো ব্রাহ্মণ।

অগ্নি-জ্বালায় প্রদীপ্ত তব বক্ষের উপবীত
পরাইয়া দাও, দাও কঙ্কাল-গলে ;
শুনি এ শ্মশানে কঙ্কাল-মঙ্গল।

বন্ধু, বন্ধু মোর—
তুমি কি চলিয়া গেছ ?
তবে কেন শুনি ওঁরাও-আবাসে জীবন-জয়ধ্বনি,
চামার-মুচির ডোমের মুখেতে নির্ভয়-আশ্বাস
দেখিতে যে আজো পাই।
বাবা-ঠাকুরের সেবার লাগিয়া তারা প্রতীক্ষা করে ;
নিরীহা নির্যাতিতা,
সবাই তো ভাই আশ্রয় পায় নাই।
তোমার 'ছেলেরা' সবে
আসন পাতিয়া ব'সে আছে পাতা পেড়ে—
কলেজের ফীস্ হয় নি সবার দেওয়া।

বন্ধু, তোমার নাটকের প্লট মরিতেছে মাথা খুঁড়ে,
উদাসী আজিও একাকিনী কাঁদে মাঠে ;
থার্ড ক্লাস সেই র'য়ে গেল থার্ড ক্লাস—
তবে কেন ছিঁড়ে চ'লে গেলে মায়াজাল ?
বাস্তবিকার আসরে আজিও হরিকুমারেরা বসি
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদিতেছে নাকী স্বরে,
শেষ না হইতে দিবা তুমি কেন ছেড়ে গেলে দিবাকরী,
বলিয়া গেলে না, কোথা থাকে তব ত্রিলোচন কবিরাজ !
বন্ধু, তুমি তো দেখে গেলে নাকো মানময়ী গার্ল-স্কুলে
বদনের মুখে ছাই দিয়ে মেয়ে হাজারে হাজারে আসে,
ঘৃতকুম্ভটি প্রাঙ্গণে আছে প'ড়ে—
দধিকর্দমে পিচ্ছিল প্রাঙ্গণ।

বন্ধু, তোমার দক্ষিণ বাহু আরো কি কহিবে কথা ?
শুনিতে না পাই মিলায় ছায়ার মায়া ;
আমারই মনের ভুল—
তুমি নাই, তব দক্ষিণ বাহু নাই,
কান পেতে শুনি অসীম শূন্যে চকিতে থামিয়া গেছে
গতি-আবেগের অনাহত গীতধ্বনি।

আকাশের নীহারিকা—
বিরাট বিপুল প্রচণ্ড বেগে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান,
পুড়িয়া হয়েছে ছাই ;
ধরার ধূলায় গুঁড়া গুঁড়া হয়ে মরিয়াছে নীহারিকা,
বাতাসে উড়িয়া গেছে।

... ...

বন্ধু, তোমার ভস্ম-বিভূতি উড়িছে আকাশ ছেয়ে
ভস্মের চোখ নাই।
পায় না দেখিতে, কাঁদিছে বিধবা, কাঁদিছে উন্মাদিনী,
পিতারে হারায়ে কাঁদিছে সাতটি শিশু।
মরজীবনের সীমান্তে আসি কাঁদিতেছে অভাগিনী
মাতার শয়ন-শিয়রে জ্বলিছে
ঘৃতের প্রদীপ নহে,
মৃত পুত্রের চিতা।

পরে ইহারই সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ একটা ভূমিকা যোগ করিয়া "রবীন্দ্রনাথ [illegible]" কবিতা প্রস্তুত হইল। ভূমিকার গোড়াটা এই :

রবি নাম তব, ধর নাই রবি-রূপ—
তোমারে ঘিরিয়া গ্রহ শশী আজও করে নি ভ্রমণ শুরু ;
তুমি নীহারিকা, নেবুলা-বাষ্প, অসীম শূন্য ব্যেপে
গতির আবেগে শিহরে ঈথর নীল
বাষ্প-বিকারে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান।
লক্ষ তারকা অযুত রবির কোটি গ্রহ-চন্দ্রের
সম্ভাবনায় ব্যাকুল তরল প্রাণ।

জ্ব'লে নিবে যায়, জ্ব'লে জ্ব'লে ওঠে ধাতব বাষ্প যত,
গলিত লৌহ গলিত স্বর্ণ জল মাটি ধোঁয়াধার—
জমাট বাঁধিয়া ধরে নি কঠিন দেহ।
রবি নাম তব, নীহারিকা ইতিহাস।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি কালে প্রকাশিত মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে কবিতাটি মুদ্রিত হইল। ফাল্গুন সংখ্যা হইল "রবীন্দ্র মৈত্র সংখ্যা"। তাহাতে মোহিতলাল, সুনীতিকুমার, গোপাল হালদার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, অশোক চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী ও কৃষ্ণধন দে রবির ব্যক্তিগত জীবন, সাহিত্য-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করিলেন; আমি রবির দুই জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহায়তায় তাঁহার জীবনী লিখিলাম। 'মানময়ী গার্লস স্কুলে'র লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে আজ যাঁহারা নামে মাত্র জানেন, বাংলা সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণ অথচ বিস্ময়কর প্রতিভার বিষয় তাঁহাদের আরও জানা উচিত—এই বোধে রবি-মানুষটির সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় 'আত্মস্মৃতি'-ভুক্ত করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের সাহিত্যিক মর্যাদা—তিনি তাঁহার আটত্রিশ বৎসরের জীবনে যে সকল কীর্তি পুস্তকাকারে এবং মাসিক, সাপ্তাহিক অথবা দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় রাখিয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারাই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ-সাহিত্য-রসিকেরা নির্ধারণ করিবেন। তাঁহার জীবনীর উপকরণ যৎসামান্য, তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁহার কর্মজীবন সাহিত্যিক মনের দ্বারা পূর্ণভাবে প্রভাবিত ছিল। তাঁহার অসম্পূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেই তাঁহার মৃত্যুহীন জীবনের সন্ধান মিলিবে। তাঁহার লৌকিক জীবন সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলা যায়—তাঁহার আদি পৈতৃকবাস ছিল ফরিদপুর জিলার নাহুরিয়া গ্রামে। রবির পিতা প্রিয়নাথের বয়স যখন আড়াই বৎসর মাত্র তখন পিতামহের মৃত্যু হয়; পিতামহী তাঁহার পিত্রালয় যশোহরের ঝিনাইদহ মহকুমার ফাজিলপুর গ্রামে বাস করিতে থাকেন, প্রিয়নাথও সেখানেই লালিতপালিত হন। ফরিদপুর রতনদিয়া গ্রামের উমা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, রবি ইঁহাদের সপ্তম সন্তান। তাঁহার জন্ম হয় ১৩০২ কিংবা ১৩০৩ সালের চৈত্র মাসের এক রবিবারে, কাজেই নাম রবীন্দ্রনাথ। তিনি বাল্য ও কৈশোরে অতিশয় মেধাবী এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। পিতা শেষ বয়সে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ফাজিলপুরে বসবাস করিতে থাকেন, স্থানীয় শৈলকুপা হাই স্কুলে রবি ভর্তি হন। এইখানেই স্বদেশী-আন্দোলনের আবর্তে পড়িয়া, সুরেন্দ্রনাথ অশ্বিনীকুমার বিপিনচন্দ্র

অরবিন্দের বাণী ও রচনাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি স্বদেশী কবিতা ও নাটকাদি রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তদানীন্তন সরকারের বিরূপ দৃষ্টিও তাঁহার উপর পতিত হয়। এই দৃষ্টির প্রকোপ তাঁহাকে আজীবন ভোগ করিতে হয়।

১৯১৩ সনে শৈলকুপা হাই স্কুল হইতে রবি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯১৫ সনে কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে আই. এ. এবং ১৯১৭ সনে ওই কলেজ হইতেই কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাস করেন। পরে ইউনিভার্সিটি কলেজে এম. এ. ও ল পড়িবার কালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া লেখাপড়ায় ইস্তফা দেন। ১৯১৭ সনে বি. এ. পরীক্ষার পরই (১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ) ফরিদপুর জেলার ভীমনগর-নিবাসী দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের কন্যা হরিবালা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন, কলিকাতায় পঠদ্দশায় নাট্যকার ডি. এল. রায়ের স্নেহ লাভ করিয়া নাটক রচনাতেই তিনি বিশেষ উৎসাহী হন; কবিতা, গল্প, ছড়া প্রভৃতিও অজস্র লিখিতেন। ১৩৩৯, ৫ই ফাল্গুন রংপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ৪ঠা ফাল্গুন সন্ধ্যার পরও তিনি একটি নাটক রচনা করিতেছিলেন। তাঁহার জীবনের দুইটি লক্ষ্য ছিল, সমাজসেবা ও বাণীসাধনা; তিনি যৌবনপ্রারম্ভ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজ নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক কর্মজীবন হয়তো কালপ্রবাহে হারাইয়া যাইবে, কিন্তু বাংলা-সাহিত্যে আমরা তাঁহাকে হারাইয়াও যাহাতে পুনঃ পুনঃ পাইতে পারি সে ব্যবস্থা তিনি স্বয়ং করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই মানুষটির সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে ক্ষতি হইল তাহার আর পূরণ হইবে না; তাঁহাদিগকে চিরটা-কাল এই আক্ষেপ করিয়াই কাটাইতে হইবে যে, আমাদের রবি সর্বসাধারণের রবি হইতে পারিলেন না; সেই প্রাণস্ফুলিঙ্গ সমস্ত জাতির প্রাণে আগুন ধরাইয়া গেল না। রবিকে যাঁহারা চিনিতেন, তাঁহাদের কাছে মানুষ-রবি সাহিত্যিক-রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বা দিবাকর শর্মার চাইতেও ঢের বড় ছিলেন—তাঁহার সাহিত্যকে চাপা দিয়া তাঁহার মনুষ্যত্ব, তাঁহার পৌরুষ, তাঁহার প্রাণ বড় হইয়া দেখা দিত; তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব দিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিতেন। বাংলা দেশের সামান্য-সংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে এই ক্ষমতা দেখিয়াছি। রবি বাঁচিয়া থাকিতে আমরা কখনও তাঁহার লেখাকে প্রাধান্য দিতে পারি নাই; অসম্বৃত

বেশবাস ও কেশকলাপ, নীল চক্ষু, রোমশ বাহু ও মেঘগম্ভীর নিনাদে রবি নিজেকে এমনই জাহির করিতেন যে, আর পাঁচজনের ব্যক্তিত্ব তাঁহার নিকট ম্লান হইয়া যাইত। তিনি তখন আমাদের কাছে একটা মানুষ মাত্র থাকিতেন না—একটা আদর্শ, একটা ভাবরূপে প্রতিভাত হইতেন।

আদর্শ বা আইডিয়া মাত্র নয়, রবি ছিলেন অদ্ভুতকর্মা। হিন্দু সংগঠন, শুদ্ধি আন্দোলন, নারীনির্যাতন-প্রতিকার এবং কোল ভীল সাঁওতাল ওঁরাওদের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন: এই কাজে দুই-দুইবার সাক্ষাৎ-মৃত্যুকে বরণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তবু তিনি ভয় পাইয়া জীবনের ব্রত ছাড়েন নাই। তাঁহার আর একটা ব্রত ছিল—দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, ইহার জন্য একটা সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় ছিল। একটি প্রথম ভাগ, একটি ওয়ার্ড বুক, একটি স্পেলিং বুক এবং একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ তিনি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রচনা করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপি আকারেই সেগুলি বিনষ্ট হইয়াছে।

তাঁহার একটা ছবি আজও আমার মনে ভাসিতেছে। সকলে বসিয়া খোসগল্প করিতেছি, রাজা-উজির মারিতেছি, হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কির বন্যা বহিতেছে, হঠাৎ দেখিলাম রবি বিমর্ষ হইয়া গেল। প্রথমটা বিস্মিত হইলাম। পরে প্রণিধান করিয়া বুঝিলাম, বাচালতার মধ্যে একজনের মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইয়াছে যাহা জাতির অকল্যাণকর। আহত রবি আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না, অকস্মাৎ আড্ডা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। এই মহাপ্রাণ মানুষটিকে আমরা বিস্মৃত হইব, রবির অকালমৃত্যু সেই দুর্ভাগ্যেরই কারণ হইয়াছে। ছাপার অক্ষরে তাঁহার উপন্যাস 'মায়াজাল,' তাঁহার গল্প 'থার্ড ক্লাস,' 'উদাসীর মাঠ,' 'ত্রিলোচন কবিরাজ', তাঁহার নাটক 'মানময়ী গার্লস স্কুল', তাঁহার ব্যঙ্গ-রসরচনা 'দিবাকরী', 'বাস্তবিকা,' তাঁহার কবিতা 'সিন্ধু-সরিৎ' তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্র 'শনিবারের চিঠি' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আজিও বাঁচিয়া আছে; কিন্তু রবি-মানুষটিকে এই যুগের এবং ভবিষ্যৎ যুগের বাঙালীর কাছে আজ তুলিয়া ধরিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আমাদের ক্ষতি ব্যক্তিগত ক্ষতিই রহিয়া গেল।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

অদলবদল

১৩৩৯, ৯ই অগ্রহায়ণ (২৫ নবেম্বর ১৯৩২) তারিখের ডায়েরিতে দেখিতেছি :

> চাকরির শর্ত অনুযায়ী 'শনিবারের চিঠি'র নূতন সম্পাদক বাছাই আজই করিতে হইল। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সকল দায়িত্ব লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কিরণকুমার রায় পরিমল গোস্বামীর নাম করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণকে চিনি, গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ও সত্যেনদা (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার) সত্যেন্দ্রকৃষ্ণের বিবিধ ব্যক্তিগত দুর্বলতার উল্লেখ করিয়াই সাহিত্যিক কৃতিত্বের জন্য শুধু সম্পাদকীয় ভার তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে বলিলেন। 'নারায়ণে'র নানা গল্প-নাটক-উপন্যাসের রুচি আমার পছন্দবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহাকেই নির্বাচন করিব একরূপ স্থির করিয়াই আপিস গিয়াছিলাম। রবি ঠিক ভরা দ্বিপ্রহরে ঝড়ের মত আমার নিভৃত সম্পাদকীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় হুকুমের ভঙ্গিতে বলিল, অনেক ভেবে দেখলাম, পরিমলই 'শনিবারের চিঠি'র উপযুক্ত সম্পাদক হবে। ও আমার ভাগনে। ওকেই নাও। 'উপাসনা'য় ফোটোগ্রাফির উপর দুই-একটি প্রবন্ধ ছাড়া পরিমল গোস্বামীর কোনও সাহিত্যিক রচনার সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু ইতস্তত করিবার উপায় নাই। রবিকে কথা দিতে হইল। সন্ধ্যার মুখে সত্যেন্দ্রকৃষ্ণকে গাড়িবারান্দার ছাতে লইয়া গিয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলাম। পরিমল গোস্বামী সেই দিনই চাকরি লইলেন।

অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি' অবশ্য দিন ছয়-সাতের মধ্যে আমার সম্পাদকত্বেই বাহির হইল। এই সংখ্যায় চারিটি উল্লেখ-যোগ্য রচনা ছিল, প্রমথনাথ বিশীর সম্পূর্ণ কাব্য "বিদ্যাসুন্দর", রবি মৈত্রের "মিল-মেধ-কাব্য", আমার "কে জাগে" এবং শ্রীহলধর ভড় বিরচিত "উর্দোস্কৃত প্রচারিণী সভা"। হলধর ভড় অবশ্য গুপ্তনাম; লেখক গণিতবিদ্ অধ্যাপক মোহিতমোহন ঘোষ স্বনামেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। এই একটি মাত্র রচনার দ্বারা তিনি কতটা খ্যাতি অর্জন করিলেন জানি না, 'শনিবারের চিঠি'র খ্যাতি অনেক বাড়িয়া গেল। সাপ্তাহিক যুগে আমার "কামস্কাটকীয় ছন্দ", মাসিক-

নবপর্যায়-যুগে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "হিঙ্গুলী-দর্শন" যে-জাতীয় আলোড়ন তুলিয়াছিল, "উর্দোস্কত"ও ঠিক তাহাই করিল। বাহির হইবামাত্র অগ্রহায়ণ সংখ্যা নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল। এই বিদায়ী-সফলতা আমার "বাধ্যতামূলক" বিরহ-ব্যথাকে প্রায় অসহ করিয়া তুলিল।

নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সম্পাদক ৫/সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের আপিস-ছাপাখানা-বাড়িতেই ডেরা বাঁধিলেন। আমি ও পরিমলদা দুইজনে দুই দিক হইতে জাল ফেলিয়া বঙ্গসাহিত্য-অরণ্যের দুই ভাবী বিহঙ্গম-ধুরন্ধরকে ধরিয়া চিরতরে বাঁধিয়া ফেলিলাম। আমি ধরিলাম তারাশঙ্করকে, পরিমলদা ধরিলেন বলাইচাঁদ অর্থাৎ বনফুলকে। পরিমলদার শিকারও অনতিবিলম্বে মৎকবলিত হইল। সমসাময়িক আরও অনেকে এই যুগে আমার আকর্ষণের বিষয় হইয়াছেন, তোরণদ্বার পার হইয়া বৈঠকখানাতেও আড্ডা জমাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃপুরে এই দুইজন ছাড়া আর কেহই প্রবেশাধিকার পান নাই। অবশ্য পূর্বগামী মোহিতলাল, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্রজেন্দ্রনাথ সেখানে তৎপূর্বেই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরে স্নেহাস্পদ আরও দুই-চারিজন প্রবেশ-পত্র পাইয়াছেন। ভক্তিভাজন রবীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ ও করুণানিধানের কথা বাদ দিতেছি। "আত্মস্মৃতি"-পাঠকেরা জানেন বনফুলের সহিত আমার আগেই পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু সে পরিচয় মাত্র। ক্যাটালিটিক এজেন্টের মত পরিমলদাই আত্মীয়তায় পাক ধরাইয়া কাটিয়া পড়িয়াছেন। আর কোনও কারণে না হউক, এই কারণেই তিনি আমার ধন্যবাদার্হ। তারাশঙ্কর 'উপাসনা'র ধারাবাহিক পথে ধরা দিলেও আমি তাঁহাকে নিজেই অর্জন করিয়াছিলাম।

"উর্দোস্কত" একটি নিত্যরসে টলমল মাণিক্যবিশেষ। কিন্তু কালের কপোলতলে তাহা বিশুষ্ক হইয়া রেখামাত্র না রাখিয়া হারাইয়া গিয়াছে। রচনাটির কিঞ্চিৎ এখানে ধরিয়া রাখিলে অন্যায় হইবে না :

> আজ প্রায় তিন মাস হইল মামা বাত সারাইবার জন্য আমার বাসায় আসিয়াছেন। মামার বাত সারিয়া গিয়াছে, এখন প্রত্যহ দুপুর-বেলায় স্টীমারে চাঁদপাল ঘাট হইতে রাজগঞ্জ অবধি ভ্রমণ করেন। সেদিন মামার সহিত স্টীমারে বেড়াইতেছি। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের জেটি হইতে একটি প্রৌঢ়বয়স্ক মুসলমান স্টীমারে উঠিলেন। শ্রোতার অভাবে এতক্ষণ মামার গল্প বন্ধ ছিল। মুসলমানটিকে সাদরে নিজের পাশে বসাইয়া একটি বিড়ি দিলেন। মিঞা সাহেব ব্যাগ হইতে একখানা

হাতপাখা বাহির করিয়া দাড়িতে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, বিসমিল্লা, কি গরম!

মামা। হাঁ্যা, সামান্ত গরম পড়েছে বটে তবে বোগদাদের তুলনায় এ কিছুই নয়।

মিঞা। আপনি বোগ্দাদ গ্যাছলেন না কি?

মা। আমি ধনপতি বসু। পৃথিবীর কোন্ জায়গায় যাই নাই তাই জিজ্ঞাসা করুন।

মি। বোগ্দাদে কি খুব গরম?

মা। গরম তা আর বলতে? সেবার তিনটে উট আমার চোখের সামনে হার্টফেল হয়ে মরে গেল। আবার পড়ে রইল আমার তাঁবুর সামনে তখন ভয়ানক যুদ্ধ চলেছে, ঘণ্টায় ২৫।৩০টা হাত পা মাথা অ্যাম্পুটেট করছি, উটগুলোকে যে টাইগ্রিসে ফেলে দেব সে সময় নাই। দু দিন বাদে হাসপাতাল থেকে বেরুবার সময় পেলুম। বেরিয়ে দেখি, উটগুলো পচে নি। তিন দিন দিনযামিন্যৌস্বায়ংপ্রাতঃ রৌদ্র লেগে একেবারে আমসত্ত্বের মতন হয়ে গেছে।

মি। বলেন কি? হাড্ডি ভি শুকিয়ে গেল?

মা। একদম বিলকুল শুকিয়ে খেংরাকাটি বনিয়ে গেল।

মি। তাজ্জব কি বাত!

মা। এ আর তাজ্জব কি? তখন চীনদেশে ডাক্তারি করি। বুদ্ধদেবের উইসডম টুথ উদ্গম উপলক্ষ্যে আমাদের ২১ দিন ছুটি। সঙ্গে একটি চীনে হাবসী চাকর নিয়ে চীনের পাঁচিল দেখতে বেরুলুম। গিয়ে দেখি, চীনারা কাঁচা পাঁপরে জলের ছিটে দিয়ে পাঁচিলের ওপর রাখছে আর খানিক বাদে পাঁপর মুচমুচে ভাজা হয়ে উঠছে।

মি। বিসমিল্লা, এমন কাণ্ড তো কখনও শুনি নি!

মা। শুনবেন কোত্থেকে? আগে তো আর ধনপতি বোসের দেখা পান নি! আমি 'চীনময় ভারত' ব'লে একখানা বই লিখছি, তাতে এই সব কথা থাকবে। গরমে পাঁচিলের পাথরগুলো ফটাফট ফাটছিল, তার এক টুকরো ছিটকে লেগে হাবসীটা মরে গেল।

মি। একদম মরে গেল?

মা। একদম আপাদমস্তক মরে গেল। প্রতি বৎসর পাঁচিলের কাছে ৩৭ হাজার লোক গরমে গলে মারা যায়—

মি। পাচিলের ধারেই পচে, না, তাদের কলসীতে পুরে গোর দেওয়া হয়?

মা। পচেও না, গোরও দেওয়া হয় না। গরমে গলে শিলাজতু হয়ে হিমালয়ের গা বেয়ে তিব্বতে এসে পড়ে আর কবিরাজরা তাই কুড়িয়ে নিয়ে ওষুধ করেন। যাক, অনেক কথা হ'ল। শালিমারে এসে পড়েছি দেখছি, আসুন, আর একটা বিড়ি নিন, আমিও একটু তামাক খেয়ে নিই।

তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, তাই তো মিঞা সাহেব, এতক্ষণ আলাপ হ'ল, আপনার নাম তো জানা হ'ল না! কোথেকে আসছেন?

মি। আমার নাম গাজী বিটকেলউদ্দীন, ঢাকা জিলার মক্তব হতে বাংলা বাত ইমপ্রুভ করবার জন্য কলকাতায় এসেছি।

মা। আহা-হা! আপনিও বাতে ভোগেন নাকি? ও অতি সাংঘাতিক ব্যায়রাম।

মি। আরে মশাই, আমি বাত ব্যায়রামের কথা বলছি না। আমার বাত বাংলাবাত, যাকে আপনারা বলেন, ব্যাঙ্গলী লিংগুয়েজ। হিঁদুদের হাতে পড়ে বাংলা বাত একদম পয়মাল হয়ে গ্যাছে। আমি এই বাংলা লিংগুয়েজে উর্দু ও আরবী বাত ঢুকিয়ে এমন একটি চীজ বানাব যে দুনিয়া সুদ্ধ লোক অবাক হয়ে যাবে।

মা। সাবাস মিঞা, সাবাস! এ অতি উত্তম কথা বলেছেন। বাংলা ভাষায় বাত ধরিয়ে দিতে পারলে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়। আপনার প্ল্যানটা খুব ভাল, এতে পার্কে ডেঁপো ছেলেগুলোর বক্তৃতা বন্ধ হবে, বাড়িতে মেয়েদের ঝগড়া বন্ধ হবে—

মি। না না, আপনি কিছু সমজাচ্ছেন না। আমরা চাই আপনাদের বাংলা ভাষায় শওকরা ৫৫টি উর্দু ও ফারসী কথা ঢোকাতে। আপনাদের হাতে পড়ে সংস্কৃতের ঠেলায় বাংলা লিংগুয়েজ একেবারে জাহান্নামে গেছে, আমরা ওর উদ্ধার করতে চাই।

মা। ও বাবা! আপনি তো সোজা লোক নন। তা এ ভাষাকে বাংলা বলবেন কেন? একে বলুন উর্দোস্কৃত।

ইহাই হইল মামার উর্দোস্কৃতের গোড়াপত্তন। আজ সমগ্র ভারতের কল্যাণে বঙ্গবিভাজনের পর উর্দোস্কৃতের মহিমা আমরা সঠিক বুঝিতে পারিব না, কিন্তু ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে সত্যই উহা ভয়াবহ মূর্তি লইতে বসিয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিণ্ডিকেট-সভার মিনিট-বইয়ে ইহার অনেক প্রমাণ মিলিবে। যাহা হউক, "উর্দোস্কতে"র শেষটা অংশত এই :

আজ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে উর্দোস্কৃত-প্রচারিণী-সভার প্রথম অধিবেশন। সর্ববাদিসম্মতিক্রমে দাখাহুদ্দৌলা সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে গাজী বিটকেলউদ্দীন উঠিয়া বলিলেন—ভাইছাব ও বহিনছাবীগণ, আজ মোদের কি সুরোজ! আমরা এতগুলি আদমী আদমিনী জাড়পীড়িত বকরা-বকরীর ন্যায় একত্র হইয়াছি। টিকিওয়ালা মৌলবীদের হাতে পড়িয়া বাংলা ভাষার নাজেহালত্ব লাভ হইয়াছে, তবে সোবে হয় দৌলতখসম [ধনপতি] বসু ও সের [বাগ] চী ছাহেবের মেহেরবানিতে উহার পুনর্জান প্রাপ্তি হইবে। নজর করুন হিন্দু ব্যাঙালীরা কি পাজী। আমরা শওকরা ৫৫জন হইলেও ওরা আমাদের বাত মোটেই পুছে না। একমাত্র বিনয়কুমার সরকার ছাব—ছনিয়া, দৌলত, পয়জার প্রভৃতি বাত ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু হিঁতুয়ানির চক্রে পড়িয়া তিনিও একখানি কেতাবের নাম 'পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' রাখিয়াছেন। কেন, উস্কোর বদলে 'জরু, গরু ও মুল্লুক' নাম দিলে কি ক্ষতি হইত?

বিটকেলউদ্দীন এই বক্তৃতা দিয়া ঘন ঘন দাড়ি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ও চতুর্দিক সাবাস, সাবাস, কেয়াবাৎ শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অনেক রাত্রি হইয়াছে, এখন দৌলতখসম বসু ছাব কিছু বলিবেন। ইনি উর্দোস্কতে বহুত কেতাব বানাইয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু পড়িবেন। তখন মামা ভুঁড়ি দোলাইতে দোলাইতে বলিতে লাগিলেন, মজলিশখসম জবরাশয় [সভাপতি মহাশয়] ও ভদ্রাভদ্র মাজলিস্তগণ, উর্দুই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাত। উরস দুলাইয়া যাহা পড়া যায় তাহাকে উর্দু বলে। আপনাদের নিশ্চয়ই নজরুক্ত হইয়াছে যে, আদমী শিশুগণ যখন নয়া পড়িতে শুরু করে তখন তাহারা ছাতি দুলাইয়া পড়িতে থাকে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে পহেলা সকলেই উর্দুতে পাঠ করে। আমরাই মেহেরবানি করিয়া শওকরা ৪৫টি সংস্কৃত বাত রাখিতেছি। এই বাতে যে আচ্ছা কেতাব বানানো যাইতে পারে তাহা দেখাইবার ওয়াস্তে আমি রামায়ণ-খানি উর্দোস্কতে বানাইয়াছি। আপনারা স্থিরমেজাজিস্থ ও খাড়কর্ণ হইয়া শ্রবণ করুন। এই বলিয়া মামা একতাড়া কাগজ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

সীতার সাথ রিস্তাদশ-[দশরথ]-ছাওয়াল রামের শাদি হইয়া গিয়াছে ; কয়দিন খুব জোর খানাপিনা চলিয়াছে। রাম লক্ষ্মণ ভরত দুসমনঘ্ন সকলেই হাজির। সীতামায়ীর ললাটে সিন্দুর পানি-পানি করিতেছে। নবাবর্ষি জনক চারপায়োপবেশনে উজু করিতেছেন, তাঁহার সামনে বশিষ্ঠ মৌলবী দুনিয়া-দোস্ত [বিশ্বামিত্র] মোল্লা গৌ চুরি করিয়াছে বলিয়া নালিশের আরজি পেশ করিতেছেন। এমন সময় 'হরিনাম হক্, হরিনাম হক্' বলিতে বলিতে নারদ মোল্লা আসিয়া হাজির—ইয়া আজানুলম্বিত নুর, হাতে অলাবুর বদনা। জনক তখনই তাঁহাকে লুঙ্গিগদান [গলবস্ত্র] হইয়া আ-জমীন সেলাম করিলেন।...

মামার বক্তৃতা শেষ হইলে সকলে 'দৌলতখসম বসুকা জয়' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। সভা ভঙ্গ হইল। শ্রোতারা উৎসাহে মামাকে চ্যাংদোলা করিয়া রিকৃশায় চাপাইয়া দিল, আমিও রিকৃশার এক ধারে বসিলাম। আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। রিকৃশা যখন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে ব্রাহ্মমন্দিরের কাছ দিয়া যাইতেছে তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, শুনিলাম কয়েকটি যুবক সিঁড়ির উপর বসিয়া গান গাহিতেছে—

চিদাশ্‌মানে হ'ল পূর্ণ আস্‌নাই-চন্দ্রোদয় হে !

উর্দোস্কতের আবিষ্কারক মোহিতমোহন ঘোষকেও আজ কেহ স্মরণে রাখে নাই, কিন্তু তাঁহার একক রচনাটির মতই তিনি মানুষটিও ছিলেন মাণিক্যবিশেষ। ১৯১১ সনে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পরীক্ষায় উত্তরপাড়া বিদ্যালয় হইতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯১৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের ছাত্র হিসাবে বিশুদ্ধ গণিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম. এস-সি. পাস করেন। সঙ্গে সঙ্গে সার আশুতোষের দৃষ্টি এই দরিদ্র অথচ কৃতী ছাত্রটির উপর পড়ে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপকরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। বিশুদ্ধ অঙ্কের ছাত্র হইলেও মোহিতমোহন সর্ববিদ্যাবিশারদ বা চৌকস ছিলেন; সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার ব্যাপক জ্ঞান ছিল, ব্রিজ খেলাতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মাতৃভাষায় তাঁহার অতিশয় সরস রচনাভঙ্গির পরিচয় "উর্দোস্কতে"র উদ্ধৃতাংশেই মিলিবে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতিশয় মাতৃ-ভ্রাতৃপরায়ণ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিতে

করিতেই তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের এই অপরিস্ফুট প্রতিভার প্রতি এই সুযোগে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

রবির আকস্মিক মৃত্যুর প্রথম ধাক্কা কাটাইয়া একদিন তাহার ইটালির বাসায় গেলাম। তাহার প্রতিপালিত, কলিকাতায় শিক্ষারত কিশোর-যুবকদের এবং তৎসঙ্গে তাহার ঘরজোড়া সুবৃহৎ আলমারির বই ও পুথিগুলির কাতর হাহাকার যেন আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কয়েকটি মোটা মোটা খাতায় ও টুকরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাগজে অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত তাহার বহু গদ্য-পদ্য রচনা ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ছিল, সেগুলি সংগ্রহ করিলাম। ক্ষীণ আশা ছিল, এই কাগজপত্রের মধ্যে "ঘৃতকুম্ভে"র শেষাংশ, অন্তত তাহার একটা প্রাথমিক খসড়াও খুঁজিয়া পাইব। এই অপূর্ব উপন্যাসখানি ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠের 'শনিবারের চিঠি'তে আরম্ভ হয় এবং পৌষ সংখ্যায় দ্বিতীয় পর্বের অষ্টম অধ্যায় বাহির হয়। ওই পর্যন্ত কপি আমরা পাইয়াছিলাম। ঘাঁটাঘাঁটি করিতে করিতে পূর্ণ ও খণ্ডাকারে অনেক কবিতা গল্প ও নাটিকা পাইলাম, কিন্তু প্রার্থিত বস্তু মিলিল না। অনেকগুলি রচনা 'শনিবারের চিঠি'র "রবীন্দ্র মৈত্র সংখ্যাভুক্ত" করিলাম, 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাতেও অনেকগুলি লেখা বাহির হইল। আজও পর্যন্ত দেখিতে পাই, রবির অপ্রকাশিত লেখা এখানে ওখানে বাহির হইতেছে। কিন্তু "ঘৃতকুম্ভ" অসম্পূর্ণ আছে। রবির দাদাদের ইচ্ছা ছিল, আমিই উহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করি। কিন্তু রবির রচনার উপসংহার করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই। রবির এক দাদা "ঘৃতকুম্ভ" শেষ পর্যন্ত নিজেই শেষ করিয়া পাণ্ডুলিপি আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আমি উপযুক্ত বিবেচনা করি নাই।

রবির রচনাবলীর মধ্যে "কুকরি" শীর্ষক একটি ছোট্ট কবিতা ছিল, পরিমলদা তাহা চৈত্রের 'শনিবারের চিঠি'ভুক্ত করেন। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত আমার "টুকরি"-কবিতাগুলি রবির খুবই ভাল লাগিত। বিশেষ করিয়া অমলদা (শ্রীঅমল হোম), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার নিজের সম্বন্ধে রচিত "টুকরি"-গুলি সে প্রায়ই আমাদের আড্ডায় আওড়াইত। অমল-দার সঙ্গে পরিচয় তখনও ঘনিষ্ঠ হয় নাই, তাঁহার ভাবী ভায়রাভাই হাবল (হিরণকুমার) সান্যালের কৃপায় একটুকু ছোঁওয়া লাগিয়াছিল, একটুকু কথা শুনিয়াছিলাম এই মাত্র। কিন্তু রবির কণ্ঠে যখন শুনিতাম:

জহরলালের নিজ হাতে সই-করা,
টেবিলে পড়িয়া বই তাঁর একখানা;

রবি ঠাকুরের লক্ষরূপের লক্ষ ফোটোগ্রাফ।
অদ্ভুত মায়াজাল—
শাখাপাতাহীন গাছ, মনে হয় পুষ্পস্তবকানত,
ফুলের গন্ধে নন্দিত চারিদিক।
বেলোয়ারি ঝাড়, কাচ তার একখানা
কোহিনুর-ভ্রমে তুলে রাখি সিন্দুকে।
ট্রামে চাপে তাই মনে হয় যেন রোল্‌স্,
কথা কহে, যেন মনে হয় গান গাহে।

তখন সকলেরই মনে হইত, মানুষটি আমাদেরও খুবই চেনা, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। প্রায় তেইশ বৎসর পার হইতে চলিল, তাঁহার সহৃদয় হৃদয়লোকে ধীরে ধীরে প্রবেশাধিকার পাইয়া অভিষিক্ত ও ধন্য হইয়াছি, কিন্তু তাঁহার বহির্বাস বা "টোগা"র ভাঁজের একটুকু ব্যতিক্রম দেখি নাই। ধোপদুরস্ত অমলদা ঢিলাঢালা আমাদের বিস্ময়ই রহিয়া গিয়াছেন। যাক, অমলদার কথা পরে হইবে। রবি তাহার নিজের নামের "টুকরি"টিও সমান দরদ দিয়া আবৃত্তি করিত, তাহার স্মৃতিশক্তি ছিল অনন্যসাধারণ :

রিক্‌শায় চেপে বেলেঘাটা পুল পারে
যেতে যেতে বলো মাথাভরা রুখু চুলে
লক্ষ টাকার স্বপ্ন কজন দেখে!
দাড়ি গোঁফ যদি থাকে থাক্ খোঁচা খোঁচা
হোক খদ্দরী ধুতি পাঞ্জাবি ম্লান—
ক্ষতি কি হ'লেই মহিলাকুলের সভা!
হোথা গারো হিলে শিষ্য হাজার দশ
কাটিহারে আছে ন হাজার সাঁওতাল,
তবু মন কাঁদে, কোথা পাট-ক্ষেতে বিধবা-নির্যাতন!
নির্যাতিতের কথা—
কহিতে গেলেই গলা চড়ে ধাপে ধাপে
চোখ ভ'রে আসে অকারণ আঁখি-জলে।
দেশ কি ধর্ম বড়
যাচাই করিয়া আজিও হয় নি দেখা।
প্ল্যাটফর্মের দাঁড়াইয়া একধারে
থার্ড কেলাসের দেখিছে প্যাসেঞ্জার।

সীতার সাথ রিস্নাদশ-[দশরথ]-ছাওয়াল রামের শাদি হইয়া গিয়াছে; কয়দিন খুব জোর খানাপিনা চলিয়াছে। রাম লক্ষ্মণ ভরত ত্নসমনন্ন সকলেই হাজির। সীতামায়ীর ললাটে সিন্দুর পানি-পানি করিতেছে। নবাবর্ষি জনক চারপায়োপবেশনে উজু করিতেছেন, তাঁহার সামনে বশিষ্ঠ মৌলবী দুনিয়া-দোস্ত [বিশ্বামিত্র] মোল্লা গৌ চুরি করিয়াছে বলিয়া নালিশের আরজি পেশ করিতেছেন। এমন সময় 'হরিনাম হক্, হরিনাম হক্' বলিতে বলিতে নারদ মোল্লা আসিয়া হাজির—ইয়া আজানুলম্বিত নূর, হাতে অলাবুর বদনা। জনক তখনই তাঁহাকে লুঙ্গিগর্দান [গলবস্ত্র] হইয়া আ-জমীন সেলাম করিলেন।...

মামার বক্তৃতা শেষ হইলে সকলে 'দৌলতথসম বস্থকা জয়' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। সভা ভঙ্গ হইল। শ্রোতারা উৎসাহে মামাকে চ্যাংদোলা করিয়া রিক্‌শায় চাপাইয়া দিল, আমিও রিক্‌শার এক ধারে বসিলাম। আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। রিক্‌শা যখন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে ব্রাহ্মমন্দিরের কাছ দিয়া যাইতেছে তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, শুনিলাম কয়েকটি যুবক সিঁড়ির উপর বসিয়া গান গাহিতেছে—

চিদাশ্‌মানে হ'ল পূর্ণ আস্‌নাই-চন্দ্রোদয় হে !

উর্দোস্কতের আবিষ্কারক মোহিতমোহন ঘোষকেও আজ কেহ স্মরণে রাখে নাই, কিন্তু তাঁহার একক রচনাটির মতই তিনি মানুষটিও ছিলেন মাণিক্যবিশেষ। ১৯১১ সনে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পরীক্ষায় উত্তরপাড়া বিদ্যালয় হইতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯১৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের ছাত্র হিসাবে বিশুদ্ধ গণিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম. এস-সি. পাস করেন। সঙ্গে সঙ্গে সার আশুতোষের দৃষ্টি এই দরিদ্র অথচ কৃতী ছাত্রটির উপর পড়ে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপকরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। বিশুদ্ধ অঙ্কের ছাত্র হইলেও মোহিতমোহন সর্ববিদ্যাবিশারদ বা চৌকস ছিলেন; সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার ব্যাপক জ্ঞান ছিল, ব্রিজ খেলাতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মাতৃভাষায় তাঁহার অতিশয় সরস রচনাভঙ্গির পরিচয় "উর্দোস্কতে"র উদ্ধৃতাংশেই মিলিবে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতিশয় মাতৃ-ভ্রাতৃপরায়ণ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিতে

করিতেই তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের এই অপরিস্ফুট প্রতিভার প্রতি এই সুযোগে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

রবির আকস্মিক মৃত্যুর প্রথম ধাক্কা কাটাইয়া একদিন তাহার ইটালির বাসায় গেলাম। তাহার প্রতিপালিত, কলিকাতায় শিক্ষারত কিশোর-যুবকদের এবং তৎসঙ্গে তাহার ঘরজোড়া সুবৃহৎ আলমারির বই ও পুথিগুলির কাতর হাহাকার যেন আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কয়েকটি মোটা মোটা খাতায় ও টুকরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাগজে অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত তাহার বহু গদ্য-পদ্য রচনা ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ছিল, সেগুলি সংগ্রহ করিলাম। ক্ষীণ আশা ছিল, এই কাগজপত্রের মধ্যে "ঘৃতকুম্ভে"র শেষাংশ, অন্তত তাহার একটা প্রাথমিক খসড়াও খুঁজিয়া পাইব। এই অপূর্ব উপন্যাসখানি ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠের 'শনিবারের চিঠি'তে আরম্ভ হয় এবং পৌষ সংখ্যায় দ্বিতীয় পর্বের অষ্টম অধ্যায় বাহির হয়। ওই পর্যন্ত কপি আমরা পাইয়াছিলাম। ঘাঁটাঘাঁটি করিতে করিতে পূর্ণ ও খণ্ডাকারে অনেক কবিতা গল্প ও নাটিকা পাইলাম, কিন্তু প্রার্থিত বস্তু মিলিল না। অনেকগুলি রচনা 'শনিবারের চিঠি'র "রবীন্দ্র মৈত্র সংখ্যাভুক্ত" করিলাম, 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাতেও অনেকগুলি লেখা বাহির হইল। আজও পর্যন্ত দেখিতে পাই, রবির অপ্রকাশিত লেখা এখানে ওখানে বাহির হইতেছে। কিন্তু "ঘৃতকুম্ভ" অসম্পূর্ণ আছে। রবির দাদাদের ইচ্ছা ছিল, আমিই উহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করি। কিন্তু রবির রচনার উপসংহার করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই। রবির এক দাদা "ঘৃতকুম্ভ" শেষ পর্যন্ত নিজেই শেষ করিয়া পাণ্ডুলিপি আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আমি উপযুক্ত বিবেচনা করি নাই।

রবির রচনাবলীর মধ্যে "কুকরি" শীর্ষক একটি ছোট্ট কবিতা ছিল, পরিমলদা তাহা চৈত্রের 'শনিবারের চিঠি'ভুক্ত করেন। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত আমার "টুকরি"-কবিতাগুলি রবির খুবই ভাল লাগিত। বিশেষ করিয়া অমলদা (শ্রীঅমল হোম), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার নিজের সম্বন্ধে রচিত "টুকরি"-গুলি সে প্রায়ই আমাদের আড্ডায় আওড়াইত। অমল-দার সঙ্গে পরিচয় তখনও ঘনিষ্ঠ হয় নাই, তাঁহার ভাবী ভায়রাভাই হাবল (হিরণকুমার) সান্যালের কৃপায় একটুকু ছোঁওয়া লাগিয়াছিল, একটুকু কথা শুনিয়াছিলাম এই মাত্র। কিন্তু রবির কণ্ঠে যখন শুনিতাম :

> জহরলালের নিজ হাতে সই-করা,
> টেবিলে পড়িয়া বই তাঁর একখানা ;

রবি ঠাকুরের লক্ষরূপের লক্ষ ফোটোগ্রাফ।
অদ্ভুত মায়াজাল—
শাখাপাতাহীন গাছ, মনে হয় পুষ্পস্তবকানত,
ফুলের গন্ধে নন্দিত চারিদিক।
বেলোয়ারি ঝাড়, কাচ তার একখানা
কোহিনুর-ভ্রমে তুলে রাখি সিন্দুকে।
ট্রামে চাপে তাই মনে হয় যেন রোল্‌স্‌,
কথা কহে, যেন মনে হয় গান গাহে।

তখন সকলেরই মনে হইত, মানুষটি আমাদেরও খুবই চেনা, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। প্রায় তেইশ বৎসর পার হইতে চলিল, তাঁহার সহৃদয় হৃদয়লোকে ধীরে ধীরে প্রবেশাধিকার পাইয়া অভিষিক্ত ও ধন্য হইয়াছি, কিন্তু তাঁহার বহির্বাস বা "টোগা"র ভাঁজের একটুকু ব্যতিক্রম দেখি নাই। ধোপদুরস্ত অমলদা ঢিলাঢালা আমাদের বিস্ময়ই রহিয়া গিয়াছেন। যাক, অমলদার কথা পরে হইবে। রবি তাহার নিজের নামের "টুকরি"টিও সমান দরদ দিয়া আবৃত্তি করিত, তাহার স্মৃতিশক্তি ছিল অনন্যসাধারণ:

রিক্‌শায় চেপে বেলেঘাটা পুল পারে
যেতে যেতে বলো মাথাভরা রুখ্‌ চুলে
লক্ষ টাকার স্বপ্ন কজন দেখে!
দাড়ি গোঁফ যদি থাকে থাক্‌ খোঁচা খোঁচা
হোক খদ্দরী ধুতি পাঞ্জাবি ম্লান—
ক্ষতি কি হ'লেই মহিলাকুলের সভা!
হোথা গারো হিলে শিশু হাজার দশ
কাটিহারে আছে ন হাজার সাঁওতাল,
তবু মন কাঁদে, কোথা পাট-ক্ষেতে বিধবা-নির্যাতন!
নির্যাতিতের কথা—
কহিতে গেলেই গলা চড়ে ধাপে ধাপে
চোখ ভ'রে আসে অকারণ আঁখি-জলে।
দেশ কি ধর্ম বড়
যাচাই করিয়া আজিও হয় নি দেখা।
প্ল্যাটফর্মের দাঁড়াইয়া একধারে
থার্ড কেলাসের দেখিছে প্যাসেঞ্জার।

ওদিকে আবার শর্মা শ্রীদিবাকর
হরিকুমারের করিছে অন্বেষণ।

মৃত্যুর পর দেখা গেল, ক্ষত্রিয় রবির মনের উত্তাপে 'শনিবারের চিঠি'র "টুকরি" কুকরিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সে লিখিয়াছে:

ঘুঁটে কুড়াইতে কুড়ায়ে চাঁপার কলি
শনিবার-হাটে কহিছে, কে লিবি ঘুঁটে?
সস্তায় যায়—চারি গণ্ডার দরে!
ফুলের ব্যাপারী ক্ষ্যাপারে কহিছে ডাকি,
ঘুঁটে-কুড়ানো তো ব্যবসা তোমার নহে,
মারিতেছ রুজি গোবেচারাদের শুধু!
ক্ষ্যাপা হা-হা হাসে উনুনে ঢালিতে যায়।
উমার জননী খন্তি লইয়া রোখে।
নীচে এসে ক্ষ্যাপা পাখা খুলে পড়ে প্রুফ।
টুকরি উজাড় করিয়া ফেলিল টানি
আস্তাকুঁড়েতে ক্ষ্যাপার ঘরণী রেগে।
মাটিতে বুঝিবা ভেল্‌কি লুকায়ে ছিল
নিমেষে টুকরি হইল কুকরিখানা।
চাদরের ভাঁজে লুকায়ে আনিনু ঘরে,
ভাবিতেছি এবে কাহারে জবেহ করি!

'শনিবারের চিঠি'তে ইহাই রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের সর্বশেষ রচনা। সে চাহিয়াছিল, আমি ওই ছন্দে তীক্ষ্ণ "স্যাটায়ার" রচনা করি। তাহার আকাঙ্ক্ষা যে আমি পূর্ণ করিয়াছি, আমার 'রাজহংস' ও 'মানস-সরোবরে' তাহার প্রমাণ আছে। সে খুশী হইয়াছে কি না জানিবার উপায় নাই।

নূতন চাকরি-জীবনে বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই নানা দিক দিয়া নানা অদলবদল হইয়া গেল। শহরতলীসন্নিহিত রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে আর ভাল লাগিতেছিল না, ব্যবসায়ের পক্ষেও স্থানটা অসুবিধাজনক। একমাত্র আকর্ষণ—মাসীমা হেমন্তবালা দেবীর সান্নিধ্য, তিনি ক্রমাগত পত্রধারায় আমার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোমালিন্য অনেকটা ধুইয়া আনিয়াছিলেন। মাসীমাকে লেখা কবির কয়েকটি পত্রেই দেখিতেছি, আমার প্রসঙ্গ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। একটু একটু নমুনা দিলে মাসীমার কৌশলটি অনুধাবন করা সহজ হইবে। ১৩৩৯, ৪ঠা কার্তিকের চিঠিতে দেখিতেছি:

আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, আমি যাহাকে বলে মরমে মরিয়া গেলাম। অশোক চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং তখন তাঁহার একদা-নিজস্ব কাগজে আবার মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল বেনামে নিয়মিত লিখিতেছেন। তাঁহার খোঁটাই সর্বাধিক বাজিল। যে নিশ্চিন্ত আরাম ও যশের মধ্যে 'বঙ্গশ্রী'র চাকরি খিতাইয়া আসিয়াছিল, সেখানে আলোড়ন উপস্থিত হইল। অশান্ত ও অস্থির চিত্তে রাত্রে বাড়ি ফিরিলাম। গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া বসিয়া রহিলাম। ঘর ও বাহির, উত্তর ও দক্ষিণ—দুই দিকের আকর্ষণ পরিমাপ করিতে করিতে লিখিলাম "দুই মেরু" :

আমার মনের এই দুই মেরু উত্তর দক্ষিণ,
দুই হিমমেরু নহে তুহিন-শীতল।
তুষার-আবৃত হিম উত্তর আমার,
ক্ষীণ রৌদ্রহীন আলোরেখা
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ঝলসিয়া—
মৃতের অধরে ম্লান পাণ্ডুহাসি যেন।
… … …
মনের দক্ষিণ মেরু, উত্তপ্ত ফুটিছে
রক্ত-রাঙা লাভা-স্রোত আগ্নেয়-গিরির।
মরে, পচে, পাকে চুল, শাখাপত্র খসি খসি পড়ে—
ফুলের সুগন্ধে বায়ু ক্ষণেক মন্থর,
পূতিগন্ধ ক্ষণে ক্ষণে নাকে আসি লাগে।
ভাল মন্দ রমণীয়, বীভৎস বিকৃতি—
চলে কালস্রোত।
… … …
দক্ষিণ মেরুতে মোর পৃথিবীর সব নদী মেশে—
আবর্ত পড়িল।
ভেসে আসে শব-দেহ, ভেসে আসে কাঠ-খড়-কুটা,
বিচিত্র ধরার আসে মৃত্যু ও জীবন-পরিচয়।
আলো-অন্ধকারের সন্দেশ।
পথের বন্ধুরা আসে, ঝ'ড়ো হাওয়া, ডানা-ভাঙা পাখী,
ওড়ে চিল, ওড়ে মাছরাঙা ;
কানাকানি হাসি ও চিৎকার—
… … …

উত্তর উত্তরে মোর, দক্ষিণে দক্ষিণ,
দোঁহে দোঁহাকার নাহি জানে পরিচয়—
দুই শুধু এক হ'ল আমার অন্তরে;
পরিচয়হীন ক্রোধে—
নিষ্ফল আক্রোশে দুয়ে এ উহারে হানে।
এই হানাহানি—
আমার অন্তর ব্যাপি নিরন্তর এ দ্বন্দ্ব-মন্থন
বিষবাষ্প উঠে আবর্তিয়া,
কুৎসিতে সুন্দর করে, সুন্দরে ভীষণ।

... ...

দক্ষিণে সবার আমি, উত্তরে আমার আমি একা,
পথের বকুল-ছায়ে উত্তরেতে আমার সমাধি—
ফাল্গুনের উন্মন বাতাসে
শাখাচ্যুত ফুলদল পড়ে ঝরি শিয়রে আমার;
অজ্ঞাত পথিক আসি ফেলে বেদনার অশ্রুজল—
আমার মৃত্যুর মৃত্যু সেখানে হয়েছে বহুদিন।

দক্ষিণেরে ভালবাসি, উত্তর আমারে করে প্রেম,
সমাধি-শয়ন রচি মোর লাগি সে জাগে প্রহর,
দক্ষিণে আঁকড়ি লোভে আমিও অনন্তকাল ধরি
রচি উত্তরের ব্যবধান।...

সেই দিন—সেই ১৫ই জানুয়ারি রাত্রে 'বঙ্গশ্রী'র চাকরি..সম্পর্কে আমার মনে মনে অনাস্থা-প্রস্তাব পাস হইয়া গেল। সেই প্রস্তাব কার্যকরী হইতে পুরা এক বছর সময় লাগিল। ১৯৩৫ সনের ১৫ই জানুয়ারি আমি পাকাপাকি রকমে দক্ষিণকে বর্জন করিলাম, অর্থাৎ চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। এই এক বৎসরের মধ্যে আমার জীবনে আরও অনেক গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিলাম। পরবর্তী বৈশাখে (১৩৪১) রবীন্দ্রনাথের স্নেহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া এক দিকে মন যেমন হালকা হইল, অন্য দিকে ঢাকায় গিয়া একটা বিপুল পত্র-দৈপদী বোঝা মাথায় লইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম—নিজ কলিকাতাতেও আনুষঙ্গিক কম বোঝার সৃষ্টি করিলাম না। বহু নূতন ও পুরাতন অজ্ঞাতনামা

সাহিত্যিককে আবিষ্কার করিবার গৌরব অর্জন করিলাম। 'অজুত' ও 'মনোদর্পণ'-লেখকের 'রাজহংস' ও 'আলো-আঁধা'র'র প্রায় সব কবিতাগুলিই রচিত হইল। ব্রজেন্দ্রনাথ ও রামকমল সিংহের আগ্রহাতিশয্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত সম্পর্ক ঘটিল। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া শ্রীরামপুর মিশন'রি কলেজে গবেষণার কাজ আরম্ভ করিলাম। আজ হিসাব খতাইয়া দেখিতেছি, সেইদিনকার বোঝা আজ প্রায় সকলই নামাইয়া
বোঝার ভারে মাথার মাঝামাঝি টেরিটা শুধু বিপর্যস্ত হইয়া ব্যাকব্রাশে পরিণত হইয়াছিল, সেই চিহ্নটুকু আজও মস্তকে ধারণ করিতেছি।

'বঙ্গশ্রী'র দুই বৎসরে নূতন লাভ অনেক হইয়াছে। শত্রুপক্ষের শৈলজা প্রেমেন্দ্র নৃপেন্দ্র মিত্র হইয়াছেন, অপরিচিত তারাশঙ্কর বনফুল নির্মলকুমার (বসু) প'রমল চন্দ্রহাস (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়) সরোজকুমার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘনিষ্ঠ ও আপন হইয়াছেন, উত্তমর্ণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাব চুকাইয়া প্রেমের স্বর্ণসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছেন, সায়ান্স-কলেজ-মেসের স্নেহাস্পদ বন্ধু ললিতানন্দ গুপ্ত "অমলা দেবী"রূপে নূতনভাবে ধরা দিয়াছেন, কলেজের কাঁচা ছেলে শ্রীমান জগদীশ "কলেজ-বয়"রূপে আসিয়া লক্ষ্মণ-ভাইরূপে চিরসম্পর্কিত হইয়াছেন। মোটের উপর জমার খাতার অঙ্কই বেশি।

ঊনবিংশ তরঙ্গ

আত্মদর্শন

দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে একটু গুরুগম্ভীর গবেষণা করা যাক। মোটামুটি একটা গড়পড়তা হিসাব করিয়া দেখিতেছি, মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত কর্মময় জীবন "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে" আরম্ভ হইয়া একাত্তর বৎসরে শেষ হয়। অর্থাৎ ১৭ হইতে ৭১ মোট চুয়ান্ন বৎসরের ফলপ্রসূ জীবন মানুষের। মহা অসাধারণদের কথা স্বতন্ত্র। যীশুখ্রীষ্ট ও শঙ্করাচার্য তেত্রিশ-বত্রিশেই জীবনের বিপুল জ্ঞান ও কর্মসাধনায় পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া সমসাময়িক ও সুদূর ভবিষ্যতের মানুষের হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অন্য দিকে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক অবতার বুদ্ধদেব এবং আধুনিকতম মহামানব রবীন্দ্র-নাথ-গান্ধী-অরবিন্দেরা আশি বৎসর পর্যন্ত অম্লান জ্যোতিতে ধরাধামে বিরাজ করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা নিপাতনে সিদ্ধ, কাজেই ব্যতিক্রম। আমার

গবেষণালব্ধ ১৭ হইতে ৭১—এই ৫৪ বৎসরকে তিন অংশে বিভক্ত করিলে আঠার বর্ষের সমান তিনটি পর্ব পাই। প্রথম পর্বে মানুষ বহিঃকেন্দ্রিক (অবজেকটিভ) থাকে, দ্বিতীয় পর্বে হয় আত্মকেন্দ্রিক (সাবজেকটিভ), এবং তৃতীয় পর্বে তাহার উচিত বাহির ও অন্তরের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইষ্ট-কেন্দ্রিক হওয়া। উচিত বলিলাম এই কারণে যে, এই তৃতীয় পর্বে আমি সবে প্রবেশ করিয়াছি, আমার অভিজ্ঞতা আরও পাকা হইলে পোক্ত সাক্ষ্যই দিতে পারিব। প্রথম দুই পর্ব সম্বন্ধে আমার মতামত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সতের বৎসর বয়সে পিতামাতার স্নেহাশ্রয় ছাড়িয়া ভাগ্যপরীক্ষার জন্য বাহির হইয়া প্রতিকূল পরিবেশের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলাম। প্রথম পর্বের আঠার বৎসরে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি 'বঙ্গশ্রী'র চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করিলাম। বিগত আঠার বছরে যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, পর্বশেষে তাহারই একটা তামামি বা "দি সামিং আপ" যাহা দাঁড়াইল তাহার নাম দিলাম "অসহায়":

বাসনা-বহ্নি জ্বলুক জ্বলিতে দাও,
দেহ-জঞ্জাল পাবক-পরশকামী ;
মৃতার বক্ষে কেহ না বসন টানে,
শবের ললাটে সাজে না খয়েরী টিপ!
জীবনে বাঁচিবে তবু করিবে না ভুল,
কে তুমি পাষাণ, কে তুমি অহংকারী—
চিরকাল যারে চলিতে হইবে পথে,
বিপথে যাবে না, তাও সম্ভব কভু ?
ভুল ক'রে ভালবাসিবে না অধরায়,
কেবা সে প্রেমিক, রসিক বলি না তারে ;
দিবে না আঘাত কভু যারে ভালবাস—
ভালবাসা সে কি লেজারে হিসাব রাখা ?
অপচয় করি কাঁদিবে না অনুতাপে,
হোটেলে মদের পাত্র সমুখে ধরি
বিমুখ করেছ প্রভাতে যে ভিখারীরে
কাঁদিবে না তুমি স্মরি তার ম্লান মুখ ?

বারাঙ্গনার অঙ্গ চাপিয়া বুকে
ভাবিবে না তুমি পকেটে রাখিয়া হাত,
কন্যারে তব কিনে দেবে ফুলঝুরি
বলিয়া এসেছ অফিস যাবার কালে ?
খেলিবে না রেস বাঁধা দিয়ে স্ত্রীর চুড়ি ;
মাতাল হইয়া ঘরে ফিরিবার মুখে
জ্বরেতে বেহুঁশ পত্নীর তরে তুমি
কিনিয়া যতনে নেবে না ফাউল-চপ ?
মিছা কথা বলি ঠকাবে না বন্ধুরে—
পীড়িত ছেলের নামে নেওয়া পয়সায়
মেলিন্স ফুডের বদলে কিনিয়া মদ
আরো পাঁচজনে ডাকিয়া খাবে না তাহা ?

... ...

ক্ষতি কি এতই ভুল ক'রে যদি থাকো,
খতায়ে দেখিলে দেখিবে সবারি ভুল—
এ রূপে না হয় দেখিবে অন্য রূপে
নিখুঁত জ্যামিতি নহে মানুষের মন !

... ...

মানবী-গর্ভে ধরায় জন্মে যেবা
তার মত আর কেবা আছে অসহায়,
ভুল সে করিবে, বড়াই করিবে আরো
সব কাজে তার বজায় প্রিন্সিপ্‌ল্‌ !
হায় রে মানুষ, হায় রে প্রিন্সিপ্‌ল্‌—
কে কোথায় জানি করিছে টহলদারি,
ভাবের ঘরেতে চুরি হয় তবু রোজই,
নয়নের জল ঝরিছে পৃথিবী জুড়ে !

অর্থাৎ আমি থমকিয়া ভিতরের দিকে চাহিলাম ; আমার আত্মদর্শনের পর্ব আরম্ভ হইল।

এবং আরম্ভ হইল 'বঙ্গশ্রী'তেই। আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের এক পক্ষ আমার কবি-প্রকৃতি অর্থাৎ আমার বাধাবন্ধহীন উন্মাদ ও উচ্ছৃঙ্খল যৌবন ; প্রতিপক্ষ দাঁড়াইলেন আমার বিবেক-বুদ্ধির প্রতীক-স্বরূপ স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য—ভট্টাচার্য মহাশয়। ব্যবসায়-বুদ্ধিতে এবং আপিস-গত ব্যবহারে পাকা সাহেব

হইলেও তিনি আসলে ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নৈষ্ঠিক বংশধর—পূর্ব-বঙ্গের নবদ্বীপ কোটালিপাড়ার ব্রহ্মণ্য ও পাণ্ডিত্য-গৌরব সম্বন্ধে নিত্য-সচেতন। ভূদেবের পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধের বন্ধনে স্বেচ্ছাবদ্ধ ভট্টাচার্য মহাশয় গোড়া হইতেই আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। লেখনীমুখে নিঃসৃত প্রাচীন আদর্শবাদী যে "আমি"—তিনি প্রথমে তাহাকেই ভালবাসিয়াছিলেন এবং নির্বাচন করিয়াছিলেন; কিন্তু নবযুগের উদ্দাম বন্যায় ভাসমান "আমার" সঙ্গে তাহার মিল ছিল না। তাঁহার স্বভাবত স্নেহপ্রবণ হৃদয় যাহাদের মধ্যে একসঙ্গে আদর্শ ও স্নেহের পরিতৃপ্তি খুঁজিত, সেই পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ও ছাত্র অমূল্যভূষণের দলে ভাগ্যগুণে আমিও পড়িয়া গিয়াছিলাম। দেবেন্দ্রনাথ ও আমি তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ মোতাবেক সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই, পীড়ারই কারণ হইয়াছিলাম। প্রকাশ্যে না হউক, ভিতরে ভিতরে সংঘাত শুরু হইয়াছিল 'বঙ্গশ্রী'র দ্বিতীয় বর্ষের গোড়া হইতেই।

ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমি গভীর শ্রদ্ধা করিতাম এবং এখনও করি। তিনি অক্লান্তকর্মা বিচক্ষণ ব্যবসায়ী বলিয়া নয়, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের নবজীবনদাতা বলিয়া নয়, কমার্সিয়াল ক্যারিয়িং কোম্পানি, বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস, মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানী এবং মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক বলিয়াও নয়, শুধু তাঁহার কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালার জন্য তাঁহাকে প্রণাম করি। বাস্তববাদী মিঃ ভট্টাচার্যের পরিচয় তাঁহার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলিতে রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আদর্শবাদী ভট্টাচার্য মহাশয়কে আজ কেহ মনে রাখে নাই। নূতনের সংঘাতে প্রাচীন ভারতের কল্যাণকর আদর্শের বিপর্যয় দেখিয়া তাঁহাকে খেদে ক্ষোভে অশ্রুবিসর্জন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু নিছক অশ্রুবিসর্জনেই তাঁহার অন্তরের জ্বালা প্রশমিত হয় নাই; তিনি তাঁহার আরাধ্য আদর্শের প্রতিষ্ঠায় প্রভূত কর্মশক্তি ও অর্থশক্তিও নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহারই প্রত্যক্ষ ফল তাঁহার "কলিকাতা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা"। ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রচারে ও সংরক্ষণে এই প্রতিষ্ঠান চিরস্মরণীয়।

এদিকে 'বঙ্গশ্রী'র আসর দ্বিতীয় বৎসরের গোড়া হইতেই আরও জাঁকিয়া উঠিল। নূতন সুহৃজ্জনের আগমন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; শ্রীমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বেই একটি গল্প ("সরীসৃপ", আশ্বিন ১৩৪০) লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে একটি বিচিত্র উপন্যাস হস্তে তাঁহার শুভাগমন ঘটিল। এই উপন্যাসের ক্রম-

পরিণতির কাহিনীও বিচিত্র। আমার যতদূর ধারণা, এই উপন্যাসের ভিত্তিতেই মানিকের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। মানিক তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে বলিলেও চলে। মুখচোরা লাজুক ছেলে, কিন্তু "সরীসৃপ" গল্পেই তাঁহার পোক্ত-পরিণত মনের পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে মন সরল সাধারণ নহে, কুটিল জটিল অসাধারণ। লেখাটির পরিণতি সম্বন্ধে তখনও অব্যবস্থিতচিত্ত মানিক "একটি দিন" নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের আকারে উপন্যাসটি উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমনভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি "একটি দিন" সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক "একটি দিনে"র উপসংহার "একটি সন্ধ্যা" লইয়া উপস্থিত হইলেন। "একটি সন্ধ্যা"তেই শেষ হইল না, দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা "রাত্রি"তে গড়াইল এবং আরও দুই সংখ্যা পরে "রাত্রি"—"দিবারাত্রির কাব্য" হইল। এই উপন্যাসের নাম-পরিবর্ত্তনে মানিকের মনের গঠনের ছাপ আছে। এই উপন্যাসটি ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব প্রিয়, কারণ ইহার মধ্যস্থতায় আমি মানিককে জানিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় নবাগত শ্রীঅমলা দেবী। আমি যখন এম. এস-সি. সিক্সথ্ ইয়ারে উঠিলাম, শ্রীমান ললিতানন্দ গুপ্ত ফিফ্থ্ ইয়ারে ভর্ত্তি হইলেন; তিনিও আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন ৬নং বাদুড়বাগান লেনের মেসে। আমি তখন লায়েকিয়ানায় প্রবল প্রাগ্রসর, লেখাপড়া ছাড়া আর সব কাজেই আমার প্রচণ্ড উৎসাহ, সাহিত্যচর্চা তন্মধ্যে একটি। ললিতানন্দের মনে যে সাহিত্যের তুষের আগুন তখনই ধিকিধিকি জ্বলিত তাহা টের পাই নাই। আমার সাহিত্য তখন বোলচালেই সীমাবদ্ধ ছিল, লিখিত কোনও দলিল ললিতানন্দের কাছে দাখিল করি নাই। তথাপি তিনি কেন যে তখনই আমাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন তিনিই বলিতে পারেন। তারপর আমার বিজ্ঞান-ভারতীর লেখাইতি-ত্যাগের সঙ্গে পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়, ১৯২৪ সনের গোড়াতেই। দীর্ঘ দশ বৎসর পরে তিনি তাঁহার বাস ও কর্ম্মস্থল বাঁকুড়া হইতে গুরুকে পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীঅমলা দেবীর বেনামীতে একটি তীক্ষ্ণ শর প্রণামীস্বরূপ প্রেরণ করিলেন—"চন্দ্র-ডাক্তার"। প্রথমটা বিস্ময়বিমূঢ় ও আনন্দোৎফুল্ল হইলেও বাঁকুড়া ওয়েস্লিয়ান কলেজের বিজ্ঞান-শিক্ষক শ্রীললিতানন্দ গুপ্ত এম. এস-সিকে ধরিয়া ফেলিতে পারিলাম। বাংলা-

সাহিত্যে শ্রীঅমলা দেবীর শুভাগমন ঘটিল ফাল্গুন ১৩৪০এ প্রকাশিত "চন্দ্র-ডাক্তারে"র পিছু পিছু।

এই বৎসরে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকেও নূতন করিয়া পাইলাম, ঔপন্যাসিকরূপে। কবিতা-নাটক, ভ্রমণকাহিনী, সাহিত্য-প্রবন্ধ ও রসরচনাতেই তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা। কবে 'দেশের শত্রু' নাম দিয়া একটি অক্ষম উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি নিজেই হয়তো তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই বর্ষাস্ফীত 'পদ্মা'র উদ্দামতা লইয়া দেখা দিলেন। উপন্যাসে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কায়েম হইল।

ওই সংখ্যাতেই সদ্য-স্বর্গত (কার্তিক, ১৩৩৯) ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় দেখা দিলেন তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বাংলার ইতিহাস "বাঙ্গালার কথা" লইয়া। তাঁহার পুত্র ভূতপূর্ব হাইকোর্টের উকিল ও অধুনা অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এই যোগাযোগ ঘটাইলেন। ভূদেব-পৌত্রী কবি-ঔপন্যাসিক ইন্দিরা দেবীর পুত্র কবিবন্ধু শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যেমন কালিম্পংয়ের পথে ট্রেনে প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, ত্রিদিবনাথের সঙ্গেও ঠিক তেমনি সীতারামপুর-রূপনারায়ণপুর এই রকম কোনও স্টেশনে ট্রেনে প্রথম পরিচয়। প্রভাতমোহনের বেলায় যেমন তাঁহার সদ্যঃপত্নী-বিয়োগকাতর পিতা এবং সহোদরারা আমাদের বন্ধুত্ব-সূত্রপাতের সাক্ষ্য ছিলেন, ত্রিদিবনাথের সঙ্গে প্রথম আলাপের সময়ে তেমনি তাঁহার পিতা বৃদ্ধ নিখিলনাথ সাক্ষ্য ছিলেন; একজনের কথা ভাবিতে গেলেই এই কারণে আর একজনের কথাও আমার মনে পড়ে। যাহা হউক, নিখিলনাথের "বাঙ্গালার কথা" প্রকাশের গৌরব 'বঙ্গশ্রী' দ্বিতীয় বৎসরের গোড়াতেই অর্জন করিল। দুঃখের বিষয়, বইখানি 'বঙ্গশ্রী'র পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে। এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ মাসে (অর্থাৎ বৈশাখ ১৩৪১ সালে) সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় আগমন রবীন্দ্রনাথের। হেমন্তবালা দেবীর দৌত্যে কাজ যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, নিজের দুর্বুদ্ধিতে গুটি প্রায় কাঁচাইয়াও আনিয়াছিলাম। ১৯৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে রামমোহন-তিরোভাবের শতবার্ষিক উপলক্ষে বর্ষকালব্যাপী রামমোহন-স্মরণে উৎসবের সূত্রপাত হয়। বাংলা সাময়িক পত্র ও সভা-সমিতির ইতিহাসে ১৯৩৩-৩৪ সন রামমোহনকে, ১৯৩৬-৩৭ সন রামকৃষ্ণ পরমহংসকে, ১৯৩৮-৩৯ সন বঙ্কিমচন্দ্রকে, ১৯৪১-৪৫ সন রবীন্দ্রনাথকে এবং ১৯৫৪-৫৫ রামকৃষ্ণ-সারদা দেবীকে উৎসর্গিত। রামমোহন-বৎসরে আমরাও বিশেষ সংখ্যায় বিশেষ প্রবন্ধাদি দ্বারা তাঁহার স্মৃতিপূজা করিয়াছিলাম। কিন্তু অপরাধ হইয়াছিল; সম্পূর্ণ অপক্ষপাতিত্বের অছিলায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে

রামমোহন-দূষণও করিয়া বসিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং "রিফিউজ্‌ড্‌" লিখিয়া সমোড়ক 'শনিবারের চিঠি' ও 'বঙ্গশ্রী' ফেরত পাঠাইলে কি হইবে, তাঁহার কানে এই দূষণসংবাদ দিবার খর-দূষণের অভাব হয় নাই। ফলে প্রায়-বিগলিত হিমালয় আবার শক্ত হইয়া গেলেন। কিন্তু বরফ একবার গলিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে চেষ্টা করিয়া দৃঢ় রাখা কঠিন। রবীন্দ্রনাথও পারিলেন না। এইবার বরফ-ভাঙার কাজে সাহায্য করিলেন মৎগেহিণী শ্রীমতী সুধারাণী দাস। ইতি-মধ্যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের "গদ্য ছন্দে"র উপর একটি বক্তৃতা-প্রবন্ধ সংগৃহীত ও বৈশাখ (১৩৪১) সংখ্যার প্রথম রচনা হিসাবে মুদ্রিতও হইয়াছিল; কথা ছিল বীতরাগ কর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা ছাপা চলিবে না। অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই প্রবন্ধ ছাপিয়া বসিয়াছিলাম। অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু বৈশাখের ৪ তারিখ পর্যন্ত তাহা পাওয়া না যাওয়াতে চিন্তায় পড়িয়া-ছিলাম। ইতিমধ্যে সুধারাণী যে নববর্ষের প্রথম দিনেই কবিগুরুকে প্রণাম প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা আমার জানা ছিল না, হয়তো মাসীমা হেমন্তবালা দেবীর প্রেরণা ছিল। হঠাৎ ৪ঠা বৈশাখ আপিসে গিয়াই সচিব-মারফত কবির অনুমতিপত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ উল্লসিতচিত্তে নববর্ষের প্রথম সংখ্যা কাগজ বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থায় মত্ত হইলাম। উল্লাসের সঙ্গে একটু বিস্ময়ও মনে উঁকি দিয়াছিল, কিন্তু তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ ছিল না। কর্ম-ক্লান্ত দেহে রাত্রে বাড়ি ফিরিবার পথে ট্রামে বসিয়া আবার বিস্ময়ের ঘোর লাগিল। ঘোর কাটিল বাড়ি ফিরিয়া পড়ার টেবিলে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে সুধারাণীর নামাঙ্কিত খামখানি দেখিয়া। সাগ্রহে চিঠি পড়িলাম:

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার নববর্ষের প্রণাম পেয়েছি, তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

এই মাসের শেষভাগে আমি সিংহলে যাত্রা করব। কলকাতা হয়ে যেতে হবে। তখন সজনীকান্ত যদি কলকাতায় থাকেন তা হলে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তোমাকে হয় তো আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবেন।

বৎসরের আরম্ভে নানা ব্যাপারে আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীর্ঘ সাত বৎসরের বিরতির পর এই চিঠিতে প্রেক্ষাগৃহের প্রথম ঘণ্টা পড়িল। অনুমতি-পত্রের রহস্যভেদ হইল। খুশী হইলাম—শুধু এই কথা বলিলে সবটুকু বলা হইবে না। 'বঙ্গশ্রী'র চাকুরিগত যে ফাটল মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করিতেছিল, পুনর্মিলন-সম্ভাবনার মায়া-প্রলেপে সে অস্বস্তির কাঁটাটুকু কোথায় মিলাইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পাইলে সাহিত্য-জীবনে যে-কোনও পরিণতির জন্য আমি প্রস্তুত হইতে পারিব—এই বোধ আমাকে সাহস দিল। আমি নির্ভয় হইলাম।

ইতিমধ্যে আমার অবিমৃষ্যকারিতায় অথবা হঠকারিতায় আর একবার অন্নের ফ্যাসাদ ঘটিল। চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের পরে আমার ভাবপ্রবণ মনে বেশ খানিকটা বিপ্লব ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ধূম বহ্নিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল অনেক কাল পরে "ভুলি নাই" শীর্ষক একটি কবিতায়। অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের অব্যবহিত পরে আমি কিছুকাল মৃত ও জীবিত যোদ্ধাদের ফোটো, গোপনে ব্লক প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। আমার সহযোগী ছিলেন দীনেশচন্দ্র লোধ নামক এক ভদ্রলোক। কিছুকাল সর্বদা বিপদ সঙ্গে লইয়া নিশীথ-রাত্রির অন্ধকারে কলিকাতা-চন্দননগর করিতে হইয়াছিল। চন্দননগরের দক্ষিণ তোরণদ্বারের মুখে একবার ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, আমাদের বাঁচাইয়াছিল তখন আমার নিত্য-ব্যবহৃত ট্যাক্সির চালক মদন সিং। এক রকম প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম বলিয়া ভাবলোকে বিপ্লবকে ভয়যুক্ত করা হয় নাই। সমস্ত যখন থিতাইয়া আসিল, উৎসাহ-উত্তেজনা-উদ্দীপনা নিবিয়া ছাই হইল, তখন লিখিলাম "ভুলি নাই"। একটা টুকরা কাগজে লিখিয়াছিলাম, অনাদরে তাহা হারাইয়া গেল অর্থাৎ ভুলিয়া গেলাম। শ্রদ্ধেয় কবি জীবনময় রায়—আমার জীবনদা যে সে টুকরা কাগজটি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা আমার জানা ছিল না। 'বঙ্গশ্রী'র দ্বিতীয় বৎসরে জীবনদা কবিতাটি একদিন আমাকেই উপহার দিয়া বিস্মিত করিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, সেই দিন সেই সময়ে শৈলজানন্দ, প্রণব, পাঁচুগোপাল ও ফণীন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তখন 'ছায়া' (?) নামক সাময়িক পত্র বাহির করিতেছেন। তাঁহাদের আগ্রহে কবিতাটি

তাঁহাদের সমর্পণ করিলাম। সাহিত্যিক বন্ধুদের ও পত্রিকার নাম-সম্বন্ধে আমি স্থির-নিশ্চয় নহি, আশ্চর্যের বিষয় আমার ডাইরিতেও এই ঘটনার উল্লেখ নাই। তবে স্মরণ আছে, পত্রিকাটি "ভুলি নাই"-লাঞ্ছিত হওয়াতে পুলিসের কবলে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিল এবং জামিনের টাকা দাখিল করিতে না পারিয়া বিলুপ্তও হইয়াছিল। কবিতাটি এই :

যাহারা শোণিতসিক্ত পদচিহ্নে পথ রচি' বিক্ষুব্ধ ধূলায়
উত্তপ্ত বুকের রক্তে মৃতপ্রায়া জননীর করিল তর্পণ,
মানবের মহালোভ, বাঁচিবার লোভ যারা ত্যজিল হেলায়,
নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা অমারাত্রি সার করি কৈল বিসর্জন।
স্বাধীনতা সঁপি দিতে বহু লক্ষ পরাধীন আশাহীন জনে
পথ-কুক্কুরের মত পথে পথে তাড়া খেয়ে ফিরি' দীর্ঘদিন
কেহ বা বরিল কারা, কেহ মৃত্যু—মহোল্লাসে প্রেম-আলিঙ্গনে—
স্বেচ্ছাবৃত অপঘাতে জীবনের সর্ব আশা করিল বিলীন।
ক্লেদপঙ্ক-সমাকীর্ণ এ তিমিরে তাহারা আলোক-বার্তাবহ,
তাহারা জানিয়াছিল দিশাহীন অন্তহীন নহে পারাবার,
ওরে হতভাগা-দেশ, তাদের স্মরণ করি মৃত্যুদীক্ষা লহ—
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার।

তাদের বুদ্ধিরে ল'য়ে শুনিয়াছি পণ্ডিতেরা করে আলোচনা,
কেহ কহে মূর্খ তারা, দম্ভসার, চলেছিল ভুল পথ ধরি,
জীবনের রাজপথে চলিতে অক্ষম তারা, কৈল আনাগোনা
অলক্ষ্য অরণ্যপথে অন্ধকারে ত্রস্তপদে দিবা-বিভাবরী—
মানব-কল্যাণ লাগি গূঢ়গুহাশায়ী হয়ে অলক্ষিত লোকে
অমৃত-সন্ধানী তারা চিরমৃত্যু-আশঙ্কায় যাপিল জীবন।
মানি না তাদের কথা, আমি জানি অনির্বাণ প্রাণের আলোকে
উদ্ভাসিত ভাল যার, মৃত্যুভীত কাপুরুষ নহে সেই জন।
লক্ষ লক্ষ অক্ষমের অপমানে আপনার অপমান মানি
সুকঠোর দৃঢ়হস্তে যে খুঁজিল প্রতিদিন তার প্রতিকার—
কাপুরুষ অপবাদ নহে তার, কভু নহে ইহা সত্য জানি
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার।

হয়তো করেছে ভুল, হয়তো বা অকস্মাৎ বিনা প্রয়োজনে
করেছে মৃত্যুর পূজা সুনির্মম, চাহে নাই প্রিয়জন পানে—

জননীর আঁখিজল শুকাইল ঝরি ঝরি বিনিদ্র নয়নে,
প্রিয়ার পাণ্ডুর ওষ্ঠ আজো কাঁপে রহি রহি রূঢ় প্রত্যাখ্যানে।
সুকোমল গৃহশয্যা ডাক দিল আজো তবু রয়েছে অম্লান,
মহামৃত্যু-সাধনায় মিটিয়াছে সন্ন্যাসীর অতৃপ্ত পিয়াস,
স্তব্ধ হ'ল আঁখিতারা, যা খুঁজেছে বুঝি তার মিলেছে সন্ধান ;
মহাকাল উর্ধ্বে থাকি নেয় বলি, তবু যেন করে উপহাস।
আমরা কাঁপিয়া উঠি অকস্মাৎ বিলম্বিত আরাম-শয্যায়,
আকাশে খসিল তারা, লাভ-ক্ষতি কে গনিবে ধূলির ধরায় ?
তাদেরে দিও না গালি, হে শঙ্কিত, ঢাকিবারে আপন লজ্জায়,
মৃত্যু বরিয়াছে যারা মৃত্যুভয়ে তাহাদেরে কর নমস্কার।

বন্ধুবর মনোজ বসু দশ বৎসর পরে তাঁহার 'ভুলি নাই' উপন্যাসের মুখবন্ধ হিসাবে কবিতাটিকে স্থান দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন এবং বন্ধু-কৃত্য হিসাবে তাঁহার গ্রন্থখানি আমাকে উৎসর্গ করিয়াছেন। কবিতার মূল্য ইহার অধিক কোনও দিনই কামনা করি নাই।

বাহিরে আমি যখন সংগ্রামরত এবং ক্ষতবিক্ষত, পরিমলদা তখন বীরবিক্রমে আমার মৌলিক আশ্রয় এবং চিরদিনের কেল্লা অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে হয়তো নকল এবং আমার পক্ষে আসল বুঁদিগড় রক্ষা করিতেছিলেন। বনফুলের কথা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আরও অনেক সাহিত্যিক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বরাবরের জন্য শনিগোষ্ঠীভুক্ত হইয়াছেন।

গোড়াতেই বলিয়াছি, অবলোকন এবং পর্যবেক্ষণ-পর্ব আমার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। দেখিবার অনেক তবু বাকি ছিল ; ১৬ই চৈত্র (১৩৪০) তালতলা-সাহিত্য-সম্মেলনীর সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে যোগ দিয়া কিছু দেখিলাম। ডক্টর সুনীলকুমার দে সাহিত্য-শাখার সভাপতি-রূপে "বর্তমান সাহিত্য-সঙ্কট" শীর্ষক ভাষণ দিলেন। পরবর্তী বৈশাখে 'বঙ্গশ্রী'তে তাহা মুদ্রিত হইল। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন প্রমুখ সুনীলকুমারের কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরিচিত হইলাম। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর সহিত পুরাতন সম্পর্ক ঝালানো হইল। গিরিজাশঙ্কর রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে লইয়া আমার জীবনে নূতন সঙ্কটের সৃষ্টি করিলেন। সাহিত্য-সঙ্কট নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া জীবন-সঙ্কট হইয়া উঠিল। অনেক দেখিলাম, অনেক শিখিলাম।

নূতন কিছু শিক্ষা লাভ হইল সাহিত্যিক-চক্রে বসিয়া। সন্ধ্যায় বসিত গল্পচক্র—পুরোহিত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, স্থান কখনও 'বঙ্গশ্রী' আপিস এবং কখনও প্রিন্সেপ ঘাটের দুই দিকের দুই সিংহের পৃষ্ঠদেশ। অশোক চট্টোপাধ্যায়, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান রায়, কবি সুবল মুখোপাধ্যায় ও আমি এই চক্রে শৈলজানন্দের শিষ্য ছিলাম। শিষ্য অশোক রাজা-উজীর-মারী গল্পে গুরু শৈলজানন্দের সহিত পাল্লা দিতে পারিতেন। চক্রের উপকরণ ছিল ধূম। শৈলজানন্দের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে আমাদিগকে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল করিয়াছিল, তখনই অবজেকটিভ সাবজেকটিভ হইবার পথ খুঁজিতেছিল।

একটু অধিক রাত্রে বসিত কবিতাচক্র—এই চক্রে প্রেমেন্দ্র প্রধান; নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, কিরণকুমার ও আমি শিষ্য; অধিবেশন বসিত কখনও কালীঘাটে, কখনও হাওড়ায়। ধূম কবিতার বকযন্ত্রে পরিস্রুত হইয়া তরল-মধুররূপে মদালস-আবেশের সৃষ্টি করিত। আবৃত্তির মুখে কবিতার পংক্তির পর পংক্তি আবর্তিত হইয়া ফিরিত—তাহার মূল সুর হইতেছে—"বহুদিন মনে ছিল আশা—"। হাওড়া হইতে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময় হাওড়ার পুরাতন পণ্টুন ব্রিজকে আমাদেরই মত অসংলগ্ন দেখিতাম। গঙ্গা পার হইবার কালে প্রেমেন্দ্র-নৃপেন্দ্রের কাব্যোচ্ছ্বাসে তরণী টলমল করিত। তারকাকামী পতঙ্গের ডানায় ভর করিয়া নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া বাড়ি ফিরিতাম।

এই ধরণের নানা উপকরণসমৃদ্ধ আমার মন ধীরে ধীরে বহির্বিশ্ব হইতে সংবরণ করিয়া অন্তর্লোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রুজি-রুটির ভাবনা প্রায় মিটিয়া আসিয়াছিল বলিয়া অর্থাৎ নিরাপদ হইতেছিলাম বলিয়া আমার চিত্ত আবার অশান্ত হইয়া বিপদ খুঁজিতেছিল। চাকরির ঠুলি বাঁধা চোখে ঘানির চারিদিকের অভ্যস্ত পথে বারংবার আবর্তিত হইতে হইতে বুকে বিদ্রোহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। দড়ি ছিঁড়িয়া ঠুলি খুলিয়া অনভ্যস্ত পথে উদ্দাম হইয়া ছুটিবার দুষ্প্রবৃত্তি মনের মধ্যে প্রবল হইতেছিল। অমৃতে যাহার অরুচি, কালকূট তাহাকে পান করিতেই হইবে। আত্মদর্শন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল; চারিদিকে যাহা দেখিয়াছিলাম, আমার কবিমানসে তাহাই রূপ লইয়াছিল (ফাল্গুন, ১৩৪০) এইভাবে:

পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।
বিলাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে কলুষিত হয়েছে যাহারা,

লোভে ক্ষোভে জিহ্বা-মুখে যাহাদের ঝরিছে নিয়ত
দূর হতে লালাস্রাবী প্রেম,
লোলুপ ছেলের মত জীবনেরে ভালবাসে যারা,
জীবনেরে ভালবাসে, ভালবাসে আর করে ভয়—
দু কথা তাদেরে কহি, পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।
রৌদ্র নাহি ভালবাসে, মাথার উপরে ঘোরে পাখা,
কেঁদে যা'য় আকাশের হাওয়া।
ছবির মেঘের বুকে দেখে তারা সিনেমার চাঁদ,
স্টুডিও-উইয়ের-ঢিবি হিমালয়ে করিছে আঁধার।
জলপূর্ণ কাচপাত্রে তাহাদের নীলাম্বু-বিস্তার,
উঠানের টবে হেরে বারিধির উন্মত্ত নর্তন;
সাগরে জলের ঢেউ আছাড়িয়া তটেরে কাঁদায়।

বালুময় বেলাভূমে ছাতার আড়ালে রহে তারা,
সেথাও ড্রইংরুম-প্রেম।
তাদের বসন্ত আসে, ঝরে না গাছের মরা-পাতা,
রঙে সাজে কাগজের ফুল,
নিখুঁত জ্যামিতি-কষা 'বেডে' ফোটে ফুল মরশুমী—
অপরূপ নাম তাহাদের;
সে নাম যাহারা শোনে, মালীরে ধ্বার দিয়ে দাম,
তাহাদের কানে কানে শোনাব মৃত্যুর শতনাম।

দশ ধাপ সিঁড়ি উঠে, বেঞ্চ পাতা 'হলে' যাহাদের
নির্লিঙ্গ দেবতা শোনে চোখ বুজে অর্গ্যানে কোরাস;
তত ধর্ম যত ওঠে হাই,
চর্মের ভ্যানিটি-ব্যাগে দর্পণেতে দেবতার ছায়া,
আমি সেই দেবতার দেখিয়াছি মৃত্যুর স্বরূপ—
ধূলি বালি কর্দম কঙ্কর।
মর্মর-বেদীর 'পরে দেখিয়াছি হাসিছে করোটি—
দেবতা মৃত্যুর পাত্রে পান করে জীবন-আসব—
পান করে, হাসে খলখল।
পমেটম-ক্রীম-ঢাকা চর্মে হায়, লাগে না শিহর,

কর্ণে নাহি পশে অট্টহাসি।
ধর্মের মন্দির-গর্ভে চিতাধূম দেখিয়াছি আমি—
প্রেমের বেদিকামূলে লেলিহান মৃত্যুর রসনা—
মহাকাল-করাল-ভ্রূকুটি।
মায়া-মোহ-যবনিকা ধীরে ধীরে করি উত্তোলন
জীবনের রঙ্গমঞ্চে দেখাব মৃত্যুর অভিনয়—
মৃত্যুরে করিয়া নমস্কার।

স্বার্থের উদ্দাম লীলা লালসার উলঙ্গ মত্ততা,
প্রেমের মুখোশ পরি কি বীভৎস কামের কলুষ!
সন্তান গড়িয়া তোলে অর্থলোভী আয়ার সাধনা,
ক্লীব স্বামী ঔদার্যের ছলে
পত্নীরে তুলিয়া দিয়া পরের মোটরে
পর-অর্থে চালায় সংসার।

... ...

শিশুর পীযূষ-স্তন্য চাটিতেছে দন্তহীন বৃদ্ধের রসনা।
যে মরিবে সে মারিছে যে বাঁচিবে তারে ;
গুরুভক্তি পিতৃভক্তি বংশের সম্মান,
বিরূপ বীভৎস হয়ে জীবনের রোধিয়াছে পথ।

একের লালসা—
অর্থবল, লোকবল, অসহায় দরিদ্রেরে অন্ন-দানবল,
পদ-প্রতিপত্তি আর ক্ষুধিতের উদরের ক্ষুধা,
দরিদ্রের স্ত্রীকন্যার বস্ত্র-অলঙ্কারে অভিরুচি,
মোটর-ব্যসন আর হোটেল-বিলাস—
সব কিছু মিলিয়াছে মিটাইতে একের লালসা
বহুরে বঞ্চিত করি।
এক কাম-বহ্নি মাঝে বহু প্রেম দিতেছে আহুতি ;
দগ্ধ-প্রেম-ভস্মে জন্মে উদরের সামান্য সংস্থান।

রূপসীর মাতৃস্নেহে দিকে দিকে করিছে সংহার
পুরুষের বিকল পৌরুষ ;

বক্ষে ক্ষীর আসিতে না পায়।
দেহ-বেচা অর্থে মাতা সন্তানের দুগ্ধ করে ক্রয়—
দেহ-জাত হায় রে সন্তান!
যুগযুগান্তর ধরি পৃথিবীর মানবের শিশু
কাঁদিছে মায়ের কোলে বসি—
মাতা অসহায়—
সাম্রাজ্য ফ্যাক্টরী মদ আফিম কোকেন
তাড়িখানা রেস্তোরাঁ হোটেল
পথে পণ্যরমণীর ক্ষুধার্ত ইঙ্গিত—
সভ্যতার রথচক্র ঘর্ঘারিয়া ছুটিছে উদ্দাম।
লোভী ছেলে ছুটে যায় পথে,
জননীর চোখের সম্মুখে
রথচক্রতলে তার ছিন্নভিন্ন দেহ—
রক্তস্রোতে কর্দমাক্ত ধূলি।
সে লোহিত ধূলিজালে দেবতার মহান প্রকাশ—
অপরূপ মৃত্যুর বৈভব।

চারিদিকের এই বীভৎস বিকৃতি এবং আসন্ন ধ্বংসের মধ্যে আমার মন কিন্তু কালকূটপায়ী মৃত্যুঞ্জয়ের সন্ধান পাইয়াছিল। সে দমে নাই বা মুহ্যমান হয় নাই। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছিল:

সে মৃত্যু আমার মৃত্যু নয়।
দিগন্ত ছাইয়া উড়ে আমার শিবের জটাজাল,
আকাশ আঁধার করে অঙ্গের বিভূতি···
দিকে দিকে থৈ থৈ মৃত্যুর তাণ্ডব
তারি মাঝে জীবন-অঙ্কুর
শাখাপত্র পুষ্প মেলে আলোকের পানে,
প্রলয়ে করে না ভয়, দাঁড়ায়ে মৃত্যুর মুখামুখি
আপনি বাড়িয়া চলে আপন গৌরবে।

এদিকে আমার অশাস্ত্রীয় জীবনযাত্রার কাহিনী পোলক স্ট্রীটের বাসবলোক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, ইঙ্গিতে সতর্কবাণীও আসিয়াছিল; আমি ভয় পাই নাই। কবিতায় জবাব দিয়াছিলাম—আশ্বিনে (১৩৪১) "বজ্র-আশীর্বাদ" ছাপিয়া:

আসলে ইহা আমারই চিরন্তন দেব-সংস্কারের সঙ্গে বোঝাপড়া—সুখশান্তির নন্দনের জীবনের সঙ্গে চিরচলমান শাশ্বত মানবজীবনের আপোসহীন সংগ্রামের কবিতা :

হান বজ্র, বজ্র হান, মেঘলোকবাসী হে বাসব,
বজ্র হান আমাদের শিরে।
দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী—
সুদুর্মদ অহঙ্কারে শূন্যপানে আস্ফালিয়া বাহু,
মেঘলোকে তুলি শির উচ্চকণ্ঠে কহিতেছি ডাকি—
ত্রিদিবের অধীশ্বর আমি আছি—আর কেহ নাই,
সৃজিয়া নিখিল বিশ্ব, সৃষ্টিধ্বংস করি আমি আপন খেয়ালে;
জন্ম আর মৃত্যু—এই জগতের সত্য ইতিহাস
আমিই রচনা করি।
ভোগ করি, করি ক্ষয়, অপচয়ে আনন্দ আমার—
অতীতে করি না নতি, ভবিষ্যের করি না সঞ্চয়,
যাহা আছে, যাহা পাই, মুঠি ভরি উড়াই ফুৎকারে,
অনন্ত কালের বক্ষে ক্ষণিকের বুদ্বুদ-বিলাস!

তোমরা ঊর্ধ্বেতে থাক হে দেবতা নন্দননিবাসী,
ঊর্ধ্ব হতে আমাদেরে কর কর বজ্র-আশীর্বাদ—
হান বজ্র আমাদের শিরে।
আমরা মরিতে চাই, মরিয়া বাঁচিতে চাই মোরা—
ধরার মৃত্তিকাবক্ষে পদচিহ্ন নিমেষে মিলায়—
অনন্ত অশেষ প্রেম তাও ধীরে শেষ হয়ে আসে।
ক্ষণকাল পূজা করি অতি ব্যর্থ স্মৃতির মন্দিরে
স্মৃতির শ্মশানভস্ম কালস্রোতে ফেলে দিই টানি।
মনে রাখি, ভুলে যাই, ভালবাসি, ঘৃণা করি, পুন
যাহারে ঠেলিয়া ফেলি তারি লাগি কাঁদিয়া ভাসাই।

যে দুঃখ-দারিদ্র্য বেদনা-পীড়ন ক্ষয়-ক্ষতি-মৃত্যুর মধ্য দিয়া মানুষের পথচলা, সেই সব কিছুকে উপহাস-উপেক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত জয় করিয়াই তাহার গৌরব, তাহার আনন্দ—পূর্বাপর মানুষের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিয়াছে। অবলোকন-পর্যবেক্ষণের ফলে আত্মচিন্তা করিয়া আমি ধীরে ধীরে সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত

হইতেছিলাম। ইতিপূর্বে অনিশ্চিত অন্ধকার পথের ভয়হরণ-মন্ত্ররূপে "আমি"র যে স্তুতি উচ্চারণ করিয়াছিলাম, তাহারই পরিণত ও সংহত রূপ এই "বজ্র-আশীর্বাদ" :

আপনারে উৎসারিয়া আবরিয়া ফেলি এ নিখিল,
ভেঙে-চুরে চ'লে যাই নিঃশঙ্ক গর্বান্ধ পদাঘাতে,
দলিয়া পিষিয়া মারি নিজ হাতে আপনার জনে ;
নির্মম কুঠার হানি সম্মুখে রচিয়া চলি পথ,
পিছু ফিরে অকারণ খলখল হাসি অট্টহাসি।

সবারে পশ্চাতে ফেলি দূরে গিয়ে ফেলি অশ্রুজল।
হতাশায় ভেঙে পড়ি, পথ ছেড়ে হই যে বৈরাগী ;
মনে হয় মিথ্যা সব, কিছুতে নাহিক প্রয়োজন।
চোখে পুন লাগে রঙ, ধরা পড়ি, করি যে শিকার,
প্রিয়ে করি প্রিয়তর, প্রেয়সীরে প্রিয়তমা করি।
মদিরাবিহ্বল নেত্রে মধ্যরাত্রে পূজি বারাঙ্গনা,
শুচিস্নান করি প্রাতে দেবীর মন্দিরে দিই পূজা।

এও ক্ষণিকের খেলা, মৃত্যুর বধির অন্ধকারে
নিঃশব্দে ডুবিয়া যাই অলক্ষিতে সহসা একদা।
ঢেউয়ের পশ্চাতে ঢেউ, এক যায়, পুন আর আসে,
শ্মশানের শুষ্ক চরে পলি পড়ে, ফসল গজায়—
পাষাণে জলের লেখা—মানুষের এই ইতিহাস।

মানুষের মহামানবীয় রূপ তাহার মৃত্যুর মধ্যে ; মৃত্যুকে সে যেখানে ভয় করে নাই সেখানেই সে বাঁচিয়াছে। নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে, প্রগল্ভ বিলাসের মধ্যে এই সত্য সেদিন উপলব্ধি করিয়া আমার আত্মঘাতী মানুষ-সত্তা নিজেকে নিঃসহায়-নিরাবরণ সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আর একবার আত্মপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সঙ্কটের রকমটা তাহার জানা ছিল না, শুধু আরামটা তাহার সহিতেছিল না। এক কথায়, বিপদ ডাকিয়া আনিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। নিজেকে সাহস দিবার জন্যই যেন লিখিয়াছিলাম :

শাশ্বত নন্দনে তব, হে বাসব, কে আছে দেবতা—
পড়ে পাষাণের লেখা, গনে নর-জীবনের ঢেউ ?

কেহ নাই, নিঃসঙ্কোচে হান হান হান বজ্রবাণ,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
মরিতে করি না ভয়, যুগে যুগে মরিয়াছি আমি—
আমার গগনস্পর্শী স্পর্ধা কত মিশিল ধূলায়—
কত উর, বাবিলন, ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, কার্থেজ,
যুগে যুগে কত জাতি জন্ম নিল, মরিল নিঃশেষে—
ফারাও, কাইসার কত, শার্লমেন, চেঙ্গীজ, তৈমুর—
পাষাণ-মর্মর মূর্তি কারো আছে, কারো পড়ে ভেঙে,
স্মৃতি সে পাষাণ-ভার বিস্মৃতির প্রত্যন্ত-সীমায়।
বাঁচিবারে চাহি নাই, বাঁচি নাই শামুকের খোলে,
শাখা ত্যজি ধরাপৃষ্ঠে নামিয়াছি মৃত্যু-আকাজ্ক্ষায়,
মেঘচুম্বী দেবলোকে মুহুর্মুহু হানিতে কুঠার
করেছি আকাশ-যাত্রা কামনার ডানা ঝাপটিয়া।
সাগরে ভাসাই তরী, ডুবিয়াছি গহন গভীরে
অতিকায় জলসর্প শুয়ে যেথা প্রবাল-শয্যায়।
মরুপথে অভিযান, ঘনারণ্যে শ্বাপদ-গুহায়,
মর্ত্যের মৃত্তিকা খুঁড়ি নন্দনের মাণিক্য-সন্ধান,
হিমাচল-শৈলচূড়ে মৃত্যুসাথে যুঝি বারম্বার,
তুষারেতে পদচিহ্ন মুছে যায় হিমমেরুপথে।
বহ্নিরে করেছি বন্দী, অশনি শোনায় মোরে গান,
সে গানের অন্তরালে লক্ষ লক্ষ মৃত মানবের
উঠিতেছে অবিরাম মৃত্যুঞ্জয়ী জয়োল্লাসধ্বনি!
তুমি কি শুনিতে পাও, হে বাসব, সে জয়-সঙ্গীত?
তোমারে উপেক্ষা করি মানবের এই অভিযান
স্নেহচক্ষে দেখিয়াছ, অতি লুব্ধ মানব-সন্তানে—
আমারে—করেছ ক্ষমা?

দেখিয়াছ, হে দেবতা, যুগে যুগে কর আশীর্বাদ,
রূঢ় বজ্র হানিয়াছ বারম্বার মানবের শিরে—
আজো হানিতেছ তাহা ঊর্ধ্বে থাকি প্রবল বিক্ষেপে,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
স্পর্ধা মোর ভাসায়েছ কতবার প্রলয় প্লাবনে,

ফুঁসিয়া বাসুকী তব বারম্বার নাড়িয়াছে মাথা,
আমারে ঢাকিয়া গেছে লাভাস্রোত আগ্নেয়গিরির,
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে কত তরী ডুবিল অতলে,
কত গৃহ উড়িল ঝঞ্ঝায়—
কত বজ্র হানিয়াছ যুগে যুগে মহামারী-রূপে।
কি তাতে হয়েছে ক্ষতি, হে বাসব ? এরি মাঝখানে
আমার প্রচণ্ড দম্ভ বারম্বার হাসে অট্টহাসি।
এরি মাঝখানে
মহাযুদ্ধে বারম্বার আপনারে করেছি হনন…
শ্যামল ধরণীবক্ষ করিয়াছি মৃতের শ্মশান।
আত্মঘাতী দম্ভে মোর, হে দেবতা, ওঠ না শিহরি ?
কর নাকি বজ্র-আশীর্বাদ—
তোমার প্রচণ্ড বজ্র পড়ে নাকি নিষ্ফল-হুঙ্কারে
অসতর্ক অসহায় আবরণহীন এই মানুষের শিরে ?

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

আত্মস্মৃতি

তৃতীয় খণ্ড

উৎসর্গ

জগদীশ ভট্টাচার্য

স্নেহাস্পদেষু

আত্মস্মৃতি

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম তরঙ্গ

১৯৩৫

'বঙ্গশ্রী' বাহির হইবার তিন মাস পরেই অর্থাৎ ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে আরও দুইটি মাসিক পত্রিকা কলিকাতায় জন্মলাভ করে—'অভ্যুদয়' ও 'উদয়ন'। প্রধানত সাহিত্যই পত্রিকা দুইটির উপজীব্য ছিল; হয়তো 'বঙ্গশ্রী'র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাও প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। সদ্য-'উপাসনা'ভ্রষ্ট সাবিত্রীপ্রসন্ন অনেক তোড়জোড় করিয়া 'অভ্যুদয়ে'র অভ্যুদয় ঘটান। প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ প্রশস্তি-কবিতা "অভ্যুদয়ে" এই ইঙ্গিত করেন—

"শত শত লোক চলে শত শত পথে
তারি মাঝে কোথা কোন্ রথে
সে আসিছে যার আজি নব অভ্যুদয়।
দিক্‌লক্ষ্মী গাহিল না জয়,
আজো রাজটীকা
ললাটে হ'ল না তার লিখা।
নাই অস্ত্র নাই সৈন্যদল,
অস্ফুট তাহার বাণী, কণ্ঠে নাহি বল।
সে কি নিজে জানে
আসিছে সে কি লাগিয়া, আসে কোন্‌খানে।
যুগের প্রচ্ছন্ন আশা করিছে রচনা
তার অভ্যর্থনা…"

আজ বাইশ বৎসর পরে মাত্র এক বৎসরের ক্ষণজীবী 'অভ্যুদয়ে'র সূচী ও পাতা উল্টাইয়া কবির "সে আসিছে যার আজি নব অভ্যুদয়" এই উক্তি একমাত্র তারাশঙ্করের উপর আরোপ করিতে পারিতেছি। এক বৎসরে 'অভ্যুদয়ে' যাঁহারা লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই তখনই লব্ধপ্রতিষ্ঠ, গত বাইশ বৎসরে ইঁহাদের গৌরব বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। দেখিতেছি, সেদিনকার অস্ফুটবাণী ও দুর্বলকণ্ঠ তারাশঙ্করেরই অভ্যর্থনা রচনা করিয়াছে সে যুগের প্রচ্ছন্ন আশা। এক বৎসর ধরিয়া তাঁহার অপরিপক্ক "বেনের বেসাতি" (বর্তমান নাম 'প্রেম ও প্রয়োজন') উপন্যাস 'অভ্যুদয়ে' প্রকাশিত

হইয়াছিল; তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবনের সেই পইঠাটুকু রচনা করিয়াই 'অভ্যুদয়ে'র বিলয় ঘটিয়াছিল। সাবিত্রীপ্রসন্ন তাঁহার শেষ "নিবেদনে" লিখিয়াছিলেন—

"দেশের বর্তমান অবস্থায়, সাহিত্যিকের কোনও পত্রিকা চলিতে পারে না এবং বর্তমান ক্ষেত্রে 'অভ্যুদয়ে'র মত মাসিক পত্রিকা সম্পাদনের কোন সার্থকতা দেখা যাইতেছে না।"

'উদয়নে'র আয়ু ছিল কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর অর্থাৎ মাত্র দুই বৎসর; ১৩৪১এর চৈত্রে 'উদয়ন'-কর্তৃপক্ষও 'উদয়ন'-সম্পাদনের কোনও সার্থকতা আর দেখিতে পান নাই, যদিও দুই বৎসরে কাঞ্চনমূল্যে বহু খ্যাতিমান বঙ্গসাহিত্যিক 'উদয়নে' বাঁধা পড়িয়াছিলেন। ইহার সম্পাদক ও পরিচালক অনিলকুমার দে ছিলেন ছাপাখানা-ব্যবসায়ী, 'উদয়ন' প্রকাশ করিয়াই ইনি "সাহিত্যবন্ধু" আখ্যা পান। কিন্তু "সাহিত্যবন্ধু"র কোনও সাহিত্যিক বন্ধু 'উদয়ন'-সম্পাদনে একান্ত কর্তৃত্ব পান নাই বলিয়া বিচ্ছিন্ন বহু মূল্যবান উপকরণ সত্ত্বেও 'উদয়ন' দানা বাঁধিতে পারে নাই। সমবেতভাবে প্রচুর কলরব উঠিয়াছিল, কিন্তু 'উদয়ন'-উত্থিত কোন কলকণ্ঠই স্থায়ী হয় নাই।

সাবিত্রীপ্রসন্ন নিরুৎসাহ হইয়া যে আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, সে যুগের পক্ষে তাহা মোটেই প্রযোজ্য নয়। 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি সু-চলমান পত্রিকার কথা বাদ দিলেও তখন শুধু 'বঙ্গশ্রী' এবং 'শনিবারের চিঠি'তেই অনেক নূতনের অভ্যুদয় ও উদয় ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (নাটক), তারাশঙ্কর (ছোটগল্প), বনফুল (ব্যঙ্গকবিতা), চন্দ্রহাস (ব্যঙ্গকবিতা), মনোজ বসু (ছোটগল্প), প্রমথনাথ বিশী (উপন্যাস), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (উপন্যাস), অমলা দেবী (ছোটগল্প) প্রভৃতি এবং সমালোচনা-গবেষণামূলক সাহিত্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, অমূল্যচন্দ্র সেন, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের কীর্তি উদয়-অভ্যুদয়েই খণ্ডিত হয় নাই, উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া বাংলা-সাহিত্যকেও গৌরবান্বিত করিয়াছে।

'বঙ্গশ্রী'র দ্বিতীয় বৎসরের শেষার্ধে আমি যখন "বিচিত্র জগতে"র বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বিজ্ঞান-জগতে"র গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, "চতুষ্পাঠি"র নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, "বুদ্ধকথা"র* অমূল্যচন্দ্র সেন ও "বাংলা সাহিত্যের

* সানন্দে ঘোষণা করিতেছি, 'বুদ্ধকথা' সবেমাত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।—লেখক।

ইতিহাসে"র সুকুমার সেন প্রভৃতিকে লইয়া পরিপাটিভাবে আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছি, তখনই কোনও অজ্ঞাত ভূমিকম্পের ফলে আমার মনে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। দুই মেরুর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মন ইন্দ্রলোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বজ্রাঘাতের প্রতীক্ষায় উদ্যত ও উদ্ধত হইয়া রহিল।

ভিতরে ভিতরে আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া থাকিলে সমরানল জ্বালিবার উপলক্ষ্যের যে অভাব হয় না, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুলাই তারিখে অস্ট্রিয়া কর্তৃক তদানীন্তন সার্বিয়ার উপর যুদ্ধ-ঘোষণায় তাহাই প্রমাণিত হয়। এক মাস পূর্বে ২৮ জুন তারিখে সেরাজেভো (যুগোস্লাভিয়া) শহরে অস্ট্রিয়ার ভাবী সম্রাট আর্কডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনাণ্ড আততায়ী কর্তৃক নিহত না হইলেও যে ভিন্ন অজুহাতে বিশ্বমহাযুদ্ধ সংঘটিত হইত, ইতিহাসের ছাত্রেরা তাহা অবগত আছেন। আমার ক্ষেত্রেও উপলক্ষ্য সামান্য, আমার অজ্ঞাতসারে খোদ কর্তা কর্তৃক একটি গল্পের নির্বাচন ও ছাপাখানায় প্রেরণ।

ব্যাপারটা আমার গোচরীভূত হওয়ামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলাম। টেলিফোন-যোগে সরাসরি কর্তাকে জানাইলাম, তিনি অনধিকারচর্চা করিয়াছেন। তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ লেখাটি আমি ছাপিতেছি বটে, তবে ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। ভট্টাচার্য মহাশয় প্রশান্তচিত্ততার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন না। পাশ্চাত্ত্য "ডিসিপ্লিন" এবং প্রাচ্য আচরণ-বাদ উভয় দিক দিয়াই আহত হইয়া তিনি উত্তপ্ত হইলেন। যন্ত্রযোগে কিছু তর্ক ও কথা কাটাকাটি হইল, এবং আমার পক্ষের এই উক্তিতে পরিসমাপ্তি ঘটিল—"অনুগ্রহপূর্বক আমাকে রেহাই দিন।"

ভট্টাচার্য মহাশয় সঙ্গে সঙ্গেই রেহাই দিলেন। তারিখটা বেশ মনে আছে, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৫, ১লা মাঘ ১৩৪১। মাঘের অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশে তখনও দুই-চারিদিন বিলম্ব ছিল। আমি টেলিফোন ছাড়িয়াই বাসব-লোক পোলক স্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া লিখিত ইস্তফাপত্র দাখিল করিলাম। সেই দিনই ছুটি হইয়া গেল।

আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি আকস্মিক হইলেও ইহা যে অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিঞ্চিদধিক তিন মাস কাল পূর্বে আমার কবিচিত্ত তাহা অনুভব করিয়া একটা বৈদান্তিক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিল, কার্তিকের 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত "শেখভের ডার্লিং" কবিতায় তাহার আভাস আছে—

অসম্ভবের করি না সাধনা, চাহি না নিত্যপ্রেম,
ততটুকু মোরে ভালবাস তুমি, যতটুকু থাকি কাছে,
যত দূরে যাই ততখানি যাও ভুলে।

জানি, বিদায়ের কালে
তোমার চোখের ছলছল-করা জলের অন্তরালে
লুকাইয়া আছে, থাকিবে লুকায়ে, তুমি না জানিতে পার—
প্রেমের পীড়ন হইতে তোমার মুক্তির হাসিখানি।
উঠিবে শিহরি ভাবিতেও সেই কথা,
সেই হাসি তবু জাগিবে সত্য হয়ে।

যুগে যুগে এই মাটির ধরণী সাধিয়াছে জনে জনে,
করিয়াছে পূজা লাখো মন্বন্তরে
লক্ষ মনুরে—মনু-সন্তান লাখো লাখো মানবেরে;
স্মৃতির বেদীতে অমর করিয়া পূজা করি বহুদিন
বিস্মৃতিজলে শেষে ফেলিয়াছে টানি।
শেখভের ডার্লিং—
পূজিতে একেরে একের পূজাই ভেবেছে সত্য বলি,
ভেবেছে তাহাই সত্য নিত্যকাল।
এক চ'লে গেছে, অপরে আসিয়া লইয়াছে তার পূজা,
একেরে ভুলিতে এক নিমেষেরও লাগে নি অধিক কাল,
কারো পূজা তার মাটির জীবনে হয় নি মিথ্যা কভু,
কারো স্মৃতি তার হয় নি মনের ভার—
প্রেমের এ ইতিহাস।

মাটির ধরার তুমিও দুলালী মেয়ে
তুমিও মাটির মেয়ে—
এই ধরণীর মাটির বক্ত করিয়া অতিক্রম
পার না হইতে পাথর-কন্যা শিবানী হৈমবতী।
জীবনে যে স্বামী, মৃত্যুতে তার ছাই-মাখা কাঁধে চড়ি
বিষ্ণুচক্রে খণ্ডে খণ্ডে পড় নাই পীঠে পীঠে।
এক হও নাই বহু—
বহুরে মিলায়ে এক করিতেছ দেহ-পাদপীঠতলে।
আমি সে বহুর এক—
দেহবেদী 'পরে চাপিয়া বসেছি নিত্যদেবতারূপে,
গুরুগুরু বুকে বিসর্জনের শুনিতেছি জয়-ঢাক,

নূতন দেবতা আসিতেছে পায়ে পায়ে,
বিদায় আমার আসন্ন হ'ল দেবী।
বিদায় আমার আসন্ন হ'ল, ক্ষোভ নাহি করি তবু,
জেনেছি সত্য মাটির জগতে ক্ষণিকের ভালোবাসা ;
তোমরা মাটির মেয়ে—
এক বরষার প্রণয়-প্লাবনে পলি-পড়া বালুতটে
ফোটে যে কুসুম, আর বরষায় ভেসে যায় স্রোতোমুখে।
নূতন করিয়া পলি-পড়া বালুচরে
ফোটে যে নূতন ফুল।...

নিঃস্ব অবস্থায় বিদায় লইলাম। এবারে কিন্তু নিঃসঙ্গ ছিলাম না। বন্ধু-বান্ধবের কাছে অকস্মাৎ এক মুহূর্তে 'হিরো' হইবার বিচিত্র গর্বানুভূতি উপভোগই করিতে পারিতাম না, যদি কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বান্ধব সেই একান্ত দুঃসময়ে আমাকে ঘিরিয়া না থাকিতেন। মৎপরিত্যক্ত 'বঙ্গশ্রী'র তৃতীয় বৎসরের প্রথম তিন সংখ্যায় তাঁহাদের সহৃদয়তার কাহিনী বিধৃত হইয়া আছে।

'বঙ্গশ্রী'র তৎকালীন লেখকদের কাহারও সহিত কর্তৃপক্ষের বিবাদ বাধে নাই। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু অনেকেই সাহিত্য-ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অনধিকার-চর্চায় অপমান বোধ করিলেন, তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণ গায়ে পড়িয়া ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত ঝগড়াও করিয়া আসিলেন। বরং বিভূতিভূষণের সহিত আমার সম্পর্ক তখন বিবিধ বন্ধনে খুব ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তারাশঙ্করের প্রতি সাহিত্যজনিত সম্ভ্রম-প্রীতি জাগ্রত হইলেও তখনও দুস্তর হার্দিক ব্যবধান। তাঁহার 'আমার সাহিত্য-জীবনে' 'চৈতালী ঘূর্ণি'র দপ্তরী-সংক্রান্ত যে সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি আমাকে লজ্জা দিয়াছেন, সেইটি ঘটিয়াছিল আমার চাকুরি ছাড়ার মাত্র এক মাস উনিশ দিন পূর্বে—১৯৩৪ সনের ২৬ নবেম্বর তারিখে। সুতরাং তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহার নূতন উপন্যাস "জমিদারের মেয়ে"র প্রথম কিস্তি মাঘ মাসে সদ্য বাহির হইয়াছে এবং ফাল্গুনের কিস্তিও ছাপা হইয়া গিয়াছে। উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হইলে একটা মোটা অঙ্ক তাঁহার লাভ হইত, কিন্তু তিনি নীতিবোধের দিক দিয়া 'বঙ্গশ্রী'র সহিত যুক্ত থাকা সমীচীন বিবেচনা করেন নাই; "জমিদারের মেয়ে" 'বঙ্গশ্রী'তে বন্ধ করিয়া 'ধাত্রী দেবতা' নামে 'শনিবারের চিঠি'তেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর কাহাকেও এতখানি ত্যাগস্বীকার করিতে হয় নাই।

তবু যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিচিত্র বলিতে হইবে। ফাল্গুন মাস শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—তারাশঙ্কর "জমিদারের মেয়ে" লইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, বিভূতিভূষণ তাঁহার "বিচিত্র জগৎ" সহ অন্তর্ধান করিয়াছেন—নূতন 'বিচিত্র জগৎ' সৃষ্টি করিয়াছেন শিবরাম চক্রবর্ত্তী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ "চতুষ্পাঠী" হইতে পলাতক—নূতন "চতুষ্পাঠী" খুলিয়া বসিয়াছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের অবৈজ্ঞানিক হৃদয়াবেগে "বিজ্ঞান জগৎ"ও স্তব্ধ হইল—দুই মাস পরে কাজী মোতাহার হোসেন আবার তাহা চালু করিলেন। মৃত ও জীবিত আরও যাঁহাদিগকে আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম—নিখিলনাথ রায়, সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু প্রভৃতি, তাঁহারাও কেহ কেহ চিরতরে, কেহ কেহ সাময়িকভাবে সরিয়া গেলেন। একমাত্র বন্ধুবর অমূল্যচন্দ্র সেন সুদূর জার্মানিতে ছিলেন, তিনি সেখান হইতে "পরিস্থিতি" ঠিকমত ঠাহর করিতে না পারিয়া "চীনা শ্রমণদের ভারতদর্শন" চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

মিষ্টান্নের দোকান হইতে এক ঝাঁক মাছিকে তাড়াইয়া দিলেও নূতন আর এক ঝাঁককে যেমন ঠেকাইয়া রাখা যায় না, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল; বিজয়রত্ন মজুমদার, শিশিরকুমার মিত্রের সঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে আসিয়া জুটিলেন। কেবল চিরন্তন সাব-এডিটর কিরণকুমার রায় বোঁটা-মহিমায় অবিচলিত-অব্যাহত রহিয়া গেলেন।

গোড়ার এই অদলবদল ও সোরগোল সত্ত্বেও "শেখভের ডার্লিং"-এ লিপিবদ্ধ আমার কাব্য-চিন্তা সফল হইতে বিলম্ব হইল না :

> তার পর তুমি আবছা দেখিবে দাঁড়ায়ে নদীর পাড়ে
> জলের তাড়নে একগাছি খড় দূরে চ'লে যায় ভেসে,
> ভেসে চ'লে যায় পাগল ঢেউয়ের মুখে ;
> বাড়াইয়া গলা দেখিবে, দেখিবে ক্রমে
> জলের রেখায় খড়ের রেখাটি লীন,
> দেখিতে পাবে না আর।

চাকরি ছাড়ার দিন বৈকালে সাহিত্যিক বন্ধুগোষ্ঠীর সান্ত্বনা আশ্বাস ও প্রশংসাবাদের বিপুল উচ্ছ্বাস হইতে স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানীর প্রসিদ্ধ দালাল বন্ধুবর শ্রীনিখিল দাস আমাকে একরূপ ছিনাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া একেবারে উপস্থিত হইলেন গঙ্গাতীরে প্রিন্সেপ ঘাটে—নিভৃতে বসিয়া ভবিষ্যৎকর্ম্মপন্থা নির্ধারণ করিতে হইবে। কি নির্ধারিত

হইল, প্রথম খণ্ডের "সংগ্রাম" অধ্যায়ে তাহার আভাস দিয়াছি। পরিমল গোস্বামী আমার চাইতেও বিপন্ন, ছাপোষা লোক; তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিয়া 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকীয় গদিতে বসাটা উচিত বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং দুই দাসে মিলিয়া স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানীর বই বেচিব—ইহাই স্থির হইল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউস্থিত "ভারত-ভবনে"র দোতলায় একটি ঘর ভাড়া লইয়া দাস অ্যাণ্ড কোং-এর আপিস খোলা হইল।

সেই ১৫ই জানুয়ারীর অপরাহ্নে 'বঙ্গশ্রী' হইতে বিদায় লইয়া আসিলাম এবং সত্য সত্যই জলের তাড়নে একগাছি খড়ের মত দূরে ভাসিয়া গেলাম। পরবর্তী ২৩ জানুয়ারী তারিখে অর্ধোদয়যোগের স্নান-সমারোহ ছিল কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। নিখিল দাসের গাড়িতে আমি মুক্তিস্নান করিতে গিয়াছিলাম। ভিড় এড়াইবার জন্য সুদূর তক্তাঘাটকেই বাছিয়া লইয়াছিলাম। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। ঘাটের মুখেই অপ্রত্যাশিতভাবে ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত মুখামুখি হইল। তিনি স্নান সারিয়া পট্টবাস পড়িয়া খড়ম পায়ে তাঁহার গাড়ির দিকে আসিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আমি প্রণাম সারিয়া মুখ তুলিতেই দেখি, তাঁহার চোখ ছলছল করিতেছে। অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, আপনি যে ভাল আছেন সে খবর পাই। তবু বলিতেছি, আপনি ভুল করিলেন। 'বঙ্গশ্রী'কে কেন্দ্র করিয়া আমার মনে অনেক আশা ছিল, সে আশা আপনাকে দিয়াই সফল হইত। আমি জানি, একদিন আপনার ভুল ভাঙিবে, সেদিন কিন্তু আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে দ্বিধা করিবেন না।

আমি অভিভূত হইয়াছিলাম, তথাপি বলিলাম, ভুলটা যদি আপনার পক্ষেই ঘটিয়া থাকে এবং সেই ভুল যদি আপনার ভাঙে—

—আমি আপনাকে মাথায় করিয়া লইয়া আসিব।

সেইরূপ কোনও ঘটনা ঘটে নাই বটে, তবে তিনি আমাকে বহুবার তাঁহার বরাহনগরের আবাসে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার প্রাঙ্গণের বাঁধানো দীঘির চাতালে বসিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে; যে দৃপ্ত রুদ্র তেজ তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা অনেকখানি স্তিমিত ও স্নিগ্ধ হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু পুনঃসংযোগ আর সম্ভব হয় নাই।

কেতাদুরস্ত আপিস, টেলিফোন, টাইপরাইটার এবং একখানা মোটরকার সত্ত্বেও দাস অ্যাণ্ড কোম্পানি দুই দাসের খোরাকি জোগাইতে অক্ষম হইল। প্রধান নিখিল দাসেরই প্রয়োজন প্রচুর, সুতরাং আমাকে ধীরে ধীরে

আবার মৃধিক হইয়া ২৫।২ মোহনবাগান রোয়ের গর্তে প্রবেশ করিতে হইল। মে মাস পর্যন্ত কোনও রকমে চলিল, আর চলে না।

ঠিক এই সময়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দল নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের বিরুদ্ধে প্রচুর বিষোদ্গার করিতেছিলেন। স্বয়ং সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার নলিনীরঞ্জনের পক্ষে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সরকার-বিরূপ হওয়াতে তিনি নিরুপায়।

মানুষের সুখ-দুঃখ চাকার মতই আবর্তিত হয়, যাহা একবার ঘটে তাহার পুনরাবৃত্তিও হয়। সরকার মহাশয়ের চরিত্রগত অপবাদ কতকগুলি পত্র-পত্রিকার নিত্য-আন্দোলনের বিষয় হইতে দেখিয়া 'শনিবারের চিঠি'তে পরিমলদা কোনও শুভমুহূর্তে এই সরকার-বিদূষণের তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। 'দৈনিক বসুমতী'র "সাময়িক প্রসঙ্গে" একদা নিজে বঙ্কিম-প্রশস্তি লিখিয়া পরে যে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলাম, পরিমলদার এই লেখাও আমার পক্ষে অনুরূপ লাভজনক হইয়া বসিল। আসন্ন সঙ্কটের মুখে বিমর্ষ হইয়া ২রা জুন প্রাতে বসিয়া আছি হঠাৎ নলিনাক্ষ সান্যালের মতই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের আবির্ভাব ঘটিল। একথা-সেকথার পর বুদ্ধিমান তিনি আমার আ-নাক নিমজ্জমান অবস্থা ঠাহর করিয়া লইলেন। বলিলেন, তোমার তো দেখছি মেশিন নেই, কাগজ চালাতে হ'লে শুধু টাইপেই কাজ হয় না, মেশিন একটা দরকার।

আমি ম্লান হাসিয়া বলিলাম, দরকার তো, কিন্তু পাই কোথা? সত্যেনদার মনে যাহা ছিল তাহা না ভাঙিয়া পরদিন প্রাতে তাঁহার বাসায় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তিনি তখন 'রূপবাণী' সিনেমার ঠিক পিছনের একটা বৃহৎ ভবনের তেতলার একটি ফ্ল্যাটে অবস্থান করিতেন।

পরদিন ৩১ মে ১৯৩৫—নির্দিষ্ট সময়ে গেলাম। বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকিতেই মহামান্য নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সহিত চোখাচোখি এবং নমস্কার-বিনিময় হইল। খাস ময়মনসিংহীয় ভাষায় অনেক ধানাই-পানাই করিয়া সরকার মহাশয় যে প্রস্তাব করিলেন তাহা বিচিত্র। তিনি আমাকে অবিলম্বে একটি ফ্ল্যাট মেশিন খরিদ করিবার টাকা ধার দিবেন, আমি তাঁহার বীমা কোম্পানির বিজ্ঞাপন নিয়মিত লিখিয়া সে টাকা শোধ দিব। ইহাকেই বলে, ছপ্পর ফুঁড়িয়া ভাগ্যোদয়।

সেই দিনই দ্বিপ্রহরে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া হক-মার্কেটসন্নিহিত সমবায় ম্যানসন্স-এ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের আপিসে দর্শন দিলাম। সরাসরি সরকার মহাশয়ের কক্ষে নীত

হইয়া দেখিলাম, টাইপ-করা একটি নিয়োগ-পত্র আমার জন্য প্রস্তুত আছে, আমার মরজি ও অবসর মাফিক বিজ্ঞাপন লেখার কাজের জন্য মাসিক বেতন দুই শত টাকা ধার্য হইয়াছে। কাজের লোক নলিনীবাবু, সই করিয়া নিয়োগ-পত্রটি আমার হাতে দিয়াই প্রশ্ন করিলেন, একটি ভাল পুরাতন মুদ্রাযন্ত্র খরিদ করিতে কত টাকা লাগিতে পারে? আমার পূর্ব-পরিচিত ইণ্ডো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানির শ্রীযতীন হুইয়ের সহিত এখানে আসিবার পথেই কথা বলিয়া আসিয়াছিলাম—একটা পুরাতন চালু ডবল-ক্রাউন রেকর্ড মেশিন মোটরসুদ্ধ বত্রিশ শ টাকায় পাওয়া যাইবে। অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচা ও কিছু নূতন টাইপের মূল্য ধরিয়া বলিলাম, মোট সাড়ে চার হাজার টাকা হইলেই চলিবে। নলিনীরঞ্জন বিনাবাক্যব্যয়ে একটি তিন হাজার টাকার চেক লিখিয়া আমার হাতে দিলেন, বলিলেন, বাকি টাকা মেশিন ডেলিভারির পর দিবেন। এই প্রসঙ্গ চুকাইয়া ঘণ্টা টিপিতেই বিজ্ঞাপন-বিভাগের একজন কর্তাব্যক্তির আবির্ভাব হইল, তিনি আমাকে হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানির কিছু ইংরেজী বিজ্ঞাপনী-পুস্তিকা দিয়া তাহাই অবলম্বনে মাতৃভাষায় একটি পুস্তিকার মত উপকরণ প্রস্তুত করিতে বলিলেন। নিয়োগপত্র, চেক ও কাজের নির্দেশ লইয়া হর্ষোদ্বেল চিত্তে বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু মেশিন বসিবার মাসাধিক কালের মধ্যেই এই নিয়োগ-পত্রের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া আমাকে বিচলিত করিল। সরকার মহাশয়ের নির্দেশমত তখন একটি টেলিফোন লইয়াছি। তাহারই মারফত সরকার মহাশয়ের গোপনকক্ষে আহূত হইয়া প্রথম যেদিন বুঝিতে পারিলাম আমাকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিরুদ্ধে লেখনী-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে, সেই দিনই আমার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তিন হাজার এবং বাকি দেড় হাজারও তখন লওয়া হইয়া গিয়াছে। আমি বিনীতভাবে নিবেদন করিলাম, প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আমি লিখিতে পারি, কিন্তু কোনও ব্যক্তির পক্ষসমর্থনে লেখনী ধারণ করিতে আমি অক্ষম। নলিনীরঞ্জনের হতাশাব্যঞ্জক প্রাদেশিক উক্তি এখনও আমার কানে বাজিতেছে—তাহা হইলে আপনাকে লইয়া আমি কি করিব? আমি কোনও আশাপ্রদ জবাব দিতে পারিলাম না। সুরেশচন্দ্র মজুমদার, প্রফুল্লকুমার সরকার, মাখনলাল সেনকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকি, তাঁহারাও আমাকে স্নেহ করেন। কুৎসার জবাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কুৎসা করিতেই হইবে। আমি তাহা পারিব না।

নলিনীরঞ্জন ঠিক ছেলেমানুষের মত বলিয়া উঠিলেন, তাহা হইলে আমার টাকাটার কি হইবে? বলিলাম, তাহা তো মেশিন ক্রয়েই ব্যয় হইয়া গিয়াছে,

অবিলম্বে ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত নলিনীরঞ্জন-সহোদর পবিত্ররঞ্জন সরকার মহাশয় আমাকে অ্যাটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের আপিসে লইয়া গেলেন, শত-করা নয় টাকা সুদের সাড়ে চারি হাজার টাকার ঋণ-পত্র প্রস্তুত হইল, ঋণদাতা হইলেন পবিত্ররঞ্জন সরকার মহাশয়। শোধ না হওয়া পর্যন্ত শনিরঞ্জন প্রেস তাঁহার নিকট বাঁধা থাকিবে। চারি বৎসরের মধ্যে সমুদয় ঋণ সুদসহ পরিশোধ করিতে হইবে। ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলাম।

ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ সত্ত্বেও আমি নির্বিবাদে এই কঠিন দায় স্বীকার করিয়া লইলাম বলিয়া সরকার মহাশয়ের সবিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করিলাম। তিনি আমাকে নিজেই একদিন টেলিফোনযোগে জানাইলেন, যদি কোনও দিন কোনও প্রয়োজন হয় তাঁহাকে জানাইতে যেন দ্বিধা না করি। তাঁহার কথা তিনি রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন দিল্লীতে, তখন একবার কাগজ-সংক্রান্ত বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি তৎপর হইয়া আমাকে বিপদ্‌মুক্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম তাঁহার আপিসকেও তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন, 'শনিবারের চিঠি'তে কোম্পানির বিজ্ঞাপন বরাবরই চলিতে থাকিবে। প্রসঙ্গত এখানে বলিতে পারি, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ঋণমুক্ত হইয়া আমি সরকার মহাশয়ের আরও স্নেহের পাত্র হইয়াছিলাম।

অঘটনঘটনপটীয়ান ভাগ্যের খেলায় বেকার হওয়ার সাত মাসের অর্থাৎ ১৯৩৫ সনের ১৫ই আগস্টের মধ্যেই অবলীলাক্রমে যখন একটি মেশিনসহ সম্পূর্ণ ছাপাখানার মালিক হইলাম তখন মাথায় ভাবনা ঢুকিল, মেশিন চলিবে কি করিয়া! 'শনিবারের চিঠি'র কাজ তখন যৎসামান্য, রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের বই ছাপার কাজও কাগজ-কেনার অর্থাভাবে বন্ধ। মেশিনের জন্য বেশি মাহিনায় এক জোড়া লোক নিযুক্ত করিয়াছি, কম্পোজিংয়ের লোকও বাড়াইতে হইয়াছে। অথচ দিনের পর দিন উপর নীচ করিবার সময় স-সাগরেদ ওস্তাদকে মেশিনের পাটাতনের উপর ময়লাটের কাগজ বিছাইয়া যখন নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতে দেখি, তখন সেই দৃশ্য নয়নে মধুবর্ষণ করে না।

তথাপি ঋণ করিয়া হইলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার একটা আনন্দ আছে। সম্পাদক পরিমল গোস্বামীর উপর সত্যকার পরিচালকত্বে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও তাঁহার কল্যাণে খুদকুঁড়া কিছু কিছু পাইতেছিলাম। শেষ পর্যন্ত তিনিই সাহিত্যিক ইঞ্জিনীয়ার কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে জুটাইয়া আনিলেন। সে কাহিনী পরে বলিব।

গুরুতর সঙ্কটের মধ্যেও মন যে অনেকখানি হালকা হইয়াছিল, তাহার

প্রমাণ চুক্তিবদ্ধ ঋণভার মাথায় লইয়াই ১৬ই নভেম্বর তারিখে পাটনা প্রভাতী-সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য রওয়ানা হইলাম। প্রকৃতপক্ষে ইহাই সাহিত্য-সভায় আমার প্রথম পৌরোহিত্য-ক্রিয়া। পূর্বে 'বঙ্গশ্রী'তে থাকাকালীন তিনবার ক্রীড়াচ্ছলে সাহিত্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল ; প্রথম, স্টার-রঙ্গমঞ্চে 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-শিল্পীদের পুরস্কার-বিতরণী সভায় ; দ্বিতীয়, ডায়মণ্ডহারবার-সন্নিহিত সরিষা গ্রামের এক উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের হল-ঘরে অনুষ্ঠিত সভায়। ভট্টাচার্য মহাশয় বাল্যে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তাঁহারই আদেশে আমাকে যাইতে হইয়াছিল। সঙ্গে ছিলেন উৎসবে ব্যসনে তো বটেই, বহুবিধ সঙ্কটে আমার একমাত্র সঙ্গী বন্ধুবর সুবলচন্দ্র। ইহার পর সহস্রাধিক সভায় সভাপতি বা প্রধান অতিথিরূপে যোগ দিয়াছি, কিন্তু সরিষার এই প্রথম সভার উৎকট-অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। স্মরণ আছে আমার কুমারী-ভাষিকায় (মেডেন স্পীচ) একটি বাক্যই বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে সমস্ত মঞ্চটা পরিক্রমণ করিয়া ফিরিয়াছিলাম। সুবলচন্দ্রের আশ্বাস-দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ না থাকিলে সেই দিন বোধ হয় মূর্ছিত হইয়া পড়িতাম। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল, থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলাম। সভাশেষে যে দক্ষিণী ব্যবহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে আজও হৃৎকম্প হয়।

আমার তৃতীয় কীর্তি কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে—স্বামী বিবেকানন্দের একটি স্মৃতিসভায়। মৌখিক ভাষণ দিতে আর সাহস হয় নাই, গদ্য ভূমিকা-সহ একটি কবিতা লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাও কম্পিত কলেবরে।

পাটনার সভা (১৭ নভেম্বর) আমার জীবনে প্রথম উল্লেখযোগ্য সভা, সুতরাং প্রস্তুত হইয়া ভাষণ ছাপাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম। যোগাযোগ ঘটাইয়াছিলেন রঙীনদা—রঙীন হালদার মহাশয়। সাহিত্য ব্যাপারে সেই আমার প্রথম মুক্তপক্ষবিহার। তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্য-জীবনে' এই সভার কথা বিশদভাবে লিখিয়াছেন। আমিও তাঁহার সাহায্যই এখানে গ্রহণ করিতেছি—

"'প্রভাতী-সংঘে'র প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান। আমি আছি এখানে। আর ওরা নিমন্ত্রণ করেছে শ্রীসজনীকান্ত দাসকে, বনফুলকে এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রঙীনদা উৎসাহিত করেছেন। শচীমামা [পাটনার ব্যারিস্টার শচীন্দ্রনাথ বসু] বলেছেন, খুব ভাল, আন, আন। জমিয়ে তোল আসর।...

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত সভাপতি হিসেবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। আমি ওখানে ছিলাম। আর নিমন্ত্রিত হলেন ভাগলপুরের বনফুল, মুঙ্গেরের শ্রীযুক্ত শরদিন্দুবাবু। বাঙালী-সমাজে বেশ সাড়া প'ড়ে গেল।

সজনীকান্ত বনফুল এসে উঠলেন মণি সমাদ্দারের ওখানে। স্বর্গত যোগীন্দ্র সমাদ্দার মশায়ের প্রশস্ত লাইব্রেরি-ঘরে তাঁদের ঠাঁই হয়েছিল। মনে পড়ছে, বনফুল সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই একখানি উপন্যাস—তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড' লিখে শেষ করেছিলেন। সকালবেলায় গেলাম, বনফুল পড়া শুরু করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস, তার উপর সুস্থ সবলদেহ বলাইচাঁদ। সতেজ কণ্ঠে আবেগের সঙ্গে প'ড়ে গেলেন।

বই শেষ হতে বাজল দুটো।

বাড়ি এসে খাওয়া-দাওয়া করছি, এমন সময় খবর এল, যে বেহার ন্যাশনাল কলেজ-হলে সম্মেলন হওয়ার কথা, সেখানকার কর্তৃপক্ষ খবর পাঠিয়েছেন—তারাশঙ্করবাবু রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁকে কলেজ-হলে বক্তৃতা করতে দিলে কলেজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, সুতরাং তাঁকে বাদ দেওয়া হোক অথবা আই. বি. পুলিসের কাছে যথারীতি অনুমতি নেওয়া হোক।

সজনীকান্ত, বনফুল, শরদিন্দু বললেন, তারাশঙ্করকে যোগ দিতে না দিলে আমরা যোগ দিতে পারি না।

মণি সমাদ্দারের দলটি ব্যাকুল হয়ে উঠল—কি হবে?

রণীনদা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, এ হতে পারে না। প্রিন্সিপ্যালের কাছে কেউ গিয়ে নানা ভুয়ো সংবাদ দিয়ে ভুল বুঝিয়ে এই কাণ্ড করেছে। এবং কে করেছে সে আমি জানি।

টেবিলটার ওপর তিনি প্রচণ্ড একটা মুষ্ট্যাঘাত করলেন।

বেশ গরম হয়ে উঠল বাঙালী-সমাজ। বিপদে পড়ল তরুণ ছেলে কয়টি। আমি নিজে হলাম বিব্রত। আমার বড়মামার রাগ সবচেয়ে বেশি। ওই শচীমামাই তখন হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, আরে, এ নিয়ে এত রাগারাগি কর কেন? হৈ-চৈ কেন? চল, আমরা কজন যাই প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কাছে। দেখি কি বলেন তিনি!

আসল প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয় ললিতবাবু তখন অসুখে শয্যাশায়ী। তাঁর জায়গায় কাজ চালাচ্ছেন ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল জনাব মৈনুদ্দিন সাহেব। ললিত বাবু, যতদূর মনে পড়ে, শচীমামাদেরও শিক্ষক ছিলেন। শচীমামা ও আর দু-তিন জন গেলেন এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব গণ্ডগোল মিটিয়ে ফিরে

এলেন। সেই স্বকীয় ভঙ্গিতে থেমে থেমে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বললেন, নাও, এইবার কি বলে—আসর পাত। শুরু ক'রে দাও গাওনা।

গাওনাই বটে। সে এক জমজমাট আসর। আজ যত দূর মনে হচ্ছে তাতে হলখানা ছিল মস্ত বড় এবং ঘরখানার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত লোকে ঠাসা। লোকগুলি প্রবাসী-সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ছাত্র-সমাজের ভাল ছেলের দল। সত্যিকারের তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে। আজকের দিনে বলাটা বাহুল্য হবে না যে, লোকের কাছে সেদিন সবচেয়ে বড় ঔৎসুক্য ছিল সজনীকান্ত সম্পর্কেই। 'শনিবারের চিঠি'র তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনায় তখন আধুনিক সাহিত্য-ক্ষেত্র প্রায় ছিন্নভিন্ন, তিনি তখন সদ্যযুদ্ধজয়ী বীরের মতই গৌরবান্বিত। তখন 'কল্লোলে' শুরু আধুনিক সাহিত্যের অভিযান প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'ধূপছায়া' উঠে গেছে; এমন কি শনিবারে বের-হওয়া চিঠির প্রসার রুখতে রবিবারে যে লাঠি বেরিয়েছিল সে লাঠিতে ঘুণ ধ'রে ভেঙে গেছে। ওই সময়ের লেখকদের মধ্যে শৈলজানন্দ এবং প্রবোধ সান্যাল ছাড়া সকলেই যেন সাময়িকভাবে কলম থামিয়েছেন। সজনীকান্ত তখন সম্মুখবাহিনী ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়ে পিছনের রথীদের আক্রমণোদ্যোগের আভাস দিয়েছেন।

সত্যি কথা বলতে কি, লোকে দুঃখও অনুভব করে, আবার 'শনিবারের চিঠি'র মারের চাতুর্য দেখে তারিফ ক'রে না হেসেও থাকতে পারে না। সেই সজনীকান্ত কি বলবেন! এক দল তাঁকে বলে—কালাপাহাড়, সব ভেঙেচুরে দিলে, বিগ্রহগুলোর নাক কেটে বিকৃত ক'রে ফেললে। বলে অবশ্য গোপনে। তবে মারের তারিফ করে—হ্যাঁ, মার বটে।

আর একদল বলেন—হ্যাঁ, বলশালী সংস্কারক বটে।

যাই হোক, সে দিন সজনীকান্তের বক্তব্য শুনতে লোক ভিড় ক'রে এসেছিল। প্রবীণ মথুরবাবু থেকে মণি-দলের পরের দল পর্যন্ত।

সজনীকান্ত আধুনিক সাহিত্যকে গাল দিয়ে শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও সুকঠোর মন্তব্য ক'রে বসলেন। তাঁর সেই সময়ের লেখা 'পথের দাবি' 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতি ওই ধরনের লেখাগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন—পল্লী-সমাজের দাদাঠাকুর মুদির দোকানে বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে পল্লীজীবনের গল্পে আসর মাত করিয়াছেন, কিন্তু যেই তিনি থেলো হুঁকা ছাড়িয়া ও মুদির দোকান ফেলিয়া বালিগঞ্জের ড্রয়িংরুমে সোফাসেটিতে হেলান দিয়া পাইপ টানিতে টানিতে গল্প বলিতে গিয়াছেন অমনি হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, গল্প গল্প না হইয়াই মাঠে মারা গিয়াছে।

কথাগুলি ঠিক এই কথাই নয়, আমার স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে দিলাম। স্মৃতির উপর বিশ্বাস আছে।

সজনীকান্তের এই উক্তির সঙ্গে সে কি হাততালি! ঘরখানা যেন ফেটে পড়েছিল। আশ্চর্যের কথা, কেউ তাঁকে এ নিয়ে প্রশ্ন করে নি। উল্লসিতই দেখেছিলাম সকলকে…।

আমি কিন্তু একটু আঘাত পেয়েছিলাম সজনীকান্তের এই উক্তিতে। বিষণ্ণ হয়েছিলাম।"

পাটনা হইতে অনেকখানি সাহস ও গর্ব লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। কলিকাতায় আসিয়াই দেখিলাম, 'বাতায়ন' সাপ্তাহিকে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল আমার বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছেন, শরৎচন্দ্রকেও তিনি কম তাতাইয়া তোলেন নাই। ইহার ফলেই সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের চিত্র-প্রদর্শনীতে শ্রীঅতুল বসু-অঙ্কিত আমার তেলরঙা পোরট্রেটখানি দেখিয়া শরৎচন্দ্র শ্রীঅতুল বসুকেই বলিয়াছিলেন, "দেখেছ, লোকটার চোখে পাগলের দৃষ্টি, একেবারে পাগল! হবে না, ওর মা যে পাগল ছিলেন।"

এই পাটনা-সফরে শুধু যে আত্মবিশ্বাসই অর্জন করিয়া ফিরিলাম তাহা নয়, পরিমলদা এবং পত্রিকা-সংক্রান্ত চিঠিপত্রের মারফতে বনফুলের সহিত পূর্বলব্ধ পরিচয় যতটুকু ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল, দুই দিনের সহবাসে তাহা ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বে পরিণত হইল। সেই পরিচয়ই ক্রমশ পারিবারিক আত্মীয়তার সহযোগে দুই সাহিত্যিক বন্ধুকে একাত্ম করিয়া তুলিয়াছে—১৯৩৫-এর পাটনা-সফর যে সার্থক হইয়াছে ১৯৫৫-এ তাহা বলিতে পারিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিতও এইখানেই সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটিল। মধ্যে 'বঙ্গশ্রী'র আমলে তিনি একবার আমাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজের শ্যালককে জাল "চন্দ্রহাস" সাজাইয়া 'বঙ্গশ্রী'র আপিসে পাঠাইয়া পরিহাসবিজল্পিত একটা নাটকের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু আমার সাহিত্য-সংক্রান্ত কঠিন জেরায় ধরা পড়িবার পূর্ব-মুহূর্তেই নকল শরদিন্দু এবং আসল শালা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া শরদিন্দুর সহিত আলাপ অচিরাৎ জমিয়া উঠিল। পাটনার সভায় পঠিত তাঁহার বিখ্যাত গল্প "তিমিঙ্গিলে"র পাণ্ডুলিপির সঙ্গে বিদগ্ধজনসুলভ তাঁহার মার্জিত সরস বন্ধুত্বও অর্জন করিয়া আসিলাম।

১৯৩৫ সন সত্য সত্যই আমার সর্বপ্রকারে আত্মস্থ হইবার বৎসর। প্রথম মাসেই চাকরির ময়ূরপুচ্ছ ছাড়িয়া "ভারত-ভবনে" কিছুকাল ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত

কাকরূপেই কা-কা করিয়াছিলাম, বৎসরের শেষের দিকে শেষ পর্যন্ত মূষিকের মতই আপন গর্তে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল ; নলিনীরঞ্জনের অযাচিত ঋণ-দাক্ষিণ্যে সে গর্ত ক্রমশ প্রশস্ততর অর্থাৎ হাত-পা ছড়াইয়া বাসের উপযুক্ত হইতেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বৈষয়িক প্রত্যাবর্তন পারিবারিক এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যাবর্তনের তুলনায় কিছুই নয়। সে প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছিল ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রিতে ঘণ্টাবংশীধ্বনিযোগে বৎসরের শেষ-দিনের সমাপ্তি ঘোষিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে। চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে আমরা কয়েকজন নানা বিচিত্র টুপি মাথায় নৈশাহার সমাপ্ত করিয়া নিকটবর্তী একটি সিনেমায় দক্ষিণ-সমুদ্র-দ্বীপপুঞ্জের একটি কাহিনী-আশ্রিত 'টাবু' ছবিটি দেখিতেছিলাম। হঠাৎ মনে ও দেহে একটা বিচিত্র বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মত বৃদ্ধ গ্রামপ্রধানের মুখের অবিচলিত দৃষ্টি আমাকে যেন বিদ্ধ করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, নিয়তির অমোঘ দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। আর ছবি দেখিতে পারিলাম না। সঙ্গীদিগকে বিচলিত বিস্মিত করিয়া চিত্রগৃহ হইতে একাকী নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটা ট্যাক্সিযোগে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম। যদিও যথেষ্ট ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বিপর্যস্ত ছিলাম, তথাপি ঘুম আসিল না। ভীত উৎকণ্ঠিত গৃহিণীকে আশ্বস্ত হইয়া ঘুমাইতে বলিলাম। বলিলাম, কবিতাদেবী স্কন্ধে ভর করিয়াছেন ; তিনি ঘাড় হইতে না নামিলে ঘুম আসিবে না। লিখিতে বসিলাম। লেখা যখন শেষ হইল, আশেপাশের মিলগুলি প্রলম্বিত বংশীধ্বনির দ্বারা পুরাতন বৎসরের সমাপ্তি এবং নববর্ষের শুভাগমন ঘোষণা করিল। 'রাজহংসে'র সর্বশেষ কবিতা "আকাশ-সাগর" রচনার ইহাই ইতিহাস। যাহা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না—যাহা নিষিদ্ধ এবং অব্যক্ত, তাহার পূর্ণ ইঙ্গিত এই কবিতাতেই সহৃদয় পাঠক খুঁজিয়া পাইবেন। এক সম্পূর্ণ নূতন বিচিত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারা এই কবিতা ওতপ্রোত হইয়া আছে। আমার কাব্য-জীবন-প্রবাহের উত্তুঙ্গতম তরঙ্গের ইহা একটি—

অবশেষে দেবী, তোমারই চরণতলে
শ্রদ্ধা-প্রেমের অর্ঘ্য আনিনু বহি ;
বিপথে ঘুরিয়া তোমাতে আমার সমাপ্ত পথচলা।
জননী-জঠরে আমার অতীত, নমো নমো নমঃ—নমি আমি জননীরে,
নমো নমো নমঃ, তোমার গর্ভে আমার ভবিষ্যৎ।
দাঁড়ায়েছি করজোড়ে,

বুঝিতেছি, কেন শিবশঙ্কর বক্ষ পাতিয়া বন্দিল শিবানীরে।
নীলকণ্ঠের বিষপান করি তুমি দেবী, তুমি কালী সে ভয়ঙ্করী,
নমামি দিগম্বরী,
মহাসাগরের আবরণ শুধু অসীম আকাশ আছে।

ভুল করে দেবী, সাগর-স্বপ্ন দেখিয়াছি গোষ্পদে,
সাগর দেখেছি কূপ বাপী সরোবরে ;
নির্ঝরিণীর কুলুকুলু জলে কখনো দেখেছি ফেলিয়াছে ক্ষীণ ছায়া
অতি লঘু মেঘ—মেঘ সে চপল অতি।
আমার আকাশ ঢাকিয়া গিয়াছে অকারণ কালো মেঘে,
আকাশে সাগরে ঘটিয়াছে ব্যবধান।

ব্যবধান আজ ঘুচিয়াছে, দেবী, আমি আসিয়াছি সম্ভ্রমে ভয়ে ভয়ে,
দাঁড়ায়েছি করজোড়ে—
ভবিষ্যতের তমসাতীর্থে ভ্রান্ত পথিকে দেবী,
তুমি লয়ে চল অসহায় হাত ধরি ;
অনাগত সেই তিমিরে মিশাও অতীত অন্ধকার।
বর্তমানের বিজলি-ঝলক মাঝে
ত্রাসে কেঁপে উঠি তুমি আর আমি কত বার বার দেবী,
ভুল করিয়াছি জড়াতে পরস্পরে ;
বহু ভ্রান্তিতে উঠিয়াছে হলাহল—
সেই হলাহল একেলা করেছি পান।
আজ বেলাশেষে বিষজর্জর আসিয়াছি আমি তব মন্দিরদ্বারে,
বর্তমানের ঘৃতদীপালোকে, হে দেবী, আমার হাতখানি তুমি ধর।

ভবিষ্যতের দীপ জ্বালি দিয়া তুমি আর আমি নিঃশেষে যাব মরি,
পুড়ে ছাই হবে হতাশ বর্তমান ;
অতীতে হইবে লীন।
সেই অতীতের আঁধারগর্ভ হতে
অন্ধনয়ন মেলিয়া দেখিব ভবিষ্যতের তমসাসিন্ধুকূলে
সারি সারি সারি জ্বলিছে বাসনাদীপ,
চলে আমাদের পূজারতি যেন মহাকাল-মন্দিরে।

হে দেবী, যে পথে নামিয়া এসেছি হিমালয়-চূড়া হতে
উপলমুখর নির্ঝর-কূলে-কূলে,
সেই পথ কবে হারায়ে গিয়াছে অরণ্যপ্রান্তরে।
তোমাতে আমাতে অপরিচয়ের দেখা হ'ল বার বার,
বার বার ছাড়াছাড়ি।
বেলাশেষে আজ ছোট গ্রামখানি, তোমারে পড়িল মনে।
অস্তরবির রঙ ধরিয়াছে দূর বনানীর শিরে,
একা তালগাছ দাঁড়াইয়া আছে সীমাহীন প্রান্তরে।
ঘট কাঁখে তুমি চলিয়াছ একা সরোবরে বাঁধাঘাটে,
সীমন্তে সিন্দুর—
চিতার আগুন সন্ধ্যা-অন্ধকারে।
রৌদ্র-পীড়িত দিবস আমার, তপ্তপথের ধূলিধূসরিত জ্বালা
সরোবর-নীরে যেন সুশীতল হ'ল ;
তোমারে প্রণাম করি
দেবতারে মোর বন্দনা করিলাম।

সন্ধ্যা নামিল, স্নান শেষ কর দেবী,
তুলসীমঞ্চে জ্বালিতে হইবে দীপ—
আমি রব' পিছে পিছে,
করজোড়ে শুধু রহিব দাঁড়ায়ে উঠানের এক ধারে।

প্রণাম সারিয়া উঠিবে যখন তুমি,
দেখিতে পাইবে আমার আকাশে সারি সারি দীপ জ্বালা,
তোমার সাগরে যুগ যুগ ধরি কাঁপিবে তাহারি ছায়া।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

'রাজহংস'

"ভারত-ভবনে"র দাসাশ্রম অচিরাৎ কপিলাশ্রমে পরিণত হইল। দুই দাস বিচ্ছিন্ন হইয়া স্ব-স্ব ভাগ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতেই আপিস-ঘরে তালা পড়িল। তালা খুলিলেন সদ্য-ফ্রান্স-প্রত্যাগত ইঞ্জিনীয়ার শ্রীকপিলপ্রসাদ

ভট্টাচার্য। দাসেরা ছিল আদার ব্যাপারী, ইনি হইয়া আসিলেন জাহাজের কারবারী। ক্ষীণ যোগসূত্র ছিল সাহিত্যের। ছোটগল্প লেখায় কপিলপ্রসাদ তৎপূর্বেই নাম করিয়াছেন। মৎসম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী'তেও তাঁহার ফ্রান্সভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হইয়াছে। ভাগলপুরের সহিত দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকাতে ইনি "বনফুলে"র বিশেষ পরিচিত ছিলেন, শ্রীপরিমল গোস্বামীর সহিত সেখানেই তাঁহার আলাপ; পরিমলদাই আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। কপিলপ্রসাদ "ভারত-ভবনে"র মাসিক ঘর-ভাড়া ও টেলিফোনের বিলের দায়মুক্ত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক পরিমল গোস্বামী হইলেন জাহাজের কারবারের বৈকালিক পরিচালক, কপিলপ্রসাদের "পার্টটাইম" কর্মসচিব।

সাহিত্যের প্রতি প্রীতি অত্যল্পকাল মধ্যে কপিলপ্রসাদের জাহাজডুবি ঘটাইয়া সাহিত্যের ঘাটে তাঁহাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। "বনফুলে"র সদ্য-রচিত বিচিত্র উপন্যাস 'তৃণখণ্ড' এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রে লিখিত 'বনফুলের কবিতা' প্রকাশে উদ্যোগী হইয়া তিনি রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের সহিত যুক্ত হইলেন; তাঁহার স্ব-রচিত গল্পগুলির সংগ্রহ 'ঘসেটিমলের তাঁবেদারী ও অন্যান্য গল্পে'র পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত হইল। ১৯৩৬ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই (পৌষ ১৩৪২) 'তৃণখণ্ড' রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে বাহির হইল; ইহাই "বনফুলে"র প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। 'বনফুলের কবিতা' ও 'ঘসেটিমলের তাঁবেদারী'ও ছাপা হইতে লাগিল। কপিলপ্রসাদের উৎসাহে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস আর একটি গুরুতর সাহিত্যকর্মে প্রবৃত্ত হইল—সচিত্র সাপ্তাহিক 'নূতন পত্রিকা'র প্রকাশ। এই পত্রিকাটি যদিও মাত্র পাঁচ সপ্তাহ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালীন বিদগ্ধজনের মনে ইহা যে পরিমাণ আশা ও আগ্রহের সঞ্চার করিয়াছিল তেমনটি আর কোনও সাপ্তাহিক পত্রিকা করে নাই। করিবেই বা না কেন? মাত্র বাত্রিশ পৃষ্ঠার এই চটি সাপ্তাহিকটির পাঁচ সংখ্যায় প্রবন্ধ জোগান দিয়াছিলেন আচার্য যদুনাথ, পণ্ডিত সুনীতিকুমার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অমল হোম, অনাথনাথ বসু, গোপাল ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, নির্মলকুমার বসু, সুকুমার বসু প্রভৃতি; গল্প জোগাইয়াছিলেন বাংলা দেশের সেকালের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী-পঞ্চক—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বনফুল, মনোজ ও শরদিন্দু; রস-রচনার দ্বারা রসায়িত করিয়াছিলেন প্র. না. বি., পরিমল গোস্বামী প্রভৃতি; এবং আলোক-চিত্রের সাহায্যে বাংলার শ্রী ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন পরিমল গোস্বামী ও শম্ভু সাহা। স্বয়ং সম্পাদক শ্রীনীরদচন্দ্র

চৌধুরী স্বনামে ও বেনামে প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় টিপ্পনী এবং সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনার বান ডাকাইয়া সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা মেলা ভার। বস্তুত এই সাপ্তাহিকটি যদি দীর্ঘস্থায়ী হইত, তাহা হইলে নীরদচন্দ্র নিজেকে অজ্ঞাত ভারতীয় (Unknown Indian) আখ্যা দিয়া বিজাতীয় ভাষায় আত্মজীবনী লিখিবার ছলে স্বদেশদূষণ করিবার অবকাশই পাইতেন না। যে অসাধারণ কৃতিত্বের সূচনা নীরদচন্দ্র পাঁচ সপ্তাহে দেখাইয়াছিলেন, তাহা সম্যক স্ফূর্তি লাভ করিতে পারিলে বাংলার সাময়িকপত্র-জগৎ নূতনতর শ্রী লাভ করিত।

পরিকল্পনার কালেই আমার ভূমিকা ছিল পরিচালকের ও ব্যবস্থাপকের। প্রথম কাজ হইল সম্পাদক-নির্বাচন। বেগ পাইতে হইল না। নীরদচন্দ্র তখন 'প্রবাসী'-'মর্ডান রিভিউ'র সহ-সম্পাদকের কাজে ইস্তফা দিয়া বেকার বসিয়া ছিলেন। কষ্টেই ছিলেন, অপেক্ষাকৃত অল্পবেতনে, তাঁহার মূল্যবান সহায়তা সংগ্রহ করিতে পারিলাম।

১৯৩৫ সনের শেষের দিকে প্রস্তাব পেশ করামাত্রই নীরদচন্দ্র সানন্দে সম্মত হইয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। আমি পরিচালক, তিনি সম্পাদক; প্রুফ দেখার জন্য একজন ও হিসাবপত্র বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জন্য আর একজন কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন। নীরদচন্দ্র তখন ছেঁড়া চাটাইয়ের হ্রস্ব মানুষটি হইলে কি হইবে, তাঁহার ছিল বাদশাহী মেজাজ এবং নভোচুম্বী কল্পনা। সেই কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়া রঞ্জন পাবলিশিং হাউস চক্ষে সরিষা-ফুল দেখিল। ফ্রান্স-ফেরত-সিমেন্ট-কংক্রীট-পারদর্শী কপিলপ্রসাদের দরাজ দিলেও ফাটল ধরিল। চব্বিশে জানুয়ারী (১৯৩৬) শুক্রবার প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। উৎকৃষ্ট কাগজ, সর্বোত্তম ছবি এবং তদুপযুক্ত ছাপাই না হইলে সম্পাদকের মন উঠে না, কাজেই পরিমল গোস্বামী ও শম্ভু সাহার পূর্ণপৃষ্ঠা-ব্যাপী ছবির তলব হইল; দেশী ব্লকপ্রস্তুতকারী কারখানার উপর তাঁহার বিশ্বাস নাই, সুতরাং 'স্টেটসম্যান'-আপিসের ব্লক নির্মাণ কারখানার সাহায্য প্রয়োজন হইল। দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই ঋণজাল দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল, পঞ্চম সপ্তাহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলপ্রসাদ হাওয়া হইয়া গেলেন, আমি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ভাগলপুর-কাটিহার করিতে লাগিলাম। পাঁচ সপ্তাহের শিশু 'নূতন পত্রিকা' ধূমকেতুর চমক লাগাইয়া মরিয়া গেল।

অকালে মরিয়া গেলেও এই পত্রিকাটি একটা আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে, পরবর্তীয়েরা তাহা গ্রহণ করিলে উপকৃত হইবেন। প্রথম সংখ্যার প্রথম নিবন্ধে ("নূতন পত্রিকা") সম্পাদক মহাশয় সবিনয়েই বলিয়াছিলেন—

"নিজেদের দুর্বলতা, কামনা বা খেয়ালকে ভবিষ্যতের কাঁধে চাপাইয়া আমাদের পত্রিকাকে অনাগত যুগের অগ্রদুত বলিয়া ঘোষণা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 'নূতন পত্রিকা'র বিষয়বস্তু ও অবলম্বন বর্তমান। এই বর্তমানকে যথাসাধ্য বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিলেই আমাদের কর্তব্য সমাপন হইল মনে করিব।"

'নূতন পত্রিকা'য় নূতন ও পুরাতনের একটা সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা হইয়াছিল। এ দেশে সাময়িক পত্রের পুরাতন পদ্ধতি ছিল, পত্রিকার পক্ষে একদল লেখক ক্রমাগত কথা বলিয়া যাইতেন এবং স্কুল-কলেজের ক্লাসের প্রাণহীন ছাত্রের মত অপর পক্ষকে তাহা শুনিয়া যাইতে হইত। 'নূতন পত্রিকা' বলিলেন—

"আমাদের দেশে সাময়িক পত্রে অনেক সময়ে জীবন্ত ভাবের যে অভাব দেখা যায়, তাহার কারণ লেখক ও পাঠকদের মধ্যে যোগের অভাব। যে দেশের পাঠকবর্গ যত প্রাণবান, সে দেশের সাহিত্য দর্শন রাজনৈতিক চিন্তাও ততই সতেজ। দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের মধ্যে সমতা না থাকিলে ভিক্ষাবৃত্তি চলে, সৃষ্টি চলে না। সেজন্য আমরা আমাদের পাঠকদিগকে নিজেদের বক্তব্য বলিতে ও আমাদের বক্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জানাইতে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি।"

ইহাই হইল নূতনের প্রবর্তন। মহত্তর আদর্শের বেলায় 'নূতন পত্রিকা' পুরাতনকে প্রাধান্য দিতে গিয়া বলিলেন—

"বর্তমান যুগে পাশ্চাত্ত্য দেশে অনেকে সাময়িক পত্রকে লোকশিক্ষা বা স্বাধীন চিন্তার বাহন বলিয়া আর মানিতে চান না। তাঁহারা উহার নিকট হইতে প্রত্যাশা করেন শুধু মনোরঞ্জন বা আমোদ। এই ঢেউ আমাদের দেশেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সংবাদপত্রের কর্তব্য অতি মহান এইরূপ একটা চিরপ্রচলিত ধারণা থাকাতে এখনও পুরাতন সংস্কারকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে আমাদের সাময়িক পত্রের পরিচালনায় একটা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কথায় ও কাজে একটা বিরোধ দেখা দিয়াছে। সেজন্য দেখি, অনেকে সাময়িক পত্রের উচ্চ কর্তব্য আছে স্বীকার করিলেও কার্যক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা ও আর্থিক সাফল্যকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু সাময়িক পত্রের কর্তব্য ও জনপ্রিয়তার মধ্যে একটা মূলগত বিরোধ আছে, এ কথা মানি না। সাধারণ মানুষ শুধু ক্ষণস্থায়ী আমোদ চায়, আর কিছু চায় না—ইহাকেই চরম সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে গণতান্ত্রিক সমাজে আস্থা রাখা সম্ভব নয়। যে

দিন সাময়িকপত্রসেবী গণমনোরঞ্জনকেই তাঁহার একমাত্র বৃত্তি বলিয়া মানিয়া লইবেন, সে দিন হইতে আর কোন চিন্তাশীল আদর্শবাদীর সংবাদপত্র-জগতে স্থান হইবে না।"

বাংলা সাময়িকপত্র-জগতের সেই ঘোর সঙ্কটকাল আজ উপস্থিত হইতে দেখিয়া 'নূতন পত্রিকা'র "নিবেদন" এমনভাবে স্মরণ করিতেছি। যে দুই-চারিখানি সাময়িক পত্র আজ সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহাদের চিন্তালেশহীন গণমনোরঞ্জন-প্রয়াসই প্রতিদিন উৎকটরূপে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। ভাষার শৈথিল্যে ধর্ম-সমাজনীতি-দর্শনও রম্যায়িত হইয়া "মছল মছল যাই"তেছে, সেক্সের সুড়সুড়ি সর্বাঙ্গে মাখিয়া কথা-সাহিত্য মদনানন্দমোদকে পরিণত হইতেছে এবং কবিতার নামে যাহা পরিবেশিত হইতেছে তাহা উচ্চকোটির পাগল বা মাতালের প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

"উচ্চকোটি" বলিতে ভাষাতত্ত্ব-ধুরন্ধর সুনীতিকুমারকে মনে পড়িল। 'নূতন পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (৩১ জানুয়ারী, ১৯৩৬) "আজি হতে কুড়ি বর্ষ আগে" তিনি "রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তখন ভারতের স্বাধীনতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত ছিল। খিলাফত-খেয়ালী মহাত্মা গান্ধীর "হিন্দুস্থানী"র অঙ্কুরোদ্গম মাত্র হইয়াছে। সুনীতিকুমার সেদিন যাহা বলিয়াছিলেন, কালের গতিকে আজ তাহাই অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সঙ্কটের আভাস পাইয়া তিনি সেদিন সমাধানের যে সহজ রাস্তা নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা অনুসৃত হইলে অহিন্দীভাষাভাষীদের আজ রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের ধমক খাইতে হইত না।

৮ই ফাল্গুন (১৩৪২) পঞ্চমবারের জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়া 'নূতন পত্রিকা' পঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিলেন। কপিলপ্রসাদের সঙ্কলিত 'বনফুলের কবিতা' ফাল্গুনের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইল। কিন্তু সঙ্কলক স্বয়ং তখন অন্তর্ধান করিয়াছেন। আমি ঋণজালে খুবই জড়াইয়া পড়িয়াছি। সদ্য-ক্রীত মুদ্রাযন্ত্রে 'নূতন পত্রিকা' ও তিনখানি পুস্তকের দৌলতে বেশ কাজ হইতেছিল, আবার তাহা বেকার হইয়া পড়িল। রাজহংস-সিরিজের প্রায় সবগুলি কবিতাই তখন লেখা হইয়া গিয়াছে। আমার অবসাদগ্রস্ত মন এবং হঠাৎ-স্তব্ধ মুদ্রাযন্ত্রকে চাঙ্গা করিবার জন্য শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন 'রাজহংস' নাম দিয়া কবিতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপিতে। কাগজের টাকাও তো যোগাড় করিতে হইবে, সুতরাং খুব উৎসাহিত হইলাম না। শেষ পর্যন্ত দোনামোনা করিয়া ধারে রীম কয়েক কাগজ কিনিয়া ফেলিলাম। কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া লইতে বিলম্ব হইল না। 'রাজহংস' ছাপা আরম্ভ হইল ফাল্গুনেই, চৈত্রের

মাঝামাঝি ছাপা শেষ হইয়া গেল। 'রাজহংস' পুস্তকের আকাশে উড়িবার অধিকার লাভ করিল।

বিপন্ন সজনীকান্তকে ঘিরিয়া তখন শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা অনেক। 'বঙ্গশ্রী'তে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের তালিকা কবি প্রমথনাথ বিশী তাঁহার স্বাভাবিক সরসভঙ্গিতে "পুরাতন পঞ্জিকা" ও "পুরাতন পঞ্জিকা : এক শত বৎসর পরে" শীর্ষক দুইটি কবিতায় ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে ইঁহাদের পরিচয়-দান-প্রসঙ্গে প্রমথনাথের অপূর্ব বর্ণনার সাহায্য আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আপাতত এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 'বঙ্গশ্রী'র আশ্রয়চ্যুত হইলেও ইঁহাদের অধিকাংশেরই সৌহার্দ্যে বঞ্চিত হই নাই। সুনীতিকুমার, ব্রজেন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, নীরদ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, নৃপেন্দ্র, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ, পরিমল, প্রমথনাথ তো ছিলেনই—পলাতক সুবলচন্দ্র আবার ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ব্রহ্মশেলাহত হইয়া অর্থাৎ বার্মাশেলের চাকরি ছাড়িয়া। আরও দুইজন নূতন কবিবন্ধু জুটিয়াছিলেন—একজন বয়সে প্রবীণ, শ্রীশান্তি পাল; অন্যজন অতি তরুণ, শ্রীমান জগদীশ ভট্টাচার্য। 'বঙ্গশ্রী'র আমলেই ইঁহাদের সহিত পরিচয়ের সুত্রপাত হয়। 'রাজহংস' প্রকাশ সম্বন্ধে এই দুই জনের আগ্রহ ছিল সর্বাধিক।

'রাজহংসে'র কবিতাগুলি প্রায় আড়াই বৎসর ধরিয়া বিচ্ছিন্ন কালে ও স্থানে রচিত হইলেও ভাবে সুরে ও ছন্দে ইহা একটি অখণ্ড কাব্যগ্রন্থ হইতে পারিয়াছে। সর্বশেষ কবিতা "আকাশ-সাগর" সবশেষে রচিত হয়, সে কাহিনী গতবারে বলিয়াছি। গ্রন্থমধ্যেই ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পর গোড়ায় মায়ের নামে উৎসর্গ-কবিতাটি রচিত ও সংযোজিত হয়। মাতৃবন্দনায় গ্রন্থের আরম্ভ, সহধর্মিণীবন্দনায় শেষ। মাঝখানে চারিটি বিভাগ—হিমালয়, নির্ঝরিণী, অরণ্য-প্রান্তর ও আকাশ-সাগর। শেষ বিভাগে একটিমাত্র কবিতা। হিমালয় হইতে উদ্ভূত নির্ঝরিণী অরণ্য-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সাগরে বিলীন হইতেছে—সমস্ত কাব্যের ইহাই সুর। "নির্ঝরিণী" অংশের "তমসা-জাহ্নবী" কবিতা সাময়িকপত্রে সবশেষে প্রকাশিত হয়—১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে।

চপল "নির্ঝরিণী"র অংশভুক্ত হইলেও "তমসা-জাহ্নবী"তে নৈরাশ্য ও অবসাদের সুর স্পষ্ট। বর্তমানে কবির আস্থা নাই, ভবিষ্যতের ভরসায় সে বসিয়া আছে—

> বহুরূপী আলোকের ক্লান্ত আমি রূপ দেখে দেখে,
> নিরাশ্বাস অন্ধকারে দু দণ্ড বসিব নিরুৎসাহে—
> তুমি ব'স কাছে মোর হাতে তব হাতখানি রেখে।

মনে কর সূর্য নাই, নাই শশী, নাই তারাদল ;
পথ ভুলি এ আঁধারে পশে না পথিক ধূমকেতু ;
খসে না জ্বলন্ত উল্কা ; প্রান্তরের আলেয়ার মত
খেলে না বিদ্যুৎ-বিভা আকাশের প্রাঙ্গণ চিরিয়া।
আলোরশ্মিস্পর্শহীন অনন্ত আদিম অন্ধকারে
ব'সে আছি দুই জনে, এইটুকু শুধু জানিয়াছি—
আলোকের সম্ভাবনা ঝলসে যোজন কোটি দূরে।
সেথা হতে নিরন্তর রশ্মিমুখে আসিছে ছুটিয়া,
অন্ধ মূক অন্ধকারে আসিছে সরল রেখা টানি,
পঁহুছিবে হেথা আসি হয়তো বা কোটি জন্মান্তরে,
পরশ করিবে স্নেহে আমাদের প্রস্তর-পঞ্জর ;
ভবিষ্য আলোর দূত গাহিবে মোদের জয়গান,
তমসা-তীর্থের কবি খ্যাত হবে আলোকের যুগে।

গ্রন্থপ্রকাশকালেও এই অবসাদ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই, তাই দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে স্বরচিত কাব্যগ্রন্থ এবং সর্বপ্রথম জীবনদর্শনসম্বলিত গ্রন্থ বাহির করিয়াও তেমন উৎসাহিত হইয়া উঠি নাই, যদিও অন্তরের গহন গভীরে তখনও বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে

তমসা-তীর্থের কবি খ্যাত হবে আলোকের যুগে।

'রাজহংস' প্রকাশিত হওয়ার পর কবিবন্ধু প্রমথনাথ বিশীর উল্লাসের কথা স্মরণ আছে। বন্ধুজনকে স্বহস্তে লিখিয়া বই উপহার দিতেছি, আমার আনন্দের ভাগ সেইটুকু। হঠাৎ প্রমথনাথ প্রস্তাব করিলেন, রবীন্দ্রনাথকে একখানা 'রাজহংস' পাঠাইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার মনোভাব তখন

হিমালয়-শিরে তুষার গলিয়া গেছে,
সবুজ মাটির পেতেছি আভাস যেন

হইলেও বহু দিনের ব্যবধানহেতু যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিল। প্রমথনাথ সে সঙ্কোচ জোর করিয়া ভাঙিয়া দিলেন। বই একখানা পাঠাইতে হইল। প্রমথনাথ কবির অভিমত চাহিয়া পত্রাঘাত নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন, পুস্তকপ্রেরণের সপ্তাহকাল মধ্যে তিনি তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত পত্রটি আমার নাকের উপর ধরিয়া প্রনাবিক হাসি হাসিলেন। বৈরাগ্যের পঙ্কমন্তরে উত্তীর্ণ হইলেও কম্পিত চিত্তে পড়িলাম—

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু,

অভিমত দিতে আমি একান্ত নারাজ—ভালোই বলি আর মন্দই বলি এতে দেশের দুর্মুখকে জাগিয়ে তোলা হয়। বড়ো অশান্তি, আমার বয়সে এই দুর্বিপাক থেকে নিষ্কৃতি দাবী করতে পারি। তোকে গোপনে বলি, রাজহংস বইখানি ভালো হয়েছে। আমার মতে কবিতার দুই জাত আছে ভালো এবং মন্দ। মাঝখানে যে সঙ্কর বর্ণের আবির্ভাব দেখা যায় তাদের জাতি নির্ণয় করতে বৃথা পরিশ্রম না করাই শ্রেয়। এই ইসারাটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হলুম, এ নিয়ে হট্টগোল করিস নে।

ছন্দ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে গদ্য এবং পদ্য—কাব্যের এই দুই ছন্দ আছে। রাজহংসের ছন্দ স্পষ্টতই পদ্য ছন্দ; তাকে তোর চিঠিতে গদ্য ছন্দ কেন আখ্যা দিয়েছিলি বুঝতে পারলুম না। আমি আজকাল অনেক সময়ে গদ্য ছন্দে কবিতা লিখি—আর কোনো ছন্দে ঠিক এই সকল ভাব বলা আমার পক্ষে সাধ্য নয় বলেই আমার এই অধ্যবসায়। কাজটা কিছুমাত্র সহজ নয় একথা জানিয়ে রাখলুম। সহজ মনে করে যদি প্রবৃত্ত হোস তবে হঠাৎ ঘাটের থেকে পড়বি পাঁকের মধ্যে। ইতি ২৯ এপ্রেল ১৯৩৬

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রমথনাথের কৃপায় সেই দিনই মূল চিঠিখানি হস্তগত হইল বটে, কিন্তু কবিবন্ধুর মর্যাদা রক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র "হট্টগোল" করিলাম না, গোপন কথা গোপনেই রাখিলাম। দেশের দুর্মুখকে জাগাইয়া তোলা হইল না দেখিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও হয়তো খুশি হইলেন। আজ পর্যন্ত কথাটা চাপিয়াই রাখিয়াছিলাম; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্তত আর একজনের কাছেও যে 'রাজহংসে'র প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার খবর পাওয়া গেল; তিনি তাহা গোপন রাখেন নাই, ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আজ বন্ধু প্রমথনাথের মর্যাদাহানির প্রশ্ন নাই।

রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মুন্সী শ্রীসুধীরচন্দ্র কর সেই অপরাধ করিয়াছেন। তিনি "রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-জীবন" ('যুগান্তর' শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৫)

শীর্ষক নিবন্ধে সেই দিনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যেদিন ডাকযোগে 'রাজহংস' রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হয়। তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিতেছি—

"স্মৃতিসূত্রে টান প'ড়ে এই প্রসঙ্গে মনে আসছে আর এক দিনের কথা। ১৩৪৩ সনের বৈশাখ। চলছে কবির 'পত্রপুট' কাব্যের পালা। তার তের নম্বরের কবিতাটি সেই দিনই কি তার আগের দু-একদিনের মধ্যেই লেখা হয়েছে। কপি ক'রে এনে দেওয়া গেল কবির হাতে। কবি তখন "কোনর্ক"-বাসী। "কোনর্ক" গৃহের বারান্দার সামনে যে শিমুল গাছটি আছে, তার তলায় বসেছেন কবি সকাল বেলার কাজে। লেখার টেবিল পাতা রয়েছে সামনে। সদ্য রচিত উপরোক্ত কবিতার কথাই চলছিল। খ্যাতনামা সাহিত্যিকের কাব্যোপহার ['রাজহংস'] এসে পৌঁছেছে হাতে, সেই ডাকেই। প্যাকেট থেকে বই খুলে উল্টেপাল্টে দেখলেন। হঠাৎ বললেন, 'আমি পারি নি, কিন্তু এ পেরেছে, যা বলতে চেয়েছি—এর মধ্যে দেখছি কত সবল সুন্দর তার প্রকাশ।' বিশ্বকে সর্ব অনুভবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে লেখা কবির 'পত্রপুটে'র সেই তের নম্বরের কবিতাটি। সে বেদনা তাঁকে এমন পেয়ে বসেছে, দিনরাত ঐ ভাবছেন আর লিখছেন, কাটছেন, যোগ করছেন; কবিতা লিখেও মনের ভার কমে নি, একটার পর আর একটা লিখছেন। বারো নম্বরের কবিতাটিতে তার আগে মর্মান্তিক বেদনা জানিয়েছেন। বিশ্ব-জীবনের বিশেষ বিশেষ বাস্তব অভিজ্ঞতার অক্ষমতা নিয়ে। তাতে শেষটায় লিখেছেন—

'মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
  যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্রমানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
  ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চ'লে।

… … …

বূ্যহ ভেদ ক'রে
স্থান নিইনি যুধ্যমান দেবলোকের সংগ্রাম-সহকারিতায়।
কেবল স্বপ্নে শুনেছি ডমরুর গুরু গুরু,
কেবল সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন
  মিলেছে হৃৎস্পন্দনে বাহিরের পথ থেকে।

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়,
শুধু রেখে গেলেম নত মস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে,
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।'

এতেও হয় নি, আরো সুনির্দিষ্ট যথাযথ সতেজরূপ দেওয়ার কথাই মনে ঘুরছে, বয়োকনিষ্ঠ কবির মধ্যে স্বীয় অনুভবের সার্থকতর সাড়া পেয়ে নিজের শিল্পক্ষুণ্ন রচনার বেদনাকে ছাপিয়ে উঠেছিল সেই অপরের প্রশস্তিবাদ অকুণ্ঠ উৎসাহে।"

একটি বিষয়ে আজ আমার কোনই সংশয় নাই যে, রবীন্দ্রনাথ সেই দিন 'রাজহংসে'র "কালকূট" কবিতাটিতে নিজ বক্তব্যের স্ফুটতর প্রকাশ দেখিয়া-ছিলেন, যেখানে আমি বলিয়াছিলাম—

সে মৃত্যু আমার মৃত্যু নয়—
দিগন্ত ছাইয়া উড়ে আমার শিবের জটাজাল,
আকাশ আঁধার করে অঙ্গের বিভূতি।
ভূমিকম্প নহে তাহা, নহে গিরি-বিদারণ-রূপ—
সে তো পলকের লীলা, নটেশের এক পদপাত,
দিকে দিকে থৈ-থৈ মৃত্যুর তাণ্ডব।
তারই মাঝে জীবন-অঙ্কুর
শাখা-পত্র-পুষ্প মেলে আলোকের পানে,
প্রলয়ে করে না ভয়, দাঁড়ায়ে মৃত্যুর মুখামুখি
আপনি বাড়িয়া চলে আপন গৌরবে।

আমার মৃত্যুর মাঝে দধীচির নিজ অস্থিদান,
রাজা শিবি দেহ-মাংস অকাতরে করে নিবেদন
কপোত-শরণাগত লাগি।
ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ মোর সে-মৃত্যু মহান—
অগ্নিদগ্ধ বীরাঙ্গনা-রূপ।
মৃত্যুতীর্থ-স্নানে ধায় বীরদল উত্তর মেরুতে—

হিংস্র শ্বাপদের মুখে অরণ্যে গহন,
সুনিশ্চিত সলিল-সমাধি।
জীবের কল্যাণ লাগি মোর মৃত্যু করে আবিষ্কার
নব জীবরসায়ন।
অপরূপ যন্ত্র-উদ্ভাবনা মৃত্যুকর স্পর্শি হাসিমুখে—
হাসিমুখে ঝাঁপ দেয় ঘোরতর সমর-অনলে
আর্ত পীড়িতের সেবা-কাজে।
বন্দীর বন্ধন
মুক্তিকামী মৃত্যু মোর আপনার গলে লয় তুলি—
সে মৃত্যুরে করি নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথের সেই প্রশংসা-দিয়া-কাড়িয়া-লওয়ার ব্যবস্থায় মনে কিঞ্চিৎ বেদনামিশ্রিত গ্লানি অনুভব করিয়াছিলাম, ফলে 'রাজহংসে'র কোনও প্রশংসা-পত্রই বাজারে দাখিল করি নাই। প্রমথ চৌধুরী ঘটিত মামলায় বিপক্ষদলের অন্যতম প্রধান শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় "তেজীয়ান দম্ভ" ও "মর্দানা আওয়াজের" জন্য 'রাজহংসে'র কবির প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—পয়ারের পরে যেমন মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষরের পরে যেমন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র অসম ছন্দ, 'রাজহংসে'র ছয় মাত্রার অমিল ছন্দ তেমনি 'বলাকা'-ছন্দেরও এক ধাপ উপরে। কিন্তু এই সকল প্রশংসার কোনটিই রবীন্দ্রনাথের সেই "তোকে গোপনে বলি, রাজহংস বইখানি ভালো হয়েছে"র বর্ম ভেদ করিয়া আমার মর্মে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমার এই সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানটিকে আমি প্রচারের দিক দিয়া বরাবরই অবহেলা করিয়া আসিয়াছি।

পিতার অবহেলা সম্পূর্ণ নিরাকৃত করিয়াছিলেন পিতৃব্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র; যোগ্যতর কণ্ঠে প্রচারের ভার লইয়া তিনিই 'রাজহংস'কে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। বহু সভা সমিতি জলসা আসর বৈঠকে 'রাজহংসে'র কবিতা আবৃত্তি করিয়া তিনি শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন, ফলে ইহার চাহিদা বাড়িয়াছে। শুধু সভা-সমিতিই নয়, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা-কেন্দ্র হইতে তিনি বহুবার আমার কবিতার আকাশ-বিস্তার ঘটাইয়াছেন, গ্রামোফোন-রেকর্ডে তাঁহার "কে জাগে"র অপরূপ আবৃত্তিকে দীর্ঘস্থায়িত্ব দান করিয়াছেন; এক কথায় আমি যেমন 'রাজহংসে'র জনক, তিনি তেমনই ইহার পালক।

'রাজহংস' প্রকাশের মাসাধিক কালের মধ্যেই গভীর আত্মদর্শন-সমন্বিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আলো-আঁধারি' বাহির করিলাম। 'রাজহংস' উৎসর্গ করিয়াছিলাম মৃতা মাতাকে, 'আলো-আঁধারি' উৎসর্গ করিলাম জীবিত পিতাকে। মোহিতলাল 'আলো-আঁধারি'কেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন।

এতদিন ব্যঙ্গ হাস্য ও হালকা কবিতার কবি ছিলাম, এই দুইখানি কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক কবির স্তরে উত্তীর্ণ হইলাম; কিন্তু সাধারণের দরবারে তাহাতে যে লাভ বিশেষ হইল তাহা মনে হয় না; 'শনিবারের চিঠি'র "সংবাদ-সাহিত্যে"র লেখক সজনীকান্তকে কবি সজনীকান্ত অতিক্রম করিতে পারিল না। আমার সাহিত্য-জীবনের ইহাই সর্বাধিক ট্র্যাজেডি।

ট্র্যাজেডি হইলেও ইহাতেই আমার মুক্তি হইয়াছে—পূর্বতন সজনীকান্তের ভক্তেরা বলেন, মৃত্যু। কিন্তু আমি জানি, 'রাজহংসে'ই আমি নিজেকে ফিরিয়া পাইয়াছি। বিকৃত এবং লঘু—বহু বিচিত্র পথে পরিক্রমণ করিয়া শেষ পর্যন্ত যে আত্মস্থ হইতে পারিয়াছি, তজ্জন্য আমার সরস্বতীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নাই। "সরস্বতী" কবিতায় এই সত্যটাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। জীবন-সাধনার দিক দিয়া "আকাশ-সাগর" 'রাজহংসে'র শেষ কবিতা বটে, কিন্তু কাব্যসাধনার দিক দিয়া 'সরস্বতী"ই "রাজহংসে'র শেষ কবিতা। কেন শেষ, তাহার জবাব কবিতার মধ্যেই আছে—

খুঁজিয়া পেনু হারানো আপনারে

কবে কখন করেছিলাম চলা আমার শুরু
ভিন্ গাঁয়েতে পেরিয়ে নদীবন—
বাঁধানো কভু, কখনো মেঠো পথ,
কখনো চর, কখনো ডাঙা, কখনো জলাভূমি।
মায়ের কোলে রূপকথাতে শোনা—
তেপান্তর মাঠের মাঝে দেউল একখানি—
দেউল, তবু কমলবন-মাঝে
হংসারূঢ়া আমার সরস্বতী
বাজান একা হাতের বীণাটিরে।

মায়ের কোল কখন কবে ছেড়ে
নেমেছিলাম কালো কঠিন ভুঁয়ে;

॥ আত্মস্মৃতি ॥

উষর ডাঙা, অলস বালুনদী,
একটি দুটি কাঁটাখেজুর, দীর্ঘদেহ তাল,
গহন বন, ক্ষুরের ধারা নদী,
কাঁকর দিয়ে সাজানো রাজপথ ;
বাউরীপাড়া—মুর্গি-পাতিহাঁস,
কুমোরবাড়ি—আঙ্গিনাতে মাচায় ঝোলে লাউ,
চপল লোকালয় ;
সুমুখে আর পিছনে দেখি পথিক চলে নানা।

পথের জনতায়
হারিয়ে ফেলে কখনো আপনারে
আপন মনে চলিয়া এনু সারাটা পথ ধরি—
কলহ-কোলাহলে,
কখনো মনে জমেছে বিষ, কখনো ধূলিজালে
হয়েছে কালো আমার দশ দিশি।
বিপথপথে অনেক ঘুরে ঘুরে—
অনেক বাট, অনেক ঘাট দিয়ে
পেরিয়ে কত শহর লোকালয়
হাজার লাখ তেপান্তর মাঠ—
কোথাও নাই রূপকথাতে শোনা
হংসারূঢ়া আমার সরস্বতী।

খুঁজিতে তাঁরে দিগ্বিদিকে চলিছে ছুটাছুটি,
বাণীপূজার ছলে
পৃথিবী জুড়ে গাঁয়ের হাটে হাটে
বেচাকেনার বসেছে জোর মেলা।
সাজিয়ে তুলে নকল সরস্বতী
কমলা-কৃপা মাগিতে সবে ফিকির খোঁজে নানা।

ক্লান্তদেহে ফিরিনু আমি দীর্ঘপথ ধরি,
শান্তমনে বসিনু এসে ঘরের বাতায়নে,
ঘুমায়ে পড়িলাম।

জাগিয়া আজ খুঁজিয়া পেনু হারানো আপনারে ;
আমারি মন জুড়ে
বসিয়া আছে আমার সরস্বতী।

তৃতীয় তরঙ্গ

অথ পরিচয়-কথা (১)

এখন পর্যন্ত আমার পঁয়ত্রিশ বৎসরের সাহিত্য-জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহা করিতে গিয়া স্বরচিত কবিতা-উদ্ধৃতির আধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি জানাইয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই এই কাহিনীর ভূমিকায় আমি লিখিয়াছিলাম,

> সৌভাগ্যক্রমে কাব্যসরস্বতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন। ছন্দের বন্ধনে অগোচর ও অধরা ক্ষণে ক্ষণে বাঁধা পড়িয়াছেন —মহাজীবন-জলতরঙ্গে আমার নগণ্য জীবনও ঢেউয়ের শীর্ষে উঠিয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে। সেই তরঙ্গমালার কথা সকলকে শুনাইবার উপকরণ আমার রচনায় আছে।

বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ দিন-লিপি লেখার অভ্যাস থাকিলেও আমি প্রধানত সেই কাব্য-উপকরণকেই উপজীব্য করিয়াছি।

আগামী ৯ই ভাদ্র, ১৩৬২ জীবনের পঞ্চান্ন বৎসর অতিক্রম করিব। ছত্রিশ হইতে পঞ্চান্ন এই শেষের কুড়ি বৎসরের কাহিনী রচনা দুরূহতম কর্ম। সৌভাগ্যক্রমে এই কালের পথ চলার সঙ্গীরা প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষভাবে বিরাজ করিতেছেন। পরোক্ষে নৈবেদ্য-নিবেদন নিরাপদ; সাক্ষাতে তাহা করিতে গেলেই পদে পদে বিপদ। কাজেই অতঃপর যতদূর সম্ভব সাবধান ও সতর্ক হইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

'রাজহংস'-প্রকাশ প্রসঙ্গে দুই নূতন কবি-বন্ধুর উল্লেখ করিয়াছি—শ্রীশান্তি পাল ও শ্রীমান জগদীশ ভট্টাচার্য। তাঁহাদের দিয়াই "পরিচয়-কথা" শুরু করিতেছি। বর্তমানে আমার অন্তরঙ্গদের মধ্যে ইঁহারা দুইজন। পরিচয়ের সূত্রপাতে শান্তি পাল ছিলেন দস্যু রত্নাকর, এখন নিঃসংশয়ে কবি বাল্মীকি; তবে মূল বাল্মীকির রামনাম-সাধনার জোর ছিল, বল্মীক-আবরণ তিনি ভেদ করিয়াছিলেন। এ যুগের বাল্মীকি ব্যাধি ও বার্ধক্যের বল্মীকে ক্রমেই

জড়ীভূত হইতেছেন। আর সেদিনের "কলেজ-বয়" জগদীশ ছিলেন তরুণ প্রেমিক—একাধারে গম্ভীর ও চটুল ছন্দের কবি। আজ তিনি প্রবীণ অধ্যাপক ও সাহিত্য-সমালোচক, এক কথায় সাহিত্যের মুরুব্বী হইয়া বসিয়াছেন। বেপথুমান হস্তে শান্তি পাল আজিও স্রষ্টা, জগদীশ দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অপরের সৃষ্টিলীলা পর্যবেক্ষণেই সন্তুষ্ট।

শান্তি পালের সহিত পরিচয়-প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনোজ বসুর কথা বলা প্রয়োজন। পরে বয়সের হিসাব খতাইতে গিয়া যদিও ধরা পড়িয়াছে, মনোজ আমার চাইতে মাত্র এক বছরের ছোট। কিন্তু কেন জানি না গোড়ায় তাঁহাকে ছোট্ট-খাট্ট শ্রীমান মনোজরূপেই অর্থাৎ রীতিমত পিঠ-চাপড়ানোর ভঙ্গিতেই গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। দিনটা স্পষ্ট মনে আছে—১৩৩৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের ৭ তারিখ, ২১ মার্চ ১৯৩১, শনিবার। বর্তমান 'প্রবাসী'-আপিসের প্রেস-ম্যানেজারের ক্ষুদ্র ঘরখানি লোকে লোকারণ্য, ধোঁয়ায় অন্ধকার। শনিবারের বারবেলার আড্ডা জমিয়া উঠিয়াছে; সুনীতিকুমার, কালিদাস, বিভূতিভূষণ (বন্দ্যো), বিরিঞ্চিবিলাস, পবিত্র এই অধমের টেবিলের চারিপাশে স্ব স্ব রুচি ও স্বাচ্ছন্দ্য মত বসিয়া মুড়ি-সহযোগে তেলেভাজা খাইতেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ ও নীরদচন্দ্র উপরের সম্পদকীয় কাজ সারিয়া প্রবেশ-পথে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই দুই চারিটি সরস বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতেছেন। এমন সময় তাঁহাদের উভয়ের পাশ কাটাইয়া তৈল-চিক্কণ একটি তরুণের আবির্ভাব ঘটিল। কথায়-বার্তায় তো বটেই, গায়েও তখন তাঁহার যশুরে গন্ধ ছিল, অথচ বেশ সপ্রতিভ ভাব। আমাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম কথা বলিলেন, একটা গল্প আনিয়াছি, শুনাইতে চাই। অনুভবে বুঝিলাম, উপস্থিত সকলেই কৌতুক বোধ করিলেন; ব্রজেন্দ্রনাথ ও নীরদচন্দ্র বিপদ গণিয়া নিঃশব্দে কাটিয়া পড়িলেন। বিভূতি ও আমি একটু তটস্থ হইয়া বসিলাম। সোৎসাহে বলিলাম, নিশ্চয়ই শুনিব, তবে আপাতত কিঞ্চিৎ মুড়ি ও তেলেভাজা ভক্ষণ করিয়া এই আড্ডায় দীক্ষা গ্রহণ করুন। দ্বিতীয় বার বলিতে হইল না। মনোজ অচিরাৎ লাগিয়া গেলেন। পরশুরাম চা দিয়া গেল। জলযোগ-পর্ব সমাপনান্তে সবাই উন্মুখ হইয়া গল্প শুনিতে বসিলাম। গল্পটি নামে "বাঘ" হইলেও আসলে যশোহরের অজ পল্লীগ্রামে একটি চোঙ-ওয়ালা গ্রামোফোনের প্রথম আবির্ভাব কাহিনী; সরস হাস্য-সহযোগে খুব মুন্সিয়ানার সঙ্গে লেখা। পাঠ সাঙ্গ হইলে আমি লেখককে সস্নেহ আলিঙ্গন করিলাম, বিভূতিভূষণ তৈলসিক্ত হস্তেই তাঁহার করমর্দন করিলেন, যশোহরের যশ-গৌরবে তাঁহার মুখখানা উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিল। এক নিমেষে মনোজ বসু আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত হইলেন। বলা বাহুল্য, পরবর্তী বৈশাখেই (১৩৩৮) গল্পটিও 'প্রবাসী'-ভুক্ত হইল।

'প্রবাসী'র সেই পরিচয় ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল, 'বঙ্গশ্রী'র আমলে মনোজ বসু অন্তরঙ্গদের একজন। তখন ইংরেজী ছায়া-ছবি দেখা আমার একটা বাতিকে দাঁড়াইয়াছিল। "বনফুলে"র সহিত পরিচয়-প্রসঙ্গে এই বাতিকের কথা বিস্তারিতভাবে বলিব। 'বঙ্গশ্রী'র আড্ডায় একদিন ছবি দেখার কথা হইতেছিল—ডায়েরির তারিখ হইতেছে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪, মঙ্গলবার। আড্ডাধারীরা অনেকেই ছিলেন, স-"কার" নিখিল দাসও। মনোজ বলিলেন, 'ছবিঘরে' আমাদের শান্তিদা থাকিতে পয়সা দিয়া ছবি দেখেন কেন? তাঁহার কাছে একবার হাজির হওয়া লইয়া কথা, তারপর যত ইচ্ছা ছবি দেখুন। আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, দূতীয়ালিটা না হয় তুমিই কর। অদম্য মনোজ 'বঙ্গশ্রী'র চিঠির প্যাড টানিয়া লইয়া খস্ খস্ করিয়া একটা পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিলেন। উহা লইয়া নিখিল দাসের গাড়ীতে চাপিয়া দুই দাসে তৎক্ষণাৎ শিয়ালদহ সন্নিহিত "ছবিঘরে" হাজির হইয়া দেশবিখ্যাত সাঁতারু শান্তি পালের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ঘোষ লেন অর্থাৎ শুঁড়িপাড়ায় অবস্থানকালে সিমুলিয়া পল্লীর দুর্দান্ত শান্তি পালের কীর্তিকাহিনী কিছু কিছু কানে আসিয়াছিল। গুণ্ডামি ইত্যাদিতে ওই পাড়ার জনৈক ঘোষ এবং জনৈক গোস্বামীর সমপর্যায়ের খ্যাতি ছিল তাঁহার। প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ শিষ্যদের লইয়া হেদুয়া অঞ্চল তিনি একাই সরগরম রাখিতেন। কিন্তু দস্যু রত্নাকরের পাষাণ-হৃদয়ের তলদেশে যে অন্তঃসলিলা গীতিকবিতার ফল্গুধারা কুলুকুলু রবে প্রবাহিত হইত, নারদের তাহা জানিবার কথা নয়। ইঁহারই একটি প্রেয়সীমার্কা প্রেমের কবিতা যে মৎসম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী'তেই ঠিক নয় মাস পূর্বে বাহির হইয়াছিল, সে খেয়ালও আমার ছিল না। সুতরাং সেই প্রথম আলাপেই মনোজের লিপি-দূত টেবিলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, আমি কবিতার করাল দংষ্ট্রায় বাঁধা পড়িলাম। সেই দিনই রাত্রি নয়টার "শো"য়ে দুই দাসগিন্নীসহ দুই দাসে "ছবিঘরে" ছবি দেখিয়াছিল সে-কথার উল্লেখ আর না করিলেও চলিবে।

শান্তি পাল বয়সে আমার বড় এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রে তাঁহার দেশজোড়া খ্যাতি সত্ত্বেও কবিকর্মে সবিনয়ে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে গোড়া হইতেই গুরুর মর্যাদা দিয়াছেন; সেই সম্পর্ক আজও অটুট আছে। আমার গৃহিণীকেও দিদিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি অবলীলাক্রমে আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়াছেন। সভাসমিতি এবং বায়ুপরিবর্তন ব্যপদেশে তিনি

সর্বত্রই আমার সহগামী হইয়াছেন, প্রায় প্রত্যহ সদ্য-রচিত কবিতা শুনাইয়া আমার চিত্তকে সরস রাখিয়াছেন। তাঁহার কবিতার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলার মাটির খাঁটি গন্ধ তাহাতে পাওয়া যায়। তিনি চিরকাল শহরে বাস করিয়াও প্রধানতঃ পল্লীপ্রকৃতির কবি; প্রেরণা, অভিজ্ঞতা ও শব্দসম্পদ সংগ্রহের জন্য তিনি প্রায়শঃই দুরূহ দুর্গম পল্লীপথে উধাও হইয়া যান। এখন কবিতাই তাঁহার ধ্যানজ্ঞান, কবিতাই তাঁহার প্রাণ। প্রাচীন বাংলার বীরত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসও তাঁহার অন্যতম সাধনা। এই অশিক্ষিতপটু কবিমানুষটি নিজের অদম্য চেষ্টায় কাব্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার চিত্তের মৌলিক কাব্যপ্রেরণা যে বল্গাহীন "দস্যিপনা"-তেও বিনষ্ট হয় নাই তাহার প্রধান কারণ হেদুয়া পুষ্করিণীর খেলা-ধুলা দৌড়-ঝাঁপের মধ্যেই কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহসংস্পর্শ। পরবর্তী কালে আমি কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম কবি শান্তি পাল স্বয়ং এইভাবে তাহার পরিচয় দিয়াছেন 'বসুমতী'তে প্রকাশিত আমার চতুঃপঞ্চাশৎ (১৯৫৪) জন্মদিনের প্রশস্তি-কবিতায়—

"বিশটি বছর কোথায় দিয়ে কেমন ক'রে কাটল ভাই,
আজকে তোমার জন্মদিনে সেই কথাটি ভাবছি তাই।
বিশটি বছর হয়তো মোরা বিশটা দিনও তফাত নেই,
একটি দিনের অদর্শনে হারিয়ে ফেলি মনের খেই।
কী সে যাদুমন্ত্রবলে রত্নাকরে মানিয়ে পোষ,
চোখের কালো পর্দা খুলে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দোষ—
তুললে টেনে পঙ্ক থেকে, ভালবাসায় করলে মাৎ,
সাহিত্যিকের হাতে তুমি মিলিয়ে দিলে আমার হাত।
বন্ধু, আমি ভুলি নি তা, শোধ করা কি যায় সে ঋণ,
তোমার তালিম না পেলে ভাই কে বাজাত কাব্য-বীণ্?
নিজের কথা কও নি কভু, পরের কথা শুনেই যাও,
আপনাকে তাই গোপন রেখে দু'হাত দিয়ে সব বিলাও।
কোথায় এমন দরদী হায়, বা'র থেকে কে জানবে তায়?
যে এসেছে তোমার কাছে সেই পড়েছে প্রেমের দায়।
পুরাতনে শ্রদ্ধা দিয়ে পথ-ভোলাদের ফিরিয়ে মোড়,
বাণীর কুঞ্জে পদ্ম ফুটাও, ছুটাও ঘেঁটুর স্বপ্নঘোর…"

কবি শান্তি পাল নিজগুণে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অত্যুক্তি থাকিলেও তাঁহার স্বীকৃতিতে সত্য আছে।

শ্রীমান জগদীশ শ্রীভূমির সন্তান। গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁহার জন্ম। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেও রাজনৈতিক অপরাধে সরকারী বৃত্তিবঞ্চিত জগদীশ কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ভরতি হন এবং পরে সিটি কলেজে বি-এ পড়িতে পড়িতে সহপাঠিনীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জীবনের একমাত্র প্রেমের উদ্ভব হয়। সহপাঠিনী সহধর্মিণী না হইয়া উঠা পর্যন্ত যে গুরুতর অনিশ্চিত ও সংশয়ান্বিত সঙ্কটকাল পল্লীগ্রামের একজন অনভিজ্ঞ গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারের সংস্কারবদ্ধ তরুণের জীবনে অনিবার্যভাবে আসিতে বাধ্য—সেই নিদারুণ অবস্থার মধ্যেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। ডায়েরিতে দেখিতেছি তারিখটা ১৮ই নবেম্বর ১৯৩৪—২রা অগ্রহায়ণ ১৩৪১, রবিবার। কয়দিন পূর্বেই ১৩৪১ কার্তিক 'শনিবারের চিঠি'তে "কলেজ বয়" বেনামীতে রচিত তাঁহার "কলেজ গার্ল" কবিতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। হাল্কা চটুল ছন্দে রচিত ওই কবিতাটিতেই বেশ একটু চমকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন "কলেজ বয়"।

"রোজ বিকেল বেলা এই জানলাখানির
ঠিক সায়ে দিয়ে,
ওই ঘড়ির কাঁটার সোয়া পাঁচটা হ'লে
এই রাস্তা বেয়ে ধীরে যায় সে চ'লে;
তুমি চিনবে ওকে
তার করুণ চোখে
খুব ক্লান্ত বিষণ্ণতা ফুটবে তাতে,
খান তিনেক পুথিও আর থাকবে হাতে।
যাবে আপন মনেই তার মেয়েলি বাঁটের
ছাতা বাঁ হাতে নিয়ে;
রোজ বিকেল বেলা এই জানলাখানির
ঠিক সায়ে দিয়ে।"

এই অকাট্য প্রশংসাপত্রের জোরে শ্রীমানকে কবি হিসাবে কোল দিতে দ্বিধা করিলাম না, প্রথম দর্শনেই একখানি 'অজয়' উপহার দিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলাম। তিনি তখনও প্রায় বালক বলিলেও চলে, একটা ঘোর নীল রঙের শার্ট পরিধানে থাকাতে তাঁহাকে ঠিক ব্রতী বালকের মত মনে হইতেছিল। সময় অপরাহ্ণ, স্থান 'বঙ্গশ্রী'-আপিস। রবিবার ছুটির দিন হইলেও আপিসেই ছিলাম। শ্রীবিজয়সিং নাহারের পিতা স্বর্গীয় পূরনচাঁদ

নাহার মহাশয় আসিয়াছিলেন, প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' এক খণ্ড সংগ্রহ করিতে। যাবতীয় সাময়িক-পত্রের মলাট সংগ্রহের বিচিত্র বাতিক ছিল তাঁহার। ধীরে ধীরে তাঁহার এই খেয়াল-খেলা এক বিপুল ঐতিহাসিক সংগ্রহে পরিণত হইয়াছিল। আমাদের 'শনিবারের চিঠি'ই যে কতবার মলাট বদলাইয়াছে সে জ্ঞান আমারই ছিল না। একদিন নাহার মহাশয়ের ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটস্থ ভবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাজ্জব বনিয়া গিয়াছিলাম। ডক্টর সুশীলকুমার দেরও অনুরূপ একটা বাতিক ছিল, দেশলাইয়ের বাক্সের মলাট সংগ্রহের। অনেক হাত সাফাইয়ের কসরৎ করিয়া তিনি নিঃশব্দে বন্ধুবান্ধবদের অজ্ঞাতসারে নূতন ছাপওয়ালা দেশলাইয়ের বাক্স দেখিলেই সংগ্রহ করিতেন। নাহার মহাশয়ের ও ডক্টর দের সংগ্রহ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত হইবার বৈচিত্র্য অর্জন করিয়াছিল।

যাহা হউক, নাহার মহাশয় মলাট সংগ্রহ করিয়া চলিয়া গেলেন, আসিয়া জুটিলেন বন্ধুবর দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিলেও কিশোর-কবিকে হঠাৎ বিদায় করিয়া দিতে পারিলাম না। দেবীদাস নৃপেন পাশের কামরায় বিশ্রম্ভালাপে রত হইল। আমি জগদীশের সহিত কাব্য ও জীবনদর্শন বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণেই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হইল। দেখিলাম এই যুবক দূরে থাকিয়া আমার কাব্য ও বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার সন্ধান রাখিয়াছে, আমার চলার পথের "পান্থ-পাদপ"দের সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের অন্ত নাই। কথায় কথায় অসতর্ক যুবক তাহার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল সমস্যাগুলিও আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলিল। প্রধান সমস্যা অনুলোম বিবাহের। প্রথম দিনের পরিচয়েই সঙ্কটত্রাণের ভূমিকায় আমাকে অবতীর্ণ হইতে হইল। কাজেই জগদীশের সহিত আমার সম্পর্ক কেবল সাহিত্যগত নয়, জীবনগত। নিরুদ্দেশ পথের সহযাত্রী হিসাবে আমাদের পরিচয় ও পরস্পর নির্ভরতা। বাস্তব জীবনের প্রচণ্ড চাপে তাঁহার কবি-জীবন খর্ব ও খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জীবন ব্যর্থ হয় নাই। নব নূতনের প্রাণে নব সৃষ্টির প্রেরণা জোগাইবার যে গুরু-ভূমিকায় জগদীশ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই তাঁহার সাধনাকে সার্থকতা দান করিতেছে।

তবু কবি জগদীশ ভট্টাচার্যের জন্য আমার দুঃখ হয়। "পান্থ-পাদপে"র কবিকে তিনি চিনিয়াছিলেন এবং "পান্থ-পাদপে"র জের টানিয়া "মরীচিকা" কবিতায় ('শনিবারের চিঠি', ফাল্গুন, ১৩৪১) তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন—

"আবার যাত্রা শুরু :
মরু-বালুকায় নাই সখী জল, নাই শ্যাম প্রান্তর,
নাই নীপছায়া, দক্ষিণ সমীরণ,
নাই তৃষ্ণার বারি।
আছে অসহ্য মৃগতৃষ্ণিকা-জ্বালা,
আর ওই দূরে—কত দূরে জানি নাকো—
আছে মরুপথ—দিগ্‌দেবতার বিষাণের আহ্বান,
চলার সঙ্গী আছে মরুভূমি আর আছে মহাকাল।
ঘরহারা আমি চলি আর চলি, এ চলা হবে না শেষ,
সব হারায়েছি, তবু তো আজও হই নি সর্বহারা,
তুমি যে রয়েছ সুদূরচারীর মানসলোকের মিতা,
তোমারি পরশে রাঙিয়া উঠিছে চক্রবালের রেখা
তোমারি ভাষাতে মুখর হয়েছে অমা-রজনীর বাণী,
আমি যে তোমার—তুমি যে আমার না-পাওয়া পথের বঁধু
তুমি আছ—তুমি আছ,
তুমি আছ তাই আমার পথের হবে না কখনো শেষ।
শুষ্ক ধূলায় বন্ধুর পথে তুমি জাগো চুপে চুপে,—
তোমার মায়ায় পান্থ-পাদপ জাগে—
জাগে ক্ষণিকের শ্যামল মরূদ্যান।"

কিন্তু 'ক্ষণ-শাশ্বতী'র কবির ভাগ্যে "ক্ষণিকের শ্যামল মরূদ্যান"ই শাশ্বত হইয়া রহিল।

'বঙ্গশ্রী'র আমলে ১৯৩৪ সনের গোড়ায় বাংলা দেশের দুই জন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীর সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে দুই অকৃত্রিম হিতৈষী সুহৃদের স্নেহাশ্রিত বন্ধুত্ব আমার চিরজীবনের সম্পদ হইয়াছে। শ্রীঅতুল বসু ও শ্রীযামিনী রায়ের কথা বলিতেছি। 'প্রবাসী'তে থাকিতে শিল্পী দেবীপ্রসাদ, প্রমোদকুমার ও চৈতন্যদেবের বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছিলাম। নন্দলাল বসুর সহিত পরিচয় ঘটে বারম্বার শান্তিনিকেতন যাতায়াতের ফলে, পরে গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কৃপায় ঘনিষ্ঠতা জন্মে। যামিনী রায়ের সহিত পূর্বেই পরিচয়মাত্র হইয়াছিল।

'প্রবাসী'তে শিল্পী মুকুল দে এবং 'বঙ্গশ্রী'র প্রথম বৎসরে দেবীপ্রসাদ ও চৈতন্যদেব সম্বন্ধে গুরু-গম্ভীর সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য,

শিল্পীরাই সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার চিত্রশিল্প বিষয়ক কেরামতি ওইটুকু। অবশ্য 'শনিবারের চিঠি'তে সুযোগ পাইলেই চিত্র ও চিত্রকরদের খোঁচা দিতে কখনও কসুর করি নাই। শিল্পে ন্যাকামি ও মেয়েলিপনার বিরোধী ছিলাম। সেকালের ফ্যাশান লতানে পেলব মেরুদণ্ডহীন চিত্রকলার বিরুদ্ধে আমার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বাণ অতুল বসুর হয়তো পছন্দমাফিক হইয়াছিল। তিনি হঠাৎ জানুয়ারি মাসের (১৯৩৪) ৪ঠা তারিখে টেলিফোন-যোগে আমাকে সাদর আহ্বান জানাইলেন তাঁহারই উদ্যোগে কলিকাতার যাদুঘরে অনুষ্ঠিত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর চিত্র-প্রদর্শনীতে। ইহাই অ্যাকাডেমির প্রথম বাৎসরিক প্রদর্শনী, ১৯৩৩ সনের ২৩ ডিসেম্বর আরম্ভ হইয়া ১৯৩৪-এর ৭ই জানুয়ারী শেষ হয়। ৬ জানুয়ারি শনিবার অপরাহ্নে সেখান উপস্থিত হইতেই সর্বাগ্রে অতুল বসু ও যামিনী রায়ের সঙ্গে আলাপ হইল। তিন জনেরই রাশিচক্রে নিশ্চয়ই অনুকূল গ্রহের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, মৌখিক পরিচয় আন্তরিক সৌহার্দ্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। আমি মাসাধিক কালের মধ্যেই অতুল বসুর শিল্প-প্রতিভা সম্পর্কে 'বঙ্গশ্রী'তে (ফাল্গুন, ১৩৪০) সচিত্র প্রবন্ধ লিখিলাম এবং তিনিও তেলরঙে আমার পোরট্রেট আঁকিয়া ফেলিলেন। যামিনী রায়ও অচিরাৎ 'যামিনীদা' হইয়া স্নেহালিঙ্গনে চিরতরে বদ্ধ করিলেন।

এই পরিচয়ের ফলে ভারতীয় কলাশিল্প বিষয়ে যে ভাবনা আমার চিত্তকে সেদিন অধিকার করিয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি এখানে দোষাবহ হইবে না।—

> বাংলা চিত্রশিল্পের রঙ্গমঞ্চে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইতেই নবীন প্রাণের শুরু, অঙ্কুরের উদ্গম।
>
> অবনীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছেন। তাঁহার অপরূপ কল্পনা এবং লেখনী ও তুলিকায় তাহাকে রূপ দিবার অসাধারণ ভঙ্গী যে কোন বড় কবির কাম্য হইতে পারে। এতখানি কবিত্বশক্তি ছিল বলিয়া তিনি খেয়ালী শিল্পী হইয়া রহিলেন। উপযুক্ত শিষ্য নন্দলাল বসু গুরুর পুঞ্জীভূত সৃষ্টি-খেয়ালের মধ্যে শিল্পসাধনার নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন; নূতন ভারতীয় শিল্পকলাপদ্ধতি প্রবর্তিত হইল।
>
> তারপর, অত্যল্পকাল মধ্যে বহু সাধক আসিয়া জুটিলেন; নূতনের আঘাতে জনসাধারণ সন্দেহাকুল, বিক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইবার পূর্বেই হ্যাভেল সাহেব, ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মিসেস অ্যানি বেসাণ্ট, কাজিন্‌স্ সাহেব এবং 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা এমনই জয়নিনাদ তুলিয়া দিলেন যে, প্রকাশ্য সভায় যাচাই হইবার পূর্বেই

ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ইহার মূলে স্বাদেশিকতার দুর্দমনীয় বেগও ছিল, নূতনের মোহও ছিল।

কিন্তু এই হঠাতের হুল্লোড়ে একটা গোল হইল এই যে, অবনীন্দ্র, নন্দলাল প্রমুখ শক্তসমর্থ তেজীয়ান সাধকের প্রাপ্য সম্মান ভিড়ের মধ্যে অক্ষম ক্লীব অনুকরণকারীদের মাথায়ও বর্ষিত হইতে লাগিল; মাথা-ভারী, দেহ-সরু নূতন শিল্পপদ্ধতি এতখানি পোষ্টাই সহ্য করিতে পারিল না। অবনীন্দ্রনাথ তখন শিল্প-গুরু, তিনি গুরুসুলভ স্নেহে আশীর্বাদ করিতে শুরু করিলেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে যে ক্লীবত্ব, পঙ্গুতা ও অক্ষমতা দেখা দিল, অবনীন্দ্র-নন্দলাল-পরবর্তী শিল্পকলা-পদ্ধতিতেও তাহা প্রকট হইয়া উঠিল। মনস্বী টলস্টয়ের কথায়—

Both were quite lacking in naivete, sincerity, and simplicity and both overflowed with artificiality, forced originality and self-assurance.

কিন্তু সে বিস্তৃত ও স্বতন্ত্র ইতিহাস, এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখমাত্র প্রয়োজন। এ কথা সানন্দে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বহু প্রতিভা-শালী শিল্পী এই পদ্ধতিতে শিল্প-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ও আজিও করিতেছেন এবং নিতান্ত দুঃখের বিষয়ও এই যে, অত্যল্পকাল মধ্যে বিকৃতিও দেখা দিয়াছে।

এই নূতন পদ্ধতির যখন সূত্রপাত হয় তখনই এক পক্ষের প্রতিবাদ ছিল। তাঁহারা ইতিপূর্বেই পৃথক হইয়া আর্ট স্কুলের সম্মুখের ময়দানে শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় বেশী ছিলেন না, মোট পাঁচ-ছয় জন এবং তাঁহাদের নেতা ছিলেন তদানীন্তন আর্ট স্কুলের বিদ্রোহী মাস্টার রণদা গুপ্ত মহাশয়।

যাঁহারা ভারতীয় চিত্রকলায় গুণগান করিতে বসিয়া পশ্চিমের যুগযুগব্যাপী সাধনাকে অবজ্ঞা করিতেন, রণদাবাবু তাঁহাদের প্রতিবাদ করিতেন। বলিতেন, শিল্পের পূর্বপশ্চিম নাই, শিল্পের বিচার প্রাণ লইয়া, পদ্ধতি লইয়া নয়। ইতালীয় পদ্ধতিতে অথবা জাপানী পদ্ধতিতে বাংলা দেশে বসিয়া যদি কেহ সত্যকার সজীব ছবি আঁকিতে পারে সে-ই চিত্র-শিল্পকে সম্মান করিল। রণদাবাবু প্রাণবান পুরুষ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির বিকারে যে ধরনের পুরুষ ও স্ত্রী মূর্তির প্রচার হইতেছে তাহাতে জাতির প্রাণশক্তির অভাব সূচিত হইতেছে এবং এই ধরনের ক্লীব ছবি দেখিতে দেখিতে জাতিও অধিকতর ক্লীবত্ব বরণ

করিবে। এই বিশ্বাস তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিত। শোনা যায়, একবার বালীগঞ্জের কোনও বাড়ির গৃহিণী তাঁহাকে ভারতীয় চিত্র-শোভিত তাঁহার ঘরগুলি দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া বিদায়কালে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কেমন দেখিলেন? রণদাবাবু বলিয়াছিলেন, চিত্রশিল্পের ইতিহাসে পড়িয়াছি, পূর্বে রোমের অধিবাসীরা দেখিতে কদাকার ও দুর্বল ছিল। দেখিয়া শুনিয়া তদানীন্তন চিন্তাশীল কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিল্পী চিত্রে আদর্শ পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সকল চিত্র অনুধ্যান করার ফলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দেশে স্ত্রী পুরুষের চেহারা ফিরিয়া যায়। এই গল্পটি বলিয়া পরিশেষে তিনি বলেন, তাই ভাবিতেছি, এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের চেহারা ভবিষ্যতে কেমন হইবে! মাস কয়েক পরে পুনরায় সেই বাড়িতে আমন্ত্রিত হইয়া রণদাবাবু দেখিতে পান, ভারতীয় চিত্রগুলি সমুদয় অন্তর্ধান করিয়াছে।

এই রণদা গুপ্তের স্কুলের নাম ছিল জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি। অতুল বসুর শিল্প-শিক্ষার গোড়াপত্তন এইখানে, পরে তিনি তিন বৎসর (১৯১৬-১৮) কলিকাতা গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৮ সনে শেষ পরীক্ষায় সকল বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্ব অর্জন করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করেন। যামিনী রায় তাঁহার উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতেন এবং ইউরোপীয় পদ্ধতির চিত্রক[illegible], বিশেষ করিয়া পোর্ট্রেট অঙ্কনে, পারঙ্গম ছিলেন। অতুল বসু আর্ট স্কুল [illegible] করিয়া শিল্পী হেমেন মজুমদারের বীডন স্ট্রীটস্থ গৃহে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্[illegible]ডেমি অব আর্ট প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি হন। যামিনী রায়ের সহিত এইখানেই তাঁহার পরিচয়। যামিনী রায় তখন হইতেই আর্টে বর্ণসঙ্করের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ভারতীয় নামে অভিহিত চিত্রশিল্পে দেশী বিদেশী নানা ঢঙ ও রঙের জগাখিচুড়ি দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন। এই বিক্ষোভই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে দেশীয় প্রতিমা ও পটশিল্পের আদর্শে নিজস্ব বিশেষ চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। আজ যামিনী রায় কোনও প্রচলিত বা গতানুগতিক পদ্ধতির সাধক নন, তিনি নিজেই একটি পদ্ধতি, নিজেই একটি স্কুল। তাঁহার মূল আদর্শ ভারতীয় পৌরাণিক, তবে পাশ্চাত্ত্য অঙ্কনপদ্ধতির সকল ধাপ অতিক্রম করিয়া, বিশ্বের শিল্প-গোলকধাঁধার সকল জটিলতা ভেদ করিয়া তিনি সহজ পথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহার 'বোধোদয়' 'কথামালা' প্রবীণ প্রাজ্ঞের পূর্ণ অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

৭ই জানুয়ারি প্রদর্শনী প্রকাশ্যতঃ বন্ধ হইয়া গেলেও আমি নূতন পরিচয়ের আকর্ষণে প্রত্যহ বৈকালে সেখানে যাইতে লাগিলাম এবং যামিনী রায় ও

অতুল বসুর নিকট শিল্পবিষয়ে নানা নূতন কথা শুনিয়া লাভবান হইলাম। প্রদর্শনী সম্পর্কে 'বঙ্গশ্রী'তে প্রবন্ধ লিখিবার জন্যও এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী বৈশাখে (১৩৪১) সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

২২ জানুয়ারি যামিনী রায়ের বাগবাজারের বাড়িতে রামঋষির কীর্তন শুনিতে আমন্ত্রিত হইয়া শিল্পীকে তাঁহার নিজস্ব পরিবেশে দেখিলাম। ধূপধুনাগুগ্‌গুলের গন্ধমন্থর বাতাস এবং চন্দ্রাতপবেষ্টিত প্রাঙ্গণের স্তিমিত আলোক, সর্বোপরি বেদনাবিধুর মাথুরকীর্তনের সুরের মাদকতা প্রাচীর-শোভিত যামিনী রায়ের নিজস্ব পদ্ধতির চিত্রকলাকে আমার চোখে অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দিল। সেই স্বপ্নালোকের মাঝখানে বসিয়া মনে হইল, শিল্পীর ভাষা যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি। তিনি যেন বলিতে চাহিতেছেন, আমার এই শিল্পের মধ্যে রাজসিক দম্ভ নাই, তামসিক জড়তা নাই, ইহার প্রথম ও প্রধান উপাদান সাত্ত্বিক প্রেম। শক্তিমদমত্ত অহঙ্কারী দাম্ভিক মানুষ, অত্যাচারী নির্মম কঠোর মানুষ, হিংসাদ্বেষদুষ্ট স্বার্থপর মানুষ —সকলেই এই প্রেমের মহাশ্মশানে আসিয়া এক হয়, এখানেই মানুষের চিরন্তন শাশ্বত শিল্পের জন্ম হয়, যে শিল্প দেশভেদে কালভেদে সর্বত্র ও সর্বকালে এক। নানা সংস্কারের জটিলতায় মানুষ এখানে পৌঁছিতে পারিতেছে না, অথচ সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের ভারে প্রপীড়িত মানুষ এই সহজের গঙ্গাজলে স্নান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

যামিনীদার সঙ্গে পরে শিল্প সম্বন্ধে বহুবার আলাপ হইয়াছে, তাঁহার অনেক কথাই শুনিয়াছি; কিন্তু সেই প্রথম দিন তাঁহার শিল্পসৃষ্টি দৃষ্টে যে অনুভূতি আমার মনে জাগিয়াছিল, তাহার প্রভাব এড়াইতে পারি নাই। সমগ্র বিশ্বের শিল্পধারায় বাঙালী প্রতিভার বিশিষ্ট দান সম্বন্ধে তিনি সচেতন। সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট মত পোষণ করেন। এ জাতি রাজা নয়, বীর নয়, দিগ্বিজয়ী নয়; তাই বৃহৎ বিরাট শিল্প এখানে গড়িয়া উঠে নাই, উঠিবেও না। আমরা দীনহীন, ভালবাসিয়া সকলকে স্বাগত জানাই। উলু শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া আমাদের প্রাঙ্গণে আলপনা আঁকিয়া সকলকে আহ্বান করি, আমাদের মেটেঘরের তোরণদ্বারে স্বস্তিকচিহ্নশোভিত মঙ্গলঘটেই আমাদের শিল্পপ্রতিভা স্ফূর্তি পায়। বাংলার নিজস্ব শিল্পের সেই সহজ রূপটি পুনরাবিষ্কারে শিল্পী যামিনী রায় ব্রতী হইয়াছেন। তিনি যে কিছু খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিলে এবং কথা শুনিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তবু তাঁহার অস্থিরতার এখনও অবসান হয় নাই। রাষ্ট্র সমাজ শিল্প ও সাহিত্যের সামঞ্জস্য যতদিন না ঘটিতেছে, শিল্প ও সাহিত্যকে নিজস্ব আশ্রয় ও

ভিত্তিভূমি রাষ্ট্র ও সমাজ-নিরপেক্ষ ভাবে যতদিন নিজেকেই রচনা করিয়া লইতে হইতেছে, ততদিন শিল্পীর ও সাহিত্যিকের অশান্তি অনিবার্যভাবে থাকিবেই। শিল্প ও সাহিত্য যদি সমাজের কল্যাণে না লাগিল, তাহা হইলে তাহাদের সার্থকতা কোথায়? শিল্পী যামিনী রায় মানুষের মহত্তর সত্তায় বিশ্বাসী, তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, সহজতর পথ আবিষ্কারে নিত্য-নূতন পরীক্ষা করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে নিজের সহিত কঠিন বোঝাপড়ার দ্বন্দ্বে পীড়িত হইতেছেন।

সাহিত্য ও শিল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। সাহিত্যে যেভাবে জটিলতার মধ্যে আমরা ঘুরপাক খাইতেছি, ফরম্ এবং টেকনিকের অরণ্যে দিশাহারা হইয়া নূতন হইবার প্রবল আগ্রহে যে ভাবে কিম্ভূতকিমাকার হইয়া পড়িতেছি তাহাতে মনে হয়, বাংলা-সাহিত্যেও একজন যামিনী রায়ের আবির্ভাব প্রয়োজন হইয়াছে। শিল্পেও জট পাকাইয়া গিয়াছিল, সে জট যামিনী রায় যখন ছাড়াইতে পারিয়াছেন, অনুরূপ নিষ্ঠা ও সাধনা লইয়া সাহিত্যের জটও নিশ্চয়ই কোনও সাহিত্যশিল্পী মোচন করিতে সক্ষম হইবেন। যামিনী রায়কে দেখিলেই তাই আমি আশান্বিত হইয়া উঠি। মহৎ হইবার জন্য বৃহৎ উপাদানের যে প্রয়োজন নাই, যামিনী রায় সেই মন্ত্র আমাদের শিখাইতেছেন।

'বঙ্গশ্রী'র আমলে আরও তিনজন মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, যাঁহাদের স্নেহ প্রীতি ও বন্ধুত্ব আমার ভাণ্ডারে জমা হইয়া আছে; সাহিত্য যদিচ এই তিনজনের কাহারও জীবনের প্রধান অবলম্বন নয়, তবু ইঁহারা সাহিত্যসেবক, সাহিত্যরসিক। এই তিনজন: অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য ও ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী। ইঁহাদের সহিত পরিচয়-কাহিনী পরে বলিতেছি।

চতুর্থ তরঙ্গ

পরিচয়-কথা (২)

শ্রদ্ধেয় অতুল বসু ও যামিনী রায়ের প্রসঙ্গ আমি ১৯৩৪ সনের দিনলিপি দেখিয়াই লিখিয়াছিলাম। ১৯৩১ সনের একটা ঘটনা আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল। শ্রীঅতুল বসুর স্মৃতিতে তাহা জাগ্রত ছিল, তিনি আমাকেও স্মরণ করাইয়া দিলেন। পূজাবকাশের পর ১৯৩১ সনের শেষাশেষি এক শীতের

সকাল। 'প্রবাসী'র চাকরি ছাড়িয়া তখন আমি সম্পূর্ণ বেকার। অধরোষ্ঠ ও দক্ষিণহস্তের প্রত্যহ দুই বেলা সংযোগবিধানের কঠিন প্রয়াসে আমি যতটা না ঘর্মাক্তকলেবর, ততোধিক বিভ্রান্তচিত্ত। কোনও ক্রমে 'শনিবারের চিঠি'তে মাসগত পাপক্ষয় করিতেছিলাম। বাংলা-সাহিত্যের মত বঙ্গীয় কলাশিল্পেও তখন "এলোমেলো ক'রে দে-মা লুটেপুটে খাই"দের অভিযান চলিতেছে। সাহিত্য যাঁহাদের ধ্যান জ্ঞান সাধনা ও উপজীবিকা তাঁহারা স্বভাবতঃই যেমন বিচলিত হইয়াছিলেন, শিল্প যাঁহাদের অন্তরের একান্ত সাধনা তাঁহারাও কম অতিষ্ঠ হন নাই। প্রমাণ মিলিল সেই দিন সকালে আমার রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের গৃহপ্রাঙ্গণে শিল্পী ত্রয়ীর আকস্মিক অভ্যাগমে—যামিনী রায়, অতুল বসু ও সতীশ সিংহ। সাহিত্যের একটা নীতিমূলক আদর্শকে আশ্রয় করিয়া আমরা সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছি বলিয়া অতুল বসু অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। প্রশ্ন করিলেন, ইহা আমাদের সাময়িক খেয়াল মাত্র, না, দূর-প্রসারী সংগ্রাম —আমার ডায়েরিতে "ওয়ার" কথাটা লেখা আছে। উত্তর দিয়াছিলাম, ইহা আমাদের জীবন-মরণ-সংগ্রাম। কারণ, উহারা বাঁচিলে আমরা বাঁচিব না। শিল্পকলা বিষয়েও আমাদের সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি ও রুচি মত এলোপাতাড়ি মার যে দিই নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে। "উহারা বাঁচিলে আমরা বাঁচিব না"—আমার এই স্পষ্ট ঘোষণা শিল্পীদের ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহারা আমাদের আহ্বান জানাইয়াছিলেন কলাশিল্প বিষয়েও ধারাবাহিক অভিযান চালাইবার জন্য। আমি অনধিকার চর্চার অজুহাত দেখাইয়াছিলাম। ভারতীর বীণার বিভিন্ন তন্ত্রীর সাধক হইলেও আমাদের মন যে একসুরে বাঁধা, ১৯৩১ সনের শেষেই তাহা পরস্পর জানাজানি হইয়াছিল। এই ভিত্তির উপরেই ১৯৩৪ সনের ঘনিষ্ঠতা।

শ্রীঅনাথনাথ বসু—আমাদের অনুদা'র সহিত সম্ভবতঃ বিশ্বভারতীর সূত্রপাতের যুগে আমার ঘন ঘন শান্তিনিকেতন-গতায়াতকালে আলাপ হইয়াছিল। তিনি তখন কটিবস্ত্র-সম্বল গান্ধীপন্থী দেশকর্মী; বোলপুরের কাছাকাছি কোনও আশ্রমে চরকা-খদ্দর প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন পরিচয় ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে উঠিবার অবকাশ পায় নাই। তাহার পর কবে তিনি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, কবে সাহেব সাজিয়া পাশ্চাত্ত্য দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, আমার জানা ছিল না। ১৯৩৩ সনের শেষাশেষি তিনি যখন শিকাগোর বিশ্ব-প্রদর্শনী দেখিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন আবার দেখা হইল। আমার সহকারী কিরণকুমার রায়ের তিনি ছিলেন অনুদা—'বঙ্গশ্রী'-আপিসে একদিন পদার্পণ করিয়া আমারও

অন্নদা হইলেন। ১৩৪০ সালের পৌষের 'বঙ্গশ্রী'তে তাঁহার দীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ "শিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনী" বাহির হইল। ১৫ই জানুয়ারি (১৯৩৪) অপরাহ্ণে বিহার-ভূমিকম্প। ২০এ জানুয়ারি সকালে বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ও সমালোচক গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ও শিক্ষাবিদ অনাথনাথ বসুর অনুগামী হইয়া আমি ও কিরণ কুষ্টিয়া যাত্রা করিলাম। সেই দিনই বৈকালে কুষ্টিয়া উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে সরস্বতীপূজা উপলক্ষ্যে সভা—গিরিজা-শঙ্কর সভাপতি, অনাথনাথ প্রধান অতিথি। ভূমিকম্পের আঘাত মনে ছিল, আমি "দুর্দিন" শীর্ষক কবিতা পাঠ করিলাম। প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ্য সভায় ইহাই আমার প্রথম সক্রিয় সহযোগ। অন্নদার সঙ্গে এইখানেই ঘনিষ্ঠ হইবার অবকাশ পাইলাম; বিহারের ভূমিকম্পপীড়িতদের সাহায্যার্থ কিছু করা যায় কি না, সে বিষয়ে উভয়ে অনেক পরামর্শ করিলাম এবং রাণাঘাট স্টেশন হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-আপিসে শ্রীমাখনলাল সেনকে এই অনুরোধ জানাইয়া এক টেলিগ্রাম পাঠাইলাম—কলিকাতার প্রত্যেক সরস্বতী-পূজা-মণ্ডপে আবেদন করিয়া তিনি যেন সংগৃহীত চাঁদার কিছু অংশ বিহারের আর্তত্রাণের নিমিত্ত হস্তগত করেন। আর্তসেবা প্রসঙ্গে কথায় কথায় অন্নদা তাঁহার বন্ধু শ্রীনির্মলকুমার বসুর নামোল্লেখ করিলেন। সেই মাঘী শ্রীপঞ্চমীর রাত্রে রাণাঘাট স্টেশনের স্তিমিত আলোকে "নাম-পরতাপে" পূর্বরাগ হইল।

একদিন অন্নদাই শ্রীনির্মলকুমার বসুকে সঙ্গে করিয়া 'বঙ্গশ্রী'-আপিসে আনিলেন: সুস্থ, সবল, সৌম্যদর্শন পুরুষ—কোথায় যেন একটু বিদ্যাসাগরী স্পর্শ আছে। যদিও পায়ে তালতলার চটি ছিল না, খদ্দরী খাটো মট্‌কা-রঙা কোর্তার সঙ্গে একটা বেমানান পাহাড়-ভাঙা শু-ই ছিল তবু কানে যেন চটির ফট্‌ফট্ আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। বয়সের হিসাব হইল না, দ্বিধাহীন কণ্ঠে "নির্মলদা" ডাক আপনি নিঃসারিত হইল।

আমার জীবনে তিনটি মানুষ দেখিয়াছি, যাঁহারা বয়সে ভারিক্কি না হইলেও সহজাত কবচকুণ্ডলের মত ভারিক্কির চাল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এক, শ্যামাপ্রসাদ; দুই, নির্মলকুমার বসু; এবং তিন, অতুল্য ঘোষ। অল্পক্ষণের আলাপেই বুঝিতে পারিলাম, ইনি সেই-জাতীয় মানুষ যাঁহার উপর নির্ভয়ে নির্ভর করা চলে। সে বোঝা আমার ভুল হয় নাই; গত বাইশ বৎসর নির্মলদার অবারিত স্নেহ আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছে, পরে হিসাব খতাইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে নির্মলদা আমার কয়েক মাসের ছোট।

নির্মলদার সঙ্গে পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল ততই তাঁহার জ্ঞানের পরিধি দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলাম। পাণ্ডিত্য কথাটা ইচ্ছা

করিয়াই ব্যবহার করিলাম না, তিনি পণ্ডিত নন—জ্ঞানী। তাঁহার সকল পাণ্ডিত্য জ্ঞানে পর্যবসিত, অর্থাৎ তিনি অধীত ও অর্জিত বিদ্যা ব্যবহার ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল এবং ভূবিদ্যা তাঁহার বিশেষ অনুশীলনের বিষয় হইলেও ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, মন্দিরস্থাপত্য ও গান্ধীবাদ সম্পর্কে তিনি ভারতবর্ষে একজন বিশেষজ্ঞ। কোনও বিষয়ে নিছক তাত্ত্বিকতায় তিনি বিশ্বাসী নন, সকল বিষয় হাতে-কলমে অনুশীলন করিয়া দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া কথা বলেন। আমাদের প্রাচীনা ঠাকুরমাদের নিত্য-ব্যবহৃত টোট্‌কা-ঔষধ সম্বন্ধেও তাঁহার সংগ্রহ ও জ্ঞান উল্লেখযোগ্য, বন্ধুবান্ধবদের পারিবারিক বিপদে ও সঙ্কটে এই জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া আজন্ম-ব্রহ্মচারী নির্মলকুমার প্রায় সাধু-সন্ন্যাসীর খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

নির্মলকুমার দৃঢ়চরিত্র নিয়মনিষ্ঠ মানুষ, ইংরেজীতে যাহাকে বলে "স্ট্রিক্টলি মেথডিকাল" তিনি সেই জাতীয়; যাঁহারাই তাঁহার সহিত দেশভ্রমণের সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন, তিনি পথের সর্ববিঘ্নহর গজসিংহ; তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, কাছাকাছি জল নাই—নির্মলকুমারের ঝোলা হইতে আয়ুর্বেদ মতে হরিতকী আমলকী যষ্টিমধু কাবাবচিনি অথবা অ্যালোপ্যাথিক মতে লেমন-ড্রপ-লজেঞ্জ বাহির হইল, জুতার স্ট্র্যাপ ছিঁড়িয়া গিয়া কঙ্করময় পথ চলা অসম্ভব হইয়াছে, নির্মলকুমার ঝুলি হইতে সেফ্‌টিপিন বাহির করিয়া কাজ-চলা-গোছ ব্যবস্থা করিলেন; পথে ফলমূল বাদাম জাতীয় খাদ্য যাহাই জুটুক খোসা ছাড়াইবার, খোলা ভাঙিবার উপায় নির্মলকুমারের আয়ত্তে আছে। তিনি সঙ্গে থাকিলে নির্ভয়ে মূর্ছা যাইতে পার, পেটের অসুখ করিবার মত করিয়া খাইতে পার, মাথা ধরাইবার মত হল্লা করিতে পার—প্রতিকার নির্মলকুমারের ঝুলির মধ্যেই বর্তমান। কখনও কখনও তাঁহার এই দিকটা দেখিয়া মনে হইয়াছে তিনি খুঁটিনাটির প্রতি একটু বাড়াবাড়ি রকমের দৃষ্টিসম্পন্ন—ফর্ম্ বজায় রাখিতে গিয়া অনেক সময় আসল লক্ষ্যকে অবহেলা করিয়া বসেন। খুঁটিনাটির প্রতি অনুরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন আরও দুইটি মানুষ আমি দেখিয়াছি—ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু ও তৎজ্যেষ্ঠ শ্রীরাজশেখর বসু। টেবিল ফাইল আলমারি দেরাজ তাকের কোথাও পান হইতে চুন খসিবার জো নাই; ছুরি কাঁচি পেপার-ওয়েট ও পেপার-কাটারের সঙ্গে স্কেল ও দাঁড়ি-পাল্লা ইঁহাদের নিত্য-ব্যবহার্য বস্তুর মধ্যে পড়িত। গিরীন্দ্র-বাবুর বেলায় দেখিয়াছি মাপ ও ওজন ঠিক রাখিতে গিয়া তাঁহার গতি ব্যাহত হইত। মনস্তত্ত্ববিদেরই ইহা বাতিকে দাঁড়াইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক রাজশেখর বসুর প্রখর শিল্পসাহিত্যবুদ্ধি তাঁহার নিয়মনিষ্ঠাকে ব্যাধিতে পরিণত হইতে দেয়

নাই। এই বুদ্ধিই হয়তো কড়ায়-কড়া-কাহনে-কানা হওয়া হইতে নির্মলকুমারকে রক্ষা করিবে।

এই বুদ্ধি অর্থাৎ শিল্পসাহিত্যবুদ্ধি নির্মলকুমারের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রবল ছিল; কিন্তু তিনি তাহা এতাবৎকাল দমন করিয়া চলিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার 'পরিব্রাজকের ডায়েরি' পড়িবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই অপরূপ সাহিত্যসুষমামণ্ডিত কয়েকটি চিত্র পাঠে বিস্ময় অনুভব করিয়াছেন। মাত্র কয়েকটি রেখার সাহায্যে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ছবি আঁকার ক্ষমতা তাঁহার আছে, এবং সে ছবির প্রত্যেকটিই বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাহিত্যিক ছাড়া অন্য সকলেরও তাহা ভাল লাগে। কিন্তু তিনি সাহিত্যসেবাকে পাশে সরাইয়া রাখিয়া দেশের ঐতিহ্য ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া দেশের সর্বত্র টহল দিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহার মধ্যে যে যাযাবরটি বাস করে তিনিই যদিও তাঁহার মাথায় নিরন্তর ডাঙ্গশ মারিয়া বেশীদিন এক স্থানে তিষ্ঠাইতে দেন না—আমরা লাভবান হই তাঁহার এই ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতার ফল ভোগ করিয়া।

নির্মলকুমার সব্যসাচী। ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষায় তাঁহার ডাইনে বাঁয়ে কলম চলে, উভয় ভাষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণীর বক্তা। কিন্তু ইহা দ্বারা আমার নিকট নির্মলকুমারের বিচার নয়, তিনি আমাদের বিপদবারণ বন্ধু—একাধারে ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড—সুহৃৎ, পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শক।

১৩৪১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৩৪ সনের গোড়ায় বাংলা দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে অকস্মাৎ কমিউনিজমের প্রভাব লক্ষিত হয়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের অহিংস সৈনিকদের মধ্যে চট্টগ্রামের সশস্ত্র হিংসাত্মক বিপ্লবের সৈন্যেরা আসিয়া পড়িলে জেলে জেলে এক ঠাণ্ডা মানসিক সংগ্রাম চলিতে থাকে। কণ্টক-দ্বারা-কণ্টক-উচ্ছেদ-নীতির সাহায্যে সদ্য-আগত কমিউনিজমের হাতে দৃঢ়মূল গান্ধীবাদের সংহার কামনা করিয়া তদানীন্তন ইংরেজ সরকার নানাভাবে কমিউনিজমকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন। এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার স্বপ্নও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন—গান্ধীবাদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ। নব-তন্ত্রের পক্ষে দুই-একজন সক্ষম প্রচারক নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অহিংস পক্ষের নল নীল গয় গবাক্ষ—একে একে বহু সেনাপতিরই পতন হইতে লাগিল। নির্মলকুমার তখনই কারাগারের লৌহ-তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া গতায়াত করিতেছেন। তিনি গান্ধীপক্ষে

দাঁড়াইলেন, তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসের ভিত্তি আকস্মিক আঘাতে বিচলিত হইবার মত শিথিল ছিল না। তিনি টিকিয়া গেলেন এবং এই সংঘর্ষে কমিউনিজম-মতবাদকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আয়ত্ত করিয়া ফিরিলেন। আমার সহিত যখন তাঁহার পরিচয় ঘটিল, তখন তিনি গান্ধীবাদ ও কমিউনিজম লইয়া বিশেষভাবে অধ্যয়ন-অনুশীলন করিতেছেন। 'বঙ্গশ্রী'র পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করিতে আমি তাঁহাকে সরাসরি অনুরোধ করিলাম। ১৩৪১ সালের আশ্বিনের 'বঙ্গশ্রী'র প্রথম প্রবন্ধরূপে নির্মলকুমার বসুর "কমিউনিজম ও গান্ধীবাদ" প্রবন্ধ বাহির হইল। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা দুই মতবাদের পার্থক্য তিনি সেদিন যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজিকার দিনেও সে পার্থক্য বজায় আছে। তখনও কমিউনিস্ট জগতে লেনিনের যুগ চলিতেছিল, হিট্‌লারের অভ্যুদয় হয় নাই এবং মহামান্য স্টালিন ট্রট্‌স্কির বুদ্ধির কারাগার হইতে গোকুলে নীত হইয়া সেখানেই বাড়িতেছেন।

নির্মলকুমার নিজের সাহিত্য-প্রতিভার সম্যক্ প্রয়োগ করিবার সুযোগ নিজেকে দেন নাই। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরের এবং বালু-প্রস্তরময় উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-ভারতের সুপ্রাচীন মন্দিরগুলির আহ্বান তাঁহার কাছে এত প্রবল যে, সাহিত্য-সাধনার নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ তাঁহার নাই। ইহার উপর রাঁচি-হাজারিবাগ-ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসীদের এবং ময়ূরভঞ্জ-অঞ্চলের প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ডাক আছে। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ ও বিহারে গান্ধীজীর অনুগমন করিয়া তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তিনি ইংরেজী-বাংলা ভাষায় আমাদের উপহার দিয়াছেন, তাহা একান্তই বাই-প্রডাক্ট—ফালতু ফসল। সাহিত্যিক নির্মলকুমারের আশা আমি এখনও রাখি, সুদূরের পিপাসা মিটাইয়া তিনি কবে বাগবাজারের কোটরে ডানা গুটাইয়া বসিবেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।

নির্মলকুমারের সঙ্গে আমার সাহিত্য-জীবনের সর্বাধিক ট্রাজেডি জড়াইয়া আছে। 'আত্মস্মৃতি'র পূর্বাপর পাঠকেরা যদিও জানেন ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ হইতে আমি গান্ধীজীর অনুরক্ত ভক্ত, 'শনিবারের চিঠি'র স্তম্ভ গান্ধীবিরোধী মোহিতলালের ধারণা হইয়াছিল—নির্মলকুমার আমাকে গান্ধীভক্ত করিয়া তুলিয়া 'শনিবারের চিঠি'র ক্ষতি করিতেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর মত আমাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন দুর্যোধনকে ত্যাগ করিবার জন্য। যাহা আত্মনেপদী, তাহাকে পরস্মৈপদী আখ্যা দিতে আমি রাজী হই নাই—নির্মল-

কুমারকে বর্জন করিবার কোন সঙ্গত কারণ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। ফলে মোহিতলালের সহিত আমার সম্পর্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছিল।

ডাক্তার সাহিত্যিক শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্যের বন্ধুত্ব বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটকালিতে লাভ করিয়াছিলাম। ঘাটশীলার আরণ্য ও পার্বত্য প্রকৃতি বারম্বার বিভূতিকে আহ্বান করিত। সেখানকার পুষ্পব্যবসায়ী ডিজোন কোম্পানীর সাহিত্য-প্রাণ স্বত্বাধিকারী দ্বিজেন্দ্র মল্লিক বেশ একটি সাহিত্য-পরিবেশ রচনা করিয়াছিলেন; বিভূতিভূষণ, সস্ত্রীক ব্যারিস্টার নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, উত্তরপাড়ার শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীমতী পরিমল দাস প্রভৃতি মিলিয়া সুবর্ণরেখার তীরে একটি সাহিত্য-চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। অদূরবর্তী গালুডি-গ্রামে পশুপতিবাবুর অবসর-বিনোদনের একটি আখড়া ছিল। নীরদরঞ্জন ছিলেন তাঁহার প্রতিবেশী ও বন্ধু, সুতরাং পশুপতিবাবুরও সুবর্ণচক্র-ভুক্ত হইতে বিলম্ব হয় নাই। বিভূতিভূষণ সেই পরিচয়ের জোরে আমারও সহিত তাঁহার পরিচয় সাধন করাইয়া দেন। প্রথম আলাপেই বুঝিতে পারিলাম—পশুপতিবাবুর সাহিত্যিক পরিচয় সুবর্ণচক্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি রবি-চক্রেরও একজন অন্তরঙ্গ সভ্য, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকেও বিশেষ স্নেহ করিয়া থাকেন। তথাপি সাহিত্য ছিল তাঁহার শখের খেলা।

পশুপতি ভট্টাচার্যকে বন্ধুরূপে পাইয়া আমার সেই নিতান্ত দুরবস্থায় আমি বহু বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলাম। তখন সবে 'বঙ্গশ্রী'র চাকরি লইয়াছি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে থাকি, চোটা সুদের জের তখনও চলিতেছে। সংসার-যাত্রার সহায়তার জন্য একাধিক লোক রাখিবার সঙ্গতি ছিল না—একাধারে পাচিকা, দাসী এবং শ্রীমান রঞ্জনের ধাত্রী ছিল সরস্বতী নামধেয়া এক প্রৌঢ়া। আমার "হরিমতি" গল্পে এই প্রৌঢ়ার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ঠিক এই সময়ে সে হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল এবং তাহার বুদ্ধির জড়তা দেখা দিল। সেই নিদারুণ সঙ্কটকালে ডাক্তার পশুপতিবাবু নিয়মিত হাজিরা দিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ পরিবারের চিরস্থায়ী বন্ধু মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে ইংরেজ-কন্যা পলিন স্মিথের "স্কুলমাষ্টার" গল্পের অনুবাদ "মাস্টার মশাই" মারফত তিনি 'বঙ্গশ্রী'র সাহিত্যিক-গোষ্ঠীভুক্ত হইলেন।

পশুপতিবাবুর সাহিত্য-সাধনা বিচিত্র পথে অগ্রসর হইয়াছে। সাহিত্য গোড়ায় ডাক্তারের অবসর-বিনোদনের উপায় মাত্র ছিল, ধীরে ধীরে তাহাই তাঁহার প্রায় একান্ত সাধনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোড়ায় তিনি ছিলেন

অনুবাদক এবং চিকিৎসা ও খাদ্যতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণাকারী লেখক, বর্তমানে তাঁহার উপন্যাসে ও প্রবন্ধে অতি গভীর জীবন-দর্শন আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাঁহার প্রথম দিককার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম অস্থিরচিত্ত লক্ষ্যহীন পথের পথিকরূপে, দেহাশ্রিত স্থূল প্রেমের লুব্ধ পূজারীরূপে। তাঁহার সাহিত্যিক মন তখন নানা জটিলতার গোলকধাঁধায় বিভ্রান্ত ছিল, আজ তিনি সহজ পথের পথিক সহজ মানুষ, দেবতা তাঁহার লক্ষ্য স্থির ও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন।

ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী যক্ষ্মারোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবেই পরিচিত; বাংলা-সাহিত্যের এমন প্রেমিক ও সমঝদার আমি অল্পই দেখিয়াছি। কিরণ-কুমারের তিনি বন্ধু ছিলেন। 'বঙ্গশ্রী'র আড্ডায় গোড়া হইতেই তাঁহাকে দেখিয়াছি। কাগজের উপর কলমের সাহায্যে কথার ফুল ফুটাইবার অভ্যাস তিনি করেন নাই, মুখে মুখে সাহিত্য-রচনা করিয়া মজলিস-মনোরঞ্জন করা তাঁহার একটা ব্যসন ছিল। অর্থাৎ তিনি চমৎকার কথা বলিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথ ও তৎপরবর্তী বাঙালী কবিদের একনিষ্ঠ পাঠক তিনি, কথায় কথায় প্রায়শই রবীন্দ্রনাথ এবং কখনও কখনও যতীন্দ্রমোহন-করুণানিধান-যতীন্দ্রনাথ-কুমুদরঞ্জন-মোহিতলাল-কালিদাস-নজরুল এবং কদাচিৎ সজনীকান্তের 'রাজহংসে'র কবিতা আবৃত্তি করিতেন। ভারী গলায় তাঁহার আবৃত্তি খুব ভাল লাগিত। তাঁহার সাহিত্যরসিক মূর্তিটি প্রথমে ধরিতে পারি নাই, নিছক আড্ডাবিলাসী বলিয়াই তাঁহাকে মনে হইয়াছিল। ১৯৩৪ সনের ২রা জানুয়ারি তারিখে 'বঙ্গশ্রী'-আপিসে জোর আড্ডা বসিয়াছিল। ডক্টর সুশীলকুমার দে, ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সিংহ, কুমুদবন্ধু সেন ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। আড্ডা খুব জমিয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ কে যেন সংবাদ আনিলেন, অ্যালবার্ট হলে সেই দিন সন্ধ্যায় কবি সরোজিনী নাইডু "মানবজীবনে কবিতার প্রভাব" বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন ও তৎসঙ্গে স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইবেন। আড্ডা ছাড়িয়া যাইতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারীকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না। তিনি যাইবেনই এবং আমাকেও লইয়া যাইবেন। শেক্সপীয়র-প্রোক্ত স্কুলগামী বালকের মত সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম শ্রীতুলসী গোস্বামী সেখানে আসর জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন, কিরণশঙ্কর রায় এবং শ্রীকালিদাস নাগ তদ্বির-তদারক করিতেছেন। যথাকালে

সরোজিনী নাইডু উপস্থিত হইয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন এবং পিক-বিনিন্দিত কণ্ঠে নানা দৃষ্টান্ত আবৃত্তির সঙ্গে কবিতার ঐশী শক্তি সম্বন্ধে চমৎকার একটি বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, কবিতা জীবনের দর্পণস্বরূপ, সমাজ ও ব্যক্তি, ব্যষ্টি ও সমষ্টির আত্মিক চিত্র ইহাতে প্রতিফলিত হয়; মানব-জীবনে কবিতার মৃত্যু হইলে ধীরে ধীরে মানুষের তথা সমাজের অধোগতি হয়, সাধারণ তেল-নুন-লকড়ি সংগ্রহের উদ্যমও ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া সমাজকে জড়পিণ্ডে পরিণত করে। বক্তৃতার শেষে তিনি স্বরচিত কয়েকটি কবিতা, বিশেষ করিয়া দেশপ্রেম-মূলক কবিতাগুলি, আবৃত্তি করিলেন। সন্ধ্যাটা সার্থক হইল দেখিয়া মনে মনে ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইলাম।

তিনিও আমাকে ছাড়িলেন না। ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন সন্নিহিত তাঁহার আইবুড়ো-বিবরে লইয়া গেলেন। সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাব্যচর্চা চলিল। গভীর রাত্রে এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম যে, বিদ্যায় ও উপজীবিকায় তিনি যাহাই হউন, আসলে একটি সহৃদয় ভাবুক প্রাণ ওই ঢিলাঢালা অসম্বৃত কাঠামোর মধ্যে বাস করে। মনে আছে যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের পরিধি দেখিয়া সেই দিন তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম তাঁহার জ্ঞান মাতৃভাষায় সকলের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিতে। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে আমার অনুরোধ প্রতিপালিত হইয়াছে। আমরা ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারীর 'ক্ষয়রোগ-কথা' পাইয়াছি। এই বইখানি যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, ডক্টর অধিকারীর সাহিত্যপ্রতিভাও বড় কম ছিল না।

এই "পরিচয়-কথা" সূত্রে আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যাহাকে ছায়াচিত্রের ছায়ামূর্তি বলিতে পারি—'বিষবৃক্ষে'র পূর্বগামিনী ছায়া। ১৯৩৪ সনে বছরের গোড়া হইতেই আমাকে যেন ছায়াছবির ভূতে ধরিয়াছিল। সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ দিন সিনেমার ছবি দেখা বাতিকে দাঁড়াইয়াছিল। কোন কোন দিন দুইবারও দেখিতাম। হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় তখন ধর্মতলা স্ট্রীটের "রওনক মহল" নামক ছবিঘরের ম্যানেজার—তাঁহার কৃপাই ছিল সমধিক। আট আনার টিকিটে ছবি দেখিতে তখন লজ্জা বা অসুবিধা ছিল না। চলচ্চিত্রশিল্পের সহিত যোগাযোগের সম্ভাবনা তখন আমার সুদূরবর্তী কল্পনাতেও ছিল না। তবু পাগলের মত ছবি দেখিয়া ছবিতে গল্প বলার টেকনিক আয়ত্ত করিতেছিলাম। তখন সিনেমা-জগতে নিউথিয়েটার্সের জয়-পতাকা সবে উড়িতে আরম্ভ হইয়াছে—প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু ও

নীতীন্দ্র বসুর খুব নাম। হঠাৎ ৩০ মার্চ (১৯৩৪) তারিখে নীতীন্দ্র বসুর সহিত পরিচয় ঘটিল, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় আলাপ করাইয়া দিলেন। চলচ্চিত্র বিষয়ক দুই-চারিটি কথা হইতেই নীতীনবাবু আমাকে একটি গল্পের "সিনারিও" বা চিত্রনাট্য লিখিতে বলিলেন। "গোড়ার কবিতা ও শেষের কবিতা" নামক একটি ধারাবাহিক গল্প পাঁচ বৎসর পূর্বে 'শনিবারের চিঠি'তে লিখিতে লিখিতে আর শেষ করি নাই। বাড়ি ফিরিয়া সেই গল্প লইয়া পড়িলাম। গল্পটিকে যতদূর সম্ভব চটকদার করিয়া তুলিলাম। কিন্তু নীতীন বসুর মনোহরণ করিতে পারিলাম না। তখন 'অক্সফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্স' প্রস্তুত সম্পর্কে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মারফত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘন ঘন যোগাযোগ ঘটিতেছিল। সে কাহিনী পরে বক্তব্য। নীতীন বসু এই যোগাযোগের সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি একদিন বলিলেন, রবীন্দ্রনাথের একটা ছোটগল্প বাছিয়া লইয়া স্বয়ং কবির পরামর্শে যদি তাহার চিত্রনাট্যরূপ প্রস্তুত করি, তাহা হইলে তাহা কাজে লাগানো যাইতে পারিবে। ৫ই এপ্রিল লোভে লোভে ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে উপস্থিত হইলাম। 'অক্সফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্স' সম্পর্কে কথার ফাঁকে নীতীন বসুর প্রস্তাবটাও কবির গোচর করিলাম। তিনিও উৎসাহিত হইলেন। "দুরাশা", ক্ষুধিত পাষাণ" ও "পরিশোধ" এই তিনটি গল্প লইয়া বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। কিন্তু আমার সিনেমা-ভাগ্য তখনও প্রসন্ন হয় নাই। নীতীন বসু গাছে তুলিয়া মই লইয়া সরিয়া পড়িলেন। ১৯৩৭ সনে প্রমথেশ বড়ুয়া প্রথম গাছে মই লাগাইয়া আমাকে নামাইলেন, এবং ১৯৪৫ সনে স্বয়ং নীতীন বসু যাহা লইয়া উপস্থিত হইলেন তাহা মই নয়, তাহাকে মার্বলপাথর-বাঁধানো সিঁড়িও বলা যাইতে পারে।

পঞ্চম তরঙ্গ

দক্ষিণং মুখম্

আমার সাহিত্য-জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সত্য কথা বলিতে গেলে রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙালী কবিদের প্রায় সকলেই আমরা যেন মূল গায়েন রবীন্দ্রনাথের দোহারকি করিয়াই সার্থক হইয়াছি; দুই-চারিজন একটু দূরে সরিয়া বেসুরা গাহিবার চেষ্টা করিয়াছি বটে, কিন্তু শেষাশেষি ওই রবীন্দ্র-রূপ-সাগরেই ডুব দিতে হইয়াছে, আন্-ঘাটে তরী বাঁধা আর হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তীর সময় নানা কারণে তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া তাঁহার সান্নিধ্য হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়াছিলাম। "শ্রীচরণেষু", "হিমালয়" প্রভৃতি কবিতা ; শ্রীহেমন্তবালা দেবীর নির্বন্ধাতিশয্য ও পত্রদৌত্য ; শ্রীমতী সুধারাণীর নববর্ষের প্রণাম-নিবেদন মিলনের অন্তরায়গুলি বহুলপরিমাণে দূর করিলেও আমার পক্ষে পথ সুগম হয় নাই। কবির তরফে একটা নিদারুণ অবসাদ ও উদাসীনতা আসিয়াছিল। এই সময়ে লেখা একটি চিঠিতে তাঁহার মনের অবস্থা স্পষ্টত প্রকাশ পাইয়াছে :

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

সজনীকান্ত এসেছিলেন। তিনি বললেন, 'শনিবারের চিঠি'তে আমার পিতার নামে যে লেখা বেরিয়েচে, তাতে কুৎসা আছে একথা সত্য নয়, বরঞ্চ তার বিপরীত। এ নিয়ে আর আলোচনা করবার দরকার নেই। বুদ্ধদেবের বাংলা সম্বন্ধে আমি তোমাদের কাছে যে মন্তব্য [প্রতিকূল] প্রকাশ করেচি, সজনী তা শুনেছেন। এ নিয়ে আমাকে জড়িত করে তিনি যদি লেখালেখি না করেন তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হই। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। একটু নিরালার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি। যে একটি দায় [বিশ্বভারতী] স্বীকার করে নিয়েছি তারি ভার আমার পক্ষে দুর্বহ। আমাকে আর বাদপ্রতিবাদের আবর্তের মধ্যে যেন পাক না খেতে হয় এইটি তোমরা কোরো। লোকের সঙ্গে ব্যবহারে আত্মরক্ষা করে চলতে আমি অক্ষম। তোমাদের মতো যাঁদের আমার প্রতি করুণা আছে তাঁরা আমাকে বৃথা ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাবার চেষ্টা যেন করেন। গোলমালের মধ্যে আমার অত্যন্ত কাজের ক্ষতি হয়। আজ বাইরের দুয়ার বন্ধ করে শান্ত হয়ে বসবার সময় আমার হয়েছে। আমার উপর দিয়ে যে নিরন্তর নিন্দার ধারা বয়েচে সেটা চলে তো চলুক কিন্তু নতুন কোলাহলের সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করি নে। আমার দ্বারা আমার দেশের কিছু উপকার নিশ্চয়ই হয়েচে—সেজন্যে আর কিছু দাবী করতে চাই নে—কিন্তু শেষ বয়সে যে শান্তিটুকুতে আমার একান্ত প্রয়োজন, তার মধ্যে যেন বিক্ষোভ ঘটানো না হয়—আমার দেশের লোকের কাছে অন্তত এই আবেদন করবার অধিকার আমার আছে। তোমাকে আমি জানালুম, কারণ আমি জানি তুমি আমার প্রতি অকরুণ হতে পারবে না।

সাহিত্য-পরিষদ থেকে যে বাংলা বইগুলি প্রকাশ করা হয়েছে কিনতে

চাই। তুমি যদি যথাস্থানে তার ব্যবস্থা করো তাহলে উপকার হয়।"

আমি ১২ই মাঘ শান্তিনিকেতনে রওয়ানা হব, সকালের গাড়িতে। ইতি

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের শান্তিতে আমাদের দ্বারা বিন্দুমাত্র বিক্ষোভ ঘটানো হয় নাই, যদিও 'কল্লোলে'র ঝড়তি-পড়তি দল তখনও তাঁহাদের অর্থাৎ তরুণদের সমর্থক বলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি 'শনিবারের চিঠি'র আক্রোশের কাহিনীটা ঘটা করিয়াই প্রচার করিতেছিলেন। অচিন্ত্যকুমার তাঁহার 'কল্লোল যুগে' এই মিথ্যারই জের টানিয়াছেন। একজন প্রবীণ সাহিত্যিককে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হঠাৎ নজরে পড়িল। নজিরস্বরূপ তাহাই এখানে দাখিল করিতেছি:

"ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তরুণের দল আমাকে সাহিত্যের আসর থেকে বরখাস্ত করেচেন এমনি একটা রব উঠেচে। এ আসরে যখন প্রবেশ করেছিলেম তখন তাঁরা আমাকে নিযুক্ত করেন নি—সেই কারণেই তাঁরা জবাব দিলেই যে আমাকে মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হবে এমন আশঙ্কা কোরো না। নিশ্চয়ই আমারো যাবার সময় হবে, কিন্তু বরখাস্তকারীরা যে সেদিন পেরিয়ে টিঁকে থাকবেন এখনো তেমন পাকা দলিল তাঁরা রেজেস্টারি করেন নি। তরুণ-অতরুণের চোখরাঙানী জীবনে বার বার দেখে এলুম—তার কতটা যে দাম তা জানতে আমার বাকি নেই। যদি নিশ্চিত জানতেন সাহিত্যের বিধিলিপি তাঁদের কলম দিয়েই রচিত হয় তা হলে ব্যর্থ আক্রোশে এত বেশি চীৎকার করতেন না। খুব চেঁচিয়ে কথা বলা আর সত্য কথা বলা এক জিনিস নয়।

ইতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

সেদিনের উচ্চাভিলাষী তরুণদের "পথরোধী" রবীন্দ্রনাথের কথাই সত্য হইয়াছে। সাহিত্যের মামলায় "পাকা দলিল যাঁরা রেজেস্টারি করেছেন তাঁরা" তাঁহারা নন। যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি 'বঙ্গশ্রী'র দ্বিতীয় বৎসরের প্রারম্ভে তুষার গলিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং 'রাজহংস' কবির হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পথ প্রশস্ততর হইয়া আসিয়াছিল। ইহা ১৩৪৩ বৈশাখের (১৯৩৬ এপ্রিল-মে) কথা। সেই বছর পূজাবকাশের কিছু আগেই রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী'র "পরিশোধ" নামক গাথাটিকে নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'র

পরিবর্তিত করেন; আশ্বিনের শেষের দিকে কলিকাতার আশুতোষ-কলেজ-হলে তাহা অভিনীত হয়। কবি স্বয়ং আমাকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু গ্রহের এমনই লীলা আমি তৎপূর্বেই আসাম-প্রবাসী ছাত্রসম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে (গৌহাটী) সভাপতিত্বের বায়না লইয়া বসিয়াছি। ২৭ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর ১৯৩৬) গৌহাটী পৌঁছিতে হইল —২৭।২৮ দুই দিনই সভা। প্রথম দিনের সভায় দুষ্টা সরস্বতী আমার স্কন্ধে হঠাৎ ভর করিলেন, আমি কথার তোড়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বদেশীযুগ-পরবর্তী বাঙালী যুবকদের মেরুদণ্ড-ও-চরিত্র-হীনতার দায় রবীন্দ্রনাথের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলাম। যাহা বলিলাম তাহার মোদ্দা কথাটা হইতেছে এই যে, ভূদেব এবং বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে আত্মস্থ করিয়া স্বদেশী যুগের সিংহদ্বার পর্যন্ত আগাইয়া দিয়াছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির উপদেশে ও নির্দেশে তাহার চরিত্রে স্থৈর্য ও বীর্যের প্রকাশ দেখা গিয়াছিল; এমন সময় রবির প্রবল আকর্ষণে তাহার পদদ্বয় ভূমিস্পর্শ হারাইয়া তাহাকে নিরালম্ব আলোক-লতার পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম তাহার পক্ষে কল্যাণপ্রসূ তো হয়ই নাই, তাহাকে বাত্যান্দোলিত লতার মত উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে, 'সবুজ পত্রে'র বাতাস বাঙালীকে মহৎ করে নাই, মাতাল করিয়াছে মাত্র।

গরম গরম কথা বলিয়া বিপুল করতালিধ্বনির মধ্যে খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম সন্দেহ নাই। ভয় ও অনুশোচনাও যে মনে জাগে নাই তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারিব না। তবে ভরসা ছিল, উড়ো খৈ গোবিন্দের চরণ পর্যন্ত পৌঁছিবে না। সেটা আমার ভুল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্তৃপক্ষের নিকট তখন নানা কারণে আমার খুব খাতির। কলিকাতায় ফিরিয়াই দেখিলাম, আমার গৌহাটী-ভাষণ ঘটা করিয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। সর্বনাশ! রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কলিকাতায়, তাঁহার দৃষ্টিতে সরাসরি না পড়িলেও আমার শুভানুধ্যায়ীরা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে দিবেন না। আমার ধারণা যে ভুল হয় নাই, দুই দিন পরেই আমার কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকট রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ অতি সংক্ষেপেই লিখিয়াছেন: "এই কথাগুলি বলিবার জন্ম সজনীকান্ত কি আমার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিতেন না?"

বাস্, এত তোড়জোড়, এত সাধ্যসাধনা, এত উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা ভুলের চোরাবালিতে পড়িয়া এক নিমেষে তলাইয়া গেল। নিজের দোষে প্রায় পাকা

খুঁটি কাঁচিয়া গেল, তরী তীরে পৌছিয়া ডুবিল। বুঝিলাম, কবিসমাগম আর আমার ভাগ্যে নাই। লজ্জায় এবং অনুতাপে মরমে মরিয়া গেলাম। হাতের ঢিল তখন ছোঁড়া হইয়া গিয়াছে, ফিরাইবার উপায় নাই।

কিন্তু মানুষের অহমিকা ও স্থূলবুদ্ধি তাহার দূরদৃষ্টিকে সর্বদাই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সে কতটুকুই বা দেখিতে পায়? অনুমানই বা কতটুকু করিতে পারে? রন্ধ্রহীন অন্ধকারে আশার ক্ষীণমাত্র আলোক প্রবেশের সম্ভাবনা যখন সুদূর-পরাহত তখনই যে কোথা হইতে কেমন করিয়া আলো-বাতাসের বন্যা আসিয়া মুমূর্ষু মানুষকে অভিষিক্ত করিয়া দেয়—মানুষের জীবনে এ পরমাশ্চর্য বার বার ঘটিয়া থাকে। আমার জীবনেও ঘটিল। অকস্মাৎ একদিন ১৯৩৮ সনের ২৪ জুলাই রবিবার প্রাতে জোড়াসাঁকো-ভবন হইতে ডাক আসিল, রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। গুরু-শিষ্যকে সহজ সান্নিধ্যে আনিবার জন্য যাঁহারা এতকাল প্রবল চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহারা কেহই এই নব যোগা-যোগের কারণ নহেন। বিচ্ছেদকালে অনেক ভাল কাজের পাকা দলিল রচনা করিয়াছিলাম, যেমন, 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদন, 'নূতন পত্রিকা' প্রকাশ, 'রাজহংস', 'আলো-আঁধারি,' 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' এবং 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী' প্রথম খণ্ডের প্রকাশ—এ সবেও কাজ হয় নাই। সাহিত্যের বাই-প্রডাক্ট হিসাবে 'মুক্তি' চলচ্চিত্রের চটকদার দলিলও ছিল, তাহাতে মৎপ্রণীত দুই-একখানি গান তদ্‌রচিত কি না এ প্রশ্নও তাঁহাকে উৎসাহী রসিকজন মারফত শুনিতে হইয়াছিল। কিন্তু তবুও ডাক আসে নাই। জোড়াসাঁকো পৌছিয়া কবির চরণপ্রান্তে বসিয়া বুঝিতে পারিলাম, এ আহ্বানের মূলে বঙ্গকাব্য-সরস্বতী স্বয়ং। মাত্র কয়েক দিন পূর্বে কবি-সম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়' প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় তিনি ক্ষুব্ধ ও অশান্ত আছেন। অচিরাৎ আর একটি সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ সংকলন প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছে। কাজেই সমস্ত বিরাগ-বিরক্তি দূরে সরাইয়া দিয়া কবি অসঙ্কোচে আমাকে ডাক দিয়াছেন।

আবেগে এবং উত্তেজনায় আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ভিতরে ভিতরে যে কারণই কাজ করিয়া থাকুক, একটা কারণ আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে ছিল। ১৯৩৪ সনের মার্চ মাসের মাঝামাঝি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস রবীন্দ্রনাথকে 'অক্সফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্স' (ইংরেজী সংকলনের আদর্শ) সংকলন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানান। কাজটা তাঁহার খুব পছন্দ-মাফিক ছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে (১৮৮৩ খ্রী:) একবার বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী ('পদরত্নাবলী') নির্বাচন ও সংকলন করিয়াছিলেন, সহায়ক ছিলেন

বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। অনুরুদ্ধ হইয়া কবি উৎসাহের সঙ্গে কাজে লাগেন এবং উপকরণ সংগ্রহের কাজে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে নিযুক্ত করেন। তখন আমারও ডাক পড়িয়াছিল। ৬ই মে সিংহলযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত এই সংকলন-ব্যাপারে আলোচনার জন্য কবি, শ্রীযুক্ত মহলানবিশ ও আমি ঘন ঘন মিলিত হইতাম। কাজ অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছিল। সিংহল হইতে ফেরেন জুনের শেষে, তাহার পর কয়েকবার শান্তিনিকেতন কলিকাতা করিয়া কবি সেপ্টেম্বরে মাদ্রাজ যাত্রা করেন, ফিরিয়া আসিয়া আবার কাশী। কাশী হইতে ফিরিলেন ডিসেম্বরের একেবারে গোড়ায়। তাহার কয়েক দিন পূর্বে 'চার অধ্যায়' পুস্তকাকারে বাহির হইয়া বাংলা দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের নাম "ভূমিকা"য় যুক্ত করাতে আমরা 'শনিবারের চিঠি'তে তীব্র মন্তব্য করিলাম। সাময়িক যোগসূত্র আবার ছিন্ন হইয়া গেল। 'অক্সফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্সে'র পাণ্ডুলিপির কি হইল, সে সন্ধান আর রাখি নাই।

তাহার পর আবার এই আহ্বান। বঙ্গকাব্য-সরস্বতীর কৃপায় রুদ্র প্রসন্ন মুখ ফিরাইলেন। সকল বিরোধ, সকল সন্তাপ মায়ামন্ত্রবলে দূর হইয়া গেল। কোনও প্রশ্ন নয়, কোনও সন্দেহ নয়। "প্রডিগাল সন" দ্বিধাহীন সমাদরে পিতৃবক্ষে আশ্রয় লাভ করিল। মাঝখানের প্রায় দশ বছরের বিয়োগ-বেদনাময় ইতিহাস নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল। যেন কখনও ফাঁক পড়ে নাই বা বিপরীত কিছু ঘটে নাই।

দশ বছর বলিলাম এই কারণে যে, ১৯২৮ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রার্থিত সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর ১৯৩৮ সনের ২৫ জুলাই পর্যন্ত দশ বছর পাঁচ মাস কাল কবির সহিত আমার "শতং বদ মা লিখ" সম্পর্ক ছিল। উক্ত ২৫ জুলাই তারিখে তিনি আমাকে 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' দ্বিতীয় সংস্করণ সংকলন-সমিতির সদস্যরূপে নিয়োগপত্র (ইংরেজীতে) দেন। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে পুনঃসংযোগ ঘটে ওই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখে। ইহার মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসে 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী' প্রথম খণ্ড সুনীতিকুমার, ব্রজেন্দ্রনাথ ও আমার সম্পাদনায় রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে বাহির হইয়াছে এবং শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের অর্থে উদ্যোগে ও আমার সম্পাদনায় 'অলকা' নামক মাসিকপত্র বাহির হইতে চলিয়াছে। 'কাব্যপরিচয়' সংক্রান্ত যোগাযোগ গৌণ, আমার মুখ্য কাজ তখন বিশ্বসুদ্ধ কাজের লোকের আবেদন-নিবেদনের থালা কবির সম্মুখে হাজির করা। বস্তুত পুনর্মিলনের গোড়ার দিকটায় তাঁহাকে কম উত্ত্যক্ত করি নাই। তিনি হাসিমুখে সমস্ত আবদার

শুধু সহ্য করেন নাই, চরিতার্থ করিয়াছেন। ইহার পর, তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সম্পর্ক অটুট ছিল। তাঁহার বহু শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি তাঁহাকে সাবধান ও সতর্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাকে যাঁহারা ঘোরতর অপছন্দ করিতেন তাঁহারা মৎসম্পর্কে মান অভিমান ও শাসনের ভয়ও দেখাইয়াছেন। তিনি নিজে সেই সকল গল্প আমাকে শুনাইয়াছেন কিন্তু কখনও বিচলিত হন নাই। তিনি কাহাকেও কাহাকেও এই কালে বলিয়াছিলেন, "সজনী আমার রাবণ-ভক্ত"—ইহাও শুনিয়াছি।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ আমাকে ঘন ঘন শান্তিনিকেতনে আহ্বান করিতেন, না যাইয়াও উপায় ছিল না। ৩১ আগস্ট (১৯৩৮, ১৪ ভাদ্র ১৩৪৫) গেলাম —প্রধানত মেদিনীপুরের তদানীন্তন জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের তাগিদে। 'অলকা'র জন্য কিছু খোরাক সংগ্রহেরও বাসনা ছিল। পৌঁছাইয়াই দেখি, কবি আসর জমাইয়া বসিয়াছেন। "মুক্তির উপায়" নামক গল্পটিকে খেলাচ্ছলে নাটকাকারে লিখিয়াছেন, তাহারই পাঠ চলিতেছে। কিছুদূর অগ্রসরও হইয়াছিল, কিন্তু কবি আমার সম্মানার্থে আবার গোড়া হইতে শুরু করিলেন। অদ্ভুত তাঁহার ক্ষমতা, একাই সমস্ত নাটকটিকে যেন অভিনয় করিয়া দেখাইলেন। হাসিতে হাসিতে শ্রোতাদের দম ফুরাইল, কবি কিন্তু নির্বিকার। আমি ১০ই সেপ্টেম্বর ২৪ ভাদ্র শনিবার ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কর্তৃক স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর-স্থাপন উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পর্কে একটি প্রশস্তি-কবিতা এবং 'অলকা'র প্রথম সংখ্যার (আশ্বিন ১৩৪৫) জন্য "মুক্তির উপায়" নাটকটি প্রার্থনা করিয়া পর দিন কলিকাতায় ফিরিলাম। দুই দিন পরেই স্মারক-লিপি পাঠাইলাম। জবাবটি এই হিসাবে মূল্যবান যে দশ বছর পাঁচ মাস পরে এইটি তাঁহার প্রথম ব্যক্তিগত চিঠি :

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ভুলেই গিয়েছিলুম। তোমার চিঠি পেয়ে আজ আমি কয়েক লাইন লিখে মেদিনীপুরে কালেক্টরকে পাঠিয়ে দিয়েছি। মুক্তির উপায় থেকে বোধ হচ্চে আমার মুক্তির উপায় নেই। আচ্ছা কপি করিয়ে পাঠিয়ে দেব। সুধাকান্ত রায় চৌধুরী বলচে পালিশ করে দেওয়া দরকার। আমার মন বলচে আর তো পারা যায় না। যারা জন্মায় কুঁড়ে হয়ে তারা মরে খাটতে খাটতে। ইতি ৬।৯।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

যে কয়েক লাইন লিখিয়া শ্রীবিনয়রঞ্জন সেনকে পাঠাইয়াছিলেন তাহাও বাঙালীর স্মৃতির পটে ধরিয়া রাখিবার যোগ্য। এই অপূর্ব কবিতাটি তেমন প্রচারিত হয় নাই।—

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমিষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যূষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টীকা।
রুদ্ধভাষা-আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা।
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে॥"

৯ই সেপ্টেম্বর ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন-উৎসবে যোগ দিবার জন্য মেদিনীপুর গেলাম। ১১ই তারিখে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, "মুক্তির উপায়" আসে নাই। আমার ব্যাকুল পত্রাঘাত-বিচলিত কবি ১৫ই তারিখে লিখিয়া পাঠাইলেন:

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার দোষ নেই। কপি করিয়ে ঠিক করে রেখেছিলুম লেখাটা—যাঁরা আমার পরিমণ্ডল, তাঁরা আরও কপি করানো কর্তব্য বোধ করলেন—যাঁরা কপি করেন তাঁরাও ক্ষিপ্রকারিতার জন্য বিখ্যাত নন। রেজেস্ট্রি ডাকে কাল রওনা হয়ে গেছে বলে অনুমান করি। লেখাটার মধ্যে সকলের চেয়ে ব্যবহার্য হচ্ছে আমার দস্তখৎ—সেইটের ছাপ দেখিয়ে ডুবো মাল যদি তোমরা চালাও বাজারে, তবে তার দায় তোমরা কবুল কোরো সাধারণের দরবারে।

ভূমিকায় পদ্মাপুলার উপরে অগুরুবনদাহনের ব্রত আরোপ করেছি—

সে অংশ তুলে দিয়ো—লোকে ভাববে বইটা প্রপাগ্যাণ্ডা—সেটা সত্য নয়। এটা বিশুদ্ধ উচ্চহাস্য।

কাব্যপরিচয়ের পরিমার্জিত রূপের জন্যে অপেক্ষা করে আছি। দ্বিতীয় খণ্ডে আদিরসের বাহনটিকেও প্রয়োজন আছে। দিলীপকুমার তাঁর কবিতার নির্বাচনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, আমি তাঁকে জানিয়েছি দ্বিতীয় সংস্করণের দায়িত্ব আমি নেব না। তোমার নাম করি নি তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। ইতি ১৫।৯।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”

২২শে তারিখে আবার জরুরি তারযোগে আহূত হইয়া শান্তিনিকেতন যাইতে হইল। “মুক্তির উপায়ে”র মহড়া চলিতেছে, দশ সেট প্রূফ লইয়া সন্ধ্যার মুখে পৌঁছিলাম। হৈ-হৈ কাণ্ড চলিয়াছে। কবি মহাখুশী। ছাপাখানায় যে এত দ্রুত কাজ হয় ইহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি নাই। সেই দিন আশ্বিনের ৫ তারিখ, পরদিন মহালয়া। ‘অলকা’ প্রকাশে আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। বিবিধ আকর্ষণ এবং কর্তার উপরোধ সত্ত্বেও ভোরের ট্রেন ধরিলাম। মহালয়ার দিনই ‘অলকা’র কাজ শেষ করিয়া প্রথম দুই কপি কবিকে পাঠাইলাম। এবারকার সাক্ষাতে সময়াভাবে ‘কাব্যপরিচয়’-প্রসঙ্গ উঠিতে পায় নাই; সুতরাং ‘অলকা’-প্রাপ্তি সংবাদের মধ্যেই সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন :

“ওঁ

কল্যাণীয়েষু

দুখণ্ড অলকা পেয়েছি। বিতরণ হয়ে গেছে। এখন ছুটির সময় আর পাঠাতে হবে না। যদি কোন কারণে পরে দরকার হয় জানাব। আশা করি তোমার পাঠকদের মেজাজ বিগড়িয়ে যায় নি।

কাব্যসঙ্কলন উপলক্ষ্যে বুদ্ধদেব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাকে ঠাণ্ডা করতে পার তো কোরো। এই বইয়ে সমর সেনের বিরহ তাকে বেজেছে। দিলীপ দুঃখিত। সুধীন্দ্র ক্ষাপা। তাদের কবিতা তাদের দিয়েই বাছাই করতে দেওয়া চলে কি না ভেবে দেখো। ইতি ২৮।৯।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”

ইতিমধ্যে কাব্যসঙ্কলন ব্যাপারে বঙ্গকবি-সাগরে সত্য সত্যই আক্ষেপ-বিক্ষেপের প্রবল আলোড়ন উঠিয়াছিল। যাঁহারা আমার গুরুত্ব কথঞ্চিৎ স্বীকার করিতেন তাঁহারা সাক্ষাতে ও পত্রযোগে, এবং যাঁহারা আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন তাঁহারা সরাসরি কবিকে নির্দেশ-উপদেশের দ্বারা জর্জরিত

করিতে লাগিলেন ; এমন কবির দাবিও আমার নিকট আসিতে লাগিল যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের একান্ত অন্তরঙ্গ অথবা আত্মীয়। দুইজন শ্রদ্ধেয় কবি-অধ্যাপক নির্বাচন-ব্যাপারে ঐতিহাসিকতা বজায় রাখিতে পরামর্শ দিলেন। আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম এবং সমুদয় মামলা হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়া 'অলকা' প্রকাশের পরিশ্রম এবং রক্তে শর্করাবৃদ্ধিজনিত নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারে বন্ধুবর ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ("বনফুল") শরণ লইবার জন্য কলিকাতায় বিজয়া সারিয়াই ৫ই অক্টোবর তারিখে ভাগলপুর পলায়ন করিলাম। ঠিকানাটা শুধু কবির গোচর করিয়া গেলাম।

রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়া কাহিনীর ধারাবাহিকতা ছাড়িয়া অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছি। ইহারই মধ্যে বনফুলের সহিত পরিচয় বন্ধুত্বের পর্যায় হইতে আত্মীয়তার পর্যায়ে উঠিয়াছে, অসহায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে একান্তভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, তারাশঙ্করও আর দূরের মানুষ নহেন। এই সকল বিচিত্র কাহিনী পরবর্তী কালের জন্য মুলতুবি রাখিয়া রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে আর একটু অগ্রসর হইতেছি।

স্থির ছিল পূজার অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলে সেখানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু হঠাৎ ৯ই অক্টোবর তারিখে ভাগলপুরের ঠিকানায় তাঁহার একখানি পত্র পাইয়া বুঝিলাম, তিনিও ক্লান্ত অবসন্ন :—

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমি পলাতকা। চলেছি পাহাড়ের দিকে। স্বভাবসঙ্গত অভ্যাসে ভুল করেছি—উল্টা বুঝেছি—গরম যখন দুঃসহ ছিল তখন শীতের সন্ধানে বেরব বলে মন স্থির করতে করতে ভাদ্দুরে গরমের ফ্রন্টিয়ারে এসে পড়েছি। আয়োজনটা যখন পাকা হয়েছে প্রয়োজনটা তখন পরিহাস করতে উদ্যত। কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে মন বদলাতে গেলে পরিচিতবর্গের পক্ষে সেটা কৌতুকজনক হবে জেনে দৃঢ়তার সঙ্গে জেদ বজায় রাখতে হোলো। কাল যাব কলকাতায়, সোমবারে যাব কালিম্পঙ।

কাব্যসাহিত্যকে আমি ইতিহাসের গণ্ডি দিতে চাইনি—আমার ও বুদ্ধি নেই। কবিতা যদি যেমন তেমন করে আসন নেয় তাতে তার রসের ক্ষতি বা মর্যাদার হানি হয় না। ওদিকে আমি চিন্তাই করি নি। এর থেকে বুঝবে আমার সঙ্কলন-কর্মের অযোগ্যতা। কোনো কোনো কবি ফরমাস করেছেন এবারে যেন আমি ভালো কবিতা বাছাই করি অর্থাৎ তাঁদের মতের অনুসরণ করি। মত কি

তা জানার সম্ভাবনা নেই, থাকলেও হয়তো মানার সম্ভাবনা আরো দুঃসাধ্য। কবি-সম্প্রদায়ের মেজাজ আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু বোধ হচ্চে দেবা ন জানন্তি। যাই হোক এখন থেকে শত হস্তেন কবিনাম্। তোমার সাহস আছে—বয়সও অল্প। এই বিপদজনক অধ্যবসায় তোমাকেই সাজবে।

ফিরে আসি তার পরে মোকাবিলায় কাজের কথার আলোচনা করব। ইতি ৭।১০।৩৮ .

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

ভাগলপুর হইতে ১২ই অক্টোবর সকালে কলিকাতায় ফিরিয়াই রাঁচী হইতে সভা-ভীরু ব্রজেন্দ্রনাথের ব্যাকুল আহ্বান শুনিলাম। আমাকে সেখানে যাইতেই হইবে। তিনি পূজার অবকাশে সেখানে গিয়াছিলেন। হিন্দু-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিত্বের গুরুভার তাঁহার কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উৎসব-ব্যসন-দুর্ভিক্ষ-রাষ্ট্র-বিপ্লব-রাজদ্বার-শ্মশানের মত সভামণ্ডপেও যে বন্ধুর সান্নিধ্য প্রয়োজন, সে কথা মানিতে হইল। 'অলকা'র স্বত্বাধিকারী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার আশ্বাস দিলেন, তিনি তাঁহার মোটরকারযোগে আমাকে রাঁচী পৌঁছাইয়া দিবেন। কালিম্পঙের ঠিকানায় 'শনিবারের চিঠি'র জন্য লেখা প্রার্থনা করিয়া কবিকে পত্র দিলাম ১৪ই তারিখে। চারি দিন পরেই খবর পাইলাম, কবি পাহাড় হইতে নামিয়া কলিকাতায় অপেক্ষা না করিয়াই শান্তিনিকেতনে গিয়াছেন, সুতরাং মোকাবিলা ফস্কাইয়া গেল। আমিও ২২শে অক্টোবর শ্রীধীরেন্দ্রনাথের গাড়ীতে রাঁচী চলিয়া গেলাম।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে আর একটু অগ্রসর হইয়া প্রসঙ্গান্তরে অবতীর্ণ হইব। ১৯৩৮ সনের শেষ পর্যন্ত এই তরঙ্গকে সীমাবদ্ধ করিয়া আমার সমসাময়িক, কিঞ্চিৎ অগ্রজ ও অনুজ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর কথায় ফিরিয়া আসিব।

ভাগলপুর হইতে ফিরিয়াই ১৪ই অক্টোবর (১৯৩৮) তারিখে 'শনিবারের চিঠি'র জন্য লেখা প্রার্থনা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র দিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার "নবজাতক" কবিতাটির উল্লেখ ছিল। এই অধুনা-প্রসিদ্ধ কবিতাটি

-মাসীমা হেমন্তবালার কন্যা শ্রীমতী বাসন্তীর প্রথম সন্তান শ্রীমান কিশোর-কান্তের জন্ম-উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। ঠিকানায় পৌছিবামাত্র তাহা আমার হস্তগত হয়। কবিতাটি রচনার তারিখ ৩০ জুলাই, ১৯৩৮। পরে (এপ্রিল, ১৯৪০) 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতারূপে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু ভ্রমক্রমে নীচে তারিখ দেওয়া হইয়াছে "১৯।৮।৩৮"। অবশ্য কাব্যগ্রন্থে দুইটি পংক্তির স্থান পরিবর্তন ও শেষ পংক্তির "এই বুঝি দিল আনি" -স্থলে "বুঝিবা দিতেছে আনি" পাঠ লক্ষণীয়। আমি সাক্ষাতে কবির নিকট কবিতাটি 'শনিবারের চিঠি'ভুক্ত করিবার প্রার্থনা জানাই, তিনি তাহা মঞ্জুর করেন। কিন্তু কেমন করিয়া জানি না, উহা তৎপূর্বেই কিশোর-পত্রিকা 'পাঠশালা'য় মুদ্রিত হইয়া যায়। কিশোরকান্তের ডাকনাম নাচন। নাতির জবানিতে দিদিমা হেমন্তবালা সম্বর্ধনা-কবিতা পাইয়া কবিকে যে পত্র লেখেন আমিই তাহা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম এবং কবিতা ও উত্তর দুইটিই একসঙ্গে ছাপিতে চাহিয়াছিলাম। 'পাঠশালা'য় "নবজাতক" প্রকাশিত হওয়াতে আমার ১৪ই তারিখের পত্রে একটু অনুযোগ করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সদ্য-আবিষ্কৃত পত্রও তাঁহার অবগতির জন্য পাঠাইয়া-ছিলাম। পত্রে বঙ্গীয়-'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র জন্যও একটি প্রবন্ধের তাগিদ ছিল।

২৪ অক্টোবর রাঁচী ভ্রমণ সমাপনান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া শান্তিনিকেতন হইতে ২১ অক্টোবর তারিখে লিখিত কবির এক দীর্ঘ পত্র পাইলাম :

"কল্যাণীয়েষু,

মস্ত একটা ছিদ্র আছে আমার রচনার ঘটে। এক দিক থেকে যা ভর্তি হয় অন্য দিক থেকে তা নিষ্ক্রান্ত হতে বিলম্ব করে না। কিশোর-কান্তর অভিনন্দন পত্রখানা কবে পৌঁছেছে গিয়ে 'পাঠশালা'য় তা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। বোধ হচ্ছে যেন নাচনের নামে হেমন্তবালা আমাকে যে পত্রখানা লিখেছিলেন সেইটের সঙ্গে জড়িয়ে কবিতাটা তুমি ছাপতে ইচ্ছা করেছিলে—তা যদি হয় তাহলে সেই প্রসঙ্গে পূর্বপ্রকাশিত কবিতা আবার প্রকাশ করলে দোষ হবে না। আমি আজ নাচনের উদ্দেশে যে পত্রখানি লিখেছি সেটা ব্যবহার করলে চক্রটা সম্পূর্ণ হতে পারবে। যে পত্র বাহনরূপে তুমি এনেছিলে আমার কাছে সেই পত্রের উত্তরটিও তোমাকে পাঠাই, তুমি যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ো। কাগজে প্রকাশ করবার পক্ষে এটা যদি কটুস্বাদ হয়ে থাকে তবে চেপে যেয়ো।

বঙ্কিমের চিঠিখানি চমৎকার। কোন এক অবকাশে কাজে লাগাতে পারব।

সাহিত্য পরিষদের জন্যে লেখা চেয়েছ। আমার পুরোনো লেখনীতে নতুন লেখা সরচে না। কী জীবনে কী রচনায় থামবার টর্মিনস লেখনী জোর করে পেরোতে গেলেই দুর্গতি ঘটায়।

'ভাষা পরিচয়ে'র ভূমিকাটা তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু ঐ বইটার 'পরে অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের। শ্যামাপ্রসাদের কাছ থেকে যদি সম্মতি নিতে পারো তা হলে বাধা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলে বোধ হয় আপত্তি হবে না।

কাব্যপরিচয় নিয়ে কবিদের মন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। চেম্বার-লেনি পদ্ধতিতে কাটা ছেঁড়া করে এই হিটলারি সম্প্রদায়ের উষ্মা নিবারণ করতে যদি পার তা হলে আমার পরিত্রাণের উপায় হবে।

মুক্তির উপায় যখন তোমাকে দিয়েছিলুম আমার মন ছিল নিষ্কাম। যদি দক্ষিণা দিতে চাও আমার নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দিলে পুণ্যলাভ করবে। ইতি

২১।১০।৩৮

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

এই চিঠির সঙ্গেই নাচনচন্দ্রের পত্রের জবাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ কৌশলে তাঁহার প্রশস্তি-কবিতা, নাচনচন্দ্রের জবাব এবং পরে তাঁহার জবাব সমগ্র ব্যাপারটিকে একটি প্রবন্ধে গ্রথিত করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন "অতি-আধুনিক ভাষা"। একটি "ভূমিকা" সংযোজিত করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"আপন সম্বলের প্রতি যে শিশু-ভোলানাথের কোনো আসক্তি নেই, আনন্দমত্ত প্রলয়লীলায় যিনি তাঁর প্রতি মুহূর্তের নৈবেদ্য প্রতি মুহূর্তেই সগর্জনে ধূলিসাৎ করে দেন, তাঁর সেই বিলুপ্তি-ভাঙের সদ্য ভাঙন নেশার প্রতি ভরসা রেখে সেই অবুঝ দেবতার অবোধ্য ভাষা সম্বন্ধে গোপনে একখানি পত্র লিখেছিলেম। শনিগ্রহের চক্রান্তে পত্রখানি ধূলির ঠিকানা এড়িয়ে পড়েছে সম্পাদকের ঝুলির ঠিকানায়। মনে আছে সংস্কৃত ভাষার একটি শ্লোকে পড়েছিলুম—চোখে যে কাজল ভূষণ, সেই কাজলই দূষণ মুখের উপরে। আমার কাজল ঠিকানাভ্রষ্ট হয়েছে আমার দোষে নয়। চোখের কালিমা যে শিশুর মুখে লাগলেও মানায়, আমার লেখা তাকেই লক্ষ্য ক'রে। আর কেউ যেন আত্মাভিমানে এর প্রতি দাবী না করেন।"

নাচনচন্দ্রের চিঠিতে ছিল, "আপনাদের ভাষায় কোন বই আমি পড়বই না। আমি নিজেই কত ভাল ভাল বই রচনা করতে পারি,…" এই উক্তিরই সুযোগ গ্রহণ করিয়া জবাবে অতি আধুনিক ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন :

"নাচনবাবু, একেবারে খাঁটি আধুনিক তুমি। পাঁজিও সেই কথা বলে, তোমার ভাষার থেকেও তার প্রমাণ পাই। এ ভাষায় শব্দ আছে যথেষ্ট কিন্তু অর্থ খুঁজে পাইনে। ভাষা যে কিছু বোঝাবার জন্যে সে দায়িত্ব বুঝি একেবারে অস্বীকার করেছ। আমি সেকেলে লোক, আমার কেমন একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, যা বলব সেটা যেন পাঁচজনে বুঝতে পারে। যেন না ভাবতে বসে আমি পাগল হয়েছি, না, তারা পাগল হয়েছে। পাঁচজনের সম্বন্ধে তোমার মনের এই দীনতা নেই—তার থেকে প্রমাণ হয় তুমি আধুনিক। যারা সাধারণ ব্যক্তি তারা অন্যকে লক্ষ্য ক'রে যা বলে তা বোঝা যায়—তুমি অসাধারণ, তুমি আধুনিক, তুমি কাকে লক্ষ্য ক'রে কী যে বলো তা যারা বোঝে তারাও তোমার মতোই অদ্বিতীয়। আমার শব্দের মধ্যে অর্থ ঢুকে পড়েছে—ওটা বয়সের দোষ। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর থেকেই এই বিভ্রাট ঘটেছে। তোমার মতোই আধুনিকতার প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলুম কিন্তু লজ্জা এসে গেছে। তোমার অজস্র ক্ষমতা আছে লজ্জা না পাবার। এর থেকে বুঝি তুমি খাঁটি। তোমার অসংলগ্ন বাক্যাবলীতে ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে যায়। আমার সাহস নেই। আজ কিছু কালের মতো তোমারি জিৎ রইল নাচনচন্দ্র—কিন্তু কাল! বলা যায় না, যদি জাতশত্রু আধুনিকতার ছোঁয়াচ তোমার ভাষায় লাগে তাহলে আমাকে লক্ষ্য ক'রে যা বলবে সেই শব্দভেদী বাণ গিয়ে পৌঁছবে একেবারে বৈতরণীতীরে। দোহাই তোমার। আমার কথার মধ্যে সহজ অর্থ খুঁজে পেয়ে তোমার মনে যদি অত্যন্ত ধিক্কার জন্মে তাহলে কথাগুলোকে উল্টে পাল্টে দিয়ো—তোমাদের কাজ চলবে। একটা নমুনা দেখাই—

কূলে গরজে। গগনে বসে আছি।
মেঘ একা। ভরসা নাহি। ঘন বরষা।

মনে হচ্চে না কি, কিছু যেন বলা হোলো, কিন্তু কী যে তা বোঝবার দরকার নেই। তোমার অভিনন্দন-পত্রে বীর হও এ আশা জানিয়েছি, কিন্তু কবি হও এ কামনা করি নি। হতে হতে হয়তো তোমার ভাষা কোথায়

গিয়ে পৌঁছবে বলা যায় না, কোন্ অকথনীয়ে কোন্ অচিন্তনীয়ে, বাক্য-কলেবরের কোন্ অসংশ্লিষ্ট অপঘাতে, তখন তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে, যেহেতু বুঝিয়ে বলার চির-প্রচলিত সংস্কারে আমি অভ্যস্ত। যেহেতু এ কালের 'পরে আমার বিশ্বাস ছিল না, আমার বিশ্বাস চিরকালের 'পরে।

পুনশ্চ নিবেদন :—আর বিশ বছর পরের তারিখের প্রতি লক্ষ্য ক'রে আমার এ চিঠি লেখা। ইতিমধ্যে তোমার কাকলী পর্ব শেষ হোক। তোমার এখনকার কলালাপ তর্জমা করবার ভার নিয়েছেন দিদিমা। কিন্তু ভুল করেছেন সন্দেহ নেই, কেন না তিনি যা ব্যাখ্যা করেছেন তার আগাগোড়া বোঝা গেল। হে আভাবিক, হে আধুনিক, এই আমার বুঝতে পারা ভাষার সহজ সীমানা থেকেই আজ তোমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে গেলুম—এর পরে সেদিন যে-কোনো ভাষায় ইচ্ছা তুমি উত্তর দিয়ো, আমার বোঝবার আর প্রয়োজন হবে না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়চে, বিনা ভাষায় নীরব চোখ মুখের আলাপ থেকে যারা প্রলাপ মথিত ক'রে তুলতে পারে, তারা নাচন নয়, তারা নাচ্‌নীর দল, তারই একটির জন্যে আবেদন জানিয়ে রাখলুম তোমার মায়ের দরবারে। হায় রে, বারবার ভুলে যাই—নাচ্‌নী আসবে কিন্তু (একটা দীর্ঘ নিশ্বাস)। ইতি ২১।১০।৩৮

সপ্তকপারবর্তী কবি"

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাঁহারা কৌতূহলী তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে, অক্টোবরের প্রথমার্ধে কালিম্পঙে অবস্থানকালে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বাংলা ভাষা সম্পর্কে আলোচনামূলক একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন। তাহারই ভূমিকার উল্লেখ তাঁহার পত্রে আছে। বলা বাহুল্য আমি শ্যামাপ্রসাদের নিকট দরবার করিয়া প্রবন্ধটি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশ করি। গ্রন্থটিও ১৯৩৮ সনের শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হয়।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, ভাষাবিষয়ক এই গ্রন্থটি সুনীতিকুমারকে উৎসর্গ করেন; সুনীতিকুমারকে দিয়া একবার আগাগোড়া যাচাই করাইয়া লইবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য-সফর লইয়া উভয়ের মধ্যে যে পত্রাঘাত চলে তাহাতে তাঁহারা পরস্পরকে এড়াইয়া চলেন ও তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন। যদিও কবি এবং ভাষাতত্ত্ববিদের সামাজিক

বিরোধে আমরাও জড়িত ছিলাম, শেষ পর্যন্ত আমিই কবির ইচ্ছার কথা সুনীতিকুমারের নিকট নিবেদন করি। তিনিও সানন্দে কবির উভয় ইচ্ছাই পূরণ করিতে চাহেন। ২৫এ অক্টোবরের পত্রে কবিকে তাহা জ্ঞাপন করিলে ২৭ তারিখে তিনি লেখেন :

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্বন্ধে কয়েক লাইন লিখে পাঠালুম।

পিওনের পদ পেয়ে পথের মধ্যে তুমি ডাক মেরেছ এ জন্যে হেমন্ত-বালার কাছে তোমার জবাবদিহী, আমার কর্তব্য আমি করেছি।

সুনীতিকে সঙ্গে নিয়ে তুমি এখানে আসবার সঙ্কল্প করেছ শুনে খুশি হলুম। ভাষা সম্বন্ধে আমার বইখানি তাঁর নামেই উৎসর্গ করচি। তাঁকে দেখিয়ে রাখব বলে অনেকদিন অপেক্ষা করেছিলুম। তিনি ছিলেন প্রবাসে। ছাপা আরম্ভ হয়ে গেছে, তবু এখনো সময় উত্তীর্ণ হয় নি। তিনি এলে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারবেন। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাবলীতে ভুক্ত হবে। আনাড়ি হাতের ভুলচুক না থাকাই উচিত। তোমাদের যখন অবকাশ এসো। বেশি সঙ্গী এনো না, বিদ্যালয় খোলবার মুখে অভিভাবকদের ভিড় হবে। ইতি ২৭।১০।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

২৯ তারিখে পূজাসংখ্যা 'অলকা'য় "মুক্তির উপায়ে"র মুক্তি উপলক্ষে কবিকে কাঞ্চনমূল্য পাঠাইলাম। পরিমাণে যৎসামান্য, সুতরাং কিঞ্চিৎ আমড়াগাছিও করিতে হইল। ৩১ অক্টোবর তারিখে জবাব আসিল, যাহাতে লজ্জিত হইতে হইল :

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

সর্বত্রই লেখা দিয়ে থাকি নিস্পৃহ ভাবে। পরিবর্তে মূল্য যদি পাই সম্মানের কথা বিচার করি নে। কেন না সে কথা বিচার করতে গেলে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দেবার আশঙ্কা থাকে। কাজ কী। অলকা থেকে যে পরিমাণ দক্ষিণা পেয়েছি সেটা সেই পরিমাণ কাজে লাগবে। ধন্যবাদ দিতে রাজি আছি তার চেয়ে বেশি পরিমাণে। তোমরা শনিবারে আসবে শুনে খুশি হলুম।

নাচনের চিঠিখানি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছ আশা করি। ইতি

৩১|১০|৩৮

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

৫ই নবেম্বর শনিবার প্রাতঃকালের ট্রেনে আমরা বোলপুরে পৌঁছিলাম। আমরা অর্থে—সগৃহিণী সুনীতিকুমার, আমি ও প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীশম্ভু সাহা। বিভিন্ন ভাবে ও পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের চিত্রগ্রহণই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের হইল ফাল্তু লাভ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানাভাবে আমরাও চিরদিনের জন্য ধরা পড়িলাম। আমাদের সুধাকান্তদা অর্থাৎ রবীন্দ্র-সচিব শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরীও সটাক আমাদের মধ্যে শোভিত হইলেন। চিত্রগুলি আজও পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, ইহাই এগুলির বিশেষত্ব।

এই যাত্রায় দুই দিন মাত্র শান্তিনিকেতনে ছিলাম, কিন্তু প্রায় সর্বক্ষণ কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়া মনে হইয়াছিল যেন দীর্ঘকাল তাঁহার কাছে আছি। দেশ-বিদেশের সাহিত্য সমাজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কত বিচিত্র কথা, ভাষাতত্ত্বের কত জটিল এবং কৌতুকপ্রদ আলোচনা, অপূর্ব রসিকতা ও রহস্যকথায় আমার এই দুই দিনের দিনলিপি ভারাক্রান্ত হইয়া আছে—শেষের কয়েকটি ফসল সুধাকান্তদার কল্যাণে সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছিল।

কবি বলিলেন, সুধাকান্ত, তোমার টাক যে দিনে দিনে প্রশস্ততর হচ্ছে, ওটার একটা ব্যবস্থা কর। সুধাকান্ত তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, আজ্ঞে ওটা পৈতৃক। কবিও তৎপরতার সঙ্গে পাল্টা জবাব দিলেন, পৈতৃক যখন তখন শিরোধার্য নিশ্চয়ই।

কবির প্রীত্যর্থে সঙ্গে সেন মহাশয়ের সন্দেশ লইয়া গিয়াছিলাম, আস্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, দেখ হে, বল্লালসেনের কথা বাদই দিচ্ছি, দাওয়ান রামকমল সেন ও তস্য নাতি কেশবচন্দ্রের যুগও কেটে গেছে, দীনেশচন্দ্র সেন পুরাতন বাংলা-সাহিত্যের সন্ধান করতে করতে পুরনো হয়ে গেলেন, শেষ পর্যন্ত সন্দেশেও সেন! বাংলা দেশে সেন-রাজত্বের অবসান কখনই হবে না।

দক্ষিণ-ভারতীয় এক নাছোড়বান্দা ভক্ত আসিয়াছিলেন, কবির সহিত সাক্ষাতের পর তিনি কিছুতেই উঠিবার নাম করেন না। কবি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে লালের আভা ক্রমশই গাঢ়তর হইতেছে। সুধাকান্তদা প্রমাদ গনিয়া বহু কৌশলে ভদ্রলোককে অপসারিত করিলে কবি হাসিয়া বলিলেন, দক্ষিণভারতের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় মন্দিরগুলির বিপুলায়তন গোপুরম্ বা তোরণের অর্থ এতদিনে

বুঝতে পারছি। দরজা থেকেই ভক্তদের বিদায় করার অভিপ্রায় দেবতারও হয়।

আমার সহিত একান্তে 'বাংলা কাব্য পরিচয়'কে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘ আলোচনার পর কবি সর্বশেষে হতাশা প্রকাশ করিলেন। নানা অন্তর্ঘাতী কারণে তাঁহার মন যে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম। বেশী বাধা তাঁহার অন্তরঙ্গমহল হইতেই আসিতেছিল। আমি জানাইলাম, বাংলা-কাব্যের আদি ও মধ্যযুগের নির্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে, অন্ত্যযুগও সমাপ্ত-প্রায়। সকল নির্বাচনই তাঁহার সহিত পরামর্শক্রমে তাঁহার সম্মতিতে হইতে-ছিল। পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হইতে বিশেষ বিলম্ব ছিল না।

'বাংলা ভাষা-পরিচয়' সম্পর্কিত সকল কাজ চুকিয়া গেলে আমরা সদলবলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। 'মুক্তির উপায়ে'র মহড়া তখনও চলিতে-ছিল, মঞ্চস্থ হইবার কালে আমি তাহা দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিলাম। ফিরিবার পর সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হইতেই ১১ই নবেম্বর তারিখের এই পত্রটি ঠিকানা বদল হইয়া মোহিতলাল মজুমদারের বরাবর পৌঁছিল। আমি ১১ই তারিখেই ঢাকায় রওয়ানা হইয়াছিলাম।

"কল্যাণীয়েষু

রঙ্গমঞ্চে 'মুক্তির উপায়ে'র মুক্তি সাধন ঘটল না। প্রয়োগকুশল নটের অভাব।

কাব্য পরিচয়ের আদ্য এবং মাধ্যদের শ্রাদ্ধ সমাধা হয়ে গেছে—সুতরাং তাঁরা অশান্তি ঘটাবেন না। অন্ত্যরা ভয়াবহ। আমি শান্তি-প্রয়াসী, খর রসনার আস্ফালনে ভীত। সাহিত্যে অত্যন্ত যাঁরা প্রত্যন্ত-দেশীয় তাঁরাও আমাকে ভয় করেন না। সেই জন্যেই অন্ত্যবর্গের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ভার তোমারই উপরে। তোমার চর্মে খরনখরের প্রখরতা প্রতিহত হবে জানি। কবির দল বরযাত্রদলের মতো, সংকলনকর্তা কন্যাকর্তার সমপর্যায়ের। মাথা হেঁট করেও বোধ হয় তুষ্টিসাধন করতে হবে। তাই বলে মাথা ধুলোয় লুটিয়ো না। এই অনুষ্ঠানে হিটলার চেম্বারলনী পালার সাহিত্যিক রূপ দেখতে পাব আশা করচি। অর্থাৎ নিজের মানহানি করেও যতটা পার সব দাবীই মেনে চলতে হবে না। কিন্তু তাঁরা যাঁদের চার্চিল কৃপার বলে ত্যাজ্য করতে চান তর্জনের ভয়ে তাঁদের বর্জন করাটা অবৈধ হবে। এ গ্রন্থে রবাহূত অনাহূতদেরও যথাসম্ভব পাত পেড়ে দেবার আমি পক্ষপাতী। যাই হোক এবার যে লড়াই হবে আমি দূর থেকে তাই দেখব—তাতে কৌতুক আছে। ইতি ১১।১১।৩৮

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

ঢাকায় পৌঁছিয়াছিলাম ২৬ কার্তিক। ঠিক ১৫ দিন পূর্বে ১১ই কার্তিক তারিখে মোহিতলালের পঞ্চাশত্তম জন্মদিন গিয়াছে। সেই উপলক্ষে ঘটা করিয়া আনন্দোৎসব করা গেল। সেই আনন্দের দিনেই ব্যথিত-বিস্ময়ে অনুভব করিলাম কবি ও সাহিত্যিক মোহিতলালের দেহে ও মনে একটা নিদারুণ অবসাদ নামিয়া আসিতেছে। যে সাহিত্যব্যাপারে তাঁহার উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত ছিল না, এবারে তাহাতেই তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উদাসীন দেখিলাম। যাঁহার সত্যশিবসুন্দর-মন্ত্র, যাঁহার সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আমাদের নিরুদ্দেশ সাহিত্যযাত্রার দিগ্‌দর্শক ছিল তাঁহাকে বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ ও আস্থাহীন দেখিয়া মন দমিয়া গেল। ঠিক এই সময় হইতেই তিনি সাহিত্যের অবাধ মুক্ত আকাশ হইতে ডানা গুটাইয়া বাঙালীয়ানার কোটরে আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলেন। ভূদেব-বঙ্কিম-ব্রহ্মানন্দ-বিবেকানন্দ-ব্রহ্মবান্ধব হইলেন তাঁহার ধ্যানের বিষয়, শেষ পর্যন্ত এই মনোভাবেরই পরিণতি ঘটিয়াছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ধ্যানে। তিনি বাস্তব, কংক্রীট, রক্তমাংসের দেহধারী দেবতাকে খুঁজিতেছিলেন; গান্ধীজীর অহিংসা ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম তখন হইতেই তাঁহার নিকট বিস্বাদ ও অবাস্তব বলিয়া ঠেকিয়াছিল। এই পঞ্চাশৎ জন্মদিন উপলক্ষে তিনি যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহার আরম্ভ এইরূপ—

> "আয়ু-বিহঙ্গ মেলিয়াছে পাখা অর্ধশতক আগে,
> অসীম শোভার সৃষ্টির 'পরে উড়িয়াছে দিন রাত;
> আজি সে ক্লান্ত, পক্ষে তাহার জরার জড়িমা জাগে,
> নয়ন মুদিয়া দিবস-নাথেরে করিতেছে প্রণিপাত।"

১৬ই নবেম্বর ঢাকা হইতে ভারাক্রান্ত চিত্ত লইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। ফিরিয়াই 'শনিবারের চিঠি' ও 'অলকা'র টানাহ্যাঁচড়ার মধ্যে পড়িলাম। 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে'র পাণ্ডুলিপি ডিসেম্বরের গোড়াতেই প্রেসে যাইবার কথা। তাল লইয়াও কম খাটুনিতে পড়িতে হইল না। এই সম্পর্কে ২৯ নবেম্বর শান্তিনিকেতন হইতে লিখিত কবির শেষ চিঠি পাইলাম ৩০ নবেম্বর—সঙ্গে একজন আধুনিক কবির একটি দীর্ঘ পত্রও ছিল :

"সজনীকান্ত,

কাব্যপরিচয়ের দ্বিতীয় দেহান্তর কাল কতদূরে। পত্রখানি তোমার দৃষ্টি জন্য পাঠাই। তোমাদের কাজ শেষ হবে কিন্তু পত্রের পথ বন্ধ হবে না।

সুফিয়া হোসেনের কবিতার বই সম্প্রতি হাতে পড়ল। বিশেষ সমাদরের যোগ্য সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ”

ইহার পরদিনই তাঁহারই এক আত্মীয় কবির নামাঙ্কিত একটি চতুর্দশপদী কবিতা স্বহস্তে নকল করিয়া পাঠাইলেন। কবিতাটি স্বয়ং কবিগুরুর রচনা হইলেও দোষের হইত না—এত ভাল। আমি তাহা পাণ্ডুলিপির যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া তৎসহ বিশ্বভারতী আপিসে দর্শন দিলাম। কিশোরীমোহন সাঁতরা তখন সেখানে প্রকাশনী বিভাগের কর্মকর্তা। পাণ্ডুলিপি তাঁহার জিম্মা করিয়া দিয়া হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিলাম। সেটা ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ। তাহার পর পূরা সতরো বৎসর কাটিয়া গেল, আজও ‘বাংলা কাব্য-পরিচয়ে’র নব দেহান্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি। কয়েক দিনের মধ্যেই কবির সহিত দেখা হইয়াছিল, তিনি নিজেই উক্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন, লাল ফিতা খুলতে সময় লাগে হে। যাক, আমরা তো ধর্মের নামে খালাস।

এখান হইতে আমি আবার ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ‘বঙ্গশ্রী’র আমলে ফিরিয়া যাইব। রামকমল সিংহ ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও উৎসাহে আমি এই বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কার্য-নির্বাহক-সিমিতির সভ্যরূপে অর্থাৎ সেবকরূপে প্রবেশাধিকার লাভ করি।

সপ্তম তরঙ্গ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

১৯২১ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯ ভাদ্র ১৩২৮ রবিবার আমি সম্পূর্ণ রবাহূত ভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে প্রবেশ করি। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, তবু দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। পূর্ববর্তী ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জীবনের ষাট বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু উৎসবের দিনটিতে তিনি সুদূর পশ্চিমে প্রবাসী ছিলেন। ইউরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন ১৯২০ সনের ১১ই মে, শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন চোদ্দ মাস পরে অর্থাৎ ১৯২১ সনের ১৮ই জুলাই। কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পর তখন মাহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগের ডামাডোল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অসহযোগ-আন্দোলনের মধ্যে কূপমণ্ডুকতার

আভাস পাইয়া বিশ্বভারতী-স্থাপনেচ্ছু কবির চিত্ত বিক্ষুব্ধ। মাসাধিক কালের মধ্যেই তিনি "শিক্ষার মিলন" ও "সত্যের আহ্বানে" তাঁহার আশঙ্কাজনিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন। উত্তেজনার মুখে মানুষ ও মনুষ্য সমাজের প্রতি বিমুখ হইয়া কবি প্রকৃতির রহস্যনিকেতনে সান্ত্বনা খুঁজিলেন। গানের পর গানে "বর্ষা-মঙ্গল" উৎসব সেই প্রথম আরম্ভ হইল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। বিলম্বিত ষষ্টিতম জন্মদিবস এবং দীর্ঘ প্রবাস বাসের পর নির্বিঘ্নে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দুই ঘটনাকে জড়াইয়া পরিষৎ সদ্যবিশ্বজয়ী কবিকে অভিনন্দিত করিলেন ওই ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে। বি. এস-সি. ক্লাসের ছাত্র হইলেও তখনই সাহিত্য আমার নিশীথ-রাত্রির স্বপ্ন ছিল। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হইয়া সভয়ে ও কম্পিত বক্ষে পরিষৎ-মন্দিরের তোরণদ্বার সেই দিন প্রথম অতিক্রম করিলাম। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে রাজনৈতিক নেতাদের বিপুল ও বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়াছিলাম। এই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সাহিত্য-রথীদের একত্র দেখিলাম। কবিগুরুকে কেন্দ্র করিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাহচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিত-লাল মজুমদার—মহানগরীর সকল সাহিত্যিকই সমবেত হইয়াছিলেন, শুধু শরৎচন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে না। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের রচিত সভায় পঠিত কবিতার ও গীত গানের একটি মুদ্রিত সঙ্কলন 'রবীন্দ্র-মঙ্গল' সভায় বিতরিত হইয়াছিল। একখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলাম। নূতন সাহিত্যের প্রথম আহৃত সম্পদ হিসাবে সেটি আজিও আমার ভাণ্ডারে মজুত আছে। সেই দিন পরিষদের প্রধান বৈতনিক কর্মকর্তা রামকমল সিংহকে চিনিয়া রাখিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম দূর সম্পর্কে তাঁহার সহিত আমাদের আত্মীয়তা আছে।

প্রথম সন্দর্শনেই পরিষৎ-মন্দিরকে ভাল লাগিয়াছিল এবং ঘনিষ্ঠ হইবার কল্পনাও মনে জাগিয়াছিল—যদিও বিজ্ঞানের উপর নির্ভর তখনও অটুট ছিল। কয়েক বছর পূর্বে দিনাজপুরের কাছারি-সংলগ্ন ময়দানে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের এক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম; কৌতুক ছিল যথেষ্ট কিন্তু কৌতূহল ছিল না। খাঁটি সাহেবী পোশাক পরিহিত মোটাসোটা প্রশস্ত টাক সম্বলিত এক ভদ্রলোক স্বরচিত একটি সুদীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন, শুনিতে বেশ ভাল লাগিয়াছিল। পরে জানিয়াছিলাম তিনি স্ট্যাটুটারি সিভিলিয়ান বরদাচরণ মিত্র। তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনি-গাম্ভীর্য ও ললিতছন্দ কবিতা-আবৃত্তিতে আমার প্রেরণা জোগাইয়াছিল এই

মাত্র। সেই সাহিত্য-সম্মেলন সাহিত্য ব্যাপারে আমার ঔৎসুক্য সঞ্চার করিতে পারে নাই। কিন্তু পরিষদের রবীন্দ্র-অভিনন্দন-সম্মেলন আমাকে যে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহার প্রমাণ, সেই রাত্রেই সেই রবীন্দ্র-বন্দনাটি রচনা করিয়াছিলাম যাহা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে প্রথম শ্রদ্ধার্ঘরূপে পত্রযোগে নিবেদন করিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছিলাম।

কিন্তু যে শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে প্রথম দর্শন প্রেমে স্ফূর্তিলাভ করে ছাত্র জীবনের ঘন ঘন পরিবর্তনশীল স্রোতের আবর্তে তাহা রচিত হয় নাই। কলিকাতা হইতে কাশী এবং কাশী হইতে পুনরায় কলিকাতা—ঝড়ের পাখী নীড়ের আশ্রয় পায় নাই। শেষ পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'র আশ্রয় মিলিল বটে কিন্তু তাহাও স্থির নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হইল না। সাহিত্যিক গবেষণার বাসনা হৃদয়ে জাত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইল। 'প্রবাসী'র স্থির আশ্রয় যখন পাইলাম তখন একদিন সহসা বীরভূমের সাহিত্যিক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয় ঘটিল। ১৯২৬ সনের শেষ—তিনি 'বীরভূম বিবরণ' দুই খণ্ড শেষ করিয়া তৃতীয় খণ্ডে হাত দিয়াছেন। আমি শান্তিনিকেতন-সন্নিহিত রাইপুরের লোক; তিনি আমার উপর "শান্তিনিকেতন কথা" অংশ লিখিবার ভার দিলেন। লিখিতে গিয়া গবেষণায় শান পড়িল। ছেলেবেলায় ইস্কুলে পড়িতে পড়িতেই খুব মন দিয়া মহাজন-পদাবলী পড়িয়াছিলাম। কেহ বলিয়া দেয় নাই—সম্পূর্ণ নিজের খেয়ালেই কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়িবার সময় বর্ধমান বীরভূম জেলায় প্রাচীন পুথি সংগ্রহের কাজেও একবার বাহির হইয়াছিলাম। সংগ্রহের মধ্যে একটি দুষ্প্রাপ্য পুথি ছিল—বিভিন্ন মহাজনের পদাবলীর সঙ্কলন। পুথিটির বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক পৃষ্ঠার শিরোনামায় নকল করার তারিখ লিপিবদ্ধ আছে। তারিখ দৃষ্টে নিঃসংশয়ে বলা যায় ইহাই প্রাচীনতম পদাবলী সংগ্রহের পুথি। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহাদের প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণায় এই পুথির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। সুকুমারবাবু তাঁহার ব্রজবুলি-বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত) ইহাকে "দাস ম্যানাস্ক্রিপ্ট" আখ্যা দিয়াছেন ও ইহার এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়াছেন। এ হেন মূল্যবান পুথি লইয়া কিছু কাজ করিবার ইচ্ছা হরেকৃষ্ণদার সহিত আলাপের ফলেই চিত্তে জাগ্রত হয়। প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সাহায্য প্রয়োজন হয়—রামকমল সিংহের কথা তখন মনে পড়িয়া যায়।

রামকমল সিংহের মত বাংলা-সাহিত্যের নিঃস্বার্থ প্রেমিক আমি আর

দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না; রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাইতে আজীবন দূতিয়ালি করিয়াই কাটাইয়াছেন, নিজের কথা কখনই চিন্তা করেন নাই। তিনি নিজে লেখক ছিলেন না, সাহিত্যিক তাঁহাকে বলা যায় না, অথচ সাহিত্যিকদের রচনা ও গবেষণার কাজে সহায়তা করিবার জন্য সদাসর্বদা উন্মুখ হইয়া থাকিতেন। কোনও অসুবিধার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলেই হইল, যেখান হইতে হউক, যেমন করিয়া হউক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ অথবা পুথি তিনি হাজির করিয়া দিবেন, এবং বারংবার হাজিরা ও তাগিদ দিয়া লেখককে উৎসাহিত করিবেন। বর্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের যাদুঘর এবং পুস্তক ও পুথিশালার বহু সম্পদ তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে। সন্ধান পাইলেই হইল, বনজঙ্গল গ্রামগ্রামান্তর অতিক্রম করিয়া বর্ষা কাদা ধূলা গরম মশকদংশন গ্রাহ্য না করিয়া রামকমল সিংহ ছুটিয়া যাইতেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য কৌশলে প্রার্থিত বস্তু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে সমৃদ্ধ করিতেন। যাহার সহিত যাহার যোগাযোগ ঘটাইলে বাংলা-সাহিত্যের উপকার হইবে বলিয়া তিনি বুঝিতেন তাহার সহিত তাহার যোগাযোগ ঘটাইয়া তবে ছাড়িতেন; ঘটকালির কাজে তাঁহার উৎসাহের অবধি ছিল না। রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, হীরেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ, সারদাচরণ, জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রফুল্লচন্দ্র, যদুনাথ প্রভৃতি পরিষদের চিন্তা-নায়কদের কথা আমাদের যেমন স্মরণীয় তেমনই কর্মী হিসাবে ব্যোমকেশ মুস্তফী ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের নামের সঙ্গে রামকমল সিংহের নামও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ক্রমবর্ধমান প্রসার ও প্রসিদ্ধির সহিত জড়াইয়া স্মরণ করিতে হইবে। ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র রামকমলই লেখনী-উপকরণ ব্যতিরেকেই শুধু প্রাণের তাগিদে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর নিরলস সেবায় পরিষদের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আলেখ্য বা মর্মরমূর্তি পরিষৎ-মন্দিরে স্থাপিত হয় নাই কিন্তু তাঁহার প্রেম ও শ্রদ্ধার স্পর্শ মন্দিরের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। যাঁহারা তাঁহার সহিত কাজ করিয়াছেন এবং বাণীসেবার কাজে তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের হৃদয়-মন্দিরে রামকমল সিংহের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে।

আমি এই দলের একজন। গবেষণার কাজে আমার প্রত্যক্ষগুরু ব্রজেন্দ্রনাথও এই রামকমল সিংহের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি গোড়ায় ছিলেন নিছক ইতিহাসের লেখক—আচার্য যদুনাথ সরকারের অন্তরঙ্গ ছাত্র। ইতিহাস-চর্চা করিতে করিতে পুরাতন বাংলা নাটক সম্পর্কীয় একটা ঝগড়ায় জড়াইয়া পড়েন। তাঁহাকে উপকরণ জোগাইবার

কাজে রামকমল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগাইয়া আসেন। তখন ব্রজেন্দ্রনাথ পরিষদের কেউ নন। রামকমল সিংহের নিঃস্বার্থ সেবা তাঁহাকে ধীরে ধীরে পরিষদের গণ্ডীর ভিতর টানিয়া আনে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে একান্ত পরিষৎ-গত-প্রাণ করিয়া তোলে।

যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম। মৎসংগৃহীত পুথিখানি লইয়া রামকমল সিংহের সাহায্যপ্রার্থী হওয়া মাত্র তিনি পদাবলী-সাহিত্যের যাবতীয় উপকরণ আমার নিকট হাজির করিয়া দিলেন। পুথিটি অতি প্রাচীন অক্ষরে লেখা, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালের নকল। অক্ষর আয়ত্ত করিয়া সমগ্র পুথিটি নকল করিতে বেশীদিন লাগিল না। তাহার পর বিভিন্ন পদ ও পদ-কর্তাদের লইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একটার পর একটা ভাগ্য বিপর্যয়ে পদাবলীর মহাজনদের ছাড়িয়া চোটাসুদের মহাজনদের কবলে পড়িলাম; রাধাকৃষ্ণের ছন্দোবদ্ধ লীলা পুথির পাতাতেই বদ্ধ রহিল।

'বঙ্গশ্রী'র আমলে পুরাতন পুথি আবার খুলিবার অবকাশ পাইলাম অর্থাৎ একদিন ব্রজেন্দ্রনাথ সমভিব্যাহারে রামকমল সিংহ আসিয়া হাজির হইলেন। হুকুম হইল আমাকে শুধু পরিষদের সভ্য নয়, সেবকও হইতে হইবে। তখন অবস্থার সুসার হইয়াছে; সম্পাদকের অধিকারে সমালোচনার অজুহাতে অসংখ্য সদ্যপ্রকাশিত বাংলা পুস্তকের মালিকও হইয়াছি। 'বঙ্গশ্রী' আপিসেই সেগুলি একটি র‍্যাকে থরে থরে সজ্জিত ছিল। রামকমল সিংহের পরিষৎ-পক্ষের লোলুপ দৃষ্টি সেগুলির উপর পতিত হইল, ফলে অচিরাৎ একটি ছ্যাকড়া গাড়িতে ভর্তি হইয়া সেগুলি পরিষৎ-মন্দিরে চালান হইয়া গেল। আমিও পরিষদের সক্রিয় সভ্য হইলাম। অর্থাৎ সভ্য ছিলাম, এইবারে কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হইলাম। ইহা ১৯৩৩ সনের (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) ঘটনা। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ আমার একটি ক্ষুদ্র জীবনী লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:

> "**বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ:** পরিষদের সক্রিয় সেবায় আমিই বোধহয় সজনীকান্তকে প্রথম অনুপ্রাণিত করি। আমারই অনুরোধে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের আজীবন-সদস্য পদ গ্রহণ করেন (১৬ আষাঢ় ১৩৪১)। গত ১৭ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি পরিষদের সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইহার হিসাব।

১৩৪০-৪৪, ১৩৪৮-৫১ : কার্যনির্বাহক সভার সভ্য

১৩৪৪-৪৬ : গ্রন্থাধ্যক্ষ

১৩৪৬-৪৭ : পত্রিকাধ্যক্ষ

১৩৫২-৫৫ : সম্পাদক

১৩৫৬-৫৭ : সহকারী সভাপতি”

১৩৫৮ সালে আমি সভাপতির পদে নিযুক্ত হই এবং আজ পর্যন্ত অর্থাৎ বিগত চারি বৎসর সভাপতি হিসাবেই পরিষদের সেবা করিতেছি।

অনুপ্রাণনার ব্যাপারে ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত রামকমল সিংহও ছিলেন। তবে ব্রজেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব—তিনি আমাকে প্রাচীন সাহিত্য হইতে একেবারে আধুনিক সাহিত্যের গবেষণায় উত্তীর্ণ করিয়া দেন। কাহিনীর সূত্রপাত এইরূপ :—

১৩৪০ বঙ্গাব্দের কথা। ব্রজেন্দ্রনাথ রামমোহন রায় লইয়া গবেষণা করিতে করিতে তর্কবিতর্কের ঘোর জালে আবদ্ধ হন। তর্কের একটা বিষয় রামরাম বসু। তৎকাল-প্রচলিত ধারণা এই ছিল যে, রামমোহন রামরাম বসুর গুরু ছিলেন; ‘লিপিমালা’র প্রারম্ভে রামরাম যে এক-ঈশ্বরের প্রশস্তি করিয়াছেন তাহা রামমোহনেরই প্রভাবে ঘটিয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রচলিত মতের বিরোধী ছিলেন কিন্তু তাঁহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ ছিল না। ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের নথিপত্র হইতে তিনি এইটুকু মাত্র জানিতে পারিয়াছিলেন যে রামরাম রামমোহন অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং রামমোহন যখন নিতান্ত কিশোরবয়স্ক, রামরাম তখনই চেম্বার্স, টমাস প্রভৃতি জাঁদরেল জাঁদরেল সাহেবদের চরাইয়া খাইতেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ আমাকে অনুরোধ করিলেন—শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত কাগজপত্র হইতে রামরাম বসু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতে। আমি উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। শ্রীরামপুর কলেজের মিশনারি সাহেব কর্তৃপক্ষ প্রভূত উদারতা দেখাইয়া আমাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সন্ধান করিতে করিতে এমন সব সম্পূর্ণ নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে লাগিলাম যে আমাকে নেশায় পাইয়া বসিল। এক নাগাড় প্রায় ছয় মাস এই ভাবে সপ্তাহে দুই-তিন দিন যাতায়াত করিতে লাগিলাম। সকাল নটায় আহার করিয়া শ্রীরামপুর রওয়ানা হইতাম, রাত্রি আটটায় ফিরিতাম। পুরাতন ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ছাপা বই, কালি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, পরকলা কাচের সাহায্যে বহুকষ্টে তাহার পাঠ উদ্ধার, উইলিয়ম কেরীর লেখা পলিগ্লট ডিকসনারির পাণ্ডুলিপি, টমাস কেরী ওয়ার্ড মার্শম্যানের চিঠিপত্র ও জার্নাল প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে শুধু রামরাম-রামমোহন নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিধুরন্ধরদের প্রায় সকলেরই অনেক অজ্ঞাত সংবাদ পাইতে

লাগিলাম। আমার 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' গ্রন্থের উপকরণ তখনই অধিকাংশ সংগৃহীত হইল। একদিন নির্মলদাকে অর্থাৎ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুকে সঙ্গে লইয়া অনেক দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্রও তুলাইয়া লইলাম। সেগুলির প্রত্যেকটিই আমার বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়িল। সম্পূর্ণ বিস্মৃত রামরাম বসুর একটা মোটামুটি পরিচয় আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। সে পরিচয় একজন মতলববাজ বিষয়ী লোকের। ইংরেজীতে যাহাকে "আনস্ক্রুপুলাস" বলে রামরাম ছিলেন তাই। খাঁটি হিন্দু হইয়াও তিনি পয়সার খাতিরে খ্রীস্টমহিমা প্রচার করিতেন, এবং হিন্দুদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছড়া কাটিয়া ও কঠিন কঠিন গালিসমন্বিত পয়ার ত্রিপদী রচনা করিয়া এমন ভাব দেখাইতেন যে সাহেবেরা (টমাস কেরী প্রভৃতি) আনন্দে ডগমগ হইতেন। কিন্তু "দি লাফ দি লাফ" করিতে করিতে লাফ আর তিনি দেন নাই, তাঁহার ঠকামিতে বিভ্রান্ত টমাস শেষ পর্যন্ত পাগলই হইয়া গেলেন। এমন একটি চৌকস লোক রামমোহনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিলে রামমোহনকেই গালি দেওয়া হয়।

আমার সংগৃহীত উপকরণ লইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ 'বঙ্গশ্রী'তে রামরাম বসুর উপর প্রবন্ধ লিখিলেন এবং পরে সাহিত্যসাধক চরিতমালায় তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমিও ব্রজেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা মারফত বাংলা সাহিত্যের গবেষক হইয়া পড়িলাম।

এই অনুসন্ধানের কালে আমি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়ম কেরী ও তৎপুত্র ফেলিক্স কেরী সম্বন্ধেও অনেক প্রচলিত ভ্রান্তি অপনোদন করিতে পারিয়াছিলাম। চিলে কান লইয়া গেল রবে নিজের কানে হাত না দিয়া চিলের প্রতি ধাবমান হওয়ার মূর্খতা দীর্ঘকাল বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে দেখাইয়া আসিতেছিলেন। বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ইংরেজীনবীস কাশীপ্রসাদ ঘোষ কবে রব তুলিয়া দিয়াছিলেন (ইংরেজীতেই) যে, মৃত্যুঞ্জয় জঘন্য বাংলা লিখিতেন। পরবর্তীকালে তাঁহার কথাই মানিয়া লওয়ার রেওয়াজ চলিতেছিল—লেজ তুলিয়া কেহ আর দেখেন নাই। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক 'বক্তৃতা'য় অকারণ মৃত্যুঞ্জয়ের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিয়াছেন, রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'প্রস্তাবে' ন্যায়-বিচার করেন নাই। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথও কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষে প্রথম সক্ষম প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। তিনি বাল্যকালে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' পড়িয়া থাকিবেন, তাহা হইতে চলতি বাংলার একটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া তিনি দেখাইলেন মৃত্যুঞ্জয়ই চলতি বাংলার প্রবর্তক, টেকচাঁদ এবং হুতোমের অগ্রজ তিনি। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ও মৃত্যুঞ্জয়ের দুর্গতির আসল কারণটি দেখান নাই। আমিই সর্বপ্রথম দেখাইলাম যে মৃত্যুঞ্জয়—জন ক্লার্ক মার্শম্যানের ভাষায় "জ্ঞানদৈত্য মৃত্যুঞ্জয়"—বাংলা ভাষায় কত রকম রীতিতে লেখা যাইতে পারে তাহারই পরীক্ষা চালাইয়াছিলেন। চলতি, দুর্বোধ্য, গদ্যছন্দোবদ্ধ, সরল, সাধু যাবতীয় পদ্ধতির দৃষ্টান্ত তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব ছাত্রদের জন্য 'প্রবোধচন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন—১৮১৩ সনে। "কোকিল-কলালাপবাচাল" বাক্যটি দুরূহতম স্টাইলের নমুনা হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। এই দৃষ্টান্তই তাঁহার কাল হইল। বিশেষকে সাধারণ ধরিয়া, দৃষ্টান্তকে মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব রচনারীতি কল্পনা করিয়া যে নিন্দার বান ডাকিল, শ্রীবিনয়রঞ্জন সেনের (তদানীন্তন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর) মধ্যস্থতায় ঝাড়গ্রামরাজ শ্রীনরসিংহ মল্লদেবের প্রদত্ত অর্থে মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পূর্ণ রচনাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ ও আমি দীর্ঘ এক শতাব্দী পরে তাহা রোধ করিলাম। ওই গ্রন্থের ভূমিকায় আমি স্টাইল-বিশারদ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের যথার্থ রূপটি ফুটাইয়া তুলিলাম। কট্টর প্রমাণের জোরে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয়ের যথার্থ স্থান নির্ণীত হইল।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের যতগুলি শাখা ছিল ও আছে তন্মধ্যে অধুনামৃত রংপুর শাখাকে বাদ দিলে মেদিনীপুর শাখাই সর্বাধিক জীবন্ত ও সক্রিয়। স্বর্গীয় কবি ক্ষিতীশ চক্রবর্তী ও বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমবায়-সচিব শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়ের উদ্যোগে ও অক্লান্ত চেষ্টায় এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মেদিনীপুরবাসীদের আর্থিক বদান্যতায় এই শাখা মেদিনীপুর বীরসিংহের সিংহশিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন সমগ্র বঙ্গদেশের তাহা গৌরবের বিষয়। শাখা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্য করিয়া বৎসরে বৎসরে মেদিনীপুর শহরে দুইদিন ব্যাপী যে সাহিত্য-সভা বসে তাহা স্থানীয় সাহিত্য-রসিকদের উৎসাহে উদ্দীপনায় সজীব ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। রামকমল সিংহ মেদিনীপুরবাসী না হইয়াও এই সকল সাহিত্য-ব্যাপারে কর্মকর্তাদের অন্তরঙ্গ সহায়ক ছিলেন। তিনিই ব্রজেন্দ্রনাথ ও আমাকে মেদিনীপুরে লইয়া যান এবং মেদিনীপুরবাসীর যাবতীয় সাহিত্যিক শুভ কর্মে আমরা সহযোগী হইবার গৌরব অর্জন করি।

১৯৩৭ সনের ২৯ জুলাই (১৩ শ্রাবণ, ১৩৪৪) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

মৃত্যুতিথি স্মরণে জন্মস্থান বীরসিংহে সভা ; আমি সভাপতি নির্বাচিত হইলাম। ঘটক রামকমল সিংহ ও বন্ধুবর সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সঙ্গে গেলেন। নিদারুণ বর্ষা। মেদিনীপুর হইতে প্রায় ষাট মাইল মোটরে, বাকি দুই তিন মাইল তখন কাঁচা রাস্তা ছিল। কাদায় এবং জলে প্রায় দুর্গম। মাঠ ভাঙিয়া হাঁটু পর্যন্ত কাদা মাখিয়া বহু কষ্টে কিঞ্চিৎ বিলম্বে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দেখি, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মহামান্য বি. আর. সেন সভা আলো করিয়া সভাপতিপদে আসীন আছেন, সভা শেষ হয় হয়। ক্ষিতীশদা ও চিত্তরঞ্জন ক্ষেপিয়া গেলেন। ঘোষণা করিলেন, নির্বাচিত সভাপতি অর্থাৎ আমাকে লইয়া নূতন করিয়া সভা বসিবে। শ্রীবি. আর. সেন যখন পূর্ণাঙ্গ বঙ্গের প্রচারবিভাগের অধিকর্তা ছিলেন তখন বিদ্রোহীদের রাজভক্ত করিবার কাজে সাহিত্যিক এবং দৈনিক ও মাসিক পত্রের সম্পাদকদের বশীভূত করিতেছেন এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া আমি 'শনিবারের চিঠি'তে কিঞ্চিৎ বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাই হয়তো আমার সভাপতিত্ব তাঁহার পছন্দমাফিক হয় নাই। তিনি সভা ভঙ্গ করিয়া জলযোগের জন্য একটু অন্তরালে গেলেন। শাখা-পরিষদের কর্মকর্তারা আমাকে জোর করিয়া তাঁহার শূন্য সিংহাসনে বসাইলেন এবং আমি ষোল পৃষ্ঠা মুদ্রিত অভিভাষণ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই নজরে পড়িল জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট স্বদলবলে সভায় আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন ও নিবিষ্টমনে আমার ভাষণ শুনিতেছেন। জনবিরল স্থানে স্মৃতিমন্দিরের পিছনে অযথা অর্থব্যয় না করিয়া আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার গ্রন্থাবলীর পুনঃপ্রচারের ব্যাকুল আবেদন করিয়াছিলাম। স্বনামে বেনামে লেখা তাঁহার প্রচলিত অপ্রচলিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও বিস্মৃত বই-গুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকাও সভায় দাখিল করিলাম। সভাশেষে সেন মহাশয় আমার করমর্দন করিলেন এবং সহৃদয়তার সহিত আমার প্রস্তাবলী প্রকাশের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন অদ্ভুতকর্মা পুরুষ, শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়ও তাই। দুইয়ের সহযোগে এবং ঝাড়গ্রামরাজ প্রভৃতি মেদিনীপুরের সুসন্তানদের উদারতায় অঘটন ঘটিতে বিলম্ব হইল না। মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসমিতির উদ্যোগে সুনীতিকুমার, ব্রজেন্দ্রনাথ ও আমার সম্পাদনায় সুবিরাট বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ অচিরাৎ আরম্ভ হইয়া গেল। প্রকাশক হইল রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। আমারই পরিকল্পিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীকে দ্রুত রূপ দিতে আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। সাহিত্য, সমাজ ও (বিবিধ অংশসহ) শিক্ষা—এই তিন খণ্ডে গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ হইবে স্থির হয়। সাহিত্য-খণ্ড প্রায় সম্পূর্ণ

হইবার মুখে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদেরই অন্য এক আকর্ষণে আমাকে কৃষ্ণনগর যাইতে হয়—বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশনে কাব্য-শাখার সভাপতিরূপে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ (১ ফাল্গুন, ১৩৪৪) সম্মেলন বসে। এই সম্মিলন প্রথমাবধি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পরিষদের সহিতই যুক্ত ছিল; ওই বছরের ১৮ই আষাঢ় হইতে উহা রেজিস্ট্রীকৃত ও স্বতন্ত্র হইয়া যায়। পরিষদের সহিত যুক্ত থাকা কালে শেষ অধিবেশন হয় কলিকাতার ভবানীপুরে ১৩৩৬ সালে। ইহা উনবিংশ অধিবেশন। ইহার পর দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল সম্মিলনের অধিবেশন বন্ধ থাকে। সাহিত্যপ্রেমিক এবং দুঃসাহসী শ্রীহরিহর শেঠ বিংশ অধিবেশন আহ্বান করেন ১৩৪৩ সালে চন্দননগরে। সভাপতি হন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ এখানেই শেষবারের সম্মিলনে যোগদান করেন। পর বৎসরেই কৃষ্ণনগরের অধিবেশন—মূল সভাপতি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। কাব্যশাখার সভাপতিরূপে আমি আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করি। কাব্য ভঙ্গিসর্বস্ব হইতে গিয়া ক্রমশ দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে এবং পরিণামে গুরুতর সঙ্কট দেখা দিবে সে আশঙ্কাও প্রকাশ করি। তথাকথিত আধুনিক মহলে বিরূপ সমালোচনার ঝড় বহিয়া যায়, কিন্তু মোহিতলাল-প্রমুখ প্রবীণ কবিরা আমাকে সমর্থন করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সম্পর্কে আরও একটু কথা আছে। পর বৎসর অর্থাৎ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে সুনীতিকুমারের সভাপতিত্বে কুমিল্লায় দ্বাবিংশ অধিবেশন হইয়া সম্মিলন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অজুহাতে দিল্লীর দিল্লগী বন্ধ করিবার জন্যই অবিলম্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পুনঃপ্রবর্তন প্রয়োজন।

কলিকাতায় ফিরিয়া বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর সাহিত্য-খণ্ড সম্পূর্ণ করিয়া ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে স্বদলবলে মেদিনীপুর পৌঁছি। ২৭ তারিখে হীরেন্দ্রনাথ যদুনাথ প্রভৃতি সাহিত্যরথীদের উপস্থিতিতে ঠিক যে মুহূর্তে মেদিনীপুর স্মৃতি-সমিতির হস্তে গ্রন্থাবলী সমর্পণ করিতেছি ঠিক তখনই কলিকাতায় বাবার অন্তিম অবস্থার সংবাদসহ একটি টেলিগ্রাম শ্রীবি. আর. সেন মারফত প্রাপ্ত হই। একই পক্ষকালের মধ্যে সাহিত্যজীবনের দুইটি গৌরব অর্জনের আনন্দ নিষ্ঠুর মৃত্যুর রূঢ় হস্তাবলেপে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সেনের বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতি বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীতেই পর্যবসিত হয় নাই। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির নির্মাণ, ঝাড়গ্রামে বিদ্যাসাগর বাণীভবন, বীরসিংহ পর্যন্ত পাকা রাস্তা, বীরসিংহের স্মৃতিসৌধ—এতগুলি পুণ্যকর্ম সমাধা করিবার কাজে মেদিনীপুরবাসীরা তাঁহার অবাধ সহযোগিতা

লাভ করিয়াছিল। বাংলা গদ্যের আদি লেখক মৃত্যুঞ্জয়কে মেদিনীপুরের সন্তান জানিয়া তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা তিনি ঝাড়গ্রামরাজের অর্থানুকূল্যে করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রেও রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশের দায়িত্ব লইয়াছিল।

১৯৩৮ সনের প্রথমার্ধে বঙ্কিম-শতবার্ষিকের সাড়া পড়িয়া যায়। সুষ্ঠুভাবে শতবার্ষিক পালনের দায়িত্ব বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশের সর্বত্র সভাসমিতি ও বঙ্কিম-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছাড়া বৃহত্তর বা স্থায়ী কিছু করা পরিষদের আয়ত্তে ছিল না। পরিষদের কর্মকর্তারা প্রায় সকলেই সভাব্যপদেশে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছিলেন। আমিও বহুস্থানের মহড়া লইতে-ছিলাম। হঠাৎ শ্রীবি. আর. সেনের জরুরি আহ্বান পাইলাম। মেদিনীপুরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস যদি বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর মত করিয়া বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী ছাপিতে পারে তিনি ঝাড়গ্রামরাজকে দিয়া দশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন।

বঙ্কিম শতবার্ষিক উপলক্ষ্যে পরিষৎ স্থায়ী কি করিতে পারেন তাহাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। পরিষদের আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়। সরকারী দান ছিল নামমাত্র বার্ষিক বারো শত টাকা; বেসরকারী অর্থাৎ বাংলার ভূম্যধিকারীদের এককালীন দান ছিল না বলিলেই হয়। শুধু সভ্যদের মাসিক চাঁদায় পরিষদের দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহ দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ ও আমি যুগোপযোগী পুস্তক নিয়মিত প্রকাশ করিয়া পরিষদের আয় বাড়াইবার কথা প্রায়শই চিন্তা করিতেছিলাম। আমি সেন মহাশয়ের লোভনীয় প্রস্তাবকে ব্যক্তিগত লাভের বিষয় করিবার লোভ সম্বরণ করিলাম। পাল্টা প্রস্তাব করিলাম, ঝাড়গ্রামরাজের এই এককালীন দান পরিষৎকে দেওয়া হউক। পরিষৎ বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী সুষ্ঠুভাবেই প্রকাশ করিবেন। এক ঢিলে দুই পাখি মারার কল্পনা আমার মাথায় চকিতে উদিত হইয়াছিল। এই টাকায় পরিষৎ স্থায়ীভাবে বঙ্কিম-স্মৃতি সংরক্ষণ করিতে পারিবে, অধিকন্তু লভ্যাংশ হইতে পরিষদের নিত্যকর্মপদ্ধতিও অটুট রাখা চলিবে। সেন মহাশয় খুশি হইলেন তবে তাঁহার শর্ত রহিল যে গ্রন্থ সম্পাদন, মুদ্রণ ও প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্রজেন্দ্রবাবু ও আমাকে লইতে হইবে।

কলিকাতায় ফিরিয়া ব্রজেন্দ্রনাথকে বলিতেই তিনি হাতে স্বর্গ পাইলেন। পরিষদের ঝাড়গ্রাম তহবিল স্থাপিত হইল এবং পরবর্তী আষাঢ় মাসেই (১৩৪৫) বঙ্কিম-শতবার্ষিক দিবসে বঙ্কিম-রচনাবলীর প্রথম খণ্ড বাহির করিতে পারিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী মুদ্রণের কাজও চলিতেছিল। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের

চৈত্র মাসে তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়া 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী' সম্পূর্ণ হইল, 'বঙ্কিম-রচনাবলী' ইংরেজী ও বাংলা নয় খণ্ডে সম্পূর্ণ হইল ১৩৪৮ সালের পৌষে। ঝাড়গ্রামরাজের কল্যাণে পরিষদের মান প্রাণ উভয়ই বাঁচিল।

আজ ১৩৬২ বঙ্গাব্দের শেষে দেখিতেছি, ঝাড়গ্রাম তহবিল প্রায় অবিকৃতই আছে অথচ এই টাকা খাটাইয়া আমরা ভারতচন্দ্র, রামমোহন, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল (কাব্য), শরৎকুমারী, পাঁচকড়ি, রামেন্দ্রসুন্দর ও বলেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বাংলা গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছি, তাহা ছাড়া বাংলা সাহিত্যে যুগান্তকারী কয়েকটি পুস্তকও স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ক্লাসিকস-এর মর্যাদা লাভ করিলেই ভাল বইয়ের চাহিদা সাধারণের কাছে কমিয়া যায়, এ কথা যে সত্য নয় পরিষৎ-প্রকাশিত এই গ্রন্থগুলির বহুল প্রচারই তাহার প্রমাণ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির সর্বাধিক গৌরব-জনক প্রতিষ্ঠান। বাঙালীর ভাষা সাহিত্য লোকশিল্প ও সামাজিক ইতিহাস—এক কথায় বাঙালী সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার ইহা আকর-ভূমি। বাঙালী মনীষার দীর্ঘ সত্তর বৎসরের সাধনায় ইহা তিলে তিলে গড়িয়া উঠিয়াছে। গত শতাব্দী কালের মধ্যে সাহিত্যে ও সমাজে যাঁহারা কৃতী হইয়াছেন তাঁহারাই পরিষদের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ইহার মূর্তি-চিত্রশালা, পাঠাগার ও পুথিশালা বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার সংরক্ষণ ও প্রসারের দায়িত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে সমগ্র বাঙালী জাতির উপর বর্তিয়াছে। আমি শতাব্দীপাদকাল সাধ্যমত এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া আসিতেছি। আমার জীবনের সর্বাধিক গৌরব ইহাই।

অষ্টম তরঙ্গ

চলচ্চিত্রং চলৎবিত্তম্

১৯২৮ সনে তিন শত পঁচিশ টাকা সম্মান-দক্ষিণা দিয়া বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ ও রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের পত্তনের দ্বারা যেদিন লেখক হইতে প্রকাশক-শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই, সেদিন কলিকাতার একটি বৃহত্তম পুস্তক-প্রকাশ-প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তা আমাকে আত্মঘাতী পদ্ধতি অবলম্বন না করিতে বিস্তর উপদেশ ও সাবধান-বাণী শুনাইয়াছিলেন। 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের ঘটনাটি হয়তো সামান্য, কিন্তু তাহা পরবর্তী কালে বাঙালী-

লেখক-জগতে সুবৃহৎ ফল-সম্ভাবনার সূচনা করিয়াছিল। সেকালের এক রকম রেওয়াজই দাঁড়াইয়াছিল পঞ্চাশ হইতে এক শত টাকা মূল্যের বিনিময়ে প্রকাশকের নিকট গ্রন্থের সর্বস্বত্ব বিক্রয়ের। এক শত টাকা পাইতেন স্বল্প-সংখ্যক ভাগ্যবান লেখক। পঞ্চাশ টাকাই ছিল সাধারণ ভদ্র দর। 'পথের পাঁচালী'র পর হইতেই হাওয়া বদলাইয়াছে। আজকাল নিতান্ত হতভাগ্য নেশাখোর লেখক ছাড়া কেহই ওই মূল্যে কপিরাইট বিক্রয়ের কল্পনাও করেন না।

চলচ্চিত্রে বাঙালী লেখকদের মূল্য নিরূপণ ব্যাপারে আমিই অনুরূপ বিপর্যয় ঘটাইয়াছিলাম। সেই কাহিনী বলিতেছি।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের নীহারিকা বা প্রাগৈতিহাসিক যুগে নিরঞ্জন পাল, হিমাংশু রায়, পি. গুহ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু রায় (পত্নী মায়া রায় সহ) প্রমুখ পায়োনীয়ারগণকে হিসাবের মধ্যে ধরিতেছি না। বাংলা চলচ্চিত্র-নির্মাণে সর্বাধিক প্রতিভাধর বড়ুয়া সাহেব (প্রমথেশ বড়ুয়া) ও সর্বাধিক ক্ষিপ্র দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চারার ডি. জি.কেও (শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, পত্নী প্রেমলতিকা দেবী সহ) ওই দলেই ফেলিতেছি। ঐতিহাসিক যুগে প্রথম মুখর চলচ্চিত্র 'ঋষির প্রেমে'র লেখক কবি কৃষ্ণধন দে না-অর্থ না-যশ কোন দিক দিয়াই লাভবান হন নাই—তাঁহাকেও সেই মাত্র পঞ্চাশ টাকায় কপিরাইট বিক্রয়ের দুর্ভোগ সহিতে হইয়াছে। তিনি এতাবৎকাল প্রায় দুই ডজন ছবির গল্প-লেখক, অথচ সিনেমা-বিলাসীরা তাঁহার নামের সঙ্গে পরিচিত নন। তিনি দরিদ্র লেখক বলিয়াই অবহেলায় চাপা পড়িয়াছেন।

বর্ধমান হইতে তরুণ লেখক শ্রীদেবকীকুমার বসু বিপুল উদ্যম, অসাধারণ অধ্যবসায় ও এক বাণ্ডিল স্ক্রিপ্ট বগলে যেদিন কলিকাতার চলচ্চিত্র-জগতে উদিত হইলেন, সেই দিন নূতন ইতিহাসের সূচনা হইল; দুর্গাদাস-উমাশশীর অভিনয়-সাফল্য-মণ্ডিত 'চণ্ডীদাসে' দেবকীকুমারের ঐকান্তিক একলব্যীয় সাধনা জয়যুক্ত হইল। কিন্তু তিনি সাহিত্যের সাধক রহিলেন না, সরাসরি চলচ্চিত্রের সেবক হইয়া গেলেন।

১৯৩০ সনের মধ্যে অনেকগুলি চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান যদিও কলিকাতায় ও ঢাকায় কাজ আরম্ভ করিয়াছিল এবং 'বিগ্রহ' 'কণ্ঠহার' প্রভৃতি চিত্রের যৎ-সামান্য নামও হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সাহিত্যিকদের পক্ষে ওই নূতন শিল্পের লোভনীয় আকর্ষণ ছিল না বলিলেই হয়। ওই সনের ২০ ডিসেম্বর শনিবার রাধা ফিল্মের 'শ্রীকান্ত' লইয়া 'চিত্রা' চিত্রগৃহের পত্তন এবং পরে নিউ থিয়েটার্সের জন্মলাভে বাংলা চলচ্চিত্র-জগতে নূতন উৎসাহ ও উদ্যমের সঞ্চার

হয়। বাঙালী কথা-সাহিত্যিকেরা ধীরে ধীরে স্বল্পমূল্যেই সিনেমা-শিল্পের পায়ে আত্মনিবেদন করেন। 'কল্লোল' তখন শুরু, দল ছিন্নভিন্ন। সম্পাদক ডি. আর. অর্থাৎ দীনেশরঞ্জন দাশ অচিরাৎ শিল্পীবন্ধু চারু রায়ের অনুসরণে স্টুডিও-শিল্পের উৎকর্ষ বিধানে ব্রতী হইয়াছেন; শৈলজানন্দ প্রবল অধ্যবসায় সহকারে সমালোচনার খিড়কি-পথ দিয়া সদরে মাথা গলাইবার প্রয়াস করিতেছেন। 'সাহানা' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে তদানীন্তন চলচ্চিত্রগুলির বিরুদ্ধে এক দিকে যখন তিনি তীব্র সংগ্রাম চালাইতেছেন, অন্য দিকে তখনই গঠনমূলক চিত্রনাট্য রচনার মকশও করিতেছেন। শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্র-দেবতা তাঁহাকে কৌশলে কুক্ষিগত করিয়া সামান্য দাক্ষিণ্যে তাঁহার বাম হস্তখানি নিষ্ক্রিয় করিয়া দিলেন। শৈলজানন্দ পুরাপুরি চলচ্চিত্রায়িত হইয়া গেলেন। 'কালি-কলমে'র সহযোগী প্রেমেন্দ্রও তাঁহার অনুগমন করিতে বিলম্ব করিলেন না। তাহার পর একে একে প্রবীণ নবীন বহু সাহিত্যিকই সিনেমা-তীর্থে কিম্বদন্তী-বর্ণিত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মত হয় মস্তক মুণ্ডন করিলেন, না হয় মহাকবি কালিদাসের ন্যায় "হয়োভূত্বা চিঁহিশব্দং চকারয়েৎ"।

বলা বাহুল্য, আমাকেও বার কয়েক ঘোড়া বনিয়া চিঁহি-চিঁহি করিতে হইয়াছে। প্রথম সংযোগ ঘটে ১৯৩০ সনের ১৫ই নবেম্বর তারিখে—'প্রবাসী'র ছাপাখানা-ম্যানেজারের ছোট্ট ঘরখানিতে বসিয়াই যেদিন চলচ্চিত্র-সাপ্তাহিক 'চিত্রলেখা' বাহির করি। মুরুব্বি ছিলেন শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। শুনিয়াছিলাম—পরবর্তী কালের চলচ্চিত্র-ধুরন্ধর শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারেরও গোপন হস্ত এই উদ্যোগের পিছনে ছিল। আমাকে নানা কারণে অন্তরালে থাকিতে হইয়াছিল, সম্পাদকরূপে মাসিক দশ টাকা বেতনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাকে রথাগ্রে স্থাপন করিয়াছিলাম, লাগাম অবশ্য আমার হাতেই ছিল। আঠার সপ্তাহ 'চিত্রলেখা' চালাইয়া তদানীন্তন স্বল্পপরিধিসম্পন্ন চলচ্চিত্র ব্যাপারে প্রায় লায়েক হইয়া উঠিয়াছিলাম। তারপর সেই 'বঙ্গশ্রী'র আমলের ব্যাপার; শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কল্যাণে গোটা ১৯৩৪ সন ধরিয়া কমপক্ষে দুই শতখানি বিদেশী ছবি দেখিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল বুঝি চিত্রনাট্যরচনার যাবতীয় টেকনিকই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছি। হেমন্তকুমার শ্রীনীতীন্দ্র বসুর সহিতও আমার সংযোগ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সংযোগ ফলপ্রসূ হয় নাই। আমার বিদ্যা অপরীক্ষিতই থাকিয়া গিয়াছিল।

১৯৩৭ সনের মাঝামাঝি কালে শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় যেদিন প্রমথেশ বড়ুয়াকে সঙ্গে লইয়া আমার ২৫।২ মোহনবাগান রো-স্থিত আপিস, ছাপাখানা এবং বাসভবনে উপস্থিত হন, তৎপূর্বে 'সচিত্র ভারত' নামক সাপ্তাহিক পত্রে

(আর্ট প্রেস হইতে প্রকাশিত) আমি আর একবার সমসাময়িক চলচ্চিত্রের কড়া কড়া সমালোচনা লিখিয়া সিনেমা-সংক্রান্ত হস্তকণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করিয়াছিলাম। নিউ থিয়েটার্সের উপরেই একটু বেশী কোদাল চালাইয়াছিলাম। সেই নিউ থিয়েটার্সের প্রখ্যাত প্রযোজক এবং প্রচারসচিবকে সশরীরে মদ্‌গেহে উপস্থিত হইতে দেখিয়া একটু চকিত হইয়াছিলাম বই কি! পাকা শিকারী প্রমথেশবাবু, ধানাই-পানাই বা আমড়াগাছির অবকাশমাত্র দিলেন না, একেবারে স্থিরলক্ষ্যে গুলি ছুঁড়িলেন। বলিলেন, আমার পিতার জমিদারিতে কিছু বনজঙ্গল এবং কয়েকটা হাতী আছে; পরবর্তী ছবিতে সেগুলিকে কাজে লাগাইতে চাই। গল্পটা হইবে একজন আর্টিস্টের দুঃখময় জীবনের। তিনি মুখে মুখে খানিকটা গল্পও বলিয়া গেলেন এবং আমাকে দুই দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গল্পটি খাড়া করিতে বলিলেন। ঠিক দুই দিনের দিন বৈকালে আমাকে তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া লইয়া বড়ুয়া সাহেব নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিওর গোলঘরে হাজির করিলেন। সায়েব অর্থাৎ শ্রী বি. এন. সরকার সেখানে বার দিয়া বসিয়া ছিলেন। শান্ত স্বল্পভাষী মানুষ—আমার গল্প পড়া হইলে ছোট্ট একটি কথা বলিলেন, ভাল। বড়ুয়া সাহেব চিত্রনাট্যের খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য গল্পটি আমার নিকট হইতে লইয়া বলিলেন, তাঁহার কাজ হইয়া গেলেই পাত্রপাত্রীদের মুখের কথা অর্থাৎ সংলাপ আমাকে বসাইয়া দিতে হইবে। কয়েকটি গান রচনারও ফরমাশ দিলেন। গল্পটির নাম দিয়াছিলাম 'মুক্তি'—সেই বৎসরের একটি সাময়িকপত্রের কোনও বিশেষ সংখ্যায় তাহা প্রকাশও করিয়াছিলাম। সংলাপ ও গান লিখিতে বেশীদিন দেরি হইল না। আমার পুরা চারিটি ও তিনটি গানের অংশবিশেষ বড়ুয়া সাহেব গ্রহণ করিলেন; রবীন্দ্রনাথের ও অজয় ভট্টাচার্যের গানও কয়েকটি লওয়া হইল। কাজ হইয়া গেলেই আমাকে নিউ থিয়েটার্সের ধর্মতলাস্থিত আপিসে উপস্থিত হইতে বলা হইল। সেখানে শ্রীসতীনাথ ঘোষ, বর্তমানে আমার নন্তুদা-র, মুসাবিদায় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। গল্প, সংলাপ ও সাতখানি গানের সর্ববিধ স্বত্ব (মায় রেকর্ড) বেচিয়া সাকুল্যে পাঁচ শত টাকা পাইয়া আমি আনন্দে ডগমগ হইয়া ঘরে ফিরিলাম। আমাকে মাত্র এক দিনের জন্য শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের আহ্বানে সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া গানের দুই-একটি কথা বদলাইবার জন্য স্টুডিওতে হাজিরা দিতে হইয়াছিল। বাস্, ওই পর্যন্ত। ১৯৩৭ সনের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি 'মুক্তি' মুক্তিলাভ করিল ওই "চিত্রা"-গৃহে এবং সঙ্গে সঙ্গে আশাতীত জনপ্রিয়তা অর্জন করিল। অজয় ভট্টাচার্যের "কোন্ গগনে" এবং আমার "ওগো সুন্দর"—এই গান দুইটি পথে-

ঘাটে বনে-বাদাড়ে সর্বত্র শ্রুত হইতে লাগিল। আমার গানটি নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী কানন দেবী গাহিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা কি না ইহা লইয়া বহু তর্কবিতর্ক ও বাজি-ধরাধরি হইয়াছিল। শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক উহার স্বরলিপিও প্রচার করিয়াছিলেন। চলচ্চিত্র ব্যাপারে আমার প্রথম প্রচেষ্টা প্রায় ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করিয়াছিল যে রচনাটির কল্যাণে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :

ওগো সুন্দর,
মনের গহনে তোমার মুরতিখানি
ভেঙে ভেঙে যায়, মুছে যায় বারে বারে
বাহির-বিশ্বে তাই তো তোমারে টানি ॥
ওই যে হোথায় আকাশের নীলে
বনের সবুজ এক হয়ে মিলে
ওই যে হোথায় সাগর-বেলায় ঢেউ করে কানাকানি—
ভেঙে ভেঙে যায় মুছে যায় বারে বারে
বাহির-বিশ্বে তাই তো তোমারে টানি ॥
তোমার আসন পাতিব পথের ধারে,
তোমার আসন পাতিব ঘাটের মাঝে।
আঁধারে আলোকে যুগ যুগ ধরি প্রিয়,
বিরহে মিলনে চিরদিন জানাজানি—
ভেঙে ভেঙে যায় মুছে যায় বারে বারে
বাহির-বিশ্বে তাই তো তোমারে টানি ॥

এই গানের রেকর্ড বহু সহস্র বিক্রয় হইয়াছে, আমার "ভুল ক'রো না পথিক" গানটিও গ্রামোফোন-রেকর্ড মারফত কম জনপ্রিয়তা অর্জন করে নাই ; কিন্তু লেখকের ভাগ্যে প্রাপ্তির অঙ্ক সেই পাঁচ শতই রহিয়া গিয়াছে।

'মুক্তি'র এই অভিনব সাফল্য অবিলম্বে প্রখ্যাত ডি. জি.-কে আমার দিকে আকৃষ্ট করিল। তিনি 'হাল-বাংলা' নামীয় একটি কাহিনীর খসড়া আমার নিকট হাজির করিলেন, সংলাপ ও গান রচনা করিতে হইবে। বড়ুয়া সাহেব যে চিত্রনাট্য-মেড-ঈজি পদ্ধতি শিখাইয়াছিলেন তাহাতে আমার যথেষ্ট সাহস জন্মিয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও পাঁচ শত টাকার চুক্তিতে কাজ আরম্ভ করিলাম, গান লিখিয়া দিলাম সতেরটি। কাজ শেষ হইল, কিন্তু ডি. জি. বারম্বার আমার প্রাপ্যবিষয়ক চুক্তি ভঙ্গ করাতে আমি সংলাপ আটক

করিলাম। স্মরণ হইতেছে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের (১৯৩৮) ৯ই ভাদ্র অর্থাৎ আমার জন্মদিনে হঠাৎ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণকে আমি নির্ব্যূঢ়স্বত্বে গান সংলাপ সমস্তই দান করিয়া আনন্দ ও মুক্তিলাভ করিলাম।

সাহিত্যিকের পক্ষে চলচ্চিত্রের দাক্ষিণ্যের পরিমাণ তখন এইরূপই ছিল। শৈলজা-প্রেমেন্দ্রও সামান্য মাস-মাহিনায় কাজ করিতেন এবং সাহিত্য-বোধহীন কর্তৃপক্ষের অনুশাসন মানিতে বাধ্য হইতেন বলিয়া তাঁহাদের মানসিক যন্ত্রণার শেষ ছিল না। ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাসে এই লাঞ্ছনার শোধ তাঁহারা উভয়েই যথেচ্ছভাবে তুলিতে পারিয়াছেন, এইটুকুই সান্ত্বনা।

সামান্য মাস-মাহিনায় বন্দী হইবার জন্য বোম্বে টকিজ হইতে তারাশঙ্করেরও আহ্বান আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রসারিত বাহুবন্ধনে ধরা দিয়াছিলেন। মাসিক বেতনের বন্ধন ঘুচিয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি আজিও চলচ্চিত্র-ঝিন্দের বন্দী হইয়াই আছেন।

সংক্ষেপে যে ইতিহাস দিলাম, তাহাতে খুঁটিনাটির একটু-আধটু ভুল থাকিতে পারে; কিন্তু আমার প্রতিপাদ্য মূল কথাটা সত্য। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের প্রায় সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পে সাহিত্যিকেরা উপযুক্ত সম্মান লাভ করেন নাই। চিত্রনির্মাতা ও তাঁহাদের নিযুক্ত প্রযোজক-সম্প্রদায় তখন নিজেদের শিল্প-সাহিত্য-বুদ্ধিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান করিয়া দম্ভ ও আত্ম-প্রত্যয়ের আকাশদুর্গে বিহার করিতেন। মৃত বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ-চন্দ্রের চাহিদা ছিল শুধু তাঁহাদের নামের বিজ্ঞাপন-মূল্য হেতুই। তাঁহাদের গল্প, বাচন ও কথোপকথন-ভঙ্গীর উপর বানিয়া বুদ্ধির লগুড়াঘাত করিতে চিত্রনির্মাতাদের দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না। সাহিত্যবুদ্ধিহীন বেতনভোগী চিত্রনাট্যরচয়িতাদের স্থূল হস্তাবলেপ সাহিত্য-রসিকদের মুহুর্মুহু ক্ষুণ্ণ করিত। যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক চাহিদায় বাজে বদ্দি মালও অবাধে বিকাইত। কাকতালীয় অর্থপ্রাপ্তির বিপুল সাফল্য চিত্রনির্মাতারা সবটাই নিজেদের কেরামতির খাতে জমা করিয়া আত্মগর্বে স্ফীত হইতেন এবং ঘোষণা করিতেন, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ধার আমরা ধারি না, আমরা কায়দা করিয়া যাহা দিব, জনসাধারণ তাহাই গোগ্রাসে গিলিবে। তাঁহারা বিদেশী ছবি, বিদেশী গল্প ও দেশীয় রসিকতা তিলে তিলে আহরণ করিয়া তিলোত্তমা ছবি নির্মাণ করিতেন; গল্প ও সংলাপ-রচনায় সাহিত্যনীতির কোনও মূল্য দিতেন না। কবরের শব প্রাণবন্ত ও দৈত্যবলে বলীয়ান হইয়া যখন স্বয়ং ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের গলা টিপিয়া ধরিতে উদ্যত হইল, তখন চৈতন্য হইল। চিত্রনির্মাতারা বুঝিতে

পারিলেন, ডিরেক্টরদের খোশখেয়ালের জোড়াতাড়া-দেওয়া কাহিনী এবং ইংরেজীগন্ধী সংলাপ আর চলিবে না—কাহিনী ও সংলাপ রচনার কাজে কৃতী সাহিত্যিকদের সহযোগিতা অনিবার্যভাবে আবশ্যক। এমন কি, মৃত সাহিত্য-সম্রাটদের সাম্রাজ্য চলচ্চিত্রে বজায় রাখিতে হইলে জীবিত সাহিত্যিকদের লিপি-অনুশাসন প্রয়োজন। কর্তাদের এই বিলম্বিত সদ্বুদ্ধির ফলেই চলচ্চিত্র-জগতে সাহিত্যিক অনুপ্রবেশ (ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন) সম্ভব হইয়াছিল। শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র-শরদিন্দুকে গোড়ায় পশ্চাদ্দ্বারপথে প্রবেশের দুঃখ সহিতে হইয়াছে, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহারা এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী সাহিত্যিকেরা সদরের সম্মান লাভ করিয়াছেন।

১৯৪৫ সনে এপ্রিল মাসের জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আমরা—সদ্য-প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘের কর্মীরা—নৃত্যগীতবহুল 'অভ্যুদয়' নাটকের অভিনয় লইয়া মাতিয়াছিলাম। ওই নাটকের অভাবনীয় সাফল্য আমাদিগকেও যথেষ্ট খ্যাতি দান করিয়াছিল। নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করিবার সময় নামজাদা দেশকর্মীরা কারাগারে বন্ধ ছিলেন। বৎসরের শেষের দিকে তাঁহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিলেন এবং 'অভ্যুদয়' দেখিয়া কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘকে সম্বর্ধিত করিলেন। ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসিবে, কংগ্রেস-কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্যদের 'অভ্যুদয়' দেখাইবার জন্য আমরাও বিশেষ তোড়জোড় করিতেছিলাম। হঠাৎ বুড়োদা অর্থাৎ শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী সংবাদ দিলেন—শ্রীনীতীন্দ্র বসু বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, জরুরী প্রয়োজনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। এগারো বৎসর পূর্বে ১৯৩৪ সনে চলচ্চিত্র সম্পর্কে ইনিই আমাকে সর্বপ্রথম তাতাইয়া দিয়া গা-ঢাকা দেন। সুতরাং সংবাদ শুনিয়া কৌতূহল ও কৌতুক দুই-ই বোধ করিলাম।

সাক্ষাৎ হইল। বোম্বে টকিজ লিমিটেড রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'র মুখর ছবি তুলিতে চান—হিন্দী বাংলা উভয় ভাষায়। চিত্রনাট্যরচনার ভার তাঁহারা আমাকে দিতে চান। মহৎ আদর্শ ও জাতীয় কল্যাণের পটভূমিকা রচনা না করিয়া নীতীন্দ্র বসু কোনও কথা বলেন না। আমার সুবিধা অসুবিধার কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার পূর্বেই তিনি মনোহারী বচনের তোড়ে আমাকে এমনই অভিভূত করিয়া ফেলিলেন যে, আমার অজগর-কবলিত হরিণের অবস্থা হইল, পলাইবার বা 'না' বলিবার ক্ষমতা রহিল না। 'অভ্যুদয়ে'র ঐতিহাসিক অভিনয়ই আমার সর্বাধিক বাধা, কিন্তু প্রাপ্তির অঙ্কের আঘাতে সে বাধা অপসারিত হইতে দেরি হইল না। সেও এক ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি—

একেবারে পাঁচ অঙ্কের ব্যাপার। পর্বতসানুদেশলগ্ন গ্লেসিয়ারের মত আমার বিগলিত ও নিম্নাভিমুখী অবস্থা ঘটিল, রাজী হইয়া গেলাম।

শ্রীহিতেন্দ্র চৌধুরীর সহিত চিঠিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়া ডিসেম্বরের গোড়াতেই বোম্বাই পৌছিলাম এবং একেবারে সরাসরি নগরোপান্তবর্তী মালাড-গ্রামে স্টুডিও-ভবনে অধিষ্ঠিত হইলাম। আমার চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত জ্ঞান তখনও বড়ুয়াসাহেবকৃত "শর্ট-ডিভিসন" পর্যন্ত। ওই বিদ্যা লইয়াই হাতে-কলমে 'মুক্তি' ও 'হাল-বাংলা'র সংলাপ লিখিয়াছিলাম। মনে মনে ধারণা ছিল বাংলা দেশের প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার হইতে হইলে ইহার অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন নাই; এখানে এই ক্ষেত্রে অশিক্ষিতপটুত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ ছাড়পত্র। কিন্তু একটা গোটা উপন্যাসকে চিত্রনাট্যায়িত করিতে বসিয়া দেখিলাম, বড়ুয়া-বিদ্যা কোন কাজেই লাগিতেছে না। শেষ পর্যন্ত নিজের সহজবুদ্ধিতে একটা পদ্ধতি খাড়া করিলাম। বইখানি বার বার পড়িয়া ও বিশ্লেষণ করিয়া মূল চরিত্রগুলিকে বাছাই করিয়া লইলাম এবং উপন্যাসের ধারা ধরিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রের কাহিনী রচনা করিলাম। স্মরণ আছে বিশ্লেষণকালে অর্ধশতাধিক অসঙ্গতি চোখে পড়িয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ কথার পরে কথা সাজাইয়া যে ছবি ফুটাইয়াছেন, ছবি দিয়া সেই ছবি ফুটাইতে গেলেই অসঙ্গতি ধরা পড়িবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। বিবাহান্তে একই ঝড়ের রাত্রে দুই বরপক্ষ একই নদীতে নৌকা-বহরে স্ব স্ব স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। রমেশ এক বর, নলিনাক্ষ আর এক বর। রমেশের বধূ সুশীলার মাতা বরপক্ষের সহযাত্রিনী হইয়াছেন; নলিনাক্ষের স্ত্রী কমলার তিনকূলে কেহ নাই, সে একক স্বামীর অনুগামিনী। রাত্রে ঝড়ে নৌকাডুবি হইল। ভোরে দেখা গেল পদ্মার চরে রমেশ ও কমলা পাশাপাশি পড়িয়া আছে। কমলা যদি সুশীলা অর্থাৎ রমেশের বধূ হইত তাহা হইলে জ্ঞান হইবামাত্র সে সর্বপ্রথমে "মা মা" বলিয়া কাঁদিত। কমলা যখন তাহা করিল না তখনই রমেশের বুঝা উচিত ছিল, বধূটি তাহার নয়। সে কমলাকে লইয়া গ্রামে পৌছিল, সেখানে তাহার পিতার শবদেহ পাওয়া গেল এবং শ্মশানে দাহও হইল অথচ নববধূর মাতার প্রসঙ্গও উঠিল না, ইহা কি করিয়া সম্ভব? সম্ভব এইজন্য যে সে প্রসঙ্গ উঠিলে গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'র ভরাডুবি হইত, সেইখানেই মামলার নিষ্পত্তি হইয়া যাইত।

এইরূপ বহু অসঙ্গতিতে 'নৌকাডুবি' ভরা। ছবিতে দেখাইতে গেলেই দর্শককে তাহা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হইবে, কথার ফুলঝুরির মোহ ছবিতে টিকিবে না। মহা সমস্যায় পড়িলাম। এই সকল সমস্যা সমাধানে নীতীন্দ্র বসু আমার একমাত্র সহায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ে পরামর্শ

করিয়া একটা সঙ্গতিপূর্ণ চিত্রনাট্য খাড়া করিলাম। তাহাই বাংলা 'নৌকা-ডুবি' এবং হিন্দী 'মিলন' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। চিত্রনাট্য রচিত হইলে বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের সমর্থন আমাকেই আনিতে হইয়াছিল। আমি শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে পরিবর্তনের কারণগুলি দেখাইয়া দিতেই তিনি ছাড়পত্র দিয়াছিলেন।

এই বোম্বাই-সফরে আমার আর একটি মোহমুক্তি হইয়াছিল। স্টুডিওর অভ্যন্তরে কিছুকাল বাস করিয়া ও কিছুদিন অবিরত যাতায়াত করিয়া আমি বহুবর্ণ বিচিত্র ও সুশোভিত "আসুন-বসুন"-লেখা চলচ্চিত্র-আসনের উল্টা পিঠটাও দেখিয়া ফেলিয়াছিলাম। ম্যাজিসিয়ানের সহকারী হইলে ম্যাজিকের মোহ কাটিয়া গিয়া খেলা দেখিয়া যেমন দর্শকদের বোকামিতে হাসির উদ্রেক হয়, চলচ্চিত্রের ফাঁকি কি ভাবে লক্ষ লক্ষ দর্শককে বাস্তবের ধোঁকা দিয়া বিভ্রান্ত করে তাহাও দেখিবার ও শিখিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সিনেমার পাহাড়-পর্বত নদী-সমুদ্র অরণ্য-নগর ঝড়-জল মেঘ-বিদ্যুতের বিচিত্র ইন্দ্রজাল ভেদ করিয়া সুখী হইতে পারি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কার্য হয় না। চালাকির দ্বারা মহতীজনতাকে মোহমুগ্ধ করিয়া যে তাহার সর্বস্ব অপহরণ করা যায় সিনেমা তাহা প্রমাণ করিয়াছে। ছায়ার প্রতারণা বুদ্ধিমান মানুষকে প্রত্যহ অবশ ও নির্বুদ্ধি করিতেছে।

যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম। আমারই পঞ্চাঙ্ক-প্রাপ্তির পরেই বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতি চলচ্চিত্র দেবতার মুক্তহস্ত দাক্ষিণ্যের সঞ্চার হয়। একটি কৌতুককর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত এই যে, যে নিউ থিয়েটার্স ১৯৩৭ সনে 'মুক্তি'র গল্প-সংলাপ-গানের জন্য আমাকে ৫০০ টাকা দক্ষিণা দেন, তাঁহারাই ১৯৫০ সনে 'পরিত্রাণ' চিত্রের মাত্র দুইখানি গানের জন্য আমাকে ওই ৫০০ টাকাই প্রদান করেন। শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয়, সর্বত্রই এই বর্ধিত হার প্রবর্তিত হয়।

আরও এক শিক্ষা বাকি ছিল, ১৯৪৭ সনে তাহাও লাভ করিলাম। 'নৌকাডুবি'তে বড় উপন্যাসকে সঙ্কুচিত করিয়া দুই ঘণ্টার পরিধিতে আনিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল, কলিকাতার এস. বি. প্রডাকশনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প "দৃষ্টিদান"কে দুই ঘণ্টার মত টানিয়া লম্বা করিতেও হাঙ্গামা কম হয় নাই। এ ক্ষেত্রেও শ্রীনীতীন্দ্র বসু সহায়ক ছিলেন। কয়েকটি নূতন চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করিয়া সে পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম অর্থাৎ বিশ্বভারতীর পাসমার্কা পাইয়াছিলাম। এস. বি.

প্রডাকশন আমার চিত্রনাট্যটি সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন, সুতরাং নূতন শিক্ষা ও পরীক্ষার ফলাফলের মুদ্রিত প্রমাণ আছে।

১৯৪৮ সনে বম্বে টকিজের পক্ষে শ্রীনীতীন্দ্র বসু আবার ডাক দিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'কে চিত্রনাট্যরূপ দিবার জন্য। ইহাও বড় উপন্যাসকে সঙ্কুচিত করার কাজ, কিন্তু 'নৌকাডুবি'র আদর্শে সে কাজ করা গেল না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সকল গল্পই নিজের জবানিতে বলিয়াছেন, শুধু 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরার জবানি এবং 'রজনী'তে বিভিন্ন চরিত্রের জবানিতে কাহিনী শুনাইয়াছেন। এইগুলির অধিকাংশই মনের কথা। সামান্য ঘটনা—ফুলের গন্ধ, হাতের স্পর্শ অথবা কণ্ঠের স্বরকে কেন্দ্র করিয়া এক এক কাঁড়ি ভাবনা। বিভিন্ন চরিত্রের কথা মিলাইয়া এক করিতে গিয়া দেখি, হাজারো অসঙ্গতি। ভাবনা ও অসঙ্গতিকে ছবিতে রূপ দেওয়া যায় না। কাজেই অনেক অদল-বদল করিতে হইল। শেষ পর্যন্ত গল্প এমন দাঁড়াইল যে, বই ও পাত্রপাত্রীর নাম ছাড়া বঙ্কিমের আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। আমি দেবকীকুমার বসু কর্তৃক চিত্রায়িত 'চন্দ্রশেখরে'র অ-বঙ্কিমত্বে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম। 'রজনী'কে অতখানি পরিবর্তনের ধাক্কা সহিতে দিলাম না। অমরনাথকে সমরনাথ করিয়া তাহারই নামে বইয়ের নাম রাখিলাম 'সমর'; তরঙ্গময়ীর (লবঙ্গলতা) সহিত তাহার বুদ্ধির যুদ্ধের প্রতিও ওই নামের মধ্যে ইঙ্গিত রহিল। গোড়ায় একটি কৈফিয়ৎও যোগ করিয়া দিলাম। 'সমরে'র হিন্দীরূপের নাম হইল 'মশাল'।

১৯৪৫ সন হইতে আজ পর্যন্ত জীবিত সাহিত্যিকদের উষর ক্ষেত্রে চলৎচিত্র হইতে অনেক বিত্ত গড়াইয়া আসিয়াছে; কিন্তু গলৎ-এর কথা এই যে অধিকাংশ স্থলেই তাহা চলৎ-বিত্তম্। তবুও পূর্বে যেমনটি হইত, জাতি-কুলমান দিয়াছি তবু পেট ভরে নাই—এমনটি আর হইতে পায় নাই। একটা কথা স্বীকার না করিলে অন্যায় হইবে, এই তীর্থে মাথা মুড়াইয়া অথবা হামাগুড়ি দিয়া ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যিকদের লাভ হইতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্পকে আশ্রয় করিয়া বাংলা সাহিত্যের কোন উন্নতিই হয় নাই, হয়তো বিপরীতই ঘটিয়াছে।

নবম তরঙ্গ

নষ্টোদ্ধার

বাংলা সাহিত্য বিষয়ে আমার অনুসন্ধিৎসা বাল্যকাল হইতেই প্রবল ছিল। এই প্রবৃত্তিকে সহজাতও বলিতে পারি। যখনই সুযোগ পাইয়াছি পুরাতন পুথি, মুদ্রিত গ্রন্থ ও চিঠিপত্রাদি সংগ্রহ করিয়াছি; শৈশবে ছাত্রাবস্থা হইতেই এই বাতিক আমার আছে। আমার জীবন কোন্ পথে চালিত হইবে, আমি কেরানী ইস্কুল-মাস্টার উকিল ডাক্তার—ভবিষ্যতে কী হইব, এই চিন্তা-নিরপেক্ষ ভাবেই কোথাও সাহিত্য-সম্পর্কিত কোন কিছুর সন্ধান পাইলেই ছুটিয়া গিয়াছি এবং যেন-তেন-প্রকারেণ তাহা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি। কলেজে পাঠকালে প্রাচীনতম মহাজন পদাবলীর পুথিসংগ্রহ এই চেষ্টারই ফল। তাহার পর ভাগ্যের বিচিত্র নিয়ন্ত্রণে সাহিত্যই আমার সেব্য ও উপজীব্য হইয়াছে। ততদিন পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য ও রক্ষণীয় বস্তু যাহা আহরণ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা পরিত্যক্ত হইয়া বালকের পুতুল-খেলার সামগ্রীর দুরবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই; সযত্নে সংগৃহীত ও রক্ষিত বস্তুগুলি ধীরে ধীরে কাজে লাগিয়াছে। এই ভাবে কলেজ-জীবনে একখানি সহজিয়া-তন্ত্রের পুথি আবিষ্কার করিয়াছিলাম, স্বর্গীয় মণীন্দ্রমোহন বসু স্বীয় গ্রন্থে মূল্যবিচার ও ব্যবহারের দ্বারা সেটিকে প্রভূত সম্মান দিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত সংযোগ ঘটিবার পর রামরাম বসুর জীবনী ও কীর্তিকে কেন্দ্র করিয়া অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষা-সাহিত্যের গবেষক হইয়া পড়ি এবং ঘটনাচক্রে বহু মূল্যবান আবিষ্কার ও নষ্টোদ্ধারের গৌরব অর্জন করি।

বাংলা গদ্যের নীহারিকা ও আদি গঠনযুগ আমার গবেষণার বিষয় ছিল। ওই সূত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের পোর্তুগীজ পাদরীদের কীর্তি অনুসরণ করিতে করিতে ওই শতাব্দীর শেষপাদে উপনীত হই— যাহার গোড়াতেই (১৭৭৮ খ্রী:) ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেডের ইংরেজীতে লিখিত বাংলা ভাষার ব্যকরণ। এই ব্যাকরণের সহিত আর একজন ইংরেজ মনীষীর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল—চার্লস উইলকিন্সের। বাংলা হরফের জন্মদাতা পিতা এই উইলকিন্স ও গর্ভধারিণী মাতা পঞ্চানন কর্মকার। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরেজীতে প্রথম অনুবাদকও উইলকিন্স। এই হালহেড-উইলকিন্সকে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিলেন বহু-নিন্দিত ওয়ারেন হেস্টিংস। ইহার পরই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা

সার্ উইলিয়াম জোন্সের আবির্ভাব। ১৭৮৫ সন হইতে ইংরেজী আইন-গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ এবং ক্যালকাটা গেজেটের প্রকাশ হইতে থাকে। জোনাথান ডানকান, এন. বি. এডমনস্টন ও হেনরি পিট্‌স ফরস্টারের অনূদিত আইন-বহিগুলির নাম মাত্র শোনা ছিল; লণ্ডন হইতে সেগুলির ফোটো-গ্রাফিক নকল আনাইয়া ইতিহাস রচনার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, হঠাৎ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির প্রথম ভ্যলুম ক্যাটালগের (১৮৮৮ খ্রী:) পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ৩৯৫ পৃষ্ঠায় "Extensive Vocabulary of Bengali, English and Udiya, 2 Vols. Calcutta, 1793" এই নামটি চোখে পড়াতে চমকাইয়া উঠি। ততদিন পর্যন্ত জানা ছিল যে হেনরি পিট্‌স ফরস্টারের ইংরেজী-বাংলা অভিধানই (১৭৯৯ খ্রী:) বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম অভিধান। প্রথমেই মনে হইল ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ক্যাটালগে ভুল তারিখ ছাপা হইয়াছে। সন্দেহ হইলেও তৎক্ষণাৎ টাইটেল-পেজ, ভূমিকা ও নমুনা-পৃষ্ঠার ফোটোগ্রাফ পাঠাইবার জন্য বিলাতে জরুরী চিঠি লিখিলাম এবং অচিরাৎ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' আবিষ্কারের সৌভাগ্য লাভ করিলাম। পরে শোভাবাজার রাজবাটীতে অবস্থিত রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পাঠাগারেও ওই পুস্তকের একটি করিয়া খণ্ডিত কপি পাওয়া গেল। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র চতুর্থ সংখ্যায় এই আবিষ্কারের বিস্তৃত বিবরণ চিত্রসহ প্রকাশ করি। তাহার পর আমাকে এই সন্ধানী নেশায় পাইয়া বসে। সাংঘাতিক নেশা। পুরাতন লাইব্রেরি এবং পুরাতন ক্যাটালগ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। প্রভূত কায়িক ক্লেশের বিনিময়ে আর একটি মাত্র অনুরূপ আবিষ্কার করিলাম—জন মিলার-লিখিত 'The Tutor'। ডক্টর সুশীলকুমার দে মিলারের একটি অভিধানের উল্লেখ মাত্র তাঁহার গ্রন্থে করিয়া-ছেন। এই সংবাদের উৎস রামকমল সেনের অভিধানের ভূমিকা। ইহার অন্য কোনও পরিচয় জানা যায় নাই। ক্যাটালগ-গবেষণায় বইখানির সন্ধান পাইলাম। আবার সেই ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি হইতে নকল আনাইলাম। দেখিলাম, জন মিলার অভিধান রচনা করেন নাই। তাঁহার পুস্তকের টাইটেল-পেজে এই বিচিত্র পুস্তকের পরিচয় তিনি নিজেই এইভাবে দিয়াছেন:

> "সিক্ষ্যাগুরু কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালিদিগরকে ইংরাজি সিক্ষা করাইতে তিন খণ্ডে।"

১৭৯৭ সনে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আমার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' পুস্তকে এই গ্রন্থেরও বিশদ পরিচয় দিয়াছি। তাহার পর নানা ভাগ্যবিপর্যয়ে

অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রন্থজগৎ হইতে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ কয় বৎসর বাস্তব-জীবনের খরস্রোতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি—সকল গর্ব, সকল আত্মপ্রসাদ লইয়া নষ্ট-আবিষ্কার সেই স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে গিয়া ঘুমন্ত আবিষ্কার-প্রবৃত্তিতে আবার সুড়সুড়ি লাগিল। মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "ভাইপো"-নামাঙ্কিত বেনামী রচনাগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া-ছিলেন ; ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত আমিও সেগুলির সন্ধানে মাতিয়া উঠিলাম। এই মাতনের ফল গন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডে আছে। পিঠ-পিঠ বঙ্কিম-শতবার্ষিক উৎসবের ডামাডোল বাজিয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিষ্কৃতি দিয়া বঙ্কিমকে লইয়া পড়িলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্তি উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পরিব্যাপ্ত। তিনি অতিশয় অভিজাতশ্রেণীর লেখক ছিলেন, স্বপরিচালিত পত্রিকা ছাড়া অন্যত্র কদাচিৎ লিখিতেন এবং নিজেই নিজের প্রায় যাবতীয় রচনা সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। বাকি যাহা ছিল তাহা ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র ও 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম-গবেষকেরা সকলেই সশরীরে বর্তমান ছিলেন। তদানীন্তন পরিষৎ-সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তো বঙ্কিমের স্নেহভাজন গবেষক ছিলেন। সুতরাং বঙ্কিমের সুরক্ষিত সাহিত্য-ভাণ্ডারে চিঠিপত্র বা অসমাপ্ত লেখার টুকরা ছেঁড়া পাতা ছাড়া আর কিছু মিলিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। অভিনিবেশসহকারে 'কৃষ্ণচরিত্র' পাঠ করিতে গিয়া একটা ইঙ্গিত পাইলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে' "দেবতত্ত্ব বিষয়ক" ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিল, লিখিয়া থাকিলে তাহার কি হইল? যে বঙ্কিমচন্দ্রের "বিরহিণীর দশদশা" বিষয়ক খসড়া কবিতা এবং ভূতুড়ে গল্প "নিশীথ রাত্রির কাহিনী"র অসম্পূর্ণ অবতরণিকামাত্র ঘটা করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, "দেবতত্ত্ব বিষয়ক" তাঁহার রচনার পুনঃপ্রকাশ দূরে থাকুক, উল্লেখমাত্রও কোথাও নাই কেন? গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের বেদ বিষয়ক আলোচনা কি বেদান্ত-রত্ন হীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিও আকর্ষণ করে নাই? জীবনীকার শচীশচন্দ্র ও টীকাকার গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কি ওই রচনাকালে ঘুমাইয়াছিলেন? যাহা হউক, তন্ন তন্ন করিয়া 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পড়িতে লাগিলাম। পরিশ্রম সার্থক হইল—সতেরো অধ্যায়ে বিভক্ত এই অসম্পূর্ণ সুবৃহৎ বেদের দেবতাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থটি পাকা প্রমাণসহ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। ১৩৪৫, ২৯শে শ্রাবণ (১৪ই আগস্ট ১৯৩৮) শ্রীরামপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক উৎসবের সভাপতি হিসাবে

প্রদত্ত ভাষণে (লিখিত) "বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম" আলোচনা-প্রসঙ্গে এই আবিষ্কারের বিষয় ঘোষণা করিলাম। প্রাচীনেরা অনেকেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। হীরেন্দ্রনাথ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় ধারাবাহিক আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বঙ্কিমের দেবতত্ত্ব বিষয়ক রচনার আবিষ্কারককে অকুণ্ঠ সপ্রশংস আশীর্বাদ করিলেন এবং তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে এই আবিষ্কারের উপরে একটি অধ্যায় যোজনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবতত্ত্ব বিষয়ক বৃহৎ রচনা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী'র "বিবিধ" খণ্ডে সম্পূর্ণ পুনঃপ্রকাশিত হইয়া বঙ্কিমের স্থায়ী কীর্তিতে পরিণত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ। আদিতে এবং মধ্যে ছোট বড় আরও অনেকে আছেন, ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া যাঁহাদের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে ব্রতী হইয়াছিলাম। পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ও সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালায় এবং 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমার কোনও কাজই রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। আসলে রবীন্দ্রনাথের নষ্টোদ্ধারের কাহিনী বলিবার জন্যই এই "তরঙ্গে"র অবতারণা, এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা ভূমিকামাত্র।

১৯৩৫ সনের গোড়াতেই 'বঙ্গশ্রী'র পাকা আশ্রয়চ্যুত হইয়া নানা ঝড়-ঝাপটা-তরঙ্গাঘাত-চোরাপাহাড়-হাঙ্গর-কুমীরের আক্রমণ বাঁচাইয়া শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সনের শেষাশেষি আবার বন্দরে আসিয়া পৌছিলাম; সে বন্দর বেনামী বন্দর নয়। যে বন্দরে সর্বপ্রথম ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্যসাগরে তরণী ভাসাইয়াছিলাম আনন্দ-বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলাম, আবার সেই বন্দরে আসিয়াই ঠেকিয়াছি। ঝড় প্রশমিত, আকাশ নির্মেঘ, বাতাস সুপ্রসন্ন! আশার আলোকে নভোপ্রাঙ্গণ উদ্ভাসিত।

নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব হওয়া মাত্রই আবার গবেষণা-প্রবৃত্তিতে শান পড়িল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন খুব দহরম-মহরম চলিতেছে। মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সমিতির কর্তারা বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসৌধের নির্মাণকার্য প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে দিয়া মন্দিরের উদ্বোধন করাইতে হইবে, তাঁহারা আমাকে দালাল পাকড়াইলেন। ঠিক এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের বেনামী রচনাগুলির একটি সুষ্ঠু পঞ্জী প্রস্তুত করিবার খেয়াল মাথায় আসিয়াছে। পুরাতন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' 'ভারতী' প্রভৃতি ঘাঁটিয়া নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত অনেক নামহীন ও কল্পিত-নামাঙ্কিত রচনা রবীন্দ্রনাথের বলিয়া চিহ্নিতও করিয়াছি। একবার খোদ কর্তাকে দিয়া যাচাই করাইয়া

লওয়ার প্রয়োজন। মেদিনীপুরের আবেদন এবং আমার আবেদন একসঙ্গে একটি চিঠিতে পেশ করিলাম। কবি তখন মংপুতে হাওয়া-বদল করিতে গিয়াছেন। সেখান হইতে ১১ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখে লেখা এই চিঠি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাইলাম—

"ওঁ

মংপু দার্জিলিঙ

কল্যাণীয়েষু,

পুজোর ছুটি এখানে কাটিয়ে তবে স্বস্থানে ফিরব। আমার রচনাপঞ্জী সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাও কোরো কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য উত্তর পাবার আশা রেখো না। আমার পঞ্জিকার তারিখ আন্দাজের দ্বারা চালিত। তার কারণ আমার মনে ঘটনার পূর্বাপরতা বোধ তথ্যমূলক নয়, অনুভূতির স্পষ্টতা অনুসারে তারা আপনার পংক্তি গ্রহণ করে।

আমার শরীর সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা বোধ হয় তোমাদের ইচ্ছানুবর্তী। এ ঘর থেকে ও ঘর আমার পক্ষে বিদেশ। একে চলতে হয় সাবধানে, অভ্যস্ত নিয়ম আঁকড়ে ধরে—নতুন জায়গায় সেটা সহজসাধ্য হয় না কষ্টকর হয়। মেদিনীপুর যেতে হলে আমার পক্ষে একটা দৈহিক বিপ্লব হবে।

কলকাতায় তোমার সঙ্গে দেখা হলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব। বস্তুত যথার্থ হিসাব মতে আমি অতীতের পর্যায়ভুক্ত, কোনো মতে বর্তমানে আমার টিঁকে থাকা যাকে বলে এনাক্রনিজ্‌ম অর্থাৎ সময়লঙ্ঘন দোষ। ইতি ১১।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

আমি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', 'ভারতী' প্রভৃতি হইতে যুক্তির জালে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি ছাঁকিয়া একটা সবিবরণী তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম। 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লিখিত নবীনচন্দ্র সেন কর্তৃক ১৮৭৭ সনে হিন্দুমেলায় গাছতলায় শ্রুত কবিতাটির সন্ধান কোথাও না পাইয়া সেটি এবং বাল্যকালে জ্যোতিষ সম্পর্কে তাঁহার লেখা—উভয় বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নসহ তালিকাটি রবীন্দ্রনাথের নিকট ১২ই অক্টোবর তারিখেই পাঠাই। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল জ্যোতিষ-বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ছাপা হইয়াছিল। তাঁহার সে বিশ্বাস যে ভুল আমি সে কথাও লিখিয়াছিলাম। মংপু হইতে ১৫ই তারিখে লেখা এই জবাব আসে—

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি আমাকে মুস্কিলে ফেললে। তোমার পঞ্জীতে যে লেখাগুলি উদ্ধৃত করেছ তার অধিকাংশ মনে আনতে পারচি নে। অর্থাৎ এদের পক্ষে বা বিপক্ষে হলফ পড়ে সাক্ষ্য দেবার মত স্পষ্ট ধারণা আমার নেই। অতএব তোমাদের তরফ থেকে আমার পঞ্জীতে এদের যদি স্থান দেও উচ্ছেদ করবার মত জোর আমার নেই। বাল্যলীলায় এরকম প্রলাপোক্তিকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিতে হবে। অতএব তোমাদের প্রমাণগুলিকে অঙ্গীকার করে নেওয়া গেল। প্রথম লর্ড লিটনের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে যে কবিতা লিখেছিলুম হিতৈষীদের সতর্কতা মান্য করে সেটা লোপ করে দেওয়া হয়েছিল। মনে আছে, কেউ কেউ সেটা হাতে লিখে প্রচার করে বেড়াতেন।

পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপান হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন বালক শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোন যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশ-যোগ্য রূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোন লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোন অন্যায় করা হয় নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার আমার মনে থাকতে পারত না। ঝান্সির রাণী ও সান্ত্বনা প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছুই মনে নেই। ইতি ১৫।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

১৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) এই পত্র আমার হস্তগত হয়। আমি তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সেই দিনই তাঁহার জ্যোতিষ-বিষয়ক রচনা সম্বন্ধে লিখি—

"সেই সময়ের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ঘাঁটিয়া দেখিতেছি, ১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায় "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র" নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম নয় কল্পে জ্যোতিষ-বিষয়ে অন্য কোন প্রবন্ধ নাই। ১৭৯৫ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আপনি আপনার পিতৃদেবের সহিত ড্যালহৌসি পাহাড়ে ছিলেন। সুতরাং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়া থাকিলে এই সুবৃহৎ প্রবন্ধই আপনার লিখিত প্রথম গদ্য-প্রবন্ধ—'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫ তারিখে প্রকাশিত আপনার নামাঙ্কিত সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা "হিন্দু মেলার উপহার" কবিতারও প্রায় দুই বৎসর পূর্বে ইহা মুদ্রিত। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখিতেছি, ইহা ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ কোনও প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তির লেখা—পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত তুলনামূলক বহু আঙ্কিক সিদ্ধান্তও ইহাতে আছে। তৎকালে অঙ্কে আপনি এতখানি পাকা থাকিলে পরবর্তীকালে কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা নিশ্চয়ই পাইতাম না।"

এই চিঠির সঙ্গে মাসীমার একটি লেখা কবির গোচরে আনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। ১৯শে তারিখেই তিনি জবাব দিলেন—

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এখান থেকে ৫ই নবেম্বর নাগাদ কলকাতায় ফেরবার সংকল্প করেছি। তখন তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় আলোচনা হবে।

হেমন্তকুমারীর লেখাটি খুব ভাল লাগল; রচনাটি সুনিপুণ এবং আধুনিক জবানীতে যাকে বলে "সাবলীল।" ইতি। ১৯।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

অক্টোবর মাসের শেষে আমি পূজাবকাশে দেওঘর গেলাম। মংপুর ২৬শে তারিখে ঠিকানা-পরিবর্তিত এই চিঠি সেখানে ২৯শে অক্টোবর পাইলাম—

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

৫ই নবেম্বর এখান থেকে আমার যাত্রা সুনিশ্চিত। অনিশ্চয়তার জাল ফেলে যে ধীবরবৃত্তি করেন সে সম্বন্ধে কোন কথা বলতে সাহস করিনে। ইতি ২৬।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

ইতিমধ্যে "রবীন্দ্র-রচনাবলী"র প্রথম কিস্তিসহ কার্তিকের (১৩৪৬)

'শনিবারের চিঠি' বাহির হইয়াছে এবং তাহা পাঠে কলিকাতার রবীন্দ্র-ভক্তমহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিষ-গবেষণাকে বাতিল করিয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র "হিন্দু মেলার উপহার" কবিতাকেই তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনায় গৌরব দিয়াছিলাম।

কবি নির্দিষ্ট দিনে কলিকাতা হইয়া শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন। আমিও নবেম্বরের মাঝামাঝি দেওঘর হইতে ফিরিয়া শান্তিনিকেতনে কবির সহিত "মোকাবিলায়" যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। ভাল করিয়া 'তত্ত্বেবোধিনী পত্রিকা'র পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসের (১৮৭৪ সনের নবেম্বর-ডিসেম্বর) ১৪৮-৫০ পৃষ্ঠায় "অভিলাষ" শীর্ষক একটি কবিতা নজরে পড়িল, পূর্বে অনবধানতাবশতঃ ইহা আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল। লেখকের নামের স্থলে লেখা আছে "দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত"। ৩৯ স্তবকে সম্পূর্ণ একটি দীর্ঘ কবিতা, এবং অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, কবিতাটি পয়ারে রচিত হইলেও সম্পূর্ণ মিলহীন—কিন্তু মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়। বালক কবি যে কবি হেমচন্দ্রের অনুকারী ভক্ত তাহাতেও সন্দেহ নাই। পর-বৎসর (১৮৭৫) 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত "হিন্দু মেলার উপহার" কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িতে গিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, উভয় রচনাই একই হাতের লেখা, দুইটিই হেমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত। কবির বয়সও সাক্ষ্য দিল ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা, ১৮৭৩-৭৪ সনে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কবিতা লিখিতে পারে এমন দ্বাদশবর্ষীয় বালক আর কেহ ছিল না।

এই আবিষ্কার করিয়া প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। বিলম্ব সহিতেছিল না। সুতরাং বমাল শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলাম। সেদিন ২১ নবেম্বর তারিখ। দ্বিপ্রহরেই খাইবার টেবিলে পুথিপত্র লইয়া বসিলাম। বলিলাম, আপনাকে একটা কবিতা শুনাইব, শুনুন তো। পত্রিকাটি একটু আড়ালে রাখিয়া "অভিলাষ" পড়িতে লাগিলাম। খানিকটা পড়িবার পরই বৃদ্ধের মুখ চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ও তো আমার লেখা হে, তুমি কোথায় পেলে? পত্রিকাটি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম। তিনি সবটা দেখিয়া উল্লাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, তাই তো, এ তো দেখছি আমারই লেখা।

সংবাদ শান্তিনিকেতনে রটিতে বিলম্ব হইল না। কলিকাতার সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিরা সেখানে ছিলেন। তাঁহারা টেলিগ্রাম-যোগে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা আবিষ্কারের সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

যাবতীয় সংবাদপত্রে বড় বড় হেডিংয়ে আমার নামের সহিত যুক্ত হইয়া সংবাদ প্রচারিত হইল।

ওই ২১শে নবেম্বরের সন্ধ্যা আমার জীবনের একটি স্বর্ণসন্ধ্যা। রবীন্দ্র-রচনার নষ্টোদ্ধার ছাড়াও সেদিন তাঁহাকে একখানি বই ও একটি চিঠি দেখাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। দুইটি বস্তুই কলিকাতার ফুটপাথে সংগ্রহ করা। বইটি হইতেছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া কবি বিহারী-লালের গ্রন্থাবলী, বিহারীলালের স্বাক্ষর সম্বলিত। দাতা ও গ্রহীতার গৌরবেই বইখানির চরম গৌরব নয়। বালক রবীন্দ্রনাথ বইখানি পড়িয়া-ছিলেন এবং বইয়ের মার্জিনে বিবিধ মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের বিহারীলাল-শিষ্যের বিহারীলাল-কাব্যে ইহাই প্রথম প্রবেশদ্বার। চিঠিখানি পাইয়াছিলাম রবীন্দ্রাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের স্বব্যবহৃত মহর্ষির আত্ম-জীবনীর মধ্যে। প্রথম বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে বোম্বাইয়ে যে কিশোরী রবীন্দ্রনাথকে ভাল ইংরেজী শিখাইতে বসিয়া নিজেই ভাল বাংলা শিখিয়া-ছিলেন ও সেই সময় 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'কবি-কাহিনী' (১৮৭৮ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত) যিনি সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে "নলিনী" নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথ কিছু কবিতা-গানও রচনা করিয়াছিলেন, চিঠিটি ১৮৭৮ সনে তিনিই লিখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের কোন অগ্রজকে। তিনি বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ডাক্তার দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের কন্যা অ্যানা। বস্তু দুইটি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রায় আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং সেই সন্ধ্যাতেই স্বহস্ত-অঙ্কিত একখানি ছবি, তাঁহার ব্যবহৃত একটি আলখাল্লা এবং 'তপতী' নাটকে অভিনয়কালে তৎকর্তৃক পরিহিত শিরস্ত্রাণটি আমাকে দান করিয়া ধন্য করেন। রচনাপঞ্জী আবিষ্কার সম্পর্কে আমার কৃতিত্বের একটা পাকা সার্টিফিকেটও স্বহস্তে লিখিয়া দেন।

দশম তরঙ্গ

কবির শেষ কাজ ও শেষ কথা

রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেটটি অংশত এই :—

"শ্রীমান সজনীকান্ত দাস আমার বাল্য ও কৈশোরের বেনামী রচনাগুলি আবিষ্কার করে আমাকে বিস্মিত করেছেন। পুরাতন তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় আমার সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা "অভিলাষ" তাঁহার

অভিনব আবিষ্কার। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটেছিল। জ্যোতিদাদার প্রথম চারটি নাটকের অধিকাংশ কবিতা ও গান যে আমার রচনা তা সজনীকান্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি। হিন্দুমেলায় দিল্লীদরবার সম্বন্ধে আমার পঠিত কবিতাটি "স্বপ্নময়ী"তে আত্মগোপন করে ছিল সেটাও সজনীকান্তের ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে।...আমি যে দিকশূন্য ভট্টাচার্য ও অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর ইত্যাদি ছদ্মনামে এককালে অনেক লেখাই লিখেছি তা জেনেও বেশ কৌতুক বোধ করছি।...এখানে বলা আবশ্যক শেষোক্ত নামটি কোনো লেখক অন্য কোনো কোনো রচনায় আত্মসাৎ করেছেন বলে আমার সন্দেহ হচ্চে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন ২১৷১১৷৩৯"

এই নষ্টোদ্ধারের ফলে রবীন্দ্রনাথ এমনই খুশী হইয়া উঠিলেন যে আমি অচিরাৎ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র সম্পাদক-মণ্ডলীভুক্ত হইলাম; অক্টোবর হইতেই তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রথম খণ্ডে 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র পূর্বে রচিত যাবতীয় কাব্য এবং বহু প্রবন্ধ চিঠিপত্র ইত্যাদি পরিত্যক্ত হওয়াতে আমরা কবির নিকট দরবার করিলাম যে, তাঁহার রচনার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বাল্য ও কৈশোরের রচনাগুলিরও গ্রন্থাবলীভুক্ত হওয়া আবশ্যক। কবি জোর গলায় বলিলেন, "সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি ইতিহাসের ধারা মানি নে।" শেষ পর্যন্ত অনেক অনুনয়-বিনয়-ধস্তাধস্তির পর "অচলিত সংগ্রহ" আখ্যা দিয়া 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র কয়েকটি খণ্ড প্রকাশে অনুমতি দিলেন। অক্টোবর মাসে যে 'রচনাবলী' প্রকাশ শুরু হইয়াছিল পার্থক্য বুঝাইবার জন্য তাহাদের "প্রচলিত সংগ্রহ" আখ্যা দেওয়া হইল। "অচলিত সংগ্রহে"র সম্পূর্ণ ভার পড়িল ব্রজেন্দ্রনাথ ও আমার উপর। আমরা পরবর্তী অক্টোবরে (১৯৪০) অচলিতের প্রথম খণ্ড কবির হাতে দিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিলাম। অচলিতের আর একটি খণ্ড মাত্র পরে বাহির হইয়াছে। সাময়িক পত্রে মুদ্রিত অসংখ্য রচনা এখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াই পড়িয়া আছে।

একুশে নবেম্বরের (১৯৩৯) সফরেই কবির সহিত আলোচনান্তে আমারই নির্দেশ অনুযায়ী স্থির হইয়াছিল যে, যে সকল গ্রন্থে প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে 'রচনাবলী'তে মুদ্রিত হইবার কালে তাহাদের পাঠান্তরগুলিও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া প্রয়োজন। 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জনে'র ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন একটু

বেশী মাত্রায় করা হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের এই মত অনুসরণ করিতে বাধা ছিল, প্রধান বাধা 'রচনাবলী' প্রকাশে বিলম্বের ভয়। আমি কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পরই রবীন্দ্রনাথ 'রচনাবলী'-মুদ্রণের অধিনায়ক শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে এই পত্রাঘাত করিলেন—

"কল্যাণীয়েষু,

সজনীকান্তের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেছি যে রাজা ও রাণী ও বিসর্জনের পাঠান্তরগুলি দ্বিতীয় খণ্ডেরই পরিশিষ্ট ভাগে প্রকাশ করা কর্তব্য —নইলে তার উপযোগিতা ব্যর্থ হবে। ইতি ২৩।১১।৩৯

রবীন্দ্রনাথ"

কিন্তু এই "কর্তব্য" শেষ পর্যন্ত পালিত হইল না। গৃহিণীর সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও রান্না-ঘরে যেমন সূপকারের মতলবই হাসিল হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং তৎসহ আমি চোখ বুজিয়া ঢোক গিলিলাম।

এদিকে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন-দিবস দ্রুত আগাইয়া আসিতে লাগিল। কবিকে রাজী করানো হইতে মেদিনীপুরে হাজির করানো পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব আমার। বহু কষ্টে রাজী করাইয়াছি। এইবারে মেদিনীপুর-কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের জন্য তাগাদা দিতে লাগিলেন, একটু আগে না পাইলে সুষ্ঠুভাবে ছাপা যাইবে না। এক-ঢিলে-তিন-পাখী-মারী এক পত্র লিখিলাম; আমার তিন লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের জবাব হইতেই মালুম হইবে :

"কল্যাণীয়েষু,

তোমার কাছ থেকে তাড়া পাবার বহু পূর্বেই অভিভাষণ শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।

রচনাবলী সম্বন্ধে সমস্যা তোমার দফতরে জমে উঠছে। তাই নিয়ে পত্রযোগে কথা চালাচালি আমার পক্ষে বড় দুঃসাধ্য। সেই কারণে একটা প্রস্তাব আমার মাথায় এসেছে। তোমরা ঠিক করেছিলে সময় বাঁচাবার জন্য হাওড়ায় যান পরিবর্তন করা যাবে। আমি মনে করি তা না করে রচনাবলী প্রভৃতি নানা পরামর্শ মোকাবিলায় ঐ সময়ে চুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে। দেহটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাকা আমার পক্ষে হয় ত শ্রেয় হতে পারে।

গানগুলো কালানুক্রম অনুসরণ করে মাঝে মাঝে দিলেই তো ভাল

হয়। সেটাও বেশী উপভোগ্য হবে। পাঠান্তরগুলো তৃতীয় খণ্ড থেকে মূল গ্রন্থের সঙ্গে রেখে ছাপানোই সঙ্গত হবে। এমন কি আমার মতে রাজা ও রাণী ও বিসর্জনের বর্জিত অংশ তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে দেওয়াই উচিত। তাদের দর্শন প্রাপ্তির জন্যে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করা বিড়ম্বনা। ছোটখাট পাঠান্তর পাদটীকায় দিলে কি দোষ আছে? এই প্রণালীতেই পাঠকেরা যথার্থ উপকৃত হবে।

মানসীর "শেষ উপহার" কবিতা যে-ইংরেজী কবিতার ইঙ্গিত নিয়ে রচিত সেটা লোকেন পালিতের রচনা*।

কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে যদি এখানে আসতে চাও যেদিন তোমার অবকাশ আসতে পারো।—আমার পক্ষে আজও যেমন কালও তেমন— ইতি

রবীন্দ্রনাথ

৩০।১১।৩৯"

'রচনাবলী'তে গানগুলির সন্নিবেশ সম্পর্কেও লেখকের ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই, প্রযোজকেরা নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা-অনুযায়ীই অভিনয় করিয়া গিয়াছেন।

মেদিনীপুর-যাত্রা সম্পর্কে হঠাৎ এক উটকো বাধা উপস্থিত হইল। আমি রবীন্দ্রনাথকে আশ্বাস দিয়াছিলাম, তাঁহাকে মেদিনীপুরে একটি স্বতন্ত্র বাড়িতে সম্পূর্ণ তাঁহার ইচ্ছাধীনে রাখা হইবে। সমস্ত ব্যবস্থা তদারক করিবার জন্য রবীন্দ্র-নাথের খাস-সচিব শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরীকে "পাইলট" হিসাবে প্রেরণ করা হইলে তিনি কর্তাকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহাকে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীর হেফাজতে রাখা হইবে। তিনি বিগড়াইয়া গেলেন এবং ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন-ছাত্রী, মেদিনীপুরের জেলা-অধিকর্তা শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের সহধর্মিনী শ্রীমতী চিরপ্রভা সেনকে লিখিলেন—

কল্যাণীয়াসু চির,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম। কিছুদিন থেকেই মেদিনীপুরে যাবার আলোচনা চলছে। তোমাদের দূত সজনীকান্তের সঙ্গে এই কথা

---

* ১৮৯০ ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত 'মানসী'র "ভূমিকা"য় ছিল: "'শেষ উপহার' নামক কবিতাটি আমার কোন বন্ধুর রচিত এক ইংরাজি কবিতা অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছি।"

স্থির করেছি যে আমাকে একলা কোন বাড়িতে যেন রেখে দেওয়া হয়—আমার অভ্যেস সম্পূর্ণ নিরালায় থাকা—এখানেও আমি একখানা বাড়িতে একলা থাকি। সজনী তাই বলেছিলেন—আমাকে স্বতন্ত্র বাড়িতে স্থান দেবেন, তাতে আমার অনেকটা ক্লান্তি দূর হবে।··· ইতি

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪।১২।৩৯”

রবীন্দ্রনাথ ৬ই ডিসেম্বর তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে আমাকে লিখিলেন :

“কল্যাণীয়েষু,

সুধাকান্তকে বাহন করে তুমি এখানে উপস্থিত হয়ে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করবে কথা ছিল। সে সম্বন্ধে তোমাদের উভয় পক্ষের কাছ থেকেই কোনো কথা পাওয়া গেল না! এদিকে কর্পোরেশন পথের মধ্যে থেকে আমাকে হরণ করে নেবেন রব উঠেছে, প্রস্তাবটার নিষ্পত্তি করবেন সুধাকান্ত তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে এই ছিল কথা, মন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো খবর পাই নি। এটা বিজ্‌নেসলাইক নয়। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের দর্শন দেবেন কি না তারও কোনো আভাস পাই নি। চির (ম্যাজিস্ট্রেট-জায়া) তাঁর বাড়িতে আমাকে অতিথি রূপে পেতে চান, আমি একটি সম্পূর্ণ নিরালা বাড়ির দাবি জানিয়েছি। তুমি তো সেই রকম আশ্বাস দিয়েছিলে। এখন কি ব্যবস্থা পরিবর্তনের আশঙ্কা আছে না কি। তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় সব কথা পরিষ্কার হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

তুমি যে সংস্কৃত শ্লোকের তর্জমা পাঠিয়েছ তার ভাষাটা আমার সেকালে ভাষারই মতো কিন্তু স্মৃতির নিশ্চিত সাক্ষ্য পাচ্ছি নে। সেকালে তত্ত্ববোধিনীতে এ রকম কবিতা লিখিয়ে আর কেউ ছিল বলে মনে তো পড়ে না। ইতি

রবীন্দ্রনাথ”

১৭৯৮ শকের মাঘ অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় প্রকাশিত মূল কবিতা ও তাহার অনুবাদটি এই : রবীন্দ্রনাথ তখন সাড়ে পনের বছরের বালক।

“তারাকদম্বকুসুমান্যবকীর্য্য দিক্ষু
ক্ষেমায় সর্ব্বজগতাং স্বকরৈঃ প্রকাশং।

হিণ্ডীরপাণ্ডবরুচিঃ শশলাঞ্ছনোঽয়ং
নীরাজয়ন্ ভুবনভাবনমুজ্জিহীতে ॥
স্বৈরং শৈলবনাবলীং বিঘটয়ন্ সংক্ষোভয়ন্ সাগরং
প্রধ্মাতৈর্গিরিকন্দরান্ মুখরয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডমুদ্বোধয়ন্ ॥
বায়ো ত্বং শুভশঙ্খচামরভবাং প্রীতিং বিধেহি প্রভোঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপকোঽয়মুদগাৎ ব্যোম্নি স্ফুরত্তারকে ॥

তারকা-কুসুমচয় ছড়ায়ে আকাশময়
চন্দ্রমা আরতি তাঁর করিছে গগনে।
দুলায়ে পাদপগুলি সাগরে তরঙ্গ তুলি,
জাগাইয়া জগতের জীবজন্তুগণে।
পর্ব্বতকন্দরে গিয়া শুভ শঙ্খ বাজাইয়া,
পবন হরষে তাঁরে চামর দুলায়।
অগণ্য তারকাবলী চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গল কনকদীপ গগনের গায় ॥”

কলিকাতার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ডিসেম্বর মাসের ১৩ তারিখ শান্তিনিকেতন পৌঁছিলাম। মহা উৎসাহে ৭ই পৌষের উৎসব-আয়োজন চলিতেছে। ইহার সহিত মেদিনীপুর-অভিযানের হৈ-হৈ মিশিয়া শান্তিনিকেতন সরগরম। ক্ষিতিমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের খাস ভৃত্য বনমালী পর্যন্ত সকলেই বরযাত্রী হইবার জন্য তল্পি-তল্পা বাঁধিতেছেন। সুধাকান্ত মেদিনীপুরে তাম্বু গাড়িয়া বসিয়া আছেন, কাজেই শ্রীঅনিলকুমার চন্দের ছুটাছুটির অন্ত নাই। ১৫ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে পূর্ব-বন্দোবস্ত মত একটি ফার্স্ট ক্লাস বগি বোলপুর স্টেশনের সাইডিংয়ে হাজির করা হইল। বিপুল রাজকীয় সমারোহে সপারিষদ্ কবি তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন; অনিল চন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, কৃষ্ণ কৃপালনী প্রভৃতি আমরা কয়েকজন, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথের নিকট ঠেলিয়া দিয়া পাশের কামরায় গুলতানি করিতে করিতে চলিলাম। গুসকরায় কবির কক্ষে আমাদের ডাক পড়িল। দেখিলাম তিনি মহা উৎসাহে নানা ধরনের টিফিন কেরিয়ারের বাটি খুলিয়া সকলের প্রাতরাশের ব্যবস্থায় মাতিয়াছেন। পরোটা আলুর দম ও হালুয়া প্রধান উপকরণ। তিনি স্বয়ং প্রত্যেকের হাতে হাতে ভোজ্য বাঁটিয়া দিলেন। আমরা দুই-এক টুকরা পরোটা গলাধঃকরণ করিলে সকৌতুকে প্রশ্ন করিলেন, পরোটা কেমন লাগছে হে? এইরূপ প্রশ্নের কারণ সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া

রহিলাম, মৃদু হাস্যের সহিত তিনি বলিলেন, ক্যাস্টর অয়েলে ভাজা অথচ তোমরা কেউ ধরতেই পারলে না। অনিল ও আমি "মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে"র দল—ইহাতে মোটেই ভয় পাইলাম না। বরঞ্চ আর দুইখানা করিয়া পরোটা যাচিয়া লইয়া কবির আনন্দবিধান করিলাম। কিন্তু দেখিলাম গোলবদেহী অমিয় চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ কৃপালনী রীতিমত ভড়কাইয়াছেন।

কলিকাতায় পৌঁছামাত্র দেখি প্লাটফর্মে কলিকাতা কর্পোরেশনের মুরুব্বিরা দল বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। আমার সহিত পূর্বেই তাঁহাদের স্থির হইয়াছিল যে, হাওড়ায় কবি পৌঁছিলেই তাঁহারা তাঁহাকে কলিকাতা পৌরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "খাদ্য ও পুষ্টি" বিষয়ক সভায় পৌরোহিত্য করাইবার জন্য লইয়া যাইবেন ও যথাসময়ে মেদিনীপুরগামী ট্রেন ছাড়িবার পূর্বে হাজির করিয়া দিবেন। আমি সেই অবসরে কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর তীর্থযাত্রীদের সংগ্রহ ও যাত্রার ব্যবস্থা করিব। একে একে সকলে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য যদুনাথ সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত দাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার, রামকমল সিংহ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শান্তি পাল এবং গানের দলে কালিপদ পাঠক, অনাদি দস্তিদার, সতী ঘোষ, জয়া দাস, বিজয়া দাস, সুজিৎরঞ্জন রায়, সাগরময় ঘোষ প্রভৃতির সমাগমে হাওড়া স্টেশন মুখর হইয়া উঠিল। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী এই ফাঁকে কলিকাতায় তাঁহার শুভাগমন প্রত্যাশায় মুলতুবি-রাখা কয়েকটি বৈদিক বিবাহের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যও সারিয়া আসিলেন। মোটের উপর, এমন অপূর্ব জমায়েত আমাদের কালে কদাচিৎ ঘটিতে দেখিয়াছি। রাজেন্দ্র-সঙ্গমে শুধু দীনেরাই নন, নবীন ও প্রবীণেরাও সোল্লাস-কোলাহলে তীর্থযাত্রায় চলিলেন।

১৬ই ডিসেম্বর (১৯৩৯), ৩০শে অগ্রহায়ণ (১৩৪৬) শনিবার প্রাতঃকাল বেলা দশটার সময় নবনির্মিত বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরের অলিন্দে ও প্রাঙ্গণে হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে সেই ঐতিহাসিক দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। 'উপক্রমণিকা'র পদপ্রান্তে 'প্রান্তিকে'র নতি-নিবেদন—সেই মহান্ দৃশ্য সেদিন যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারা সৌভাগ্যবান। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বারোদ্ঘাটন-ভাষণে যখন বলিলেন, "বঙ্গ-সাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার ক'রে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—" তখন সেই অনন্য-সাধারণ স্বীকৃতিতে শ্রোতারা রোমাঞ্চিতগাত্র হইলেন। অভিনন্দনের উত্তরে

বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বাংলা-সাহিত্যগদ্যের প্রথম প্রবর্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া বঙ্গবাণীর চরণে তাঁহার জীবনের শেষ অর্ঘ্য এই বলিয়া নিবেদন করিলেন—

"আমি আয়ুর শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি। এইটাই আমার শেষকৃত্য, শেষ উপহার, শেষ উৎসর্গ। মেদিনীপুর তীর্থরূপ নিয়ে আমাকে আহ্বান করেছে এই পুণ্যক্ষেত্রে।···বঙ্গ-সাহিত্যের উদয়-শিখরে যে দীপ্তিমানের আবির্ভাব হয়েছিল, অস্তদিগন্তের প্রান্ত থেকে আমি প্রণাম প্রেরণ করছি তাঁর কাছে। যাবার সময় এইটাই আমার শেষ কাজ মনে করুন। ভবিষ্যতে আপনারা মনে করবেন, কবি শেষ কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য আপনাদের মাঝে এসে নিবেদন ক'রে গেছেন—যিনি চিরকালের মত আমাদের দেশে গৌরবান্বিত তাঁরই উদ্দেশে।"

এই ঐতিহাসিক "পূজা দর্শন" করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলাম বলিয়াই নয়, সংঘটনকারীদের একজন ছিলাম বলিয়া আমি চিরদিন গৌরব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিব।

বৎসর ফিরিয়া গেল। 'রচনাবলী' প্রসঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। কবির উপর অন্যান্য ফাই-ফরমাসের দাবিও চলিতেছে। ইতিমধ্যে অমলা দেবীর "ন্যাড়া" "মনোরমা" প্রভৃতি গল্পগুলি সঙ্কলন করিয়া 'মনোরমা' নাম দিয়া গ্রন্থাকারে বাহির করিয়াছি। শান্তিনিকেতনে গিয়া প্রথম কপি স্বহস্তে যেদিন রবীন্দ্রনাথকে নিবেদন করিলাম, সেই দিন দ্বিপ্রহরেই উঁকি মারিয়া দেখিলাম কবি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া নিবিষ্ট মনে তাহা পাঠ করিতেছেন। বৈকালে চায়ের টেবিলে বলিলেন, লেখকের অসাধারণ মুন্সিয়ানা আছে হে। আমি বলিলাম, লেখক বলছেন কেন, লেখিকা বলুন। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কয়েকবার সারা পৃথিবী পরিক্রমা করে এসেছি, সব দেশের সাহিত্যের সঙ্গেই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে, কিন্তু কোথাও বাপু, নারীর কলম দিয়ে এমন নিষ্ঠুর লেখা বেরতে দেখি নি। তুমি আমার লেগপুল করতে পারবে না। আমি আর কিছু না বলিয়া বইখানির উপর তাঁহার একটু মন্তব্যের দাবি জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। ৬ই জানুয়ারী (১৯৪০) পত্র সহ প্রার্থিত বস্তু পাইলাম। পত্রটি এই ঃ

"কল্যাণীয়েষু

নাৎনির [নন্দিনী] অতলস্পর্শ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি কয়দিন হাবুডুবু খেয়েছি। স্থির করেছিলুম এবার নৈষ্কর্ম্য সাধন করব—কিন্তু শনৈশ্চরের

দয়ামায়া নেই, নানাপ্রকার দাবীর উদ্ধাবর্ষণ চলছে। আজকাল আমার স্প্রিং-ভাঙা কলম নিয়ে ঠেলাঠেলি করতে শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, তবু কি এই পথেই অন্তিমকৃত্যের হলকর্ষণ চলবে, উত্তরগোষ্ঠের কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না ?

তোমার সময়মত একবার এসো, বানানের মন্ত্রণাসভা বসানো যাবে। রচনাবলী সম্বন্ধেও পরামর্শের প্রয়োজন থাকতে পারে। সুধাকান্ত জ্বরে শয্যাগত।

চারুবাবুকে [শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য] একবার জিজ্ঞাসা কোরো আমার যে সব ইংরাজি রচনা ম্যাকমিলানের স্বত্ববহির্ভূত সেগুলোকে তোমাদের প্রকাশযজ্ঞে আহুতি দেওয়া চলবে কি না। বাঙালির রচনা বলেই সেগুলি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয় এমনতর জনশ্রুতি আছে।

মনোরমা সম্বন্ধে কয়েক লাইন লিখে দিলুম ক্লান্ত অবকাশের "সাবলীল" আলস্যভরে। ইতি

৪।১।৪০ রবীন্দ্রনাথ"

এই কয়েক লাইনের মধ্যে তিনি "লেখক" শব্দটাই ব্যবহার করিয়াছিলেন। লেখাটি 'প্রবাসী'তে বাহির হইয়াছিল।

ঠিক এই সময়ে বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কোন দিক দিয়া ঠেকা না দিলে খাড়া রাখাই মুশকিল হইতেছিল। অমিয় চক্রবর্তী তখন বেতনভোগী, তাঁহার বেতন জোগানও কঠিন হইয়াছিল। আমি ১০ই জানুয়ারি আবার শান্তিনিকেতনে গেলে কবি আমাকে এই দুই বিষয়েই সচেতন করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, যদি যোগাযোগ ঘটাতে পার তোমাকে যে "অবচেতনার অবদান" ছবিটি এঁকে দিয়েছি তার উপর একটি কবিতা লিখে দেব। কলিকাতায় ফিরিয়া এই দুই বিষয়েই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। কথা ছিল টাকার জন্য ঝাড়গ্রামরাজের নিকট এবং অমিয় চক্রবর্তীর জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দরবার করিব। ঝাড়গ্রামরাজকে ঠিক এই সময়ে ঝাড়গ্রামে বীরসিংহে ও মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিরক্ষা-ব্যপদেশে একটু অতিরিক্ত রকম দোহন করা হইয়াছে; বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী প্রকাশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে সদ্য সদ্য দশ হাজার টাকা দিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা তখন সত্য সত্যই অনুকূল নয়। এখানে বিফল হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সফল হইলাম। ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তখন ইংরেজী বিভাগের কর্তা। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করেন। দেখিলাম তিনি নানা কারণে চক্রবর্তী মহাশয়ের পক্ষপাতী নহেন। তবু রবীন্দ্রনাথের

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

দোহাই পাড়িয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে রাজী করাইলাম এবং সে কথা পত্রযোগে কবিকে জানাইলাম। অর্ধেক সফলতার জন্য "অবচেতনার অবদান" দাবি করিলাম। জবাব আসিল :

"কল্যাণীয়েষু,

অবচেতনার অবদান সম্বন্ধে তোমাকে মুখে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম তার কোনো আইনসঙ্গত দাম নেই। লেখনযোগে পাকা দলিলে দিতে পারি যদি এখানে ঝাড়গাঁর সংস্রব লাভ করি। অতএব সে জন্যে সবুর করতে হবে। যদি ফসকে যায় তা হলে মন অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠবে, অবচেতনা যাবে অবচেতনে তলিয়ে।

অমিয় ভাগলপুরে। আজ তাকে টেলিগ্রাফ করেছি আসতে, যথাসময়ের পূর্বেই যাতে যথোচিত উপায় করা হয় তার ব্যবস্থা করা যাবে কিন্তু "বিজয়ায় সঞ্জয়" আশা করচিনে। আমাদের বোধ হচ্চে নৌকোডুবি হালো, যদি হয় সেটা ইতিহাসে অভূতপূর্ব, ক্ষতিপূরণের ভার তোমাদেরই নিতে হবে! এটা যে ঠিক দুঃশাসনের বস্ত্রহরণ, লজ্জা নিবারণ কে করবে? ইতি

২০।১।৪০ রবীন্দ্রনাথ"

যাহা হউক, অমিয় চক্রবর্তী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল হইলেন এবং একদিন প্রাতঃকালে আমার মাহেনবাগানের বাসায় আসিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া গেলেন। ফেব্রুয়ারী মাসের ২রা তারিখে হঠাৎ শান্তিনিকেতন হইতে কবির জরুরি তলবপত্র হস্তগত হইল—

"কল্যাণীয়েষু,

আগামী রবিবারে পুলিন [পুলিনবিহারী সেন] আসচেন রচনাবলী উপলক্ষ্যে। ঐ আলোচনাক্ষেত্রে তোমার উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক। আমি একাকী অসহায়—আমাকে যদি সাহায্য না কর আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে। ইতি বৃহস্পতিবার

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

আমি পরদিন অর্থাৎ ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার কবিসকাশে উপস্থিত হইলাম। সেদিন সেখানে বাঁকুড়ার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি কবিকে বাঁকুড়ায় এক সাহিত্য-সভায় আমন্ত্রণ জানাইবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের প্রার্থনা শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধ-সম্পৃক্ত

ছিল। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম এই সভার মূল উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাসকে প্রতিষ্ঠিত করা। ইঁহারা বিদায় লইলে আমি কবিকে যথাসাধ্য সচেতন করিয়া দিলাম, বিশেষ করিয়া ছাতনা গমন সম্বন্ধে।

দিন কয়েক পরেই ফাল্গুনের (১৩৪৬) গোড়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি-সমস্যা উপস্থিত হইল। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অবসর গ্রহণ করিতেছেন, ফাল্গুনের তৃতীয় সপ্তাহেই কর্মাধ্যক্ষ-নিয়োগ-সভায় নূতন সভাপতির নাম প্রস্তাব করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ কখনও পরিষদের সভাপতি হন নাই। পরিষদের সূত্রপাত হইতে পরবর্তী কয়েক বৎসর সহকারী সভাপতি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সভাপতিরূপে পাওয়া তখন অসম্ভব জানিয়াও আমি পত্রযোগে অনুরোধ জানাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসিল।

"কল্যাণীয়েষু,

> ন খলু ন খলু বাণং
> সন্নিপাত্যোয়মস্মিন্
> মৃদুনি কবিশরীরে—

তোমরা জানো কোনো রকম পতিত্ব করবারই বয়স আমার নয়—দোহাই তোমাদের, এই ধুলো-ওড়ানো ঝোড়ো দেশে কোনো উচ্চ চূড়ায় আমাকে চড়িয়ে দিয়ে মজা দেখো না। সভাপতিত্ব গ্রহণ করবার উপযুক্ত কুলীন সাহিত্যিক বাংলা দেশে অনেক আছে—সম্মার্জনী থেকে আরম্ভ করে বরমাল্য পর্যন্ত তাঁদের সহ্য করবার অভ্যাস আছে, আমি ভীরু, দেহে মনে আমি দুর্বল—যে কটা দিন বেঁচে আছি আমি শান্তি চাই।

আপাতত চললুম, বাঁকুড়ায়—চাণ্ডীদাসিক চক্রবাত্যার কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে থাকব। ফিরে আসব চৌঠো [মার্চ ১৯৪০] নাগাদ—তার পরে সাক্ষাতের প্রত্যাশা রইল—

রবীন্দ্রনাথ"

বাঁকুড়া হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি ৮ই মার্চ তারিখে ক্লান্ত দেহ-মনে লিখিলেন ঃ

"কল্যাণীয়েষু,

বাঁকুড়ায় যে রকম খাটতে হয়েছিল এমন কোথাও হয় নি। মাঝে

মাঝে আমার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে ভয়ের কারণ ঘটেছিল। কাউকে বলি নি, কর্তব্য করে গিয়েছি।... ইতি ৮।৩।৪০

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”

সেই বৎসর এপ্রিল মাসে শান্তিনিকেতনে গুরুতর গরম পড়িল। ১লা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) ২৫শে বৈশাখের উৎসব সারিয়া কবি কালিম্পংয়ের পথে কলিকাতায় আসিলেন, উঠিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের বরানগরের বাড়িতে। অব্যবহিত কাল পূর্বে আমি কলিকাতার ফুটপাথ হইতে একটি ইংরেজী বই সংগ্রহ করিয়াছিলাম—‘ন্যাশনাল কাউনসিল অব এডুকেশন, বেঙ্গল, কালেণ্ডার ১৯০৬-৮’। পুস্তকটির পরিশিষ্টে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র মুদ্রিত আছে, কয়েকটি বাংলা প্রশ্ন-পত্রের উপর লেখা দেখিলাম, “Paper set by/ Babu Rabindra Nath Tagore” অর্থাৎ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রশ্নগুলির ধরনধারণ সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হইল। মনে নানা প্রশ্ন জাগিল।

কর্তার তলব পাইয়াই বইখানি সঙ্গে লইয়া গেলাম। এই প্রশ্নপত্র সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ আমাকে সেদিন যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ১৯৪০ এপ্রিলের শেষ ভাগে বাংলা দেশের এবং বাংলার বাহিরের বহু দৈনিক সংবাদপত্রে মূল বাংলায় অথবা ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বদেশী আমলে তাঁহার কর্মজীবন কিরূপ ছিল তাহা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের নৈষ্কর্ম্য ও দুষ্কর্ম বাদের প্রভূত নিন্দা করিয়াছিলেন, ফলে সংবাদপত্রে প্রতিবাদ ও সমর্থনের বান ডাকিয়াছিল। মূল সাক্ষাৎকার বৃত্তান্ত ১৩৪৭ সালের বৈশাখের ‘শনিবারের চিঠি’তে বাহির হইয়াছিল। ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা—আজও অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। বাংলা দেশের জনসাধারণের কাছে ইহাই কবির সর্বশেষ কথা—মর্মান্তিক ক্ষোভের কথা।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন যাহা বলিয়াছিলেন আজও বাংলা দেশের পক্ষে তাহা সত্য—লজ্জাকরভাবেই সত্য। একটু উদ্ধৃত করিতেছি :

> “...এই আমাদের দেশ, এ দেশের কোন্ সফল কীর্তি আমরা আশা করতে পারি? আদুরে ছেলের মত আমরা আব্দারের ঠোঁট ফুলিয়ে ভাঙবার কাজেই আছি। গড়ার কাজ ধৈর্যের—পুরুষের। আমাদের দিয়ে তার কোনটা হ'ল না। শুধু মেয়েলি নালিশ—ওরা দিলে না এই অধিকার; সুতরাং কান্না শুরু কর, অলক্ষ্যে মাথা লক্ষ্য ক'রে ঢিল ছোঁড়। নিজেরা করব না, কাউকেও কিছু করতে দেব না।

একটা বড় আশ্চর্য জিনিস দেখছি এই বাংলা দেশে, যে সব পুরুষ এখানে দেশনেতার সম্মান লাভ করেন, নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মত ঘর-ভাঙা-ভাঙির খেলাকেই তাঁরা উচ্চ রাজনীতি ব'লে ঘোষণা করেন। তাঁদের পুরুষত্বে এতটুকু বাধে না। এখানকার লোকে তাই তিলে তিলে কিছু গ'ড়ে তোলবার জন্যে দল বাঁধে না, দল বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার পৈশাচিক আনন্দে। এ জিনিসকেও ক্ষমা করা যেত, যদি না দেখতাম, পেছনে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি তার দংষ্ট্রা বের ক'রে আছে।

এই সর্বনাশা প্রবৃত্তি দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠেছে বাংলা দেশে। বুদ্ধির অভাববশত নয়, এর মধ্যে দুর্বুদ্ধি আছে, আছে শয়তানী। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অসাধুতা তার জয়পতাকা তুলছে; স্বার্থবুদ্ধি এবং স্বেচ্ছাচার সকল কল্যাণকে করছে বিনষ্ট। অভিভাবকদের অন্নে পুষ্ট দায়িত্বহীন ছাত্রদের নীতি-অমান্যের সহজ প্রবৃত্তিকে স্বাধীনতার দাবি ব'লে ঘোষণা ক'রে তাদের ক্ষেপিয়ে অপরের সৎকীর্তি যারা ধ্বংস করতে চায়, তারা নামে এবং মহিমায় যেই হোক, আসলে দেশের প্রবল শত্রু। আজকের দিনে তারাই প্রবল হয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আমাদের বাঁচবার কোনও পথই নেই।

দেখ, আমার এই দীর্ঘজীবনের জন্যে এখন প্রায়ই মনে ধিক্কার জাগে। মনে এ আশাও নেই যে, কোনদিন এই ভাঙনের মধ্যে থেকেই সৃজনের দেবতার কাজ শুরু হবে। এখানে হবে না। মিথ্যার জঞ্জাল-স্তূপ থেকে সত্যের অঙ্কুর উদ্গত হতে পারে না।···

বাঙালীও সুযোগ পেয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম তার পরিচয়; সে যুগের বাঙালীরা এই পরিচয়কে কাজে লাগিয়েছিল, ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশকে পিছনে ফেলে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বাঙালী চলেছিল এগিয়ে। এই সাধনার পুরস্কার সে লাভ করেছিল তার শিল্প ও সাহিত্যের ফসলে। কিন্তু জাতিগঠনের কাজ তার একটুও এগোয় নি। কারণ, শিল্প ও সাহিত্য ব্যক্তির কাজ, একের কাজ, খোশখেয়ালের খুশিতে নিভৃত রাত্রির অবসরে তার সাধনা। কিন্তু জাতি গড়ার কাজ একলার নয়; এ কাজে মিলতে হবে সকলকে। এই মিলতে বাঙালী পারলে না। দল বেঁধে দলাদলি ক'রে গ'ড়ে তোলার সব কিছু সম্ভাবনাকে সে ভেঙে ভেঙে চলেছে। আজ সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার এই অস্বাস্থ্য বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। সমস্ত ভারতবর্ষের গ্লানির কেন্দ্র আজ এই বাংলা দেশ। অথচ বাঙালীর আর্ত

নালিশ অহরহ শোনা যাচ্ছে,—হিংসায় ও ঈর্ষায় তাকে নাকি চেপে মারছে অন্যান্য প্রদেশের সম্মিলিত চেষ্টা, বাঙালীর ভাল আজ আর কেউ দেখতে পারে না। এর চেয়ে মিথ্যে নালিশ আর কিছু হতে পারে না।···

ধ্বংস করবার কাজে কোন কৃতিত্বের প্রয়োজন নেই, বাঙালী আজ এতেই পটু হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ চালাবে অথচ শৃঙ্খলা মানবে না, পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত সমরায়োজন আর কুত্রাপি দেখা যায় নি। বাঙালীর যুদ্ধ বাইরের কোনও শত্রুর সঙ্গে নয়, পরস্পর, নিজের সঙ্গে; পরকে উপলক্ষ ক'রে ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে এরা অবিরত শান দিচ্ছে ছুরিতে; সে ছুরিও কোন ধাতুর তৈরী নয়—কুৎসা এবং কাদা দিয়ে তৈরী তার অস্ত্র। বড়কে, বৃহৎকে, নমস্যকে মানব না, পরস্পরের কাঁধে চড়ে ওপর থেকে কাদা ছুঁড়ব—এই মনোবৃত্তি থেকে কোনও কল্যাণ আসতে পারে না।···যে খোকামি প্রশ্রয় পেয়ে আজ বাংলা দেশের কপিধ্বজ রথের চূড়ায় চ'ড়ে বসেছে, সেই খোকামির স্বরূপ চেনবার শক্তি বাঙালীর এত দিনে অর্জন করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় তা হয় নি। বাংলা দেশের আধুনিক পলিটিক্স সেই নিষ্ফলতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

ইহার পর দীর্ঘ ষোল বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু বাংলা দেশের অবস্থা অবনত বই উন্নত হয় নাই।

একাদশ তরঙ্গ

বনস্পতির মৃত্যু

১৮৭৬ সনের ১৮ই নবেম্বর, শনিবার ভারত-স্বাধীনতার আদি ঋষি রাজনারায়ণ বসু কলিকাতার "বঙ্গভাষা-সমালোচনী সভা"র এক অধিবেশনে "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" দিতে দিতে মধুসূদনের প্রসঙ্গে আসিবার পূর্বে একটু থামিয়া বলেন—

"এক্ষণে আমরা মাইকেল মধুসূদনের নিকট আগমন করিতেছি। এই বারেই ঠকাঠকি।···তাঁহার সহিত আমার অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল। তিনি কলেজে আমার সমাধ্যায়ী ছিলেন। যখন আমি মেদিনীপুরে ছিলাম, তখন তাঁহার সহিত আমার সর্বদা পত্র লেখা হইত; সেই সকল পত্র আমার নিকট আছে; তাহা অতীব কৌতুহলজনক। যখন আমি ঐ

স্থানে ছিলাম, তখন মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য ছাপাইবার পূর্বে তাহার প্রথম দুই সর্গ আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া যেখানে যেখানে দোষ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত তিনি আমাকে 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' সংবাদপত্রে তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রার্থনামতে আমি ঐ কাব্য উক্ত পত্রে সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তির দোষ গুণ বিচারের সময় বন্ধুতা-ভাবের দ্বারা মনকে বশীভূত হইতে দেওয়া উচিত নহে।"

আমার 'আত্মস্মৃতি'তে 'বঙ্গশ্রী'র আমলে আসা অবধি আমি পাঁয়তারা ভাঁজিতেছি। এইবারে আমার সমসাময়িক কালের সাহিত্যিক বন্ধুদের প্রসঙ্গ তুলিব। কিন্তু কাজে নামিতে পারিতেছি না। কারণ "এইবারেই ঠকাঠকি"। যাঁহাদের কথা বলিতে চাহিতেছি তাঁহারা সকলেই আমার সমাধ্যায়ী না হইলেও অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং এমন এক সময় ছিল যখন তাঁহাদের প্রত্যেকে আমাকে রচনা শুনাইয়া সমর্থন না পাইলে ছাপিতে দিতেন না। এমন কি, অগ্রজ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মোহিতলাল মজুমদারও এই অনুগ্রহ করিতেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে তরুণতম সমসাময়িক বন্ধুদের গোড়ার সাহিত্য-সৃষ্টির সহিত আমি এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, বিচ্ছিন্ন নিরাসক্তির সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচার করা কঠিন। তবু রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায, কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মৃত ঘনিষ্ঠদের বেলায় পার আছে; কিন্তু সুশীল দে, প্রেমাঙ্কুর, তারাশঙ্কর, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু, প্রমথ, পরিমল, মনোজ, অমলা, শান্তি পাল, জগদীশ, সম্বুদ্ধ, দেবীপ্রসাদ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, উমা, বাণী, দীপক, হরিনারায়ণ, অমরেন্দ্র, গৌরীশঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, মানবেন্দ্র, কুমারেশ, সুভাষ সমাজদার প্রভৃতি জীবিতদের কথায় নির্ভয় নিঃসঙ্কোচ হওয়া আরও একটু সময়সাপেক্ষ। আমি এতকাল রবীন্দ্রনাথকে বুড়ি-ছুঁইয়া নির্ভাবনায় খেলিয়া যাইতেছিলাম, এইবারে তাঁহার তিরোভাব-প্রসঙ্গ দিয়া সে আশ্রয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। স্থির করিয়াছি, মৃত ও জীবিত রবীন্দ্রোত্তর সমসাময়িকদের কথা কিছুকাল বিরতির পর আরম্ভ করিব, ততদিনে তাঁহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানকে প্রশস্ততর এবং মনকে দৃঢ়তর করিতে হইবে।

শান্তিনিকেতনের অসহ্য গরম হইতে ভায়া-কলিকাতা কালিম্পঙের "গৌরীপুর ভবনে" পৌঁছিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল পরিবেশের মধ্যে কবির মন যথেষ্ট নরম হইয়া থাকিবে। ১৮ই মে (১৯৪০) তারিখেই পত্রযোগে তাঁহার একটি "ছড়া" পাইলাম; প্রসন্নচিত্ত কবি পূর্বেকার শর্ত উপেক্ষা করিলেন। দুই-চারিদিন পূর্বে কালিম্পঙ হইতেই শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী, শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য" শীর্ষক সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া "রবীন্দ্র-সাহিত্যের অবসান" নামক একটি রচনা শনিবারের চিঠিতে প্রকাশার্থ পাঠান। সে খবর অবগত হইয়া কবি একটু বিচলিত হন। তিনি লেখেন—

"ওঁ

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

সজনী, প্রতিশ্রুত ছিলুম তোমাকে একটা ছড়া দেব, সেটা রক্ষা করলুম…শুনছি সুধাকান্ত ধূর্জটির মুখরতার বিরুদ্ধে তোমাকে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছে। এ নিয়ে আমার মনে দ্বিধা আছে। যদিও তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছি তবু লোকে বলবে আমি এই রচনার "পৃষ্ঠপোষক" এবং এই সূত্রে শনিগ্রহের সঙ্গে রবিগ্রহের দেনাপাওনা চলছে। তোমাদের সকলের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ নিষ্কাম হয় এই আমার কামনা। তুমি ভেবে দেখো, এবং যেখানে আমার কোনো সমর্থন আছে সেটা বর্জন কোরো। ধূর্জটির লেখায় আমার একমাত্র বিরক্তির কারণ… তার ইস্কুল মাস্টারি মুরুব্বিয়ানা।… কিন্তু রুচির ক্ষেত্রে ধৃষ্টতা সহ্য করতেই হয়। যাই হোক আমাকে শান্তিতে থাকতে সাহায্য কোরো—বয়েস হয়ে গেছে। ইতি। ১৮।৫।৪০

রবীন্দ্রনাথ"

রবীন্দ্রনাথ উদারতা দেখাইলেও শর্ত সম্বন্ধে আমি কুণ্ঠিত ছিলাম, কাজেই ছড়াটি হাতে রাখিয়া দিলাম। তাঁহার তিরোধানের পর ১৩০৮ সালের ভাদ্র মাসের 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম কবিতা হিসাবে তাঁহার হাতের লেখার প্রতিলিপিতে উহা প্রকাশিত হয় ("সুবলদাদা আনল টেনে আদম দিঘির পাড়ে")। সুধাকান্তের রচনাটি ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠের "প্রসঙ্গ কথা"-ভুক্ত হইয়া

বাহির হয়। শর্তাধীন সঙ্কোচের বশে রবীন্দ্রনাথের পত্রের জবাব দিই নাই, তাহা ছাড়া ঠিক সেই সময়ে আমি সভাপতিত্বের বায়না লইয়া সারা বাংলা দেশ চষিয়া বেড়াইতেছিলাম। পূর্ববর্তী এপ্রিল মাসে কবির কালিম্পঙ যাত্রা-পথে শিয়ালদহ স্টেশনে বিদায় সাক্ষাতের পর আমার তরফ হইতে কোনও যোগাযোগ রক্ষা করি নাই। ১লা জুন পত্র লিখিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাইলাম—

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

দীর্ঘকাল তোমার কাছ থেকে চিঠির উত্তর না পেয়ে উদ্বিগ্ন ছিলুম। উত্তর পেয়ে যে উদ্বেগ কমল তা বলতে পারিনে। মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় তুমি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলে। নিজের প্রতি এই অত্যাচার কী করে তোমার দ্বারা সম্ভব হোলো ভেবে পাইনে। চুপ করে থাক এখন কিছু দিন, এডিটরি রাজদণ্ড দাও আর কারও হাতে। আমার চিঠির উত্তর দিতে হয় দিয়ো মনে মনে। সাব-এডিটরকে বলে দিয়ো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুহৃজ্জনের কোনো লেখা ছাপিয়ে বঙ্গ-সাহিত্য-সরোবরের তলার পাঁক ঘুলিয়ে দিয়ে ভারতীর পদ্মাসন যেন ঢলিয়ে না দেয়। শীঘ্র আরোগ্য লাভ কর এই কামনা করি। ইতি ৩।৬।৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ"

সঙ্গে সঙ্গে সুধাকান্ত মারফত খবর পাইলাম তিনি আমার ব্যাধি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানিবার জন্য আগ্রহশীল। ইতিহাস লিখিয়া পাঠাইতে পরদিনই ব্যবস্থা-পত্র আসিল—

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সকল বিষয়েই আমি আনাড়ি, অশিক্ষার উপরে কাজ চালিয়ে দিই, সব সময়ে ধরা পড়িনে। আমার ডাক্তারির পক্ষে বলবার কথা এই যে, সাংঘাতিকতায় আমার ওষুধ ব্যামোকে ছাড়িয়ে যায় না। বায়োকেমিক বইটা ঘেঁটে দেখছিলুম যে ঐ চিকিৎসার মতে নেট্রাম সালফ ডায়াবিটিসের প্রধান ওষুধ। তুমি এক কাজ কোরো। বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়িস

'টুয়েল্‌ভ টিস্যু রেমেডিজ' আনিয়ে নিয়ো, বলাইয়ের সাহায্যে সেটা ঘাঁটিয়ে নিয়ো। বায়োকেমিক ওষুধের গুণ এই যে হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধের মতো এ শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। অন্য ওষুধের সঙ্গে এর ব্যবহার চলে, অন্তত আমি তো ব্যবহার করেছি। দিনে তিনবার খেলে আপত্তি করে না, অ্যাকিউট ব্যাধিতে সেইটেই ব্যবস্থা।

আমার মনের অবস্থা কর্মবিমুখ, আমার গ্রহ আমাকে খাটিয়ে নেয়, বাজে খাটুনিই বেশি। ইতি তারিখ পাজি দেখে ঠিক করে নিয়ো।

রবীন্দ্রনাথ"

তারিখ ৬ই জুন হইবে। চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথের আরও দুইখানি চিঠি পর পর ছাপিতেছি। আমার বক্তব্য এইটুকু যে, বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়ির বইখানি খরিদ করিবার পর আরও অন্তত দুই শত টাকা ব্যয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বায়োকেমিক বিদ্যা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করি। পারিবারিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফলও পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, আমার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী উমারাণীর কঠিন সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা আমি অন্য মতে হইতে দিই নাই। বায়োকেমিক ঔষধেই ফল হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের পত্র দুইটি এই :

১। "ওঁ

[কালিম্পঙ, ২০ জুন, ১৯৪০]

কল্যাণীয়েষু

আমার ওষুধে ফল পেয়েছ। বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন। যে বয়সে স্বভাবতই অন্য খ্যাতির পথে বালিচাপা পড়ে, সেই বয়সে তিনি একটা নতুন পথ খুলে দিলেন। আমার জীবন-চরিতের শেষ অধ্যায়ে এই খবরটা দিয়ে যেতে পারবে। এ বিদ্যেটা সরস্বতীর এলাকায় নয়, এটা ধন্বন্তরীর মহলে—সেখানে রস নেই রসায়ন আছে। সাইকলজির নাড়ি যাঁরা টেপেন এখানকার নাড়ির খবর তাঁদের হাতে নেই। (বলাইয়ের প্রতি কটাক্ষ করচি নে, পদ্মগন্ধে আয়োডোফর্মের গন্ধ বেমালুম মিশে গেছে তাঁর নাসারন্ধ্রে।) যাক তোমার মাথাটাকে চাঙ্গা করবার জন্যে আমার বায়োকেমিক বিধান হচ্ছে কেলিফস সিক্স এক্স। পূর্বের ওষুধের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে, দিনে পাঁচটা বড়ি, অন্তত তিনবার সেবনীয়।

রবীন্দ্রনাথ"

২। "ওঁ

[শান্তিনিকেতন, ২৮ জুলাই ১৯৪০]

কল্যাণীয়েষু

তোমার বায়োকেমিক বন্ধুর [ইংরেজীতে সুবৃহৎ বায়োকেমিক চিকিৎসা-গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত বীরেন মিত্র] উদ্দেশে একখানা প্রশস্তিপত্র লিখে পাঠালুম। এখানে তোমার যে বন্ধুটি [সুধাকান্ত] আমার সিংহাসন আগলিয়ে থাকেন ইংরেজিতে লেখবার জন্যে তোমার হয়ে তিনি আমাকে তাগিদ জানালেন। গৌড়ীয় সাহিত্য-মণ্ডলীর প্রতিনিধি আমি এমন দুর্নীতির কাজ পারৎপক্ষে করিনে। আমার পক্ষে এর পরিণাম ভাল হবে না। আমার কলমের মুখে এ রকম বিধার্মিক কালী পড়াতে আমি লজ্জিত আছি। যদি এতে কারো কোনো উপকার হয় ভেবে এই অনাচার মেনে নিলুম।

তোমার কাজের মহলে একটা ডাক্তারি খিড়কির দরোজা হঠাৎ খুলে গেল—এর জন্যে দায়ী আমি। আশা করি কোনো পরিতাপের কারণ ঘটবে না। ভাল আছ বলে আন্দাজ করছি। চুপচাপ থাকাটা একটা খবর—ওটা আরো কিছুদিন বড় হেডলাইনে জাহির কোরো।

আমার দিন চলছে একঘেয়ে সুরে, অবন্ধুর পথে। ইতি ২৮।৭।৪০

রবীন্দ্রনাথ"

পাথরের মন্দিরে ইতিমধ্যেই ফাটল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিদায় ঘণ্টা মুহুর্মুহু বাজিতেছে। আমরাও শঙ্কিত-তটস্থ হইয়া উঠিতেছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় শান্তিনিকেতন হইতে পত্র পাইলাম। আমার 'কেডস ও স্যাণ্ডাল' এবং 'কলিকাল' সবে বাহির হইয়াছে, কবিকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি লিখিলেন—

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন। তোমার বই দুটি পেয়েছি। চোখ সুস্থ হলে পড়ব। কিছুতে মন দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হয়েছে। অক্টোবরের আরম্ভে পাহাড়ে পালাবার ইচ্ছা করচি। যাবার মুখে কলকাতায় দেখা হতে পারবে। নইলে তুমি যদি এখানে এসো সেও একটা উপায় আছে। ইতি ১০।৯।৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

এই চিঠি পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর ভাগলপুর টি. এন. জুবিলী কলেজের সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমি ভাগলপুর রওয়ানা হইলাম। পরদিন (১৫ই) বৈকালে সভা। হঠাৎ ১৬ই সেপ্টেম্বর ভাগলপুরে জরুরী তার পাইলাম—কবি কলিকাতায় পৌছিয়াছেন ও আমার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইয়াছেন। আমি সেই রাত্রেই রওয়ানা হইয়া পরদিন ১লা আশ্বিন ১৭ই সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে নয়টায় কলিকাতা পৌছিলাম। অপরাহ্ণে টেলিফোনে জোড়াসাঁকোয় খবর করিতেই সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান আসিল। বেলা চারিটায় পৌছিলাম, তাঁহাকে সুস্থ দেখাইতেছিল না, চোখ এবং কান খুবই খারাপ হইয়াছে, তবু দেখি প্রস্তুত হইয়া আছেন—সদ্য-লেখা "ল্যাবরেটারি" গল্প আমাকে পড়িয়া শুনাইবেন। আমি শঙ্কিত হইলাম, তাঁহার পরিজনদের কাছে কেমন একটা সঙ্কোচও বোধ হইতে লাগিল, তবু শুনিতে হইল। দেখিলাম, এই বয়সে অসুস্থ শরীরে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এক নারীচরিত্র সোহিনীর আবির্ভাব হইয়াছে। আমার কথায় কবি ছেলেমানুষের মত খুশী হইয়া উঠিলেন।

যদিও চিঠিতে "অক্টোবরের আরম্ভে পাহাড়ে পালাবার" কথা লিখিয়াছিলেন—বিকল দেহ ও চঞ্চল মন তাঁহাকে কলিকাতায় তিষ্ঠাইতে দিল না, তিনি ১৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রে সুধাকান্ত-সমভিব্যাহারে কালিম্পঙ রওয়ানা হইয়া গেলেন। পরদিন সকালে কালিম্পঙে পৌছিয়াই শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে বলিলেন, "বউমা, মৈত্রেয়ী লিখেছিল ওর ওখানে যেতে কিন্তু সেখানে যেতে সাহস হোলো না, আমি এখানেই এলুম। ডাক্তাররা বলছেন আমার কখন কি হয় তাই তোমাদের কাছাকাছি থাকাই ভালো। আমাকে এবার বড় ক্লান্ত করেছে, ভিতরে ভিতরে দুর্বল বোধ করছি, মনে হচ্ছে যেন সামনে একটা বিপদ অপেক্ষা করে আছে।"*

সেই বিপদ আসিতে দেরি হইল না। কালিম্পঙে সাত দিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল দুরন্ত ইউরিমিয়ার প্রকোপে তাঁহার চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। বিপদের সেই আরম্ভ। ট্রাঙ্ক টেলিফোন, বেতার বার্তা, চারিদিকে ছুটাছুটি—কলিকাতা হইতে ডাক্তারেরা গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। সারা দেশে মৃত্যুশোকের ছায়া নামিয়া আসিল।

এক মাসেরও অধিককাল জোড়াসাঁকোর "পাথরের ঘরে" তিনি জীবন-

---

* 'নির্বাণ' (ভাদ্র ১৩৪৯) পৃ ১০-১১।

মরণের সন্ধিক্ষণে প্রায় আচ্ছন্নের মত ছিলেন। ৩০ অক্টোবর তারিখে রোগকে উপেক্ষা করিয়া প্রথম কলম ধরিয়া লিখিলেন "জপের মালা"—

"একা বসে আছি হেথায়
যাতায়াতের পথের তীরে
যারা বিহানবেলায় গানের খেয়া
আনল বেয়ে প্রাণের ঘাটে
আলোছায়ার নিত্য নাটে
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা
মিলায় ধীরে।
আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে,
সুরহারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর পরে প্রহর যে যায়
বসে বসে কেবল গণি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে॥"

তখনই অস্ত্রোপচারের কথা হইতেছিল, কিন্তু সার নীলরতন সরকার তাহা হইতে দিলেন না। নবেম্বরে তাঁহাকে শান্তিনিকেতনের খোলা হাওয়া এবং তাজা রোদের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। অদম্য কবি এই সময়েই রচনা করিলেন—'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য,' 'জন্মদিনে' এবং 'গল্পসল্প'। 'গল্পসল্প' পুস্তকাকারে বাহির হয় ১৩৪৮ বৈশাখে। রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন যাওয়া এবং 'গল্পসল্পে'র প্রকাশ—নবেম্বর ১৯৪০—মে ১৯৪১ এই ছয় মাস কাল আবার আমাকে সভার ভূতে পাইয়া বসিয়াছিল, জিয়াগঞ্জ—দিনাজপুর—দার্জিলিং—বহরমপুর—ভাগলপুর—নবদ্বীপ টহল দিয়া ফিরিতে-ছিলাম। ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪১ একবার বোলপুর গিয়া কবিকে অনেকটা সুস্থই দেখিয়া আসিয়াছিলাম। 'গল্পসল্প' বাহির হওয়ামাত্রই তিনি আমাকে এক খণ্ড পাঠাইয়া আমার মতামত জানিতে চাহিলেন। আমি তখন সভাপতির সম্মানদক্ষিণা উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের বিবিধ প্রসিদ্ধ মিষ্টান্নের আক্রমণে ঘায়েল, শয্যাশায়ী বলিলেও হয়। তবু মনঃসংযোগ করিয়া বইখানি

পড়িলাম ও আমার বক্তব্য কবিকে জানাইলাম। পত্রোত্তরে তিনি ২৮।৫।৪১ তারিখে লিখিলেন—

"কল্যাণীয়েষু,

সজনী, গল্পসল্প তোমার ভালো লেগেছে শুনে আমি খুশী হলুম। ওরকম খুচরো গল্প সাধারণত কারো কানে পৌঁছয় না, কিছু পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তুমি যে তার ঠিক মর্মটি ধরতে পেরেছ এতে তোমাকে সাহিত্যের সমজদার বলে চেনা গেল।

তোমার শরীর অসুস্থ এর মধ্যে তুমি যে এই লেখায় মন দিতে পেরেছ এ খুব আশ্চর্যের বিষয়। তুমি রোগের হস্ত হতে নিষ্কৃতি লাভ কর, আমি এই কামনা করি। ইতি

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

যতদূর মনে পড়িতেছে, 'গল্পসল্পে'র উপর আমার লেখাটি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পত্র পাইয়াই আমি কেন জানি না, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। পরম্পরায় খবর পাইতেছিলাম, তিনি দিনে দিনে শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন। শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারিলাম না। বাহির হইয়া পড়িলাম—বাড়িতে মিথ্যা করিয়া বলিয়া গেলাম, জরুরি প্রয়োজনে চন্দননগর যাইতেছি। একলা একশত মাইল পাড়ি দিতে সাহস ছিল না। রবীন্দ্র-দর্শনকামী দুইজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ৩রা জুন সকালের ট্রেনে রওনা হইয়া সকালেই শান্তিনিকেতন পৌঁছিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। প্রতিমা দেবী ঠিকই বর্ণনা করিয়াছেন, "এই নয় মাসে ধীরে ধীরে চেহারা বদলে গিয়েছিল, তিনি শীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু তাতে তাঁকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখাত না। তাঁর চোখের উজ্জ্বলতা একটি করুণায় পূর্ণ হয়েছিল, তাঁকে ইদানীং মনে হোত তপঃক্লিষ্ট ঋষি, আধ্যাত্মিক জ্যোতির মধ্যে দিয়ে চলেছেন মহাপ্রস্থানের পথে. মুখে ঠিকরে পড়ত একটি প্রীতি ও শান্তির ধারা।" কবি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, কি করিয়া আমাদের আদর-আপ্যায়ন করিবেন তাহা লইয়া সচিব ও অনুচরদের বিপন্ন করিয়া তুলিলেন। বৈকালের ট্রেনেই ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষ পত্র* হস্তগত হইল—

*সম্ভবত বাহিরের লোককে লেখা এইটিই শেষ পত্র।

"কল্যাণীয়েষু

সজনী, তুমি ক্ষণকালের জন্য এসে আমাদের খুশী করে দিয়ে গেছ। তোমার যে রকম ভঙ্গুর অবস্থা তাতে আমি এ প্রত্যাশা করিনি। প্রতীক্ষা করে রইলুম সুস্থ অবস্থায় আবার সম্মিলন হোতে পারবে। আমি আজ অপেক্ষাকৃত কিছু ভালো আছি। তোমার বন্ধুরা খুশি হয়ে গেছেন, এই বর্ষার দিনে তাতে সুধাকান্তর মনকে মুখরিত করে তুলেছে। আশা করি সদলবলে ঘরে সুস্থ অবস্থায় ফিরতে পেরেছ এবং গৃহিণীর ভর্ৎসনা দুঃসহ হয়নি। ইতি ৪।৬।৪১

শুভানুধ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ"

একমাস তেইশ দিন পরে আবার সম্মিলন হইয়াছিল, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় নয়—হয়তো অন্যত্র এই সম্মিলন হইবে।

শান্তিনিকেতনে অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হইতে থাকিলে ২৫শে জুলাই শুক্রবার তাঁহাকে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আনা হয়, বেলা সওয়া তিনটায় তিনি আসিয়া পৌঁছান এবং দোতলার "পাথরের ঘরে"ই থাকেন। পরের দিন ২৬শে জুলাই, ১০ই শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ছিল। দুপুরের আহারের পর সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, হঠাৎ টেলিফোনে সুধাকান্তদার ব্যাকুল আহ্বান আসিল—যদি সজ্ঞানে কবিকে দেখতে চান এক্ষুনি আসুন। তৎক্ষণাৎ গেলাম। সুধাকান্তদার সহিত আমি কবির কাছে উপস্থিত হইতেই সেবারতা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। আমি প্রণাম করিতেই বসিতে বলিলেন। নিজে হইতেই অবনীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন, ওর জন্মদিন উপলক্ষ্যে (৭ই আগস্ট) তোমরা ঘটা করে উৎসব ক'রো। দেশের রুচির হাওয়া ও একলাই বদলে দিয়েছে—এত বড় প্রতিভা ওর। একটা বড় সম্মান ওর প্রাপ্য।

প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার মুখে বলিলাম আপনি শীগগির সুস্থ হয়ে উঠুন। তাঁহার মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল, কষ্টের সঙ্গে বলিলেন, সেটা কি আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে!

৭ই আগস্ট, ২২শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিপ্রহরে কবি বিদায় লইলেন। শেষের চারদিন দিবারাত্র আমি আরও অনেকের সহিত তাঁহার আশেপাশেই ছিলাম। শেষের তিন দিন তিনি সজ্ঞানে ছিলেন না।

সব শেষ হইলে যখন বাড়ি ফিরিলাম তখন আমারও প্রায় সংজ্ঞা ছিল না। একটা অসহ্য অব্যক্ত ব্যথায় মুহ্যমান ছিলাম। ১৬ই আগস্ট শ্রাদ্ধব্যপদেশে

শান্তিনিকেতন গেলাম, ফিরিয়া আসিয়াও মনের অশান্তি দূর হইল না। আমার যেন একটা কি করণীয় আছে অথচ করিতে পারিতেছি না, একটা ব্যাকুলতা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ৬ই সেপ্টেম্বর ২০শে ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে শোকসভা—৫ই সেপ্টেম্বর শিল্পী অতুল বসুর বণ্ডেল রোডের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের একটি তৈলচিত্র সংগ্রহে গেলাম। রবীন্দ্রনাথকে সামনে রাখিয়া শিল্পী চিত্রটি অঙ্কিত করেন। শিল্পী চিত্রটি পরিষৎকে দান করিবেন এবং পরের দিন সভায় উহার প্রতিষ্ঠা হইবে। কবির কথা চিন্তা করিতে করিতেই বাসে বালিগঞ্জ যাইতেছিলাম, সহসা বিদ্যুদ্দীপ্তির মত একটি কবিতার পংক্তি আমার মুহ্যমান মনকে উদ্ভাসিত করিল—

বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?

কোনও রকমে কাজ সারিয়া ছটফট করিতে করিতে বাড়ি ফিরিলাম এবং সেই রাত্রেই দীর্ঘ "মর্ত্য হইতে বিদায়" কবিতাটি লিখিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। পরদিন পরিষদের শোকসভায় কবিতাটি পাঠ করিলাম:

বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?
অরণ্যভূমি আঁধার করিয়া শতেক বর্ষ ধরি
শাখাপ্রশাখায় মেলি সহস্র বাহু
মৃত্তিকারস করিয়া শোষণ শিকড়ের পাকে পাকে
নিম্নে বিরচি বহুবিস্তৃত স্নেহছায়া-আশ্রয়—
অভ্রংলিহ বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?

সারা দেহ জুড়ি প্রদোষে উষায় নভচারী পাখীদের
কূজন ও কোলাহল—
স্তিমিত আলোয় উড়িয়া ক্লান্ত পক্ষের বিধুনন,
ভোরের আঁধারে দীপ্ত আশায় ডানা ঝাপটিয়া জাগা।
নীড়ে ও কুলায়ে প্রাণস্পন্দনে চকিত বিচঞ্চল—
বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?

অরণ্যশোভা বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?
পাদদেশে তার শতসহস্র পাদপ-সম্ভাবনা
খর্বায়তন লতাগুল্মের বিফল বিকারে হত।

রৌদ্রপুষ্ট সবুজ কোথায় ? পাণ্ডুর বনতল—
বনস্পতির মৃত্যুতে তারা পেয়েছে মুক্তি সবে ?
উদার আকাশে মেলিয়া অযুত বাহু
রয়েছে উতলা বিস্তার-কামনায়,
বনস্পতির বিহনে বনে কি জমিছে এরণ্ডেরা ?
লালসালোলুপ দৃষ্টি এখনি জাগিছে কাহারো চোখে,
কোনো বঞ্চিত, ওষ্ঠে তাহার ফুটিছে মলিন হাসি—
জীবনের লোভে মৃত্যুশীতল হাসি :
তবু আমি জানি, আশ্রয়হারা কাঁদিতেছে বনভূমি,
অভ্যাসবশে বনস্পতির নিবিড় চন্দ্রাতপ
কামনা করিছে সবে।
ধূসর রৌদ্র ভাল নাহি লাগে, আকাশের গাঢ় নীল ;
বনস্পতির মহিমায় আজো কানন আত্মহারা।
একের মাঝারে সবার সার্থকতা,
অদ্বিতীয় সে একের বিয়োগে বহুর যে কাতরতা
পেতেছে প্রকাশ নয়নে বাষ্প হয়ে,
রৌদ্রদগ্ধ নভপ্রাঙ্গণ করিছে মেঘমেদুর—
রহি রহি আজো ধারাবর্ষণে ঝরিছে অবিশ্রাম ;
লতাগুল্মের অরণ্যে হের ঝঞ্ঝার মাতামাতি,
মাথার উপরে আশ্রয় কারো নাই ;
কাননভূমির চির-আশ্রয় একক বনস্পতি—
বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?

বিফল উপমা, কোথা অরণ্য, কোথায় বনস্পতি,
কোথা কালিদাস, উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে কবি—
কোথায় উজ্জয়িনী ?
শুধু মেঘদূত গগনে গগনে গুমরিছে গুরু গুরু,
পবনে করিয়া ভর
কালসমুদ্র পার হয়ে এল সহস্র বর্ষের।
শত-পারাবত-কূজন-মুখর ভবনবলভি যত
মিশেছে ধূলায়, শুনিতেছি মোরা আজো—
কপোতকাকলি এ কলিকাতার অলস মধ্যাদিনে।

হায় রে উপমা, বিফল উপমা যত !
সকল উপমা হারাইয়া গেছে কাল-তমসার নীরে।
হায়, 'বলাকা'র কবি,
বাঁকা ঝিলমের দুই তীর ব্যাপি নেমেছে অন্ধকার,
জমেছে আঁধার নিরবধি-চলা "বিরাট নদী"র জলে।

তুষারমৌলি নগ-অধিরাজ দেখিয়াছি হিমালয়,
স্থিত পৃথিবীর মানদণ্ডের মত—
পূজিয়াছি হিমালয়ে।
যত দেখিয়াছি, তত করিয়াছি বিস্ময় অনুভব।
ভূমিকম্পের প্রবল তাড়নে সহসা কি একদিন
চৌচির হয়ে ফাটিয়া পড়িতে দেখিয়াছ হিমালয়ে ?
সহস্রশির বিরাট নগাধিরাজে
গুঁড়া গুঁড়া হয়ে ভাঙিয়া পড়িতে তোমরা দেখেছ কেউ ?
আকাশ-আড়াল-করা ব্যবধান একদা নিশীথশেষে
চকিতে দেখেছ বাতাসে উড়িয়া গেছে ?
সহসা দেখেছ বিস্মিত আঁখি মেলে
হিমালয় নাই, ধু-ধু করিতেছে সীমাহীন প্রান্তর,
ধু-ধু করিতেছে বালি-ঝলসানো সুবিশাল মরুভূমি—
মরীচিকাহীন ভয়াবহ মরুভূমি ?
মহা-হিমালয়ে ভাঙিতে দেখেছ কেউ ?
পাদমূল সহ দেবতা-আত্মা হিমচূড়া হিমালয়ে
মৃত্যুর মত কালো কুয়াশায় ঢাকিতে দেখেছ কেউ ?
রবির উদয়ে যে কুয়াশা কভু শূন্যে মিলাবে নাকো,
যে কুয়াশা ছেদি হাসিবে না হিমালয়,
সুনীল আকাশপটে কোনদিন তুষারশীর্ষ গিরি
জাগিবে না আর—কারো মনে এই জেগেছে সম্ভাবনা,
কঠিন সম্ভাবনা ?
ভাঙিতে কেহ কি দেখিয়াছ হিমালয়ে ?

বিফল উপমা, কোথা হিমালয়-নদী-গুহা-আশ্রয়,
কোথা কালিদাস রঘুকুমারের কবি ?

চিতার ভস্ম উড়িছে কি আজো রোদনমুখর
রেবামালিনীর কূলে,
স্মৃতিমন্দির উঠেছে কি কোনো, প্রভাতবেলায়
পুণ্যলোভীরা সবে
চন্দনমাখা শুভ্র কুসুম উদ্দেশে তাঁর দিতেছে শ্রদ্ধাভরে ?
হরপার্বতী-মিলনকাহিনী সুরসিক জন পড়িতেছে
যুগে যুগে,
কুতুহলী মোরা পড়ি অবকাশকালে—
ঘরে ঘরে সবে করি যে কামনা কুমার কার্তিকেয়ে ;
বৈদেহী সাথে ফিরিছে রাঘব শূন্য বিমান-পথে,
আজো দেখি মনে সেই পুরাতন ছবি—
কলকোলাহল-মুখরিত এই নগর কলিকাতায়।
হায় রে উপমা, বিফল উপমা যত,
সকল উপমা হারাইয়া যায় ক্ষণিকের খেলাঘরে ;
হায়, 'ক্ষণিকা'র কবি,
আঁধার নেমেছে "কৃষ্ণকলি"র হরিণনয়ন ছেয়ে,
নেমেছে আঁধার "ময়নাপাড়ার মাঠে"।

* * *

পূর্ণিমাচাঁদ দেখি নি ডুবিতে, আঁধার শ্রাবণনিশি—
শুনিয়াছিলাম শঙ্খঘণ্টারোল,
মেঘগর্জন-অবকাশে মোরা শুনেছিনু সকলেই
ঝুলন-পৌর্ণমাসী রজনীতে সঘন শঙ্খরব ;
বরষাবিদ্ধ তন্দ্রামগ্ন নগরী সে কলিকাতা,
চিৎপুর রোডে বন্ধ হয়েছে যানবাহনের চলা,
মেঘের আড়ালে দেখিনু সহসা হাসিল শারদশশী।

তীর্থযাত্রী একেলা পথিক বৈতরণীর তীরে
সম্বলহীন, তাই তো শঙ্কাহীন—
ওপারে চাহিয়া এপারের ছবি দেখিছে পথিক
ধ্যাননিমীলিত চোখে,
এপারের রবি ওপারে ডুবিতে চায়,
এপারে ওপারে আমাদের মাঝে দুস্তর পারাবার।

মহামানবের প্রাণ—
মানবের মাঝে চিরজীবী প্রাণ—সুন্দর ত্রিভুবন—
জীর্ণ খাঁচায় আজ পলাতক মরণোন্মুখ প্রাণ,
ভুবনের রূপ চির-অমলিন—তবুও বিবাগী প্রাণ,
শিয়রে তাঁহার জাগিছে কয়টি প্রাণী।
জাগে আর তারা প্রতীক্ষা করে নিশ্বাস গুনে গুনে,
প্রতীক্ষা করে নিশ্বাস রোধ করি,
প্রহর গনিয়া প্রতীক্ষা করে সবে।
শ্রাবণরজনী শিথিলচরণে প্রখর রৌদ্রে কখন আত্মহারা,
প্রভাত হইল রাখী-পূর্ণিমা-দিন,
মাটির ধরণী রাখিতে নারিল তবু
বিদায়প্রার্থী বিবাগী সন্তানেরে।
দূর হতে দেখি জীবনের বুকে মৃত্যুর নিশ্বাস
ওঠে আর ভেঙে পড়ে।
সুশুভ্রফেনশীর্ষ বারিধি মেলি তরঙ্গবাহু
অভ্যাসবশে তটেরে ধরিতে চায়—
মিথ্যা সে খেলা, আমি জানি তার গভীরেতে অনুরাগ।
বিদায়-বারতা শুধু নিশ্বাসে—শান্ত ললাট-পট,
পাণ্ডু ওষ্ঠে স্ফুরে না বিদায়গান;
পিছু ফিরিবার নাহি কোনো ব্যাকুলতা,
যাবার বেলায় পিছু ডাকিবার ছিল না সেদিন কেউ।
সে মহাপ্রাণের শিয়রে জাগিয়া কটি অসহায় প্রাণী—
মূঢ় বিস্ময়ে সহসা দেখিল তারা—
দেখিল সহসা দ্বারে জনতার ভীড়।
মাটির পৃথিবী চঞ্চল হয়ে বাহু বুঝি মেলিয়াছে—
বিদায়প্রার্থী রাখিতে সন্তানেরে;
তখন সময় নাই।
আকাশে বাতাসে শুধু শোনা যায় অস্ফুট কানাকানি,
প্রাণমৃত্যুর চিররহস্য-কথা—
নিগূঢ় গোপন কথা।
মৃত্যুর কথা কেহ বলিল না, “বারোটা তেরো মিনিট”—
কণ্ঠে কণ্ঠে অতি অসময়ে সময়ের পরিমাপ,

মহাকাল-গতি চকিতে থামিল যেন—
এপারে ওপারে ঘুচে গেল ব্যবধান,
প্রাণমৃত্যুর সব রহস্য শেষ।
আসিল পরম ক্ষণ—
সারা বনভূমি আলোড়ন করি মরিল বনস্পতি,
ভেঙে গেল হিমালয়।

মৃত্যুরে যেবা প্রলুব্ধ করি ডাক দিয়েছিল অর্ধ শতক ধরি
মৃত্যু তাহারে নিয়ে গেল শেষাশেষি ;
নিয়ে গেল ভালবেসে—
রক্ত-অধর নিবিড় চুমায় পাণ্ডুর হ'ল কি না,
হিসাব তাহার পারে নি রাখিতে কেউ।
গোধূলি-লগনে যায় নি পথিক স্তিমিত অন্ধকারে,
পাখীরা তখনো ফিরে আসে নাই নীড়ে।
দিনের রৌদ্র যখন প্রখরতম
মর্ত্য হইতে বিদায়-বারতা রটিল মর্ত্যভূমে,
মর্ত্য-মানব মোরা—
"স্বর্গ হইতে বিদায়ে"র কবি—নিমীল তাঁহার চোখে
বিদায়-অশ্রু কেহ কি দেখিয়াছিল ?
হায় কবি, হায়, সুন্দর ত্রিভুবন !

স্তম্ভিত ভয়ে শুনেছিনু সবে আর্ত ঘোষণা সেই,
আকাশের পানে তুলিয়া চকিতে শত উৎসুক আঁখি
দেখেছিনু সবে, খর-রবিকরে নিখিল পুড়িয়া যায়—
অকরুণ নীলাকাশ।

মৃত্যু, মরণ, সমাপ্তি, শেষ, বিদায় চিরন্তন—
কাব্যের ভাষা যাহাই বলুক, নিঃশেষে শেষ হওয়া
সকল দেহীর মত—
অমর কবির চরম সে পরিণাম ;
স্তব্ধ হইয়া শুনিলাম কানে শ্রাবণ-দ্বিপ্রহরে,

বিস্ময়ে দেখিলাম,
নিশ্চল দেহে সকল জ্বালার শেষ।

সুতীব্র কশাঘাতে—
অলক্ষ্য সেই অকরুণ কশাঘাতে
দেহে মনে যেন উঠিনু চকিত হয়ে,
চীৎকার করি বলিবারে চাহিলাম—
বলিতে চাহিনু চরম অবিশ্বাসে,
"মর্ত্য-মানব মোরা—
ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই অসহায়,
ধ্বংস-জরার ক্রূর হাত হতে নিস্তার কারো নাই।"
ক্ষণ-বিস্মৃতি—ক্রোধে বেদনায় চাহি অপলক চোখে—
পাগলের মত চাহি বিহ্বল চোখে
দেখিনু মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখখানি—
প্রশান্ত মুখে দুটি অপলক আঁখি,
আয়ত নয়নে দৃষ্টি কেবল নাই।
যে আঁখি একদা সূর্যের মত জ্বলিত দীপ্ত তেজে—
জ্বলিত তীক্ষ্ণ তেজে—
সন্ধানী আলো—চকিতে দেখিত গোপন মর্মতল,
বিশ্বের ব্যথা জমাট বাঁধিয়া কালো সে গভীর চোখে,
দৃষ্টির লেশ নাই।

কি যে হ'ল মনে, বিহ্বল ক্ষণে কল্পনা অদ্ভুত,
মৃতের বধির শ্রবণে চাহিনু শোনাতে আর্তস্বরে—
"চাও আঁখি মেলি, কথা কও কও মর্ত্যের সন্তান,
আমরা মর্ত্যবাসী
ডাকিতেছি সবে, নয়ন মেলিয়া চাও।"
মনে মনে ডাকিলাম—
ঘরের বাতাস ভারী হয়ে এল, কেহ শুনিল না কানে।
মর্ত্যের কবি, চিরজীবী কবি, কখন অকস্মাৎ
মলিন মর্ত্য হইতে বিদায় নিয়েছে অনিচ্ছায়।

সুন্দর এ ভুবন—
ভুবন ছাড়িয়া ভুবনের কবি গিয়াছে পরম ক্ষণে।

*   *   *

বিমূঢ় স্তব্ধ দেখিলাম চেয়ে নিবেছে দিনের আলো—
মেঘে মেঘে কালো গাঢ় আকাশের নীল।
মানুষের কাঁধে কাঁধে চ'লে গেল মৃত মানবের দেহ,
পাবক-অগ্নি জ্বলে জাহ্নবীতীরে,
জ্বলিছে রাত্রিদিন।

*   *   *

অন্ধকারেতে সভয় চরণ ফেলিয়া এলাম ঘরে—
আমার রুদ্ধ ঘরে ;
সম্বিৎহারা সম্বিৎ পেনু ফিরে—
প্রসন্ন আঁখি মেলি দেখিলাম, আমার ঘরের কোণে
স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলিতেছে ঘৃতদীপ ;
চিতার আগুন ঘরের প্রদীপে কখন ছুঁইয়া গেছে—
ছুঁয়েছে পরম স্নেহে।
দ্বিধা-কম্পিত দুই করতল এক হ'ল আশ্বাসে,
বলিতে পারি না কোন্ দেবতারে ঘৃতদীপ-মহিমায়
নিবেদিনু নতি চরম নমস্কারে।

প্রকাশকের নিবেদন

'আত্মস্মৃতি' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল যথাক্রমে অগ্রহায়ণ ১৩৬১ ও ভাদ্র ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী। বই দুটি নিঃশেষিত হয়ে গেছে অনেককাল আগে। দীর্ঘদিন অমুদ্রিত থাকার ফলে বহু আগ্রহী পাঠক ও গবেষকের অসুবিধা ঘটেছে, অনেকে বই দুটি কোনমতে সংগ্রহ করতে না পেরে খোঁজাখুঁজির হয়রানি ভোগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অনেক দেরিতে হলেও পরবর্তী প্রকাশনের দায়িত্ব নিয়ে প্রথম দ্বিতীয় দুই খণ্ডের সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত তৃতীয় খণ্ড একত্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করার সৌভাগ্য আমাদের হল। সে ক্ষেত্রে এটিকে নতুন প্রকাশ রূপে গণ্য করাই সঙ্গত হবে।

গ্রন্থমধ্যে চারখানি ছবি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থারম্ভের ছবিখানি সজনীকান্তের যৌবনবয়সে তোলা। শনিমণ্ডলীর ছবিটি ১৯২৮ সালের। রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত ছবিটি তোলা হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। পত্নী ও পৌত্রসহ সজনীকান্তের ছবি ১৯৬১ সালের।

'আত্মস্মৃতি' তৃতীয় খণ্ড সজনীকান্তের ইচ্ছানুসারে কবি-সম্পাদক-অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

সজনীকান্তের জন্ম বর্ধমানের বেতালবন গ্রামে ৯ই ভাদ্র ১৩০৭, ২৫এ আগস্ট ১৯০০ শনিবার। মৃত্যু কলিকাতায় ২৮এ মাঘ ১৩৬৮, ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ রবিবার।

এই গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠার দশম পংক্তিতে 'কিন্তু'র পরে 'সাময়িক ভাবে' কথাটি বসিবে।

গ্রন্থটির প্রুফ দেখা, নির্ঘণ্ট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত এবং শ্রীসুচিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভূত সাহায্য করেছেন।

॥ নির্ঘণ্ট ॥

॥ নির্ঘণ্ট ॥

॥ নির্ঘণ্ট ॥

—•—